পূজাবার্ষিকী ১৩৮৭
আনন্দমেলা

পূজোয় চাই
নতুন জুতো
স্পোর্টি ১৯
সাইজ ৫-৮
পোগো বি-১
সাইজ ৪-৮
প্লেমেট ৪৩
সাইজ ৩-৬,
৭-১০, ১১-১
জুবিলি ৫৩
সাইজ ৬-৮,
৯-১১
টনি ০৮
সাইজ ৪-৬, ৭-১০
Bata understands shoes
Bata

পূজাবার্ষিকী ১৩৮৭

বিশেষ রচনা

উপন্যাস

বড় গল্প

চিত্র-কাহিনী

গল্প

কবিতা ও ছড়া

খেলাধুলো

জ্ঞান-বিজ্ঞান

পরীক্ষার্থীদের জন্য

রচনা-বিচিত্রা

প্রচ্ছদ ঃ বিমল দাস

সম্পাদক ঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং দেশ পাবলিকেশনস (প্রা) লিমিটেড, ২৬৭ রয়াপেটা হাই রোড, মাদরাজ ৬০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত।

স্ট্যানরোজ ত্রৈমাসিক
আকাশ বাতাস আজ উৎসব মুখর ! জীবনের সব আনন্দকে পরিপূর্ণ-ভাবে উপভোগ করার সেই মধুর ক্ষণগুলি আবার ফিরে এসেছে।
আনন্দের এই শুভ ক্ষণে আপনাকে সঙ্গ দিতে আমরাও এগিয়ে এসেছি —আর সঙ্গে এনেছি নানান বস্ত্রের সম্ভার—যা উৎসবের আনন্দকে করবে দ্বিগুণ আর ঐ আনন্দের রেশ থাকবে সারা বছর !
everest/80/SM/307-bn
এই সব চাঞ্চল্যকর নতুন ফ্যাশন আপনার জন্যেই তৈরী
সিলেক্শন্
গোল্ড ক্রেস্ট
স্যুটিংস
কটো প্রিন্সেস্
রুবিয়া
প্রিয় লক্ষী
স্ট্যাণ্ডার্ড মিলস
মফতলাল অ্যাপারেলস
সুরাট কটন মিলস
স্ট্যানরোজ ফ্যাব্রিকস

মেঘের ময়ূরপংখী চলেচে
পশ্চিম পথ ধরে,
সূর্য্য বসেন মাঝখানে তার
রঙিন বসন পরে।
কিরণ ছটার মুকুট মাথায়
ঐ বুঝি দিয়ে যান
মাঠের শেষের বনের পাতায়
শেষ আলোকের দান।

মেঘের ময়ূরপংখী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
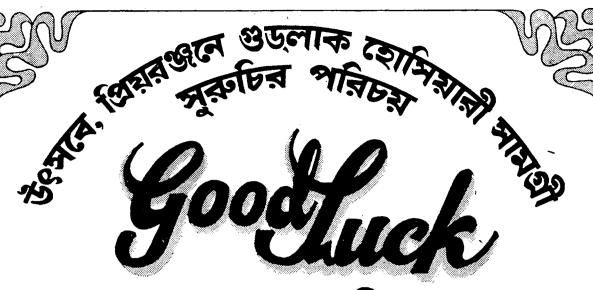
মেঘের ময়ূরপংখী চলেচে
পশ্চিম পথ ধরে,
সূর্য্য বসেন মাঝখানে তার
রঙিন বসন পরে।
কিরণছটার মুকুট মাথায়
ঐ বুঝি দিয়ে যান
মাঠের শেষের বনের পাতায়
শেষ আলোকের দান

এখন থেকে বাহান্ন বছর আগে (১৯২৮) রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি লিখেছিলেন। তাঁর 'সহজ পাঠ'-এর একটি পাণ্ডুলিপিতে এটি পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন-অভিলেখাগার থেকে শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব এটি সংগ্রহ করে তোমাদের জন্য পাঠিয়েছেন। বিশ্বভারতীর মাননীয় উপাচার্য ও রবীন্দ্রভবনের মাননীয় অধ্যক্ষ-মহোদয়ের অনুমতিক্রমে এটি এখানে প্রকাশ করা হল।

ছবি অনুপ রায়

রবীন্দ্রনাথের মাস্টারমশাইরা

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'-কাব্যের 'পুরোনো বট' কবিতার সঙ্গে আমাদের অনেকেরই পরিচয় আছে। তাতে বটগাছ-তলার বর্ণনায় কবি লিখছেন ঃ —''ওখানেতে পাঠশালা নেই,/পন্ডিত মশাই—/বেত হাতে নাইকো বসে/মাধব গোঁসাই।'' কবিতার এই 'মাধব গোঁসাই'ই হলেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম মাস্টারমশাই মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর দেশ ছিল বাঁকুড়া—জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির চন্ডীমন্ডপের পাঠশালার গুরুমশাই ছিলেন তিনি। মাধবপন্ডিতের পাঠশালায় শিশু-রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন বিদ্যাসাগর-প্রণীত 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগের বিখ্যাত সেই পংক্তি—'জল পড়ে পাতা নড়ে'—তাঁর জীবনে যা হয়ে উঠেছিল আদি কবির প্রথম কবিতা। বর্ণপরিচয় ছাড়া মাধবপন্ডিত তাঁকে মুখস্থ করিয়েছিলেন 'চাণক্য-শ্লোক', পড়িয়েছিলেন 'শিশুবোধক'—যার একটি গল্প ছিল ষন্ডামার্ক মুনির পাঠশালা সম্পর্কে। বড়দের সঙ্গে ইস্কুলে যাবার জেদ ধরলে এই মাধবচন্দ্রই রবীন্দ্রনাথের গালে প্রচন্ড এক চড় কষিয়ে বলেছিলেন—এখন ইস্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদছ, না যাবার জন্যে এর চেয়ে অনেক বেশি কাঁদতে হবে। এত বড় অব্যর্থ ভবিষ্যৎবাণী, ইস্কুল-পলাতক রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে নিজেই স্বীকার করেছেন, আর কেউ কোনোদিন তাঁর সম্বন্ধে করেন নি।

মাধবপন্ডিতের পর রবীন্দ্রনাথের যে-শিক্ষকের উল্লেখ পাই তিনি হলেন নর্মাল ইস্কুলের হরনাথ পন্ডিত। তাঁর চোয়াল দুটি ছিল অদ্ভুত চওড়া আর শক্ত রকমের। কথা বলার সময় সেই চোয়াল দুটি ওঠানামা করত, মনে হত তিনি যেন কিছু চিবোচ্ছেন। হরনাথ ক্লাসে ছেলেদের কুৎসিত ভাষায় অপমান করতেন, ছাত্রদের অদ্ভুত নামকরণ করে আনন্দ পেতেন। এ-রকম স্বভাবের শিক্ষকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনে জন্মেছিল দারুণ বিতৃষ্ণা। ক্লাসে হরনাথের কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিতেন না তিনি—সবার পিছনে চুপচাপ বসে থাকতেন। বছর-শেষের পরীক্ষায় নর্মাল ইস্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক মধুসূদন বাচস্পতির কাছে বাংলায় রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি নম্বর পেলে হরনাথ পরীক্ষকের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনেছিলেন। ফলে, বিদ্যালয়ের সুপারিনটেনডেন্ট গোবিন্দবাবুর সামনে রবীন্দ্রনাথকে আবার পরীক্ষা দিতে হয়, এবং, বলা নিষ্প্রয়োজন, এবার-ও রবীন্দ্রনাথ শীর্ষস্থান অধিকার করেন। মনে হয়,এই হরনাথ-পন্ডিতেরই ছাত্র-পীড়নের কিছু নমুনা রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন তাঁর 'গিন্নি' গল্পে। 'হরনাথ' সেখানে হয়েছেন 'শিবনাথ'—যাঁকে দেখলেই ক্লাসের ছেলেদের অন্তরাত্মা যেত শুকিয়ে—যিনি গ্রীবার অংশটা প্রশস্ত থাকায় শশীশেখরের নামকরণ করেছিলেন 'ভেটকি', বোনের সঙ্গে পুতুল খেলত বলে আশুর নাম দিয়েছিলেন 'গিন্নি'। হরনাথ পন্ডিতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ 'গিন্নি' গল্পে ফুটে উঠেছে।

নর্মাল ইস্কুলের নীলকমল ঘোষাল ছিলেন রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক। তাঁর শরীর ছিল ক্ষীণ, শুষ্ক ও কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ। ছাত্র-রবীন্দ্রনাথ তাঁকে মানুষ-জন্মধারী ছিপ্‌ছিপে বেতের মতো ভাবতেন। সকাল ছ'টা থেকে সাড়ে ন'টা পর্যন্ত পড়াতেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে পড়েছেন বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়', অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ' ও 'পদার্থবিদ্যা', রামগতি ন্যায়রত্ন-প্রণীত 'বস্তুবিচার', সাতকড়ি দত্ত রচিত 'প্রাণিবৃত্তান্ত', মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'—জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল। নীলকমলবাবুর কাছে পড়ার সময় অমনোযোগী ছাত্র রবীন্দ্রনাথের চোখ ছুটে যেত নেয়ামত দর্জির কাপড় সেলাই করার দিকে কিংবা চন্দ্রভান দারোয়ানের লম্বা দাড়ি আঁচড়ানোর দিকে।

নর্মাল ইস্কুলেরই আর-এক শিক্ষক ছিলেন সাতকড়ি দত্ত—যাঁর 'প্রাণিবৃত্তান্ত' ছিল রবীন্দ্রনাথের পাঠ্য। ক্লাসে না-পড়ালেও বালক রবীন্দ্রনাথকে তিনি বিশেষভাবে স্নেহ করতেন। ররীন্দ্রনাথ কবিতা লেখেন জানতে পেরে সাতকড়িবাবু মাঝে-মাঝে দু' এক পদ দিয়ে তা পূরণ করে আনতে বলতেন। যেমন একবার দিয়েছিলেন—"রবি-করে জ্বালাতন আছিল সবাই,/বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।" —রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে মিলিয়ে যে-পদ্য লিখেছিলেন তার দুটি পদ 'জীবনস্মৃতি'-তে উল্লেখ করেছেন—"মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে,/এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।"

সাতকড়ি দত্তের মতোই রবীন্দ্রনাথকে কবিতা লেখার ফরমায়েশ করেছিলেন নর্মাল ইস্কুলের পূর্বোক্ত সুপারিন-টেনডেন্ট গোবিন্দবাবু—পুরো নাম গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঁটেখাটো মোটাসোটা গোবিন্দবাবুর গায়ের রঙ ছিল ঘন কালো, তার উপরে আবার কালো চাপকান পরে ইস্কুলের দোতলাঘরে অফিস করতেন তিনি। দোর্দন্ড প্রতাপ ছিল তাঁর —অপরাধী ছাত্রদের বিচার করার—শাস্তি দেবার ভার ছিল তাঁর-ই উপরে। বড় ছেলেদের উপদ্রবে অতিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ

কখনো-কখনো গোবিন্দবাবুর শরণাপন্ন হতেন। এই গোবিন্দ-বাবুর আদেশে বালক-কবি উচ্চ অঙ্গের সুনীতি সম্পর্কে কবিতা লিখে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করে-ছিলেন। গোবিন্দবাবুর প্রত্যাশা-মতো রবীন্দ্রনাথের নীতি-কবিতাটি ছাত্রদের উচ্চ-আদর্শে উদ্বুদ্ধ তো করেইনি, বরঞ্চ কবিতা শুনে ছাত্ররা যে-পথ অবলম্বন করেছিল, তা মোটেই নৈতিক কারণে সমর্থন-যোগ্য নয়। প্রথমত ছাত্ররা রটনা করেছে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি নিজে লেখেননি—ছাপা বই থেকে চুরি করেছেন। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথের দেখাদেখি ছাত্ররা অনেকেই কবিতা লেখা শুরু করেছে—কবিযশঃপ্রার্থীর সংখ্যা বেড়েছে—বই থেকে নকল করে কবিতা লিখে তারা রবীন্দ্রনাথের প্রতিযোগী হতে চেয়েছে।

সেন্ট জেভিয়ার্স ইস্কুলের যে-শিক্ষকের মধুর-স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের জীবনে অম্লান হয়েছিল তাঁর নাম ফাদার ডি পেনেরান্ডা (Father Alphonsus de Penaranda)। জাতিতে স্পেনীয় হওয়ায় তাঁর ইংরেজি উচ্চারণে যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল—তারই সুযোগ নিয়ে ক্লাসের ছাত্ররা তাঁকে অপদস্থ করত। ছাত্রদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ফাদার নীরবে সহ্য করতেন। এ-কারণে তাঁর প্রতি বালক রবীন্দ্রনাথের সমবেদনার অন্ত ছিল না। নিয়মিত শিক্ষকের বদলে ক্লাস নেওয়ার সময় ফাদার ডি পেনেরান্ডা একদিন তাঁর প্রতি যে সস্নেহ সহানুভূতি দেখিয়ে-ছিলেন তাতেই অভিভূত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

গৃহশিক্ষকদের মধ্যে সর্বাগ্রে আসে ইংরেজি মাস্টার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথা। এর আগে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি শেখার সূত্রপাত হয় রাখালদাস দত্ত নামে স্বল্পস্থায়ী এক শিক্ষকের কাছে। অঘোরবাবু ছিলেন মেডিকেল কালেজের ছাত্র—তাই তাঁর স্বাস্থ্যও ছিল 'অন্যায়রকমের' ভাল—রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহপাঠীদের ঐকান্তিক কামনা সত্ত্বেও তিনি কোনো সন্ধ্যায় অনুপস্থিত থাকেন নি। প্রচন্ড বর্ষণেও অঘোর-মাস্টারমশাইয়ের 'দৈবদুর্যোগে-অপরাহত' সেই কালো ছাতাটি যথাসময়ে জোড়াসাঁকো গলিতে দেখা দিয়েছে। অঘোরবাবু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আপত্তির প্রধান কারণ—তাঁর পড়াবার সময় ছিল সন্ধ্যা এবং পড়াবার বিষয় ছিল ইংরেজি। বালককে ইংরেজির প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য অঘোরবাবু হরেক উপায় অবলম্বন করেছেন। ইংরেজি কাব্যের ভাল-ভাল জায়গা আবৃত্তি করতে গিয়ে ছাত্রের কাছে নিজেকে হাস্যকর করে তুলেছেন। ছাত্রকে খুশি করার জন্য রুটিন-মাফিক পড়া বন্ধ রেখে কখনও বা পকেট থেকে কাগজে-মোড়া মানুষের কণ্ঠনালী বের করে বুঝিয়েছেন তার কাজকর্ম, কখনও বা ছাত্রকে অবাক করে দেবার জন্য নিয়ে গেছেন মেডিকেল কলেজে শব-ব্যবচ্ছেদের ঘরে—দেখিয়েছেন বৃদ্ধার মৃতদেহ, কিংবা এক খন্ড কাটা পা। এত করেও ইংরেজি পাঠে রবীন্দ্রনাথের মনোনিবেশ ঘটে নি। তারই মাঝে অঘোরবাবুর কাছে পড়েছেন প্যারীচরণ সরকারের 'ফার্স্ট বুক অব রীডিং', 'সেকেন্ড বুক অব রীডিং', মকলকের 'কোরস অব রীডিং'।

বাড়িতে যাঁরা পড়াতেন—তাঁদের মধ্যে বালকের সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষক ছিলেন সীতানাথ ঘোষ—যাঁকে 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'র সীতানাথ দত্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেকালে বৈজ্ঞানিক হিসেবে সীতানাথের খ্যাতি ছিল। বিদ্যুৎ ও চুম্বকের সাহায্যে কীভাবে শরীরকে সুস্থ ও নীরোগ রাখা যেতে পারে তাই ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে যন্ত্রযোগে প্রতি রবিবার প্রাকৃত বিজ্ঞান পড়তেন। বিষয়টি বালকের কাছে এমন-ই চিত্তাকর্ষক ছিল যে, যে-রবিবার সীতানাথবাবু অনুপস্থিত হতেন, সে-রবিবার রবীন্দ্রনাথের রবিবার বলেই বোধ হত না। সীতানাথ-ই ব্যবহারিক ক্লাসের মারফত জ্বাল দিলে জল কীভাবে টগ্‌বগ্‌ করে, দুধ কীভাবে ঘন হয়—ইত্যাদি দেখিয়ে বালকদের বিস্মিত করে দিতেন।

মেডিকেল কলেজের এক ছাত্র (নাম জানা যায় না) রবীন্দ্রনাথকে অস্থিবিদ্যা শেখাতেন। মানুষের হাড় চেনাবার জন্য ছ' টাকা দু' আনা (পারিবারিক হিসাবখাতা অনুযায়ী) দিয়ে কেনা হয়েছিল তার-দিয়ে-জোড়া আস্ত একটা নরকঙ্কাল, সেটা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল পড়ার ঘরে। অস্থিবিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে আবার হেরম্ব তত্ত্বরত্নের কাছে না-বুঝে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ মুখস্থ করতে হত। অস্থিবিদ্যার হাড়ের নাম আর বোপদেবের ব্যাকরণের সূত্র—দুয়ের মধ্যে তুলনামূলকভাবে হাড়ের নামগুলোই বালকের কাছে কিছুটা সহজ ঠেকত। বড় বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঐ নরকঙ্কাল অবলম্বনে 'কঙ্কাল' নামে তাঁর বিখ্যাত গল্পটি লেখেন।

শুধু বই-পড়া কিংবা মুখস্থ-বিদ্যা নয়, এ-সময়ে রবীন্দ্রনাথকে নিয়মিত গানও শিখতে হত। তাঁর প্রথম গানের শিক্ষক বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী, যিনি রামমোহন রায়ের সময় থেকে ব্রাহ্মসমাজে গান গাইতেন। ঠাকুরবাড়িতে বিষ্ণু ছিলেন বেতন-ভুক গায়ক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে শিখেছেন দেশী গান, কখনো-বা ব্রহ্মসঙ্গীত। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আশ্রিত এক নাম-না-জানা গাইয়ে তাঁকে সকালবেলার সুরে শিখিয়েছিলেন "বংশী হমারি রে।" বিখ্যাত গায়ক যদুভট্টও রবীন্দ্রনাথের গানের শিক্ষক ছিলেন।

ভোরে উঠে বাড়ির নিয়মানুযায়ী বালক রবীন্দ্রনাথ কুস্তি লড়তেন শহরের ডাকসাইটে পালোয়ান হীরা সিং-এর সঙ্গে। বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে ব্যায়াম শিখতেন নামজাদা ব্যায়াম-বীর শ্যামাচরণ ঘোষের কাছে। তাছাড়া এই বিকেলেই আসতেন ছবি-আঁকার মাস্টারমশাই। সম্ভবত তাঁর নাম ছিল ভবানীচরণ সেন।

ইস্কুলের সিলেবাস অনুযায়ী পড়াশুনোয় যখন রবীন্দ্র-নাথের মন বসল না, যখন গৃহশিক্ষকরা তাঁকে 'তরিয়ে দেবার কাজে হাল ছেড়ে' দিলেন, তখন তাঁর শিক্ষকতার ভার নিলেন জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য বি এ—প্রথম একজন গ্র্যাজুয়েটের কাছে পড়ার সুযোগ হল তাঁর। তিনি রবীন্দ্রনাথকে কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' মুখস্থ করালেন, তর্জমা করালেন শেক্সপিয়রের 'ম্যাকবেথ'। তর্জমা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত তিনি রবীন্দ্রনাথকে ঘরে বন্ধ করে রাখতেন। মেট্রোপলিটন ইনসটিটিউশনের হেড-পন্ডিত রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য সংস্কৃত শিক্ষক রূপে রবীন্দ্রনাথকে পড়ালেন কালিদাসের 'শকুন্তলা'। তিনি-ই আবার রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যান বিদ্যাসাগরের কাছে, তাঁকে শুনিয়ে আসেন ম্যাকবেথের অনুবাদ। জ্ঞানচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথের দায়িত্ব নিলেন মেট্রোপলিটন কলেজের সুপারিনটেনডেন্ট ব্রজনাথ দে। তিনি তাঁর ছাত্রকে দিয়ে অনুবাদ করালেন গোল্ডস্মিথের 'ভিকর অব ওয়েকফিলড'। নিয়মিত শিক্ষক ছাড়াও বাড়িতে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ও মনীষী রাজনারায়ণ বসু রবীন্দ্রনাথের পড়াশুনোর তত্ত্বাবধান করেছেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথকে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত যেতে হয়। সেখানকার তিনজন শিক্ষকের উল্লেখ আছে 'জীবনস্মৃতি'তে। প্রথমজন ল্যাটিন-শিক্ষক—দরিদ্র ও ভাবুক প্রকৃতির এই শিক্ষকের নাম না বললেও তাঁর প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বার্কার নামে শিক্ষকের নিজের স্ত্রীর প্রতি অমানবিক ব্যবহার দেখে রবীন্দ্রনাথ খুবই অপ্রসন্ন হয়েছেন। সবশেষে আসে হেনরি মর্লির কথা—সাহিত্য যাঁর মনে, যাঁর গলার সুরে কাব্য প্রাণ পেয়ে উঠত এবং যাঁকে লন্ডন ইউনিভারসিটিতে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে পেয়ে ধন্য বোধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

বিন্দি

অন্নদাশঙ্কর রায়

চোদ্দ বছর ছিল বেঁচে
মানুষকে কামড়ায়নিকো
ঘেউ-ঘেউ করেছে যদিও
মানুষকে আঁচড়ায়নিকো,
এমনি কুকুর ছিল বিন্দি
লিখো, লিখো, এপিটাফ লিখো।

কুকুর কেন যে বলে ওকে,
কুকুর কথাটা এত রূঢ়,—
মানুষ! মানুষ ছিল জানি,
বিশ্বাস করবে না মূঢ়,
কুকুরও মানুষ হতে পারে
তত্ত্বটা অতিশয় গূঢ়।

আমি যদি বহু দূরে যাই
খাওয়াদাওয়া করবে সে বন্ধ,
ক'দিন উপোসি থেকে, হায়,
শরীরের হাল হয় মন্দ।
বাড়ি ফিরে আসি আমি যবে
আহা, তার কত যে আনন্দ।

আমার শোবার ঘরটিতে
তারও মেজেতে শোওয়া চাই,
আমাকে পাহারা দেয় রাতে,
ওকে ছেড়ে যেন না পালাই।
চোখে-চোখে রাখে সে আমাকে
যখন-ই যেখানেই যাই।

পাহাড়ি কুকুর ছিল ও যে,
গায়ে ওর ঘন কালো লোম,
কালো এক ভালুকের মতো
ছিল ওর রকম-সকম।
ল্যাজ ছিল চামরের মতো
কী নরম সফেদ পশম!

চামর উঁচিয়ে চলে পথে
ওই তার অঙ্গের শোভা,
রূপ দেখে পথিকেরা তার
বিস্ময়ে কৌতুকে বোবা।
কে কখন চুরি করে ওকে
সুন্দরী এত মনোলোভা!

চোখ দুটি ভাবে ভরপুর
গাঢ় স্নেহে ঘোর অভিমানে
আদর সোহাগ করি না তো
চেয়ে থাকে তাই মুখপানে।
ভালবাসা জানাতে ও পেতে
কত শত রঙ্গ ও জানে।

যখনি বেড়াতে যাই আমি
বন্ধুরা সকলে শুধায়
আজ কেন একা একা দেখি,
আপনার সাথিটি কোথায়?
ভাষা দিয়ে বোঝাব কেমনে
বলতে যে বুক ফেটে যায়।

ছবি সুনীল শীল

আগডুম-বাগডুম

সুনির্মল বসু

আগডুম-বাগডুম গান চলে আর
ঢাক-ডুমাডুম বাদ্য,
জলার ধারে জলসা জমে
ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ।
শাঁকচুণ্ণী ঘূর্ণি তালে
নাচ জুড়েছে শূন্যি ডালে,
ভূত-পিরেতে গবগবাগব্
খাচ্ছে ভোজের খাদ্য।
আগডুম-বাগডুম গান চলে আর
ঢাক-ডুমাডুম বাদ্য।

বেহ্মদৈত্য পৈতা গলে
ইকড়ি মিকড়ি মন্ত্র বলে
প্রেত পিশাচের হট্টগোলে
বুঝবে তা কার সাধ্য,
আগডুম-বাগডুম গান চলে আর
ঢাক-ডুমাডুম বাদ্য।
স্কন্ধকাটা, মামদোগুলি
ঝগড়া করে হল্লা তুলি
দাঙ্গা লাগে মামদো-দানোয়
কেউ কারো নয় বাধ্য।
আগডুম-বাগডুম গান চলে আর
ঢাক-ডুমাডুম বাদ্য।

ছবি সুনীল শীল

রবীন্দ্রনাথের শৈশবের সাপ্তাহিক রুটিন

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার লেখাপড়া ছিল একেবারে রুটিন বাঁধা। রবিবারের দিনটি ছাড়া সোম থেকে শনির মধ্যে ছুটি ছিল না কোনোদিন। ষাট বছর বয়সে তাঁর শৈশবের দিনগুলির কথা স্মরণ করেই বুঝি লিখেছিলেন—

সোম মঙ্গল বুধ এরা সব
আসে তাড়াতাড়ি,
এদের ঘরে আছে বুঝি
মস্ত হাওয়াগাড়ি?
রবিবার সে কেন, মা গো,
এমন দেরি করে?
ধীরে ধীরে পৌঁছয় সে
সকল বারের পরে।

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার যে-খাতাটি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-সংগ্রহালয়ে সযত্নে রক্ষিত আছে তার মধ্যে কবির শৈশবের কত ইতিহাসই না ছড়িয়ে আছে। সেই খাতায় যেমন লিখেছেন পাতার-পর-পাতা কবিতা তেমনি আছে নিজের আঁকা নানা কারুকাজ ও ছবি; আর আছে তাঁর সেই কালের লেখাপড়ার কিছু নিদর্শন—আছে ইংরেজি হাতের লেখা, ইংরেজি থেকে বাংলা ট্রানস্লেশন, দেবনাগরী হরফে কিছু লেখার চেষ্টা ও লেখাপড়ার একটি সাপ্তাহিক রুটিন।

সেই রুটিনটা ছিল এই রকম—

সোমবার	ইংরেজি গদ্য	জ্যামিতি	ইংলণ্ডের ইতিহাস	সংস্কৃত
মঙ্গলবার	গ্রামার	বীজগণিত	ভারতের ইতিহাস	সংস্কৃত
বুধবার	ইংরেজি গদ্য	পাটিগণিত	প্রাকৃতিক ভূগোল	ঐ
বৃহস্পতিবার	গ্রামার	পরিমিতি ও বীজগণিত	ইংলণ্ডের ইতিহাস	ঐ
শুক্রবার	ইংরেজি গদ্য	পাটিগণিত	সাধারণ ভূগোল	ঐ
শনিবার	ঐ	জ্যামিতি	ভারতের ইতিহাস	ঐ
রবিবার	অনুশীলনী			

Monday — Eng Prose — Geomet — Eng History — San
Tuesday — Grammar — Algebra — Hist India — San
Wednesday — Eng Prose — Arith — Geography —
Thursday — Grammar — Mensuration & Algebra — Eng History —
Friday — Eng Prose Arithmetic — General Geography —
Saturday — Do — Geomet — Hist India —
Sunday — Exercise —

শৈশবে রবিবারটা বরাবরই ছিল তাঁর বাঁধা-নিয়মের বাইরের দিন—ছুটির দিনের স্বর্গ। অনুশীলনীটা ছিল নিজের ইচ্ছামতো এবং নিজের মনের মতো। গান শেখা হত এই ছুটির দিনে, আর যন্ত্রপাতি সহযোগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শেখা হত এই রবিবারের ছুটিতে।

সেই বাল্যকাল থেকেই সূর্য ওঠার আগে তিনি ঘুম থেকে উঠতেন। ভোরে অন্ধকার থাকতে শরীরচর্চার জন্য কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করতে হত। তারপর সকাল ছটা থেকে সাড়ে নটা পর্যন্ত বাড়িতে নর্মাল স্কুলের শিক্ষক নীলকমল পণ্ডিতের কাছে পড়া হত চারুপাঠ, বস্তুবিচার, প্রাণিবৃত্তান্ত, মেঘনাদবধ-কাব্য, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত জ্যামিতি ইত্যাদি। সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের খুব আগ্রহ ছিল—রবি বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিচিত্র বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করে বড় হোক। স্কুল থেকে ফিরে আসার পর কিছুক্ষণ চলত ব্যায়াম। তারপর আসতেন ছবি আঁকার শিক্ষক। তিনি চলে গেলে পড়ার ঘরে জ্বলে উঠত তেলের বাতি। সন্ধ্যার ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে অঘোরবাবু এসে উপস্থিত হতেন ইংরেজি পড়াতে। ঘড়ির কাঁটা নটার ঘরে পৌঁছলে তবে ছাত্রের ছুটি মিলত।

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার যে-খাতাখানিতে তাঁর লেখাপড়ার সাপ্তাহিক পাঠক্রমটি পাচ্ছি, তাতে দেখছি ইংরেজি গণিত ইতিহাস ভূগোল সংস্কৃত সবই আছে, নেই কেবল বাংলা।

নেই কেন বাংলা?

এর ইতিহাস কবি লিখে গেছেন তাঁর 'জীবনস্মৃতি' বইয়ে বাংলা শিক্ষার অবসান অধ্যায়ে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একদিন দেখলেন—পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে বাংলা শিখে ছেলেদের সত্যিকারের বাংলা-শিক্ষা কিছুমাত্র হয়নি। পর-দিনই নীলকমল পণ্ডিতের চাকরি গেল—ছুটি মিলল ছাত্রদের। বাংলা শিক্ষার অবসানের পর চাপ পড়ল ইংরেজি শিক্ষার উপর। কবির খাতায় ইংরেজিতে লেখা যে রুটিনটি পাই তা এই সময়ের পাঠক্রম। সারাদিনে লেখাপড়ার রুটিনের মধ্যে বাংলা নেই—এই ঘটনায় বালকের মনও বোধ করি সেদিন কিছুটা বেদনা অনুভব করে-ছিল। জীবনস্মৃতিতে সেই কথাই স্মরণ করে লিখেছেন, ''যখন চারিদিকে খুব করিয়া ইংরেজি পড়াইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে, তখন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই আমার স্বর্গত সেজদাদার উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।''
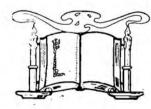
বট আছেন অশত্থ আছেন পাকুড় গাছটি মাঝে।
জরদগব বসতি করেন সেই বৃক্ষের খাঁজে।
গাছের শিকড়ে বাস্তু সাপ, গাছের শিয়রে মেঘ হেলা
গাছের ডালে ডালে পক্ষীর বাসা কাচ্ছা বাচ্ছা তাতে মেলা।

হরবোলা বুলবুলা চুহুবোলা চৌবোলা—তারা নানা পক্ষী চুলবুল করে এক বৃক্ষে। মুড়ো ডালের চুড়োয় চৌমাথা পথে বসে থাকেন বাট আগলে হুতুম-থুমো— জরদগবের পিসির মামা। নানা পক্ষীর কোলাহল শুনে তিনি ধমকে ওঠেন—

ঘুমতা ঘুমায় ঘুমতা ঘুমায়
রাত বিরেতে চাঁদটা ঘুমায়
কালো ঘুর ঘুর জাগে বাদুড়
হুতুম প্যাঁচা হুতুম থুমায় ॥

মামার ধমকে গাছের আগায় গাছের গোড়ায় বাকলের ফাঁকে ঝিঁঝি পোকার ডানা ভয়ে রী-রী করে ওঠে। ছোট ছোট পাখি-গুলো কান্না চাপতে চেয়ে খালি ফোঁপায়—বুকের পালক তাদের থেকে-থেকে ফুলতে থাকে—কথা ফোটেনি, শুধু কিচ কিচ করে বলে, 'শীত লাগে, শীত লাগে—বিজি-পিসি, বিজি-পিসি!'

বিজি-পিসি পর্কটি গাছের গোড়াতে সাপে-কাটার ওষুধ পাকা পর্কটির কাঁচা ছাল খুঁজে ফিরছিলেন, গোলমাল শুনে তিনি গাছতলা থেকে উপরে চেয়ে বললেন—

ছি ছি মিছি মিছি কর কিচিমিচি
নানা পখ্‌খি এক বিরিক্ষে
করি ঠেসাঠেসি বসি ঘেঁসাঘিসি
ঘুমুবি না হলি পাইবি শিক্ষে!

অশতপাতার বেড়া-দেওয়া ঘরে বসত করে বন-পায়রার মন-মোহিনী কবুতরী—সে তার ফুঁপি খুপি দুই মেয়েকে নীল বালাপোষ ঢাকা দিয়ে কোলে করে ঘুম পাড়ায় আর ছড়া কেটে চলে—

আ ঘুম, যা ঘুম, যা না ঘুম, পাখ্‌ পাখুম্‌, হুম, বড় কুটুম, ছোট কুটুম—সেলামালিকুম্‌—আইকুম—বাইকুম—আয় ঘুম যায় ঘুম—আগাডুম—বাগাডুম—আকুম বাকুম—নাক উঠুম, চোখ ফুটুম—বেমালুম উকুন পাখ খুটুন—টাক ঢাকুম—পাকুড় পাকুন —ঠাকুর রাখুন।

টুনটুনির দুটো ছানা—গুলগুলি আর তুলতুলি। বটপাতার ঠুলির মধ্যে দুষ্টুমি করে সন্ধেবেলা হুটোপাটিতে তুলতুলিটা বাসা থেকে টুপ করে পড়ে নীচের ডালে হেঁচি করকচি পাখির বাসায়। তারা চমকে উঠে একজন হাঁচে একজন কাশে—হ্যাঁক্‌ছোঃ কিমিদং—যেন নস্যি নিয়েছে।

হুতুম আর একবার ধমকে ওঠেন—

ঘুম ঘুমতা হুতুম থুমটা ভোঁদড় ভামটা
ঘুণ ধরা বাঁশটা গাঁট মটকায় শুনতা
কট কট্টাস মট মট্টাস পট পট্টাস
খট্টাস চট পট্টাস ডালে ডালে ঘুমতা
ঝাঁট দুমটা গায়ে কাঁটা ফুলতা ॥

খট্টাসের ভয়ে ভোঁদড় ভামের নামে তোতলা বনমোরগের পা থেকে মাথার ঝুঁট পর্যন্ত কাঁটা দিয়ে ওঠে, হেঁকেই চলে—কক্‌-কটাস—খখ্‌—খট খট খটাস।

তিতির পাখির ছানাকটা—নিকিরি, ভিকিরি, চিতিরি, মিটিরি—মাঠে কাশঝাড়ের মধ্যে গাবু কেটে ভাঁটা গড়গড় খেলছিল। তিতির বুড়ো ক্ষেতের আলে দাঁড়িয়ে তাদের ডাক দিলে, কঃ কুত্র ভোঃ কঃ কুত্র ভোঃ কঃ কুত্র ভোঃ—ইধিরি মিধিরি গুপ—পড়ে এল ধুপ।

সেই শব্দে বৈকালিক নিদ্রা ছুটে কেয়ালতায় ময়ূর পাখি [illegible] দিয়ে হেঁকে চললেন—

কেও কেও কেও—ওকেও ওকেও ওকে ওকে ওকেও—কে [illegible] কে ওই কে রে কৈ—কেবা কার কেকার কইচে কেও?'

তারপর আপনার চাঁদতারা চমকানো মোরপাংখা পাখম সন্ধের [illegible] একবার খুলে আর বন্ধ করে কেয়াবনে গা-ঢাকা হলেন। [illegible] আলোটুকু কেয়াপাতের আগায় ঝিক্ ঝিক্ করছিল, [illegible]-পাখমের নাড়া পেয়ে রোদটুকু কেয়াপাতার উপর থেকে [illegible] ঢলে পড়ল—যেন একটি ডালিমফুলের পাপড়ি। মউর [illegible] ঠকরে তুলে নিতে নিতে বাতাস সেটিকে কোথায় [illegible] নিলে।

সূর্যি ডোবেন আস্তে আস্তে। পাখিরা চুপ হয়ে থাকে। [illegible] দু-চারটা ইর্কাড় মির্কাড় খেলতে বার হয়; কালো [illegible] বাদুড়-ছানাগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে যায় তারা [illegible] নদী পার হয়ে। চড়াইপাখিগুলো খানিক ধুলোট [illegible], কিচিমিচি শব্দে মিছি-মিছি ডালিম গাছে দোল খেয়েই [illegible] বেঁধে পালাল পর্কটি বৃক্ষের ওধারে একরাশ পাকাটি [illegible] মধ্যে। কাকগুলো চুপচাপ বকুল গাছে বসে ছিল, হঠাৎ [illegible] সূর্য ডোবা অমনি হো হা করে গাছ ছেড়ে ছিটকে উঠল [illegible] এক মুঠো জামের বীচির মতো—তারপরে হঠাৎ আবার [illegible] নেমে পড়ল যে যার স্থানে বকুলডালে। আকাশে তখন [illegible] রং ধরে গেছে—সন্ধ্যাতারা দেখা দিয়েছে—আকাশে [illegible] সিঁদুর-রং' একটুকুও নেই—

একটু চাঁদের কোলে, একটি তারা ঝলে
যেন সন্ধ্যা-পিদুম জ্বলে
দিক্ ঝলমল করে, ঝিলমিল করে আলো
বনপথে ছায়া খানিক
খানিক আলো খানিক কালো
নদীজলে ঘুমে ঢোলে।

পিপলী গাঁয়ের দিকে দেখা যায় সারি-সারি খড়ো ঘর, [illegible] বাথান, মুড়ো মন্দিরের গরুড় থাম্ব। সেদিক থেকে [illegible] ঘণ্টা গরুবাছুরের হাম্বারব খরগোশের কানে এসে [illegible] খসখস ঘাসের গোড়াতে—ঢোং-ঢ্যাং ওম ওম্বা। খরগোশ [illegible] উলটায়, নাক চুলকায়, গোঁফ মুচড়ায়, চোখ মটকায় আর [illegible] চিবায়, এমন সময় দূর থেকে জরদ্গবের সাড়া পায় [illegible] লুব্ধকো জাল তন্ডুল হন্তো সমাভ্যেতি। সে কোন্ [illegible] কে জানে একবার লুব্ধক চিড়িমার জাল পেতে চাল ছড়িয়ে [illegible] কুড়ি এগারোটা পায়রা ধরে নিয়েছিল, সেই থেকে জরদ্গব [illegible] রোজ ঠিক এই একই-সময় পাকাটিকাঠির লাঠি হাতে সঙ্গে [illegible] ধরে উল্কামুখি ফুল্কোমুখি চেড়ি পর্কটি বন ঘুরে রোঁদ [illegible] তবে নিজের কোটরে যান—না হলে তিনি ঘুমোতে পারেন [illegible] নিশ্চিন্ত হয়ে। এই রোঁদ ফেরা জরদ্গবের—কি ঝড় কি [illegible] কি শীত কি গরমী—একটি দিনও কামাই হবার জো নেই। [illegible] ও-ঝোপে পাকাটির খোঁচা দেন আর বলে চলেন—

এক হাতে জাল এক হাতে চাল
বিষম জালিয়া লুব্ধক চণ্ডাল
আসে বুঝি বনে অশুভ ক্ষণে
করতে পশু পক্ষীদের জালে ধরে নাকাল।
সাবধান হও সবে নয় তো হবে
নাজেহাল পয়মাল।

লুব্ধক ব্যাধটা বিষম দুরাত্মা—এ-হাতে ছড়ায় মুষ্টি-ভিক্ষা [illegible] হাতে গোড়ায় ফাঁদটা। বিশ্বাস কর আর নাই কর যে যার [illegible] ধর—সাবধান, দেখে চল জাল। সাবধান ও উল্কোমুখি [illegible] ফুল্কোমুখি, আলো ধরে দেখ, এ-বন সে-বন ঘুরে সকলকে [illegible] কর—বস। আমার কাজ আমি করলেম—এখন কোটরে গিয়ে আরামে নিদ্রা দিতে পারব।

এই সময় পাহাড়ের দিকে শেয়ালগুলো পাহারা ফুকরে দেয়—

বার হুয়া বার হুয়া পাহারোলা বার হুয়া
রাত হুয়া রাত হুয়া ডাকাত বার হুয়া
হো পাহারোলা, কেয়া পারোয়া
ক্যা পারো—

বলেই হঠাৎ স্তব্ধ হল তারা।

খরগোশ ল্যাজ তুলে পালাচ্ছিল, জরদ্গব তাকে ডেকে বলেন, 'দেখ, জেগেজুগে বসে থাকো হয়ে হুঁশিয়ার। বিষম চোরার গমনাগমন দমনে রাখ ও তার আসিবার পথে কর্ণ পাতিয়া থাক—চারিদিকে রেখে নজর ইতিমধ্যে বিশেষ ঘটনা যদি কিছু ঘটে তো ছুটে পর্কটি আরামে গিয়ে আমায় জাগিয়ে দেবে—দেখি ব্যাধটা কী করে—হাঁ।

আমি জরদ্গব বুড়ো
আতাই পক্ষীর খুড়ো
নখে ছিঁড়ি মুড়ো, ঠোঁটে নাড়া-ভুঁড়ো
একলা আমি একা বুড়ো
দোকা বুড়ো তেকা বুড়ো
মুড়ো পাকুড়ের বুড়ো
পাহাড়তলির চুড়ো
ব্যাধের নাগাল পাই তো লাগাই
পাকটি কাটির হুড়ো।

এই সময় কুরচী গাছের দিকে হাঁচি পড়ে জোরে জোরে তিনবার—হ্যাঁক ছোঃ কিম্দিং। বিকট হাঁচির শব্দে জরদ্গব চমকে সাত হাত পিছিয়ে বলেন, "কেও পিসি নাকি?"

কুরচী গাছের তলায় ছিল কুঁকড়ো, হু হু হু হুঃ করে হেসে উঠতেই কুরচী গাছের উপর থেকে জরদ্গবের দুই পিসি হেঁচি করকচি নেমে এসে বললেন, "কী কী হয়েছে কী?"

জরদ্গব গম্ভীর হয়ে বলেন, "ভয় পেয়ে গেছি পিসি।" বলেই এ ঝোপে ও ঝোপে দোচোখো পাকাটির খোঁচা দেন আর বলেন—

জেগে জুগে বসে থাকা চাই হয়ে হুঁশিয়ার হাতিয়ার ধরে, সকল চোরের গমনাগমন দমনে রাখা চাই।

এ ঝোপে কুঁকড়ো ও ঝোপে কুবো, এধারে কোকিল ওধারে কাক পাকাটি কাটির খোঁচা খেয়ে চেঁচাচেঁচি করে—

ছি ছি চোখটি বুজেচি কি এসে খিচি খিচি
ঝিমকিনি দিচি কি চিমটিনি মিচি মিচি
দিদি কেমনে বাঁচি
হাঁচি বলে আমি কমনে আচি।

এই সময় উল্কোমুখি ফুল্কোমুখি ছুটে এসে খবর দিলে—

তেমাথা পথে লুঙ্গি বাবা
বসেছে এসে গম্ভীর মুখে তুম্বি নিয়ে।
চুঙ্গি আদায় করতেছে সে
তেলা পোকাদের ঘাড় ভাঙিয়ে
সর্বাঙ্গে তার ভস্ম মাখা
লম্বা জটা ঠ্যাং দুটো বাঁকা
জপতে আছে হাড়ের মালা ধুনি জালিয়ে
নট খটিয়ে খট খটিয়ে।
চলতে আছে পায়ে খড়ম
বাঘছাল কম্বল কাঁধে নিয়ে।

"ও দেখ, কে আবার এল কোন লুব্ধক"—বলেই জরদ্গব না রাম না গঙ্গা সোজা নিজের কোটরের দিকে যান। সঙ্গে সঙ্গে চলেন দুই পিসি হাঁচতে হাঁচতে—হ্যাঁক ছো। কিম্দিং। আর জরদ্গবকে ডেকে বলেন—

ভয় কি আমরা আছি কাছাকাছি
দুই পিসি হেঁচি করকচি।
দুই বুড়িকুরচী গাছের সরুমোটা দুই গুঁড়ি।
নুড়ি ভেঙে চুলো খুঁড়ি
রেঁধেচি শেয়ালের নাড়িভুঁড়ি
বেড়ালের ল্যাজা মুড়ি
গন্ধগোকুলের গাঁদাল সশবড়ি
ভোঁদড় ভামের চাম ভাজি—ছাল চাঁচি।

খাবারের ফর্দ শুনে জরদ্গবের সাহস বেড়ে গেল। হনহন করে পাকাটি লাঠি ধরে বাসায় উপস্থিত হলেন। খাওয়া-দাওয়া জরদ্গবের চিরকালই গবগব করে। যেমন বন-গাঁয়ের ডালকুত্তো হাঁক দিলে—রও এউ ওউ ডাক হাঁক রাখ—চোর চালাক পালাক পালাক—অমনি উল্কো ফুল্কো লণ্ঠন নিভিয়ে দে দৌড় দুজনে।

জরদ্গব খড়কে খেতে খেতে গাছের ডালে উঠে বসলেন, সেই সময় হুট্টিম পাখির একটা ছানা লাটিম ঘুরতে ঘুরতে মাকড়সার সুতো ধরে আগডাল থেকে নেমে এসে জরদ্গবকে বললে, "গপ্প।"

জরদ্গব পাখিটার দিকে চেয়ে বললেন, কোয়ম? এখনো পালক গজায়নি, এরি মধ্যে বাসা ছাড়া।

হুট্টিম জরদ্গবের গা ঘেঁষে বলে, 'শীত। গপ্প।'

জরদ্গব পিসিকে বললেন, 'এ তো ভারি মুস্কিল হল। কী করে একে বাসাতে তোলা যায়? ও পিসি, এ যে মাকড়ের সুতোয় আটকা পড়েছে। আয় বাপু, আমার ডানার মধ্যে গরম হয়ে ঘুমো।'

চটের থলির মতো দুখানা ডানা, তার মধ্যে ঢুকে পড়ে হুট্টিম বললে, 'গপ্প!'

জরদ্গব বললেন, 'বেশ গা ঢাকা হয়ে চুপটি করে গল্প বলি শোনো, কথা কইলে কাক ভুষণ্ডি মাথায় ঠোকর দেবে।'

হুট্টিম ডানা থেকে বার হয়ে বললে, 'উঃ, চটের থলিতে গায়ে আঁচড় লেগেছে। তোমার গায়ে যেমন চটের কাঁথা বাসা ও তেমনি বটের তলায় ইঁটের পাঁজা।'

জরদ্গব তাকে দেখিয়ে পিসিকে বললেন, 'এটার কথা অনেকটা জ্যেঠির মতো, আমাদেরই কেউ হবে। বোস্ বাপু গল্প শোন্।'

গল্পের নামে কবুতরী নীল বালাপোষের ঘোমটা খুলে জরদ্গবের গা ঘেঁসে বসে বললে, 'হুঁ হুঁ গল্প বলুন।'

সব পাখিরা ঘিরে বসল। সন্ধের চাঁদটা ভস্মলোচনের কানাকড়িপানা একটা চোখের মতো অন্ধকারের মধ্যে থেকে চেয়ে রইল—জবদ্গবের দরবারের দিকে।

জরদ্গব তখন গোসাপের চামড়া বাঁধা শাঁকিনী সাপের সরু সরু হাড়ে লেখা বহুকালের পুরোনো জরদ্গব-নামাখানা খুলে বসলেন—

গুরু গম্ভীর অতি স্থবির মুণ্ডিতশির
পুরাতন ডালে পক্ষীটির
আষাঢ়ান্ত দিনের অন্তে
কণ্ঠে মালা শিম বর্বটির॥

হুট্টিম বললে, 'গপ্প শোনাও।'

জরদ্গব বললেন, শীতছন্দে—

গল্প শুনবে তো তল্প নাও
জল্পনা রাখ কল্পনা কর অল্প সল্প
শুনে নাও হাল্কা কথা
জল ঝর ঝর—
বাদলা দিনের সন্ধে বেলা।

কথামুখ

(বাসিন্দা নিবাসিন্দার উপকথা বা রূপকথা)

(জরদ্গব শুরু করেন—ছোট পাখিরা যোগ দেন গানে—হেঁচি করকচি দোহারকি করেন)

॥ গীত ॥

এক যে থাকেন বেঙ্গমা
আর যে থাকেন বেঙ্গমী
একস্তর দুইজনা স্বতন্তর দুই জনই।
জোড়া পাখি চোখ টানা
সাদা কালো দুই ডানা
খোপে খাপে বসে থাকে
ঝোপে ঝাপে চরে জানি
নিবাসিন্দা বেঙ্গমা বাসিন্দা সে বেঙ্গমী।
দিন যখন কাটছে না
রাত যখন যাচ্ছে না
স্থলে ডাকেন বেঙ্গমা জলে ডাকেন বেঙ্গমী।

মুহূর্ত-ঘটিকা-প্রহর, নিমেষ-পল-অনুপল-বিপল তিন শত পঞ্চ-ষষ্টি অহোরাত্র এইভাবে থাকতে থাকতে কেটে গেল, তবে এল শরৎকাল। আকাশ হল নির্ধূম নীল। নিবাসিন্দা বেঙ্গমার মন টানে পরদেশের দিকে।

বেঙ্গমা ডাকেন, 'বেঙ্গমী!'

বেঙ্গমী বলেন, 'কী লো কী?'

"আর তো ঘরে মন টেঁকে না বেঙ্গমী!
মন আমার কেমন কেমন করে।
ও বেঙ্গমা, চায় মেলায় ডানা
ও সে ঘুম ভেঙে চায়
গহন রাতের শেষ পহরে
—বারে বারে যখন তখন॥"

বেঙ্গমার মন কাঁদল তো বেঙ্গমীর মনও কাঁদল। আহা উহু করে বলেন বাসিন্দা বেঙ্গমী—

বিদেশেতে যাইতে আমার মন নাহি সরে একটু
বনে থাকি বনের পাখি পাতা লতার ঘরে বন্ধু
নদীর কূলে থাক রে বন্ধু, নদীর কূলে কর বাস
ফল থাকতে বনের বৃক্ষে পন্থে চলিবার
কেন আশ রে বন্ধু।
বাতাস সায়রে বন্ধু কূল কিনারার দেখা নাই
শূন্যের পথে কুন্খানেতে ঘরে ফেরার কথা নাই
দিনের শেষে রে বন্ধু

বেঙ্গমী যত বোঝায় বেঙ্গমা বোঝে না। আবার বেঙ্গমা যত বলে 'চল যাই' বেঙ্গমী তত করে—না, না।

যেতে চেও না রে বারণ করি।
বিদায় দিয়ে তোমারে কি প্রকারে
শূন্য ঘরে রব আমি একেশ্বরী।
বিদেশে তুমি রইবে ভুলে
একা বনে নদীকূলে—
আমি রইব প্রাণে মরি।

বেঙ্গমা বলেন, 'বেঙ্গমী!'

বেঙ্গমী বলেন, 'কী?'

'বেঙ্গমী, কিছু দিনের জন্যে আমি মৌন ব্রত অবলম্বন করে

[দে]শ ভ্রমণে যেতে চাই, অতেব—অন্তস্পুরে যাও তুমি বাহিরেতে [চ]লিলাম আমি।'
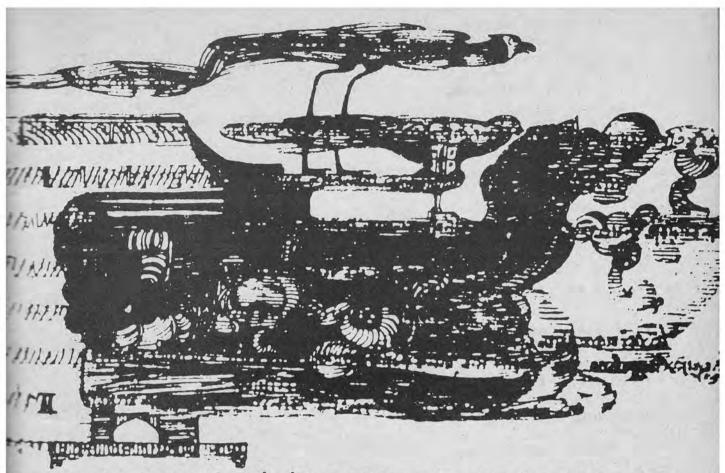
বেঙ্গমী বলেন, 'এ কী নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করি। এই কি [তো]মার মৌন ব্রতের সময়? দেখছ না—

মহুরীর সৌরভ চৌধার বনটায়।
মৌমাছি ভোমরা উড়িউড়ি চলি যায়॥
রোউদে ফুকরায় মৌচুলি পাখিটি
মউলে বউলে মৌভার মিঠি মিঠি॥'

বেঙ্গমীর মানা মানে না বেঙ্গমা, ফিরে বসে বলে—

(উভয়ের গীত)

হাওয়া বয় হাওয়া বয়
রয় রয় মন কয়
দিন যে যায় না—কী করি।
মন চায় ওই পারে একা উড়ে পড়ি
মানা মানে না মেলিয়ে দিতে চায় ডানা,
মন মানা মানে না
ও বেঙ্গমী ও বেঙ্গমা—ও সহচরী।

এই বলতে বলতে দূর-দেশের হাওয়ার মুখে ডানা মেলিয়ে [দে]ন বেঙ্গমা—নিবাসিন্দা সে, দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে যায় [মে]ঘের পারে—

হায় বাতাসে বাঁধিয়া রাখী
কে ধরে আকাশের পাখি!

এক নিমেষের মতো বিচ্ছেদ হয় দুজনায়। তার পরে বাসিন্দা [সে]ও চলে যায় নিবাসিন্দা যে পথে গেছে সেই পথে।

বন ছেড়ে যায় বেঙ্গমা বেঙ্গমী, আকাশ হয়ে যায় অন্ধকার, [বা]তাস পড়ে ঝিমিয়ে, রাত যেন উপস্থিত হয় দিন না যেতেই, বাদল [মে]ঘ পাহাড় ছেড়ে নেমে আসে ভিজে কম্বল গায়ে কিম্ভূত-[কি]মাকার যেন একটা রীচ্—শোনা যায় সেটা যেন এগিয়ে চলেছে ছপ্ ছপ্ করে। মহুয়া বনটার দিকে অন্ধকার ঘনায়, পাতায় পাতায় বিষ্টি পড়ে কীট পতঙ্গ গিরগিট্ ডাকতে থাকে বনে বনে–

টিপ্ টিপ্ টুপ্ টাপ্ চারি ভিত্ চুপ চাপ্
ঝিঁঝি টিক্ করে কীট্ গিরগিট্ করে টুপ্ টাপ্।
ঝিঁজি বলে ইতি উতি—মিঠি ঢাক্॥

বেঙ্গমা বেঙ্গমী চলে যান তো বন-সুদ্ধ সবাই যান-যান করেন। চকাচকী বলাবলি করেন—

দুখরাত এল—জল ছল ছল দুখরাত
ও চক্রবাকী ও চক্রবাক্
চল্ সেই পারে নাই যেই পারে
বিরহ গহন দুখরাত॥

সবাই যাই-যাই করে, বনে কারু মন টেঁকে না। আ্যং যায় ব্যাং যায় খলসে চায় সেও যায়। জোড়ে জোড়ে কেউ, জোড় ভেঙে কেউ যেতে চায়। বেজোড় পশুপক্ষী কটিতে আমরা বলি—থাকি পড়ে এসো সবাই শ্রীবৃন্দাবনে গিরি গোবর্ধনে—এমন স্থান জগতে নাই—

ছিরি বৃন্দাবনে গিরি গোবর্ধনে
অর্ধেক রাধা অর্ধেক কৃষ্ণচূড়ার বুড়া গাছ
গোড়া ঘেঁষে তার ময়ূরপংখী
পাখনা ছড়ায়ে করেন বিরাজ
আগাতে বসেন হতভম্ব কঙ্ক
আর মৎস্য রঙ্গ
মধ্যের ডালে আতাই পক্ষী
তোতা তুতি লক্ষ্মী পেঁচা শিকরে বাজ
ময়না কথা কয় না
শুক সারি মুখ ভারি
বসে রয় দিয়ে আড়ি

চটাই পক্ষী চটিৎ রক্ষি
কেবলি ঝাড়ে কালো দাড়ি
মনঃপুত তবু হয় না।

এমন সময় মাস-চটক আর তাল-চটক—একজনে ফরমাসি চটি পায়ে আর একজন তালপাতার চটি পায়ে মাস পাঁজী আর তাল-পাতার পুঁথি হাতে হাজির—নামাবলী গায়ে।

হুদুম পাখি তাদের দেখেই বলে উঠলেন, 'হা ডু ডু চাটার্য, হা ডুডু আচার্যি। হেলো হা ডু ডু, কুম্ কুম—সি ডাউন সি ডাউন।'

ছাতাই পক্ষী চাটাই বিছিয়ে দুজনকে বসিয়ে বললেন, 'দেখ তো গণনা করে হঠাৎ বৃন্দাবন শূন্য করে বেঙ্গমা বেঙ্গমী অদর্শন হলেন কেন।'

পাখিরা সবাই ঘিরে বসল, গণনা শুরু করলেন পাঁজিপুঁথি খুলে—

মিরিচ্ মিছরি চানা
আদ্রক হরিদ্রা বেদানা
বেগুন বীজ্—এই সাত তারা
তার মধ্যে জোড়া তারা—বেঙ্গমী বেঙ্গমা
নয় ঘরে নবগ্রহ—হয়ে গেল জমা॥

অনেক পাঁজিপুঁথি ঘেঁটে মাস-চটক আর তাল-চটক সমুদ্রে তাল-আঁটি আর মাষকলাই-এর গুটিকা নিক্ষেপ করে বললেন, 'বেঙ্গমা বেঙ্গমী এখন নকল দানার বনে নবদ্‌খানায় আনন্দে বিরাজ করছেন। মেষ বৃষ সিংহ কর্কট বৃশ্চিক মীন—এঁরা স্ব স্ব স্থান থেকে সুদৃষ্টি করছেন তাঁদের উপর—রিষ্টি নাস্তি কুং ফট্ ত্রিং চট"—বলেই মাস-চটক তাল-চটক চটি জুতো পায়ে চট্ চট্ করে প্রস্থান করেন দেখে শুক-শারি-ময়না তিনজনে বললেন,

বলি, চৌরাশি ক্রোশ বৃন্দাবন,
তার এ-কোণ ও-কোণ সে-কোণ
কোন কোণে নকল দানার বন তাই ক'ন।

চাটুয্যে আচার্যে মিলে চতুষ্কোণ অষ্টকোণ—এ-কোণ ও-কোণ সে-কোণ ঘর কেটে, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ অষ্টভুজ দেগে, ত্রিভুজে ফুল রেখে বললেন—

ও দেখেন দেখেন! জলপথ স্থলপথ
আকাশপথ এই তিনটা
জলেতে চলি সাঁতার কাটি
থলেতে চলি ধরে লাঠি
আকাশপথে স্বপ্নে হাঁটি।
তবু ছাড়া নাই বিপদ আপদ
সঙ্গে চলে গলাগলি
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি॥

এই তিনটে পথ অতিক্রম করে তিন যুগ নানা বিপদ আপদ রিষ্টি ফাঁড়া ইত্যাদি কাটিয়ে চলে যেতে পারলে তবে আসল বেদানা-বনের লাগাও নকল দানার বন দৃষ্ট হবে—

সেথা আতা গাছে তোতা পাখি
ডালিম গাছে কোউ
কথা বলে না কয় না কেউ॥

ছাতাই বলে উঠলেন, 'সে তো দেখি এইখানেরই মতো স্থানটা।'

চটাই বললেন, 'শুধু সেখানে সোনার আতা, মাটি আর গালার ফল খেয়ে নকল পাখি হয়ে বসে থাকা—এই যা তফাত।'

সা-মোরগ বললেন, 'আমি সেখানে যাচ্ছিনে, আসল বেদানা-দানাই ভালো আমার।'

তোতারাম প্রশ্ন করেন, 'দেখ তো কোন দুঃখে সে বনে গেলেন বেঙ্গমা বেঙ্গমী।'

আচার্যি খড়ি পাতেন, চাটার্যি পাঁজি ঘাঁটেন কিমর্থং বার করতে। না পেরে কেবলই টিকি টানেন, মাথা চুলকান।

তোতারাম বললেন, 'দুত্তোর টিকি নাড়া রাখ। ডাক দাও ভুশুণ্ডি ঠাকরুনকে। তিনি তিনকালের খবর রাখেন—কাকচরিত্র দেখে এখনি বলে দেবেন সব কথা ঠিকঠাক।'

ফিঙে পাখি 'ভুশুণ্ডি ভুশুণ্ডি ভুশুণ্ডি' বলে তিনবার ডাক দিতেই ভুশুণ্ডি ঠাকরুন সাড়া দিলেন শুঁটকি মাছের চর থেকে—

কাগ ভুশুণ্ডি নামটি আমার
তিনকাল দেখে এখনো দেখছি পরিষ্কার
সূর্যটা চন্দ্রটা, মাটি জল আকাশ তিনটা—
এসপার ওসপার।
কোনখানে দেখা নেই বেঙ্গমী কি বেঙ্গমার।

বেঙ্গমা বেঙ্গমীর অদর্শনে শুকশারি তোতাতুতি ময়না শালিক যত ছিল খাঁচা-পালানো শিকল-কাটা পড়া-পাখি তারা চেঁচাতে থাকল—হা অদৃষ্ট, দুরদৃষ্ট, হে কৃষ্ট হে কৃষ্ট ঘটিল অনিষ্ট।

সেই সঙ্গে কাঠবেড়ালের ছা' কটাও যোগ দিলে—রিষ্টি দুর-দৃষ্টি অনিষ্টি মহানিষ্টি অবশিষ্টি অনাছিষ্টি।

অবেলাতে রামপাখি ডেকে চলল, সেইসঙ্গে সারস ময়ূর হাঁস মুরগি মোরগে কোলাহল করতে লাগল—

পালাও পালাও পা চালাও
যাও পারো যত দূর
শুধাও আরকি গুড়াও তল্পি
লম্বা দাও, ডুব দাও, নয় ছুট দাও
উধাও বহু দূর।
অন্ধকার চেপে এল ঘাড়ে
আগারে পগারে বনে বাদাড়ে
পুকুরপারে জুড়ে বসল
বেলা থাকতে—রাত দুপুর॥

ডাকপাখি হাঁক দিয়ে গেল মাথার উপরে—

আয় আয় আয় হায় হায় হায়—
কা কস্য পরিবেদনা
দিনে দিনে আয়, রাতে রাতে আয়
কাল পরশ্ব বিবেচনা,
করার সময় আর কোথায়।

সাড়া পড়ে গেল—পালাও পালাও—তাড়া পড়ে গেল পালা-বার। কাক উড়ে পড়ে বাঁশঝাড়ে, বক হেঁটে চলে খালপারে—ডোবাজলে ডুবল মাছ—বালুচর ছাড়ল হাঁস।

তারপরে বলব কি, কালো বেড়াল একটি বার করে দিল চিৎকার। চক্ষের নিমেষে মার্জার আত্মারামের আতা-কুঞ্জের পাতার বেড়া টপকে পড়ে রামপাখির বাসাঘরটা তছনছ করে দিয়ে চলে গেল।

আত্মারাম বিস্ময়-বিস্ফারিত হয়ে দুবার 'কৃষ্ণ কৃষ্ট কৃষ্ট, তিষ্ট তিষ্ট' বলে আতাবীজের মালা জপতে থাকলেন তাড়াতাড়ি।

ভোঁতা-ঠোঁট তোতারাম কেবলি হাঁপাচেন আর আত্মারামকে শুধান—হ্যাক ছোঃ কিমিদং—

হ্যাক ছোঃ কিমিদম্ আস্তো বিভীষণ যেন একটা
বিড়েল ছানাটা দেখেছোঃ কী ভীষণ
ছরকটি গেছে পর্কটি বন
ঝটাপটি বাধিয়াছে ল্যাঠা।
কাণ্ড কি বিষম
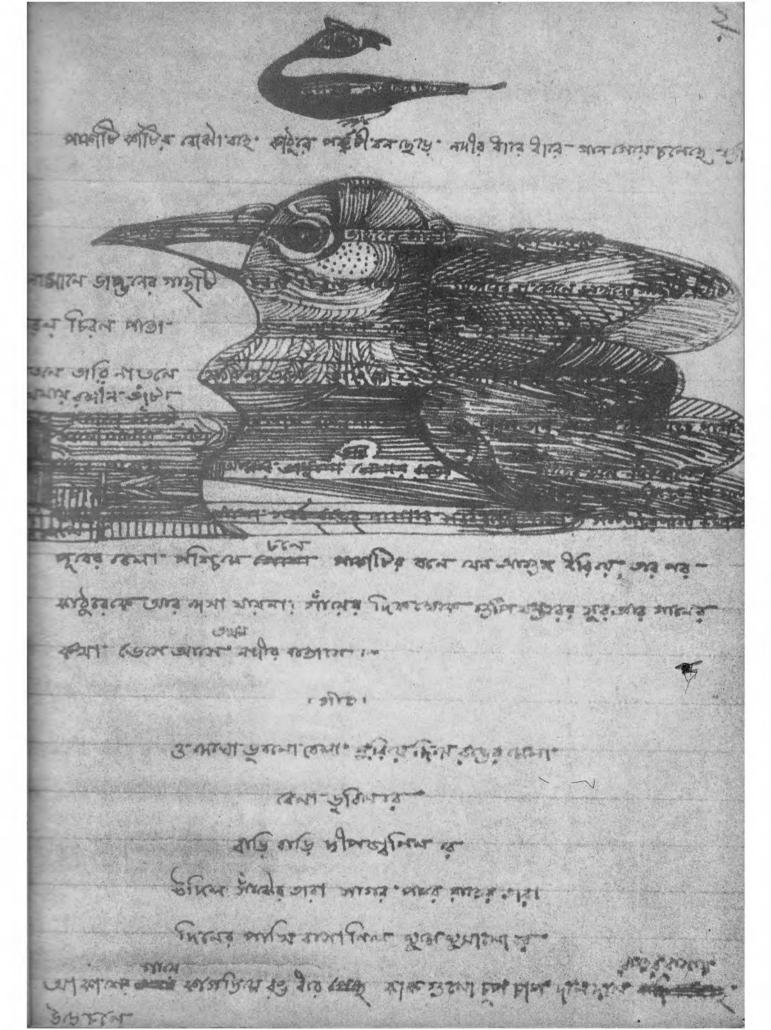
আত্মারামের আরাম ছুটিয়েছে
তোতারামের ব্যারাম ধরিয়েছে
করিয়েছে ড্যাবা চক্ষু স্তিমিতম্
হ্যাক ছোঃ কিমিদম্ দেখচোঃ
—কি ভীষণ কান্ড কি বিষম ।।

হাঁচির শব্দে চটকা ভেঙে টিকটিকি গিরগিটি ধিক্কার দিতে থাকল—

ধিক ধিক নেই ঠিক দিক বিদিক
এদিক কি সেদিক।

এ হাঁচে হ্যাক ছোঃ,ও বলে কিমিদং,এ বলে ধিক ধিক, ও বলে ছিচি ছিচি—শেষে মাছিটা পর্যন্ত হেঁচে ফেললে। ভয়ানক সর্দি লেগে গেল বলে।

বাতাস বয় ছর্দ
হাঁচয় জোয়ান মর্দ
গর্দানেতে সক্কলেরই হয়ে গেল দর্দ।

গোলা পায়রা আর কোলা-বেঙের গলা ফুলে বেলুন। বাতে কারু পা, কারু পেট কারু হাত ফুলে গেল। বেঙ্গমা বেঙ্গমীর অদর্শনে ঘোরতর দুশ্চিন্তায় বাকরোধ বনের সকল কাগ-পক্ষীর—

আতা গাছে তোতা পাখি
ডালিম গাছে বেনে বৌ
কথা কয় না ময়না কি কেউ
খৈ ফোটে না মুখে মন সুখে
বুকে ব্যথা বাজে মন দুখে
সক্কালে বৈকালে ঘুঘু বলে
বনতলে উহু উ উ
বালু ধু ধু—নেই কেউ।।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রমে ভানুতাপে ধরণী তাপিতা হলেন। একা বসে যেন পঞ্চতপা করছি কোটরের মধ্যে, বাইরে তখন—

কাল বৈশাখী আগুন ঝরে
কাল বৈশাখী রোদে পোড়ে।
গঙ্গা শুকু শুকু আকাশে ছাই
পদ্মপত্রে জলবিন্দু নাই
সরোবরের দশায় দশা
লাগল মাছের জলপিপাসা
চাতক পক্ষীর গলা হল কাঠ
ডাকে ত্রাহি ত্রাহি—রোদে ফাটে মাঠ।

সেই সময় তেপান্তর মাঠের পারে দেখা দিলেন রাজপুত্র বাদলের মেঘের মতো কালো ঘোড়ায়, গায়ে বাদলার কাজের জামা জোড়া হাতে রামধনুকের - রঙে - রাঙানো - ডানা, আত্মারাম পাখি কপচাচ্ছে—'তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী মুখ মিষ্টি।' ঝড়বেগে আসছে তো আসছেই ঘোড়া—তেপান্তর মাঠের আর শেষ পায় না। আমি চেয়ে থাকি তো চেয়েই থাকি সেই দিকে—সন্ধ্যায় ঘুম ঘোরে দেখি তারা আসছে তখনো—সকালে ঘুম ভেঙে দেখি তারা আসছে তখনো—গভীর রাতে এক একবার হাওয়া বহে আনে ঘোড়ার পায়ের শব্দ—অন্ধকারে চোখ বন্ধ কিন্তু তবু যেন দেখতে পাই—

দমকা হাওয়া পাগলা ঘোড়া
কেশর ঝাড়ে দাপট মারে
তেপান্তর মাঠের পারে।
নীল সাগরের ঢেউ যেন সে
নীলী ঘোড়া, কায়া গড়া তার
মেঘমল্লারে।
আসে আসে আসে না ঘোড়া।।

আসে আসে করে আবার মিলিয়ে যায়—ঘূর্ণি হাওয়া ধুলোর আওড়ে ঢেকে নেয় তাকে—থেকে থেকে চমকায় বিদ্যুতের মতো তার সোনার সাজ।

এমনি দিন দুপুরে একদিন যখন—

উপরে সূর্যের তাপ নীচে মুরো বালি
সর্ষে ফুল দেখিতেছে চক্ষের পুতলী।

বনে শুধু দুটি ঘুঘু বলাবলি করছে—'উহু রোদ্দুর—আর কদ্দুর আর কদ্দুর' সেই কালে সরল পথের কাছেই হংস-কলমীর লতাকুঞ্জের মধ্যে এসে পৌঁছয়, নাচতে নাচতে রাজপুত্রের জিন-সোয়ারী ঘোড়া। সাত রাত সাত দিন ক্রমান্বয়ে দৌড়ে, সাত সাগর পার হয়ে এল, সে যেন—

দুল দুল ঘোড়া পংখীরাজ
বিজলী চমকে অঙ্গে অঙ্গে
টাপে টাপে কড়কে বাজ
চিক্কুর হানে ক্ষুর
মাথে মানিক চূড়।

রাজপুত্র ঘোড়া ছেড়ে আলিস ভাঙেন—তমালবনের ছায়ায়। ঘোড়া ফেরে কলমী লতার পাতা খেয়ে। আত্মারাম পাখি উড়ে বসেন আমার বাসার কাছে—আলাপচারি চলে দুজনে—

ভাল আছেন তো ভাল আছেন তো?
আছে শান্ত মন প্রাণ তো?
আসেন আসেন কেমন আছেন?
—বড় যে দেখছি পরিশ্রান্ত।

দুটো পাকা পর্কটি আর আধ দানা চির্ভটি খেয়ে আত্মারাম ঠান্ডা হয়ে বললেন, 'চল এখন "সেবিতব্যো মহাবৃক্ষ" করা যাক রাজপুত্রকে নিয়ে।'

ঘুমন্ত রাজপুত্রকে সম্বোধন করে আত্মারাম বলেন, 'যুবরাজ চলেন, কারণ শাস্ত্রে বলেছেন—

সুখের চরম নরম গরম
শ্যাম মিস্তিরীর ইষ্টকালয়
শীত কালে উষ্ণ থাকে গ্রীষ্মিকালে
ঠান্ডা হয়।
বটের ছায়ায় কুয়ার কানায়
হাওয়া চালায়,
—গরমে নরম শীতেতে গরম।।'

কে কার কথা শোনে? রাজপুত্র অঘোর নিদ্রায় মগ্ন। আমি চাই আত্মারামের দিকে, তিনি চান আমার দিকে।

রোদ পড়ে আসে, আমরা দুজনে দুই ডালে ছাওয়া করে বসে থাকি রাজপুত্রকে আগলে। আষাঢ়ের অফুরন্ত বেলায় তমাল গাছ ছায়া বাড়ায় আস্তে আস্তে—রাজপুত্রের গায়ে যেন কালো হাতের পাঁচটি আঙুল কে বুলিয়ে চলে। অবেলায় ঘুম ভাঙতেই চায় না রাজপুত্রের। আমি বলি, 'কী করি?' আত্মারাম বলেন, 'কী করি?'

নীল পক্ষিরাজ এক একবার মুখ নামায় রাজপুত্রের পায়ের কাছে, তার কালো জটা চামরের মতো দোলে। সানু নেই সাড়া নেই রাজপুত্রের।

ভাবছি তিন জনে কী করি, এমন সময় গভীর বনের মধ্যে থেকে বাউরীদের পাড়ার পাগলী বুড়িটা—কে জানে কী মনে করে—রাজপুত্র যে গাছতলে ঘুম যাচ্ছেন তারি কাছে বাবলা-তলায় বসে আপন মনেই গেয়ে চলল—কত কথা বললে—কত কান্না শোনালে সে গানে গানে রাজপুত্রের কানে কানে—ঘুম ভাঙল না।

রাজপুত্রের সাড়া না পেয়ে শেষে এই কথা বলতে বলতে পাগলী চলে গেল—

মুই যে তোমার মা, ভুললে সে কথা।
তুই যে আমার ছা—লাগছে না ব্যথা?
কথা ক' উঠে বোস
অমন করে কেন র'স
নিদ এল কি তাড়াতাড়ি
গা হল কি তাইতে ভারী?
চোখের পাতা পড়ল ঢুলে
রাত ঘনাল দিন দুপুরে?
মউলি শাকের শিকড় বেটে কে খাওয়াল?
ঘুমচি গাছের পাতার বাতাসে ঘুম পাড়াল
সকল গা-টা তাই এলাল—আহা।

আমরা তো পাখি, কত আর জাগি—ডালে বসে ঝিমোতে থাকি আর এক একবার চমক ভেঙে চাই—দেখি রাজপুত্র তেমনি শুয়ে চাঁদনি টেনে দিয়েছে যেন সাদা চাদরখানি তাঁর গায়ে।

রাতের শেষ প্রহরে ঘুম ভাঙল যখন তখন জুঁই ফুল ফুটেছে বনের ধারে, সেঁউতি ফুল পড়েছে ঝরে, তারি গন্ধে ভরে উঠেছে বাতাস। লতা পাতা সব নড়ছে কি নড়ছে না—নদীর কিনারায় চাঁদ ডুবে গেছে। জলে ঝিকমিক করছে তারার একটু আলো। সেই আলোতে দেখা যাচ্ছে—রাজপুত্রের ঘোড়া যেন কালো পাথরে গড়া, এমন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যে মনে হয় কোন দিন আর সে চলবে না, খাড়া দাঁড়িয়ে থাকবে গাছতলে ঘুমন্ত রাজপুত্রের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে—মরা নদীর পুবপারে।

হঠাৎ শুনি এক সময় বনমোরগ বলছে, 'ভোর ভয়ো, ভোর ভয়ো—উঠ হো বনচারি।' চোখ মেলে দেখি—

টিপির টিপির বিষ্টি পড়ে বাদল ধরে ছাঁও
আন্ধার আবৃত দেখি ঝুঁটিতক পাঁও।।

আত্মারামের দিকে চেয়ে দেখি, সে আত্মারাম আর নেই—রামধনুকের রং তার গেছে ধুয়ে, গা হয়ে গেছে ধূসর বর্ণ

গায়ে ওড়ে খড়ি
দাড়ি শনের দড়ি
চোঁচ চাঁচা ছোলা
নখ খোঁচা তোলা

আমি তাঁকে পাঁকাটির খোঁচা দিয়ে বলি—

চোখ মেলো গোল গোল
রাত গেল তবু আকাশ কাজোল
দিনটা ধুসো না রাতটা ভুসা
না মাঝামাঝি গোছের উষা
ও সে রাত না দিন—লেগে গেল গোল।

আত্মারাম গা মোড়া দিয়ে বলেন—

পাশাপাশি দিব্বি আছি,
দুটি পাখি একটি বাসায় ঠাসাঠাসি
বোধ হচ্ছে এসে গেছে জঙ্গলা দেশে
মঙ্গলা উষা কেটে পৌর্ণ মাসী।

কে জানে মঙ্গলা কি অমঙ্গলা—রাজপুত্রই বা কোথা ঘোড়াই বা কোথা। আত্মারাম দেখি আবার ঢোলেন। আর এক কাঠির খোঁচা দিতেই—আঁ বলে ডালে উড়ে বসে বলেন, 'তাই তো যুবরাজ গেছেন তা হলে—আঁ।' —

'আরে কোথায় গেলেন তাই কও।'

'যাবেন আর কোথা—সন্ধানে।'

'আঁ সন্ধানে কী? কার সন্ধানে? কিসের সন্ধানে?'

'বলছি গেছেন সন্ধানে। রাজপুত্রদের রোগই তো ওই। সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে সময় নেই অসময় নেই, যখন-তখন। ওরা যত দিন না রাজ-সিংহাসনে গদীয়ান হয়ে বসতে পায় ততদিন এক দণ্ড স্থির নেই। ও'র সাতটা ভাই যেখানে উনিও গেলেন সেখানে।' —বলেই ঝুঁটির পালক ওসকাতে থাকলেন আত্মারাম ডান হাতের দুই আঙুলে।

আমি এদিক-ওদিক দেখি—বানের জলে নদী ভর্তি, তমাল গাছের গোড়াটা পর্যন্ত জল উঠে এসেছে। হাঁ হয়ে চেয়ে আছি দেখে আত্মারাম বলে উঠলেন, 'দেখ কী? চল দুটো খেয়ে নেই, আমাকেও চলতে হবে সন্ধানে?'

'তোমারেও কি সন্ধানরোগে ধরল?'

'ঘোড়ার কাছ থেকে রাজপুত্রের ধরল ঘোড়ারোগ, তিনি বার হলেন ঘোড়ায় চেপে সন্ধানে,—রাজপুত্রের কাছে থেকে ঘোড়াকে ধরল ঘোড়দৌড় রোগে, সে দৌড়ল তাঁকে পিঠে নিয়ে সন্ধানে, ঘোড়ায় চড়া রাজপুত্রের হাতে পড়ে আমার ধরেছে ওড়া-রোগ—উড়ে চলতে হবে সন্ধানে।'

'বলি, কিসের সন্ধান তাই কও না?'

'সন্ধান, সন্ধান'—দু বার বলে আত্মারাম গীত ধরলেন—

ধরা আছে অতল তলে—
কী যে আছে—তা কি জানি।
নীল সাগরের আঁচল ঘেরা
জ্বলে শুনি প্রদীপখানি
সেখানে নিধি গোপন আছে
শুনি শতক্ষেরে ফণীর ফণা আগলে আছে
কারে সে ঘিরে আছে
তাহা না জানি
সন্ধানিয়া রাজার ছেলে
দিন রজনী সন্ধানে ফেরে—এই তো জানি

এ তো বড় ভয়ানক রোগ দেখি—সন্ধানরোগ। ছোঁয়াচ লাগার ভয়ে আমি সরে বসলেম দু হাত আত্মারামের কাছ থেকে।

সেই সময় একবার মেঘ ফেটে রোদ দেখা দিল। আত্মারাম কোন কথা না বলে সোঁ করে উড়ান দিলেন—যেন একখানা চুনী-পান্নার ঝাপটা ঠিকরে পড়ল বনের ওপারে। তারপরে মেঘ আর বিষ্টি—কিছু আর দেখা যায় না—

দেখি ঘোর অন্ধকার, তরজে গরজে মেঘ বারম্বার,
উঠে প্রচণ্ড পবন ছিন্ন ভিন্ন করে বন
আতঙ্গে শিহরে মন—
মূর্চ্ছি রয় অন্তর বার।

কী করি, আস্তে আস্তে নিজের কোটরে গিয়ে ঢুকি, মনে মনে বড়ু চণ্ডী দাসীর স্তব আওড়াই—

শোন শোন বৃক্ষমাতা বলিয়ে তোম্ভারে
দয়া করে তুম্ভার বক্ষ কোটরে
রাখ আজিকে দীন আম্ভারে।।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
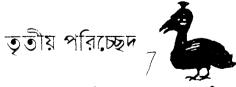
আমার কোটরের সামনে গেছো কুমিরের লেজের মতো মোটা একটা ডাল মাটির পরে জলের কিনারায় ঝুঁকে পড়েছে। এমনি ঝড়বিষ্টির দিনে মাছরাঙা বসেন এসে তার উপরে মাছ ধরার বেলায়, জলের কেটো জল ছেড়ে উঠে বসে তার উপর, কোন কোন দিন বর্ষার পরে সকালের রোদ পোহাতে দূর-দূরান্তরে চলতে বকগুলো হঠাৎ নেমে পড়ে ডালটার উপর, দুটো গুগলি খেয়ে নিতে; দুপুরে প্রায়ই ছাতার-পাখি কটা লাফালাফি কিচমিচ বাধায় সেটার উপর, কাঠবেড়ালীর ছানা কটা দাঁত খিটিখিটি দাঁতকপাটি আর আখরোট ফলের ভাঁটা খেলা
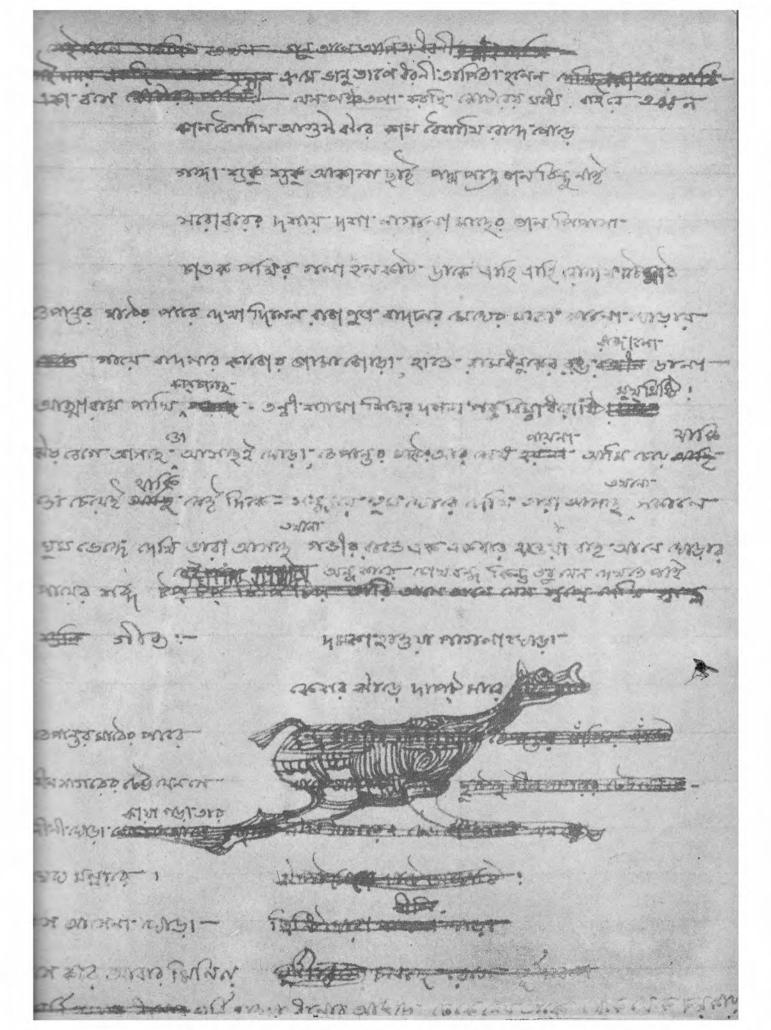
বাধিয়ে দেয় সেখানে দুপুর বেলা; আখরোট বনের কাঠ-ঠোকরা একমনে ভিজে ডালে ঘসে ঘসে নিজের চোচ পালিস করতে থাকেন গাঁত গেয়ে—

টুক টাক ঠিক ঠাক গিণ্ট গাঁট বুঝে কাট
গুঁড়ি কাট কড়ি কাট চুপ চাপ ঠুক ঠাক
কাটি কোটরা লাল টোপ নীল শার্ট।

আমি কাঠঠোকরাকে বলি, 'নতুন কোটরা আখরোট কাঠের বাঁধা হচ্ছে কার জন্যে?'

সে বলে, রাজপুত্রের জন্যে। মাছরাঙাকে শুধাই জাল ফেলচ কার জন্যে? সে বলে, রাজপুত্রের জন্যে।

নীল আকাশের মাছ ধরা চাই—
আকাশের মেঘনাতে মাছ আছে বিস্তর
ঘন নীল রুই মৃগেল আর কপিঞ্জর।

নীলমণি মাছ ভাজা খাবেন রাজপুত্তুর লালমণি চালের সবজি পিলাও দিয়ে। জাল ফেলে আর গায় মাকড়সা—

জাল পাততে আছি, জাল টানতে আছি
জাল গুড়াতে আছি—
রঙ্গে রঙ্গীন-বাহার মায়াজাল।
অবেলায় ফুলবনে
বনের তলায় একমনে
সকাল বিকাল যতনে বোনা জাল
হারে, ও তারে ধরব বলে—আজ কাল।।

বক এসে বসেই ডানা মেলাতে চায়। বলি 'যাও কোথায়?'

'চলেছি রাজপুত্রের পাঁতি বহে এপার-গঙ্গা ওপার-গঙ্গার মধ্যি চরে সিপসদাগরকে ঝিনুকের জাহাজ তৈরী রাখার হুকুম হয়েছে।'

একদিন কলহংসীর দল এসে গেল কোলাহল করে। আমি বলি, 'যাচ্ছ কোথা তাড়াতাড়ি?'

'মানস সরোবর থেকে পদ্মপাতা আনতে।'

'কী হবে পদ্মপাত?'

'জানো না, আমাদের প্রিয় সখি পুঁটু রাজকুমারী বিরহের গান লিখবেন।'

আমি শুধাই, 'তারপর?'

তারা বলে, 'আমরা দাসী কেমন করে জানব?' বলেই তারা গেয়ে চলে যায়—

আমরা রাজকুমারীর দাসীর দাসী
দাসীই রব—যা বলিবেন তাই শুনিব।
মোদের দুঃখ তাঁরে কব তেনার দুঃখের ভাগী হব।
বলেন যদি রাজনন্দিনী
কমল বনের কলহংসিনী
কমলাফুলির দেশেতে হব ঘরবাসী।

সবাই বলে রাজার ছেলে রাজার মেয়ের কথা, সবাই চলে তাদের কাজে—কিন্তু কোথায় যে আছে তারা সে সন্ধান কেউ দেয় না। আসে বসে নাচে গায়—চলে যায় কাজ বাজাতে। আমি বসে বসে ভাবি আপনার কোটরে—ঠিক ঠিকানা পাইনে কিছু। মনে করি আমিও চলি না সন্ধানে। কেউ কোথাও যখন নেই তখন বার হই এক একদিন কোটর ছেড়ে, শেওলাতে পিছল ভিজে ডালে পা রেখে আস্তে আস্তে চলি এগিয়ে—ভাবি, এই ডাল শেষ হয়েছে যেখানে সেখানে হয়তো রাজবাড়ির ফাটক, তার সামনে বাঁধা দেখব জিন সোয়ারী ঘোড়া। এগিয়ে চলি পায় পায়, মাঝপথে দেখি গোল ছাতার তলায় বসে কোলা ব্যাং, যেন নেংটা বাবা চক্ষু মুদে। তিনি পায়ের শব্দ পেয়ে চমকে উঠে দুটো গোল চোখ ঘুরিয়ে বলে ওঠেন, 'ঘড় যাঁউচি, ঝড় আঁউচি।' বলেই তিনি লাফিয়ে পড়েন ঘাসবনে—গাছের বুড়ো ডাল মচ মচ করে ওঠে ঝড়-বাতাসের ধাক্কায়। আমি ভয় খেয়ে পিছিয়ে পড়ি আপন
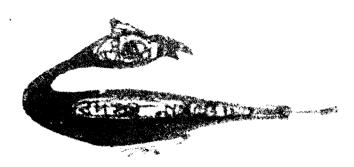
বাসায়, এগিয়ে যেতে আর ভরসা হয় না। একলা বসে আপন মনে বকি।—নদী চরে বাঁধা নৌকোর দিক থেকে কে যেন আমায় ডেকে যায়, গলাটা সেই সকাল বেলার পথিকের মতো সুরে সুরে বলে চলে—

ওরে ওউরে ডানা ভারি তেজে চল রে,
বাসা বাড়ি তেজে চল রে।
উড়ে পড় রে কোটর ছাড়ি—দেরি না করে।
আকাশে রোউদ সরে
দেখ ওপার চরে আবোর লাগে হলুদ মাখা
যেন সে বৌ-কথা-কও বাউরী পাখি মেলালো পাখা।
কাজল দাঁড়া সোনাতে মাখা,
বাতাসে ঢলা ঢেউ লাগিল ভাঙ্গনে রে।।

ওপারে ভাঙনের ধারে এই চিরল পাতার গাছটি কেবল চোখে পড়ে—আর কেউ নয় আর কিছু নয়। তার ওধারে যা তা মাঠ না ক্ষেত না সমুদ্র না ঘাট ভেবে ঠিক করতে পারিনে।

একদিন তোতা পণ্ডিতকে শুধাতে তিনি খড়কি খেতে খেতে বললেন, "ওস্তুত্তর শ্যাম দেশে দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম লঙ্কাধিরাজ—ওই উত্তর শ্যাম দেশে, ওখানে দেবতা হীমামার আলয়—রাজার নাম লঙ্কাধিরাজ অর্থাৎ সেই দশস্কন্ধ রাবণের দেশ, যিনি তোমার জন্মানোর বহু পূর্বে জটাই পক্ষীর ডানা ছেদন করেছিলেন—দশরথ-রাজপুত্রের সীতা হরণের কালে। চলি—আজ লক্ষ্মীবারে ব্রতর দুটো ধানের শিষ জোগাড় করতে হবে—বলেই তোতা পণ্ডিত লক্ষ্মীপুজোর ধ্যান আওড়াতে আওড়াতে সরে পড়লেন—

লঙ্কা দেবী কর যদি কৃপা
ঠাণ্ডা হয় জঠর জ্বালা
আতা গাছে তোতা পাখি হয়ে থাকি—মুদে আঁখি
কাটতে থাকি ছোলা ছানা।।

এই সময় বাঁশবনের এক চোখকানা ডোমকাক এসে কানের কাছে ফিসফিস করে বললে, 'শোন কেন পণ্ডিতের কথা? ওদিকটাকে বলে সর্বরঙের দেশ বা সবরঙ বাদশার মুল্লুক।'

'ওর ওধারে কী আছে?'

'তা আমি জানিনে।'

এই সময় লোমড়ি হোগলা পাতার ঝোপ থেকে বার হয়ে বললেন, আমি জানি ওর ওধারে কোকাক্ষ পর্বত।

কোকাক্ষ পর্বতে বাস করে পরীগণ
তার মধ্যে ছয় পরী পরথম যৈবন
লাল পরী নীল পরী
সোনা পরী চাঁদি পরী
আর কাঁচ পরী
পাঁচপরীর সেরা পরী সব ছোট নুরী।।'

তয় দেশের রাজপুত্যা হাতেমের বুকে মালিস করতে পরী পাখির চর্বি আনতে যাই সেখানে।

লোমড়ির কথাটাই লাগল আমার। পথের সন্ধান শুধতে তিনি বললেন,

ডাহিনের পথে পাবে ঠগের মল্লুক
বামের পথেতে গেলে জীন পরীর রাজ্য
সম্মুখের পথে গেলে হইবে বাণিজ্য।।

এই কথা বলেই হুক্কা হুয়া বলতে বলতে লোমড়ি দিলেন দৌড় বাসায়—চাঁদ উঠি-উঠি করছেন তখন।

দেখতে দেখতে বেলা কেটে প্রদোষ কালের অন্ধকার বাম-দক্ষিণ-সম্মুখ-পশ্চাৎ ঘিরে নিয়েছে দেখি। চলি কি না-চলি ভাবছি এমন সময় লক্ষ্মীপ্যাঁচা এসে বললেন—

গোষ্ঠ পথে চলা ভার শৃঙ্গীদের ভিড়ে
লক্ষ্মী যায় চন্দ্রমায় পক্ষী যায় নীড়ে।

কথাটা লাগল। ঠিক সেই সময় তোতা পণ্ডিত এসে কোটরে ঢুকেই বললেন, 'প্রদোষে নিহতঃ পন্থা রাত্রৌচ ভ্রমণম্ বিষম। প্রদোষে হারাবে রাস্তা—লাগাবে ঠাণ্ডা।'

কথাটা লাগল—বসে রইলেম কোটরে গুটি-সুটি কম্বল মুড়ি—ঘুম এল না নানা ভাবনাতে। ডাঁস পোকা ভনভনাতে থাকল কেবলি গায়ে চিমটি দিয়ে—

রাত দিন চিন্তা, দিন রাত চিন্তা—ছাড়ি দিন
দিন ছাড়ি চিন্তা
দিন রাত রাত দিন চিন্তা
চিন্তায় দিন দিন—অতি ক্ষীণ রসহীন।

কথাটা লাগল—নিজের গালে নিজেই চড়াই আর বলি—

বৃক্ষ ছেড়ে যায় পক্ষী না রহিলে ফল
সারস সরসী ছাড়ে না রয় যদি জল
ভৃঙ্গ পুষ্পবন ছাড়ে না পায় যদি মধু
বৈরিগী যায় অকারণে ছাড়ি প্রাণ বঁধু।
বন-হরিণ বন ছাড়ে দেখে দাবানল।

বনে রয়েছে দিব্যি ফল জল, দাবানলের লক্ষণও দেখছিনে কোন দিকে। বলছে বৌ-কথা-কও পাখি ঐ তো উত্তরে গাইছে মনুয়া—

ওরে ওউ মউরীদানায় ভরল মৌ।
ভরে মহুরীর সৌরভ চৌধার বনটায়
মৌমাছি ভোমরা উড়ি উড়ি চলি যায়
রৌদে ফুকরায় মৌচুলি পাখিটি
মউলে বউলে মিঠি মিঠি ভরে মৌ।

আমি কি বৈরিগী হয়েছি...এমন দিনে আত্মারামের মতো বন ছেড়ে যাব রাজপুত্রের সন্ধানে? কে আমার সে রাজপুত্র যে, তার জন্যে অবনে গিয়ে পড়তে হবে...হাঁ। বলেই পাশ ফিরে শুয়ে যেই চোখ বন্ধ করা সেই ঘুম আসা। ওধারে গাছের ফাটলে 'বৃক্ষে বৃক্ষে বৃক্ষে' বলে চলল উইচিংড়ে আর ঝিঁঝি—

তুমি কার কে তোমার, কে বা তোমার তুমিই বা কার...কারই বা কে... নানা পক্ষী এক বৃক্ষে থাকে...তারা তোমারই বা কে—তুমি তাদেরই বা কে। সুনিদ্রায় রাত কেটে গেল। কালপ্যাঁচা এসে মাথার উপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ঘুম ভাঙাল...

তেঁতুল গাছে দেয় কোকিলে খোঁচা
ওঁচায় বকুল গাছে কাক ত্রিশূলে
দিবালোক এসে চক্ষু ধাঁধায়
উষাতে রাস্তায় লাগায় দিক্‌ভুল।

চমকে জেগে দেখি ডানার পালক গজিয়ে গেছে আমার এক রাত্তিরে। কোটর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখি আকাশ পরিষ্কার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমার যেদিন ডানা গজাল বনবেড়ালেরও সেদিন গোঁপ

উঠল। সে ল্যাজ ফুলিয়ে গোঁপ মুচড়ে এসে আমার দুয়োর গোড়ায় একবার উঁকি দিয়ে বললে 'মিঁত্যে।' আমি বললেম 'খিদ্যে।'

ডাল বেয়ে বনবেড়াল নেমে গেল গাছের নীচে, আমি উঠে গেলেম গাছের উপরে আগ্‌ডালে।

বনের ওধারে যে একটা পর্বত আছে সেই প্রথম দেখলেম... মনে হল যেন নীলবর্ণ প্রকাণ্ড পাখি একটা নদীর ওপারে বিরাট দুখানা ডানা মেলিয়ে চরে বসে চুপ করে রোদ পোহাচ্ছে। পূব দিকে চেয়ে দেখি দূরে একটা বনে দাবানল জ্বলছে...গাছের শিয়র ধুমায় ঢাকা।

শুকনো ডালে বসে দাঁড়কাক জিভ ছুলতে-ছুলতে বললে আমাকে...

অ আ ককা
পা-পা-গা গা গান গা।
যা পাস্ তাই খা খুঁটে খুঁটে,
ভোরে উঠে, লুটে পুটে...খা গা।
খাঃ দাঃ গান গাঃ।

আমি যতটা পারি দুই ঠোঁট ফাঁক করে গান গাইতে যাই... সুর বার হয় না। দাঁড়কাক টেরা চোখে আমার দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'বোকাঃ।'

গায়ে আমার যেন লঙ্কা-মরিচ ছিটিয়ে দিলে, রাগে গরগর হয়ে আগডাল ছেড়ে ঝম্প দিলেম দাঁড়কাকের দাঁড়ের দিকে। কাক দাঁড় ছেড়ে কোকিলে পাখির খালি বাসায় ঢুকে পড়ল ভয়ে। আমি সোজা আকাশ সাঁতরে পাহাড়ের চুড়োয় পিল্পে পণ্ডিতের আস্তানায় পিপ্পলী গাছটার শুকনো ডালে গিয়ে বসলাম...তখন মনে পড়ল উড়তে শিখে গেছি একদমে। নিজেকে সামলে গাছের তলায় চেয়ে দেখি...চরেন্দা পরেন্দা সবাই পিল্পে-পণ্ডিতকে ঘিরে গল্প শুনছে। পিপীলিকা থেকে গজহস্তী, গরুড় পক্ষী থেকে চর্ম-চটিকা সবাই শ্রোতা হয়ে বসেছে...মাঝে শ্বেতপাথরের পিল্পের উপরে পিল্পে-পণ্ডিত।

আমিও গিয়ে উপস্থিত আর পিলপ্পাই কথার শেষ পাতাটি খুলে পণ্ডিত পাঠ করলেন—

বৃক্ষ ছেড়ে যায় পক্ষী না রহিলে ফল
সারস সরসী ছাড়ে না থাকিলে জল
ভৃঙ্গ পুষ্প ছাড়ে যদি মধু নাহি রয়।
দগ্ধ বন ছাড়ি মৃগ সুদূরে চলয়
বস্তি ছাড়ে ঘর গৃহস্তি না দেখে সম্বল
করে বসে বানপ্রস্থ কাঁধে কাঁথা কম্বল।

'চরেন্দা পরেন্দা তোমরা সব যে যার স্থানে প্রস্থান কর, আমি বানপ্রস্থে চল্লেম।' এই বলেই কাঁথা কম্বল পুঁথি আর আসন আর যা-কিছু সম্বল নিয়ে পিল্পে-পণ্ডিত পিল্পের মধ্যে অকস্মাৎ অন্তর্ধান। গল্প বন্ধ। শ্রোতা ছিল যারা চরেন্দা...তারা চোখ মুছতে মুছতে চরতে গেল এ-বনে সে-বনে। আপন দেশে পরেন্দা...তারা পরীর মতো উড়তে উড়তে চলে গেল পরদেশে। পিল্পে রইল...কিন্তু পিল্পে-পণ্ডিতকে কেউ আর দেখতে পেলেম না।...একেবারে তিরোভাব, সাড়াশব্দ কিছু নেই, চুপ হয়ে গেল পিপ্‌লীতলা।

আমি কোথা যাই—কী বা করি। পায়ে পায়ে পিল্পের কাছে এগিয়ে দেখি পিল্পের উপরে হয়েছে কুয়োর মতো গর্ত, তার মধ্যে থেকে নীল সাদা লাল তিনটে চোখ জ্বলছে যেন তিনটে 'আকোয়া' মানিক।

আমি কুয়োর কিনারা থেকে ফল ভেবে সে তিনটের দিকে ঠোঁট বাড়াতেই গম্ভীর আওয়াজ এল পাতাল থেকে...'কোয়ম্'। আমার মুখ থেকে অমনি সমস্কৃততে বেরিয়ে গেল...
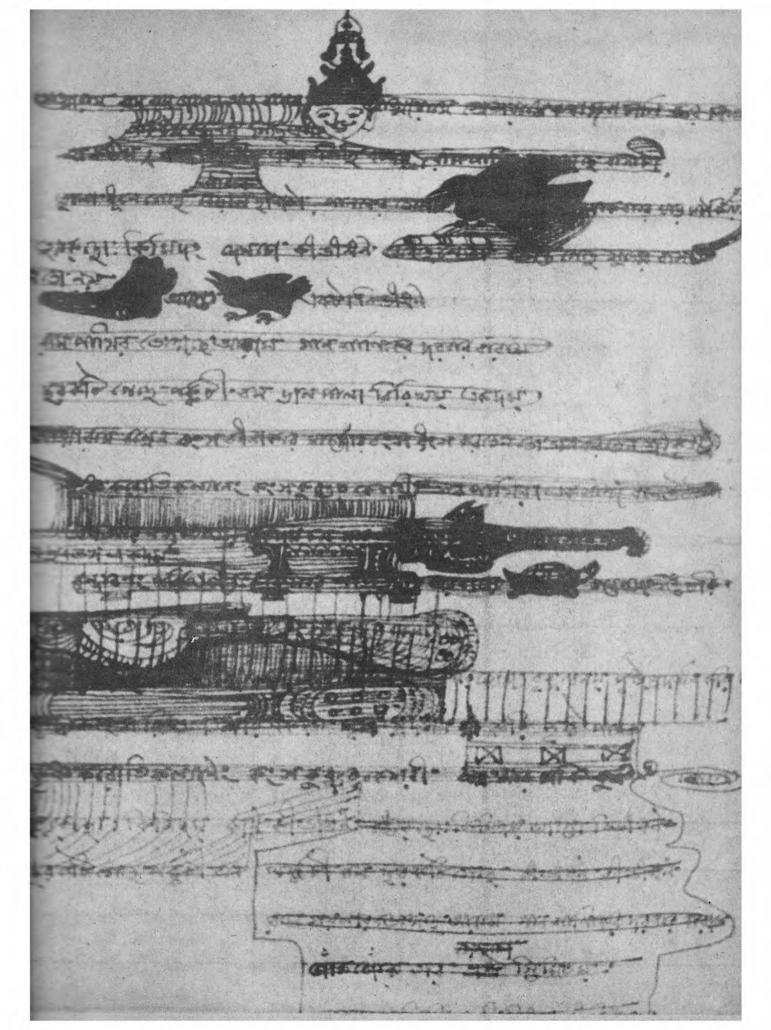
'জরদ্গবোহম্'। পাতাল থেকে শব্দ উঠল...'হুম'—যেন হাঁড়ির মধ্যে থেকে কে কথা কইল।

সেই সময় নতুন গোঁফের গোড়ায় পাক দিতে দিতে বনবেড়াল পিছু থেকে ডাকলেন, 'মিত্যো।' আমি 'অ্যাঁ' বলে চমকে ফিরতে না ফিরতে মিতে আমার আমাকে টপকে এক লম্ফে একেবারে কুয়োর মধ্যে ঘাড়মুড় গুঁজে চিতপটাং...তার পরেই হাউইয়ের মতো সোঁ করে আকাশে উঠে অন্তর্ধান। পাকাটি তলার দিকটাতে একবার শুনলেম ডাক—'মিত্যা খিদ্যা'... তারপরেই সব সুনসান্ ময়দান।

খিদের জ্বালায় পিল্পের ধারে ধারে ঘুরছি। 'কোয়ম্ কোয়ম্' বলে এমন সময় কুয়োর মধ্যে থেকে আবার শব্দ পেলেম...

ফল সুমধুর ছায়াও মেদুর
ওই গাছতলে বিছাও মাদুর
বদরী ফল পাকিবে মিষ্ট
ছায়াতলে বসো শান্ত শিষ্ট

এই না বলে পিল্পে-মুখের গর্তটা খানিক ধুমো ছেড়ে দিলে। গর্তের কিনারায় সান বাঁধা চাতাল...তারি উপরে আমি আসন করে বসলেম সন্নিসীর মতো...চাটাই বিছিয়ে পাকাটি-কাটির।

কে জানত পিল্পেটা চিন্তা-মণিতে গাঁথা। যেমন সেটার উপর চড়ে বসা গদীয়ান হয়ে, আর সংসারের সুচিন্তা কুচিন্তা দুশ্চিন্তা রুদ্রাক্ষ-মুখী নানা চিন্তা, এক-মুখী একাগ্রচিন্তা একসঙ্গে এসে চিন্তার ভারে সেই পিল্পেটার সঙ্গে আমাকেও যেন পাথরের গরুড় পক্ষীর ছানার মতো বজ্রপ্রলেপ দিয়ে জুড়ে দিলে...চেপে ঘাড়ে। নড়ন চড়ন নেই...চিন্তাই করি বসে বসে...

দূর আকাশে নয়নতারা রেখে স্থির
ধ্যান ধরি মুনি যেন নৈমিষির
হয়ে শিবনেত্র রই খেয়ে পত্র ও বেত্র
রাত্র যায় জাগরণে গাত্র কণ্ডু দিনমানে
চলে যায় দ্রুত গমনে
গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ শিশির।

চিন্তাম্বুধির আর শেষ পাইনে। মুহূর্ত ঘটিকা প্রহর তিন শত পঞ্চষষ্টি অহোরাত্র কাটাই কত নিমেষ পল অনুপল বিপল বিফলে চলে যায়। চিন্তামণি শিলাতলে চলতেও চায় না, মন উড়তেও চায় না। ভাবে আর ভাবে, কী যে ভাবে তা না জানে বাতাস না আকাশ, না জানে দিন, না জানে রাত্রি। বসন্তের বাতাস এসে লাগে গায়ে, কিন্তু এই জরদ্গবের চিন্তাভরা গলার থলিটাকেই দুলিয়ে যায় ; দুই কাঁধের পালক দু-চারটে ঝুলে পড়া ডানা দুখানাকে আস্তে আস্তে চাপড়ায়, ডানার বাজু দুটো দু-একবার কাঁপে...যেন বাঁশপাতা নড়ে চড়ে একটু একটু, চিন্তার বোঝা ঝেড়ে ফেলা সাধ্য হয় না তাদের। কোল-কুঁজো ঘাড়বাঁকা পাখি এক স্থানে আটকা থাকি আর ভাঙা গলায় থেকে থেকে করি কান্নাকাটি-হাঁকাহাঁকি...কখনো খিদের জ্বালায় কখনো বাতের ঝনঝনানিতে...

সোজা কইবই বই ভূতের বোঝা,
ঝাঁকা মুটের বোঝা...ত্রিসংসারের চিন্তার বোঝা।
কথাটা শুনতে সোজা
বইতে সোজা নয় বোঝাটা—
এ যে চিন্তার পরে চিন্তার বোঝা
কমতি নাই তার বাড়তি বই।
মনোদুখে চক্ষু ভাসে
বক্ষ ভাঙে বইতে বোঝা।

এমনি থাকতে থাকতে দিন গেল...বোঝা গেল না। রাত গেল, মাস গেল, বছর গেল, বয়স গাছপাথর পেরিয়ে গেল.. বোঝা গেল না। চিন্তামণিময় হয়ে গেছি তখন। নাক সড়সড় করলে চিন্তামণি শিলাতলে নাক ঘষি, আঙুল কটকট করলে নখ আঁচড়াই চিন্তামণি পাথরে। নখ পেল ক্ষয়, ঠোঁট হল ভোঁতা। ভাঁটা চোখ দুটো লাল নীল সাদা তিন রঙের চিন্তামণির দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে ক্ষয়ে যাবার জোগাড়। মন কিন্তু কী জানি কেমন করে রয়ে গেছে তখনো তরুণ। দেখি একদিন খুব একটা আধ্যাত্মিক কবিতা লিখে ফেললে। বলি শোনো সেটা...

হায় রে মাটিতে পিল্পায় বাঁধা
থাকি খিল আঁটা
মন চায় ছাড়া পায় নীলাকাশে
খেলি ভাঁটা
ধরে চাঁদটায় বেলাবেলি গোলা খেলি
গাঁঠেতে গাঁঠেতে বাতেতে আটকা
বাতিকে হাঁটে মন খাট থেকে সাত পা।
লাফালে মটকাতে চটকা ভেঙে যায়
পটকান খেয়ে পড়ি
দিয়ে ধুলে গড়াগড়ি
যাতনায় কাতরাই—করি খালি উঃ আঃ
ঝাড়ি ডানা কাদা-ঘাঁটা।

ঐ যেখানে তেমাথা পথে বসে আছেন এখন 'লুংগী বাবা তুম্বি নিয়ে', ওখানে তখন থাকে ধাড়ি লেঙ্গুর মুখপোড়া, পিঠের উপরে উল্টো বিস্ময়ের চিহ্নের মতো কুণ্ডলায়িত লেজ খাড়া করে সে কেবলি কুণ্ডুলী পোকা বাছে বসে বসে, আমার দিকে এক-একবার দাঁত খিঁচিয়ে চায় আর বলে

চিন্তামণি চরণাম্বুজ-রজ চিত ভুখা ভুখা রহো
রুখা শুখা জপত রহো নাম
ছোড় দে চিন্তা সমসারকী
ছোড়ত রহো সব কাম
সুখাদুখা মিটাবনি...জপতো রহো নাম।

আর পিটপিট করে দেখে আম জাম শসা কলা কোনো দিকে পেকেছে কিনা কোনো গাছে।

এই সময় জাম্ববান বুড়ো মধুবনের ঐ সে চৌমাথায় যেখানে এখন বসে কমলী বাবা, সেখান থেকে লেঙ্গুর বাবাজিকে ডাক পাড়ে, ভুঁড়ি বাজিয়ে ভজন গেয়ে জানায়...

পাকিল কাঁটাল আম, লিচু আর গোলাপ জাম
আঙ্গুর বাগে আঙ্গুর ফলে
জম্বু দ্বীপে ফলে কালো জাম।
সারা দিনমান কুহু রজনী
কোকিলের কুহু কুহুই শুনি
জাম্ববতী জাম্ববানী
কোথায় জানি পাড়ে কালো জাম
ইধারে তেঁতুল গাছে
বিহারে চাঁদ বাঁকা ঠাম।

সেই সময় শীত যে শেষ হল, বসন্তকাল যে এল এল...এই খবর দিয়ে গেল বনে বনে কে তা কে জানে।

হু হু উত্তুরী বায়ু...
উড়ায়ে নিল ধুলা, দুলায়ে দিল কাশ,
নীলাকাশ ঘুরে ঘুরে, বহিল বাতাস হু হু।
শুকালো শিশির...
উশীর বনে উদ্গ্রীব তিতির
হল অস্থির মেলাতে ডানা
মুহু মুহু—মন হু হু।
চায় যায় সে উড়ে
কুয়াশায় ঢাকা বালুচরে
দূরে দূরে বয় যেথা উত্তুরী বায়ু।

তার পরই হঠাৎ এসে যায় বসন্তকাল। ঘোরে ফেরে প্রজাপতি...তাদের ডানাতে আলো-মাখা বাতাস ফিরে ফিরে লাগে। গাঁয়ের কালো ছেলেরা মেয়েরা গান ধরেছে শোনা যায়

ফিরি ফিরি বয় রে নন্দুয়া হাওয়া
মিঠি মিঠি বয় রে নলীয়া হাওয়া
ধীরি ধীরি ঝিরি ঝিরি/ফিরি বয় রে দাখিনা হাওয়া
মিঠি মিঠিয়াঁ ভরি পানিয়াঁ
নদী বয় রে বাঁকে বাঁকিয়া।

তখনো আমি পিল্পের উপর চিন্তামণি-শিলাতলে চিন্তামগ্ন বসে আছি। হঠাৎ কূর্ম পিল্পের তলা থেকে চারখানা পা আর মুখটা বার করে বললেন...

রাত দিন চিন্তা, ছেড়ে দিন্ দিন তা
নেচে নিন্ ঢিমে তালে
চলে নিন্ ফেলে পা...পা পা
চেও না নেই যা, নিয়ে নাও পেলে যা
ভেবো না যা তা।
অতোশতো ভাবনা চিন্তা
নিয়ে কেন থতোমতো—রও বসে
দেখ এসে, চলে গেল দিনটা!

এই না শুনে যেমন দূবার গা ঝাড়া দেওয়া আর বরফের কুঁচির মতো চিন্তাগুলো পুট পুট করে ভেঙে পড়ল ডানা থেকে। ঠিক সেই সময় চিন্তামণি শিলাতলটাও জল হয়ে গলে ঘাসের উপর রামধনুকের রঙের স্রোত বইয়ে দিলে। সেই জলে তিনটে ডুব দিয়ে উঠতেই কূর্ম বলে উঠলেন, 'যাক্ আর ভয় নেই, দ্বিজন্ম হয়ে গেল, এখন নিদ্রাভঙ্গ, নাম হল তোমার জরদ্গব।'

সেই সময় বগামামা একটা সিংগিমাছ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আশীর্বাদমন্ত্র পাঠ শুরু করলেন...

পক্ষ নাই কিন্তু তবু পক্ষ পালন কর
ক্ষীণ চক্ষু চক্ষু কোটর কোটরেই বাস কর।
নেড়া নেড়ি সম হোক ওল-কামানো মুণ্ড
তিন কাল বর্তে থাকো যথা কাগভুষুণ্ড
বৃক্ষে রক্ষে কর নিত্য বানর তাড়াও
ইহ জন্মে মার্জারের মৈত্রী না বাড়াও
যে যা দেবে তাই খেও জরদ্গব নাম
যোগী নয় রোগী নয় জেগো চার যাম।

মন্তর আশীর্বাদ সবই যেন জটিল সমস্যার মতো ঠেকল... ওর মধ্যে আসল জিনিস ছিল ধড়ফড় টাটকা মাছটা, আমি সেটার দিকে মুখ নিতেই বগামামা বলে উঠলেন 'উহুঁ ওটা আজ খেতে নেই, ছুঁয়ে দাও, জলে দিই।' আমি ভয়ে ভয়ে আঙুল বাড়িয়ে মাছটা ছুঁতে মামা সেটা টপ্ করে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে জলে গিয়ে নামলেন, তার পর দুই ঠোঁটে মাছটাকে ধরে টপ্ করে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে কোমর-জলে হাঁ করে দাঁড়ালেন...উপর বাগে ঘাড় তুলে। মাছটা টপ করে পড়ে আর কি মামার মুখে, এমন সময় ঝপ্ করে দাঁড়কাক কোথা থেকে এসে মাছটাকে ছোঁ দিয়ে নিয়ে দে চম্পট আকাশ-পথে।

মামা খটাস্ করে সন্নিসীর চিমটের মতো ঠোঁট দুখানা বন্ধ করে হা-হা করে বললেন, 'যাক্, মাছটা জলে গেল—কা কস্য পরিবেদনা।' তারপর গম্ভীর চালে পায়ে পায়ে কাদা ভেঙে ধানদূর্বা খুঁজতে জলার দিকে গেলেন—আর দেখা নেই। সেদিকে অন্ধকার করে টিপ্ টিপ্ বিষ্টি নামল।

এই সময় কোলাবেঙ ছাতা মাথায় পেটের খোল চাপড়ে বার হলেন মুক্তিস্নানে, ব্যান্ড বাজিয়ে সংগে সংগে নগরকীর্তনের দল ছাতাঁরে পাখিদের পাড়ার দিকে হুল্লোড় গেয়ে চলেছে দেখি। সোনাবেঙ দলের মাঝে উর্ধ্ববাহু কেবলি লাফাচ্ছে, ভাঁটা চোখে দরবিগলিত ধারা বইছে, গা-টা ঘামে আর বিষ্টিজলে সিক্ত বিসিক্ত হলুদ গামছার মতো দেখাচ্ছে। রোল তুলেছে গেছো বেঙ কটা কীর্তনের—

আজ মুক্তীর দিনে
বেঙ বেঙাচি মশা মাছি ছাড়ল ডিম
হট্টিমা টিম্ টিম্।
সুপ্টি ছাড়, ধুকটি ধর
শুক্টির মাঝে মুক্টি যথা
ভ্রুকুটি তথা লপ্টি আছে
পোষ্টিকা ঘেঁটে চল কাদামাটি হিম।
হট্টিমা টিম টিম।
চাট্টিখানি কথা—টোপা পানার ডাঁটা
মিষ্টি জলে মুক্তি পেল কলমীলতা শিম
সবুজ পাতা মুখটি খোলো বাদল-ঝরা দিন
—গ্রহণ দান দিন।

কটকটি বেঙ দলে দলে দান লীলা সেধে চলল, 'গ্রহণ দান যেরন দান—দান করো, দান করো—মুখটি চান করো।'

মুক্তিচানে যাবে সবাই, ইতিমধ্যে কয়ে কয়লার আকার কাক হঠাৎ এসে বললেন, 'আর কাজ নেই মুক্তিস্নানে—পালাও, পালাও।'

গলাফোলা কোলাবেঙ বলে উঠলেন, 'স্তু হী কীদৃশ বিয়াপারখান।'

গর্ত থেকে অসমর্থ বেঙ মুখ বার করে বললেন, 'কিমর্থ আগতোসি— ব্যাপার কী? ব্যাপার কী?'

সেই কালে সুবচনীর হাঁস খোঁড়াতে খোঁড়াতে নেংচে এসে বললেন, 'ব্যাঘাত ব্যাঘাত!'

সংগে আর সাতটা হাঁস কোলাহল শুরু করে দিলে আমাদের ঘিরে—অকস্মাৎ উৎপাত হঠাৎ বজ্রাঘাত উল্টা ক্যাত পদ্মপাতে হন সাক্ষাৎ—কী কব আর—

মানুষ কি জানোয়ার বুঝে ওঠা ভার
কিম্ভূত কিমাকার।
ওষ্ঠ মাস ঠেলি দন্ত আছে মেলি
দশ দশ অঙ্গুলিতে বক্রনখধার—

ভয়ে বাক্ রোধ। কূর্ম খোলার মধ্যে থেকে নিজের পেটের খোলটা চাপড়ে খোলের বোল বাজাতে বসে গেলেন আওয়াজ পাওয়া গেল স্পষ্ট—বিকট সংকট ক্রমসন্নিকট উড়িয়তাম উড়িয়তাম—লটখট বিকট নিকটে চটপট—ডুব-দীয়তাম। ডুব দীয়তাম—কূপমণ্ডুকবৎ। ক্রীড়াকন্দুকবৎ দীয়তাম চম্পট।

কোলাবেঙ তাঁর চার বৌকে ডাক দিলেন, 'ও কট্কৌটি, পানকৌটি, চুনকৌটি কড়কৌটি।' আর কড়কৌটি! মুক্তিচান, নগরকেত্তনে মেতে তারা গেল ঘরের দিকে কি বাইরের দিকে কে জানে তা। কোলাবেঙ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চারিদিকে তো চাইতে থাকুন—ওধারে বেঙ-বেঙাচি খেলামকুচি নীলাম্বুজী পাতখোলা হাটখেলা, নাকতোলা ড্যাবডেবি বেঙপাড়ার আর সবাই পালাল দেখে তাম্ববেঙ আর সোনাবেঙ কুয়োতলাতে দুজনে মুখোমুখি শিবনেত্র হয়ে বসেই রইল—মেঘলা আকাশের পারে ময়লা আধুলির মতো চাঁদটার দিকে তাকিয়ে।

তারপর এক সময়ে হঠাৎ চটকা ভেঙে 'উড্ডিয়তাং' বলেই ডিগবাজি খেয়ে একসঙ্গে ঝম্প দিলে চাঁদ ধরতে ; কিন্ত পড়ল দুটোতে আকাশপথে এতে ওতে ধাক্কা খেয়ে পটকা ফেটে কোথায় ছটকে।

না-রাম-না-গঙ্গা ভাঁটার মতো দুটো চোখ ঘুরিয়ে কুয়োতলাটা বারবার দেখতে থাকলেন কোলাবেঙ।

কাক ডালে উড়ে বসে বললেন, 'যাক।'

কোলাবেঙ মোটা গলায় উত্তর দিলেন, 'নির্বান্ধব হৈড় পড়ী।'

আমি বললেম কূর্মকে, 'চলেন, আমরাও চলি—আর কি?'

কূর্ম জবাব দেবার আগেই কোলাবেঙ বলে উঠলেন, 'কুত্র গন্তব্যম্ ?'

সরু গলায় কূর্ম কাতর স্বরে 'কিং কূর্ম?' বলেই কাতর-ভাবে পিল্পের দিকে চাইলেন। পিল্পে থেকে ভক্ করে খানিক গাঁজার ধুমা আর একটা সমস্কৃত শোলোকের শব্দ উঠল—'অস্ত্যুত্তরস্যাংদিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।' যেন আত্মারামের গলা পেলেম। এদিক-ওদিক চাই—দেখি গাছের উপর বসে সত্যিই আত্মারাম পক্‌টি ফল খাচ্ছেন আর ভেণ্টিলোকীজ্‌ম' (VENTRILOQUISM) করছেন—তারই প্রতিধ্বনি দিচ্ছে।

আত্মারামকে ডেকে বললেন, 'অস্থি দেবার কী কথা হল? বুঝলেম না তো।'

আত্মারাম আবার আউড়ে চল্লেন—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ, তস্যোত্তরে মানস সরে বগাহ্য নিবসন্তি বকাস্য তীরে ন্যগ্রোধ পাদপে সভার্য্য।

অন্তর্বাহ্য কিছুই বুঝলাম না কেউ, আত্মারামের কথার মানে বুঝতে মাথা ঘুরে গেল সকলের। তখন আত্মারাম বাংলায় অস্যার্থ করলেন—

> উত্তরেতে হিমবৎ তদুত্তরে মানসহ্রদ
> তার তীরে এক পাদপ ন্যগ্রোধ
> সেস্থানেতে সপার্ষদ বসেন কুরুবগ
> যেতে পারলে তদ্‌দেশে হওয়া যায় নিরাপদ।

বসবাস করবার এমন নিরাপদ স্থান আর নেই। একেবারে পৃথিবীর শেষে বরফের দেশ, তার মধ্যে মানস-হ্রদটি আর্সির মতো ঝকঝক করছে। ডুবে ডুবে বরফজল খাও আর ন্যগ্রোধ পাদপের অগ্রডালে স্তব্ধ হয়ে বসে তপস্যা করো। যমরাজের পোষ্যপুত্রের বাবাও হাত বাড়িয়ে সে স্থানে নাগাল পাবে না—এমন চমৎকার দেশ সেটি।

কোলাবেঙ আপত্তি তুললেন, 'শীতোকাড় ইদান্ত মানস হ্রদ তো জমি কিড়ি বড়ফ হৈ গলা—জড় কিমতি মিড়িবা নামি বকু?'

আমি ঘাড় নেড়ে বললেম, 'একথা ঠিক।'—

> খাওয়া মেলে তো যাওয়া যায়
> নয়তো ভাই টেঁকা দায়
> জলপান না পেলে মানস সরোবরে
> প্রাণ যাবে বরফ খেলে হেঁচে কেশে।
> কোন মতে গেলে বেঁচে অবশেষে
> দেশে ফেরা দায়।
> বাতে যদি ধরে হাতে পায়
> নড়া দায় তার কথা ঠেলে।

আত্মারাম গম্ভীর হয়ে বললেন, 'শুনেছি রাজপুত্তুর সেখানে গেছেন অষ্টধাতের পক্ষিরাজ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ধবলা পাহাড় টপকে।'

কূর্ম গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তোমরা না হয় ডানা পেয়েছ, উড়ে গেলে সেখানে রাজপুত্তুরের আস্তাবলের ধারে অষ্টধাতের ঘোড়ার আড়গোড়ায় তৈরি হল উড়োঘোড়া, ঘোড়ারোগ আর উড়ম্বা-বাতিকগ্রস্ত মানুষটির ধাত বুঝে। আমরা তো ভাই সে ধাতের জীব নই, জলস্থল দুটো সয়েছে আমাদের ধাতে, আকাশ কিন্তু......'

কোলাবেঙ আর চুপ থাকতে না পেরে 'ব্যোম্ মহাদেও' বলেই আটা-কাটির মতো লম্বা জিভ বার করে একটার পর একটা উড়ন্ত পিঁপু ও কানামাছি নিঃসাড়ায় পেটে পুরতে থাকলেন। তারপরে গুরুগম্ভীর স্বরে 'কুত্র গন্তব্যম্' বলে তিনটে ঢোক গিললেন।

আমি বললেম, 'উত্তরে মানস সরোবর ব্রহ্মার পরমহংসদের জন্যে থাক। আমরা চল পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের রাস্তা ধরে সান্ বন্দরের ঘাট পেরিয়ে মগের মুল্লুকে গিয়ে ঢুকি। শুনেছি তারা জীব-হিংসা করে না।'

আত্মারাম চেঁচিয়ে বললেন, 'নাপি নাপি নাপি। জীবিতে-নাপি মৃতেনাপি। রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ...বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য কদাপি ন্নাপি গচ্ছামি—চল বৃন্দাবনেই চলে যাই—'

কূর্ম বললেন—

> ওরে ভাই দধি ঘোলে শরীর টিকে রবে নাই
> মাংসাশী হলেম মোরা কজনাই
> ধীরে সমীরে যমুনা-তীরে শৃঙ্গীদের ভিড়ে
> সহজে যেতে নাই।

তুলসীতলায় নেহাত বিপদে না পড়লে তবেই যাওয়া, নয় তো আমার তো ইচ্ছে মাটি খুঁড়ে একবার সেই পাতালে নেমে যাই—চল যেখানে সীতা ডুব দিয়ে বেঁচে গেলেন ; অমন নিরাপদ স্থান আর নেই। ভোগবতীর জল কর্দম আছে, কমঠ অবতারের সময় বহু-দিন সেখানে থাকা গেছে।

বেঙ ভারী গলায় 'কড়কট নাগ' বলেই মুখ ব্যাদন করে দেখানো মাত্র একটা গঙ্গা ফড়িং টপ করে চলে গেল সেই পথে তাঁর পেটে। 'স্বড়গ-মড়ত-পান্তাড় সব ঘুড়নায়মান চড়ন্তি' বলেই উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ঊর্ধ্ব অধঃ চোখ দুটিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কোলাবেঙ কটমট করে ছড়া কাটা শুরু করলেন—

> উতড় দচ্ছিন পুড়ব পচ্চিম
> স্বড়গ মড়ত পতাড়
> জড়পথ স্থড়পথ আকাশপথ যদা
> নিড়ীখন কড়িকিড়ি দেখিড়া
> রস্তাড় গতা না পাইড়া
> সব ঠেকিড়া বিসম ধন্দা।
> আগাইড়া পিছাইড়া গোড়মাড় বধাইড়া
> ফিড়ি আইড়া তদা॥

কাছিম বললেন, "কিং কুর্ম?"

কাক বললেন, "কঃ যামঃ?"

আত্মারাম বললেন, 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।'
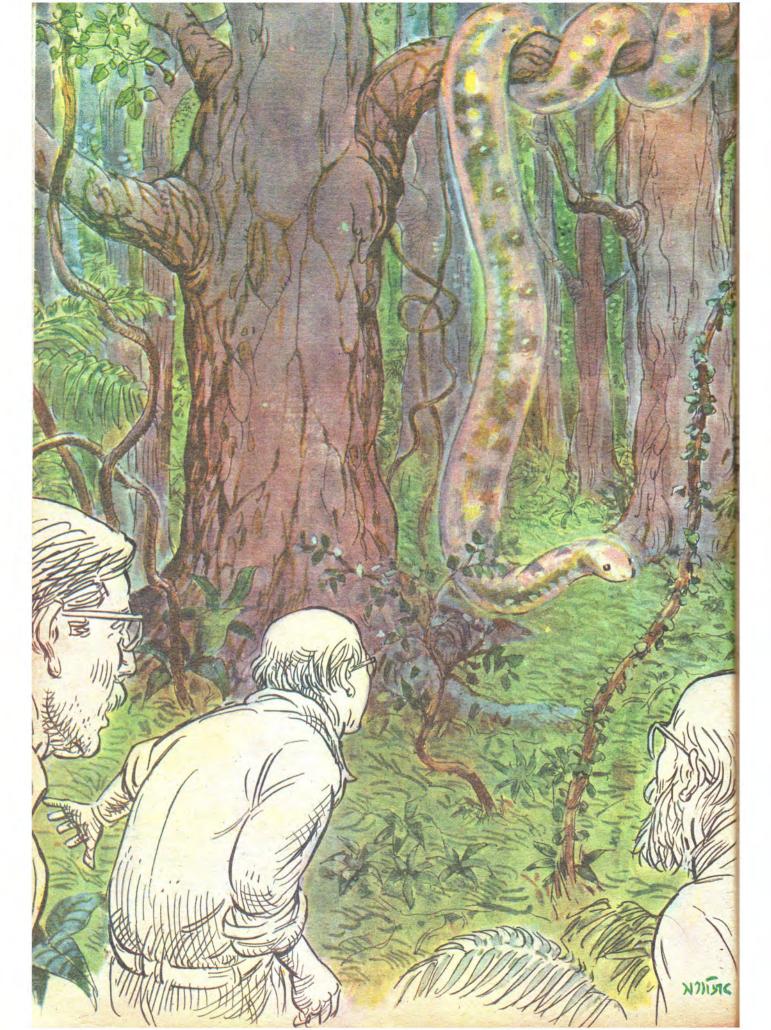
প্রোফেসর শঙ্কুর অ্যাডভেঞ্চার

১৩ই জুন

আজ সকালের ঘটনাটা আমার কাজের রুটিন একেবারে তছনছ করে দিল। কাজটা অবিশ্যি আর কিছুই না ঃ আমার যাবতীয় আবিষ্কার বা ইনভেনশনগুলো সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখছিলাম সুইডেনের বিখ্যাত কসমস পত্রিকার জন্য। এ-কাজটা এর আগে কখনো করিনি, যদিও নানান দেশের নানান পত্রিকা

থেকে অনুরোধ এসেছে অনেকবার। সময়ের অভাবে প্রতিবারই প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। ইদানীং আমার গবেষণার কাজ ইচ্ছে করেই অনেক কমিয়ে দিয়েছি। এটা ক্রমেই বুঝতে পারছি যে, গিরিডির মতো জায়গায় বসে আমার গবেষণাগারের সামান্য উপকরণ নিয়ে আজকের যুগে শুধু যে আর বিশেষ কিছু করা যায় না তা নয়, করার প্রয়োজনও নেই। দেশে-বিদেশে বহু তরুণ বৈজ্ঞানিক আশ্চর্য সব আধুনিক যন্ত্রপাতি হাতে পেয়ে, এবং সেই সঙ্গে নানান বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় যে-সব কাজ করছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। অবিশ্যি আমি নিজে সামান্য ব্যয়ে সামান্য মালমশলা নিয়ে যা করেছি তার স্বীকৃতি দিতে বৈজ্ঞানিক মহল কার্পণ্য করেনি। সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেই আবার এমন লোকও আছে, যারা আমাকে বৈজ্ঞানিক বলে মানতেই চায়নি। তাদের ধারণা, আমি একজন জাদুকর বা প্রেতসিদ্ধ গোছের কিছু ; বৈজ্ঞানিকের চোখে ধুলো দেবার নানারকম মন্ত্রতন্ত্র আমার জানা আছে, আর তার জোরেই আমার প্রতিষ্ঠা। আমি অবশ্য এটা নিয়ে কোনোদিনই নিজেকে উত্তেজিত হতে দিইনি। আমার মধ্যে যে একটা ঋষিসুলভ স্থৈর্য ও সংযম আছে সেটা আমি জানি। এককথায় আমি মাথা-ঠান্ডা মানুষ। পশ্চিমে এমন অনেক জ্ঞানী-গুণী-গবেষকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, যাঁরা কথায়-কথায় টেবিল চাপড়ান, বা টেবিলের অভাবে নিজেদের হাঁটু। জার্মানির এক জীবরাসায়নিক ডঃ হেলব্রোনার একবার তাঁর এক নতুন আবিষ্কারের কথা বলতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে আমার কাঁধে এমন এক চপেটাঘাত করেছিলেন যে, যন্ত্রণায় আমাকে আর্তনাদ করে উঠতে হয়েছিল।

যাই হোক, এই প্রবন্ধে একটা জিনিস বুঝিয়ে বলার সুযোগ পাচ্ছি : সেটা হল—আমার আবিষ্কার-

গুলো কেন আমি সারা পৃথিবীর ব্যবহারার্থে ছাড়িয়ে দিইনি। তার কারণ আর কিছুই না—আমার তৈরি জিনিসগুলোর মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে শক্তিশালী বা হিতসাধক—যেমন অ্যানাইহিলিন পিস্তল বা মিরাকিউরল ওষুধ বা অমনিস্কোপ বা মাইক্রোসোনোগ্রাফ, বা স্মৃতি-উদ্ঘাটক যন্ত্র রিমেমব্রেন—এর কোনোটাই কারখানায় তৈরি করা যায় না। এগুলো সবই মানুষের হাতের কাজ, এবং সে-মানুষও একটি বৈ আর দ্বিতীয় নেই। তিনি হলেন ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু।

আজ ভোরে যথারীতি উশ্রীর ধারে বেরিয়ে বাড়ি ফিরে কফি খেয়ে আমার লেখাপড়ার ঘরে বসে আমার পঞ্চাশ-বছর-ব্যবহার-করা ওয়াটারম্যান ফাউনটেন পেনটাতে কালি ভরে লেখা শুরু করতে যাব, এমন সময় আমার চাকর প্রহ্লাদ এসে বলল একটি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

"কোন্ দেশীয়?" প্রশ্ন করলাম আমি। স্বাভাবিক প্রশ্ন, কারণ পৃথিবীর খুব কম দেশই আছে, যেখানকার গুণী-জ্ঞানীর কেউ-না-কেউ কোনোদিন-না-কোনোদিন এই গিরিডিতে আমার বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেননি। তিন সপ্তাহ আগে লিথুয়ানিয়া থেকে এসেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত পতঙ্গ-বিজ্ঞানী প্রোফেসর জাবলনস্কিস।

"তা তো জিজ্ঞাসা করিনি," বলল প্রহ্লাদ, "তবে ধুতি দেখলাম, আর খদ্দরের পাঞ্জাবি, আর কথা তো বললেন বাংলাতেই।"

"কী বললেন?" কথাটা অপ্রীতিকর শোনালেও স্বীকার করতেই হবে যে, মামুলি লোকের সঙ্গে মামুলি খেজুরে আলাপের সময় নেই আমার।

"বললেন কি, তোমার বাবুকে বলো কিসমিসের লেখাটা একটু বন্ধ করে যদি দশ মিনিট সময় দেন। কী যেন বলার আছে।"

কিসমিস? তার মানে কি কসমস? কিন্তু তা কী করে হয়? আমি যে কসমস পত্রিকার জন্য লিখছি, সে-কথা তো এখানে কেউ জানে না!

উঠে পড়লাম লেখা ছেড়ে। কিসমিস-রহস্য ভেদ না করে শান্তি নেই।

বসবার ঘরে ঢুকে যাঁকে দু হাতের মুঠোয় ধুতির কোঁচা ধরে সোফার এক পাশে জবুথবু হয়ে বসে থাকতে দেখলাম, তেমন নিরীহ মানুষ আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। যদিও প্রথম চাহনির পর দ্বিতীয়তে লক্ষ করা যায় এঁর চোখের মণির বিশেষত্বটা: এঁর মধ্যে যেটুকু প্রাণশক্তি আছে, তার সবটুকুই যেন ওই মণিতে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

"নমস্কার তিলুবাবু!" কোঁচার ডগা সমেত হাত দুটো মুঠো অবস্থায় চলে এল ভদ্রলোকের থুতনির কাছে। —"কসমসের লেখাটা বন্ধ করলাম বলে মার্জনা চাইছি। আপনার সঙ্গে সামান্য কয়েকটা কথা বলার প্রবল বাসনা নিয়ে এসেছি আমি। আমি জানি আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।"

শুধু কসমস নয়, তিলু-নামটা ব্যবহার করাটাও একটা প্রচন্ড বিস্ময়-উদ্রেককারী ব্যাপার। ষাট বছর আগে আমার বাবা শেষ আমায় ডেকেছেন ওই নামে। তার পরে ডাকনামটার আর কোনো প্রয়োজন হয়নি।

"অধমের নাম শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস।"

আমার বিস্ময় কাটেনি, তাই ভদ্রলোকই কথা বলে চলেছেন।

"মাকড়দায় থাকি; কদিন থেকেই আপনাকে দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। অবিশ্যি সে-দেখা আর এ-দেখা এক জিনিস নয়।"

"আমাকে দেখতে পাচ্ছেন মানে?" আমি প্রশ্ন করতে বাধ্য হলাম।

"এটা মাস দেড়েক হল আরম্ভ হয়েছে। অন্য জায়গার লোক, অন্য জায়গার ঘটনা, এইসব হঠাৎ চোখের সামনে দেখি। সব সময় খুব স্পষ্ট নয়, তাও দেখি। আপনার নাম শুনেছি, ছবিও দেখেছি কাগজে। সেদিন আপনার চেহারাটা মনে করতেই দেখি আপনি এসে হাজির।"

"এ জিনিস দেড় মাস থেকে হচ্ছে আপনার?"

"হ্যাঁ। তা দেড় মাসই হবে। খুব জল হচ্ছিল সেদিন, আর তার সঙ্গে মেঘের ডাক। দুপুর বেলা। দাওয়ায় বসে গোলা তেঁতুলের আচার খাচ্ছি, হঠাৎ দেখি সামনে বিশ হাত দূরে মিত্তিরদের বাড়ির ভেরেন্ডা গাছের পিছন দিকে একটা আগুনের গোলার মতো কী যেন শূন্যে ঘোরাফেরা করছে। বললে বিশ্বাস করবেন না, তিলুবাবু, গোলাটা এল ঠিক আমারই দিকে। যেন একটি জ্যোতির্ময় ফুটবল। উঠোনে তুলসীর কাছ অবধি আসতে দেখেছি এটা মনে আছে, তারপর আর মনে নেই। জ্ঞান যখন হল তখন জল থেমে গেছে। আমি ছিলাম তক্তপোশে; তিনটে বেড়ালছানা খেলা করছিল উঠোনে, দাওয়ার ঠিক সামনেই। সে-তিনটে মরে গেছে। অথচ আমার গায়ে আঁচড়টি নেই। আমাদের বাড়ির পিছনে একটা মাদার গাছ আর একটা কতবেল গাছ ছিল, দুটোই পুড়ে ঝামা।"

"আর বাড়ির অন্য লোক?"

"ঠাকুমা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। ছোট ভাই ছিল ইস্কুলে; সে মাকড়দা প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টার। মা নেই; বাবা ছিলেন ননী ঘোষের বাড়ি, দাবার আড্ডায়। ঠাকুমার অসুখ। খাটে শুয়ে ছিলেন পিছন দিকের ঘরে, তাঁর কিচ্ছু হয়নি।"

বর্ণনা শুনে মনে হল 'বল লাইটনিং'-এর কথা বলছেন ভদ্রলোক। ক্বচিৎ কদাচিৎ এ ধরনের বিদ্যুতের কথা শোনা যায়, যেটা ঠিক বলেরই আকার ধরে কিছুক্ষণ শূন্য দিয়ে ভেসে বেড়িয়ে হঠাৎ এক্সপ্লোড করে। সে-বিদ্যুৎ একটা মানুষের কাছ দিয়ে যাবার ফলে যদি দেখা যায় যে, সে-মানুষের মধ্যে একটা বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে গেছে, তাহলে বলার কিছু নেই। কাছাকাছি বাজ পড়ে কালা কানে শুনেছে, অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে, এমন খবরও কাগজে পড়েছি। প্রশ্ন হচ্ছে, এই ভদ্রলোকের শক্তির দৌড় কতদূর।

প্রশ্নটা করার আগেই উত্তরের খানিকটা আভাস পেয়ে গেলাম।

নকুড়বাবু হঠাৎ বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, "থ্রি এইট এইট এইট নাইন ওয়ান সেভেন ওয়ান।" দেখলাম তিনি চেয়ে রয়েছেন সামনে টেবিলের উপর রাখা আমেরিকান সাপ্তাহিক 'টাইম'-এর মলাটের দিকে। মলাটে যাঁর ছবি রয়েছে তিনি হলেন মার্কিন ক্রোড়পতি পেট্রস সারাকিসিয়ান। ছবির দিকে চেয়েই নকুড়বাবু বলে চলেছেন, "সাহেবের ঘরে একটা সিন্দুক দেখতে পাচ্ছি—খাটের ডান পাশে—ক্রম্বলি কোম্পানির তৈরি—

ভিতরে টাকা—বান্ডিল-বান্ডিল একশো ডলারের নোট...”

“আর আপনি যে-নম্বরটা বললেন, সেটা কী?”

“ওটা সিন্দুকটা খোলার নম্বর। ডালার গায়ে একটা দাঁত-কাটা চাকার মতো জিনিস, আর সেটাকে ঘিরে খোদাই করা এক থেকে নয় অবধি নম্বর। চাকাটা এদিকে-ওদিকে ঘোরে। নম্বর মিলিয়ে ঘোরালেই খুলে যাবে সিন্দুক।”

কথাটা বলে হঠাৎ একটা ভীষণ কুণ্ঠার ভাব করে ভদ্রলোক বললেন, “অপরাধ নেবেন না তিলুবাবু। এসব কথা আপনার মতো ব্যস্ত মানুষের কাছে বলতে আসা মানেই আপনার মূল্যবান সময়—”

“মোটেই না,” আমি বাধা দিয়ে বললাম। “আপনার মতো ক্ষমতা একটা দুর্লভ ব্যাপার। আপনার সাক্ষাৎ পাওয়াটা একজন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের কথা। আমি শুধু জানতে চাই—”

“আমি বলছি আপনাকে। আপনি জানতে চাইছেন ‘বল লাইটনিং’-এর সংস্পর্শে এসে আমার মধ্যে আর কী কী বিশেষ ক্ষমতা দেখা দিয়েছে, এই তো?”

নির্ভুল অনুমান। বললাম, “ঠিক তাই।”

নকুড়বাবু বললেন, “মুশকিল হচ্ছে কী জানেন? এগুলোকে তো আর বিশেষ ক্ষমতা বলে ভাবতে পারি না আমি! মানুষ যে হাসে বা কাঁদে বা হাই তোলে বা নাক ডাকায়—এগুলোকে কি আর মানুষ বিশেষ ক্ষমতা বলে মনে করে? এ তো নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই স্বাভাবিক। আমিও যা করছি সেগুলো বিশেষ ক্ষমতা ভেবে করছি না। যেমন ধরুন আপনার ওই টেবিলটা। ওটার ওপর কী রয়েছে বলুন তো?”

আমি ভদ্রলোকের ইঙ্গিত অনুসরণ করে আমার ঘরের কোণে রাখা কাশ্মিরী টেবিলটার দিকে দেখলাম।

টেবিলের উপর একটা জিনিস রয়েছে যেটা এর আগে কোনোদিন দেখিনি। সেটা একটা পিতলের মূর্তি —যদিও খুব স্পষ্ট নয়। যেন একটা স্পন্দনের ভাব, একটা স্বচ্ছতা, রয়েছে মূর্তিটার মধ্যে। দেখতে-দেখতেই মূর্তিটা মিলিয়ে গেল।

“কী দেখলেন?”

“একটা পিতলের ধ্যানী-বুদ্ধমূর্তি। তবে ঠিক নিরেট নয়।”

“ওই ত বললুম। এখনো ঠিক রপ্ত হয়নি ব্যাপারটা। মূর্তিটা রয়েছে আমাদের উকিল শিবরতন মল্লিকের বাড়ির বৈঠকখানায়। একবার দেখেছিলুম। এখনকার মতো আপনার ওই টেবিলে আছে বলে কল্পনা করলুম, কিন্তু পুরোপুরি এল না।”

আমি মনে-মনে বলছিলাম, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো জাদুকর (একমাত্র চীনে জাদুকর চী চিং ছাড়া) আমাকে হিপনোটাইজ করতে পারেনি। ইনি কিন্তু অনেকটা সমর্থ হয়েছেন। এও একরকম সম্মোহন বই কী! নকুড় বিশ্বাসের একাধিক ক্ষমতার মধ্যে এটাও একটা। হিপনোটিজম, টেলিপ্যাথি, ক্লেয়ারভয়েন্স বা অলোকদৃষ্টি—এ সব কটা ক্ষমতাই দেখছি একসঙ্গে পেয়ে গেছেন ভদ্রলোক।

“শিবরতনবাবুর কাছেই আপনার কথা প্রথম শুনি,” বললেন নকুড়বাবু। “তাই ভাবলুম একবার গিরিডিটা হয়ে আসি। আপনার দর্শনটাও হয়ে যাবে, আর সেই সঙ্গে একটা ব্যাপারে আপনাকে একটু সাবধানও করে দিতে পারব।”

“সাবধান?”

“আজ্ঞে কিছু মনে করবেন না, তিলুবাবু, ধৃষ্টতা মাপ করবেন; আমি জানি আপনি তো শুধু আমাদের দেশের লোক নন; সারা বিশ্বে আপনার সম্মান, পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই আপনার ডাক পড়ে, আর আপনাকে সে সব ডাকে সাড়াও দিতে হয়। কিন্তু সাও পাউলোর ব্যাপারটাতে গেলে আপনাকে বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকতে অনুরোধ করি।”

সাও পাউলো হল ব্রেজিলের সব চেয়ে বড় শহর। সেখান থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো ডাক আসেনি আমার। বললাম, “সাও পাউলোতে কী ব্যাপার?”

“আজ্ঞে সেটা এখনো ঠিক বলতে পারলাম না। ব্যাপারটা এখনো ঠিক স্পষ্ট নয় আমার কাছে। সত্যি বলতে কী, সাও পাউলো যে কোথায় তাও আমি জানি না। হঠাৎ চোখের সামনে দেখতে পেলুম একটা লম্বা সাদা খাম, তার উপর টাইপ করা আপনার নাম ও ঠিকানা, খামের এক কোণে একটা নতুন ডাকটিকিট, তার উপর একটা ছাপ পড়ল—‘সাও পাউলো’—আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার বুকটা কেঁপে উঠল। আর তার পরমুহূর্তেই দেখলুম একটা সুদৃশ্য কামরা, তাতে এক বিশালবপু বিদেশী ভদ্রলোক আপনার দিকে চেয়ে বসে আছেন। লোকটিকে দেখে মোটেই ভাল লাগল না।”

দশ মিনিট হয়ে গেছে দেখেই বোধহয় ভদ্রলোক উঠে পড়ছিলেন, আমি বসতে বললাম। অন্তত এক কাপ কফি না খাইয়ে ছাড়া যায় না ভদ্রলোককে। তাছাড়া ভবিষ্যতে এঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার কী উপায় সেটাও জানা দরকার।

ভদ্রলোক রীতিমতো সঙ্কোচের সঙ্গে আধা-ওঠা অবস্থা থেকে বসে পড়লেন। বললাম, “আপনি উঠেছেন কোথায়?”

“আজ্ঞে, উঠেছি মনোরমা হোটেলে।”

“থাকবেন কদিন?”

“যে কাজের জন্য আসা সে কাজ তো হয়ে গেল, কাজেই...”

“কিন্তু আপনার ঠিকানাটা যে জানা দরকার।”

লজ্জায় ভদ্রলোকের ঘাড় বেঁকে গেল। সেই অবস্থাতেই বললেন, “আমার ঠিকানা আপনি চাইছেন এ তো বিশ্বাসই করতে পারছি না।”

এবার ভদ্রলোককে একটু কড়া করেই বলতে হল যে তাঁর বিনয়টা একটু আদিখ্যেতার মতো হয়ে যাচ্ছে। বললাম, “আপনি জেনে রাখুন যে, আপনার সঙ্গে মাত্র দশ মিনিটের পরিচয়ের পর একেবারে যোগবিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াটা যে-কোনো বৈজ্ঞানিকের পক্ষেই একটা আপসোসের কারণ হতে পারে।”

“আপনি কেয়ার অফ হরগোপাল বিশ্বাস, মাকড়দা দিলেই আমি চিঠি পেয়ে-যাব। আমার বাবাকে ওখানে সবাই চেনে।”

“আপনি বিদেশ যাবার সুযোগ পেলে যাবেন?”

প্রশ্নটা কিছুক্ষণ থেকেই মাথায় ঘুরছিল। সেটার কারণ আর কিছুই না—অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা বা ঘটনা সম্পর্কে পশ্চিমে অনেক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একটা হেসে উড়িয়ে দেবার ভাব লক্ষ করেছি। শ্রীমান নকুড় বিশ্বাসকে একবার তাদের সামনে নিয়ে ফেলতে পারলে মন্দ হত না। আমি নিজে অবিশ্যি কোনোদিনই এই

সন্দেহবাদীদের দলে নই। নকুড়বাবুর এই ক্ষমতা আমি মোটেই অবজ্ঞা বা অবিশ্বাসের চোখে দেখি না। মানুষের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে আমরা এখনো স্পষ্টভাবে কিছুই জানি না। আমার ঠাকুরদা বটুকেশ্বর ছিলেন শ্রুতিধর। একবার শুনলে বা পড়লেই একটা গোটা কাব্য তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। অথচ তিনি পুরোদস্তুর সংসারী লোক ছিলেন ; এমন না যে, দিনরাত কেবল পড়াশুনা বা ধর্মকর্ম নিয়ে থাকতেন। এটা কী করে সম্ভব হয় সেটা কি পশ্চিমের কোনো বৈজ্ঞানিক সঠিক বলতে পারে? পারে না, কারণ তারা এখনো মস্তিষ্কের অর্ধেক রহস্যই উদ্ঘাটন করতে পারেনি।

কিন্তু আমার প্রশ্ন শুনে নকুড়বাবু এমন ভাব করলেন যেন আমি উন্মাদের মতো কিছু বলে ফেলেছি।

"আমি বিদেশ যাব?" চোখ কপালে তুলে বললেন নকুড়বাবু। "কী বলছেন আপনি তিলুবাবু? আর যদি বা ইচ্ছেই থাকত, আমার মতো লোকের পক্ষে সেটা সম্ভবই বা হত কী করে?"

আমি বললাম, "বাইরের অনেক বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানই কোনো বিজ্ঞানী-সম্মেলনে কাউকে আমন্ত্রণ জানালে তাঁকে দুটো প্লেনের টিকিট দিয়ে থাকেন, এবং সেখানে দুজনের থাকার খরচ বহন করে থাকেন। কেউ-কেউ নিয়ে যান স্ত্রীকে, কেউ বা সেক্রেটারিকে। আমি অবশ্য একাই গিয়ে থাকি, কিন্তু আপনি যেতে সম্মত হলে—"

নকুড়বাবু একসঙ্গে মাথা নেড়ে, জিভ কেটে আমার প্রস্তাবে ঘোর আপত্তি জানিয়ে উঠে পড়লেন।

"আপনি যে আমার কথাটা ভেবেছেন সেইটেই আমার অনেক পাওয়া। এর বেশি আর আমি কিছু চাই না।"

আমি কিছুটা ঠাট্টার সুরে বললাম, "যাই হোক, যদি আপনার দিব্যদৃষ্টিতে কোনোদিন আপনার বিদেশ যাবার সম্ভাবনা দেখতে পান, তাহলে আমাকে জানাবেন।"

নকুড়বাবু যেন আমার রসিকতাটা উপভোগ করেই
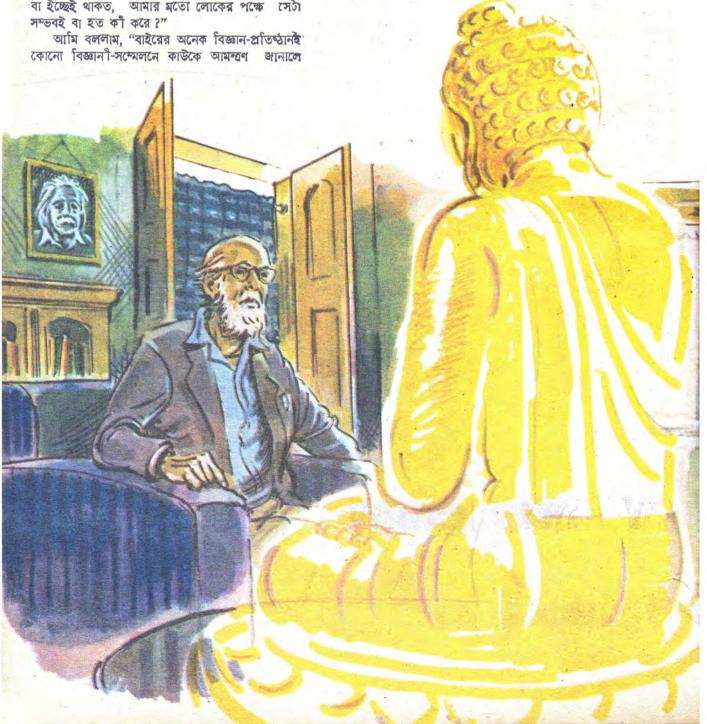
মৃদু হেসে দুহাতে কোঁচার গোছটা তুলে নিয়ে নমস্কার করে বললেন, "আমার প্রণাম রইল। নিউটনকে আমার আশীর্বাদ দেবেন।"

২১শে জুন

কসমস পত্রিকার জন্য প্রবন্ধটা কাল পাঠিয়ে দিলাম।

শ্রীমান নকুড়চন্দ্রের আর কোনো খবর পাইনি। সে নিজে না-দিলে আর কে দেবে খবর। আমার দিক থেকে খুব বেশি আগ্রহ দেখানোটাও ঠিক নয়, তাই ঠিকানা জানা সত্ত্বেও আমি তাকে চিঠি লিখিনি। অবিশ্যি ইতিমধ্যে আমার দুই বন্ধু সন্ডার্স ও ক্রোলকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছি। তারা দুজনেই গভীর কৌতূহল প্রকাশ করেছে। ক্রোল বলছে, নকুড় বিশ্বাসকে ইউরোপে নিয়ে গিয়ে ডিমনস্ট্রেশনের জন্য খরচ সংগ্রহ করতে কোনো অসুবিধা হবে না। এমন কী, টেলিভিশন প্রোগ্রাম ইত্যাদির জোরে নকুড় বিশ্বাস বেশ কিছু টাকা হাতে নিয়ে দেশে ফিরতে পারবে। আমি জানিয়ে দিয়েছি, মাকড়দাবাসীর কাছ থেকে উৎসাহের কোনো ইঙ্গিত পেলেই জানাব।

২৪শে জুলাই

গত একমাসে আমার প্রবন্ধটা সম্পর্কে একশো সাতাত্তরটা চিঠি পেয়েছি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে। সবই অভিনন্দনসূচক। তার মধ্যে একটি চিঠি হল এক বিরাট মার্কিন কেমিক্যাল কর্পোরেশনের মালিক সলোমন ব্লুমগার্টেনের কাছ থেকে। তিনি জানিয়েছেন যে, আমার অন্তত তিনটি আবিষ্কারের পেটেন্টস্বত্ব তিনি কিনতে রাজি আছেন। তার জন্য তিনি আমাকে পঁচাত্তর হাজার ডলার দিতে প্রস্তুত। আবিষ্কার তিনটি হল অ্যানাইহিলিন পিস্তল, মিরাকিউরল বড়ি ও অমনিস্কোপ যন্ত্র। যদিও আমি প্রবন্ধে লিখেছিলাম যে, এসব জিনিস কারখানায় তৈরি করা যায় না, সে-কথাটা ব্লুমগার্টেন মানতে রাজি নন। তাঁর ধারণা, একজন মানুষ নিজে হাতে যেটা তৈরি করতে পারে, যন্ত্রের সাহায্যে সেটা তৈরি না-করতে পারার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। এসব ব্যাপারে চিঠি মারফত তর্ক করা বৃথা ঃ তাই আমি জানিয়ে দিয়েছি যে, ব্যক্তিগত কারণে আমি পেটেন্ট রাইটস বিক্রি করতে রাজি নই।
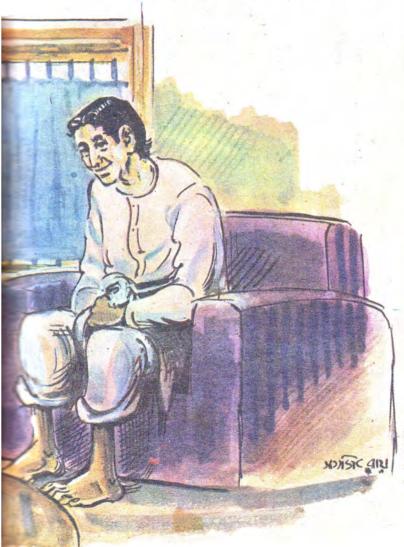
পঁচাত্তর হাজার ডলারেও আমার লোভ লাগল না দেখে সাহেবের না জানি কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

১৭ই আগস্ট

আজ এক অপ্রত্যাশিত চিঠি। লিখছেন শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস। চিঠির ভাব ও ভাষা দুইই অপ্রত্যাশিত। তাই সেটা তুলে দিচ্ছি—

শ্রীত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু মহাশয়ের শ্রীচরণে শতকোটি প্রণামপূর্বক নিবেদনমিদং—

> মহাশয়,
>
> অধমকে যে আপনি স্মরণে রাখিয়াছেন সে-বিষয়ে অবগত আছি। অবিলম্বে সাও পাউলো হইতে আমন্ত্রণ আপনার হস্তগত হইবে। আপনি সঙ্গত কারণেই উক্ত আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না। আপনার স্মরণে থাকিবে যে, আপনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন আপনার দাসানুদাস সেক্রেটারির রূপে আপনার সহিত বিদেশ গমনের জন্য। তৎকালে সম্মত হই নাই, কিন্তু স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর ক্রমে উপলব্ধি করিয়াছি যে, সাও পাউলোতে আপনার পার্শ্বে উপস্থিত না থাকিলে আপনার সমূহ বিপদ। আমি গত কয়েকমাস অক্লান্ত পরিশ্রমে পিটম্যান পদ্ধতিতে শর্টহ্যান্ড বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি। উপরন্তু এটিকেট সম্পর্কে কতিপয় পুস্তক পাঠ করিয়া পাশ্চাত্ত্য আদবকায়দা কিছুটা আয়ত্ত করিয়াছি। অতএব আপনি আমাকে আপনার অনুচর রূপে সঙ্গে লইবার ব্যাপারে কী স্থির করেন তাহা পত্রপাঠ জানাইলে বাধিত হইব। আপনি ভারতের তথা বিশ্বের গৌরব। সর্বোপরি আপনি বঙ্গসন্তান। আপনার দীর্ঘ, রোগমুক্ত, নিঃসংকট জীবন আমাদের সকলেরই কাম্য। ইতি।
>
> সেবক শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে— আমার সঙ্গে বাইরে যাবার ব্যাপারে হঠাৎ মত পরিবর্তনের কারণ যেটা বলছেন নকুড়বাবু, সেটা কি সত্যি? নাকি এর মধ্যে কোনো গূঢ় অভিসন্ধি আছে? ভদ্রলোক কি আসলে গভীর জলের মাছ? চিঠির ভাব ও ভাষা কি আসলে আদিখ্যেতা?

লোকটার মধ্যে সত্যিই কতকগুলো আশ্চর্য ক্ষমতা আছে বলে এই প্রশ্নগুলো আসছে। অবিশ্যি এখন এ-বিষয়ে ভেবে লাভ নেই। আগে নেমন্তন্নটা আসে কিনা দেখা যাক, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

৩রা সেপ্টেম্বর

নকুড়বাবু আবার অবাক করলেন। নেমন্তন্ন এসে গেছে। আরো অবাক হয়েছি এই কারণে যে, এ-নেমন্তন্ন সত্যিই ঠেলা যাবে না। সাও পাউলোর বিখ্যাত রাটানটান ইনস্টিটিউট একটা তিনদিনব্যাপী বিজ্ঞান সম্মেলনের আয়োজন করেছেন, যেখানে বক্তৃতা, আলোচনা-সভা ইত্যাদি তো হবেই, তাছাড়া সম্মেলনের শেষ দিনে ইনস্টিটিউট আমাকে ডক্টরেট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করবে। কসমসের প্রবন্ধই আসলে নতুন করে আমার খ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছে বিজ্ঞানের জগতে। সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ যে শুধু আমার উপস্থিতি প্রার্থনা করেছেন তা নয়, আমার সব কটি ইনভেনশন এবং সেই সঙ্গে সেই সংক্রান্ত আমার গবেষণার কাগজপত্রের একটি প্রদর্শনী করবেন বলে প্রস্তাব করেছেন। এ ব্যাপারে দিল্লির ব্রেজিলীয় এমব্যাসির সঙ্গে ভারত সরকার সবরকম সহায়তা করতে প্রস্তুত আছেন বলে জানিয়েছেন। ইনস্টিটিউট জানিয়েছেন যে, তাঁদের আতিথেয়তা তিন দিনেই ফুরিয়ে যাচ্ছে না, অন্তত আরো সাতদিন থেকে যাতে আমি ব্রেজিল ঘুরে দেখতে পারি সে-ব্যবস্থাও কর্তৃপক্ষ করবেন। দুজনের জন্য থাকার এবং যাতায়াতের খরচ তাঁরা বহন করবেন।

আমি যাব বলে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি, আর এও জানিয়ে দিয়েছি যে, আমার সঙ্গে থাকবেন আমার সেক্রেটারি মিঃ এন সি বিসওয়াস।

মাকড়দাতেও অবিশ্যি চিঠি চলে গেছে। কনফারেন্স শুরু হচ্ছে ১০ই অক্টোবর। এই একমাসের মধ্যে সব ব্যবস্থা করে ফেলতে পারব বলে মনে হয়।

সন্ডার্স ও ক্রোলকে খবরটা দিয়ে দিয়েছি। লব্ধ-প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক হিসাবে দুজনেই সাও পাউলোতে আমন্ত্রিত হবেন বলে আমার বিশ্বাস, তবে নকুড়বাবুর খবরটা জানিয়ে দেওয়া দরকার ছিল। তাকে নিয়ে এ যাত্রা বিশেষ মাতামাতি করা যাবে না সেটাও জানিয়ে দিয়েছি। ক্রোল নিজে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট কৌতুহলী ও ওয়াকিবহাল। হোটেলের ঘরে বসে বিশেষ করে তাঁর জন্য সামান্য ডিমনস্ট্রেশন দিতে নকুড়বাবুর নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না।

আমার আসন্ন বিপদের কথাটা সত্যি কি মিথ্যে জানি না। আমার মনে-মনে একটা সন্দেহ হচ্ছে যে, নকুড়বাবু নিখরচায় বিদেশ দেখার লোভটা সামলাতে পারেননি। আমি লিখেছি তিনি যেন রওনা হবার অন্তত তিনদিন আগে আমার কাছে চলে আসেন। তাঁর আদবকায়দার দৌড় কতটা সেটা একবার দেখে নেওয়া দরকার। ভাষা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। ইংরিজিটা মনে হয় ভদ্রলোক একরকম নিজেই চালিয়ে নিতে পারবেন; আর, কোনো বিশেষ অবস্থায় যদি ব্রেজিলের ভাষা পর্তুগীজ বলার প্রয়োজন হয়, তার জন্য তো আমিই আছি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে পর্তুগীজদের ভূমিকার কথা মনে করে আমি এগারো বছর বয়সে গিরিডির পর্তুগীজ পাদরি ফাদার রেবেলোর কাছ থেকে ভাষাটা শিখে নিয়েছিলাম।

২রা অক্টোবর

আজ নকুড়বাবু এসেছেন। এই ক'মাসে ভদ্রলোকের চেহারায় বেশ একটা উন্নতি লক্ষ করছি। বললেন যোগব্যায়ামের ফল। ইতিমধ্যে কলকাতায় গিয়ে ভদ্রলোক দুটো সুট করিয়ে এনেছেন, সেই সঙ্গে শার্ট-টাই-জুতো-মোজা ইত্যাদিও যোগাড় হয়েছে। দাঁতনের অভ্যাস বলে টুথপেস্ট টুথব্রাশ কিনতে হয়েছে। স্যুটকেস যেটা এনেছেন সেটা নাকি আসলে উকিল শিবরতন মল্লিকের। সেটি যে এনার কাছে কী করে এল সেটা আর জিগ্যেস করলাম না।

"ব্রেজিলের জঙ্গল দেখতে যাবেন না?" আজ দুপুরে খাবার সময় প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক। আমি বললাম, "সাতদিন তো ঘুরিয়ে দেখাবে বলেছে; তার মধ্যে অরণ্য কি আর একেবারে বাদ পড়বে?"

নকুড়বাবু বললেন, "আমাদের শ্রীগুরু লাইব্রেরিতে খোঁজ করে বরদা বাঁড়ুজ্যের লেখা ছবিটবি দেওয়া একটা পুরনো বই পেলাম ব্রেজিল সম্বন্ধে। তাতে লিখেছে ওখানকার জঙ্গলের কথা, আর লিখেছে সেই জঙ্গলে একরকম সাপ আছে যা নাকি লম্বায় আমাদের অজগরের ডবল।"

মোটকথা ভদ্রলোক বেশ খোশমেজাজে আছেন। এখনো পর্যন্ত কোনো নতুন ক্ষমতার পরিচয় দেননি। সত্যি বলতে কী, সে-প্রসঙ্গ আর উত্থাপনই করেননি।

ক্রোল ও সন্ডার্স দুজনেই সাও পাউলো যাচ্ছে বলে লিখেছে। বলা বাহুল্য দুজনেই নকুড়বাবুকে দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

১০ই অক্টোবর, সাও পাউলো, রাত সাড়ে এগারোটা

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে, কনফারেন্সের কর্ণধার প্রোফেসর রডরিগেজের বাড়িতে ডিনার খেয়ে আধ ঘন্টা হল ফিরেছি হোটেলে। শহরের প্রান্তে সমুদ্রের ধারে পৃথিবীর বহু বিখ্যাত হোটেলকে হার মানানো এই গ্র্যান্ড হোটেল। আমন্ত্রিতরা সকলেই এখানে উঠেছেন। আমাকে দেওয়া হয়েছে একটি বিশাল সুসজ্জিত 'সুইট'—নম্বর ৭৭৭। আমার সেক্রেটারি নকুড় বিশ্বাস একই তলায় আছেন ৭১২ নং সিঙ্গল রুমে।

এখানকার কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে ক্রোল ও সন্ডার্সও গিয়েছিল এয়ারপোর্টে আমাকে রিসীভ করতে। সেখানেই নকুড়বাবুর সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দিই। ক্রোলের সঙ্গে পরিচয় হতেই নকুড়বাবু জার্মান ভদ্রলোকটির দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বললেন, "আলপস—বাভারিয়ান আলপস—নাইনটীন থার্টি টু—ইউ অ্যান্ড টু ইয়ং মেন ক্লাইম্বিং, ক্লাইম্বিং, ক্লাইম্বিং—দেন স্লিপিং, স্লিপিং, স্লিপিং—দেন—উফ্‌ফ্—ভেরি ব্যাড!"

ক্রোল দেখি মুখ হাঁ করে সম্মোহিতের মতো চেয়ে আছে নকুড়বাবুর দিকে। তারপর আর থাকতে না পেরে জার্মান ভাষাতেই চেঁচিয়ে উঠল—"আমার পা হড়কে গিয়েছিল। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে হারম্যান ও কার্ল

দুজনেরই প্রাণ যায়!"

কথাটা বাংলায় অনুবাদ করে দিতে নকুড়বাবুও বাংলায় বললেন, "দৃশ্যটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। বলতে চাইনি। বড় মর্মান্তিক ঘটনা ওঁর জীবনের।"

বলা বাহুল্য, ক্রোলকে আমার আর মুখে কিছু বলতে হয়নি। আমি জানি সন্ডার্স এ-ধরনের ক্ষমতা সম্পর্কে বেশ খানিকটা সন্দেহ পোষণ করে। সে প্রথমে কোনো মন্তব্য করেনি; এয়ারপোর্ট থেকে ফেরার পথে গাড়িতে আমার পাশে বসে একবার শুধু জিগ্যেস করল, "ক্রোলের যুবা বয়সের এ-ঘটনাটা তুমি জানতে?"

আমি মাথা নেড়ে "না" বললাম।

এর পরে আর এ নিয়ে কোনো কথা হয়নি।

আজ ডিনারে প্রোঃ রোডরিগেজের সেক্রেটারি মিঃ লোবোর সঙ্গে আলাপ হল। এখানকার অনেকেরই গায়ের রং যাকে বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, আর চোখের মণি এবং মাথার চুল কালো। মিঃ লোবোও এর ব্যতিক্রম নন। বেশ চালাক-চতুর ভদ্রলোক। ইংরিজিটাও মোটামুটি ভাল জানেন, ঘন্টাখানেকের আলাপেই আমাদের সঙ্গে বেশ মিশে গেছেন। তাঁকে বললাম যে, আমাদের খুব ইচ্ছে কনফারেন্সের পর ব্রেজিলের জঙ্গলের কিছুটা অংশ ঘুরে দেখা। "নিশ্চয়, নিশ্চয়!" বললেন মিঃ লোবো, যদিও বলার ঢঙে কোথায় যেন একটা কৃত্রিমতার আভাস পেলাম। আসলে এঁরা হয়ত চাইছেন অতিথিদের ব্রেজিলের আধুনিক সভ্যতার নিদর্শনগুলি দেখাতে।

আজ আলোচনা-সভায় আমি ইংরাজিতে বক্তৃতা করেছিলাম। আমার সেক্রেটারি সে-বক্তৃতার সম্পূর্ণটাই শর্টহ্যান্ডে লিখে রেখেছেন। আমি জানি আজকের দিনে টেপ রেকর্ডারের সাহায্যে বক্তৃতা তুলে রাখাটাই সবচেয়ে সহজ ও নির্ভরযোগ্য উপায়; কিন্তু নকুড়বাবু এত কষ্ট করে পিটম্যান শিখে এসেছেন, তাই মনে হল তাঁকে সেটার সদ্ব্যবহার করতে দেওয়াটাই ভাল।

আমার আবিষ্কার ও সেই সংক্রান্ত গবেষণার কাগজপত্রের প্রদর্শনীও আজই খুলল। যে-সব জিনিস এতকাল গিরিডিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে আমার আলমারির মধ্যে পড়ে ছিল, সেগুলো হঠাৎ আজ পৃথিবীর বিপরীত গোলার্ধে ব্রেজিলের শহরের প্রকাশ্য প্রদর্শনীতে দেখতে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল। সত্যি বলতে কী, একটু যে ভয়ও করছিল না তা নয়, যদিও ব্রেজিল সরকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন ভালই। প্রদর্শনীর দরজার বাইরে এবং রাটানটান ইনস্টিটিউটের ফটকের বাইরে সশস্ত্র পুলিস। কাজেই ভয়ের কারণ নেই।

১২ই অক্টোবর, সকাল সাড়ে ছ'টা

গতকাল বেশ কয়েকটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেল।

কাল লাঞ্চের পর আমি আমার দুই বিদেশী বন্ধু ও সেক্রেটারি সমেত শহর দেখতে বেরিয়েছিলাম। কিছু কেনাকাটা সেরে বিকেলে হোটেলে ফিরে নকুড়বাবু তাঁর ঘরে চলে গেলেন। এটা লক্ষ করছি যে, ঠিক যতটুকু সময় আমার সঙ্গে না থাকলে নয়, তার এক মিনিটও বেশি থাকেন না ভদ্রলোক। ক্রোল আর সন্ডার্সও আমার ঘরে বসে কফি খেয়ে যে যার ঘরে চলে গেল; কথা হল স্নান করে এক ঘন্টার মধ্যে হোটেলের লবিতে জমায়েত হয়ে একসঙ্গে যাব এখানকার এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে।

ব্রেজিলের কফির তুলনা নেই, তাই আমি নিজের জন্যে সবে আর-এক পেয়ালা ঢেলেছি, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। হ্যালো বলাতে উলটো দিক থেকে বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন এল—

"ইজ দ্যাট প্রোফেসর শ্যাঙ্কু ?"

আমি জানালাম আমিই সেই ব্যক্তি।

"দিস ইজ সলোমন ব্লুমগার্টেন।"

নামটা মনে পড়ে গেল। ইনিই গিরিডিতে চিঠি লিখে আমার তিনটে আবিষ্কারের পেটেন্ট স্বত্ব কেনার প্রস্তাব করেছিলেন।

"চিনতে পেরেছ আমাকে ?" প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

"বিলক্ষণ।"

"একবার আসতে পারি কি ? আমি এই হোটেলের লবি থেকেই ফোন করছি।"

আমার মুশকিল হচ্ছে কি, এসব অবস্থায় সরাসরি কিছুতেই না বলতে পারি না, যদিও জানি এঁর সঙ্গে কথা বলে কোনো লাভ নেই। অগত্যা ভদ্রলোককে আসতেই বলতে হল।

মিনিট তিনেক পরে যিনি আমার ঘরে প্রবেশ করলেন, ঠিক তেমন একজন মানুষকে আর কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ভাগ্যে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই ঘরে; থাকলে সব দিক দিয়েই প্রমাণ সাইজের প্রায় দেড়া এই মানুষটির পাশে আমার মতো একজন মিনি-মানুষকে দেখে তিনি কখনই হাসি সংবরণ করতে পারতেন না।

দাঁড়ানো অবস্থায় এনার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব, তাই করমর্দনের ঠেলা কোনোমতে সামলে বললাম, "বসুন, মিঃ ব্লুমগার্টেন।"

"কল মি সল।"

চোখের সামনে থেকে পাহাড় সরে গেল। ভদ্রলোক আসন গ্রহণ করেছেন।

"কল মি সল," আবার বললেন ভদ্রলোক, "অ্যান্ড আইল কল ইউ শ্যাঙ্ক, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড।"

সল অ্যান্ড শ্যাঙ্ক। সলোমন ও শঙ্কু। এত চট-সৌহার্দ্যের প্রয়োজন কী জানি না, তবে এটা জানি যে এ-ধরনের প্রস্তাবে "হ্যাঁ" বলা ছাড়া গতি নেই। বললাম, "বলো, সল, কী করতে পারি তোমার জন্য।"

"তোমাকে তো বলেইছি চিঠিতে। সেই একই প্রস্তাব আবার করতে এসেছি আমি। আজ তোমার প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম। কিছু মনে কোরো না,—তোমার এইসব আশ্চর্য আবিষ্কার বিশ্বের কাছে গোপন রেখে তুমি অত্যন্ত স্বার্থপর কাজ করেছ।"

দানবাকৃতি মানুষটি বসে পড়াতে আমার স্বাভাবিক মনের জোর অনেকটা ফিরে এসেছে। বললাম, "তুমি কি মানব-কল্যাণের জন্য এতই ব্যগ্র ? আমার তো মনে হয় তুমি আবিষ্কারগুলোর ব্যবসার দিকটাই দেখছ, তাই নয় কি ?"

মুহূর্তের জন্য সলোমান ব্লুমগার্টেনের লোমশ ভুরু দুটো নীচে নেমে এসে চোখ দুটোকে প্রায় ঢেকে ফেলে আবার তখনই যথাস্থানে ফিরে গেল।

"আমি ব্যবসায়ী, শ্যাঙ্ক, তাই ব্যবসার দিকটা দেখব তাতে আশ্চর্যের কী ? কিন্তু তোমাকে বঞ্চিত করে তো নয় ! তোমাকে আমি এক লাখ ডলার দিতে প্রস্তুত আছি ওই তিনটি আবিষ্কারের স্বত্বের জন্য। চেক-বই আমার সঙ্গে আছে। নগদ টাকা চাও, তাও দিতে পারি—তবে এতগুলো টাকা সঙ্গে নিয়ে তোমারই অসুবিধা হবে।"

আমি মাথা নাড়লাম। চিঠিতে যে-কথা বলেছিলাম, সেটাই আবার বললাম, যে আমার এই জিনিসগুলো কোনোটাই মেশিনের সাহায্যে কারখানায় তৈরি করা সম্ভব নয়।

গভীর সন্দেহের দৃষ্টিতে ব্লুমগার্টেন চেয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ সটান আমার দিকে। তারপর গুরু-গম্ভীর স্বরে বললেন চারটি ইংরিজি শব্দ।

"আই ডোন্ট বিলীভ ইউ।"

"তাহলে আর কী করা যায় বলো !"

"আই ক্যান ডাবল মাই প্রাইস, শ্যাঙ্ক !"

কী মুশকিল ! লোকটাকে কী করে বোঝাই যে, আমি দিব্যি আছি, আমার আর টাকার দরকার নেই, এক লক্ষের জায়গায় বিশ লাখ পেলেও আমি স্বত্ব বিক্রি করব না।

ভদ্রলোক কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল।

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি আমার সেক্রেটারি।

"ইয়ে—" ভারী কিন্তু-কিন্তু ভাব করে ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে এলেন। —"কাল সকালের প্রোগ্রামটা— ?"

এইটুকু বলে ব্লুমগার্টেনের দিকে চোখ পড়াতে নকুড়বাবু হঠাৎ কথার খেই হারিয়ে ফেললেন।

ভারী অসোয়াস্তিকর পরিস্থিতি। ব্লুমগার্টেনকে হঠাৎ দেখলে অনেকেরই কথার খেই হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু নকুড়বাবু যেন শুধু হারাননি; সেই সঙ্গে কিছু যেন পেয়েওছেন তিনি।

"কালকের প্রোগ্রামের কথা জানতে চাইছিলেন কি ?"

পরিস্থিতিটাকে একটু সহজ করার জন্য প্রশ্নটা করলাম আমি।

প্রশ্নের উত্তরে যে-কথাটা নকুড়বাবুর মুখ দিয়ে বেরোল সেটা বর্তমান ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। ব্লুমগার্টেনের দিক থেকে চোখ না সরিয়েই ভদ্রলোক মৃদু স্বরে দুবার 'এল ডোরাডো' কথাটা উচ্চারণ করে কেমন যেন হতভম্ব ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

"হু ওয়াজ দ্যাট ম্যান ?"

আমি দরজা বন্ধ করার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রশ্নটা করলেন সলোমন ব্লুমগার্টেন।

আমি বললাম, "আমার সেক্রেটারি।"

"এল ডোরাডো কথাটা বলল কেন হঠাৎ?"

ব্লুমগার্টেনের ধাঁধালো ভাবটা আমার কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। বললাম, "দক্ষিণ আমেরিকা সম্বন্ধে পড়াশুনা করছেন ভদ্রলোক, কাজেই এল ডোরাডো নামটা জানা কিছুই আশ্চর্য নয়।"

সোনার শহর এল ডোরাডোর কিংবদন্তীর কথা কে না জানে? ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেন থেকে কোর্টেজের সৈন্য দক্ষিণ আমেরিকায় এসে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে জিতে এদেশে স্পেনের আধিপত্য বিস্তার করে। তখনই এখানকার উপজাতি-দের মুখে এল ডোরাডোর কথা শোনে স্পেনীয়রা। আর তখন থেকেই এ নাম চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে ধনলিপ্সু পর্যটকদের। ইংল্যান্ডের স্যার ওয়লটর র‍্যালে পর্যন্ত এল ডোরাডোর টানে নৌবহর নিয়ে হাজির হয়েছিলেন এই দেশে। কিন্তু এল ডোরাডো চিরকালই অন্বেষণকারীদের ফাঁকি দিয়ে এসেছে। পেরু বোলিভিয়া কোলোম্বিয়া ব্রেজিল আর্জেনটিনা দক্ষিণ আমেরিকার কোনো দেশেই এল ডোরাডোর কোনো সন্ধান মেলেনি।

ব্লুমগার্টেন হতবাক হয়ে টেবিল ল্যাম্পের দিকে চেয়ে রয়েছে দেখে আমি বাধ্য হয়েই বললাম, "আমাকে বেরোতে হবে একটু পরেই; কাজেই তোমার যদি আর কিছু বলার না থাকে তাহলে—"

"ভারতীয়রা তো জাদু জানে?" আমার কথা চাপা দিয়ে প্রশ্ন করল ব্লুমগার্টেন।

আমি হেসে বললাম, "তাই যদি হত, তাহলে ভারতে এত দারিদ্র্য থাকত কি? জাদু জানলেও নিজেদের অবস্থার উন্নতি করার জাদু তারা নিশ্চয়ই জানে না।"

"সে তো তোমাকে দিয়েই বুঝতে পারছি," ব্যঙ্গের সুরে বলল ব্লুমগার্টেন, "যে-দেশের লোক টাকা হাতে তুলে দিলেও সে-টাকা নেয় না, সে-দেশ গরিব থাকতে বাধ্য। কিন্তু..."

ব্লুমগার্টেন আবার চুপ, আবার অন্যমনস্ক। আমার আবার অসহায় ভাব; এ লোকটাকে তাড়ানোর রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না।

"জাদুর কথা বলছি এই কারণে," বলল ব্লুমগার্টেন, "আমার যে-মুহূর্তে এল ডোরাডোর কথাটা মনে হয়েছে, সেই মুহূর্তে নামটা কানে এল ওই ভদ্রলোকের মুখ থেকে। আজ থেকে দুশো বছর আগে আমার পূর্বপুরুষরা পর-পর তিন পুরুষ ধরে উত্তর আমেরিকা থেকে এদেশে পাড়ি দিয়েছে এল ডোরাডোর

সন্ধানে। আমি নিজে দুবার এসেছি যুবা-বয়সে। পেরু, বোলিভিয়া, গুইয়ানা, ইকুয়েডর, ভেনিজুয়েলা—কোনো দেশে খোঁজা বাদ দিইনি। শেষে ব্রেজিলে এসে জঙ্গলে ঘুরে ব্যারাম বাধিয়ে বাধ্য হয়ে এল ডোরাডোর মায়া ত্যাগ করে দেশে ফিরে যাই। আজ এতদিন পরে আবার ব্রেজিলে এসে কাল থেকে মাঝে-মাঝে এল ডোরাডোর কথাটা মনে পড়ে যাচ্ছে, আর আজ..."

আমি কোনো মন্তব্য করলাম না। ব্লুমগার্টেনও উঠে পড়ল। বলল, "আমি ম্যারিনা হোটেলে আছি। যদি মত পরিবর্তন করো তো আমাকে জানিও।"

ক্রোল আর সন্ডার্সকে ঘটনাটা বলতে তারা দুজনেই রেগে আগুন। সন্ডার্স বলল, "তুমি মানুষটা অতিরিক্ত রকম ভদ্র, তাই এইসব লোকের ঔদ্ধত্য হজম করো। এবার এলে আমাদের একটা ফোন করে দিও, আমরা এসে যা করার করব।"

এর পরের ঘটনাটা ঘটল মাঝরাত্তিরে। পরে ঘড়ি দেখে জেনেছিলাম তখন সোয়া দুটো। ঘুম ভাঙল কলিং বেলের শব্দে। বিদেশ-বিভুঁইয়ে এত রাত্তিরে আমার ঘরে কে আসতে পারে?

দরজা খুলে দেখি শ্রীমান নকুড় বিশ্বাস। ফ্যাকাসে মুখ, ত্রস্ত ভাব।

"অপরাধ নেবেন না তিলুবাবু, কিন্তু না এসে পারলাম না।"

ভদ্রলোকের চেহারাটা ভাল লাগছিল না, তাই বললাম, "আগে বসুন, তারপর কথা হবে।"

সোফায় বসেই নকুড়বাবু বললেন, "কপি হয়ে গেল।"

কপি? কিসের কপি? এত রাত্তিরে এসব কী বলতে এসেছেন ভদ্রলোক?

"যন্ত্রটার নাম জানি না," বলে চললেন নকুড়বাবু, "তবে চোখের সামনে দেখতে পেলাম। একটা বাক্সর মতো জিনিস, ভিতরে আলো জ্বলছে, ওপরে একটা কাচ। একটা কাগজ পুরে দেওয়া হল যন্ত্রে; তারপর একটা হাতল ঘোরাতেই কাগজের লেখা অন্য একটা কাগজে হুবহু নকল হয়ে বেরিয়ে এল।"

শুনে মনে হল ভদ্রলোক জীরক্স ডুপলিকেটিং যন্ত্রের কথা বলছেন। "কী কাগজ ছাপা হল?" প্রশ্ন করলাম আমি।

নকুড়বাবুর দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে। একটা আতঙ্কের ভাব দেখা দিয়েছে মুখে।

"কী ছাপা হল?" আবার জিগ্যেস করলাম।

নকুড়বাবু এবার মুখ তুলে চাইলেন আমার দিকে। সংশয়াকুল দৃষ্টি।

"আপনার আবিষ্কারের সব ফরমুলা," চাপা গলায় দৃষ্টি বিস্ফারিত করে বললেন নকুড়বাবু।

আমি না-হেসে পারলাম না।

"আপনি এই বলতে এসেছেন এত রাত্তিরে? আমার ফরমুলা প্রদর্শনীর ঘর থেকে বেরোবে কী করে? সে তো—"

"ব্যাঙ্ক থেকে টাকা চুরি হয় না? দলিল চুরি হয় না?" প্রায় ধমকের সুরে বললেন নকুড়বাবু। —"আর এখানে যে ঘরের লোক। ঘরের লোককে পুলিসই বা আটকাবে কেন?"

"ঘরের লোক?"

"ঘরের লোক, তিলুবাবু। মিস্টার লোবো!"

আমার মনে হল ভয়ঙ্কর আবোল-তাবোল বকছেন নকুড়বাবু। বললাম, "এসব কি আপনি স্বপ্নে দেখলেন?"

"স্বপ্ন নয়!" গলার স্বর তিন ধাপ চড়িয়ে বললেন নকুড়বাবু। "চোখের সামনে জলজ্যান্ত দেখতে পেলাম এই দশ মিনিট আগে। হাতে টর্চ নিয়ে ঢুকলেন মিঃ লোবো—নিজে চাবি দিয়ে প্রদর্শনীর ঘরের দরজা খুলে। প্রহরী চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে। লোবো সোজা চলে গেলেন একটা বিশেষ টেবিলের দিকে—যেটার কাঁচের ঢাকনার তলায় আপনার খাতাপত্তর রয়েছে। ঢাকনা তুলে দুটো খাতা বার করলেন মিঃ লোবো। তারপর অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটা প্যাসেজের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে উপরের তলার একটা আপিস-ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সেইখানে রয়েছে এই যন্ত্র। —কী নাম এই যন্ত্রের তিলুবাবু?"

"জীরক্স," যথাসম্ভব শান্ত স্বরে বললাম আমি। কেন জানি নকুড়বাবুর কথাটা আর অবিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু মিঃ লোবো!

"আপনার ঘুমের ব্যাঘাত করার জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত, তিলুবাবু," আবার সেই খুব চেনা কুণ্ঠার ভাব করে বললেন নকুড় বিশ্বাস, "কিন্তু খবরটা আপনাকে না-দিয়ে পারলাম না। অবিশ্যি আমি যখন রয়েছি, তখন আপনার যাতে ক্ষতি না হয় তার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। যেটা ঘটতে যাচ্ছে সেটা আগে থাকতে জানতে পারলে একটা মস্ত সুবিধে তো! আসলে নতুন জায়গায় এসে মনটাকে ঠিক সংহত করতে পারছিলাম না, তাই লোবোবাবুর ঘটনাটা আগে থেকে জানতে পারিনি—কেবল বুঝেছিলাম আপনার একটা বিপদ হবে সাও পাউলোতে।"

নকুড়বাবু আবার ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, আর আমিও চিন্তিত ভাবে এসে বিছানায় শুলাম।

আমার মধ্যে নকুড়বাবুর মতো অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা না-থাকলেও এটা বেশ বুঝতে পারছি যে, লোবোর মতো লোকের পক্ষে নিজে থেকে এ-জিনিস করা সম্ভব নয়। তার পিছনে অন্য লোক আছে। পয়সাওয়ালা লোক।

ভাবলে একজনের কথাই মনে হয়।

সলোমন ব্লুমগার্টেন।

১২ই অক্টোবর, রাত পৌনে বারোটা

আজ রাটানটান ইনস্টিটিউট থেকে আমাকে ডক্টরেট দেওয়া হল। মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান, প্রোঃ রড্রিগেজ-কে নিয়ে চারজন বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকের আন্তরিকতাপূর্ণ ভাষণ, ও সবশেষে আমার ধন্যবাদ-জ্ঞাপন। সব মিলিয়ে মনটা ভারী প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। আজ ডিনারে আমার দুই বন্ধু ও প্রোঃ রড্রিগেজের উপরোধে জীবনে প্রথম এক চুমক শ্যাম্পেন পান করলাম। এটাও একটা ঘটনা বটে।

কাল নকুড়বাবুর মুখে মিঃ লোবোর বিষয় শুনে মনটা বিষিয়ে গিয়েছিল, আজ ভদ্রলোকের অমায়িক ব্যবহারে মনে হচ্ছে নকুড়বাবু হয়ত এবার একটু ভুল করেছেন। প্রদর্শনীতে ঢুঁ মেরে দেখে এসেছি যে, আমার কাগজপত্র ঠিক যেমন ছিল তেমনই আছে।

হোটেলে ফিরতে-ফিরতে হল এগারোটা। ঢুকেই একটা দৃশ্য দেখে একেবারে হকচকিয়ে যেতে হল।

হোটেলের লবিতে চতুর্দিকেই বসার জন্য সোফা ছড়ানো রয়েছে; তারই একটায় দেখি একপাশে বিশাল-বপু সলোমন ব্লুমগার্টেন ও অন্যপাশে একটি অচেনা বিদেশী ভদ্রলোককে নিয়ে বসে আছেন আমার সেক্রেটারি শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস।

আমার সঙ্গে চোখাচুখি হতেই নকুড়বাবু একগাল হেসে উঠে এলেন।

"এনাদের সঙ্গে একটু বাক্যালাপ করছিলাম।"

ব্লুমগার্টেনও উঠে এলেন।

"কনগ্র্যাচুলেশনস!"

করমর্দনে যথারীতি হাতব্যথা করিয়ে দিয়ে ব্লুমগার্টেন চোখ কপালে তুলে বললেন, "তুমি কাকে সেক্রেটারি করে নিয়ে এসেছ? ইনি তো অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি! আমার চোখের দিকে চেয়ে আমার নাড়ীনক্ষত্র বলে দিলেন!"

দুজনের মধ্যে মোলাকাতটা কীভাবে হল সেটা ভাবছি, তার উত্তর নকুড়বাবুই দিয়ে দিলেন।

"আমার বন্ধু যোগেন বকশীর ছেলে কানাইলালকে একটা পোস্টকার্ড লিখে পোস্ট করার জন্য ওই কাউন্টারে দিতে গিয়ে দেখি এনারা পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমায় দেখে ব্লুমগার্টেন সাহেবই এগিয়ে এসে আলাপ করলেন। বললেন কাল আমার মুখে এল ডোরাডোর নাম শুনে ওঁর কৌতূহল হচ্ছে আমি এল ডোরাডো সম্পর্কে কতদূর জানি। আমি বললুম—আই অ্যাম মুখ্যুসুখ্যু ম্যান—নো এডুকেশন—কাল একটা বেঙ্গলি বইয়ে পড়ছিলাম এল ডোরাডোর কথা। তা, পড়তে পড়তে যেন সোনার শহরটাকে চোখের সামনে দেখতে পেলাম। তা ইনি—"

নকুড়বাবুর বাক্যস্রোত বন্ধ করতে হল। ক্রোল ও সন্ডার্সের মুখের ভাব দেখেই বুঝেছিলাম তাদের প্রচন্ড কৌতূহল হচ্ছে ব্যাপারটা জানার জন্য। আমি এ পর্যন্ত যা বলেছেন নকুড়বাবু সেটা ইংরেজি তর্জমা করে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলাম। ততক্ষণে অবিশ্যি আমরা তিনজনেই একটা পাশের সোফায় বসে পড়েছি, এবং আমি আমার দুই বন্ধুর সঙ্গে ব্লুমগার্টেনের আলাপ করিয়ে দিয়েছি। অন্য বিদেশী ভদ্রলোকটির নাম নাকি মাইক হ্যাচেট। হাবভাবে বুঝলাম ইনি ব্লুমগার্টেনের বডিগার্ড বা ধামাধারী গোছের কেউ।

এবার ব্লুমগার্টেনই কথা বলল।

"ইওর ম্যান বিসওয়াস ইজ এ রিয়্যাল উইজার্ড। ওকে মাইরনের হাতে তুলে দিলে সে রাতারাতি সোনা ফলিয়ে দেবে, অ্যান্ড ইওর ম্যান উইল বি ওনিং এ ক্যাডিল্যাক ইন থ্রী মানথস টাইম!"

মাইরন লোকটি কে জিগ্যেস করাতে ব্লুমগার্টেন চোখ কপালে তুলে বললেন, "হোলি স্মোক! —মাইরনের নাম শোনোনি? মাইরন এন্টারপ্রাইজেজ! অত বড় ইমপ্রেসারিও আর নেই। কত গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে জাদুকর মাইরনের ম্যানেজমেন্টের জোরে দাঁড়িয়ে গেল, আর ইনি তো প্রতিভাধর ব্যক্তি।"

আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। নকুড়বাবু শেষটায় রঙ্গমঞ্চে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে নাম কিনবেন? কই, এমন তো কথা ছিল না!

"অ্যান্ড হি নোজ হোয়্যার এল ডোরাডো ইজ !"

আমি নকুড়বাবুর দিকে দৃষ্টি দিলাম। ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। বললাম, "কী মশাই আপনি কি সাহেবকে বলেছেন এল ডোরাডো কোথায় তা আপনি জানেন ?"

"যেটুকু আমি জানি সেটুকুই বলেছি," কাঠগড়ার আসামির মতো হাত জোড় করে বললেন নকুড় বিশ্বাস। "বলেছি এই ব্রেজিলেই আছে এল ডোরাডো। আমরা যেখানে আছি তার উত্তর-পশ্চিমে। একটি পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকার ঠিক মধ্যিখানে এক গভীর জঙ্গল, সেই জঙ্গলের মধ্যেই এই শহর। কেউ জানে না এ শহরের কথা। মানুষজন বলতে আর কেউ নেই সেখানে। পোড়ো শহর, তবে রোদ পড়লে এখনো সোনা ঝলমল করে। সোনার তোরণ, সোনার পিরামিড, যেখানে-সেখানে সোনার স্তম্ভ, বাড়ির দরজা-জানালা সব সোনার। সোনা তো আর নষ্ট হয় না, তাই সে-সোনা এখনো আছে। লোকজন যা ছিল, হাজার বছর আগে সব লোপ পেয়ে যায়। একবার খুব বর্ষা হয়; তার পরেই জঙ্গলে এক মারাত্মক পোকা দেখা দেয়; সেই পোকা থেকেই মড়ক। বিশ্বাস করুন তিলুবাবু, এ সবই আমি পরপর চোখের সামনে বায়োস্কোপের ছবির মতো দেখতে পেলুম।"

ক্রোল ও সন্ডার্সের জন্য এই অংশটুকু ইংরিজিতে অনুবাদ করে দিয়ে ব্লুমগার্টেনকে বললাম, "তুমি তো তাহলে এল ডোরাডোর হদিস পেয়ে গেলে; এবার অভিযানের তোড়জোড় করো। আমরা আপাতত ক্লান্ত, কাজেই আমাদের মাপ করো। —আসুন নকুড়বাবু।"

আমার কথায় ব্লুমগার্টেনের মুখে যে থমথমে ভাবটা দেখা দিল, সেটা যে-কোনো লোকের মনে ত্রাসের সঞ্চার করত। আমি সেটা যেন দেখেও দেখলাম

না। নকুড়বাবু উঠে এলেন ভদ্রলোকের পাশ ছেড়ে।

আমরা চারজনে গিয়ে বসলাম আমার ঘরে। নকুড়বাবুর ইচ্ছে ছিল সোজা নিজের ঘরে চলে যান, কিন্তু আমি বললাম যে, তাঁর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে। দুই সাহেব বন্ধুর কাছে বাংলা বলার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে নকুড়বাবুকে বললাম, "দেখুন, মশাই, আমি আপনার ভালর জন্যই বলছি, আপনার মধ্যে যে ক্ষমতাটা আছে সেটা যার-তার কাছে এভাবে প্রকাশ করবেন না। আপনার অভিজ্ঞতা কম, আপনি হয়তো লোক চেনেন না, কিন্তু এটা বলে দিচ্ছি যে, এই রুমগার্টেনের খপ্পরে পড়লে আপনার সর্বনাশ হবে। আপনাকে অনুরোধ করছি—আমাকে না-জানিয়ে ফস করে একটা কিছু করে বসবেন না।"

নকুড়বাবু লজ্জায় প্রায় কার্পেটের সঙ্গে মিশে গেলেন। বললেন, "আমায় মাপ করবেন তিলুবাবু; আমার সত্যিই অপরাধ হয়েছে। আসলে বিদেশে তো আসিনি কখনো! মফস্বলে মানুষ, তাই হয়তো মাথাটা একটু ঘুরে গিয়ে থাকবে। আমাকে সাবধান করে দিয়ে আপনি সত্যিই খুব উপকার করলেন।"

নকুড়বাবু উঠে পড়লেন।

ভদ্রলোক চলে যাবার পর ক্রোল তার পাইপে টান দিয়ে এক ঘর ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "এল ডোরাডো যদি সত্যিই থেকে থাকে, তাহলে সেটা আমাদের একবার দেখে আসা উচিত নয় কি?"

আগেই বলেছি, সন্ডার্স এসব ব্যাপারে ঘোর সন্দেহবাদী। সে ধমকের সুরে বলল, "দেখ হে জার্মান পন্ডিত, তিন শো বছর ধরে সোনার-স্বপ্নদেখা অজস্র লোক দক্ষিণ আমেরিকা চষে বেড়িয়েও এল ডোরাডোর সন্ধান পায়নি, আর এই ভদ্রলোকের এই কটা কথায় তুমি মেতে উঠলে? ওই অতিকায় ইহুদী যদি এসব কথায় বিশ্বাস করে জঙ্গলে গিয়ে জাগুয়ারের শিকার হতে চান, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমি এর মধ্যে নেই। আমাদের যা প্ল্যান হয়েছে তার একচুল এদিক-ওদিক হয় এটা আমি চাই না। আমার বিশ্বাস শঙ্কুও এ-বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত।"

আমি মাথা নেড়ে সন্ডার্সের কথায় সায় দিলাম। আমাদের প্ল্যান হল আমরা কাল সকালে ব্রেকফাস্টের পর প্লেনে করে চলে যাব উত্তরে, ব্রেজিলের রাজধানী ব্রাসিলিয়া শহরে। সেখানে একদিন থেকে ছোট প্লেন ধরে আমরা চলে যাব জিঙ্গু ন্যাশনাল পার্কের উত্তর প্রান্তে পোস্টো ডিয়াউয়ারুম শহরে। তারপর বাকি অংশ নদীপথে। জিঙ্গু নদী ধরে নৌকা করে আমরা যাব পোরোরি গ্রামে। পোরোরিতে ব্রেজিলের এক আদিম উপজাতি চুকাহামাই-দের কিছু সংখ্যক লোক এখনো রয়েছে, যারা এই সেদিন পর্যন্ত ছিল প্রস্তরযুগের মানুষ। ব্রাসিলিয়া থেকেই আমাদের সঙ্গে থাকবেন একজন বিশেষজ্ঞ, যাকে এখানকার ভাষায় বলা হয় সেরটানিস্টা। কথাটার মানেই হল অরণ্য-অভিজ্ঞ। সেরটানিস্টারা উপজাতিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে অগ্রণী; তাদের ভাষা থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই এরা খুব ভাল ভাবে জানে।

পোরোরি ছেড়ে আরো খানিকটা পথ উত্তরে গিয়ে ভন মার্টিয়ুস জলপ্রপাত দেখে আবার ব্রাসিলিয়া ফিরে এসে সেখান থেকে প্লেন ধরে যে যার দেশে ফিরব। দিন সাতেকের মধ্যে পুরো সফর হয়ে যাওয়া উচিত, তবে ব্রেজিল সরকার বলেছেন প্রয়োজনে আতিথেয়তার মেয়াদ তিন দিন পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন তাঁরা।

সাড়ে এগারোটা বাজে, তাই ক্রোল ও সন্ডার্স উঠে পড়ল। ক্রোল যে আমাদের দুজনের সঙ্গে একমত নয়, সেটা সে যাবার আগে জানিয়ে দিয়ে গেল দরজার মুখটাতে দাঁড়িয়ে।

"আমার অবাক লাগছে, শঙ্কু, যে তুমি তোমার এত কাছের লোককে চিনতে পারছ না। তোমার এই সেক্রেটারিটির চোখের দৃষ্টিই আলাদা। হোটেলের লবিতে বসে যখন সে এল ডোরাডোর বর্ণনা দিচ্ছিল, তখন আমি ওর চোখ থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না।"

সন্ডার্স কথাটা শুনে আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে হাতে গেলাস ধরার মুদ্রা করে বুঝিয়ে দিল যে, ক্রোল আজ পার্টিতে শ্যাম্পেনটা একটু বেশি খেয়েছে।

বারোটা বেজে গেছে। শহর নিস্তব্ধ। শুয়ে পড়ি।

১৩ই অক্টোবর, হোটেল ক্যাপিটল, ব্রাসিলিয়া, দুপুর আড়াইটা

আমরা ঘন্টাখানেক হল এখানে পৌঁছেছি। আমরা মানে আমরা তিন বন্ধু ও মিঃ লোবো। লোবো পুরো সফরটাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আমি অন্তত এক-মুহূর্তের জন্যও সৌজন্যের কোনো অভাব লক্ষ করিনি ভদ্রলোকের ব্যবহারে।

এখানে নকুড়বাবুর কথাটা স্বভাবতই এসে পড়ে, যদিও কোনো প্রসঙ্গের দরকার ছিল না। সোজা বাংলায় বলতে গেলে ভদ্রলোক আমাকে লেঙ্গি মেরেছেন, এবং সেটা যে টাকার লোভে সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

আজ সাও পাউলোতে আমার রুম বয় সকালের কফির সঙ্গে একটা চিঠি এনে দিল। বাংলা চিঠি, আর হস্তাক্ষর আমার চেনা। আগেরটার তুলনায় বলতেই হয় এটার ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ। এই হল চিঠি—

> প্রিয় তিলুবাবু,
>
> অধমের অপরাধ লইবেন না। নগদ পাঁচ হাজার ডলারের লোভ সংবরণ করা সম্ভবপর হইল না। আমার পিতামহী আজ চারি বৎসর যাবৎ এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী। আমি সাড়ে আট বৎসর বয়সে আমার মাতৃদেবীকে হারাই। তখন হইতে আমি আমার পিতামহীর দ্বারাই লালিত। শুনিয়াছি এ-দেশে এই রোগের এক আশ্চর্য নূতন ঔষধ বাহির হইয়াছে। ঔষধের মূল্য অনেক। রুমগার্টেন সাহেবের বদান্যতায় এই মহার্ঘ ঔষধ কিনিয়া দেশে ফিরিবার সৌভাগ্য হইবে আমার।
>
> আজ সকালেই আমরা রুমগার্টেন মহাশয়ের ব্যক্তিগত হেলিকপটর বিমানে রওনা হইতেছি আমাদের লক্ষ্য সাও পাউলোর সাড়ে তিন শো মাইল উত্তর-পশ্চিমে একটি অরণ্য অঞ্চল। এই অরণ্য মধ্যেই এল ডোরাডো অবস্থিত। আমার সাহায্য ব্যতীত রুমগার্টেন মহোদয় কোনোক্রমেই এল ডোরাডো পঁহুছিতে পারিতেন না। তাঁহার

প্রতি অনুকম্পাবশত আমি নির্দেশ দিতে সম্মত হইয়াছি। আমার কার্য সমাধা হইলেই আমি আপনাদের সহিত মিলিত হইব। আপনাদের যাত্রাপথ আমার জানা আছে।

ঈশ্বর আপনাদিগের মঙ্গল করুন। আমি যদি ঈশ্বরের কৃপায় আপনার কোনোরূপে সাহায্য করিতে পারি, তবে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। ইতি

দাসানুদাস সেবক
শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস

হোটেলের রিসেপশনে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, নকুড়বাবু সত্যিই বেরিয়ে গেছেন ভোর ছটায়। জনৈক বিশালবপু ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে ছিলেন কি? আজ্ঞে হ্যাঁ, ছিলেন।

আমার চেয়েও বেশি বিরক্ত হয়েছে সন্ডার্স, এবং সেটা শুধু নকুড়বাবুর উপর নয়; আমার উপরেও। বলল, "তোমার-আমার মতো লোকের এই ভৌতিক অলৌকিক প্রেতলৌকিক ব্যাপারগুলো থেকে যতদূর সরে থাকা যায় ততই ভাল।"

ক্রোল কিন্তু ব্যাপারটা শুনে বেশ মুষড়ে পড়েছে; এবং সেটা অন্য কারণে। সে বলল, "তোমার লোক যখন বলছে আমাদের আবার মীট করবে, তখন বোঝাই যাচ্ছে যে, এল ডোরাডো আমাদের গন্তব্যস্থল থেকে খুব বেশি দূর নয়। সেক্ষেত্রে আমরাও যে কেন সেখানে যেতে পারি না সেটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।"

আমি আর সন্ডার্স ক্রোলের এই অভিযোগ কানে তুললাম না।

ব্রাসিলিয়া ব্রেজিলের রাজধানী হলেও সাও পাউলোর সঙ্গে কোনো তুলনা চলে না। আমরা হোটেলে পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের দলে যে সেরটানিস্টা বা অরণ্য-অভিজ্ঞ ভদ্রলোকটি যাবেন—নাম হাইটর—তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। বয়স বেশি না হলেও, চেহারায় একটা অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে। তার উপরে ঠান্ডা মেজাজ ও স্নিগ্ধ ব্যবহার দেখে মনে হয় উপজাতিদের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য ইনিই আদর্শ ব্যক্তি। তাঁকে আজ ক্রোল জিগ্যেস করেছিল এল ডোরাডো সম্পর্কে তাঁর কী ধারণা। প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক চোখ কপালে তুলে বললেন, "আজকের দিনে আবার এল ডোরাডোর প্রশ্ন তুলছেন কেন? সে তো কোনকালে মিথ্যে বলে প্রমাণ হয়ে গেছে। এল ডোরাডো তো শহরই নয়; আসলে ওটা একজন ব্যক্তি। ডোরাডো কথাটা সোনার শহর বা সোনার মানুষ দুই-ই বোঝায় পর্তুগীজ ভাষায়। সূর্যের প্রতীক হিসেবে কোনো এক বিশেষ ব্যক্তিকে পুরাকালে এখানকার অধিবাসীরা পুজো করত, আর তাকেই বলত এল ডোরাডো।"

চোখের পলকে একজন মানুষকে কখনো এমন হতাশ হতে দেখিনি, যেমন দেখলাম ক্রোলকে।

কাল সকালে আমাদের আবার যাত্রা শুরু। নকুড়বাবু অন্যায় কাজ করেছেন সেটা ঠিকই, কিন্তু তার জন্য আমিই যে বেশ খানিকটা দায়ী সেটাও ভুলতে পারছি না। আমিই তো প্রথম তাঁকে আমার সঙ্গে নিয়ে আসার প্রস্তাবটা করি।

১৬ই অক্টোবর, বিকাল সাড়ে চারটা

বাহারের নকশা করা ক্যানু নৌকাতে জিঙ্গু নদী ধরে আমরা চলে এসেছি প্রায় তেত্রিশ মাইল। আমরা পাঁচজন—অর্থাৎ আমি, ক্রোল, সন্ডার্স, লোবো আর হাইটর—ছাড়া রয়েছে দুজন নৌকাবাহী দক্ষিণ আমেরিকান ইন্ডিয়ান। আরো দুজন নৌকাবাহী সহ আরেকটি ক্যানুতে চলেছে আমাদের মালপত্র রসদ ইত্যাদি। এখন আমরা নদীর ধারে একটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জায়গা বেছে সেখানে তাঁবু ফেলেছি। তাঁবুর কাছেই তিনটি গাছে দুটি হ্যামক বাঁধা রয়েছে; সন্ডার্স ও ক্রোল তার এক-একটি দখল করে তাতে শুয়ে তর্ক জুড়ে দিয়েছে ব্রেজিলের বিখ্যাত অ্যানাকোন্ডা সাপ নিয়ে। এই অ্যানাকোন্ডা যে সময়-সময় বিশাল আকার ধারণ করে, সেটা অনেক পর্যটকের বিবরণ থেকেই জানা যায়। ক্রোলের মতে ত্রিশ হাত পর্যন্ত লম্বা হওয়া কিছুই আশ্চর্য না। সন্ডার্স সেটা বিশ্বাস করতে রাজি নয়। এখানে বলে রাখি যে, আমাদের তিনজনের কেউই চিড়িয়াখানার বাইরে অ্যানাকোন্ডা দেখিনি। এ-যাত্রায় আমাদের ভাগ্যে অ্যানাকোন্ডার সাক্ষাৎ পাওয়া আছে কিনা জানি না। না থাকলেও, আমার অন্তত তাতে আপসোস নেই। লতাগুল্ম-ফলমূল-কীটপতঙ্গ-পশু-পাখিতে ভরা ব্রেজিলের জঙ্গলের যে রূপ আমরা এখন পর্যন্ত দেখেছি, তার কোনো তুলনা নেই। বন গভীর ও অন্ধকার হলেও তাতে রঙের অভাব নেই। প্রায়ই চোখে পড়ে লালটানা ফুলের ঝোপ, হরেক রঙের প্রজাপতি আর চোখ-ঝলসানো সব কাকাতুয়া শ্রেণীর পাখি। নৌকা চলার সময় জলে হাত দেওয়া বারণ, কারণ নদীতে রাক্ষুসে পিরানহা মাছের ছড়াছড়ি। কালই নদীর ধারে একটা কেইম্যান কুমিরের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখলাম; তার মাথার দিকের খানিকটা অংশে ছাড়া আর কোথাও মাংস নেই, শুধু হাড়। মাংস গেছে পিরানহার পেটে।

ব্রেজিলের অনেক অংশেই বহুদিন পর্যন্ত বাইরের মানুষের পা পড়েনি। গত বছর-দশেকের মধ্যে বেশ কিছু জঙ্গল কেটে চাষের জমি বাড়ানো হয়েছে। সেই সঙ্গে ব্রেজিল সরকারের হাইওয়ে বানানোর কাজও চলেছে জঙ্গল কেটে, আর ডিনামাইটের সাহায্যে পাহাড় উড়িয়ে। আমরা আসার পথেও বেশ কয়েকবার ডিনামাইট বিস্ফোরণ বা ব্লাস্টিং-এর শব্দ পেয়েছি। কাল মাঝরাত্রে একটা গুরুগম্ভীর বিস্ফোরণের শব্দে আমাদের ক্যাম্পের সকলেরই ঘুম ভেঙে যায়। শব্দ-তরঙ্গের চাপ এত প্রবল ছিল যে, ক্রোলের বিয়ার-গ্লাসটা তার ফলে ফেটে চৌচির হয়ে গেল। আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল, তাই আজ সকালে হাইটরকে জিগ্যেস করলাম কাছাকাছি কোনো আগ্নেয়-গিরি আছে কিনা। হাইটর মুখে কিছু না বলে কেবল গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।

১৭ই অক্টোবর, ভোর ছ'টা

কাল রাত্রে এক বিচিত্র ঘটনা।

রাত্রে মশা, আর দিনে জ্বালাতুনে ব্যারাকুদা মাছির উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমি গিরিডি থেকেই একরকম মলম তৈরি করে এনেছিলাম। তিন বন্ধুতে

সেই মলম মেখে সাড়ে ন'টার মধ্যেই যে-যার ক্যাম্পে শুয়ে পড়েছিলাম। যদিও এখানে রাত্রেও নিস্তব্ধতা বলে কিছু নেই, ঝিঁঝি থেকে শুরু করে জাগুয়ার পর্যন্ত সব কিছুরই ডাক শোনা যায়, তবু দিনের ক্লান্তির জন্য ঘুমটা এসে যায় বেশ তাড়াতাড়ি। সেই ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেল এক বিকট চিৎকারে।

আমি ও সন্ডার্স হন্তদন্ত আমাদের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে দেখি ক্রোলও তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছে, এবং তৃতীয় তাঁবু থেকে হাইটর।

কিন্তু মিঃ লোবো কোথায় ?

ক্রোল টর্চটা জ্বালিয়ে এদিক-ওদিক ফেলতেই দেখা গেল ভদ্রলোককে। মুখ বিকৃত করে বিশ হাত দূরে একটা ঝোপের পাশ থেকে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে। আর সেই সঙ্গে পর্তুগীজ ভাষায় পরিত্রাহি ডেকে চলেছেন ভগবান যীশুকে।

"আমার পায়ে দিয়েছে কামড়, আমি আর নেই"— সন্ডার্সের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন মিঃ লোবো।

কামড়টা মাকড়সার, এবং সেটা ডান পায়ের পাতার ঠিক উপরে। লোবো গিয়েছিলেন একটি ঝোপের ধারে ছোট কাজ সারতে। হাতের সোনার ঘড়ির ব্যান্ডটা নাকি এমনিতেই একটু আলগা ছিল; সেটা খুলে পড়ে যায় মাটিতে। টর্চ জ্বালিয়ে এদিক-ওদিক খুঁজতে গিয়ে মাকড়সার গর্তে পা পড়ে। কামড়ে বিষ আছে ঠিকই, তবে মারাত্মক নয়। কিন্তু লোবোর ভাব দেখে সেটা বোঝে কার সাধ্যি।

ওষুধ ছিল আমার সঙ্গে; সেটা সন্ডার্সের টর্চের আলোতে লাগিয়ে দিচ্ছি ক্ষতের জায়গায়, এমন সময় লোবোর মুখের দিকে চোখ পড়তে একটা অদ্ভুত ভাব লক্ষ করলাম। তাতে আতঙ্ক ও অনুশোচনার এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ আমারই দিকে।

"কী হয়েছে তোমার ?" আমি জিগ্যেস করলাম।

"আমি পাপ করেছি, আমায় ক্ষমা করো।" কাতর

কণ্ঠে প্রায় কান্নার সুরে বলে উঠলেন মিঃ লোবো।

"কী পাপের কথা বলছ তুমি?"

মিঃ লোবো দু' হাত দিয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর ঠোঁট কাঁপছে, চোখে জল। সন্ডার্স ও ক্রোল বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে তাঁর দিকে।

"সেদিন রাত্রে," বললেন মিঃ লোবো, "সেদিন রাত্রে প্রহরীকে ঘুষ দিয়ে প্রদর্শনীতে ঢুকে আমি তোমার গবেষণার নোটসের খাতা বার করে নিয়েছিলাম। তারপর..."

রীতিমত কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে, কিন্তু তাও বলার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে লোকটা।

"তারপর...সেগুলোকে জীরক্স করে আবার যথাস্থানে রেখে দিই।"

এবার আমি প্রশ্ন করলাম। "তারপর?"

"তারপর — কপিগুলো — দিয়ে দিই মিঃ ব্লুমগার্টেনকে। তিনি আমায়...টাকা...অনেক টাকা..."

"ঠিক আছে। আর বলতে হবে না।"

মিঃ লোবো একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। "কথাটা বলে...হালকা লাগছে...অনেকটা — এবার নিশ্চিন্তে মরতে পারব।"

"আপনি মরবেন না, মিঃ লোবো," শুকনো গলায় বলল সন্ডার্স। "এ মাকড়সার কামড়ে ঘা হয়, মৃত্যু হয় না।"

মিঃ লোবোর ঘা আমার ওষুধে শুকোবে ঠিকই, কিন্তু তিনি যে আমার ক্ষতি করলেন সেটা অপূরণীয়।

শ্রীমান নকুড়চন্দ্র এক বর্ণও ভুল বলেননি।

তার মানে কি এল ডোরাডো সত্যিই আছে?

১৮ই অক্টোবর, রাত দশটা, হোটেল ক্যাপিটল, ব্রাসিলিয়া

আমাদের ব্রেজিল সফরের অপ্রত্যাশিত, অবিস্মরণীয় পরিসমাপ্তির কথাটা এই বেলা লিখে ফেলি, কারণ কাল সকালেই আমরা যে যার দেশে ফিরছি। এটুকু বলতে পারি যে, সন্ডার্সের যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মনের ভিত এই প্রথম দেখলাম একটা বড় রকম ধাক্কা খেল। সে মানতে বাধ্য হয়েছে যে, সব ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস, আখেরে এর ফল ভালই হবে।

এইবার ঘটনায় আসি।

গতকাল সকালে ব্যান্ডেজবন্ধ লোবোকে সঙ্গে নিয়ে আমরা ক্যানু করে বেরিয়ে পড়লাম চুকাহামাই উপজাতিদের বাসস্থান পোরোরির উদ্দেশে। আমাদের যেতে হবে আরো প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার। যত এগোচ্ছি ততই যেন গাছপালা ফুলফল পাখি প্রজাপতির সম্ভার বেড়ে চলেছে। এই স্বপ্নরাজ্যের মনোমুগ্ধকারিতার মধ্যে আতঙ্কের খাদ মিশে আছে বলে এটা যেন আমার কাছে আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আমি জানি, এ-ব্যাপারে সন্ডার্স ও ক্রোল আমার সঙ্গে একমত। তারা যে খরস্রোতা নদীর উপকূলের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে, তার একটা কারণ বোধহয় অ্যানাকোন্ডা দর্শনের প্রত্যাশা। এখনো পর্যন্ত সে-আশা পূরণ হবার কোনো লক্ষণ দেখছি না। মাইলখানেক যাবার পর আমাদের নৌকা থামাতে হল।

নদীর ধারে তিনজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে; তারা হাইটরের দিকে হাত তুলে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে অচেনা ভাষায় কী যেন বলছে। আমি জানি এখানকার উপজাতিদের মধ্যে 'গে' নামে একটা ভাষা প্রচলিত আছে, যেটা হাইটর খুব ভালভাবেই জানে।

হাইটর লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলে আমাদের তিনজনকে উদ্দেশ করে বলল, "এরা স্থানীয় ইন্ডিয়ান। এরা আমাদের পোরোরি যেতে বারণ করছে।"

"কেন?" —আমরা তিনজনেই প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করলাম।

"এরা বলছে চুকাহামাইরা কী কারণে নাকি ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে রয়েছে। কালই নাকি একটা জাপানী দল পোরোরি গিয়েছিল; তাদের দুজনকে এরা বিষাক্ত তীর দিয়ে মেরে ফেলেছে।"

আমি জানি কুরারি নামে এক সাঙ্ঘাতিক বিষ ব্রেজিলের আদিম জাতিরা তাদের তীরের ফলায় মাখিয়ে শিকার করে।

"তাহলে এখন কী করা যায়?" আমি প্রশ্ন করলাম।

হাইটর বলল, "আপাতত এখানেই ক্যাম্প ফেলা যাক। আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি বরং একটা ক্যানু নিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা আঁচ করে আসি।"

"কিন্তু এই হঠাৎ-উত্তেজনার কারণটা কিছু আন্দাজ করতে পারছেন?" সন্ডার্স প্রশ্ন করল।

হাইটর বলল, "আমার একটা ধারণা হচ্ছে পরশু রাত্রের বিস্ফোরণের সঙ্গে এটা যুক্ত। বড় রকম একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে এরা এখনো সেটাকে দেবতার অভিশাপ মনে করে বিচলিত হয়ে পড়ে।"

অগত্যা নামলাম আমরা ক্যানু থেকে।

জায়গাটা যে ক্যাম্প ফেলার পক্ষে আদর্শ নয় সেটা বেশ বুঝতে পেরেছি। এখানে সাধারণত নদীর পাশে খানিকটা দূর অবধি জঙ্গল গভীর থাকে। ভিতরে কিছুটা অগ্রসর হলে দেখা যায় বন পাতলা হয়ে এসেছে। এই জায়গাটায় কিন্তু যতদূর অবধি দৃষ্টি যায়, তাতে অরণ্যের ঘনত্ব হ্রাস পাবার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না।

নদীর দশ-পনের গজের মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গা পেয়ে আমরা সেখানেই বিশ্রামের আয়োজন করলাম। কতক্ষণের অপেক্ষা জানা নেই, তাই তাঁবুও খাটিয়ে ফেলা হল—বিশেষ করে লোবোর জন্য। সে ভালর দিকে যাচ্ছে জেনেও মিনিটে-মিনিটে যীশু ও মেরি মাতাকে স্মরণ করছে। হয়তো সেটা এই কারণেই যে, সে অনুমান করছে আমরা শহরে ফিরে গিয়েই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করব। এ আশঙ্কা যদি সে সত্যিই করে থাকে, তবে সেটা ভুল নয়, কারণ আমি তাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত থাকলেও, ক্রোল ও সন্ডার্স দুজনেই লোবোর গর্দান নিতে বদ্ধপরিকর। আর ব্রুমগার্টেনকে পেলে তারা নাকি তার মাংস সিদ্ধ করে ব্রেজিলের নরমাংসভুক উপজাতির সন্ধান করে তাদের নেমন্তন্ন করে সে-মাংস খাওয়াবে। তাদের বিশ্বাস ব্রুমগার্টেনের মাংসে অন্তত বারো জনের ভূরিভোজ হবে।

আমরা তিনজনেই বেশ ক্লান্ত। পর পর চারটি বড় গাছের গুঁড়িতে তিনটি হ্যামক টাঙিয়ে তিনজনে শুয়ে মৃদু দোল খাচ্ছি, কাছেই বনের ভিতর থেকে মাঝে-মাঝে শুনতে পাচ্ছি চুরিয়াঙ্গি পাখির কর্কশ ডাক, এমন সময় সন্ডার্স হঠাৎ একটা গোঙানির মতো শব্দ করে উঠল। আর সেই সঙ্গে আমাদের নৌকার দুজন মাঝি একসঙ্গে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল।

এই গোঙানি ও চিৎকারের কারণ যে একই, সেটা বুঝতে আমার ও ক্রোলের তিন সেকেন্ডের বেশি সময় লাগেনি।

আমাদের থেকে দশ-বারো গজ দূরে একটা দীর্ঘাকার গাছের উপর দিকের একটা ডাল বেয়ে যেন আমাদেরই লক্ষ করে নেমে আসছে একটা সাপ, যেমন সাপের বর্ণনা পুরাণ বা রূপকথার বাইরে কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়ে না।

এ সাপের নাম জানি, হয়ত স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে বিস্ময়ের তাড়নায় নামটা আপনা থেকেই মুখ থেকে বেরিয়ে আসত, কিন্তু এখন দেখলাম গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোনোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আতঙ্কের সঙ্গে একটা ঝিম-ধরা ভাব, যেটা পরে ক্রোল ও সন্ডার্সকে জিগ্যেস করে জেনেছিলাম তাদেরও হয়েছিল।

ব্রেজিলের এই অতিকায় ময়াল মাটি থেকে প্রায় বিশ হাত উঁচু ডাল থেকে যখন মাটি-ছুঁই-ছুঁই অবস্থাতে পৌঁছেছে, তখনও তার আরো অর্ধেক নামতে বাকি। তার মানে এর দৈর্ঘ্য ষাট ফুটের কম নয়, আর প্রস্থ এমনই যে, মানুষ দুহাতে বেড় পাবে না।

আমি এই অবস্থাতেও বুঝতে চেষ্টা করছি আমার মনের ভাবের মধ্যে কতটা বিস্ময় আর কতটা আতঙ্ক, এমন সময় পিছন দিক থেকে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর পাবার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের তিনজনকে বেকুব বানিয়ে দিয়ে চোখের সামনে থেকে অ্যানাকোন্ডাপ্রবর বেমালুম উধাও।

"আপনাদের আশ মিটেছে তো?"

আমাদের পিছনে কখন যে একটি ক্যানু এসে দাঁড়িয়েছে এবং কখন যে তার থেকে শ্রীমান নকুড়চন্দ্র অবতীর্ণ হয়েছেন, তা জানি না।

"আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই," এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়ানো একটি সাহেবের দিকে নির্দেশ করে বললেন নকুড়বাবু, —"ইনি হলেন ব্রুমগার্টেন সাহেবের বিমানচালক মিস্টার জো হপগুড। ইনিই সাহেবের হেলিকপটরে করে আমাকে নিয়ে এলেন। শুধু শেষের দেড় মাইল পথ আমাদের ডিঙিতে আসতে হয়েছে।"

ক্রোল আর থাকতে না-পেরে বলে উঠল—"হি মেড আস সী দ্যাট স্নেক!"

আমি বললাম, "তোমাকে তো বলেইছিলাম ওনার মধ্যে এই ক্ষমতারও একটা আভাস পেয়েছিলাম দেশে থাকতেই।"

"বাট দিস ইজ ইনক্রেডিবল!"

নকুড়বাবু লজ্জায় লাল। বললেন, "তিলুবাবু, আপনি দয়া করে এঁদের বুঝিয়ে দিন যে, এতে আমার নিজের কৃতিত্ব কিছুই নেই। এসবই হল যিনি আমায় চালাচ্ছেন, তাঁরই খেলা।"

"কিন্তু এল ডোরাডো?"

"সে তো দেখিয়ে দিয়েছি সাহেবকে হেলিকপটর থেকেই। যেমন সাপ দেখালুম, সেইভাবেই দেখিয়েছি। বরদা বাঁড়ুজ্যের বইয়েতে কিছু ছবি ছিল, মদন পালের

আঁকা। সাপের ছবি, এল ডোরাডোর ছবি, সবই ছিল। বাজে ছবি মশাই। সোনার শহরের বাড়িগুলো দেখতে করেছে টোল-খাওয়া টোপরের মতো—তাও সিধে নয়, ট্যারচা। সাহেবও সেই ছবির মতো শহরই দেখলে, আর দেখে বললে, 'এল ডোরাডো ইজ ব্রেথ-টেকিং।"

''তারপর?''

আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছি নকুড়বাবুর কথা।

''তারপর আর কী? —জঙ্গলের মধ্যে শহর। সেখানে হেলিকপটর নামবে কী করে? নামলুম জঙ্গলের এদিকটায়। সাহেব দুই বন্দুকধারীকে নিয়ে ঢুকে পড়লেন, আর আমি চলে এলুম আমার কথামতো আপনাদের মীট করব বলে। আমি জানি আপনারা কী ভাবছেন—হুপগুড সাহেব আমাকে আনতে রাজি হলেন কেন। এই তো? ব্রুমগার্টেন সাহেবের সঙ্গে চুক্তি ছিল উনি এল ডোরাডো চাক্ষুষ দেখলেই আমার হাতে তুলে দেবেন নগদ পাঁচ হাজার ডলার। হুপগুডকে বলে রেখেছিলুম, আড়াই দেব ওকে যদি ও আমাকে পেঁছে দেয় আপনাদের কাছে। দেখুন কীরকম কথা রেখেছেন সাহেব—মনটা কীরকম দরাজ ভেবে দেখুন! আর, ও হ্যাঁ—এল ডোরাডো দেখা গেলে ব্রুমগার্টেন সাহেব এটাও কথা দিয়েছিলেন যে, তিনি আপনার গবেষণার কাগজপত্তরের কপি ফেরত দেবেন। এই নিন সেই কাগজ।''

নকুড়বাবু তাঁর কোটের পকেট থেকে রাবার-ব্যান্ডে বাঁধা এক তাড়া কাগজ বার করে আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি এত মুহ্যমান যে, মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরোল না। এর পরের প্রশ্নটা ক্রোলই করল।

"কিন্তু ব্রুমগার্টেন যখন দেখবে এল ডোরাডো নেই, তখন কী হবে?''

প্রশ্নটা শুনে নকুড়বাবুর অট্টহাসিতে আশেপাশের গাছ থেকে খান তিনেক ম্যাকাও উড়ে পালিয়ে গেল।

''ব্রুমগার্টেন কোথায়?'' কোনোমতে হাসি থামিয়ে বললেন নকুড় বিশ্বাস। —''তিনি কি আর ইহজগতে আছেন? তিনি জঙ্গলে ঢোকেন বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। তার ছ' ঘণ্টা পরে, রাত এগারোটা তেত্রিশ মিনিটে, এল ডোরোডোয় উল্কাপাতের ফলে সাড়ে তিন মাইল জুড়ে একটি গোটা জঙ্গল একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এ-ঘটনাও যে আপনাদের আশীর্বাদে আগে থেকেই জানা ছিল, তিলুবাবু! আপনার মতো এমন একজন লোক, যাঁর সঙ্গ পেয়ে আজ আমি তিন শো টাকা দামের একটি বিলিতি ওষুধ কিনে নিয়ে যেতে পারছি আমার ঠাকুমার জন্য, তাঁর শত্রুর কি আর শেষ রাখতে পারি আমি?''

*

ব্রাসিলিয়া এসেই দেখেছি খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার অর্ধেকটা জুড়ে রয়েছে কুইয়াবা—সান্তেরাম হাইওয়ের ত্রিশ কিলোমিটার পশ্চিমে একটি গভীর অরণ্যে আনুমানিক কুড়ি লক্ষ টন ওজনের একটি উল্কাপাতের খবর।

সৌভাগ্যক্রমে এই অঞ্চলে কোনো মানুষের বাস ছিল না। জীবজন্তু গাছপালা ইত্যাদি যা ছিল তা সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

পাঠশালা

লীলা মজুমদার

শম্ভুর মেজদাদু পঞ্চাশ বছর আমেরিকায় কাটিয়ে ৭০ বছর বয়সে মেলা টাকাকড়ি নিয়ে দেশে ফিরলেন। যাদের উনি বিদেশ থেকে এটা-ওটা পাঠাতেন, তারা কত বারণ করেছিল—অমন কাজ-ও কোরো না, এটা খুব খারাপ জায়গা, যেমনি নোংরা তেমনি গরম, চোরে আর জোচ্চোরে ভরা, দেখতে-দেখতে তোমার পয়সাকড়ি সব তোমাকে আলাদা করে দেবে। তাছাড়া অসুখবিসুখ লেগেই আছে, মুখ্যুর একশেষ, মাদুলিতে বিশ্বাস করে, ভূত মানে। দেশের পৈতৃক বাড়িতে পর্যন্ত নাকি কীসব—যাক গে, সে-কথা বলে আর কী হবে—মোট কথা, এসো না। ওখানেই আরো রোজগার করতে থাকো।

এ-সমস্ত শুনে, খুশি হয়ে, মেজদাদু তাঁর আসার দিন তারা এক মাস এগিয়ে দিলেন। পঞ্চাশ বছর ধরে উনি নাকি ঐ জিনিসই খুঁজে বেড়িয়েছেন, কিন্তু পাননি। এখন দেখছ কাণ্ড! নিজের বাড়ির দোরগোড়াতে সমস্তই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছে! তাছাড়া বাপের ভিটে তো বটে।

শম্ভুর বাবার ছোটপিসি বললেন, ''তাহলে বেহালার সে-বাড়িটা কিনলে না কেন? তখন দাম কম ছিল। বাপের ভিটেতে তো কেউ বাস করতে পারবে না—স্রেফ ভূতের বাড়ি!''

''কেন পারবে না? আমেরিকায় এ-রকম বাড়ি লাখ-লাখ ডলারে বিক্রি হয় তা জানিস? এই নিয়ে গবেষণা হয়। তাছাড়া পঞ্চাশ বছর বিদেশে থেকে, আমিও আর ঠিক মানুষ নেই। কিছু ভাবিসনে তোরা। আমার বন্ধু ছ্যাঁচড়কে মনে আছে? সেই-যে ছ্যাঁচড়—যে বাবার ন্যাজ-ওয়ালা ঘড়ি সারাবে বলে নিয়ে গিয়ে স্রেফ হারিয়ে ফেলল?—আমি তাকে তার পুরনো ঠিকানায় চিঠি দিতেই সে ফোন করে জানিয়েছে যে, তার মেরামতির ব্যবসা উঠে গেলেও, আমার ঘড়িটা সারিয়ে নতুনের মতো করে দেবে। আমার দয়ার দেনার একটুখানি তাহলে শোধ হবে। নাকি আমার জানায়-অজানায় আমার কাছ থেকে যা নিয়েছে, তার দাম খুব কম কটি হবে না!"

ছোটপিসির মুখ হাঁড়ি হল, ''ও! তা পাড়াগাঁয়ে সময় কাটাবে কী করে!"

মেজদাদু বললেন, "কেন, আমার 'নবেল পাঠশালা'টি এবার খুলব। আমার কতদিনের স্বপন এবার সত্যি হবে।"

মেজপিসি আঁতকে উঠলেন "অ্যাঁ! নবেল পড়াবার পাঠশালা খুলবে? তাহলেই হয়েছে, তোমার পাঠশালায় কেউ ছেলেমেয়ে পাঠাবে না, দেখো।''

মেজদাদু চটে গেলেন, "না, পাঠাবে না! মুখে-মুখে ইতিহাস, ভূগোল, জীব-বিজ্ঞান শেখাব। লিখতে-পড়তে শিখলেই প্রাইজ দোব। তাছাড়া এ সে-নবেল নয়। নবেল মানে নয়া, নতুন নিয়মে পড়াব কি না। তাতে পড়তে জানবার দরকার হবে না—''

"কী যে বাজে কথা বলো, মেজদা! পড়াবেটা কে শুনি? একা তো পারবে না।''

"কেন, তুই আর তোর বর। তুই ঘরকন্না দেখবি, সে পড়াবে। সকালে সব পোড়োরা মুড়ি, কলা, আখের গুড় খাবে। তারপর একঘন্টা পড়া, একঘন্টা গাছে চড়ার, বাগান সাফ করার ক্লাস, তারপর পুকুরে চান, মাছ ধরা—যারা লিখতে-পড়তে পারবে তারা নিজেদের মাছ বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে, তারপর—"

ছোটপিসি উঠে পড়লেন, "তা কবে থেকে পাঠশালা শুরু হবে? কবে যেতে হবে? বাড়িওলাকে তো নোটিস দিতে হবে।"

মেজদাদু মহা খুশি হয়ে বললেন, "ধরে নে ১লা বৈশাখ প্রতিষ্ঠা দিবস। ছ্যাঁচড়টাকে পঞ্চাশ বছর দেখিনি, কিন্তু, আগের ঠিকানায় চিঠি দিতেই, ফোনে কথাবার্তা হয়ে গেল। আগের মতোই গলা, তবে নস্যি নিয়ে-নিয়ে একটু খারাপ হয়ে গেছে।"

তাই হল শেষ পর্যন্ত। মেজদাদু এর মধ্যে দশবার অমর্তপুরে ঘুরে এলেন। একটা চেনা লোক দেখলেন না। সব হয় চলে গেছে, নয় বোধ হয় মরে-টরে গেছে। পুরনো বন্ধু ছ্যাঁচড়ের সঙ্গেও দেখা হল না। তবে মিস্তিরিরা উদয়াস্ত খাটছে। ওদের দলের ওস্তাদ সাতদিনের কাজের হিসাব দেয়, মালমশলা এত, মজুরি এত, চা-জলখাবার এত। সঙ্গে-সঙ্গে মেজদাদু খরচা মিটিয়ে দেবার কথা বলেন। ওস্তাদ হাত জোড় করে বলে, "টাকাটি আমি ছোঁব না। মালিককে বলবেন।"

অচেনা হলেও গাঁয়ের লোকের মহা উৎসাহ। মিনি-মাগনার পাঠশালা, জলখাবার দেবে, নেকাপড়া শেখাবে, সারা সকাল এঁটকে রাখবে—এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে। তবে সুয্যি ডোবার পর এ-পাকে কেউ আসবে না, এ-কথাটা তারা পষ্টাপষ্টি বলে গেল। মিস্তিরিরাও সূর্য ওঠার সঙ্গে আসে, সূর্য ডোবার সঙ্গে যায়। তখন মেজদাদুও এক কিলোমিটার হেঁটে রেল-স্টেশনের ধাবায় রুটি-কাবাব খেয়ে, সন্ধের গাড়ি ধরে কলকাতায় ফিরতে লাগলেন।

এক মাসে বাগান সাফ; একতলা ফিটফাট; পেছনের উঠোনে ছোট ইঁদারা আর বাগানের বড় ইঁদারা ঝালাই শেষ; পুরনো তক্তাপোষ, টেবিল, বেঞ্চি, টুল বাইরে এনে মেরামত শুরু। মেজদাদু এবার ঠিক করলেন এখন থেকে এখানেই থেকে যাবেন। স্টেশনের পাশে পল্লীমঙ্গল ব্যাঙ্কে টাকা রাখার ব্যবস্থা করলেন। গ্রামের মোড়ল কিছু টাকার বদলে খুশি হয়ে দুটো হ্যাজাক, কতকগুলো তেলের বাতি, মোমবাতি, বাসনপত্র কেনার ভার নিল। মেজদাদুর ভাগ্নে বগাকেও অতি সহজেই নিয়ে আসা গেল। কারণ বগা বেকার এবং প্রেত-তত্ত্ববিদ। বগা যাচ্ছে শুনে ছোটপিসি আর পিসেমশাই চটে কাঁই। "ঐ দ্যাখো মেজদাকে 'ভালমানুষ পেয়ে মন ভাঙিয়ে নিচ্ছে।"

শেষটা ফাল্গুন মাসের গোড়ার দিকের একটা সকালে, ট্রাক-বোঝাই সুটকেস, গেরস্থালির জিনিস, বিছানা, ছবির বই সেলেট, রঙিন খড়ি ইত্যাদির সঙ্গে ছোটপিসি, ছোটপিসে, আর বগা সহ হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স কোলে মেজদাদু এসে পৈতৃক ভিটেয় উঠলেন। এটাতে আর কারো ভাগ ছিল না। তাঁর অনুপস্থিতিতে বাপের সম্পত্তি যখন ভাগ হয়েছিল, 'অমর্ত-কুটির' বলে এই বাড়ি তাঁর ভাগে পড়েছিল। তখন ছিল কুড়ি বছরের অব্যবহারে স্রেফ একটি পোড়ো বাড়ি। চোররা পর্যন্ত রাতে ইদিকে পা দিত না।

ছোটপিসি ট্রাক থেকে নেমেই বললেন, "বগা, সেই প্রেত-তাড়ানি পুজোটা দে। প্রসাদ খেয়ে উপোস ভাঙব। খিদেয় পেট জ্বলে গেল।"

সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ির সদর দরজা দিয়ে কালো, রোগা, কোঁকড়া-চুলওয়ালা একটা লোক ছুটে বেরিয়ে এসে মেজদাদুকে বুকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল। মেজদাদুও একগাল হেসে তার পিঠ চাপড়ে বললেন, "ও কীরে ছ্যাঁচড়, তোর ছিঁচকাঁদুনে স্বভাবটা এখনো গেল না! খুশি হলেই তুই ডুকরে কেঁদে উঠতিস! তোকে আজ দেখব একবারও ভাবিনি! চেহারাটা তো বিশেষ বদলায়নি। তা কী মনে করে?"

ছ্যাঁচড় ও'দের আদর করে ভেতরে নিয়ে যেতে-যেতে বললে, "আছি এখানে, কাজকর্মের শেষটুকু নিজের চোখে দেখব ভাব-লাম। তা দিদিমণি, ঐ পুজো-টুজোগুলো এখনি করলে খারাপ দেখাবে। আগে কর্মগুলো শেষ হোক। এখন চানটান করুন, বিশ্রাম নিন, জল খান।"

মেজদাদুও বললেন, "সেই ভাল রে, বগা। অসম্পূর্ণ কাজের ওপর কখনো পুজো হওয়া উচিত বলে তো মনে হয় না। চল রে ছ্যাঁচড়, তুই-ও আমাদের সঙ্গে বসে যা।"

ছ্যাঁচড় কিছুতেই রাজি নয়, তার অনেক কাজ বাকি। সে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। ছোট-পিসি ভুরু কুঁচকে বললেন, "হুঃ! কাজ না আরো কিছু? বলিনি এরা বড্ড গোঁড়া। অ্যামেরি-কায় যা-তা খেয়েছ তুমি, তা উনি তোমার সঙ্গে খাবেন কেন? তবে অ্যামেরিকায় রোজগার করা টাকা নিতে কোনো আপত্তি হবে না।"

মেজদাদু দুঃখিত হয়ে চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "এক পয়সাও নেয়নি আজ পর্যন্ত। বাড়ি সারাবার মাল-মশলা, মজুরির জন্যেও নয়। বরং পারলে আমাকে কিছু দেয়।" বলার সঙ্গে-সঙ্গে ছ্যাঁচড় একটা মরচে-ধরা ক্যাশ-বাক্স আর এক গাল হাসি নিয়ে ঘরে ঢুকল।

"কই, খাওদা-দাওয়া চুকল? কান্ড দ্যাখো ভাই, বড় ইঁদারা থেকে যে-সব রাবিশ উঠেছে, তার মধ্যে এটাকে পেলাম। মনে হচ্ছে তোমার পিসির বিয়েতে যে ক্যাশ-বাক্স-ভরতি যৌতুকের মোহর উধাও হওয়ার গল্প শুনেছিলাম, সেটা সত্যি! চোর সেটিকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়ে ভেবেছিল পরে উদ্ধার করবে। তারপর আর হয়ে ওঠেনি।"

মেজদাদুও আকাশ থেকে পড়লেন, "আরে তাই তো! এই এই তো ঠাকুরদার নাম খোদাই করা রয়েছে! ই—শ! এই জন্য বিয়েটা ভেঙে গেছিল। তারপর তোর কাকা এসে পিঁড়িতে বসল, তবে পিসির বিয়ে হয়েছিল।"

"আছেন দুজনে স্বর্গে।" এই বলে এমনি ভক্তিভরে ছ্যাঁচড় তাঁদের উদ্দেশে নমো করল যে, মেজদাদুর বেজায় হাসি পেল।

সেদিন থেকে পাঠশালায় ভরতি হবার জন্যে গাঁয়ের সব ছেলেমেয়ে লাইন দিল। মেজদাদু সকাল থেকে বাইরের ঘরে বসে সবার নাম লিখলেন। বগা কিছু দিন হোমিওপ্যাথি পড়েছিল, তাকে দিয়ে একান্নটা ছেলেমেয়ের নাকের কানের ভেতর পরীক্ষা করালেন। গাঁয়ের লোক মহাখুশি। তার ওপর জলখাবার! এক দিনে প্রায় সব সীট ভরে গেল। তাই বলে সীট মানে সত্যি বেঞ্চিটেঞ্চি নয়, ঐ খানিকটে বসার জায়গা।

পরদিন থেকে মহা হৈ-চৈ করে পাঠশালা আরম্ভ হয়ে গেল। পোড়োরা হাঁ করে দত্যি-দানোর গল্প শুনল। তেঁতুল-বিচি দিয়ে বিশ-পঁচিশ বলে চমৎকার একটা খেলা শিখল। গাছে চড়ে পাখির বাসা দেখল। ডিমে হাত দেওয়া বারণ। বাগানের আগাছা তুলল। খেল-দেল। মাছ ধরার ছিপ তৈরি করল। তারপর দুপুরে সব

...ড়ি গেল।

রাতে নতুন খাতায় মেজদাদু সব নাম তুলছেন, এমন সময় ...ক করে ছ্যাঁচড় ঘরে ঢুকে বলল, "হ্যাঁরে, দ্যাখ তো এঁকে ...নতে পারিস কি না?"

মেজদাদু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন, "সে কী! পণ্ডিত-...শাই। আমি ভেবেছিলাম ইয়ে—"

পণ্ডিতমশাই বললেন, "না রে বাবা, সে-সব নয়। আমি ...সেছি তোর পাঠশালায় ভরতি হতে।"

"অ্যাঁ! বলেন কী, পণ্ডিতমশাই!"

"হ্যাঁ, তাই, তোর ঐ তেঁতুল-বিচির খেলা দিয়ে গুনতে ...খাটা আমার না-জানলেই নয়। মাঝে-মাঝে ভারী অসুবিধায় ...ড়ি। সমস্কিতের মানুষ, আঁকটাঁক আমার মাথায় ঢোকে না। ...র ক্লাসের এক কোণে মাটিতে বসে থেকে, সব দেখব-শুনব, ...তে তোর আপত্তিটে কী বল?"

মেজদাদু বললেন, "না, সে তো সৌভাগ্যের কথা। তবে ...কী জানেন, দুটো পোড়ো এনে গার্জেন হয়ে ঢুকলে ভাল হত।"

পণ্ডিতমশাই একগাল হেসে উঠে পড়লেন। "বেশ, তাই ...বে। আনব দুটোকে ধরে।"

আনলেনও তাই। পরদিন সবে মাত্র তেঁতুল-বিচি ভাগ করা ...চ্ছে, দুটি ছাত্র নিয়ে পণ্ডিতমশাই এসে হাজির।

তারপর আর দেখতে হল না। পোড়ো দুটি মহা ছটফটে, ...ঝে একবার উঠে নারকেল গাছে সড়সড় করে চড়ে বসল। ...ণ্ডিতও তেমনি। পেছন-পেছন গাছে চড়ে, কান ধরে নামিয়ে ...নলেন। ব্যাপার দেখে ক্লাস-সুদ্ধ সব হাঁ! কিন্তু তেঁতুল-...বিচি দিয়ে গুনতে শেখার সময় মেজদাদু আরো অবাক হলেন। ...দেখতে দেখতে ১, ২ থেকে একেবারে ভগ্নাংশ, দশমিক তেঁতুল-...বিচি দিয়ে কষে ফেলতে লাগল। তার মধ্যে বার দুই ঝপাং করে ...পুকুরে নামল, চ্যাঁচাল, হাসল, এ-ওকে নাকানিচুবুনি খাইয়ে ...নিল। আবার ভালমানুষের মতো একপাশে এসে বসল।

ক্রমে মেজদাদু হাঁপিয়ে উঠলেন। যখন ছুটি হল, একটা ...স্তির নিশ্বাস ফেললেন। দুঃখের বিষয়, পণ্ডিতমশাই কি তাঁর ...ছাত্রদের টিকিটি দেখতে পেলেন না যে ক্লাসের রীতিনীতি ...সম্বন্ধে কিছু শেখান। অথচ শুধু যে তরকারির বাগান সাফ করে ...নিয়ে গেছে তা নয়, কচি-কচি চারাও লাগিয়ে দিয়ে গেছে! সেদিন ...সন্ধ্যায় বগা ঘটা করে ভূত-তাড়ানি পুজো দিল। সেই যে অমর্ত ...পাঠশালার প্রতিষ্ঠা হল, আজ পর্যন্ত তার কী নাম-যশ! অথচ ...পণ্ডিতমশাই আর তাঁর ছাত্ররা, এমন কী ছ্যাঁচড়-ও আর কোনো ...দিনও এল না। ছ্যাঁচড় টাকা-কড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেল না। তার ...মিস্তিরিরাও কাজ সেরে সেই যে বিদায় নিল, আর তাদের দেখা ...গেল না। মেজদাদু তাজ্জব বনে গেলেন।

শেষটা আর থাকতে না পেরে, একটা রবিবার কাউকে কিছু ...না বলে ছ্যাঁচড়ের পুরনো ঠিকানায় গিয়ে দেখেন, সেখানে অচেনা ...লোকের বাস। তারা ছ্যাঁচড়ের দাদার বংশধর। মেজদাদুকে প্রণাম ...করে, তারা বারবার বলতে লাগল, "কাকা শেষ বয়সে ভারী ...ধার্মিক হয়ে গেছিলেন। বুড়ো পণ্ডিতমশায়ের শিষ্য হয়ে তাঁর ...সঙ্গে হিমালয়ে চলে গেছিলেন। সে-ও বছর কুড়ি হয়ে গেল, ...আর তাঁদের কোনো পাত্তা নেই। সব সম্পত্তি ভাইপোদের দিয়ে ...গেছেন।" তারা বলল, "খালি একটা দুঃখ ছিল যে, আপনার কাছ ...থেকে নাকি অন্যায়ভাবে কী সব নিয়েছিলেন, যেমন করেই হোক ...সেটি শোধ না করে ছাড়বেন না। কী আর বলব আমরা, আপনাকে ...প্রণাম করে মনে হচ্ছে কাকাকে বুঝি আবার ফিরে পেলাম।"

মেজদাদু বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে এসেই বগাকে বললেন, "আচ্ছা বগা, সেদিন তোর এত ঘটা করে ভূত-তাড়ানি পুজো ...দেবার কী দরকারটা ছিল শুনি? ও-সব হল গিয়ে—ইয়ে—কুসংস্কার, তাও জানিস না?"

বারোমেসে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ঝড় ওঠে বৈশাখে, জষ্টিতে আম পাকে
কম করে দুটো মাস দারুণ গরম থাকে।

আষাঢ়ে রথের মেলা, শ্রাবণে বন্ধ খেলা
কম করে দুটো মাস চলে বর্ষার পালা।

ভাদ্রে টেঁকে না মন, আশ্বিনে পার্বণ
শরতের সাদাফুলে ঢেকে যায় কাশবন।

কার্তিকে ধান তোলা, অঘ্রানে ভরে গোলা
হেমন্তে হিম লেগে গোবিন্দ গালফোলা।

পৌষের কাঁথা গায়, মাঘ মোটা লেপ চায়
শীতের এ দুটো মাস উত্তুরে হাওয়া দেয়।

ফাল্গুন ভরে ফাগে, চৈত্রে চড়ক লাগে
বসন্তে ফুল নিয়ে মধুমাস রাত জাগে ॥

ছবি দেবাশিস দেব

কচুর কল্যাণে

জরাসন্ধ

নামকরা কলেজের হস্টেল। অনেক ছেলে থাকে। খাওয়া-দাওয়া বেশ ভালই হয়। সব কিছু চালাবার ভার ওরা নিজেরাই নিয়েছে। চুরি-ছ্যাঁচড়ামির কোনো পথ নেই।

ছটা ওয়ার্ড। তারা ভোট দিয়ে দুজন করে বোর্ডার ঠিক করে এবং এই বারোজন মিলে তৈরি হয় মেস্-কমিটি। তার ভিতর থেকে একজন করে সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়। এক মাস তার মেয়াদ। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সব ব্যবস্থা ও দায়িত্ব তার। ঠাকুর-চাকরদের তার কথামতো চলতে হয়। পরের মাসে আবার নতুন সেক্রেটারি আসে।

বাজার করার ভারও বোর্ডারদের হাতে। পালা করে প্রতি ওয়ার্ড থেকে দুজন করে ছেলের কিচেন ডিউটি পড়ে। সকাল থেকে শুরু। তাদের প্রথম কাজ হল হেড কুক, অর্থাৎ ঠাকুরদের মধ্যে যে প্রধান, তার সঙ্গে বসে ঐ দিনের মতো একটি মেনু তৈরি করা এবং সেটা সেক্রেটারির কাছে পাঠানো। মঞ্জুর করা-না-করা তার এক্তিয়ার। তাকে তো সারা মাসের খরচপত্রের দিকটা ভাবতে হয়। মঞ্জুরি না পাওয়া গেলে নতুন মেনু পাঠাতে হয়।

সেদিন কিচেন ডিউটি ছিল চার নম্বর ওয়ার্ডের সনৎ আর মানসের। দুজনেই ঠিক করে এসেছিল মাছটা বদলাতে হবে। রোজ-রোজ রুই-কাতলা খেয়ে খেয়ে পেট পচে গেছে। অন্য কিছু করা যাক। জনপ্রতি দু'পিস করে মাছ বরাদ্দ। ওরা সেখানে দুটো করে কই মাছ বসিয়ে দিল। তারিণী হেসে বলল, "অনেক দাম পড়বে। সেক্রেটারিকে তো চিনি, রাজি হবে না।"

ওরা বলল, "তুমি নিয়ে তো যাও। তারপর দেখা যাবে।"

তারিণী ঠিকই ধরেছিল। মেনুটা সঙ্গে-সঙ্গে ফেরত চলে এল। কই মাছের ডান দিকে একটা 'ক্রস' চিহ্ন, অর্থাৎ ওটা চলবে না।

মানসের তাড়া ছিল। বাজারে যেতে হবে। ফিরে পড়াশুনো আছে। বলল, "দু পীস করে ইলিশ করে দে। ঝামেলার দরকার নেই।"

ইলিশও নামঞ্জুর। এবার তারিণীও অবাক হয়ে গেল। একটু বেশি পড়ত হয়তো। অন্য কোনো সেক্রেটারি আপত্তি করত না। কিন্তু এর ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। ওদের তাড়া দিল তারিণী, "বেলা হয়ে যাচ্ছে। আর দেরি হলে সময়-মতো কলেজের ভাত দেওয়া যাবে না। ওই রুই মাছই থাক বাবু, ও-বেলা বরং সাধারণ তরকারির বদলে একটা ধোঁকার ডালনা-টালনা করে দেব। সে তো আর মেনুতে লিখতে হবে না।"

সনতের জেদ চেপে গিয়েছিল, রুই মাছ বদলাতেই হবে। বলল, "ওর একার কথাতেই হবে? খাব তো আমরা। আমাদের কোনো মতামত নেই?"

"আসলে কী জানেন?" চাপা গলায় বলল তারিণী, "উনি চান রোজকার খাওয়াটা যেমন-তেমন করে চালিয়ে যে পয়সা বাঁচবে তা দিয়ে মস্ত বড় ফিস্টি দেবেন মাসের শেষে। ওঁর খুব নাম হবে। ফিস্টির মেনু তো উনিই করবেন। কাজেই আপনারা 'ইস্পিশাল' কিছু করতে চাইলে উনি শুনবেন না। যতটা শস্তার ওপর দিয়ে হয় করে দিন। আমি চট করে সইটা করিয়ে নিয়ে আসি।"

"বেশ," বলে নতুন মেনু তৈরি করল সনৎ। মানস এক নজরে দেখে বলে উঠল, "না, না; ওটা পাঠাসনে। খালি খালি একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে লাভ কী?"

সনৎ হেসে বলল, "দেখা যাক না, মজাটা কতদূর গড়ায়।"

তারিণী ক'মিনিটের জন্যে রান্নাঘরে গিয়েছিল। ফিরেই স্লিপটা নিয়ে ছুটল মঞ্জুরির জন্যে। দেখেই কোনো কথা না বলে সেক্রেটারি সোজা হস্টেল সুপারিনটেনডেনটের ঘরে গিয়ে কাগজখানা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "দেখুন স্যার, চার নম্বর ওয়ার্ডের দুটো ছেলে কীরকম অপমান করেছে আমাকে।"

সুপারিনটেনডেনট কেমিস্ট্রির প্রফেসর। দেশীয় গাছগাছড়া শাক-সবজি নিয়ে অনেকদিন ধরে গবেষণা করছিলেন। একখানা বইও লিখেছিলেন খাদ্য হিসাবে তাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে। বললেন, "কী এটা?"

"আজকের মেনু। আগে দুটো পাঠিয়েছিল। অনেক দাম পড়বে বলে আমি আপত্তি করেছিলাম। তারপর কী লিখেছে দেখুন। এর একটা বিহিত করতে হবে, স্যার।"

সুপার কাগজখানা পড়লেন। লেখা আছে: কচুপোড়া, কচুর ঘণ্ট, কাঁচকলা সেদ্ধ, কাঁচা তেঁতুলের অম্বল। বললেন, "এটাকে তুমি অপমান মনে করছ কেন?"

"অপমান নয়? এ কি একটা মেনু হল? আমি মোটা খরচে রাজি হইনি বলে এমনি করে—"

"শোনো," কথার মাঝখানে শান্তভাবে বললেন প্রফেসর ঘোষ, "শুধু এগুলো ছেলেরা খেতে চাইবে না, জানি। তুমি এর সঙ্গে কিছু মাছ-টাছ জুড়ে দাও। আসলে কচু আর কাঁচকলা দুটোরই ফুড ভ্যালু, মানে খাদ্যমূল্য অনেক। কচুতে প্রচুর প্রোটিন আছে, কাঁচকলায় আছে ভিটামিন এ, বি, সি আর কাঁচা তেঁতুলেও—"

কাঁচা তেঁতুলের গুণ-কীর্তন শুনবার আগেই কাগজখানা নিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সেক্রেটারি। তারিণীকে দিয়ে বলল, "ওদের যা খুশি করতে বল। আমাকে আর দেখাতে হবে না।"

তারিণী বুঝল, এটা রাগের কথা। কিন্তু তার আর দেরি করা চলে না। অনেকেরই দশটায় ক্লাস। তার আগে রান্না শেষ করতে হবে। সনৎ আর মানসকে গিয়ে বলল, "আপনাদের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছেন সেক্রেটারিবাবু। তাড়াতাড়ি করুন।"

সনৎ হেসে মানসের দিকে চেয়ে বলল, "দেখলি তো? কচু দিয়ে কী রকম কাত করে দিলাম।"

"শুধু কচু নয়, তার ওপরে আবার কাঁচকলা আর কাঁচা তেঁতুল। এতও আসে তোর মাথায়!"

এবার ওরা ফিরে গেল ওদের সাবেক ফর্দে। মনের মতো মেনু তৈরি হল। মঞ্জুর-টঞ্জুরের প্রশ্ন নেই। সেটা নিয়ে মানস তারিণীর সঙ্গে চলে গেল বাজারে। সনৎ রইল রান্না-বান্না তদারকির কাজে।

হস্টেলের খাবার ঘরে সেদিন দারুণ হৈ-চৈ পড়ে গেল। সোজা ব্যাপার তো নয়। একজোড়া করে ডিমভরা কই, তার সঙ্গে একখানা করে ইলিশ মাছ ভাজা, নারকেল দিয়ে ছোলার ডাল, আর রোজকার ঐ একঘেয়ে পেঁপে বা আমড়ার বদলে আলুবখরার চাটনি। অর্থাৎ একটা রীতিমত মিনি-ফীস্ট।

বোর্ডাররা দলে-দলে সনৎ আর মানসকে অভিনন্দন জানিয়ে গেল।

ব্যথামুক্তি

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বোশেখ মাসে বসাকবাবুর বুকে বিষম ব্যথা ধরল।
কমল না সে সেক মালিশে। ছেলে ডাক্তার হাজির করল
শহর থেকে, মোটা ভিজিট। হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি
সবই হল ; পারল না কেউ নির্ণয় করতে আসল ব্যাধি।
ওষুধে কেউ কমায় ব্যথা, কেউ ঘুম পাড়ায় ইঞ্জেকশনে।
শিশি, বোতল, কৌটোয়—তাদের নিত্যনতুন প্রেসক্রিপশনে
টেবিল, দেরাজ ভর্তি। প্রত্যেক চিকিৎসকের মত বিভিন্ন।
সাময়িক ফল হলেও নাইকো স্থায়ী উপশমের চিহ্ন।
কর্তা বললেন, "ঢের খাওয়ালি পয়সা গুচ্ছের মতলববাজকে।
কেউ নয় কোনও কর্মের, একবার ডাক্ না নব-কবিরাজকে!"
গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না তাই তাঁর কথা শেষ মনে হইল।
বৈদ্য এসে দিলেন বড়ি, পুটপক্ক ভস্ম, তৈল।
কোন্‌টা খাবার কী অনুপান, কোন্ মালিশে কমবে কষ্ট
বুঝিয়ে দিলেন বাড়ির লোককে। কর্তা গোড়ায় বললেন স্পষ্ট,
"চিকিৎসাতে ভাঁড় প্রায় শূন্য, যৎসামান্যই অবশিষ্ট,—
আজ পাবে না তঙ্কা তুমি, সারলে পাবে, নবকৃষ্ট।
চেষ্টা করো, ফাঁকি তুমি পড়বে না।" তাঁর সকল চেষ্টা
ব্যর্থ করে সাতদিন পরে বসাকবাবু মরলেন শেষটা।
পুত্রকন্যা আত্মীয়-পর দেহ ঘিরে জুড়লেন কান্না;
বৈদ্য অপ্রস্তুতের একশেষ, তাঁর দিকে কেউ ফিরেও চান না।
রোগী মরলেও ওষুধে তাঁর খরচ গেছে একশোর অধিক,
সেটা কি ঘর থেকে যাবে ? ছেড়ে দিলেও পারিশ্রমিক,—
তাঁর পুটিত তৈল ঘৃত, স্বর্ণভস্মের ন্যায্য মূল্য
কিছু কি নয় উচিত দেওয়া ? কর্তার দেহ খাটে তুলল
আত্মীয়েরা ফুলের মালায় সাজিয়ে,—এল কীর্তনের দল ;
সমারোহের নেইকো কমতি। আর এখন অপেক্ষা নিষ্ফল ;
বৈদ্য লজ্জার মাথা খেয়ে বললেন, "এইবার রাখতে চুক্তি
আমার প্রাপ্য মেটান। কর্তা যন্ত্রণা হইতে যে মুক্তি
লাভ করেছেন—ঐ দেখুন তাঁর প্রসন্ন মুখ দিচ্ছে সাক্ষ্য।
আপনাদের কর্তব্য এখন রক্ষা করা মৃতের বাক্য ;
(ডাক্তারদের পিছনে খরচ করেছেন আপনারা এন্তার)
'ফাঁকি তুমি পড়বে না'—এই প্রতিশ্রুতি ছিল কর্তার।
ব্যথামুক্তির সঙ্গে তিনি ছাড়বেন না এই দেহ মর্ত্য,—
আপনারা নিশ্চয়ই জানেন—এমন কোনও হয় নাই শর্ত।"

ছবি দেবাশিস দেব

ভূত যদি ভক্ত হয়

প্রেমেন্দ্র মিত্র

"...সে এক দারুণ জ্বালা!"

ওপরের ওই কোটেশন-মার্কা কথাগুলো আমার নয়।

হ্যাঁ, কাহিনীর নামটা যারা পড়ে নিয়েছ, তারা অনেকে হয়তো ঠিকই অনুমান করেছ যে, কথাগুলো রহস্যময় মেজকর্তা নাম-ধাম বাদে যাঁর ওই সম্বোধনটুকুই শুধু পেয়েছি লাল শালু মোড়া পুঁটুলির সেই ছেঁড়াখোঁড়া খেরোখাতা থেকে, কলকাতা শহরের সবচেয়ে লম্বা বাসরুটে ভি আই পি রোড ধরে দমদমের দিকে যাওয়ার সময় বেওয়ারিশ অবস্থায় যেটা পাওয়া গিয়েছিল বাসের একটি লম্বা সীটের ওপর, আর ওপর-ওপর সামান্য একটু নেড়েচেড়ে যার দু' একটা লেখা চোখে পড়ায় কৌতূহলী হয়ে যে পুঁটলিটা নাম-ধাম কিছু পেলে যথাস্থানে ফেরত দেব প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিনা আপত্তিতে নিজের দখলে নি পেরেছিলাম।

খেরোখাতার পুঁটলিটি বাড়িতে এনে অনেক ঘাঁটাঘাঁ করেও ওই মেজকর্তা নামটি ছাড়া কোনো পরিচয় কি ঠিকানা হদিস না পেলেও মেজকর্তার মতিগতি আর নেশা সম্বন্ধে যা-স বৃত্তান্ত পেয়েছি তা খেরোখাতার ছেঁড়া পাতাগুলো ঘে পড়বার চেষ্টা করবার আগে কল্পনাও যে করতে পারিনি, অকপটে স্বীকার করছি।

 ছবি সমীর সরকার

অনেক রকম মানুষের অনেক রকম নেশা, পেশা, বাতিকের কথাই তো শোনা যায়, কিন্তু মেজকর্তার যা খেয়ালের নেশা তা একেবারে সৃষ্টিছাড়া।

মেজকর্তার একমাত্র নেশা শিকার, আর সে জল-স্থলের কোনো জন্তু-জানোয়ার নয়, আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের জগতে ক্বচিৎ কদাচিৎ যাদের ক্ষণিকের আভাস মেলে, বুদ্ধি ও ব্যাখ্যার বাইরের সেই অশরীরী ভূতপ্রেতরাই তাঁর মৃগয়ার লক্ষ্য।

তাঁর এ-মৃগয়া নেহাত এলোপাথাড়ি যেখানে-সেখানে হানা দেওয়া নয়, রীতিমত খোঁজখবর-নেওয়া তোড়জোড়-করা অভিযান। [illegible] কয়েকজন মাইনে-করা চর তাঁর জন্যে সারা দেশে তাঁর ওই অদ্ভুত শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। তারপর কোথাও কিছু হদিস পেলে সেখানে ভাল করে খোঁজখবর নিয়ে পাকা খবর তাঁকে জানায়।

মেজকর্তাকে এ-সব শিকারের সন্ধান দেওয়ার ঝক্কি বড় কম নয়। পাকা খাঁটি খবর হলে যেমন দরাজ হাতের বখশিশ, বাজে [illegible] খবর হলে তেমনি কড়া বকুনি-তাড়নি তো বটেই, ঠিক [illegible] না হোক এমন মজার চাকরিটাও টলে যেতে পারে।

মেজকর্তার ছেঁড়াখোঁড়া খেরোখাতার ঢাউস পাততাড়ি ঘাঁটতে ঘাঁটতে এখনো পর্যন্ত এ-সত্যটি অন্তত জেনেছি যে, তাঁর সবচেয়ে পাকা হুঁশিয়ার চর হল নসুরাম দাস।

নসুরাম যা খবর আনে তার ষোলো আনা না হোক, বারো আনা অন্তত একেবারে ভুয়ো গুজব বলে প্রমাণ হয় না।

নসুরামের এবারের খবরও ভুয়ো গুজব ছিল না। খবরাখবর নসুরাম যা দিয়েছিল তা সবই ঠিকঠিক মিলে গিয়েছিল। কিন্তু অমন একটা পাকাপোক্ত সাচ্চা শিকার শেষ পর্যন্ত যে অমন জ্বালা হয়ে দাঁড়াবে, মেজকর্তা তা কি ভাবতে পেরেছিলেন?

মেজকর্তা লিখেছেন ঃ

*

জায়গাটা দেখে খুশিই হয়ে উঠলাম, নসুরাম দাস খুব একটা বাজে খবর দেয়নি। সে বড় একটা দেয়ও না। তার কথা-মতো বড় গাঙে কুমিরখালির ঘাটে নৌকো লাগিয়ে নৌকো ছেড়ে খালের ধারের বড় পালেদের আড়ত থেকে মুনিষদের কাউকে নিয়ে হাঁটাপথে ল্যাংড়া সাহেবের কুঠি খুঁজতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল নসুরাম।

তার এই পরামর্শটা কিন্তু শুনিনি। ল্যাংড়া সাহেবের কুঠি খুঁজতে কাউকে সঙ্গে নিতে চাওয়ার মানে নিজের মতলবটা প্রায় ঢাক পিটিয়ে জানানো।

আড়তের কাউকে না নিয়ে যা করেছি, নসুরাম তা করতে পইপই করে বারণ করেছিল। সে বলেছিল, আর যা করেন, মজা খালের মুখ থেকে কোনো ডোঙা কি শালতিতে উঠবেন না। মিনি-মাগনা নিয়ে যেতে চাইলেও না। এমনিতে সেখানে শালতি কি ডোঙা বড় একটা থাকে না। বহু দূরের বাদা কি বিলের তল্লাট থেকে গোলপাতা কি গরান কাঠের বোঝা মাঝে-মাঝে বয়ে আনার দরকারে ছাড়া তারা এখানে আসেই বা কখন।

তেমনভাবে এসে পড়ে খালের মুখে বাঁধা থাকলে তারা যা-সব লোভ দেখায়, তার টান এড়িয়ে যাওয়া কিন্তু সহজ নয়। হাঁটা

পথের অন্তত দেড়বেলা যেখানে পৌঁছতে লাগে, তারা দেড় ঘণ্টায় সেই ল্যাংড়া সাহেবের কুঠিবাড়িতে পৌঁছে দেবে বলে হলফ করে কথা দেয়। আর শুধু কি তাই? ল্যাংড়া সাহেবের কুঠিবাড়িতে নিয়ে যাবার পথে তারা আরো অন্তত দশটা আজব কিছু দেখাবার ভরসা দেয়, আর সেই সঙ্গে প্রত্যেকেই জানায় যে, ল্যাংড়া সাহেবের যখের ধনের পাতাল-কুঠরির হদিস, সে-ই কিছুটা অন্তত দিতে পারে।

নসুরাম এদের সম্বন্ধেই বিশেষ করে সাবধান করে দিয়ে বলেছিল যে, কক্ষনো ওদের বিশ্বাস যেন না করি, ওরা প্রত্যেকেই এক-একটি খুনে ডাকাত। জলা বাদা আর জঙ্গলের অকূল সব পাথারের মুল্লুকে কোথায় কে থাকে কেউ জানে না। কখনো-সখনো নতুন শিকারের খোঁজে এদিকে আসে। এদের গায়ে নাকি সেই তিনশো সাড়ে তিনশো বছর আগেকার মগ আর ফিরিঙ্গি হার্মাদদের রক্তও আছে। এরা তাই এ তল্লাটের মানুষখেকো বাঘ-কুমিরের চেয়েও হিংস্র আর শয়তান।

নসুরামের এত কড়া হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও মজা খালের মুখে ডোঙা কি শালতির খোঁজেই গেছলাম কুমিরখালির ঘাটে বজরা থেকে নেমে। গিয়েছিলাম নসুরামের কথাগুলো হেসে উড়িয়ে দেবার মতো ভেবে একেবারে অবিশ্বাস করে নয়। নসুরামের কথাগুলো পুরোপুরি আজগুবি কল্পনা নয়। তার মধ্যে সত্যের কিছু ছিটেফোঁটা অবশ্যই ছিল। কিন্তু সেইটুকুর জন্যে বরাত-জোরে সত্যিই সেই হার্মাদদের সুদূর কোনো নাতির নাতি তস্য নাতির দেখা পেয়ে যাওয়ার আশাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারিনি।

মজা খালের মুখে কোনো শালতি কি ডোঙার দেখা পেলাম না। একটু হতাশ হয়ে চলে আসছি, হঠাৎ পেছন থেকে ডাক শুনলাম—''ও কর্তা, চলে যেতে আছেন যে!''

চমকে বেশ একটু অবাক হয়েই পেছন ফিরলাম। আরে! সত্যিই তো খালের কিনারায় এক শালতি বাঁধা। তার মাঝিই আমায় ডাকছে! প্রথম এসে একেবারেই তার শালতি বা তাকে দেখতে পাইনি, এইটিই আশ্চর্য।

আমি ফিরে দাঁড়াতে মাঝি শালতি থেকেই বললে, "আসেন না কর্তা। কুঠিবাড়ি যাবেন তো?"

এবার অবশ্য ততটা অবাক হলাম না। তবু খালের আর-একটু কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় যাব তুমি জানলে কী-করে?"

''তা আর জানব না কর্তা? ল্যাংড়া সাহেবের কুঠি দেখতে ছাড়া আপনার মতো মানুষ এই লুসিফারের অরুচি মুলুকে আসবে কেন?"

মনে-মনে এবার রীতিমত চমকালেও বাইরে কিছু বুঝতে না দিয়ে পাড় দিয়ে শালতিটার কাছে নেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কুঠিবাড়ি তো বললে। কার কুঠিবাড়ি তা জানো?"

''তা আর জানি না কর্তা!'' মাঝি হেসে বললে, "এখানে ল্যাংড়া সাহেবের কুঠিবাড়ি ছাড়া আর কোনো কুঠিবাড়ি আছে নাকি? আর থাকলেও তা দেখতে আসছে কে?"

একটু থেমে লগি ঠেলে শালতিটা একেবারে পাড়ের গায়ে লাগিয়ে মাঝি আবার বললে, "আসেন কর্তা। ওঠেন আমার পিনিসে।"

একটু সাবধানে শালতির মধ্যে পা বাড়িয়ে উঠতে-উঠতে ঠাট্টার সুরেই বললাম, "এ তোমার পিনিস বুঝি? আমি তো ভেবেছিলাম আরো বড় কিছু।"

লগির ঠেলায় শালতিটা আশ্চর্য নৈপুণ্যে একেবারে স্থির রেখে মাঝি বললে, "তা মানুয়ারও বলতে পারেন কর্তা। দরকার হলে কী না হতে পারে আমার এই শালতি!"

'মানুয়ার' মানে তো ম্যান অব ওয়ার। মানে যুদ্ধজাহাজ। এ-কথাটাও শালতিওয়ালার মুখে শুনে আশ্চর্য হয়ে শালতির পেছনের দিকে জোড়া-তক্তাটার ওপর বসে অনেক-কিছু বেশ গোলমেলে মাথা নিয়েই ভাবতে শুরু করেছি।

সে-ভাবনাগুলো মনেই চেপে রেখে মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, "ল্যাংড়া সাহেবের কুঠিবাড়িতে তো নিয়ে যাবে বলছ। সে কুঠিবাড়ি কোথায় জানো তো ঠিক?"

"তা আর জানি না," লগি দিয়ে শালতিটা খালের মাঝামাঝি ঠেলে এনে সামনের দিকে চালিয়ে দিতে দিতে বললে, "ল্যাংড়া সাহেবকে ল্যাংড়া করলে কে?"

ল্যাংড়া সাহেব অন্তত দেড়শো বছর আগেকার মানুষ। তাকে খোঁড়া করার দাবিতে মাঝি আর যাই হোক বেশ রগুড়ে মানুষ তা বুঝে মনের সব প্রশ্নগুলো তারই সঙ্গে মিলিয়ে হালকা করবার চেষ্টা করলাম।

হাসিমুখে বললাম, ''তুমিই তাহলে ল্যাংড়া সাহেবের ঠ্যাং ভেঙেছ! তুমি তো তাহলে বাহাদুর মানুষ। তা তোমার নাম কী?"

"নাম?" মাঝি নাম জিজ্ঞাসাতে একটু যেন অবাক হয়ে বললে, "নাম আমার মানুল কর্তা। তা সবাই মানুই বলে।"

"নাম তোমার মানুল?" বিস্ময় আর কৌতূহলটা গলার স্বরে খুব লুকোতে পারলাম না।

মাঝি কিন্তু সেটা যেন লক্ষ না করেই বললে, "হ্যাঁ, কর্তা, আমার নাম মানুল পিদরু।''

মানুল পিদরু! অবাক হয়ে ভাবলাম তার মানে কি ম্যানুয়েল পেড্রো? অত করে যা আশা করেছিলাম, সত্যিই কি তারই সন্ধান পেলাম। সেই দুরন্ত ভয়ঙ্কর ফিরিঙ্গি হার্মাদদেরই রক্ত যার শিরায় বইছে, এমন কেউ এই মানুল পিদরু? প্রথম থেকেই তার চেহারাটা অবশ্য একটু কেমন বেয়াড়া লেগেছিল। শালতি পাওয়ার ব্যাপারটাই বেশি মনোযোগ কেড়ে রাখায় অন্য সব-কিছু তখনকার মতো চাপা পড়েছিল। এখন 'মানুল পিদরু' নামটা প্রথমেই লক্ষ-করা চেহারার বেশ একটু আলাদা ধরন সম্বন্ধে মনটাকে সজাগ করে তুললে।

হ্যাঁ, চেহারাটা আগেই চোখে পড়ে একটু অদ্ভুত লেগেছিল। ফর্সা ঠিক নয়, কিন্তু গায়ের রঙ কেমন একটু হালকা তামাটে, যা এখানকার সাধারণ মানুষজনের মধ্যে দেখাই যায় না।

আর শুধু কি গায়ের রঙ! লম্বাটে পাকানো শুকনো মুখের ওপর মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলোও যেন কেমন বেয়াড়া রকমের লালচে। সেই সঙ্গে দু চোখের তারাও যেন আমাদের আর পাঁচ-জনের মতো কালো কি বাদামি নয়। তাতে যেন কোথায় একটু সবুজের, হ্যাঁ সবুজেরই ঝিলিক রয়েছে।

মনে-মনে তখন আমি নিশ্চিত বুঝে নিয়েছি যে, এই মানুষটা অন্তত দু'-তিনশো বছর আগেকার কোনো ফিরিঙ্গি বোম্বেটের বংশধর না হয়ে যায় না। এখানে হানা দেওয়া হিংস্র নেকড়ের পালের মতো সেই হার্মাদেরা কবে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু এই জংলা-জলা-বাদার দেশে তাদের ক' ফোঁটা রক্ত এখনো যেন একেবারে ধোয়া-মোছা হয়ে যায়নি।

কিন্তু এমন একটা চেহারার মানুষ আর তার শালতিটাকে প্রথমে এসে দেখতে পাইনি কেন? আমি খুব তাড়াহুড়ো করে যেমন-তেমন করে চোখ বুলিয়েই ফিরে যাবার জন্যে মুখ ঘোরাইনি। বেশ ভাল করেই খালের মুখটা লক্ষ করছিলাম।

মনের ধোঁকার কথাটা মুখেই প্রকাশ করলাম এবার। জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, তোমায় প্রথমে দেখতে পাইনি কেন বলো তো? তুমি তো এইখানেই ছিলে?"

"তা ছিলাম বই কী কর্তা!" মানুল পিদরু ধাঁধার মতো করে জবাব দিলে, "তবে দেখা দিতে না চাইলে দেখবেন কী করে?"

মানুল পিদরুর যে একটু মজা করে কথা বলার স্বভাব, তা আগেই টের পেয়েছি। তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে তাই বললাম,

শেষ পর্যন্ত দেখা দিতে চাইলে কেন? সওয়ারি পছন্দ হল বলে?"

"তা একটু হল বই কী। নইলে আমার পিনিসে আপনাকে চড়াব কেন?" বললে পিদরু।

"তা পছন্দটা হল কিসে, তা একটু জানতে পারি?" হালকা সুরে হলেও সত্যিকার কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"পছন্দ হল কেন জানতে চান?" পিদরুর গলা যেন আগের মতো অত হালকা মনে হল না, "পছন্দ হল নির্ঝঞ্ঝাট সওয়ারি বলে।"

"নির্ঝঞ্ঝাট সওয়ারি! সে আবার কী?" সত্যিই পিদরুর কথাটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম।

"নির্ঝঞ্ঝাট বুঝলেন না কর্তা?" মানুল পিদরু আগের মতোই গুরু-গম্ভীর স্বরে বললে, "তার মানে শাবল-কোদাল, গজ-ফিতে, সিন্দুক-সড়কি-টর্চকির কোনো ঝামেলা নেই। একেবারে ঝাড়া হাত-পা।"

"ঝাড়া হাত-পা-র বদলে ওইরকম লটবহর নিয়ে কেউ-কেউ আসে নাকি?" একটু বোকার ভান করেই জানতে চাইলাম।

"কেউ-কেউ নয়, প্রায় সবাই তাই আসে," বললে মানুল পিদরু, "আর আসবে না-ই বা কেন? তারা ল্যাংড়া সাহেবের কুঠিবাড়ি চোখে দেখে তারিফ করতে আসে না, আসে তার যখের ধনের লুকনো পাতাল কুঠরি খুঁড়ে বার করে তার সোনাদানা-হিরে-চুনি-পান্নার পুঁজি বাগিয়ে নিয়ে যেতে। মজা খালের ডোঙা শালতি তারা বড় একটা নেয় না। তার বদলে গাঙের ঘাটের আড়ত থেকে কাউকে নিয়ে হাঁটা পথে দেড়-দু'বেলার হয়রানিতে ল্যাংড়া সাহেবের কুঠিকে পোড়ো ভিতের জঙ্গল মনে করে যেখানে এদিকে ওদিকে খোঁজাখুঁজি করে শাবল-কোদাল চালিয়ে জান কালা করে ফেলে, সেখানে একটা ফুটো কি ঘসা পেসোও মেলে না তাদের কপালে।"

পয়সার বদলে পিদরুর 'পেসো' বলাটা মনে-মনে টুকে রেখে বললাম, "সেটা ল্যাংড়া সাহেবের আসল কুঠিবাড়ি নয় বলেই কেউ কিছু পায় না বুঝি? কিন্তু ল্যাংড়া সাহেবের কুঠিবাড়ি বলে সত্যি কোথাও কিছু আছে কি?"

"তা আছে বই কী কর্তা।" পিদরু বেশ একটু জাঁক করেই বললে, "ল্যাংড়া সাহেবের কুঠি যেখানে ছিল, সেখানে তার গুপ্ত-ধনের পাতাল-কুঠুরিও এখনও ঠিক আছে।"

মানুল পিদরুকে একটু তাতিয়ে দেবার মতো তোয়াজ করে বললাম, "তা তুমিই ল্যাংড়া সাহেবকে খোঁড়া করেছিলে যখন, তখন আর কেউ না জানুক, তুমি পাতাল-কুঠুরির পাত্তা জানো নিশ্চয়?"

"আমি ছাড়া আর কে জানবে?" পিদরু যেন বুক চিতিয়ে বললে, "ও পাতাল-কুঠুরির যখের ধনের আমিই তো পাহারাদার।"

"তুমিই পাহারাদার?" চেষ্টা করেও আমার গলার উপহাসটা পুরোপুরি লুকোতে না পেরেই জিজ্ঞাসা করলাম, "তা সে পাতাল-কুঠুরিটা কোথায় একটু জানতে পারি?"

"পাতাল-কুঠুরি কোথায় জানতে চান কর্তা?" মানুল পিদরু একটু যেন দুঃখের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে।

"হ্যাঁ, শুধু একটু জেনে নিলে দোষ কী?" আমি পিদরুকে আশ্বাস দেবার সুরে বললাম, "দেখছ তো আমি শাবল-কোদাল নিয়ে আসিনি। কুমতলব থাকলেও তোমারই শালতি থেকে তোমার ফাঁক দিয়ে তাই খোঁড়াখুঁড়ি করে কিছু নিয়ে যেতে পারব না। সুতরাং জায়গাটা শুধু আমায় নির্ভয়ে দেখিয়ে দিতে পারো।"

"বেশ, তাহলে দেখেই রাখুন।" পিদরু কীরকম এক অদ্ভুত স্বরে বললে, "আপনি যেখানে বসে আছেন কর্তা, যখের ধনের পাতাল-কুঠুরি ঠিক তারই নীচে।"

কী! প্রায় অস্ফুট চিৎকারের সঙ্গে প্রথমে নীচের দিকে আর তারপর চারিদিকে তাকিয়ে বুকটা হঠাৎ যেন কেমন হিম হয়ে গেল।

এ কোথায় আমায় এনেছে পিদরু! যে-দিকে চাই, সে-দিকেই তো শুধু কূলকিনারাহীন জলা। সে-জলার চেহারা যেন আরো ভয়ঙ্কর করে তোলবার জন্যেই এখানে-সেখানে গরান ক্যাওড়া কসাড়ের মতো সব জলা-জংলার গাছের বিরাট সব ঝোপের জটলা উঠেছে।

এ কোন জায়গা? মজা খালে মানুল পিদরুর শালতিতে ওঠবার পর তার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে কখন এই অকূল জলার রাজ্যে এসে পড়েছি তা লক্ষই করিনি নাকি?

কিন্তু যার শালতিতে চড়ে এসে গেছি, সেই পিদরুই বা এখন কোথায়? শালতির ওপর আমি একলা বসে আছি। মানুল পিদরুকে তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ আমার চারিধারে ওটা কী বিশ্রী শব্দ শুনছি। আচমকা যে ঘূর্ণি হাওয়াটা আমার শালতিটাকে দুলিয়ে দুটো পাক দিয়ে ঘুরিয়ে বয়ে চলে গেল এ শব্দটা কি তারই? তবে এমন বিদঘুটে গায়ে-কাঁটা-দেওয়া অট্টহাসির মতো শোনাচ্ছে কেন?

শালতিটা যেরকম ভয়ঙ্করভাবে দুলছে, তাতে তা থেকে জলে ঝাঁপ দিলেই এর চেয়ে নিরাপদ হব মনে হচ্ছে বটে, তবু দাঁতে দাঁত চেপে জোর করে শালতির দুটো ধার জম্পেশ করে ধরে বসে আছি। হার মানব না। কিছুতেই মানব না। দেখি শেষ পর্যন্ত কী হয়।

হলও সত্যি কিছু। আর যা হল তাতে সন্দেহ হল এতক্ষণ আমার নিজেরই মাথাটা হঠাৎ একটু ঘুরে গিয়েছিল বলে সব ভুল দেখেছি কি না!

নইলে ওই তো পিদরু শালতির ধারের জল থেকে এক হাতের মুঠোয় কী একটা নিয়ে শালতির সামনের দিকটা হাত বাড়িয়ে ধরে সেই হাতের ওপরই ভর দিয়ে ওপরে উঠে এল। আমি অকূল জলায় এদিকে-ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখার সময় সে শালতি থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুব দিয়েছিল মনে করাই উচিত।

কিন্তু তা মনে করতে পারলাম কই?

মানুল পিদরুর গায়ে মাথায় বুকে কি হাঁটুর ওপর তোলা আঁটসাঁট -করে-মালকোঁচা-মারা খাটো কাপড়ের কোথাও এক ফোঁটা জলের চিহ্ন নেই। জলের বদলে সে যেন এক শূন্য হাওয়া-তেই ডুব দিয়ে উঠে এসেছে। নতুন কিছুর মধ্যে তার হাতের মুঠোয় কিছু একটা জিনিস আর তার কোমরে জড়ানো চামড়ার বেল্টে নকশা-তোলা সেকেলে খাপে একটা ছোরা।

যা বুঝবার তা বুঝে বুকের ভেতরটা একবার যে কেঁপে ওঠেনি, তা বলব না। মানুল তার সবুজের ছিটে দেওয়া চোখে যেভাবে আমার দিকে তখন তাকাচ্ছে, তাতে এ সর্বনাশা শালতি থেকে জলার ওপরেই ঝাঁপ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে একবার যে অস্থির হয়ে উঠিনি এমনও নয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে কোনোরকমে সামলে মুখে একটু কৌতুকের হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে বললাম, "এক ডুবেই যেন বেশ কিছু তুলে এনেছ মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, তা খুব জবর কিছুই এনেছি কর্তা!" একটু যেন বেশি গম্ভীর স্বরে বললে পিদরু।

বাঁ হাতটা তার মুঠো করাই ছিল। সে-মুঠো তেমনি বন্ধ রেখে, হঠাৎ ডান হাতে কোমরবন্ধের খাপ থেকে সেখানকার ছোরাটা সে বার করে আনল।

শিউরে-ওঠা ভয়ে চমকানো দৃষ্টির জন্যেই বোধহয় আমার মনে হল, ছোরার ঝকঝকে ইস্পাতের পাতটা ঠিক যেন হিংস্র জীবন্ত কিছুর মতো লকলক করে উঠল।

"এ বড় বেয়াড়া চাকু কর্তা। কত জানের খবর নিয়েছে তার হিসেব নেই। একবার ধরলেই হাত যেন কেমন নিশপিশ করে ওঠে চালাবার জন্যে। একবার ধরে দেখবেন নাকি কর্তা?"

মানুল পিদরু খোলা ছোরাটা আমার দিকে ছুঁড়তে যাচ্ছিল। আপত্তি জানিয়ে বললাম, "না, হাত নিশপিশ করাবার লোভ আমার নেই। ও-ছোরা তোমার কাছেই থাক।"

"তাহলে এই 'এসকুদো'টাই দেখুন।" বলে পিদরু বাঁ হাতের মুঠো থেকে যা আমার দিকে ছুঁড়ে দিলে, কোনোরকমে সেটা লুফে নিতে পারলাম। লুফে নেবার পর হাত খুলে দেখি সেটা একটা সোনার মোহর। কিন্তু বাদশাহী মোহর নয়। সেটার ওপর ভিনদেশী অক্ষরের ছাপ। সেই জন্যেই পিদরু বোধহয় এটাকে 'এসকুদো' বলেছে। তার মানে এটা ফিরিঙ্গি হার্মাদ-দের নিজেদের দেশ পোর্তুগাল কি ইস্পানিয়ার মোহরই নিশ্চয়।

মোহরটা সম্বন্ধে অনেক কৌতূহল থাকলেও সেটা ফেরত দেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে শুধু বললাম, "এটা তো বিদেশী মোহর দেখছি!"

"হ্যাঁ, কর্তা, সাত-সমুদ্দুর পারের মোহর!" বলে পিদরু যেন অবাক হয়ে বললে, "আরে! ওটা ফেরত দিচ্ছেন কেন কর্তা? ওটা আপনিই রাখুন।"

"না," একটু হেসেই বললাম, "কে জানে কত পাপের রক্ত লাগা ও মোহরে। ওতে আমার লোভ নেই কোনো।"

"লোভ নেই?" পিদরু অদ্ভুতভাবে আমার দিকে খানিক চেয়ে থেকে বললে, "তাহলে ফেলেই দিন ওটাকে জলায়।"

"না, ফেলতে হলে তুমিই ফেলো।" বলে মোহরটা তার দিকে ছুঁড়ে দিলাম।

পিদরু কিন্তু সেটা ধরবার চেষ্টা করলে না এবার। মোহরটা যেন তার গায়ের ভেতর দিয়েই জলার মধ্যে গিয়ে পড়ল। পিদরু একটু যেন অবিশ্বাসের সুরে শুধু বললে, "সত্যিই তাহলে মোহরটা নিলেন না কর্তা?"

একটু থেমে লোভ দেখাবার চেষ্টা করে আবার বললে, "ওই একটার বদলে একটা ঘড়া ভর্তি মোহর হলে নেবেন কি?"

'এসকুদো' মোহরটা মানুল পিদরুর ঠিক যেন গায়ের ভেতর দিয়ে দিয়ে জলে গিয়ে পড়বার পর আপনা থেকে একটু না শিউরে উঠে পারিনি। সেই তখনকার অস্বস্তির অনেকটা এতক্ষণে কাটিয়ে উঠে বেশ একটু জোর গলাতেই বললাম, "অমন এক-দু ঘড়া কেন, দশ-বিশ জোড়া সিন্দুক বোঝাই পেলেও তা নিতে চাই না। শুধু একটা কথা তোমার কাছে জানতে পারলে খুশি হব।"

"কী কথা?" পিদরু কেমন সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকাল।

বললাম, "কথাটা এই গুপ্তধন সম্বন্ধেই। এসব তো সেই ল্যাংড়া সাহেবের গুপ্তধন। কিন্তু গুপ্তধনের পাতাল-কুঠুরি সে এমন অথই জলের মধ্যে বানাতে গেল কেন?"

"ল্যাংড়া সাহেব এমন অথই জলায় তার পাতাল-কুঠুরি বানায়নি কর্তা। সে শক্ত শুকনো ডাঙা-জমিতেই তার কিল্লা-কুঠি আর পাতাল-কুঠুরি তৈরি করেছিল। কিন্তু তারপর এল সেই আগুন সব-লন্ড-ভন্ড-করা তুফান, আর খ্যাপা সাগরের সেই আকাশ-ছোঁয়া পেল্লায় ঢেউ, যা সবকিছু ভাসিয়ে এ-মুল্লুকটাই দিলে জলের তলায় চুবিয়ে।"

"তার মানে," বেশ একটু উত্তেজিতই হয়ে উঠলাম, "চল্লিশের সেই ঘূর্ণি তুফান আর সমুদ্রের সেই রাক্ষুসে পাহাড়প্রমাণ ঢেউয়ের..."

মানুল পিদরু আমার কথার মাঝখানেই আমায় থামিয়ে দিয়ে বললে, "চল্লিশের কথা কী বলছেন কর্তা?"

"চল্লিশ মানে," আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম, "সেই বারো-শো চল্লিশ, সাহেবদের আঠারোশো তেত্রিশ সালের ভয়ঙ্কর ঝড় আর সমুদ্রের রাক্ষুসে বানের কথা বলছি—এই জলা-জঙ্গল গ্রাম-গঞ্জ যা ভাসিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছিল।"

"তা দিয়েছিল বটে, কিন্তু তাতে কী?" মানুল পিদরু একটু যেন মেজাজ দেখিয়ে বললে, "ও সব আপনাদের নতুন সাহেবি হিসেব ভুলে যান কর্তা। যে-সালের কথা বলছেন তার কতকাল আগে কতবার এসব তল্লাটে অমন সর্বনাশা তুফান সব ওলট পালট করে গেছে, তার খবর ক'জন জানে। শুনুন কর্তা, আপনার ওই নতুন সাহেবি হিসেবের তেত্রিশ সালের অন্তত দুশো বছর আগের কথা আমি বলছি। যাদের আপনারা ফিরিঙ্গি হার্মাদ বলেন, তাদের দুই সর্দার এক সঙ্গে মিলে এই অঞ্চলের ছোটবড় অনেক রাজ্য লুটেপুটে ছারখার করে এখানেই এক কিল্লাকুঠি বানিয়ে-ছিল। সেই কিল্লাকুঠিই ছিল তাদের হানা দিতে বার হবার আর লুঠতরাজের সম্পত্তি এনে জড়ো করবার মূল ঘাঁটি।

"এ দুই সর্দারের একজন ছিল আমার বাবা আনটুনি পিদরু আর অন্যজন সান্‌চো গোমাই। লুট-করা ধনদৌলতের পুঁজি যখন অনেক জমে উঠেছে, তখন এ-দেশের রেওয়াজমাফিক এক মতলব আমার বাবার মাথায় আসে। মতলবটা হল কোথাও গুপ্তধনের এক লুকোনো পাতাল-কুঠুরি তৈরি করে সমস্ত লুটের ধনদৌলত সেখানে লুকিয়ে রাখা। বন্ধু গোমাইকে সে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এ-মতলবে রাজি করায়। মনে মনে সান্‌চো গোমাই তখন কী ভয়ঙ্কর শয়তানি মতলব যে এঁটেছে, তা তার এতদিনের দোসর হয়েও আনটুনি পিদরু একটুও আঁচ করতেও পারেনি। সান্‌চো গোমাইয়ের নিজের কোনো ছানাপোনা ছিল না, কিন্তু আনটুনি পিদরুর ছিল একটি। সে আর আনটুনি মারা যাবার পরও গুপ্তধন যাতে নিপাত্তা না হয়ে যায় তাই গুপ্ত কুঠুরিটা দেখিয়ে রাখার জন্যে সে আখেরে আসল ওয়ারিশ হিসেবে আনটুনি পিদরুর ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা তোলে। কোনোরকম সন্দেহ না করে আনটুনি পিদরু তাতে রাজি হয়।
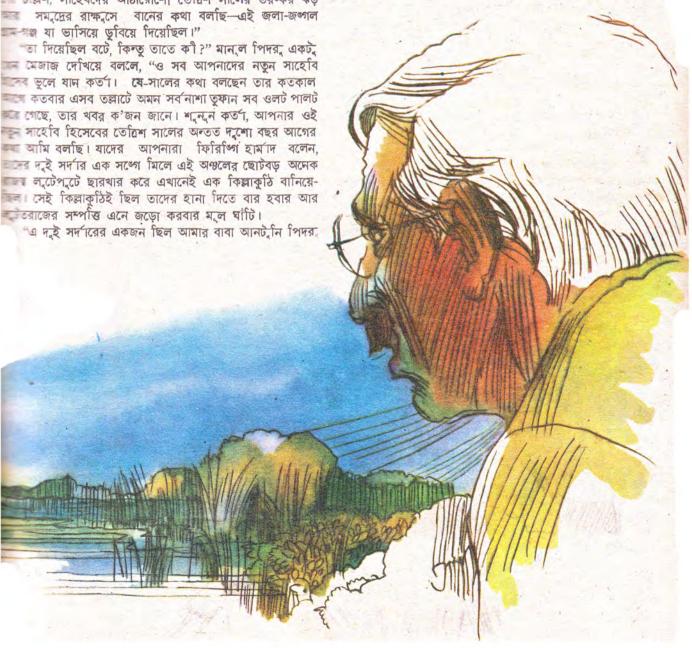
"তারপর সান্‌চো গোমাই অতি সহজেই তার মতলব হাসিলের ব্যবস্থা করে। গুপ্তধনের পাতাল-কুঠুরি পর্যন্ত গিয়ে সে আচমকা ছোরা চালিয়ে তার দোসর আনটুনিকে খতম করে। তারপর গুপ্তধনকে যখের ধন করে তোলবার জন্যে তা আগলাতে আনটুনি পিদরুর ছেলেটাকে জোর করে ধরে পাতাল-কুঠুরির গহ্বরে ঠেলে নামিয়ে দিয়ে ওপর থেকে গহ্বরের মুখটা ভারী পাথর চাপা দিয়ে এঁটে দেয়। আনটুনির ছেলেটা বাপকে খুন হতে দেখে অনেক চেষ্টা করেছিল সানচো গোমাইয়ের কবল থেকে ছাড়া পাবার। কিন্তু আট-দশ বছরের একরত্তি একটা ছেলে গোমাইয়ের মতো শয়তান দৈত্যের সঙ্গে পারবে কেন। সানচো গোমাই তাকে প্রায় দলা-পাকিয়ে পাতাল-কুঠুরির গহ্বরের ভেতর ফেলে দিয়ে দেড়মান পাথরটা চাপা দেবার আগে বলেছিল, খুব ভাল করে পাহারা দিবি, আমি বা আমার বংশের আর কেউ যেন এ যখের ধনের একটা দামড়িও না ছুঁতে পারে।

"তা আনটুনির বেটা সে-কথা তার রেখেছে এখনো পর্যন্ত। নসিবও তাকে সাহায্য করেছে। তাকে পাতাল-কুঠুরিতে বন্ধ করার পরের দিনই সেই দুনিয়ার ঝুঁটি ধরে পাক খাওয়ানো ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে কালাপানির মেঘ-ছোঁয়া ঢেউ এসে সব ভাসিয়ে দিয়েছিল লণ্ডভণ্ড করে।

"সান্‌চো গোমাইয়ের গাঁথা পাতাল-কুঠুরির ওপরের পাথর তাতে এমন কিছু না নড়লেও নীচের দিকের গাঁথুনি প্রচণ্ড ঢেউয়ের ধাক্কায় গেছে আলগা হয়ে, আর সেই সেদিকে ধসে পড়া গাঁথুনির ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে আনটুনি পিদরুর ছেলেটা।

"বেরিয়ে এসেও বেশ কিছুদিন কোনোমতে তাকে প্রাণ-টুকুকে ঠোঁটের ডগায় আটকে বাঁচা-মরার কিনারায় ঝুলে থাকতে হয়েছে। তারপর তুফান ঠান্ডা হয়েছে, কালাপানির ঢেউ কিছুটা ফিরে গেছে, কিন্তু তামাম মুল্লুকটায় ডুব জল সেই থেকে আর নামেনি।

"পাতাল-কুঠুরি থেকে বেরিয়ে আনটুনি পিদরুর বেটা কাছের একটা কসাড়-ঝোপে আটকে-থাকা তার বাপের মুর্দা থেকে ছোরা সমেত এই কোমরবন্ধটা খুলে নিয়ে নিজের কোমরবন্ধে বেঁধেছে। তারপর কিছুদূরের আরেকটা গরান-জংলায়-ভেসে-এসে-লাগা কোথাকার একটা ভাঙা শালতি পেয়ে সেইটেকেই তার বাসা করেছে।

"বদলার জন্যে খুব বেশিদিন তাকে অপেক্ষা করতে হয়নি। সান্‌চো গোমাই তুফানে আর কালাপানির ঢেউয়ে নাকানি-চোবানি খেতে-খেতে আছড়ে গিয়ে পড়েছে অনেক দূরের এক ডাঙায়। কিন্তু প্রাণে মারা যায়নি। কিছুদিন বাদে আপদ-বিপদ কিছুটা কাটলে নতুন আস্তানায় একটা ডিঙি যোগাড় করে সে তার যখের ধনের পাতাল-কুঠুরির খোঁজ করতে এসেছিল।

"খোঁজ তাকে আর পেতে হয়নি। গরান-জংলার একপাশে তার ভাঙা শালতিতে আনটুনি পিদরুর বেটা এমনি একটা মওকার জন্যেই দিন গুনছিল। গরান-জংলার ওদিক থেকে সান্‌চোর ডিঙিটা বেরিয়ে আসামাত্র কসাড়-ঝোপের আড়াল থেকে সে তার শালতি ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। তারপর আর এক লহমাও দেরি করেনি। কোমরবন্ধের খাপ থেকে লকলকে ছোরাটা টেনে বার করে প্রায় নির্ভুল নিশানদারিতে ছুঁড়ে দিয়েছে সান্‌চো গোমাইয়ের দিকে। ছোরাটা গিয়ে বুকে না হলেও প্রায় হাতল অবধি বিঁধেছে গোমাইয়ের উরুতে। গোমাইও তখনও তার গাদা কারবাইন বন্দুকটা ছুঁড়েছে আনটুনির বেটার দিকে। কিন্তু ফল কী হয়েছে দেখবার জন্যে অপেক্ষা করতে পারেনি। ফিনকি দিয়ে ওঠা রক্তে তখন তার ডিঙি লাল হয়ে উঠছে। দেখতে-দেখতে শরীর তার অবশ হয়ে আসছে। হাতে তার বন্দুকটা ধরে রাখবার জোরও যেন নেই। এরপর আনটুনি পিদরুর বেটা তার শালতি নিয়ে এসে চড়াও হলে কী হবে বুঝে সে শরীরে যেটুকু শক্তি ছিল তাই দিয়ে বন্দুকটা ফেলে বৈঠা নিয়ে ডিঙিটা চালিয়ে কোনোরকমে পালিয়ে গেছে তার নতুন আস্তানায়।

"সান্‌চো গোমাই নিজের ঘাঁটিতে ফিরে গিয়ে মরেনি, কিন্তু একটা পা তার একেবারে গেছে বরবাদ হয়ে। সেই থেকে সান্‌চো গোমাইয়ের বদলে ল্যাংড়া সাহেব বলেই তার পরিচয়।

"একটা পা খোয়া গেলেও ঘা-টা শুকোবার পর ল্যাংড়া সাহেব আবার তার গুপ্তধনের খোঁজে আসতে ছাড়েনি। এখনও সে হামেশাই আসে। ওই দেখুন না..."

মানুল পিদরু যে-দিকে আঙুল বাড়িয়েছে, সে-দিকে মুখ ফিরিয়ে এবার শিউরে উঠেছি। সত্যিই ছোট একটা ডিঙি বেয়ে দৈত্যাকার যে-মানুষটা আমাদের দিকে আসছে, তার চেহারায় হিংস্র ভয়ঙ্কর এমন একটা কিছু আছে, স্পষ্ট দেখা না গেলেও দূর থেকেই তা যেন একটা আতঙ্কের তরঙ্গ ছড়ায়। আমাদের দিকে কিছুদূরে এসেই সে হঠাৎ তার ডিঙিটা থামিয়ে তার কাঁধের গাদা-বন্দুকটা উঁচিয়ে ধরল আমাদের দিকে।

ভয়ে শিউরে উঠে হঠাৎ বেসামাল হয়ে শালতি থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম কি না জানি না, কিন্তু ভয়ের কাঁপুনিটা শুরু হবার সঙ্গেই পিদরুর গলা শুনলাম, "ভয় পাবেন না কর্তা। আমার মতো দোভাঁজ চোখ ও ল্যাংড়া সাহেবের নেই। ও শুধু আমাকেই দেখতে পাচ্ছে, আপনাকে নয়।"

কথাটার মানে বোঝার চেষ্টা করার মধ্যেই ওদিকের ডিঙির সান্‌চো গোমাইয়ের গাদা-বন্দুকের জবাবে মানুল পিদরুকে খাপ থেকে তার ছোরা খুলে নিয়ে এক ঝটকায় ছুঁড়ে দিতে দেখলাম। ল্যাংড়া সাহেবের গাদা বন্দুকও সেই মুহূর্তে গর্জে উঠেছে। পিদরুর ছোরাটা তার উরুতে গিয়ে গাঁথবার সঙ্গে-সঙ্গেই পিদরুও যেন গুলিলাগা রক্তমাখা মুখে শালতির তলায় ঝাঁপ দিলে।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে মাথাটা ঘুরে গিয়ে চোখে যেন অন্ধকার দেখলাম। তারপর...তারপর একটু সামলে উঠেই দেখলাম চারিদিকের অকূল জল জংলার মাঝে ভাঙা শালতির মধ্যে আমি একা। দিনের আলো এর মধ্যে বেশ ম্লান হয়ে এসেছে। জনমানব-হীন সমস্ত অঞ্চলটার ওপর বুকের-মধ্যে-অদ্ভুত-গা-ছমছম-করানো কাঁপুনি-তোলা একটা অজানা অদৃশ্য কিছুর ঘেরাটোপ যেন নেমে আসছে।

ভয় ভাবনায় উদ্বেগে এমন করে ঠুঁটো হয়ে বসে থাকলে কিন্তু চলবে না। যেমন করে হোক আমার বজরা যেখানে বাঁধা গাঙের ধারের সেই মজা খালের মুখে পৌঁছতে হবে। পথের হদিস জানি না, শুধু আকাশের আলো দেখে আন্দাজে যতটা সম্ভব দিক নির্ণয় করে শালতির লগিটা তুলে নিয়ে জলের তলায় ঠেলা দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে গেলাম।

কিন্তু লগি আর ঠেলতে হল না। চমকে উঠে দেখলাম আমি আর শালতিতে একা নই। শালতির মাথায় সেই মানুল পিদরু ঠিক আগেকার মতোই বসে আছে। লগিটা আমি জলে নামাবার আগেই একটা হাত বাড়িয়ে আমার কাছ থেকে সেটা টেনে নিয়ে সে বললে, "ও কী করছেন কর্তা? এই লগি কি এখানকার জলের তল পাবে! অমন পাঁচ লগিতেও না।"

"তাহলে!" চেষ্টা করেও ভেতরের উদ্বেগটা সম্পূর্ণ লুকোতে না পেরে বললাম, "এখান থেকে ফিরব কী করে? মজা খালের মুখে আমায় পৌঁছতেই হবে যে আজ।"

"পৌঁছতেই হবে আজ?" মানুল পিদরু বেশ বিষণ্ণ গলায় বললে, "বেশ, চলুন তাহলে।"

লগি-টগি সে আর নিলে না। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম শালতির পেছনের প্রান্তে বসে একদিকে একটু নুয়ে জলে ক'টা চাপড় দিতেই শালতিটা সামনের দিকে ভেসে চলল।

কী করে যে চলছে তা বুঝলাম না। চেষ্টাও করলাম না বোঝবার। শালতিটা শুধু আমার জন্যে চললেই হল।

তা চলছিল বেশ ভালই। তরতর করে যেন কলের নৌকোর মতো জল কেটে দুধারের গরান-জংলা আর কসাড়-ঝোপগুলো ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু কিছুক্ষণ এমনি গিয়েই হঠাৎ শালতিটা যেন লাগামের টানে গেল থেমে। সামনের দিকেই মুখ করে বসে ছিলাম। হঠাৎ থামায় প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে-যেতে নিজেকে সামলে অবাক হয়ে পিছন ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, "কী, হল কী, এমন করে হঠাৎ থামল যে!"

"আজ্ঞে, আমিই থামিয়ে দিলাম," জবরদস্তি-টস্তি নয়, মানুল পিদরু প্রায় করুণ গলাতেই বললে, "আপনার যাওয়া হবে না কর্তা।"

"যাওয়া হবে না, মানে?" ভয় উদ্বেগ রাগ কোনোটাই আমার গলার স্বরে আর লুকোনো রইল না। "কী, বলছ কী তুমি?"

"আজ্ঞে, আমার কথাটা একটু শুনুন কর্তা," মানুল পিদরুর গলায় রাগের জবাবে রাগ নয়, তার বদলে করুণ মিনতির সুর। সত্যিকার বিষণ্ণ গলায় করুণ আবেদন জানিয়ে সে বললে, "কী দরকার কর্তা আপনার ফিরে যাবার? কোথায় বা আপনি যাবেন এমন মুলুক ছেড়ে? আপনাকে সত্যি কথাটা বলছি। শোনেন কর্তা। ঢের ঢের সওয়ারি আমার এ-শালতিতে নিয়েছি কর্তা। ল্যাংড়া সাহেবের আসল যখের ধনের নমুনা তাদের মুলে এনে দেখিয়েছি। শুধু মুখ দিয়ে নয়, তাদের চোখ দিয়েও লালচের লালা গড়িয়ে পড়া আর থামেনি। তারপর সেই আদ্যি-কালের আসল পালা যখন সামনে মেলে দিয়েছি, হাতের মুঠোর মোহর তারা ছাড়েনি, কিন্তু ভয়ে কাঠ হয়ে প্রাণ বাঁচাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে এই কামঠ-কুমির-কিলবিল-করা জলায়। তাতেই বদনাম হয়েছে আমার শালতির, মজাখালের মুখে গাঙের ঘাটে। আমিই যেন তাদের চুবিয়ে মেরেছি ল্যাংড়া-সাহেবের পাতাল-পুরি দেখাবার লোভ দেখিয়ে। আমি তাদের ডুবিয়ে মারিনি কর্তা, তারা নিজেদের লালচে ডুবেছে, অনেক বেইমানির কালো কলিজার গর্ততে। এদের সকলের থেকে আপনি আলাদা কর্তা। কোথায় আপনি ফিরে যেতে চান? কোন দুঃখে? এই আনজান জলার মুল্লুকে আপনাকে শাহানশা বাদশা করে রাখব কর্তা। ল্যাংড়া-সাহেবের কুঠি যার কাছে ঝোপড়ি, এমন আজব মঞ্জিল দেব আপনাকে খুঁজে, ওই ল্যাংড়া-সাহেবের পালার চেয়ে জম-জমাট রমরমে দুশো বছরের অমন-অমন দশ হাজার কিসসার পালা সাজিয়ে দেখাব। না কর্তা, আপনার ফিরে যাওয়া আর হবে না। আপনার মতো মানুষ পেয়ে আর আমি ছাড়ি?"

মানুল পিদরুর কথা শুনতে-শুনতে আমি তখন এই ভক্ত ভূতের হাত থেকে কী করে নিষ্কৃতি পাব ভাবতে-ভাবতে চোখে অন্ধকার দেখছি।

ভূতেরা কি মনের ভেতরটা দেখতে পায়? তা পারলে আমার আজ অবশ্য দফা একেবারে রফা। তবু হয়তো মনের কথা জানার ক্ষমতা তাদের নেই, এই আশায় ভেতরের কাঁপুনিটা যথাসম্ভব লুকিয়ে খুশি-হয়ে-ওঠা মুখে উৎসাহের সঙ্গে বললাম, "ঠিকই বলেছ তুমি। আমার ফিরে যাওয়ার কোনো মানেই হয় না, ফিরে যেতে চাইও না আমি।"

এক লহমার জন্যে একটু যেন থমকে থেমে পড়ে ভুরু কুঁচকে মুখটা ব্যাজার করে বললাম, "কিন্তু ওই একটা ঝামেলার কথাই শুধু..."

"ঝামেলা!" মানুল পিদরু আমার কথার মাঝেই ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, "কী ঝামেলা?"

অনেক কিছুই এর মধ্যে ভেবে নিতে হয়েছে। একটু চুপ করে থেকে গোলমেলে ব্যাপারটা যেন সোজা করে বোঝাবার জন্যে নতুন দিক থেকে কথাটার একটা খেই ধরলাম, "আচ্ছা ল্যাংড়া-সাহেব মানে সানচো গোমাই যাকে তার গুপ্তধনের যখ করতে চেয়েছিল, তুমিই তো সেই আনটুনি পিদরুর ছেলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কর্তা।" একটু গর্বভরেই বললে মানুল পিদরু।

"নেহাত বাচ্চা ছিলে তো তখন," আমি যেন দরদ দেখিয়ে বললাম, "তাই দুনিয়ার সব হালচাল জানবার সুবিধে হয়নি।"

"না, কর্তা," পিদরু প্রতিবাদ জানালে, "নেহাত বাচ্চা নয়, যখ হবার সময় তেমন লায়েক না হলেও শয়তান সানচো গোমাইকে ছোরা গেঁথে খোঁড়া করবার পর সেও যেমন ল্যাংড়া-সাহেব হয়ে অনেকদিন টিঁকে ছিল, আমিও তেমনি তার বন্দুকের গুলিতে ঝাঁঝরা হলেও তখনই টেঁসে যাইনি।"

"হ্যাঁ," আমি সায় দিয়েই বললাম, "সানচো গোমাইকে খোঁড়া করবার দিন তুমি যে তার গুলিতে খতম হওনি, তা তোমার এখনকার এই চেহারা দেখেই বুঝেছি। কিন্তু বাচ্চা-বেলায় খতম না হলেও দুনিয়ায় ক'টা বেড়াজালের জ্বালার কথা জানবার বদ-নসিব তোমার হয়েছে? দায়রা সোপর্দ চারশো বিশের মামলায় ফৌজদারি সমন জারির হুলিয়া কি পিছু নিয়েছে কখনো?"

"কী!"

কী, তা আমিই কি জানি! কিন্তু পিদরুর গলার আওয়াজ আর চোখের ঘোর দেখেই বুঝলাম হঠাৎ-ভেবে পাওয়া প্যাঁচটা ঠিকমতোই খেটে গিয়ে পিদরুর ভুতুড়ে মাথাতেও ভালরকম চরকি পাক লাগাতে পেরেছে।

মানুল পিদরুর ভ্যাবাচাকা মুখের জিজ্ঞাসার জবাবে মুখটা যতখানি সম্ভব থমথমে করে বললাম, "আমার ঝামেলা হল ওই একটা মামলার সাক্ষী দেওয়ার তলব। ঠিক দিনের দিন আদালতে হাজিরা না দিলে সমনজারিটা হুলিয়া হয়ে খুঁজে বেড়াবে।"

পিদরু একটু ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "সে-হুলিয়া এখানে পর্যন্ত এসে খুঁজে পাবে কি?"

"না পেলে নিস্তার আছে নাকি?" আমি হতাশ গলায় বললাম, "সমনটা এখানকার কোনো গরানের জংলায় লটকে দিয়ে গেলেই হল। সে-সমন আর ঠেকাতে পারবে কেউ? তার চেয়ে মামলার সাক্ষীর জবানবন্দিটা দিয়ে আসাই ভাল।"

"কিন্তু সাক্ষী দিয়ে আপনি," একটু সন্দিগ্ধ স্বরেই জিজ্ঞাসা করলে পিদরু, "ঠিক ফিরে আসবেন কি?"

"বাঃ, আসব না তো যাব কোথায়!" জোর গলায় বললাম, "আর না এলে তুমিই তো টেনে আনবে গিয়ে।"

"না, না!" মানুল পিদরু সভয়ে বললে, "আপনাদের ওই মানুষ-গিজগিজ-করা সমন আর হুলিয়ার শহরে আমার যাবার ক্ষমতাই নেই। এখানে এই মজা খালের মুখে বড় গাঙের ঘাটের ধারে-কাছে গেলেও আমার কেমন ফিকে হয়ে গিয়ে হাওয়ার সামিল হওয়ার অবস্থা হয়।"

"তাই নাকি?" আহ্লাদের ঢেউটা কোনোমতে গলা পর্যন্ত ওঠার আগেই বুকের মধ্যে চেপে রেখে বললাম, "বেশ! তোমায় যেতে হবে না। আমি নিজেই আসব। এখন আমায় একটু জলদি গাঙের ঘাটে পৌঁছে দাও দিকি।"

পিদরু তাই দিয়েছিল। আর এখন ও কলকাতা পর্যন্ত ধাওয়াও করেনি। তবে আমিও এখনও ডায়মণ্ড হারবার, ক্যানিং কি বজবজ পর্যন্তও যাবার নামটুকু করি না। শুধু আনটুনি পিদরুর বেটা, ল্যাংড়া-সাহেব সানচো গোমাইয়ের দুশমন, আর তার যখের ধনের পাহারাদার মানুল পিদরুর জন্যে মাঝে-মাঝে বেশ একটু দুঃখ হয়।

*

মেজকর্তার লেখা এখানেই শেষ। তাঁর খেরোখাতার পুঁটলি ঘেঁটে মানুল পিদরুর কথা আর কোথাও পাইনি।

ভাগ্যে থাকলে কী না হয়

আশাপূর্ণা দেবী

ভাজা চিনেবাদামের ঠোঙাটা ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে একটা পুরুষ্টু বাদাম বেছে তুলে নিয়ে ছাড়িয়ে দানাটা মুখের মধ্যে আর খোলাটা গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলে ট্যাঁপার দিকে তাকিয়ে মদনা বলে উঠল, "ধুত্তোর, এ আবার একটা জীবন নাকি? দিন কাটাচ্ছি, না বাসি মুড়ি চিবিয়ে চলেছি!...না আছে মজা, না আছে ভয়-ভাবনা, দুশ্চিন্তা-আতঙ্ক।"

ট্যাঁপার কোলেও একটা বাদামের ঠোঙা, সেও ঠোঙা ঝাঁকিয়ে হৃষ্টপুষ্ট বাদাম খুঁজছিল, মনের মতো, না পেয়ে বেজার গলায় বলল, "বাদামওলা ব্যাটা রামঠকানো ঠকিয়েছে। সবগুলো চিমড়ে।"

বলল, আবার ওই থেকেই একটা তুলে নিয়ে ছাড়াল, খেল, খোলাটা গঙ্গার জলে ছুঁড়ল, তারপর বলল, "যা বলেছিস মদনা, আমার তো মনে লাগে, দিন কাটাচ্ছি, না জাবর কাটছি।...'খাও দাও, ঘুরে বেড়াও, কারো পকেটে কাঁচি চালাতে যেও না।'...দূর, একে কি আবার মানুষের জীবন বলে? অমন সূক্ষ্ম কাঁচি দুটো আমাদের, মরচে ধরে গেল।"

মদনা উদাস গলায় বলল, "অথচ ওই কাঁচি দুটো যোগাড় করতে! তোর মনে আছে ট্যাঁপা?"

"মনে আবার নেই?" ট্যাঁপা আর-একটা চিমড়ে বাদাম ছাড়াতে-ছাড়াতে বলল, "দোকানে কিনতে গিয়ে সরু কাঁচির কথা বলতে বলল কিনা, আরো সরু কাঁচি কী করবে হে বাপু? গোঁপ তো গজায়নি যে তার আগা ছাঁটবে! লোকের পকেট কাটবে না তো? শুনে রাগ দেখিয়ে চলেই আসতে হল। শেষ অবধি—"

মদনা কথার পাদপূরণ করে দিল, "শেষ অবধি, স্বয়ং ওস্তাদের কাঁচি দুখানাই হাত-সাফাই করে ফেলা গেল। সেই থেকেই তো ওস্তাদের দিক মাড়ালাম না আর।"

"মাড়াব কখন?" ট্যাঁপা বলে ওঠে, "গজ উকিল খুন হয়ে আমাদের তো বারোটা বাজিয়ে দিল। গুপি মোক্তারকে 'ফলো' করতে-করতে—তবু সে একটা 'দিন' গেছে!...আর এখন?—তার বদলে?"

মদনা বলল, "তার বদলে, বিনি পয়সায় খাচ্ছি-দাচ্ছি, আর খেলা দেখার চাকরি করছি। ধ্যেত!

ট্যাঁপা মদনা একে-একে চিমড়ে-চিমড়ে বাদামগুলোই শেষ করছে, আর খোলাগুলো গঙ্গার জলে ছুঁড়ছে। দুই বন্ধুতে বিকেলে গঙ্গার ধারে এসে পাশাপাশি বসে বাদামভাজা, ঝালমুড়ি কি পকৌড়ি খাওয়া, এই এখন এদের একমাত্র সুখ। কারণ এ সময় গজ উকিল আর গুপি মোক্তার কোর্টে থাকেন, দাবার ছক পড়ে না। পড়বে সেই সন্ধের পর। সেই খেলার আসরে হাজরে দেওয়া, এই চাকরি ট্যাঁপা-মদনার। সকালে কোর্টের আগে ঘণ্টা দুই, আর সন্ধ্যায় ঘণ্টা দু তিন।

প্রথম প্রথম উৎসাহ ছিল, আর নেই।

ট্যাঁপা ধিক্কারের গলায় বলল, "কোমপালছাড়ি দাবা খেলা
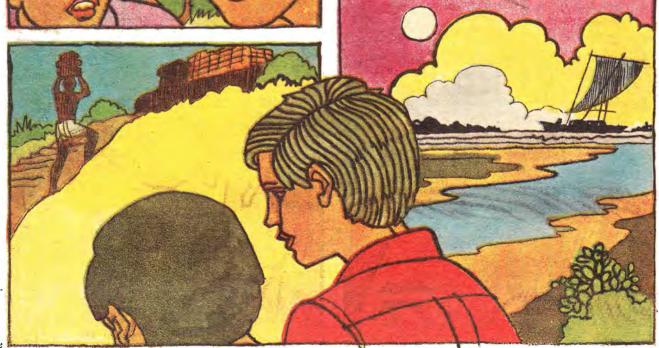
দেখ! এর নাম চাকরি! এর থেকে বেকার থাকাও ভাল।''

''ট্যাঁপা, কতদিন বলেছি কোমপালছারি নয় কম্পালসারি।"

"ওই হল!" ট্যাঁপা বলল, ''বোঝানো নিয়ে কথা। আর ভাল্লাগছে না।''

অথচ এক সময় ভারী ভাল লেগেছিল।

'গজ উকিলের হত্যা রহস্য' ভেদ হবার পর, রহস্য-ভেদে ট্যাঁপা আর মদনার অবদান স্মরণ করে গজ উকিল বলেছিলেন, "তোরা এখানে খাবি-দাবি, বেড়াবি, পয়সা লাগবে না। আমার টাকার গদিটা বড্ড ঢিবি হয়ে উঠেছে, পিঠে ফোটে, ভাবছি একটু হালকা করে ফেলব। তো তোদের দিয়েই বউনি হোক। কিন্তু খবরদার, আর কক্ষনো লোকের পকেট মারতে যাবি না।"

শুনে দুজনের চারখানা হাত চারটে কানে উঠেছিল।

তবু মদনা একবার গুনগুন করে বলেছিল, "বিনি পয়সায় খাওয়া? সুখের ষোল কলাই হল স্যার, তবে কিনা বেকার হয়ে গেলাম, এই যা। কোনো 'কাজ' রইল না।"

তখন গুপি মোক্তার আর গজ উকিল পরামর্শ করে বলেছিল, "ঠিক আছে, তোদের জন্যে একটা চাকরি ঠিক করলাম। দৈনিক সকাল-সন্ধে দু' ঘণ্টা দু' ঘণ্টা চার ঘণ্টা আর পাবলিক ছুটির দিনে হয়তো দু দশ ঘণ্টা। এই! ভাল মাইনে পাবি। কর্মে নিষ্ঠা রাখবি। ভবিষ্যতে উন্নতি অবধারিত।"

ট্যাঁপা মদনা অবশ্য ওই 'কর্মে নিষ্ঠা' দিয়ে শুরু করা কথার লাইনটা তেমন বুঝতে পারেনি, তবে চাকরিটা কী, তা বুঝেছিল। আর কিছুই নয়, ওনারা দুই বন্ধু যখন দাবা খেলবেন, বসে বসে দেখতে হবে। দেখতে-দেখতেই শিখে যাবে। আর শিখে ফেলা মানেই তো জগতের উপকারে লাগা!...নয় কেন? এমন যদি হয়, কেউ পার্টনারের অভাবে খেলতে পাচ্ছে না, দাবার ছক পেতে বসে

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে, তখন তো তোমরা তাদের সেই দুঃখ মোচন করতে পারবে?

আর এমন অবস্থা তো হলেই হল! জীবন পদ্মপত্রে জল, কে কখন আছে, কখন নেই। এই তো গজ উকিলই তো 'নিহত' হয়ে গিয়েছিলেন, নেহাত নাকি বেঁচে ফিরে এসেছেন।

তা চাকরিটার কথা শুনে প্রথমটা মহাফূর্তিই হয়েছিল। ওদের! বসে-বসে একটু খেলা দেখা। তার বদলে দিব্যি ভাল মাইনে। হেসে-খেলে হাত খরচা চলে যায়। কম মজা! এই তো আগে পঞ্চাশ পয়সার বাদাম ভাজা দুজনে ভাগ করে খেতে হয়েছে, হয়েছে চল্লিশ পয়সার ঝালমুড়ি।

এখন এক জনেই আশি পয়সা করে বাদাম নিচ্ছে, ইচ্ছে হলে আবার ডাকছে বাদামওলাকে। মন হলেই আইসক্রীম, মালাই কুলপি! তাছাড়া রোজ বাস-ট্রাম ভাড়া দিয়ে গঙ্গার ধারে এসে বসা!...এত সব কি আর বারো মাস হত? পকেট কাটার ব্যবসা। যার মানে হচ্ছে, কখনো বন্যা কখনো খরা।

প্রথম-প্রথম তাই ভেবেছিল, এমন সুখের চাকরি বিশ্বভুবনে আর আছে নাকি! আহা।

কিন্তু এখন ক্রমশই 'বোর' লাগছে। এত 'বোর' যে, জীবনটা বাসিমুড়ির তুল্য লাগছে। লাগছে খড়ের জাবরের মতো।

মাঝেমধ্যে যে একটু কামাই করবে, তারই কি জো আছে? সময় পার হল কি না হল, শুরু হয়ে যাবে ডাক-হাঁক, 'এই ট্যাঁপা, এই মদনা, এত লেট যে? চলে আয় ঝটপট!'

ডাকতে ওনাদের কোনো খাটুনি নেই, পায়ে হেঁটে আসতে হয় না, লোক পাঠাতেও হয় না। নিজের ফ্ল্যাটের বাথরুমের জানলা থেকেই তো কাজ মিটে যায়। ওই বাথরুমের পিছনটাতেই তো ট্যাঁপাদের বস্তি। ...ওই ডাক শুনতে পেলেই বাড়ির লোকও বলবে, 'অ ট্যাঁপা, তোর আপিসের সায়েব যে ডাকতেচে।'... 'অ মদনা, দোরের গোড়ায় আপিস, তাও লেট কচ্চিস ক্যানো? যা তাড়াতাড়ি।'

তার মানে ঘরে-বাইরে শত্তুর। এদের হাত এড়াতে হলে, স্রেফ সটকান দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

হ্যাঁ, সটকানই দিতে হবে।

মদনা বাদামের খালি ঠোঙাটা গঙ্গার জলে ছুঁড়ে দিতেই ট্যাঁপা ইস-ইস করে উঠল, "ভাল করে না দেখে ফেলে দিলি মদনা? তলায়-ফলায় আটকেও থাকে দু' একটা।"

বলে নিজের হাতের ঠোঙাটা ছিঁড়ে ফেলে ঝেড়ে দেখে তবে গঙ্গায় ভাসাল। তারপর বলল, "বাদামওলাটাকে ফের দেখতে পেলে, আচ্ছা করে কড়কে দেব। একেবারে 'অখাদ্য মাল' নিয়ে লোক ঠকিয়ে বেড়ানো!"

মদনা একটু উদাস হাসি হাসল। তারপরে বলল, "ওটাই তো পিরথিবির সেরা আমোদ রে ট্যাঁপা! এই যে আমরা লোকের পকেটে কাঁচি চালাতাম, শুধুই কি আর টাকার জন্যে? লোকটা পরে পকেটে হাত দিয়ে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে ভেবে মজা পাবার জন্যে নয়?"

ট্যাঁপা বলল, "তা নিষ্যাস। সেই একবার এক মস্তান দাদা-বাবুর পেন্টুলের পকেট থেকে মনিব্যাগ বার করে নিয়ে আড়ালে গিয়ে যখন দেখা গেল থাকার মধ্যে শুধু দুটো সিনেমার টিকিট আর পঁচাত্তরটা পয়সা, কী মজাটাই করেছিলি তুই?"

হেসে উঠল দুজনেই।

হ্যাঁ মজাটা বেশ করেছিল বটে মদনা। লোকটাকে ফলো করতে-করতে তার কাছাকাছি গিয়ে মদনা মনিব্যাগটা এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, "মনে কিছু করবেন না দাদা, আপনার টেরিকট পেন্টুলের পকেটের যে এমন দৈন্যদশা, তা জানতাম না। যাকগে, মজুরি হিসেবে সিনেমার টিকিট দু-খানা রাখলাম, পয়সা কটা ফেরত দিলাম। কাটা পকেট নিয়ে হাঁটা মেরে বাড়ি ফিরবেন, সেটা ভেবে প্রাণে বড় লাগল।"

লোকটা সত্যি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

ব্যাগটা হাত বাড়িয়ে না নিয়ে নিজের পকেটটাই হাতড়াতে যাচ্ছিল। কাটা পকেটের মধ্যে দিয়ে যখন হাতটা গলে গেল, তখন হঠাৎ "চোর চোর, পকেটমার পকেটমার" বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

সঙ্গে-সঙ্গেই অবশ্য লোক জমে গিয়েছিল রাস্তায়, কিন্তু কে কাকে ধরবে? ট্যাঁপারাও তো ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে "চোর চোর, পকেটমার" বলে চিৎকার করতে-করতে কেটে পড়েছিল।

"সে একটা মজার দিন গেছে।" বলল মদনা।

"ধরা পড়লে পিটনচণ্ডীও ছিল।" বলল ট্যাঁপা।

"তা হোক, তবু সে-লাইনে লাইফ ছিল রে ট্যাঁপা!"

ট্যাঁপা একটু ভেবে বলল, "তবে কি মরচে-লাগা অস্তর দুখানা আবার শানিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়া হবে রে মদনা?"

মদনা চমকে উঠে বলল, "এই, খবরদার! কান মুলেছি না? যে-হাতে কান মুলেছি, সেই হাতে আবার সেই অস্তর ধরব? দেখিস না তদবধি আমি আর কাঁচি নিয়ে নোখ কাটি না। নেল কাটার কিনেছি।"

"কাঁচি নিয়ে নোখ কাটিস না?"

"না, নিশ্চয় না। তাতে কাঁচি ধরা হয় না? নাঃ, ও কাজ আর নয় ট্যাঁপা। উপায়ের মধ্যে নিজেরাই কেটে পড়া।"

তাই হল। লোকের পকেট কাটার বদলে নিজেরাই কেটে পড়ল ওরা। বসে-বসে দুই বুড়োর দাবার চাল দেখার হাত থেকে তো রেহাই পাওয়া যাবে।

ট্যাঁপা একবার বলেছিল, "ঘরে গিয়ে দুটো জামা-পেন্টুল নিয়ে এলে হত না মদনা?"

মদনা রেগে-রেগে বলেছিল, "শুধু জামা-পেন্টুল-বিছানা-বালিশ নয়? চাল-ডাল তেল-নুন? হাঁড়ি-কড়া কয়লা-কেরোসিন? নিরুদ্দিশ হতে হলে সব কিছু ছাড়তে হয় রে ট্যাপা। তবে বলি, চিরুনিখানা পকেটে আছে?"

"তা আছে।"

"ওতেই হবে।" বলে ঘাটের ধার ধরে হনহন করে হাঁটতে থাকে মদনা।

কিন্তু এত হ্যানস্তাতেও ট্যাঁপা ওর পিছু-পিছু চলতে-চলতে আবার একবার বলে ফেলে, "আজ মাস শেষ হল। আমাদের মাইনেটা নিয়ে এলেও হত রে। পয়সার অভাবেই যত অসুবিধে। থাকলে সকল অসুবিধে নিবারণ!"

"ঘরে গিয়ে মাইনেটা নিয়ে আসা? এই কথা বলছিস তুই?" মদনা তামাশার গলায় বলে ওঠে, "তার থেকে খপরের কাগচে ছাপিয়ে দিয়ে গেলেও হয়—আমরা নিরুদ্দেশ হতে যাচ্ছি।"

অপমানিত ট্যাঁপা একটু গুম্ হয়ে থেকেই বলে উঠল, "কথাটা বললি বলেই মনে এল, রিদয়ে বড় বাসনা—একবার খপরের কাগচে নাম বেরোক, ছবি উঠুক।"

মদনা মুচকি হেসে বলল, "এই তোর বাসনা? তো চটপট খুন হয়ে যা। কাগচে ছবি-টবি-নাম বেরিয়ে যেতে পারে।"

ট্যাঁপা রাগী ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে বলে উঠল, "চটপট খুন হয়ে যাব? খুনটা করবে কে? তুই বোধহয়?"

মদন হেসে উঠল, "আহা খেপে যাচ্ছিস কেন? বললাম একটা কথার কথা। খপরের কাগচে ছবি ওঠার বাসনা তোর প্রাণে। তো ও ছাড়া আমাদের আর ছবি ওঠার আশা কোথায়?"

ট্যাঁপা কড়া গলায় বলল, "খুন হলে নয় ছবিই ছাপা হল, তো নামটা? সেটা কি আমি গলায় পদক করে ঝুলিয়ে 'নিহত' হতে যাব? লিখব, মহাশয় আমি শ্রীট্যাঁপাগোপাল দাস! দয়া করে আমার একটি ছবি তুলে কাগচে ছাপিয়ে দেবেন। তা তখন তো আবার 'শ্রী'ও থাকব না, চন্দরবিন্দু হয়ে যাব।"

"সেও একটা কথা বটে!" হেসে উঠে বলল মদন।

ট্যাঁপা ঘোঁত ঘোঁত করে বলল, "আর যদি তাই হল, সে-ছবি আমি নিজ চক্ষে দেখতে পাব?...মড়া হয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকব না?"

"জ্যান্ত থাকতে কাগচে ছবি দেখতে চাস তুই?" মদনা মুচকি হেসে বলল, "তবে না হয় উল্টোটাই কর। নিজে 'নিহত' না হয়ে অন্য কাউকে 'নিহত' করে ফেল। তাতেও নাম ছাপা হতে পারে।"

গজ উকিলের বাড়িতে নিত্য হাজিরা দেওয়ায় এই একটা উপকার হয়েছে ট্যাঁপা-মদনার। দাবার চাল দেখা এড়াতে চোখের সামনে বাংলা কাগজখানা খুলে ধরে থাকে। আর থাকতে-থাকতে হোঁচট খেয়ে-খেয়ে পড়েও ফেলতে পারছে। কাজেই কিছু 'কাগুজে' কথাও শিখে ফেলেছে। 'হতাহত' নিহত আহত এই-গুলোই রোজ রোজ বেশি-বেশি চোখে পড়ে তো?

কিন্তু ট্যাঁপা এখন দারুণ চটেছে। তাই ভয়ানক চড়া আর কড়া গলায় বলে ওঠে, "তো খুন করার পর আমি কি সেই নিহত'র মাথা কোলে নিয়ে বসে থাকব? যতক্ষণ না খপরের কাগজের লোক আসে! আয় তবে তোকেই খুন করে ফেলে তাই করি। তোর মরণের শোক করাটাও হয়ে যাবে।"

হো হো করে হেসে উঠল মদনা, "ডবল কাজ হয়ে যাবে বল। কাগজে ছবিটাও উঠে যাবে, একজন অজ্ঞাতনামা যুবক বলে।"

হেসে ফেলল ট্যাঁপাও। তারপর দুঃখ-দুঃখ গলায় বলল, "জীবনের একটা বাসনা নিয়ে ঠাট্টা করিসনে রে মদনা। হলেও হতভাগা, মানুষ মাত্তরেরই কিছু-না-কিছু বাসনা থাকে। যাক বেঁচে থাকলে কী না হয়। ট্যাঁপার সাধও মিটতে পারে।"

নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার জন্যে ওরা স্নানের ঘাটের দিকটা এড়িয়ে দিয়ে গঙ্গার ধার ধরে-ধরে চলছিল।...'গঙ্গার ধার' কথাটা শুনতে যেমন সুন্দর, সব জায়গায় আসলটা তা নয়। নোংরার একশেষ, হাঁটা দায়। তবু গা ঢাকা দিতে এটাই সুবিধে।

বাগবাজারের ঘাটে মাল চালানের নৌকো-টৌকো আসে। ইঁট বোঝাই, কাঠ বোঝাই, তুলো বোঝাই। কত কী। এক রকম নামায়, আর-একরকম ওঠায়। এদের, মানে ট্যাঁপাদের মতলব ছিল ওই রকম কোনো একখানা নৌকোয় যদি চেপে পড়া যায়। তবে যাবে অনেক দূর!

মদনা বলল, "তুই অবিশ্যি তুতোতে-পাতাতে ভালই পারিস, তবু মাঝি-মাল্লার সঙ্গে কথাটা আমিই কইব রে ট্যাঁপা, মনে কিছু করিস না।"

"মনে কেন করব? তোমার তো আমার থেকে বুদ্ধি বেশি।"

"না না তা নয়," বলেও মদনা নিজেই এগিয়ে গেল। একটা ইঁট-বোঝাই নৌকার দিকে। ঠিক 'বোঝাই' নয়, বোঝা খালি হচ্ছে। রাস্তার ওপর উঁচুতে একটা বিরাট লরি দাঁড়িয়ে, কিছু কুলি নৌকো থেকে ইঁট নামিয়ে-নামিয়ে ঘাটে সাজিয়ে-সাজিয়ে রাখছে, কিছু কুলি সেখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে লরিতে তুলছে। ...সেখানেও দু' ভাগে কুলি, এরা মাথায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, লরির মধ্যে থেকে কিছু লোক হাত বাড়িয়ে-বাড়িয়ে ওদের মাথা থেকে তুলে নিচ্ছে।

কাজেই ওই এক নৌকো ইঁট লরিতে চাপান হতে খুব যে সময় লাগল, তা নয়। শুধু কুলিদের পায়ে-পায়ে গঙ্গার ধারের অনেক মাটি ঘাটের সিঁড়িতে উঠে আসছে, আর সেখানে কাদা-জলের হ্রদ সৃষ্টি হচ্ছে।

চটচটে এঁটেল মাটি, পা ঠেকানো মাত্র হড়কে নেমে যাচ্ছে, তবু পা টিপে-টিপে সাবধানে নৌকোর কাছ পর্যন্ত চলে এল মদনা।

মেড়-মাঝি তখন মাল খালাস করে ফেলার নিশ্চিন্ততায় গামছা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছে।

মদনা চলে এল আর ট্যাঁপা দাঁড়িয়ে থাকল তা অবশ্য নয়। সেও পা টিপে-টিপে পিছু-পিছু এসে হাজির হল। ...ক্রমশই কাদা থসথসে হয়ে আসছে, কারণ একেবারে ধারে জলের ঢেউ লাগছে।

পা বসতে-বসতে হাঁটু পর্যন্ত কাদায় ডুবে পয়লটু। প্যান্টেরও বারোটা বেজে গেছে। কত আর গুটোবে? চোঙা প্যান্টের পা কতই বা গোটানো যায়?

কোনোমতে হাত বাড়িয়ে নৌকোর কোণটা চেপে ধরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল মদনা। তারপর বলে উঠল, "এ নৌকো কোথা থেকে এয়েছে কর্তা?"

মাঝি বেজার আর বিরক্তি-মাখা চোখে তাকিয়ে অগ্রাহ্যভাবে বলল, "ক্যান্? কী দরকার?"

"না, এমনি, মানে—"

মদনা একটু হাসি-হাসি মুখে বলল, "আবার ফিরবে তো সেখানে?"

মাঝি তার কাঁচা-পাকা ভুরুটা কুঁচকে নিমপাতা-চিবোনো গলায় বলল, "ফ্যাচ্-ফ্যাচ করতেচেন ক্যান? কামডা কী?"

ওর কথা শুনে নৌকোর ছইয়ের ভিতর থেকে আর-একজন বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। বলল, "হয়েছেডা কী?"

"কিছু না! এই বাবু শুদোচ্ছেন, নৌকো কোতাকার, যাবে কনে, এই সব।"

সে-লোকটা প্রায় মারমুখী হয়ে বলে উঠল, "ক্যান? বাবু কি জল-পুলিসের প্যায়দা?"

মদনা সবিনয়ে প্রায় হাতজোড় করেই বলে ফেলল, "না কর্তা, আমরা নেহাতই তুচ্ছ লোক। শুধু—"

তারপর গলার স্বর নিচু করে বলল, "আমরা দু বন্ধুতে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে চাই, তাই—"

দ্বিতীয় লোকটা খিঁচিয়ে উঠে বলল, "কী হতে চান?"

"আজ্ঞে, কর্তা, হারিয়ে যেতে চাই।"

"অ্যাঁ, কী বললে হে? এই দুম্বো ধাড়ি দুটো ছেলে হারিয়ে যেতে চাও?" এক কথায় 'আপনি' থেকে 'তুমি'।

লোকটা খ্যাঁকশেয়ালের মতো খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে উঠল। আর প্রথম লোকটা চড়া গলায় বলে উঠল, "মেলা দিক কোরো না তো বাবু। হারিয়ে যেতে সাদ হয় হারাও গে। এত বড় পির্থিমিখানা পড়ে আচে, কেউ মানা করে নাই।"

কিন্তু মদনা কি আর এত সহজে হেরে ফিরে যাবে? মোটের মাথায় সে তো হারাতেই চায়। হারিয়ে দিতেও বলা যায়।

নাছোড়বান্দা কাকুতি-মিনতি জুড়ে দেয় সে। এবং যা বোঝাতে থাকে ওদের, তা হচ্ছে—পৃথিবী ছেড়ে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে হলে আলাদা কথা, এই তো সামনেই মা-গঙ্গা রয়েছেন, ঝাঁপ দিলেই তো হয়ে গেল। কিন্তু—পৃথিবীর মধ্যে থেকে হারিয়ে যাওয়া বড় শক্ত।...এই যে ওরা দুই বন্ধু চলে এসেছে, নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে হারিয়ে যেতে পারে? এক্ষুনি বাড়ি থেকে দিকে-দিকে লোক ছুটবে, থানা-পুলিসে খবর চলে যাবে, হাওড়া-শেয়ালদায় পাহারা বসে যাবে, খবরের কাগজে ছবি দিয়ে পুরস্কার ঘোষণা করা হবে। শেষ অবধি হারিয়ে যাওয়ার সাধের বারোটা বেজে যাবে। কিন্তু ইঁট চালানের নৌকোতে কি কেউ খুঁজতে আসবে? তা আসবে না! কাজেই এইটা নিরাপদ ভেবেই বেচারা মদনকুমার লস্কর—'কর্তা'র এত খোশামোদ করছে।

মদনার বাক্য-ছটায় মাঝি-কর্তা মোহিত না হলেও ট্যাঁপা শুধু মোহিত নয়, বিমোহিত হয়। কী নির্জলা বাজে কথার চাষ চালিয়ে চলেছে মদনা।

ট্যাঁপা-মদনা হারিয়ে গেলে এত হুলিয়া পড়ে যাবে? খুঁজতে দিকে-দিকে লোক ছুটবে? থানা-পুলিসে খবর চলে যাবে? ইস্টিশনে পাহারা বসবে? খপরের কাগজে ছবি ছেপে 'পুরস্কার' ঘোষণা করবে? কে করবে? হি হি!...
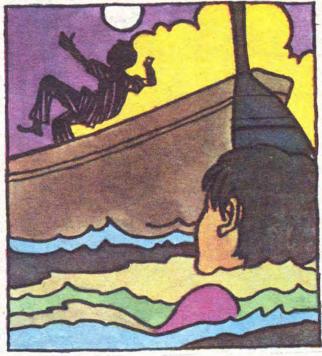
হাসি চাপতে খিক-খিক করে কাসতে থাকে ট্যাঁপা মুখে হাত চাপা দিয়ে।

আরো করুণ আর কাতর মিনতি করতে থাকে মদনা। তারা আর কিছু চায় না, শুধু কলকাতা-ছাড়া হতে চায়।

এতক্ষণে লোকদুটো কিঞ্চিৎ নরম হয়ে নিজেদের মধ্যে কী যেন ফিসফিস করে বলাবলি করে নেয়, তারপর এদিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, "ভাড়া দিতে হবে। মাথা পিছু পাঁচ টাকা করে।"

মদনা অম্লান বদনে বলে, "ভাড়া? ভাড়া কোথায় পাব কর্তা? বললাম তো বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। এই দ্যাখো, এক পোশাকে। সঙ্গে-সাথে একটা জিনিস নেই।"

দ্বিতীয় লোকটা খিঁচিয়ে বলে, "ভাড়া কোতায় পাব? ওরে আমার সোনার জাদু! অমনি-অমনি তোমায় নৌকোয় চাপিয়ে গঞ্জের ঘাটে নে যাবো! হবে না। হবে না। ভেগে পড়ো।"

ট্যাঁপা এতক্ষণ মনে-মনে মদনার বুদ্ধির তারিফ করছিল, কিন্তু এখন নিন্দে করতে শুরু করল। ...ইশ্! পাঁচটা টাকার জন্যে এই লাঞ্ছনা! মাইনেটা নিয়ে এলে কি এইটি হত? তারপর ভাবল, দু' জনের পকেট কুড়িয়ে চার-পাঁচ টাকাও তো হয়ে যেতে পারে, তাতেই যদি—

আর নীরব থাকতে পারল না. চেঁচিয়ে বলে উঠল, "মদনা!"

মদনা ওর মনোভাব অনুমান করে ফেলে মনে-মনে হাসল। হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "যাচ্ছি! তোকে ধরে উঠিয়ে নিয়ে আসছি। কাদায় পা বসে গেছে তো? ব্যবস্থা হচ্ছে! এই কর্তারা দয়া করে রাজি হয়েছেন—"

"রাজি আবার কখন হনু?"

কাঁচাপাকা-ভুরু বলে ওঠে, "বাজে কতা কও ক্যানো? রাজি-টাজি লয়। কেটে পড়ো বাবারা।"

কিন্তু মদনা এখন ছিনে জোঁকের ঠাকুর্দা। 'কর্তা কর্তা' করে জিভ মোটা করে ফেলল, হাত ঘষে-ঘষে হাতের ছাল খইয়ে ফেলল।

কত পয়সা কামাচ্ছে মাঝি, জীবনে একবার না হয় দুটো ছেলের জীবনের পরম সাধ মেটাতে একটু লোকসান খেল! লোকসানই বা কী? এক কোণে এতটুকু একটু জায়গা দেওয়া।

লোক দুটো আবার নিজেরা অন্যের অবোধ্য ভাবে কী যেন বলাবলি করল, তারপর বলে উঠল, "তো আসো! কিন্তুক মোদের না বলি কোতাও নেবে যাওয়া চলবেনি।"

"সে কী? তোমাদের না বলে কোথায় নামব?"

মদনা যেন শিউরে ওঠে। "জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব নাকি? সাঁতার জানি? না কি তোমাদের গঞ্জ-টঞ্জ কেমন চিনি? যেখানে ছেড়ে দেবে সেখান থেকেই আবার নতুন করে হারাতে আরম্ভ করব কর্তা।"

বলে নৌকোর কোণ ছেড়ে আবার তেমনি হাঁটু অবধি পা ডুবিয়ে ঘাটের ধারে চলে আসতে-আসতে চেঁচায়, "চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক্ ট্যাঁপা! আমি ধরে নিয়ে আসছি। তোর তো পায়ের দোষ!"

ট্যাঁপা মদনের মতো চালাক না হলেও, বোকা নয়। ইশারাটা বুঝে নিয়েছে। বুঝেছে, ওকে ধরে-ধরে নিয়ে যাবার ছুতো করে চুপিচুপি কথা বলে নেবে মদনা। তাই বোকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েই থাকে, পায়ের দোষের ভঙ্গিতে।

ঠিক তাই। মদনা ট্যাঁপার দুটো হাত ধরে আস্তে আস্তে পিছিয়ে-পিছিয়ে নামতে-নামতে বলে, "উঃ, কী ঘোড়েল বুড়ো দুটো!"

ট্যাঁপা রেগে বলল, "তা অমনি সোয়ারি নিতে কে আবার রাজি হয়? তখনই বলেছিলাম—"

"দূর হাঁদা। একবার টাকা দেখলে কি আর বিশ্বাস করবে আমরা সত্যি ঘর-পালানো ছেলে! কেবল-কেবল টাকা চাইবে।"

"আহা, আমরা তো ওদের নৌকোয় চিরকাল থাকতে যাচ্ছি না!"

মদনা একটু রহস্যময় হাসি হেসে বলল, "কে জানে

...কাল! ওরা এখন মস্ত দাঁও পেয়েছে ভেবে রাজি হয়েছে।"
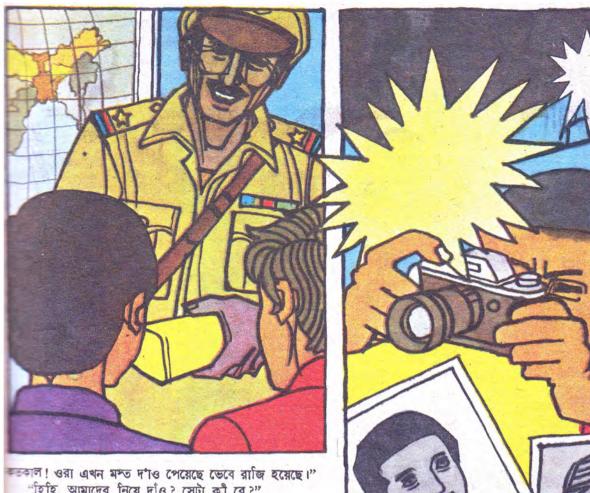
"হিহি, আমাদের নিয়ে দাঁও? সেটা কী রে?"

"এই চুপ! বেশ বুঝেছি ওরা ঠিক করে নিয়েছে আমাদের ...টকে ফেলে, আমাদের বাড়ি থেকে যে 'পুরস্কার ঘোষণা' ...বে, সেটা নিয়ে নেবে। নইলে 'ব্ল্যাকমেল' করবে।"

"কী করবে?"

"আহা, ওই যে সেদিন শুনলি না, লোকেদের ছেলেমেয়ে কি ...পনজনকে আটকে রেখে, অনেক টাকা চায়। না দিলে তাকে ...রে ফেলবে বলে ভয় দেখায়। ...আরো আস্তে ট্যাঁপা, আর ...লেই ওরা আমাদের কথা শুনতে পারে।"

যদিও ওদের 'শুনিয়ে শুনিয়ে' মাঝে-মাঝেই কথা শুনিয়ে ...ছে মদনা, "এই ট্যাঁপা, একটু চেপে! আর-একটু সামাল, হ্যাঁ ...ক আছে।" আহা, ট্যাঁপার পায়ের দোষ না?

ট্যাঁপা খুব ফিসফিসিয়ে বলে, "তোর যেমন কথা মদনা, ওই ...ভুতুম মাঝি দুটো অতসব জানে?"

"জানে না মানে?" মদনা চেঁচিয়ে ওঠে, "এই ট্যাঁপা, অমন ...ড়াচ্ছিস কেন? ভাঙা পা আবার ভাঙবি?"

...লে কৌশলে ট্যাঁপার কানের কাছে মুখ দিয়ে বলে, "ওরা ...য় খেলিয়ে গজু-গুপিকে একহাটে বেচে আর-একহাটে কিনতে ...রে, বুঝলি? তো আমরা কী ছার! তবে সর্বদা মনে রাখিস ...তোর একটা পা খারাপ। তুই খোঁড়াস।"

"কোন পা'টা রে?"

"সে তোর যেটা সুবিধে।"

"যদি ভুলে যাই? দু'বার দু দিকে খোঁড়াই?"

"এই খবরদার! ঠিক করে নে, ডান পা। বুঝলি? ডান পা।"

ওরা নেমে এসে বহু কসরত করে কাদাজলের হ্রদ থেকে পা ...ল তুলে ডিঙিকোয় চেপে বসল। অবিশ্যি মাঝি দুটো একটু সাহায্যও করল। তবে দ্বিতীয়টা শেয়ালের মতো খেঁক হাসি হেসে বলে উঠল, "খোঁড়া ন্যাং ন্যাং ন্যাং! কার বাড়িতে হাড়ি খেয়েচ, কে ভেঙেছে ঠ্যাং?"

ট্যাঁপা রাগে জ্বলতে-জ্বলতে পায়ের কাদা চাঁছতে থাকে। আর মদনা গায়ের জামাটা খুলে ঝুলিয়ে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে পা সাফ করতে-করতে মোলায়েম গলায় বলে, "দেখিস ট্যাঁপা, আবার যেন ব্যথা-পায়ে জোর দিয়ে ফেলিসনে।"

*

সকালবেলা এই দুই বন্ধুকে অ্যাবসেন্ট দেখে ওই দুই বন্ধু বাথরুমের জানালা দিয়ে সিংহনাদ ছাড়েন, "মদনা! মদনা। ট্যাঁপা। ট্যাঁপা...কাল সন্ধেয় আসিসনি, আবার আজ সকালেও কামাই? ভেবেছিস কী?" সাড়া পান না।

ডাকেন, "ও বাপ মদনকুমার, ও বাবা ট্যাঁপাচরণ, তোমরা আজ উধাও কেন? চলে এসো। কামাই করলে মাইনে কাটা যাবে যে!"

কিন্তু নো সাড়া। সব ডাকই শূন্যে ঢিল, ভস্মে ঘি!

আবার ডাকেন গজউকিল, খবরের কাগজের চোঙ করে

লাউডস্পীকার বানিয়ে ও উচ্চস্বরে "মদন, বাপধন! ট্যাঁপা, মানিক আমার! তোমাদের অভাবে যে আমরা খেলতে বসতে পারছি না। চলে এসো। বসে গেলে তো আর হুঁশ থাকবে না তোমরা হাজরে দিলে না অ্যাবসেন্ট হলে। ওরে মদন, এত ডাকাডাকিতেও ঘুম ভাঙছে না তোদের?"

এতক্ষণে নীচের বস্তি থেকে একটি ভাঙা কাঁসির আওয়াজ পাওয়া যায়, "উকিলবাবু কি আমার নাতি মদনা মুকপোড়াকে ডাকতেচো? তো সে মুকপোড়া তো কাল থেকে হাওয়া। সঙ্গে তার সেই পাজিবদমাস বন্দুটা। আপনি যারে ট্যাঁপা ডাকতেচ। কেষ্টগোপালের ব্যাটা ট্যাঁপাগোপাল! কাল দুকুর থেকেই হাওয়া।"

গজু জোর চিৎকার করেন, "কী সর্বনাশ! দু-দুটো ছেলে কাল থেকে হাওয়া, তোমরা খুঁজছ না?"

ভাঙাকাঁসির আরো ভেঙে খানখান হয়ে বলে, "খুঁজব আবার কনে? ঠিকানা রেকে গেচে?"

"কী আশ্চর্য! তো গাড়ি-ফাড়ি চাপা পড়ল কিনা—"

মদনকুমারের ঠাকুমার গলা এখন ভিজে ঢোলের মত ঢ্যাব-ঢ্যাব করে, "ওই মানিকজোড় জগাই-মাদাই দুটোরে চাপা দিয়ে জব্দ করতে পারে অ্যামন গাড়ি এখনো জগতে ছিষ্টি হয় নাই বাবু। নিশ্চিন্দি থাকো!"

উকিল মোক্তার, এই দুই মানিকজোড়ই একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠেন, "ডেঞ্জারাস লৌড়ি!"

কিন্তু তাঁদেরও তো একটা দায়িত্ব আছে? ছেলেদুটোকে খোঁজার। তাঁদের কাছে চাকরি করে যখন। কী করা যায় বলাবলি করতে করতে দাবার ছক পাতলেন। আর তারপরই ভুলে-গেলেন পৃথিবীতে গজ নৌকো ঘোড়া বোড়ে এ-সব ছাড়া আর কিছু আছে।

ওদিকে ট্যাঁপার সৎমা বলল, "হাতের পয়সা ফুরোলে পেট-কাঁদলে ঠিকই ফিরে আসবে।" এবং মদনার ঠাকুমা বলতে লাগল, "এবার ফিরে এলে, আমি মদনার বে' দিয়ে ছাড়ব। এত দৌরাত্ম্য আর একা-একা সইতে পারিনে। বৌ এসে জব্দ করবে।"

*

ট্যাঁপারা এত সব জানে না। সত্যি বলতে 'বাড়ি' বলে মনেও নেই। একমাত্র চিন্তা, কেউ চেনা লোকে না দেখে ফেলে। ইঁটেরা সবাই লরিতে উঠে গেছে, নৌকোর মধ্যে পড়ে আছে কিছু পাটকেল। মদনা ঝুঁকে পড়ে দেখতে-দেখতে বলে উঠল, "ও কর্তা, এই ভাঙা ইঁটগুলো যে রয়ে গেল। নৌকো সাফ হল না।"

খেঁকিটা খেঁকিয়ে বলে উঠল, "তা'তে তোমাদের কী লোকসানডা হল?"

মদন সরে এসে ছেলেমানুষের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে মজা করার মতো বলে ওঠে, "না, ভাবছিলাম, ওখানটা যদি সাফ করতে হয় তো ওগুলো বেশ ছুঁড়ে-ছুঁড়ে গঙ্গার জলে ফেলি।"

কাঁচাপাকা গম্ভীর গলায় বলল, "খবরদার! আমার নৌকো তোমায় সাফ করতে হবেনি। নেজের চরকায় ত্যাল দ্যাও।"

"তবে আর কী করব।" বলে নৌকোর ধারে বসে পা দোলাতে থাকে মদনা।

ট্যাঁপাও অবশ্য তাই। তবে তার আবার 'পায়ের দোষ', এই যা অসুবিধে।

ট্যাঁপা মাছি ওড়ার শব্দে বলল, "আরো তো নৌকো ছিল, কেন যে এই খেঁকি বুড়ো দুটোর নৌকোতেই চড়তে এলি পায়ে ধরে।"

মদনা মুচকি হেসে বলল, "আছে ব্যাপার!"

"কী শুনি?"

"পরে শুনবি। সময়ে শুনবি।"

এরপর আবার একটা লরি এল রাস্তার সামনে, বড়-বড় চটের বস্তা বোঝাই। তাদেরও একে একে নৌকোয় ভরে ফেলা হল। নৌকোর 'খোল' ভর্তি হয়ে উঁচু হয়ে উঠল। যদিও নৌকো নোঙর করা আছে, তবু মাল তোলার দাপটে দারুণ দোল খাচ্ছে, কাত হয়-হয়।...ট্যাঁপা ভয়ে-ভয়ে বলল, "বাঁধা নৌকোতেই এই, চললে নির্ঘাত ডুবব।"

"ভাগ! ডুবতে যাব কেন?" বলে মদনা গলা তুলে বলল, "এগুলো কিসের বস্তা কর্তা-"

কর্তা কাঁচাপাকা ভুরু কুঁচকে বলল, "এত খোঁজে তোমাদের কী দরকার হে? ঠাঁই পেয়েচ, চুপ মেরে বস্যে থাকো!"

ট্যাঁপা বলল, "কী ছোটলোক!" তারপর সেও গলা তুলে বলল, "এখনো বস্তা চাপাচ্ছ কর্তা? নৌকো ভারী হয়ে যাচ্ছে না?"

"কী বললি?" দ্বিতীয় জন 'তুমি' থেকে 'তুই'তে নামল "নৌকো ভারী হয়ে যাচ্চে? আচ্ছা বকবকানি তো শয়তান দুটোর। বিজন ভাই, ক্যান যে তুমি এ দুড়োরে নায়ে' তুললে। এই ছোঁড়া, বেশি ভারী হলে তোদের দুড়োরে ছুঁড়ে জলে ফেলে দেব, বুজলি?"

তারপর ওরা দু'জনে পালা করে নেমে গিয়ে হোটেলে খেয়ে এল। ফিরে এসে ধীরে-সুস্থে বসে পান খেল, তারপর চেঁচিয়ে ঘাটের ওপর দাঁড়ানো কাকে প্রশ্ন করল, "রাত কডা মামু?"

জবাব এল, "দশডা।"

"আলিভাই, নৌকো ছাড়ো।"

নোঙর খোলা হল। নৌকো ছাড়ল।

প্রথমটা টালমাটাল, গেল বুঝি উল্টে ওই বস্তার পাহাড় নিয়ে। তারপর স্থির। তখন আবার চলছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

ট্যাঁপা চুপিচুপি বলল, "নিজেরা খাওয়া-দাওয়া করে এল, আমাদের একবার বললও না। মনিষ্যত্ব বলে কিছু নেই।"

"সক্কলের যদি মনিষ্যত্ব থাকবে তবে তো পিরথিবিটা সগ্‌গো হয়ে যেত রে ট্যাঁপা। চুপ থাক্। একরাত না খেলে মানুষ মরে না।"

এত আস্তে কথা, তবু ওদের কানে পৌঁছেছে। একজন বলে উঠল, "খাওয়ার কথা কী বলতেচিস রে?"

মদনা তাড়াতাড়ি বলে, "না, কিছু না। আমার এই বন্ধুটা খিদে সইতে পারে না, তাই বুঝ দিচ্ছি।"

"ও! খিদে সইতে পারেনি।...নবাবের নাতি এয়েচেন হ্যাত!"

মদনা বলল, "দেখলি তো? তা তোর কেন খিদে পেল রে ট্যাঁপা? আমার তো সেই আশি পয়সার বাসি বাদাম, পেটের মধ্যে বসে পাঁচ টাকা আশির হয়ে উঠেছে।"

"সে তো আমারও। তাই বলে রাত্তিরে খাব না?"

"না, খাবি না। ঘুমো।"

বসবার জায়গার অভাবে ওরা দুজনে দুটো বস্তার উপর বসেছে।

বসে-বসে ঢুলুনি আসে।

মাঝিরাও ভাবে এরা ঘুমিয়ে পড়েছে, নিজের মনে নিজের ভাষায় কথা কয়ে চলে।

হঠাৎ মদনা ট্যাঁপার গায়ে আঙুলের একটা খোঁচা দিয়ে বলে, "ওদের কথা বুঝতে পারছিস?"

"না তো!"

"একটা 'রহস্যো' প্রেকাশ হয়ে গেছে।...এই চুপ চুপ নড়িস না।"

অতএব কেউ আর নড়ে না।

রাত বাড়তে থাকে।

নিকষ অন্ধকার রাত। আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই, শুধু ঘন কালো মেঘের চাদরে ঢাকা। সেই ঘনছায়া পড়েছে গঙ্গা

[illegible] সেখানেও তাই নিকষ কালো। এই নিথর অন্ধকারে মাঝির [illegible] বৈঠার একটানা ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ।

বস্তার খাঁজে মুখ গ‍ুঁজে ট্যাঁপা বলল, "তখন কী বলছিলি [illegible]? কিসের রহোস্যো?"

"চুপ, সে এখন বলা যাবে না।"

"ওরা তো দু'জনে নৌকোর দুদিকে। আমরা এই বস্তার [illegible]—"

"তা হোক! মুখে বলতেও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। তার থেকে [illegible] খা।"...বলে মদনা একমুঠো চিনি নিয়ে ট্যাঁপাকে দেয়... [illegible] নিজে সাবড়েছে খানিক।

"চিনি? চিনি কোথায় পেলি?" ট্যাঁপা হাঁ।

"চুপ। পাচ্ছি এই বস্তার মধ্যে চাকু চালিয়ে। বস্তাগুলো [illegible]!"

"সর্বনাশ! যাচ্ছে কোথায় এত চিনি?"

"কে জানে। গরমেন্টের রেশনশপেও যেতে পারে। চোরা-[illegible]রেও যেতে পারে।"

"ও! চাকু কোথায় পেলি?"

"হাতালাম। ওরা যখন মাল তোলায় ব্যস্ত, তখন ছৈয়ের [illegible] থেকে হাত সাফাই করে—পেন্টুলের সঙ্গে গেঁথে রেকেছি।"

"হি হি। তা'লে চিনি খেয়েই পেটভরানো যাক, কী [illegible]—"

কথা শেষ হয় না, কাঁচাপাকা-ভুরু বাঘের মতো গর্জে ওঠে, [illegible]রাত্তিরে আবার কিসের ফিসফিস রে? আলিভাই, এসো [illegible] একবার এদিকে—"

পিছনের মাঝি চলে আসে। খ্যাঁকখেঁকিয়ে বলে, [illegible]টা কী?"

"তুমি ঠিক বলেছিলে আলিভাই, ব্যাটারা নিয্যস টিকটিকি পুলিসের চর। ছোট্ট দুটো ছোঁড়া। পেটে দানা নাই, কোতায় [illegible] মতন পড়ে ঘুমোবে, তা নয় সমস্তক্ষণ হিহি, হুহু, ফিসফিস, গুজগুজ। আবার ইতি-উতি তাকানি।"

আলিভাই হুকুম দেন, "তবে আর নায়ে রাকা ক্যান? দুটো [illegible] মারলেই তো চুকে গেল।"

"সাতার জানে না—"

"তো সেটাই তো ভাল রে। যত ফুটানি সব ফুট্‌ হয়ে [illegible]র জলের তলায় তলিয়ে যাবে।"

শুনে ট্যাঁপার বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। হায় হায়! কেন [illegible] নিরুদ্দেশ হতে এসেছিল গো।...কী সুখেরই জীবন [illegible]! কেন যে অমন দুর্মতি হল! এই সলিল-সমাধি হবার [illegible] তারা ওই একটা পাজি মাঝিকে পায়ে ধরে—ঈশ!...হঠাৎ [illegible] কেঁদে উঠল ট্যাঁপা।

আর তার মুখের মধ্যে ঢোকানো একথাবা চিনি বেরিয়ে এল [illegible] থেকে। ছিটকোতে লাগল বিজনমাঝির গায়ে-মুখে।

"ও বদমাস! আমার বস্তা ছ্যাঁদা করে চিনি খাচ্ছিস? কী [illegible] বস্তা ফাঁসালি? অ্যাঁ? কী করে? হাতে ও কী? চাকু?"

আর দ্বিরুক্তি করে না মাঝি, একটা ছানা-বেড়ালকে টেনে [illegible] ফেলার দেবার মতো করে ট্যাঁপাকে টেনে ফেলে দেয়। ট্যাঁপার [illegible]ত্রাহি চিৎকারের সঙ্গে একটা 'ঝপ' শব্দ।

কিন্তু শুধুই কি ট্যাঁপাকে? মদনকে নয়?

"বদমাস, বিচ্ছু! টিকটিকি, পুলিসের চর—" বলে ওরা [illegible] এক ঝাঁকুনি দিয়ে মদনকেও ঠেলে ফেলে দেয় জলে। আবার একটা শব্দ হয়—ঝপ্‌।

কিন্তু মদনা তো আর কাঁদে না। মদনা তো এইটিই [illegible]ইছিল।...তাই না সেই চাকুটা বাগিয়ে ধরেই রেখেছিল। [illegible] যখন, তখনো হাতে! তাছাড়া—

মদনার জলে ভয় কী? ও তো মাছের মত সাঁতরাতে পারে। ট্যাঁপাও না পারে তা নয়।...বলরাম বোসের ঘাটে গঙ্গায় নেমে তো কত-কতবার ওরা এপার-ওপার করেছে। দুজনেই করেছে।

আলিভাই বলে উঠল, "বিজনভাই, শয়তান দুটো তলিয়ে' গেল? না লড়তেচে?"

বিজন মাঝি বলল, "বুজতেচি না, জল এখনো উথাল-পাথাল। যাকগে, হাত লাগাও। ঝপঝপ 'বেড়ে' পড়ো।"

নিজেও হাত লাগায়। ছপ-ছপ শব্দটা আরো দ্রুত লয়ে ধ্বনিত হতে থাকে। এখন ওদের একমাত্র লক্ষ্য তাড়াতাড়ি পালানো।...কিন্তু...কিন্তু শুধুই কি পালানো? তবে থামে কেন?

থামে। অনেকখানিটা চলার পর অন্ধকারেই কোথাকার একটা ঘাটে নৌকো বাঁধে। সেখানে মিটমিট করে দুটো কেরোসিন বাতি জ্বলছিল।

একজন জোব্বা-জাব্বা পরা, বিদেশীমতো লোক ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। হাতের আলোটা তুলে ধরে কী যেন বলল। আলিভাই ব্যস্ত হয়ে ছইয়ের মধ্যে ঢুকে ভিতরের এক-খানা পাটাতন সরিয়ে ফেলল। তার গায়েই লোহার আংটায় একটা মোটা দড়ি বাঁধা ছিল, দড়িটা ধরে জোরে একটা টান মারল, আর সঙ্গে-সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।...তার কারণ দড়ির আগায় ভারী কোনো জিনিস বাঁধা ছিল না, শুধু দড়িটা জলের মধ্যে গড়াচ্ছিল। তাই টান মারতে গিয়ে নিজেই গড়িয়ে গেল আলি! আর সঙ্গে-সঙ্গে ওই সা-জোয়ান লোক দুটো ট্যাঁপার অধম করে হাউ-মাউ করে কাঁদতে লাগল কপাল চাপড়ে।

হায়। হায়! নেংটি ইঁদুরের সাইজের দুটো ছোকরা এতবড় দুশমনি করে গেল। আমাদের বোকা বানিয়ে গেল।

জলে পড়ার পরই মদনা সাঁতরে-সাঁতরে ট্যাঁপাকে ধরে ফেলে বলল, "খবরদার, মাঝগঙ্গার দিকে চলে যাসনি, ধারের দিক ঘেঁষে সাঁতরে চলে যা। যেখানে হোক ডাঙা পেলেই উঠবি।"

"আর তুই?"

"যাচ্ছি। একটু পরে।"

বলে মদনা তীরবেগে সাঁতার কেটে সেই জায়গাটায় চলে আসে যেখানে তাদের দুজনকে নৌকো থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর যেখান থেকে এখনো নৌকোটা তাড়াতাড়ি পাড়ি দেবার চেষ্টা করছে।

এক দুই তিন। হেঁইয়া হেঁই, হেঁইয়া হেঁই!

মদনা কি মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে? নাঃ! মদনা হাতের ছুরিটা বাগিয়ে তিনটে কোপ মারছে নৌকোর তলা থেকে ঝুলন্ত একটা দোদুল্যমান মোটা দড়ির গায়ে।

কিন্তু শুধুই কি দড়ি? তাহলে কি কোপ খেত? দড়ির আগায় ঝোলানো ছিল একটা বিষম ভারী ছোট বস্তা। তাই দড়ি কাটা গেল। দড়ি কেটে ফেলার সঙ্গে-সঙ্গেই আর-একটা শব্দ হল 'ঝপ্‌'। তবে সে-শব্দ বিজনমাঝির কানে পৌঁছল না। সে তখন টিকটিকি পুলিসের ভয়ে তাড়াতাড়ি নৌকো চালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

ট্যাঁপা আর মদনা আবার যখন একত্র হল তখন ভোর হয় হয়।...প্রায় সারারাত তারা দু'জনে দুজনকে খুঁজতে আথাল-পাথাল সাঁতার দিয়ে মরেছে।...

ট্যাঁপা তো তবু ঝাড়া-হাত-পা, মদনার আবার কোমরে লম্বা-দড়ি পেঁচিয়ে আটকানো একটা ভারী 'পাথর' থলে।

কী আছে সেই থলেতে? আছে—চারখানা ইঁট!

উদ্‌ঘাটন করলেন কেবু ঘোষ। পুলিস-সাহেব। গজ উকিল আর গুপি মোক্তার দু'জনারই চেনা। তা সেই থলে নিয়ে কোথায় আবার বেড়াবে মদনা ট্যাঁপা? গার্জেনের কাছে নিয়ে না এসে সোজা সেখানেই চলে এসেছে। থলির মধ্যে চারখানি চমৎকার লাল টুকটুকে ইঁট।

কোন্ বাহনে

বিমল ঘোষ (মৌমাছি)

নীল নীল নীল সারা আকাশ
ভোরের শিশির ঘাসে,
সাদা কাশের টোপর মাথায়
মাঠ-ময়দান হাসে!
হলুদ সোনা রোদ মাখানো
শিউলি ফুলের বাসে,
পুজোর খবর এসে গেল
শেষ আশ্বিন মাসে।

দেবী দুর্গা কোনও বছর
আসেন চেপে দোলায়,
কোনও বছর চাপেন নৌকো
হাতি কিংবা ঘোড়ায়।
জানতে তো হয় এবার দেবী
কোন বাহনে আসে,
দাদু ওলটান পাঁজির পাতা
দিদুন থাকেন পাশে।

চশমা এঁটে নাকের ডগায়
পাঁজির পাতা পড়ে,
দাদু জানান—"মার আগমন
এবার গজে চড়ে।"
জর্দা-ঠাসা তিন খিলি পান
ফোকলা মুখে ভরে
দিদুন বলেন, "কক্ষনো না
আসবে নৌকো করে।"

বাইরে থেকে তর্ক শুনে
তুতুল মুন্দু হাসে,
গোল মেটাতে ঘরের ভেতর
দৌড়ে চলে আসে।
চেঁচিয়ে বলে, "মা দুগ্‌গা
আসবে এবার বাসে,
প্যান্ডেল তাই হচ্ছে বাঁধা
বাস-গুমটির পাশে।

ছবি সুনীল শীল

হায় হায়! চারখানা ইঁটের জন্যে এত রিস্ক নেওয়া? এত উদ্বেগ? আবার এমন রোমাঞ্চ, এমন উল্লাস! যার জন্যে পুলিস থেকে ট্যাঁপাদের পুরস্কার দিতে চাইছে?

হ্যাঁ, পুরস্কার দিতে চাইছে। তার কারণ ইঁটগুলো রামভারী, বিষম ভারী, অস্বাভাবিক ভারী!...

রহস্য সেইখানেই। ইঁটগুলো পোড়ামাটির নয়, প্লাস্টিকের। আর ইঁটের মতো নিরেটও নয়, ভেতরে ফাঁপা!...ভেতর ফাঁপা প্লাস্টিকের? তবু ভারী? ধাঁধা নাকি? তা' প্রায় তাই।

আসলে অবিকল ইঁটের মতো দেখতে তৈরি ওই প্লাস্টিকের কৌটোগুলোয় ঠাসা ছিল ভারী-ভারী সোনার বাট।

বিজন মাঝি আর আলিভাইয়ের নৌকোয় এই ভাবে সোনা পাচার হয়। পাছে কোনো সময় নৌকো সার্চ হয় তাই ওগুলোকে ছোট বস্তায় পুরে, দড়ি বেঁধে জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয় নৌকোর খোলের একখানা পাটাতন সরিয়ে। সেই দড়ির মুখটা থাকে ওই পাটাতনের সঙ্গেই আটকানো একটা লোহার আংটায় বাঁধা। ওপর থেকে কিছু দেখবার নেই। নৌকোও চলে, ওরাও চলে।...আর 'যথাসময়ে' ওই আলগা পাটাতন সরিয়ে ওদের তুলে নিয়ে কারবারিদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

বহুদিন থেকে নাকি চলে আসছে এই ব্যবস্থা। পুলিস ধরতে পারে না। মদনার চাকু এই চালু কারবারটি খতম করে দিল। যদিও চাকুটা তার নিজেরও নয়। একেই বলে 'যার শিল যার নোড়া তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া'। ওই ছুরিটাই ধরিয়ে দিল আলিভাইকে। নাম লেখা ছিল, আর দোকানের ঠিকানা। বড় একটি গ্যাং ধরা পড়ল এই সুত্রে।

পুঁচকে দুটো ছেলের এই অসম সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা, আর সাঁতার-পটুত্বে সারা শহরে হৈ হৈ পড়ে গেল। দু'চারটে সাঁতারু ক্লাব থেকে আমন্ত্রণ আসে মদনা-ট্যাঁপাকে সম্বর্ধনা দেবার জন্যে। আর যত কাগজের অফিস থেকে আসতে থাকে রিপোর্টার ফোটোগ্রাফার। নেওয়া হয় ফোটো, নেওয়া হয় 'সাক্ষাৎকার'।

কাগজে-কাগজে সেই ছবি। নানা পোজে।

তবে ট্যাঁপাদের মতে, ওদের নিজেদের মনের মতন পোজে তোলা ছবিটাই সেরা হয়েছে।

ওরা বলেছিল, আমরা আর কোনো পুরস্কার চাই না স্যার, শুধু এইরকম একখানা ফোটো কাগজে ছাপা হোক। সেই পোজ হচ্ছে খেলোয়াড়ের পোশাক পরা পাশাপাশি দুই বন্ধু দাঁড়িয়ে, তাদের দুই-দুই চারখানি হাতে, ওই দু-জোড়া বিখ্যাত ইঁট।

তলায় ক্যাপশান, 'ইষ্টকবিজয়ী বন্ধুদ্বয়'।

হৈ চৈ থামলে ট্যাঁপা একদিন বলল, "আচ্ছা মদনা, তুই কী করে টের পেলি?"

মদনা অবহেলায় বলল, "যখনই দেখলাম, ইঁটের গাদা থেকে হঠাৎ চারখানা ইঁট খসিয়ে নিয়ে ওই আলিবুড়ো ছইয়ের মধ্যে ঢুকে গেল, তখনই সন্দেহ চেপে ধরল।...চোখ-কান খাড়া রেখে বুঝে নিলাম, কী করল সেগুলোকে নিয়ে। তক্কে তক্কে থেকে ছুরিখানা বাগালাম।"

"যার জন্যে চিনির বস্তা ছ্যাঁদা করে, হি হি, কিন্তু ওরা যদি আমাদের জলে ফেলে না দিত রে মদনা?"

"যাতে দেয়, তা' করতাম। রাগিয়ে দিয়ে ফেলিয়ে ছাড়তাম।"

"তোর সঙ্গে থাকার গুণে আমারও নামডাক, কাগজে ছবি-ছাপা! আমি তো কিছু না।"

মদনা হেসে বলল, "তা নয় রে, দুজনার বুকের বল। আমার ঠাকমা বলে, অ্যাকা, না ভ্যাকা। তা ছাড়া তুই-ই তো বলেছিলি, ভাগ্যে থাকলে কী না হয়। বলতে পারিস এটা ঘটল তোর ভাগ্যে।"

ছবি সমীর সরকার

চাল ফুঁড়ে মোহর পড়ে

মনোজ বসু

গাঁয়ের মধ্যে অতিথিশালা। পিঁড়ি পেতে বসলেই থালায় ভাত-ডাল এসে পড়বে। সনাতন সর্দারের বন্দোবস্ত। তার নামেই নাম—সনাতন অতিথিশালা।

সনাতন ছিল বড্ড গরিব। নড়বড়ে ঘর—ঘরের চালে খড় থাকে না। বনে সে কাঠ কাটতে যায়। না খেয়ে খেয়ে হাড্ডিসার—একটা দুটো গাছ কাটতেই বেলা কাবার। কাঠ বাজারে নিয়ে যায়. বিক্রি করে চাল-ডাল তরিতরকারি কেনে। বউ আর সনাতন, দুটো মানুষের মাত্র সংসার, সকল দিন তবু খাওয়া জোটে না।

সেদিন বড় দুর্যোগ, অবিরাম ঝড়জল হচ্ছে। সন্ধ্যাবেলা সনাতন কাঠের বোঝা ঝপাস করে উঠোনে এনে ফেলল। বউ বলে, "এখন আর বাজারে যেও না, খদ্দেরও পাবে না অভদ্রার মধ্যে। কেনা-বেচা কাল সকালে। চাল চাট্টি আছে, আর কিছুই নেই।"

সনাতন বলে, "আছে, আছে। তেঁতুল পেকেছে, তলায় ঘুরলে দু-চার ছড়া মিলবেই। খেতে লঙ্কাও আছে। ভাত আর লঙ্কা-তেঁতুল—তোফা হবে।"

খিদে পেয়েছে খুব, ভাত নামাতেই সনাতন খেতে বসে গেল। সবে মুখে তুলতে যাচ্ছে—সেই মুহূর্তে এক থুনখুনে বুড়ি এসে বলে, "আমি অতিথি। সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি, খাব এখানে।"

সনাতনেরও প্রায় তাই। বুনোফল খেয়েছে কয়েকটা—কেওড়াফল ও গোলগাছের ফল। তাতে খিদে মরে না। কিন্তু গৃহস্থবাড়ি অতিথি এসে খেতে চাইছে—এর উপরে কথা কী! উঠে পড়ে সনাতন বুড়িকে তার জায়গায় বসিয়ে দিল। "খাও মা। ভাত আছে, কিন্তু ভাতের উপর লঙ্কা-তেঁতুল ছাড়া আর কিছু দেওয়া যাবে না।"

গবগব করে খাচ্ছে বুড়ি। রোগা-টিঙটিঙে হলে কী হবে, পেটের মধ্যে অঢেল জায়গা। সনাতনের পুরো থালা চেটে পুঁছে শেষ করে ফেলল। ইতি-উতি তাকাচ্ছে। "নেই আর ভাত?" বউ তখন তার জন্য যে ভাত. সমস্ত এনে ঢেলে দিল। সে-ভাতও খেয়ে নিল বুড়ি। তৃপ্তির ঢেকুর তুলল এবার। বলে. "ভরেছে পেট, দিব্যি খেলাম।"

একমুখ হাসি নিয়ে বুড়ি বিদায় হয়ে গেল।

সকাল হলে বাজারে কাঠ বিক্রি করে তবে চাল কেনা। ততক্ষণ উপোস। খিদের চোটে বউ আর সনাতন বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছে। এরই মধ্যে সনাতনের এক ঝোঁক তন্দ্রার
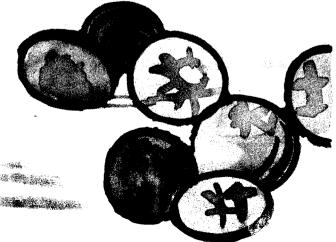
ভাব এসে গেল। আশ্চর্য স্বপ্ন—পরমাসুন্দরী এক মেয়ে এসেছেন তাদের খোড়োঘরে, রূপে চারিদিক আলো হয়ে গেছে। সনাতনকে বললেন, "খিদেয় বড্ড কাতর হয়েছিস—তাই না? আমি বনবিবি, সমস্ত বাদাবন আমার নিয়মে চলে। বুড়ি সেজে তোদের পরীক্ষা করতে এসেছিলাম। বড় প্রসন্ন হয়েছি। সাচ্চা মানুষ তোরা—পরের কষ্ট দেখে নিজের মুখের ভাত তুলে দিস। ভাতের কষ্ট কখনো যাতে না পাস, আমি সেই খোঁজ দিয়ে যাচ্ছি—"

বনবিবি দক্ষিণমুখো হাত লম্বা করে দিয়ে বলেন, "ডাইনে নয় বাঁয়ে নয়—সোজাসুজি চলে যাবি। গিয়ে পড়বি কামারবাজার গড়ে। গড়ের পাশে বটগাছ (বটগাছ এ-অঞ্চলে দেখা যায় না, এই একটাই মাত্র)। বটের একটা মোটা শিকড় নেমে গেছে—শিকড় ধরে খুঁড়তে খুঁড়তে চলে যাবি নীচে। একেবারে নীচে বড়সড় এক পাথর, পাথরের তলে মোহরের কলসি। মগ-ডাকাতদের ভয়ে কামাররাজা পালিয়ে যান, কিছু মোহর তখন ঐখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন।"

ঘুম ভেঙে সনাতন ধড়মড় করে উঠে বসল। বউ বলে, "কী হল?"

সনাতন বলল, "বনবিবি স্বপ্নে এসে গুপ্তধনের খবর বলে গেলেন। আমাদের গরিব দশা ঘুচল এবার।"

পরের দিন বাজার-হাট সেরে কোনগতিকে চাট্টি নাকে-মুখে গুঁজে সনাতন খন্তা-কোদাল নিয়ে বেরুল। বনবিবি যেমন যেমন বলেছেন, ঠিক-ঠিক মিলে যাচ্ছে। কামারবাজার গড়ে বটের শিকড় বেড় দিয়ে সে খুঁড়ে চলল। খুঁড়ছে তো খুঁড়ছেই—দেড়-মানুষ সমান গর্ত হয়ে গেল, পাথরের তবু হদিস নেই। ক্লান্তিতে ক্ষণে-ক্ষণে গাছতলায় গড়িয়ে পড়ছে।

রাত হয়েছে বেশ খানিকটা। অন্ধকার বন। পাথর মিলল এতক্ষণে—খুঁড়তে খুঁড়তে ঠকাস করে খন্তার ঘা পড়ল পাথরের উপর। মোহরের কলসি নিশ্চিত এই পাথরের নীচে। কোদাল দিয়ে চারিদিককার মাটি সরিয়ে দিল। কিন্তু অত বড় পাথর সরানো চাট্টিখানি কথা নয়। কষ্ট আর খিদেয় হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে, এই অবস্থায় সনাতনের একার সাধ্যে কুলোবে না।

খন্তা-কোদাল রইল পড়ে—ধুঁকতে-ধুঁকতে সে বাড়ি ফিরে চলল। দাওয়ার উপরে বউ পথ তাকিয়ে আছে। বলল, "কই, কী নিয়ে এলে?"

সনাতন বলে, "গড় খুঁড়তে-খুঁড়তে পাথরও পেয়ে গেছি। সমস্ত মিলে যাচ্ছে তো পাথরের নীচে মোহরের কলসিও মিলবে ঠিক। কিন্তু একলা আমি পারলাম না। শেষ রাত্রে জোৎস্না উঠবে—খেয়েদেয়ে এক ঘুম ঘুমিয়ে দেহে তাগদ নিয়ে দুজনে আমরা চলে যাব। কেউ তা টের পাচ্ছে না—কলসি ততক্ষণ পাথর-চাপা পড়ে থাকুক।"

কিন্তু টের পেয়ে গেল একজন—একটা চোর। পাড়ার মধ্যে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াচ্ছিল—অন্ধকারে সনাতনের সে পিছু নিল। সনাতনের চলন দেখে তাকেও সে চোর ভেবেছে—পিছন ধরেছে যদি কোন সুলুক-সন্ধান মেলে সনাতনের কাছ থেকে। বেড়ায় কান পেতে সে মোহরের কথা শুনল। আর দেরি করে চোর। কামারবাজার গড় থানা আছে, ছুটল সেখানে। লোকটা যা বলেছে সত্যি, গর্তের নীচের দিকে বিশাল এক পাথর। প্রাণান্তক চেষ্টায় পাথর অবশেষে খাড়া করে দিল সে। রয়েছে বটে কলসি, পাথর-চাপা ছিল এতক্ষণ। আহ্লাদে চোর দিশা করতে পারে না—মোহর মুঠোখানেক তুলে দেখবে বলে তাড়াতাড়ি সে কলসিতে হাত ঢুকাল।

আর যাবে কোথা! ওরে বাবা, মলাম রে, গেলাম রে—কাঁকড়াবিছে কলসিতে বিজবিজ করছে। হাত বেয়ে উঠল বিছে—কামড়াচ্ছে, কী সাংঘাতিক জ্বলুনি। হাতে-পায়ে ঝাড়া দিচ্ছে চোর, সেই গর্তের ভিতরেই নাচনা শুরু হয়ে গেছে। কোনগতিকে অবশেষে গায়ের বিছে ঝেড়ে ফেলে মাটির চাংড়ায় কলসির মুখ আটকে খানিকটা সোয়াস্তি। সর্বাঙ্গ ফুলে গেছে, যন্ত্রণা থামে না কিছুতেই—এত কষ্ট করে পাথর সরানোর পরিণাম এই।

কারসাজি ঐ লোকটারই—চোর ভাবছে। চোর পিছু নিয়েছে, গোড়া থেকেই সে ঠাহর করেছিল। জব্দ করার জন্যে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বউয়ের কাছে সে মোহরের গল্প করল। শোধ নেব এবার আমিও, বিছের কীরকম জ্বলুনি, বুঝিয়ে দেব।

কলসি মাথায় বয়ে চোর সনাতনের বাড়ি এল। বেড়ার ফাঁকে দেখে নিল, গভীর ঘুম ঘুমাচ্ছে এরা। প্রতিহিংসায় সর্বদেহ রি-রি করে জ্বলছে। চালে গিয়ে উঠল, বড় দেখে একটা ফুটো বেছে নিল। মাটির চাংড়া ছুঁড়ে ফেলে কলসি উপুড় করল ফুটোর মুখে। অবাক কান্ড। শক্ত জিনিস হুড়মুড় করে পড়ছে ঘরের বিছানায়—ঘুমন্ত সনাতনের গায়ে। বিছে একটাও নীচে পড়ে না—কলসির মুখে কিলবিল করছে, সেখানে থেকে চোরের গা লেপটে ছেঁকে ধরল। চাল থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে পালাল চোর।

সনাতন বউকে ডাকছে, "আলো জ্বালো দিকি শিগগির। পাথর সরিয়ে মোহর বের করতে পারিনি—বনবিবি তাই ঘরের চাল ফুঁড়ে মোহর বৃষ্টি করে গেলেন।"

ভবি
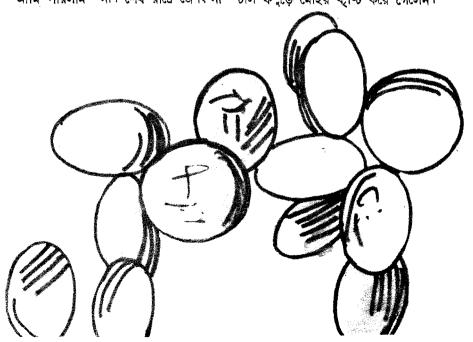
মণীন্দ্র রায়

আচ্ছা মা, দিদা কথায়-কথায়
বলে, ভবি নয় ভোলবার।
কে ভবি ? কোথায় থাকে ? চিনি না তো,
যত করি মন তোলপাড়।

বাবা তো ভোলেন চশমা ও ঘড়ি,
তুমি ভোলো চাবি-গোছা।
আমি ভুলে যাই রোজ দুধ খেতে।
ভুলে যাওয়া এত সোজা।

ভবি কেন তবে ভুলবে না কিছু ?
এত জেদ কেন ভবির ?
সাজা কেন তবে দেবে না বলো তো
ভবির সে বেয়াদবির !

না হয় ভবিকে ভরতি করো মা
আমাদেরই ইশকুলে।
রাইনোসেরাস বানানটা দেখো
যাবেই যাবে সে ভুলে।

ছবি : দেবাশিস দেব

চিৎপটাং

শঙ্খ ঘোষ

এই নামাচ্ছে মাথার থেকে এই মাথাতে
ওঠায়
সবার যেটা পছন্দ ঠিক সে-ছন্দটা
কোথায়
ডালের থেকে ফলের মতো ঝুলছি সরু
বোঁটায় !

নীচে পথের মধ্যিখানে অক্ষৌহিণী
সাজায়
এক্ষুনি খুব ধুমধড়াক্কা লাগবে রাজায়
রাজায়
ভাগ্যে যদি তাই থাকে তো যাক গে চলে
যা যায় !

ততক্ষণে গাছেই বরং লাফিয়ে উঠে
সটান
সবাই মিলে বলব কেবল দীয়তাং ভু-
জ্যতাং
তারপরে বেশ থাকব শুয়ে মগডালে চিৎ-
পটাং !

ছবি : দেবাশিস দেব
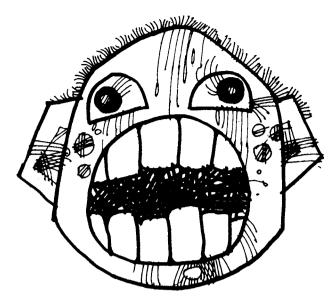
খুদ-কুড়ুনির ছড়া

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

অভাগিনীর দুটো পুত।
একটা দানো একটা ভূত ।।
সেই দানোটা পাড়ায় পাড়ায়
ভগবানের ছায়া তাড়ায় ।।
অভাগী মা'র চক্ষু জুড়ে
সন্ধে নামে দিন-দুপুরে ।।

আরেকটা পুত সে একটা ভূত।
সোমমঙ্গলবুধবিষ্যুৎ
এই দিকে ধায় ঐ দিকে ধায়,
মানুষজনের ঘাড় মটকায়।
অভাগিনীর চোখের জলে
তখন শুধুই আগুন জ্বলে ।।

কার্যকারণ

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

কান্তিকুমার বোস ছিলেন
নিজের মনেই বসছিলেন
করল তাড়া নেড়িকুকুর,
যখন মাথা ঘষছিলেন।

ব্যাপারটা যে গুরুতর
সন্দেহ কী সেই নিয়ে?
রৌদ্র তখন পড়ো-পড়ো,
দৌড়ে গেল বন-টিয়ে।

কান্তিকুমার ভালমানুষ
নেড়িও খুব খারাপ নয়,
তবুও এমন কার্যকারণ—
হঠাৎ ঘটে বিপর্যয়।

নেড়িকুকুর, কান্তি ওরে,
আয় রে এখন ক্ষান্তি দে,
কান্তিবাবু, মাথা ঘষো,
নেড়ি কি চাস্ প্রাণ দিতে?

ছবি দেবাশিস দেব

ঘুচাই ও কলকাতা

কবিতা সিংহ

ঘুচাই থাকে কলকাতা,
অলির গলি, গলির অলি,
সেই গলিতে ঘর-পাতা।

রোদ্দুর নেই আলো হাওয়া,
জানলা খুলেই পাঁচিল পাওয়া,
ঘুচাই তবু সেই দেয়ালে
বৃষ্টিধারার খামখেয়ালে
দেখল আঁকা দরজা দরাজ
ঘুরিয়ে হাতল স্বরাট স্বরাজ
পেয়েই গেল গল্প-জগৎ,
কল্পলোকের রূপকথা !

ঘুচাই থাকে কলকাতা,
গলির মুখে সকৌতুকে
তুললে দুচোখ হঠাৎ সুখে
ঘুচাই যে পায় চিলতে আকাশ,
পদ্যলেখার নীলখাতা !
ঘুচাই থাকে কলকাতা !

ছবি দেবাশিস দেব

রাতের ছড়া

আনন্দ বাগচী

ঘুমে কাদা হয়ে গেছে গঞ্জের হাট
ঘরে ঘরে বুকে খিল ধরা চৌকাঠ
বুড়ি ছুঁয়ে যায় রাত দুপুরের ঘড়ি
ই'দারায় থেমে আছে একা ঘর্ঘরি।
নিশি-পাওয়া চারপাশ ঝিঁঝিঁ-ধরা বন
জানালায় খেয়ো চাঁদ রক্তবরণ।
গল্পের বই শেষ, লণ্ঠনে তেল,
ব্রিজ ঝমঝম করে চলে গেল রেল !
ভূত ছিল গাব গাছে চিলে কোঠা ছুঁয়ে
লণ্ঠন নেবাতেই নেমে এল ভুঁয়ে।
ঝুপ করে ডুব মারি মশারির নীচে
ভাঙাবে ভোরের ঘুম পেয়ালা-পিরিচে ॥

ছবি দেবাশিস দেব

চিড়িয়াখানায়? আর না

সন্তোষকুমার ঘোষ

চিড়িয়াখানায়? প্লীজ্ মা, প্লীজ! আমাকে আর কোনও দিন যেতে বোলো না। কোনও দিন না। তাছাড়া আমি আর যাবই বা কী করে? জানি না, কিচ্ছু বুঝতে পারি না। তোমাদেরও সবার ঠোঁটে আঙুল, আমার ঘরে এলেই খালি পা থপথপ চুপ-চুপ, কেউ কিছু বলে না, এমন-কী মা, তুমিও না।

অথচ আমি জানি তো। আমার ডান পায়ের হাঁটুর নীচ থেকে হাঁটুর গিঁট পর্যন্ত দুমড়ে অসাড়। ব্যাপারটা মানে দাঁড়াল এই যে, নিজেকে নিয়ে নিজেকে তুলে আমি চিড়িয়াখানা তো চিড়িয়াখানা, কোনোখানে কোনও দিন যেতে পারব না। আমার ইচ্ছে যদি বা যায়, আমি না।

ইচ্ছে? সে তো উড়ুক্কু পাখি। খালি অপার নীলটাই সাঁতার দিতে জানে। অপার পার হতে-হতে অগাধে ডুব। পারে শুধু ডানা ছড়িয়ে দিতে। ব্যস্, ওই পর্যন্তই ওর জানা। আর আমার? তোমরা বলো আর না-ই বলো, স্রেফ এই চার-হাত-বাই আড়াই বিছানাটাই শেষ জানা। লাস্ট ধপাস। এতটা আমি ভাবছ জানলাম কী করে? হঠাৎ অন্ধকারে সেদিন গর্তে পা পড়ে গেল কিনা? তাই। গর্তটার কোথায় তল, খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মড়া রোজই দু-চারটে দেখতে পাই, কিন্তু মরা কাকে বলে, সেটা সেই তলানির গর্তটাই নিজেকে সামলাতে সামলাতে হঠাৎ টের পেয়ে গেলাম যে! ওই ব্যাপারটাই, মা, আমাকে এক মিনিটে অনেকখানি বয়স বাড়িয়ে দিল। এখন, তোমাকে ছুঁয়ে বলছি, আমি হয়তো বয়সে তুমি তো তুমি,

কী, বিশ্বাস হচ্ছে না? একবার কপালে তোমার ঠান্ডা হাতটা রাখো, টের পাবে, কত গরম। একবার খালি একবার. তোমার গাল আমার গালে রাখতে পারবে? আগে যেমন রাখতে? রাখলে নির্ঘাত দেখতে, আমি কত বদলে গেছি, আমি হঠাৎ কী আলাদা। এ যেন শীত শেষ হতে-না-হতেই হুড়মুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়ল জষ্টি কিংবা বৈশাখ। কিন্তু, কিন্তু আমার গালে তোমার গাল রাখতেই দেবে না। হাঁটুর তলাটা যেমন, আমার ভিতরটাও সিঁটিয়ে গেছে তেমনি। তুমি নুয়ে পড়লেই আমি সরে যাব। সরে, সরে, সরে—একেবারে দেয়ালের ধারে।

মা, তখন কোথায় বোশেখ-জষ্টি, আমার দুটো চোখ ছাপিয়ে আষাঢ় নামবে।

মনে আছে, চিড়িয়াখানায় যাওয়ার আগের দিন আমরা সেই নাটকটা দেখতে যাই? বোকা ছেলেটা যেখানে খালি কবে কোন্ চিঠি, কার চিঠি, সেই শেষ চিঠিটার জন্যে হন্যে-চোখ মেলে পড়ে থাকত। তখন বুঝিনি, আজ তাকে বুঝতে. পারি। শরীর যখন চলছে না, তখন চোখ ছাড়া আর কীই বা হন্যে হতে পারে, বলো? সে দেখত, দেখত, যা না-দেখত তার চেয়ে বেশি ভেবে নিত। আচ্ছা মা, ওই দইওয়ালা-টোয়ালা সব নিশ্চয় ওর নিজেরই মনে-মনে বোনা আর বানানো? দূরের পাহাড়টাও কে জানে তার নিজেরই তৈরি করা হতে পারে। তার ওপারে সে গিয়েছিল কি? যেতে পেরেছিল? পারেনি. যদ্দূর মনে পড়ে খালি একেবারে শেষ ঘন্টা বাজার আগে সুধা তাকে যে ভোলেনি, এই কথাটাও তার কানে যায়নি বলেই আমার কান্না। অন্তত এক জন যে তাকে মনে রেখেছে, শেষবার গ্যাট গ্যাট হেঁটে যাবার আগে এইটুকু তার জেনে যাওয়া চাই। একটু আগে আষাঢ় বলেছি না? হয়তো শ্রাবণ। মা, তুমি তাকে মুছে ধোয়া-মোছা শরৎ করে দিলে।

তবু পরদিন চিড়িয়াখানা থেকে ফেরার পথে. এখানে ঝোপ, ওখানে অন্ধকার, সেই শ্রাবণেরই কয়েকটা কণা চোখে লেগে থাকবে হয়তো। নইলে পাড়ার ফুটবলার আমি নিকাপ-অ্যাংকলেট্ এঁটে-সেঁটে দুরন্ত, আমার ডান পা-টা গাড্ডায় পড়বে কেন? ম্যানহোলটা খোলা ছিল? ওটা খোঁড়া যুক্তি। আমি এখন যেমন খোঁড়ার চেয়েও খোঁড়া হয়ে বিছানা-বালিশের তুলো চটকাচ্ছি, তার চেয়েও খোঁড়া—বেতো, কে জানে তোমরা তো বলো না, তার চেয়েও বেশি হতে পারে! তোমার সন্তু হয়তো আর কোনও দিন সিধে-কোমরে দাঁড়াতেই পারবে না!

মুখে-মুখে বলে যাচ্ছি, তাই সবটা ঠিক নাও মিলতে পারে। সেই যে আমি ঝিলে ঢিল ছুঁড়লাম! কত পাখি সঙ্গে সঙ্গে উড়ল? শয়ে-শয়ে, না হাজার-হাজার? আমরা কেউ

...নি, শুধু মজা পেয়ে হাততালি দিয়েছি।

একটু পরে রেপটাইল হাউস। বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে ওদের ...গে লাগে। সাপগুলো কিলবিল করছে, ফণা তুলেছিল কি ...টা? মনে নেই, মনে নেই, আমার এখন কিছু মনে ...ই, খালি খেয়ালে আছে ওদের হিসহিস, ফোঁস ফোঁস। ...বও আমার বানানো কি না জানি না।

মা, আসলে আমি নিজেই জানি না এর কতটা ঘটেছিল ...র কতটা ঘটেনি। জানি না, সাপগুলো ফোঁস করেছিল ...কি না, কিংবা একদম করেনি। তুমি হাসবে, তবু বলি, সবটাই ...মার বানানোও তো হতে পারে! আমারই।

যদি এই অবধি মেনে নিয়ে থাকো, তবে ওই জিরাফটাকে ...মার নিশ্চয় মনে আছে। যেখানে মুখ বাড়াতে নেই, সেখানে ...সে তার অসম্ভব লম্বা ঘাড় তুলে কী যেন খুঁজছিল, পেতে ...চাইছিল। দূর! পাওয়া অত চাট্টিখানি কথা নাকি?

তারপর? বাঘ-সিংহদের ঘর। কী তর্জন আর গর্জন। ...আমি ওই গজরানোটার ভিতরে যত চেঁচামেচি, তার চেয়েও ...অনেক বেশি কিছু যে দেখলাম, শুনলাম।

মাপা ঘরের মধ্যে পায়চারি আর হম্বিতম্বি—বাঘ-সিংহদের ...ও তো ওই পর্যন্ত! একটু ইদিক-সিদিক হওয়ার জো ...নেই। তুমিই তো কানে-কানে বলে দিলে ওদের রোজকার ...মাপা-বরাদ্দ। তবে ওরা বন্য-টন্য দূরে থাক, বাঘ-সিংহই ...হয় কী করে?

তারপর কত যে বসলাম, কত জিরোলাম। কত গাছ-...লি, তাদেরও ল্যাটিন নাম। বুঝি না, কিচ্ছু বুঝি না।

এইবার বলো, অত না-বোঝার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বেরোবার ...র দিকে এগোতে গিয়েছিলাম বলেই তো ছায়া-ছায়া আলো-...রিতে আমার এই ব্যাপার? পা মচকানো, দুমড়ে যাওয়া, ...র এখন বলছেন (তোমরা বলোনি, কিন্তু আমি জেনেছি) ...কাবার। চেতনা নেই।

...আছে, চেতনা আছে। এমন কী, ওই যে জেব্রাটা কালো-...মিলিয়ে খানিকটা অদ্ভুত হয়ে রইল, তাকে কি দেখিনি? ...একটু অস্পষ্ট, একটু রহস্য, সোজাসুজি বলি, যা নয় তাই ...চাইল, তাই না? এমনভাবে নিজেকে লুকোনো, জোব্বা-...ল্লায় কত খারাপ লোককে কি ফকিরের চেহারায় আমরা ...না? কত জন তো মুখে মানিকপীরের নাম দিয়ে ...রয়া পার হওয়ার কাঁদুনি গাইতে-গাইতে আমাদের ...রে এসে দাঁড়ায়। খঞ্জনী বাজায়। আর কী, মা, আর ...দয়াল সত্যপীর না এই গোছের কিছু সুর শোনায় কি ...র না? বলো বলো বলো। যারা পার হবে বলে বায়না তোলে তারা সকলে কি ছলই দেখেছে বলো।

মা, বরাবর যে বিছানায় শুয়ে আছে, সে তোমার আর কেউ নয়, কারুরই কেউ কিনা, বলতে-বলতে ব্যাপারটাই জমে বরফের মতো, না না, ক্রিসটালের মতো জমে যাচ্ছে, তাকে গলিয়ে দাও প্লীজ, তুমি গলিয়ে দাও।

তুমি শুনছ তো, শুনছ? আমি যেমন আর কিছু করবার নেই বলে খালি-খালি ঘুমিয়ে পড়ি, তুমিও তেমনই ঘুমিয়ে পড়েছ কি? তুমি ঘুমিও না।

আমি এখন ঘুমকে সবচেয়ে ভয় পাই। আবার তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা এ-সব কথা বলা যায় বলো—খালি ঘুমই চাই। ভয় পাই, কারণ ফের যদি না জেগে উঠি? আর ঘুমোলে? কত জিরাফ অনর্থক যা নাগালের বাইরে তার জন্যে গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে দেখতে পাব। কত সিঙ্গি আর বাঘকে মাপা-জায়গায় ঘুরতে আর মাপা-মাংস খেতে দেখব। আর পাখিরা? সেই সব পাখি, যেখানে তাদের বাসা নয়, সেইখানে তারা উড়ে এসেছিল কেন, এসেছিলই যদি, সারে-সারে ফিরে যাচ্ছেই বা কেন, বুঝি না, কিচ্ছু বুঝি না। তবু দেখতে পাই।

শুধু ঘুমোলে। মা, মনে করো, সেসব হাতি, যারা ছোট্ট একটা চাঁপা কলা পেয়ে শুঁড় তুলে সেলাম জানায়? না, হাতিদের মনে রাখার কথাটাও বলতে চাইছি না। এই লেখাটাকে যদি একটা হাসিতে উড়িয়ে দিই? হায়নার হাসি? যে-হাসি হাসতে পারি না, ওরা হাসে। আমরা এদিক-ওদিক কোনো-দিকেই দেখি না। ওরা দেখায়।

যখনই পঙ্গু-অসাড়, তখনই শেষবার-দেখা চিড়িয়াখানা, আমার বুকে-মনে-মগজে ফিরে আসে। হায়নার হাসি, সে তো বললামই, জিরাফের গলা-বাড়ানো, আর হাতির আর-কিছু নয়—শুধু সেলাম। একটুখানি পেয়েও যে মনে রেখেছে, সেই রাখাটাকে জানানো।

সেই শেষবারের দেখাটা সব টুকে নিয়েছে। যে-হায়নার হাসি বাইরে কখনও শুনিনি, হঠাৎ সেটা কানে আসে, টের পাই। এমন-কী, সাপের হিসহিসও যে শুনতে পায়, মা, তার আর ওখানে গিয়ে কাজ কী? গোটা চিড়িয়াখানাই যার ভেতরে, তার মিছিমিছি কেন ওখানে যাওয়া? যাক গে, বললেও সে কি যাবে? পা যা অসাড়, সে পারবেই না। তাই বলছি, বুকের জিনিস বুকেই থাক। বাঘ-সিঙ্গি-নেকড়ে টেকড়ে বোবা-বোবা পা ফেলুক চাই না ফেলুক, নয়তো যখন খুশি গর্জাক। তবু সববাইকে যে পুষে নিয়েছে, তাকে খামোখা ফের চিড়িয়াখানায়? না মা, ককখোনো আর যেতে বোলো না।

ছবি সুনীল শীল

আমার বন্ধু শাশ্বত

বিমল মিত্র

আমি শাশ্বতকে ছেলেবেলা থেকে চিনতাম। শুধু চিনতামই নয়, তার সঙ্গে আমার রীতিমত মেলামেশা ছিল। শাশ্বত অবশ্য আমাকে বিশেষ পছন্দ করত না। পছন্দ করত না মানে এই নয় সে আমাকে ঘেন্না করত। তার মানে সে আমাকে তার চেয়ে ছোট ভাবত। অথচ আমরা দুজনেই এক বয়েসের ছিলাম।

সেই শাশ্বতকে এতদিন পরে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

শাশ্বতকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, "এ কী, তুই? তুই এতদিন পরে?"

শাশ্বতর চেহারা দেখে আমি তখন অবাক হয়ে গিয়েছি। কোথায় গেল তার সেই রূপের জৌলুস, কোথায় গেল তার তারুণ্যের সারল্য! তারুণ্য আর সারল্য যখন কোনও মানুষের চেহারায় একাকার হয়ে যায় তখন লোকে তাকে ভালবাসে। তখন লোকে বলে—হ্যাঁ, এই-ই আমার মনের মানুষ, এরই জন্যে আমি এতদিন অপেক্ষা করে বসে ছিলাম।

কিন্তু শাশ্বত যে এ-রকম হয়ে যাবে তা কি আমি কল্পনা করতে পেরেছিলাম?

সত্যিই শাশ্বতকে চিনতে আমার একটু কষ্টই হয়েছিল। অর্থাৎ প্রথমে আমি তাকে চিনতেই পারিনি। এমন কালো গাল-তোবড়া মানুষটা যে আমাদের সেই প্রথম জীবনের শাশ্বত তা আমি কী করেই বা কল্পনা করতে পারব?

বললাম, "বোস্, দাঁড়িয়ে আছিস কেন?"

আশ্চর্য, যে-শাশ্বত আমাদের এককালে এত তাচ্ছিল্য করত, আমাদের এত নিচু নজরে দেখত, আজ সেই শাশ্বতই কিনা যেচে আমার অফিসে এসেছে।

যেন আমার চেয়ারের সামনের চেয়ারে বসতে তার সঙ্কোচ হচ্ছিল।

সত্যিই তো, ওই ছেঁড়া জামা, ওই ময়লা প্যান্ট পরে আমার এই সাজানো অফিস-ঘরে বসবেই বা কী করে?

শাশ্বত বললে, "তোমার অফিসের দারোয়ান আমাকে ঢুকতেই দিচ্ছিল না ভাই। বলে কিনা সাহেবের ঘরে ঢুকতে হলে স্লিপ চাই। তাই স্লিপ লিখে দেবার পর তোমার ঘরে ঢোকবার অনুমতি পেলাম।"

বললাম, "ভাই, লোকে বড় বিরক্ত করে বলে এই নিয়ম করে দিয়েছি। এখানে আমার কাছে যারাই আসে, সবাই কিছু-না-কিছু চায়।"

শাশ্বত বললে, "আমিও তো তাই তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমার একটা উপকার করে দাও ভাই।"

বললাম, "তার আগে তুমি বলো কী খাবে।"

"আমি? খাব? কী খাওয়াবে তুমি বলো। তুমি যা খাওয়াবে আমি তাই খাব। আমি অনেকদিন পেট ভরে খেতে পাইনি।"

বলে করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলে শাশ্বত! আমি অবাক হয়ে গেলাম। তার চাইবার ভঙ্গি দেখে। এমন কথা তো তার মুখ থেকে আগে কখনও শুনিনি। শাশ্বতর সঙ্গে একদিন এক স্কুলে একই ক্লাসে আমরা পড়েছি। বরাবর শাশ্বত আমাদের
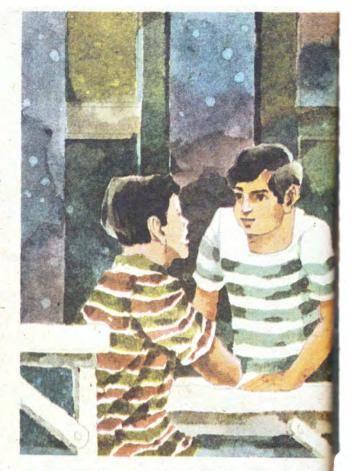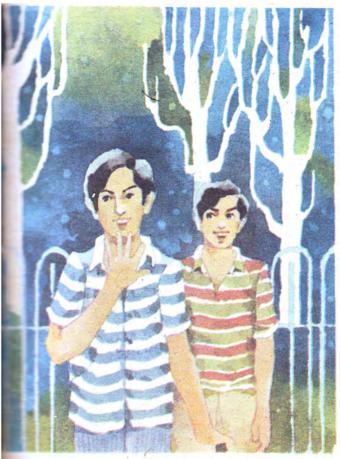
[illegible] বড় ছিল। বয়সে নয়, অন্য সব ব্যাপারে। লেখাপড়ায় যে সে ভাল ছিল তা নয়। কোনওরকমে সে পাস করত, এই পর্যন্ত। শাশ্বত সম্বন্ধে মাস্টারমশাইদেরও খুব ভাল ধারণা ছিল না।

সবাই-ই বলত, "শাশ্বত যদি মন দিয়ে পড়া-শোনা করে তো সে ফার্স্ট হবেই হবে।"

সত্যিই শাশ্বত পড়ার সময় পেত না। আমরা যখন বাড়িতে বসে লেখাপড়ায় মন দিতাম, তখন সে কলকাতার ময়দানে খেলতে যেত।

শাশ্বত ছিল বলতে গেলে আমার প্রাণের বন্ধু। তাই বন্ধু-বান্ধবরা আমাদের দুজনকে বলত "মানিক-জোড়"। শাশ্বতর সব কিছুই আমার ভাল লাগত। তার চেহারা, সাজ-পোশাক, তার কথাবার্তা, তার চালচলন সমস্তই আমি অনুকরণ করতে চেষ্টা করতাম।

শাশ্বত বলত, "তোর নাম ভোঁদা, তোকে দেখতেও ভোঁদার মতন।"

আমার বাবা যে আমার "ভোঁদা" নাম কেন রেখেছিলেন কে জানে! আমি বাড়িতে গিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করতাম। বলতাম, "আমার ভোঁদা নাম কেন রেখেছিলে তোমরা?"

মা বলতেন, "ওটা তো তোর ডাক-নাম! তোর আসল নামটা তো ভাল। মানুষের কি নাম দিয়ে পরিচয় হয়? মানুষের আসল পরিচয় তো হয় তার কাজ দিয়ে। তুই যখন বড় হবি তখন এই ভোঁদা নামটা সবাই ভুলে যাবে।"

ওই নামটার জন্যে ছেলেবেলায় বরাবরই আমার দুঃখ ছিল বুকে। আমি বরাবরই একটু অল্পতেই কাতর হয়ে যেতাম। কেউ আমাকে তাচ্ছিল্য করলে আমি বুকে আঘাত পেতাম। একটু

কড়া কথা বললেই আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসত। আমার এই স্বভাবের জন্যে আমি বাড়িতে এসে লুকিয়ে-লুকিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে কাঁদতুম। সে-সব কথা বাইরের কেউই জানতে পারত না। আবার যখন ঘরের বাইরে আসতুম তখন চোখ-মুখ মুছে ফেলতাম ভাল করে। যাতে আমার দুর্বলতা কেউ না জানতে পারে।

আমি কিছু বললেই তখন শাশ্বত বলত, "তুই বড্ড ভোঁদার মতো কথা বলিস।"

আমি বলতাম, "বাবা আমার ভোঁদা নাম রেখেছিল তা আমি কী করব?

শাশ্বত বলত, "নাম যেমনই হোক তা বলে ভোঁদার মতো কথা বলবি কেন? ভোঁদার মতন কথা বলতেও কি তোর বাবা শিখিয়ে দিয়েছে?"

শাশ্বতর কথা শুনে আমার কান্না আসত। কেবল মনে হত আমি কেমন করে সকলের প্রিয় হতে পারব! কী করলে সবাই আমাকে ভালবাসবে। শুধু কি বাইরের লোক? বাড়ির ভেতরে বাবা-মা-ভাই-বোন আত্মীয় স্বজন কেউই আমাকে দেখতে পারত না। সবাই ভাবত আমি নামেও ভোঁদা, কাজেও ভোঁদা।

বড়লোক বলতে যা বোঝায় আমরা সমাজে তাই-ই ছিলাম। আমার বাবার অনেক টাকা ছিল। অন্তত আমার তাই-ই মনে হত। আমাদের বাড়িতে গাড়ি ছিল। বাবা সেই গাড়িতে চড়ে অফিসে যেতেন। বাবা অফিস থেকে ফিরে এলে সে-গাড়িতে মা-ভাই-বোন চড়ত। চড়ে নিউ মার্কেটে যেত। কখনও-কখনও সিনেমা দেখতে যেত। বড়দিনের সময়ে বাজার থেকে কেক-বিস্কুট কিনে আনত। অনেক সময় আমাকেও দিত সেসব জিনিস।

কিন্তু আমি বেশির ভাগ দিনই সেসব খেতাম না।

মা জিজ্ঞেস করতেন, "কেন রে, খাবি না কেন?"

আমি বলতাম, "আমার খেতে ভাল লাগে না।"

"সে কী রে, কেক খেতে তোর ভাল লাগে না?"

বাবা শুনতে পেলে বলতেন, "ও যখন খেতে চাইছে না তখন ওকে খাবার জন্যে অত সাধছ কেন?"

আসলে, সত্যি কথা বলতে কী, আমার কেক খেতে, গাড়ি চড়তে, সিনেমা দেখতে খুবই ভাল লাগত। কিন্তু আমার যে মনের মধ্যে কী হত তা কেউ বুঝতে পারত না, বুঝতে চাইতও না। আমার কেবল মনে হত আমাকে সবাই অবহেলা করে, আমাকে সবাই তাচ্ছিল্য করে, আমার সবাই থাকতেও পৃথিবীতে কেউ নেই। আমার মনে হত আমি যেন একলা।

একদিন সন্ধেবেলা একলা-একলা আপন মনে রাস্তা দিয়ে চলেছি। তখন রাস্তাটা নিরিবিলি। লোকজন কিছু নেই।

একটা লোক আমার দিকে এগিয়ে এল। ডাকলে, "খোকা।"

ডাক শুনেই আমি থমকে দাঁড়িয়েছি। অন্ধকারে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে মনে হল সে আমার অচেনা।

বললাম, "কী? কিছু বলবে আমাকে?"

লোকটা বললে, "তুমি পাখি নেবে? চন্দনা পাখি?"

আমি অবাক হয়ে গেলাম। ভাবলাম এত লোক থাকতে লোকটা আমাকে পাখি দিতে চাইছে কেন?

বললাম, "দাও।"

লোকটা বললে, "আমি পাখিটাকে সিঙ্গাপুর থেকে ধরেছি।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তা পাখিটা আমাকে দেবে কেন? আর কেউ নেই তোমার?"

লোকটা বললে, "আমার নিজের যদি কেউ থাকত তো তাকেই তো দিতুম! আমার কেউ নেই বলেই তো তোমাকে দিতে চাইছি।"

"তোমার কেউ নেই?"

লোকটা বললে, "না।"

তারপর একটু থেমে বললে, "আমি কাল রাত্তিরে একটা স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্ন দেখেছি যে মা-কালী আমাকে বলছে যে রাস্তায় বেরিয়ে যে-ছেলেটাকে তুই দেখবি তাকেই এই পাখিটা দিয়ে দিবি, তাহলে তোর ভাল হবে। তা আজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে তোমাকেই প্রথম দেখলুম, তাই তোমাকেই পাখিটা দিতে চাই। তুমি নেবে? তুমি পাখিটাকে নিলে আমি বাঁচি। আমার খুব ভাল হবে।"

আমি বললাম, "পাখিটা নিয়ে আমি কী করব?"

"তুমি বাড়িতে তাকে পুষবে। সে খুব কথা বলতে পারে। সিঙ্গাপুরী চন্দনা পাখি কি না।"

আমার খুব আনন্দ হল। আমাকে তো কেউ ভালবাসে না। আমার নিজের বলতে তো কিছু নেই। অন্তত আমার একটা নিজস্ব জিনিস হবে।

জিজ্ঞেস করলাম, "পাখিটা কী কথা বলে?"

লোকটা বললে, "তুমি যে-কথা বলতে শেখাবে, সেই কথা বলবে।"

বললাম, "তাহলে দাও পাখিটা।"

লোকটা বললে, "তাহলে আমার বাড়িতে চলো।"

"তোমার বাড়ি কত দূরে?"

লোকটা বললে, "এই কাছেই। তুমি আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চলো, আমি তোমাকে খাঁচাসুদ্ধু পাখিটা দিয়ে দেব।"

লোকটাকে আমার খুব বিশ্বাস হল। আমি তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলাম। লোকটা আগে আগে চলছে আর আমিও তার সঙ্গে চলেছি। কিন্তু লোকটা চলছে তো চলছেই। অথচ বলেছে খুব কাছেই তার বাড়ি। রাস্তা ছেড়ে সে প্রথমে বাজারের - পথ ধরলে। ভাবলাম বাজারটার পেছনেই তার বাড়ি। সত্যিই লোকটা বাজারের পেছন দিকে ঢুকল। সে-দিকটায় বিরাট একটা বস্তি। বস্তির ভেতরে অনেক গরিব লোক থাকে। সাধারণত ওদিকে আমরা কেউই বড় একটা যাই না। জল-কাদায় চারদিক প্যাচ প্যাচ করছে। মধ্যিখান দিয়ে লম্বা করে ইঁট পাতা।

লোকটা জিজ্ঞেস করলে, "তোমার কি ভয় পাচ্ছে খোকা?"

আমার সত্যিই কিন্তু ভয় করছিল। কিন্তু মুখে বললাম "না।"

লোকটা বললে, "না, ভয় পাবার কী আছে? আমি তো সঙ্গে আছি। কেউ যদি কিছু করতে আসে তো আমি তাকে খুন করে ফেলব। আমার গায়ে খুব জোর আছে। আমি ছাতু-খাওয়া মানুষ, আমি একসঙ্গে দশজন গুন্ডার সঙ্গে লড়তে পারি—"

বলে লোকটা আবার যেমন যাচ্ছিল তেমনি যেতে লাগল।

আমার একবার মনে হল আমি কেন লোকটার সঙ্গে এখানে আসতে গেলুম। সামান্য একটা পাখির লোভে? পাখি নিয়ে আমি কী করব? ছেলেবেলা থেকে আমার খুব পায়রা পোষবার শখ, কুকুর পোষবার শখ। মানুষের কাছে ভালবাসা পাইনি বলে আমার মনটা বোধহয় জন্তু-জানোয়ারের দিকে ঝুঁকেছিল। ভাবতুম একটা কুকুর থাকলে সে আমাকে ভালবাসত, আর আমিও প্রাণ দিয়ে তাকে ভালবাসতুম। আর পায়রা থাকলে বেশ আকাশে উড়ত। আকাশে ঘুরেঘুরে, মেঘেদের সঙ্গে গিয়ে মিশত। আমার মনও ওই রকম উড়ে বেড়াতে চাইত। এই কুটিল পৃথিবীর থেকে ছাড়া পেয়ে খোলা আকাশে বেড়াতে যে কত আনন্দ তা পায়রাদের ওড়া দেখে বুঝতে পারতুম। এইটুকু বোঝবার তখন বয়েস হয়েছে যে, পৃথিবীর মানুষরা সবাই

...। কেউ কারও ভাল দেখতে পারে না। কারোর কিছু ... হলেই সকলের হিংসে হয়। এমন কী, বাড়ির বাবা-মায়ের ... থেকেও আমি সেই রকমের ব্যবহার পেয়ে এসেছি।

কিন্তু তখন তো আমার অন্য কোনও উপায় ছিল না যে ... বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই। পালিয়ে যাবই বা কোথায়? কে ... আশ্রয় দেবে?

হঠাৎ লোকটা পেছন ফিরে দেখলে আমি তার সঙ্গে আছি ... না।

জিজ্ঞেস করলে, "আমার সঙ্গে আসছ তো খোকা?"

"হ্যাঁ, আসছি।"

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, মনে হচ্ছিল লোকটার সঙ্গে ... এলেই হয়তো ভাল হত। কিন্তু তখন অনেক দূরে চলে ...ছি, আর ফেরবার সুযোগ ছিল না।

লোকটা একটা জায়গায় গিয়ে থামল।

থেমে বললে, "এই আমার বাড়ি, এসো আমার সঙ্গে। আমার ...তে এসো।"

বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম। একটা ভাঙা ভূতের বাড়ি বলে ... হল। বহুকাল আগে ও-বাড়িটার ভেতরে অনেক লোকজন ছিল। গাড়ি ছিল ঘোড়া ছিল ওর ভেতরে। ও-বাড়িতে যারা বাস ... তারা কবে কোথায় চলে গিয়েছে কেউ জানত না। শুধু ...টুকু জানত যে, শরিকে-শরিকে মামলা হয়ে সবাই সর্বস্বান্ত ... গিয়েছিল। তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে সে মামলা চলেছিল। উকিল-মুহুরি-পেশকার-অ্যাটর্নি সবাই মিলে কেবল টাকা ...ছে। তারপর যখন আর টাকা ছিল না তখন মামলা ... হয়ে গিয়েছে। মক্কেলরা যখন মামলা করে করে শুকনো ...রের পরিণত হয়েছে তখন উকিল-মোক্তারদের নিজেদের বাড়ি ...ছে। তারা মক্কেলের টাকায় শহরে সবাই একখানা-দুখানা করে ...ড়ি করে ফেলেছে। শেষকালে যখন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুর স্রোতের ঢেউ এসে এদেশে আছড়ে পড়েছে তখন তারা ...ই কোটরে-কোটরে কোনও রকমে মাথা গোঁজবার জায়গা করে ...ছে।

এসব আমরা জানতাম। আরো জানতাম ওখানে প্রায়ই ...বাজি হয়। কেন বোমাবাজি হয়, কাদের ওপর সে-বোমা ...ড়ে তা জানতাম না। কিন্তু জায়গাটা যে খারাপ তা ...দের পাড়ার সবাই জানতাম।

লোকটা যে সেই বাড়িতে থাকে তা আগে জানলে আমি ...তাম না।

লোকটা বললে, "কই, ওখানে থমকে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ..., আমার সঙ্গে ভেতরে এসো। কোনও ভয় নেই তোমার, ... তো আছি—"

আমি তখনও দ্বিধা করছি দেখে লোকটা বললে, "এসো ..., চলে এসো—"

আমি যাব কি না ভাবছি এমন সময় শুনি পেছন থেকে ... গলার আওয়াজ এল, "এই ভোঁদা, তুই এখানে কী ...ছে?"

শুনেই বুঝলাম, এ শাশ্বতর গলা। আমি পেছন ফিরে দেখি ...ই শাশ্বত!

এমন জায়গায় এমন সময়ে শাশ্বতকে এখানে দেখতে পাব ...তে পারিনি। বুকে তখন একটা বল পেলাম।

ততক্ষণে শাশ্বত আমার কাছে এগিয়ে এসেছে। জিজ্ঞেস ...লে, "কী রে, তুই? তুই এখানে কী করতে এসেছিস? এ-...তে তোর কী কাজ?"

আমি বললুম, "ওই লোকটা আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে।"

লোকটার দিকে শাশ্বত চেয়ে দেখলে।

জিজ্ঞেস করলে, "কে ও?"

বললাম, "তা জানি না। ও আমাকে এখানে ডেকে নিয়ে এল।"

"কেন ডেকে নিয়ে এল?"

"বললে আমাকে একটা সিঙ্গাপুরী চন্দনা পাখি দেবে।"

"সিঙ্গাপুরী চন্দনা পাখি? সিঙ্গাপুরী চন্দনা পাখি নিয়ে তুই কী করবি?

বললাম, "পুষব।"

"তা এত লোক থাকতে তোকে কেন পাখি দেবে? পাখি দেবার আর কোনও লোক পেলে না?" বলে লোকটার দিকে এগিয়ে যেতেই লোকটা কোথা দিয়ে কোন্ দিকে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শাশ্বত লোকটার পেছন-পেছন খানিকটা দৌড়ে গেল, কিন্তু তার আগেই লোকটা পালিয়ে গিয়েছে। শেষে হতাশ হয়ে আবার ফিরে এল।

এসে বললে, "তুই কী রে, একটা জোচ্চোরের কথায় বিশ্বাস করে এখানে এসেছিলি? এখন আমি যদি না এসে পড়তুম তাহলে কী হত বল্ দিকিনি?"

আমি বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, "কী হত?"

"কী হত জানিস না?"

আমি বললাম, "কী আর হত। আমার পকেটে তো কোনও পয়সা ছিল না যে তাই কেড়ে নেবে!"

শাশ্বত বললে, "টাকাপয়সা না-ই বা থাকল, কিন্তু তোকে যে খুন করে ফেলত রে! তা তুই জানিস না?"

বললাম, "আমাকে খুন করে ওর লাভ?"

শাশ্বত বললে, "তোকে খুন করলে ওর কম করে হাজার টাকা উপায় হত।"

আমাকে খুন করে যে লোকটার কী করে এক হাজার টাকা উপায় হত তা আমি বুঝতে পারলাম না।

শাশ্বত বললে, "তুই একটা আস্ত গাধা। তোর নামও যেমন ভোঁদা, তোর বুদ্ধিটাও তেমনি ভোঁদার মতন। জানিস না মানুষের হাড়ের কত দাম আজকাল।"

আমি বললাম, "মানুষের হাড় দিয়ে কী হয়?"

"কী হয় জানিস না? আজকাল তো পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হাড় আসছে না, তাই পৃথিবীর বাজারে হাড়ের দাম খুব বেড়ে গেছে। ডাক্তারি পড়তে গেলে তো মানুষের হাড় দরকার হয়। তা সে হাড় আসবে কোত্থেকে? আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানিতে মানুষের হাড় কোথায় পাবে লোকেরা? আর আমাদের দেশেও তো মানুষ মরে গেলে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে মানুষকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হয়। তাই হাড়ের বাজার-দর খুব চড়া। যারা হাড়ের কারবার করে তারা এক-একটা মানুষের পুরো হাড়ের জন্যে অনেক দর দেয়। সেই হাড় লুকিয়ে-লুকিয়ে বিদেশে চালান দেয় তারা। চালান দিয়ে তারা কোটি কোটি টাকা উপায় করে।"

আমি বললাম, "কিন্তু ও লোকটা সে-রকম নয়, আমাকে পাখি দেবে বলেছিল।"

"পাখি দেবে না ছাই দেবে। ওই বলে তোকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিজের আড্ডায় নিয়ে আসছিল। দেখে বোকা-হাঁদা ছেলে, তাই তোকে পাখি দেবার নাম করেছিল। ভাগ্যিস আমি এসে পড়েছিলুম, তাই তুই খুব জোর বেঁচে গেলি।"

আমি শাশ্বতর কথাগুলো শুনে তখন ভয়ে থর-থর করে কাঁপছি। কেন আমার অত পাখি পোষবার শখ হয়েছিল। কেন অচেনা লোকের কথায় ভুলে গিয়েছিলুম।

শাশ্বত বললে, "চল, এখন বাড়ি চল, ভগবানের দয়ায় বেঁচে গেছিস এই-ই যথেষ্ট, চল—"

সত্যিই ভগবানের দয়াই বটে! লোকটা যদি দাগি গুন্ডা না হবে তা হলে শাশ্বতকে দেখে ভয় পেয়ে পালিয়েই বা গেল কেন? ও তো সোজা কথাটা বলতেই পারত! পালিয়ে যাবার কী ছিল। আর সত্যিই যদি আমায় কেটে ফেলত তা হলে কী হত! আমার তো খুব লাগত! তখন আমি চেঁচিয়ে কাউকে ডাকতেই পারতুম না!

শাশ্বত বললে, "আর কক্ষনো অচেনা লোকের কথায় কোথাও যাসনি, এই তোকে বলে রাখলুম। আজকাল কলকাতা শহরটা গুন্ডাতে একেবারে ভরে গেছে। এত যে খুন-খারাবি হচ্ছে সে তো এই জন্যেই!"

আমি বললাম, "খবরের কাগজে খুন-খারাবির খবর তাই এত লেখা হয়। আসল ব্যাপারটা আমি জানতুম না।"

শাশ্বত বললে, "আরে, খবরের কাগজে আসল খবর আর ক'টা বেরোয়। অর্ধেকেরও কম। যে খবরগুলো বেরোয় না বা

 যে-খবরগুলো কেউ জানতে পারে না সেই খুনগুলোই তো

শ। দেখছিস না কত বোমাবাজি বেড়ে গেছে কলকাতায়!"

বললাম, "কেন বেড়ে গেছে রে?"

শাশ্বত বললে, "ওই তো বললুম হাড়ের দাম বেড়েছে লে। হাড় দিয়ে তো চাষ-বাসের সার তৈরি হয়। সে হাড় থায় পাবে। আগে পাড়াগাঁয়ের ঘাটে-মাঠে মরা গরুর হাড় ড়িয়ে থাকত, কিন্তু এখন একটাও কেউ খুঁজে পাবি না, সব ড়ের দালালরা কুড়িয়ে নিয়ে যায়—"

কথা বলতে বলতে তখন দুজনে বাড়ি ফিরছি।

হঠাৎ আমি বললুম, "ভাগ্যিস তুই ছিলি শাশ্বত, তাই রে বাঁচা বেঁচে গেলুম।"

শাশ্বত বললে, "আমি তো সব সময়ে সব জায়গায় ঘুরে ড়াই রে।"

বললাম, "তোর ভয় করে না?"

"ভয় করবে কেন? আমার কাছে তো সব সময় পিস্তল কে। আমি খালি হাতে কখনও রাস্তায় বেরোই না। হয় স্তল, নয় ভোজালি, নয় গুপ্তি থাকেই—"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "গুপ্তি কী?"

"গুপ্তি এক রকমের ছড়ি। এক রকমের লাঠি। সেটা বাইরে থেকে দেখতে লাঠির মতন, কিন্তু সেই লাঠির মধ্যে লুকোন থাকে সড়কি।"

"সড়কি কী?"

"সে এক রকম সোর্ড। সরু লম্বা ছোরার মতন। মাথায় ধারালো ফলা। সেই সড়কি দিয়ে যদি কারও পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিই তো সে ছটফট করে সঙ্গে-সঙ্গে মারা যাবে। অথচ বাইরে থেকে দেখে মনে হবে আমার হাতে বুঝি একটা লাঠি রয়েছে।"

আমি অবাক হয়ে শাশ্বতকে দেখতে লাগলাম। তাকে দেখে আমার খুব গর্ব হতে লাগল। ভাগ্যিস শাশ্বতর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, নইলে তো আমি খুন হয়ে যেতাম।

শাশ্বত বললে, "তুই খুব জোর বেঁচে গিয়েছিস!"

আমি বললাম, "কিন্তু আমাকে লোকটা যে বললে সে মা-কালীর কাছ থেকে নাকি স্বপ্ন পেয়েছে যে, সেদিন রাস্তায় বেরিয়ে যাকে সে প্রথম দেখবে তাকেই সে পাখিটা দেবে।"

শাশ্বত বললে, "ওই বলেই তো ছেলেদের ধাপ্পা দেয় ওরা।"

শাশ্বত জানত আমার মতো ছেলেকে ধাপ্পা দিয়ে ঠকানো

খুব সোজা। তা শাশ্বত আমাকে বোঝাতে লাগল—"অচেনা লোকের কোনও কথায় তুই বিশ্বাস করবি না। আমার মামা আমাকে বলে দিয়েছে আজকাল কাউকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।"

বললাম, "তুই যে সঙ্গে পিস্তল রাখিস তাতে তোকে যদি পুলিসে ধরে?"

শাশ্বত বললে, "আমাকে পুলিসে ধরবে না।"

"কেন?"

শাশ্বত বললে, "আমার মামা যে পুলিসের কর্তা। পুলিস কমিশনার।"

আমি আরও অবাক। শাশ্বতর মামা পুলিস কমিশনার?

"তোর নিজের মামা?"

শাশ্বত বললে, "হ্যাঁ, আমার নিজের মামা। আমার মায়ের আপন ভাই।"

"কিন্তু তুই তো এ-কথা আগে বলিসনি কখনও?"

"এই তোকেই প্রথম কথাটা বললুম। এর আগে কাউকে বলিনি। তুই যেন কাউকে বলে দিসনি, বুঝলি? মামা আমাকে বলতে বারণ করে দিয়েছে।"

"কেন, বললে কী দোষ?"

শাশ্বত বললে, "না ভাই, মামা বলেছে এ-কথা জানতে পারলে সবাই মামাকে গিয়ে বিরক্ত করবে। সবাই মামার কাছে গিয়ে চাকরি চাইবে।"

"তাহলে তোর চাকরি তো বাঁধা। বড় হলে তোর মামা তো তোকে বড় চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবে।"

শাশ্বত বললে, "তা তো দেবেই। মামা বলেছে আমার চাকরির জন্যে আমাকে ভাবতে হবে না। তাই জন্যেই এখন থেকে রিভলভার নিয়ে বেড়াই।"

আমি বললাম, "রিভলভার নিয়ে বেড়ালে পুলিসে ধরে না?"

"পুলিস!" পুলিসের নাম শুনে শাশ্বত হো-হো করে হেসে উঠল। পুলিস যেন শাশ্বতর কাছে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের জিনিস! তখন পুলিসকে দেখলে ভয়ে আমাদের গা শিরশির করত। আর সেই পুলিসকেই শাশ্বত কিনা মানতে চায় না!

জিজ্ঞাসা করলাম, "তুই রিভলভার পেলি কী করে?"

শাশ্বত বললে, "আমার মামা যে দিয়েছে। আমার মামার তো অনেকগুলো রিভলভার। একদিন আমি একটা রিভলভার চেয়েছিলুম, তাই আমাকে একটা দিয়ে দিলে।"

তারপর একটু থেকে বললে, "তুই একটা পিস্তল নিবি?"

বললাম, "আমি তো পিস্তল চালাতে শিখিনি, আমি পিস্তল কখনও হাত দিয়ে ছুঁইওনি।"

শাশ্বত বললে, "তুই একটু আড়ালে চল, তোকে পিস্তল দেখাব।"

বলে আমাকে একটা অন্ধকার গলির মধ্যে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে ট্যাঁক থেকে পিস্তলটা আমাকে দেখালে। আমি দেখলাম। অন্ধকারে যতটা দেখা যায় ততটা দেখলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, "এর ভেতরে গুলি ভরা আছে?"

শাশ্বত বললে, "হ্যাঁ, তিনটে গুলি ভরা আছে।"

আনন্দে, বিস্ময়ে, বন্ধু-গর্বে আমার বুকটা দশ হাত ফুলে উঠল। আমার মনে হল, এত লোক থাকতে শাশ্বতই আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুই কী করে জানতে পারলি যে, লোকটা গুন্ডা?"

শাশ্বত বললে, "আমি পাড়ার গুন্ডাদের সবাইকে চিনি।"

"কী করে চিনলি?"

শাশ্বত বললে, "তুই কাউকে বলবি না, বল আগে!"

আমি বললাম, "কথা দিচ্ছি কাউকে বলব না।"

শাশ্বত গলাটা নিচু করলে। তারপর বললে, "আমি রোজ রাত্তিরে গুন্ডা ধরতে বেরোই।"

আমি বুঝতে পারলুম না।

বললাম, "গুন্ডা ধরতে মানে?"

শাশ্বত বললে, তোরা যখন ঘুমোস তখন আমার কাজ শুরু হয়। আমি খেয়ে-দেয়ে ঘুমোতে যাই না। আমি আমার এই রিভলভারটা আর সড়কিটা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি।"

"তোর ভয় করে না?"

"ভয় করবে কেন? আমার মামা তো পুলিসের কমিশনার রে! আমি যত গুন্ডা ধরি সবাইকে মামার হাতে তুলে দিই। মামা তাদের ধরে-ধরে জেলে পোরে।"

"কী করে গুন্ডাদের ধরিস?"

"এই পিস্তল দেখিয়ে।"

"কিন্তু যদি অনেকগুলো গুন্ডা একসঙ্গে মিলে তোকে ধরে, তখন? তুই একলা সকলের সঙ্গে লড়তে পারবি?"

"কেন পারব না। আমি তো যুযুৎসু জানি। যুযুৎসুর প্যাঁচ মেরে সবাইকে চিত করে ফেলে দিই। তখন গুলি করে সবগুলোকে মেরে ফেলি!"

শাশ্বতর কথা শুনে আমি ভয়ে শিউরে উঠতাম, আর তার বীরত্বের কথা শুনে নিজের বন্ধু বলে শাশ্বতকে নিয়ে আমার গর্বও হত। ভাবতাম আমাকে বিশ্বাস করে শাশ্বত সব কথা বলে, আর কাউকেই আমার মতো বিশ্বাস করে না, এও তো আমার কাছে গৌরবের জিনিস।

ক্লাসে যখন শাশ্বত লেখা-পড়া পারত না বলে মাস্টার-মশাইয়ের কাছে বকুনি খেত তখন আমার খুব কষ্ট হ'ত। মাস্টারমশাইরা তো জানেন না যে, শাশ্বত কত বড় বীর! শাশ্বতর নিজের মামা যে পুলিসের একেবারে খোদ বড়কর্তা, পুলিস কমিশনার তাও জানেন না। তাই শাশ্বতর জন্যে আমার দুঃখ না হলেও দুঃখ হ'ত মাস্টারমশাইদের জন্যে! সত্যি, মাস্টারমশাইরা কী বোকা। তাঁরা জানেনও না যে, শাশ্বত ইচ্ছে করলে সবাইকে গ্রেফতার করে নিতে পারে। তখন?

কিন্তু শাশ্বতর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, তার গুন্ডা ধরার কাহিনী, তার মামার কাহিনী কাউকেই বলব না। আমি তাই কাউকেই কিছু বলিনি।

*

গরমের ছুটির সময় শাশ্বত দুপুরবেলায় আমাদের বাড়িতে আসত। আমার বাড়িতে আমার মা আমাকে শাশ্বতর সঙ্গে মিশতে দিত না।

মা বলত, "ওর সঙ্গে মিশিস কেন তুই? ও ছেলেটা খুব দুষ্টু।"

দাদারাও পছন্দ করত না যে, আমি শাশ্বতর সঙ্গে মিশি। সবাই জানত শাশ্বত লেখাপড়ায় ভাল নয়। খারাপ ছেলের সঙ্গে মিশে আমিও পাছে খারাপ হয়ে যাই, এই-ই ছিল সকলের ভয়। কিন্তু ওদের আমি কী করে বোঝাব যে, শাশ্বত যে-সে ছেলে নয়, সে সারা রাত ঘুরে-ঘুরে গুন্ডা ধরে বেড়ায়। ভাবতাম একবার সকলকে বলি যে, তোমরা আজকে শাশ্বতকে খারাপ ছেলে বলে বদনাম দিচ্ছ, কিন্তু যখন ও আবার পুলিসের বড় চাকরি করবে তখন তোমরাই আবার ওকে খোশামোদ করে ওকে মাথায় তুলবে।

তখন আমার খুব কম বয়েস হলেও এটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি হয়েছিল। বুদ্ধি হয়েছিল যে, মানুষ বেশির ভাগই স্বার্থপর। যে-মানুষের কাছেই তার নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি হবে সেখানেই সে সেই মানুষের পা চাটবে। অথচ সত্যিকারের গুণী মানুষের কোথাও আদর নেই। বিশেষ করে যদি সেই মানুষটা গরিব হয়।

শাশ্বতরা ছিল গরিব।

কিন্তু গরিব হওয়া কি নিন্দের?

সংসারে টাকা বড় না গুণ বড়? এই যে শাশ্বত এত বড় গুণী ছেলে, সে সমাজের এত উপকার করছে, এর কি কোনও দাম নেই? তার আর্থিক অবস্থা দেখেই কি লোকে তাকে বিচার করবে?

সত্যিই, যার নিজের মামা পুলিস কমিশনার, তারা এত গরিব বাড়িতে থাকবে, এ কথাটা আমারও মাঝে-মাঝে মনে হত।

দেখতাম শাশ্বতর মা নিজের হাতে রান্না করত। ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরে সংসারের কাজ করত। যে-বাড়িটাতে শাশ্বতরা থাকত সে বাড়িটাও বস্তির ভেতরে। বোধহয় আট টাকা কি দশ টাকা ভাড়া।

আমার মা দাদারা কেউই পছন্দ করত না যে, আমি শাশ্বতর সঙ্গে মিশি। তার একমাত্র কারণ, শাশ্বতরা গরিব আর শাশ্বত লেখা-পড়াতেও তেমন ভাল নয়।

খারাপ আর গরিব ছেলেদের সঙ্গে কোন বাড়ির বাপ-মা'ই তাদের ছেলেদের মিশতে দেয়! আর সত্যিই তো আমার বাবা কি মায়েরও তো অন্যায় নয়। শাশ্বতর মামা যে কলকাতার পুলিস কমিশনার তা তো তারা জানত না!

শাশ্বত দুপুরবেলা আমার বাড়ির যে-ঘরে আমি থাকতুম সেই ঘরের বাইরে এসে চুপি চুপি ডাকত, "এই বিনু, বিনু—"

আমি শাশ্বতর গলার আওয়াজ টের পেয়েই বাইরে বেরিয়ে আসতাম লুকিয়ে-লুকিয়ে।

শাশ্বত বলত "চল, কালীঘাট রেল-ইস্টিশানের দিকে যাই—"

আমি জিজ্ঞেস করতাম, "কেন রে? সেখানে কী আছে?"

শাশ্বত বলত, "কিছু নেই, এমনি।"

বুঝতে পারলুম না। বললাম, "কী হয়েছে সত্যি বল তো?"

শাশ্বত বললে, "মামা আমাকে বকেছে ভাই খুব।"

"কেন?"

"আমি একটা সিল্কের জামা পরেছিলুম, তাই! আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে, তাই তোর কাছে চলে এলুম।"

ভাগ্নের সিল্কের জামা পরাতে কী এমন অপরাধ হল বুঝতে পারলাম না। সিল্কের শার্ট-প্যান্ট আমিও পরতাম। কিন্তু তাতে যে অপরাধ হয়, তা জানা ছিল না।

"তোর মামা এসেছিল নাকি তোদের বাড়িতে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু অনেক রাত্তিরে, যাতে কেউ জানতে না পারে।"

"জানতে পারলে কী ক্ষতি?"

শাশ্বত বললে, "জানতে পারলে সবাই মামাকে বিরক্ত করবে। মামার কাছে সবাই চাকরি চাইবে। সেই জন্যেই তো আমরা বস্তি-বাড়িতে থাকি। গরিবের মতো করে থাকি। মামাও জানাতে দিতে চান না যে, আমি তার ভাগ্নে। একমাত্র তোকেই কথাটা বলেছি, আর কেউ তো জানে না।"

তখন বুঝলাম কেন শাশ্বত ওই রকম বস্তি-বাড়িতে থাকে। জানতে পারলাম কেন ওই রকম সাদাসিধে জামা-কাপড় পরে।

জিজ্ঞেস করলাম, "সিল্কের জামা পরলে দোষ কী?"

শাশ্বত বললে, "তা আমি তো জানি না ভাই, মামা বলেন যে-দেশে এত গরিব সে-দেশে সিল্কের জামা পরা পাপ। এই বড়লোকদের বিলাসিতা দেখেই তো গরিব লোকদের এত রাগ। এত ডাকাতি, রাহাজানি, খুনোখুনি তো ওই জন্যেই হচ্ছে। একদিকে এত টাকা নষ্ট আর একদিকে এত অভাব—এ কখনও গরিব লোকেরা সহ্য করতে পারে? তাই তো সব সময়ে দু'দলে মারামারি লেগে আছে, তাই তো এত গুণ্ডাদের অত্যাচার, এত ব্যাঙ্ক-ডাকাতি চলছে। এই সব যত হবে মামার দায়িত্ব আর কাজও তত বাড়বে!"

"কত টাকা দিয়ে জামাটা কিনেছিলি?"

"সত্তর টাকা!"

সত্তর টাকা! আমি চমকে উঠলুম। তখনকার দিনে কুড়ি টাকা দিয়ে ভাল সিল্কের শার্ট পাওয়া যেত। সেই সস্তা-গণ্ডার দিনে শাশ্বত সত্তর টাকা দিয়ে কিনেছিল! তাহলে কে বললে শাশ্বতরা গরিব!

"জামাটা তাহলে কী করলি? কাউকে দিয়ে দিলি?"

শাশ্বত বললে, "না, জামাটা ছিঁড়ে ফেললুম। আমার মা-ও জামাটা ছিঁড়ে ফেলতে বললে। মামা নিজে যখন আপত্তি করছে তখন কী করে পরি বল?"

শাশ্বত আর আমি কালীঘাটের রেল-ইস্টিশনের দিকে চলতে লাগলাম।

যেতে-যেতে অনেক কথা হতে লাগল আমাদের মধ্যে। আমাদের দুই বন্ধুর সুখ-দুঃখের কথা। আমি বারবার ভাবতাম শাশ্বতরা আমাদের সকলের চেয়ে গরিব, কিন্তু তার পর থেকে আমার সে-ধারণা বদলে গেল।

রাস্তায় চলতে-চলতে শাশ্বত আমাকে অনেক কথা বলত, আর আমি মন দিয়ে তার সমস্ত কথা শুনতাম।

শাশ্বত বলত, ''দেখ, আমি বড় ঘরের ছেলে, আমি ইচ্ছে করলেই তোদের মতন ভাল দামি জামা কাপড় পরতে পারি। কিন্তু পরি না।"

''কেন, পরিস না কেন?''

শাশ্বত বলত, "আমার লজ্জা করে।"

"কেন, লজ্জা করে কেন?"

শাশ্বত বলত, "লজ্জা করবে না? আমাদের দেশে কটা লোকের সিল্কের জামা-কাপড় পরবার ক্ষমতা আছে বল তো? যেদিন সবাই ভাল জামা-কাপড় পরতে পাবে সেদিন আমিও ভাল দামি জামা-কাপড় পরব।"

শাশ্বতর কথা শুনে আমি অবাক হয়ে যেতাম! শাশ্বত এতও ভাবে? আর তো আমাদের কাউকে এসব কথা বলতে শুনিনি।

শাশ্বতর কথা শুনে তার ওপর আমার আরও ভক্তি বেড়ে যেত।

আমার বাড়িতে আমি বাবা-মা'র কাছ থেকে অনেক টাকা হাত-খরচ হিসেবে পেতুম! আমরা ছিলাম শাশ্বতদের চেয়ে অনেক বড়লোক। আমার বাবা অনেক বড় চাকরি করতেন। আমার মাথার ওপরে আমার দাদারাও খুব বড় চাকরি করতেন। আমাদের বাড়িতে অনেক চাকর-বাকর-ঝি-ঠাকুর ছিল। নিজের হাতে আমাকে কখনও কোনও কাজ করতে হত না। এক গ্লাস জল কখনও নিজের হাতে গড়িয়ে খাইনি। নিজের হাতে বাজার করা তো দূরের কথা।

আর সেই আমারই কিনা সব চেয়ে ভাল লাগত শাশ্বতকে।

আমার কাছে সব সময় থাকত দেদার পয়সা। মা আমার হাত-খরচের জন্যে আমাকে প্রায়ই পাঁচটাকার কি দশটাকার একটা নোট দিতেন। সেগুলো ফুরিয়ে গেলে আবার টাকা দিতেন আমাকে। তার জন্যে কখনও বাবা-মা'র কাছে আমাকে দরবার করতে হত না।

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে হয়তো একটা ভিখিরি একটা পয়সা চাইত। আমি হয়তো ভিখিরিটাকে কখনও একটা পয়সা দিতাম।

শাশ্বত দেখত। বলত, ''ওকে তুই মাত্র একটা পয়সা দিলি?''

আমি বলতাম, ''ও তো একটা পয়সা চাইলে।''

শাশ্বত রেগে যেত। বলত, ''ও একটা পয়সা চাইলে বলে তুই একটা পয়সাই দিলি? তুই বড় কিপ্‌টে তো!''

আমি বলতাম, ''আচ্ছা ঠিক আছে, আর একটা পয়সা দিচ্ছি—''

শাশ্বত বলত, ''একটা আধুলি দিতে পারিস না? তোর কাছে একটা আধুলি তো মাটি রে!''

আমি লজ্জায় পড়ে যেতুম। ভিখিরিটাকে একটা পুরো টাকাই দিয়ে দিতুম।

শাশ্বত আনন্দে আমার পিঠ চাপড়ে দিত! বলত, ''এই তো, এই রকমই তো করা চাই। গরিবদের দুঃখটা একবার ভাবতে হবে। ওদের ভাল হলে তবেই আমাদের ভাল, তা জানিস? ওরা যে গরিব তার জন্যে কারা দায়ী জানিস?''

আমি বলতাম, ''না।''

''আমরা। ওরা যে অত গরিব তার জন্যে এই আমরাই দায়ী। আমরাই ওদের সারা জীবন গরিব করে রেখেছি। ওরা যদি চিরকাল গরিব হয়ে থাকে তো আমরাও চিরকাল বড়লোক হয়ে থাকতে পারব না।''

আমি শাশ্বতর কথা ভাবতে লাগলাম। এ-কথাটা তো আমি কোনদিন একবারও ভাবিনি।

আমি বলতাম, ''তোকে এসব কথা কে শেখালে রে শাশ্বত?''

শাশ্বত বলত, ''আমার মামা।''

''তোর যে-মামা পুলিস কমিশনার?''

''হ্যাঁ, মামা পুলিস কমিশনার হলে কী হবে। মামা গরিবদের দুঃখ যেমন বোঝে অমন করে কোনও মন্ত্রীও ভাবে না। এই যে আমাদের দেশে এত চুরি-ডাকাতি হচ্ছে, এ কিসের জন্যে হচ্ছে? কাদের জন্যে হচ্ছে? মামা বলেন, এসব আমাদের জন্যেই হচ্ছে, আমাদের মতো বড়লোকদের জন্যেই হচ্ছে।''

''তোর মামা নিজে এই কথা বলেছে?''

''হ্যাঁ রে, বলবে না? মামা যে নিজের চোখে সব দেখেছেন। মামা নিজে পুলিস কমিশনার হয়েও সারারাত গাড়ি নিয়ে কলকাতায় রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ান। ঘুরে-ঘুরে সব দেখেন। সব দেখে-শুনে মামার এই ধারণা হয়েছে। মামা বলেন, যে-দেশে বড়লোকের সংখ্যা কম আর গরিবদের সংখ্যা বেশি, সেই দেশেই বেশি চুরি-ডাকাতি হয়।''

আমি বলতাম, ''তা তোর মামা নিজে পুলিস কমিশনার হয়ে এই এত চুরি-ডাকাতি বন্ধ করতে পারেন না?''

''পারবেন কী করে? তাহলে হয় সব বড়লোকদের গরিব করে দিতে হয় আর নয় তো সব গরিবলোকদের বড়লোক করে দিতে হয়। তা তো আর সম্ভব নয়। সে-সব কাজ তো মামার হাতে নেই।''

কথাগুলো ভাববার মতো।

বলতে-বলতে হঠাৎ শাশ্বত একটা বাড়ির থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়ত। আর খানিক পরেই আবার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসত।

আমি জিজ্ঞেস করতাম, ''কী রে, অমন করে থামের আড়ালে লুকোলি কেন?''

শাশ্বত বলত, ''আমার মামা যাচ্ছিলেন রে। ভাগ্যিস দেখতে পায়নি।''

আমি জিজ্ঞেস করতাম, ''কই, কোথায় তোর মামা?''

''ওই তো, ওই যে একটা গাড়ি চলে গেল, ওর ভেতরেই মামা বসে ছিলেন। ভাগ্যিস আমি লুকিয়ে পড়লাম।''

আমি বুঝতে পারতাম না। জিজ্ঞেস করতাম, ''কেন, দেখতে পেলে কী ক্ষতি হত?''

''আরে তুই জানিস না, দেখতে পেলেই মামা আমাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতেন আর বকতেন।''

''কেন, বকতেন কেন?''

''বকতেন এই জন্যে যে, আমি বাজে ছেলের সঙ্গে মিশছি। মামা চান না আমি বাজে ছেলের সঙ্গে মিশি।''

''আমি বাজে ছেলে?''

''আরে তুই বাজে ছেলে হতে যাবি কেন? মামার ধারণা কলকাতার সব ছেলেই বাজে। এই যে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো, এটা মামা মোটে পছন্দ করেন না।''

এরকম প্রায়ই হত, কিন্তু আমরা রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো তবু বন্ধ করতাম না।

*

সেদিন শাশ্বতদের বাড়ি গিয়েছি। ছুটির দুপুর।

বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকলাম, ''শাশ্বত, এই শাশ্বত—''

শাশ্বতের বিধবা মা সদর-দরজা খুলে দিলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, ''শাশ্বত বাড়িতে নেই?''

শাশ্বতের মা বললেন, ''ও, তুমি? কিন্তু সে তো বাড়িতে নেই বাবা।''

''কোথায় গেছে সে?''

শাশ্বতর মা বললেন, ''তার মামার বাড়ি।''

আমি চলে আসছিলাম। হঠাৎ শাশ্বতর মা বললেন, ''তুমি চলে যাচ্ছ কেন, বোসো না একটু। সে তো এক ঘণ্টার মধ্যেই চলে আসবে।''

শাশ্বতর মা বললেন, ''তার আগেও চলে আসতে পারে। এই রোদ্দুরে তুমি কোথায় ঘুরবে। তুমি একটু ঠাণ্ডায় ঘরের মধ্যে বসে আরাম করো।''

আমি আর কী করব। ঘরের ভেতরে গিয়ে বসলাম। ঘরের ভেতরে একটি তক্তপোশ, তার ওপরে মাদুর পাতা। সেই মাদুরের ওপরেই শাশ্বতর মা এতক্ষণ শুয়ে ছিলেন। সারা বাড়িতে ওই একখানাই মাত্র ঘর। মাথার ওপরে ইলেকট্রিক ফ্যান-ট্যান কিছু নেই। তা হোক, শাশ্বত আর তার মা ওই তক্তপোশের ওপরেই রাত্তিরে শুতে। অথচ আমাদের বাড়িতে প্রত্যেক ঘরে ঘরে প্রত্যেকের মাথার ওপরে ফ্যান। তবু আমার ভাল লাগত ওই শাশ্বতদের বাড়িটা।

''আমাকে এক গেলাস জল দেবেন মাসিমা?''

''হ্যাঁ, দিই।''

বলে একটা কলাই-করা গেলাসে জল নিয়ে এলেন মাসিমা। আমি জল খেলাম।

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, ''হ্যাঁ গো বাবা, তুমি যে আমাদের বাড়ি যখন তখন আসো তাতে তোমার বাবা-মা কিছু বলেন না?''

''কেন, কিছু বলবে কেন?''

''না, তুমি তো আমার শাশ্বতর চেয়ে ভাল ছেলে, তাই বলছি।''

আমি বললাম, ''কে বললে শাশ্বত আমার চেয়ে খারাপ ছেলে?''

মাসিমা বললেন, ''কী জানি বাবা, সারাদিনই তো ও টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়। কখন যে লেখা-পড়া করে তা তো জানি না।''

আমি বললাম, ''দেখে নেবেন, শাশ্বত একদিন খুব বড় হবে। ওর মতন বুদ্ধি আমাদের ক্লাসের মধ্যে কারও নেই। ওর অত বুদ্ধি বলেই তো আমি সবাইকে ছেড়ে ওর সঙ্গে মিশি।''

''কিন্তু বাবা, ও তো পড়ে না মোটে। আমি ওকে কত তে বসতে বলি। কিন্তু কিছুতেই ও আমার কথা শুনবে না। একগুঁয়ে ছেলে ও। যা মনে করবে ভাবে তাই-ই করবে। ও কোনও কথা মানবে না। তুমি ওর এত বন্ধু, তুমি একটু ওকে বুঝিয়ে বলতে পারো না।''

আমি মাসিমার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। শাশ্বতর যে কত বুদ্ধি তা তো মাসিমা জানেন না। বললাম, "শাশ্বত আমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান মাসিমা, আপনি তো জানেন না। ও আমাকে শেখাতে পারে।''

মাসিমা বললেন, ''ছাই পারে, আমার ভাগ্য যদি অত ভাল হবে তাহলে আমার এত ভাবনা। ওর জন্যেই আমার এত জ্বালা। ও যখন জন্মাল তখনই তোমার মেসোমশাই মারা গেলেন। তখন থেকেই আমার কপাল পুড়েছে।"

আমি মাসিমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ''আমি বলছি দেখবেন একদিন ওই শাশ্বত আপনার সব দুঃখ ঘোচাবে।"

"ছাই ঘোচাবে, ওর যদি অতই বুদ্ধি হত তাহলে আমার দুঃখটা বুঝত। আমি যে বাবা কী কষ্ট করে ওকে মানুষ করেছি তা তো ও জানে না।"

আমি বলতাম, "তা না জানুক, বড় হয়ে দেখবেন ও খুব বড় চাকরি করবে। মানুষ তো ইস্কুল কলেজের ডিগ্রী দিয়ে বড় হয় না, বড় হয় তার সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে। সেই সাধারণ বুদ্ধি ওর খুব আছে। আমি ওর সঙ্গে তো ওই জন্যেই মিশি। ওর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি—''

মাসিমা বলতেন, ''আমি তো ভগবানের কাছে সারাদিন সেই প্রার্থনাই করি। আমি শুধু ভাবি ও মানুষ হোক, আমি নিজের জীবনে যে-কষ্ট পেয়ে গেলুম, ও যেন বড় হয়ে সে-কষ্ট না পায়—''

আমি বলতাম, ''দেখবেন আপনি, ও সে-কষ্ট পাবে না। আপনি মিছিমিছি ওইসব ভাবেন।''

মাসিমা বলতেন, ''ভাবব না? তুমি বলছ কী? ও যে মোটে লেখা-পড়া করে না, দিন-রাত কেবল কোথায় টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়, কেউ জানতে পারে না। ওকে জিজ্ঞেস করলেও কিছু বলে না। ইস্কুল থেকে এসেই কোথায় বেরিয়ে যায়।''

আমি বলতাম, ''ইস্কুল থেকে ফিরে এসে তো শাশ্বত আর আমি দুজনে এক সঙ্গেই বেড়াতে যাই—''

''তারপর? তারপর কী করো?''

"তারপর বাড়িতে সন্ধেবেলা মাস্টারমশাই আসেন, তাঁর কাছে পড়তে বসি।"

মাসিমা বলতেন, ''তুমি তো তোমার মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়তে বসো, আর ও তারপর কী করে জানো?''

"না, তারপর ও-ও তো পড়তে বসে।"

মাসিমা বলতেন, ''না, পড়তেই যদি বসবে তাহলে তোমার কাছে বলছি কী? ও তখন জলখাবার খেয়ে আবার বেরোয়।''

''আবার বেরোয়? কোথায় বেরোয়?''

''ভগবান জানে! আমাকে কিচ্ছু বলে না।"

"তারপর কখন বাড়ি ফেরে?"

মাসিমা বলতেন, "সে অনেক রাতে। আমি তখন ভাত কোলে করে বসে থাকি। জিজ্ঞেস করি যদি যে কোথায় গিয়েছিলি তো জবাব দেবে 'তুমি জেনে কী করবে?' শুনলে ছেলের কথা?''

আমি আর মাসিমাকে কিছু বলতুম না। আমি তো জানতুম শাশ্বত কোথায় যায়। শাশ্বত তো আমাকে নিজেই বলেছে যে সে গুপ্ত সড়কি নিয়ে চোর-ডাকাত-গুণ্ডা ধরতে সারা রাত কলকাতার রাস্তার গলি-ঘুঁজিতে ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু সে-সব কথা মাসিমাকে বলা যায় না। ও-সব শাশ্বত বিশ্বাস করে আমাকে বলেছে শুধু আমার জন্যেই। মা'কে সে-সব কথা বললে শাশ্বতর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

যখন দেখতাম এখনও শাশ্বত ফিরছে না তখন উঠতাম। বলতাম, ''তাহলে আমি চলি মাসিমা, মামার বাড়ি থেকে ফিরে এলে বলবেন আমি এসেছিলুম।''

''হ্যাঁ, বলব। তুমি আর কতক্ষণ তার জন্যে বসে থাকবে। তোমারও তো লেখা-পড়া আছে।''

আমি চলেই আসছিলাম, হঠাৎ একজন অচেনা লোক এসে হাজির হল।

বললে, ''মা-জননী আছেন নাকি?''

মাসিমা এগিয়ে এলেন।

বললেন, ''হ্যাঁ, কে? ও আপনি এসে গেছেন?''

লোকটা বললে, ''হ্যাঁ, আপনি তো আজই আমাকে আসতে বলেছিলেন মা-জননী।''

মাসিমা বললেন, ''তা তো বলেছিলাম, কিন্তু আমি সে-কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম।''

লোকটা বললে, ''কিন্তু আপনি তো সবই বোঝেন মা-জননী, আপনি তো জানেন আমি ছাপোষা মানুষ। এই বাড়ি-ভাড়ার টাকাতেই আমার সংসার-ধর্ম সব কিছু চলে। আজ তিনমাস হয়ে গেল আপনি একটা পয়সাও দিলেন না, আমার পেট কী করে চলে, সেইটে একবার বলুন মা-জননী।''

মাসিমা যেন খুব দুশ্চিন্তায় পড়লেন।

লোকটা বললে, ''অন্তত আজকে যদি এক মাসের ভাড়াটাও দিতেন তো বড় উপকার হত আমার—''

মাসিমা মুখ কালো করে বললেন, ''কিন্তু আমার হাতে তো বাবা একটা পয়সাও নেই এখন। আমার ভাই এখনও টাকা দিয়ে যায়নি। আমার ছেলেকে তাই আমার ভাইয়ের কাছে পাঠিয়েছি টাকা আনবার জন্যে। আমি তো তার পথের দিকেই চেয়ে বসে আছি—''

মাসিমার ভাই মানে শাশ্বতর মামা। শাশ্বতর মামাই তো পুলিস কমিশনার। তার বোন তিন মাসের বাড়ি ভাড়া দিতে পারছে না, এটা তো পুলিস কমিশনারের বোঝা উচিত।

লোকটা বললে, ''দেখুন না চেষ্টা করে যদি এক মাসের বাড়ি ভাড়াটাও দিতে পারতেন। আমি যে আবার আর-একজনকে কথা দিয়েছি। সে-ভদ্রলোককে আবার খালি হাতে ফেরত দিতে হবে।''

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমি সব কথা শুনছিলাম।

এবার মাসিমার দিকে চেয়ে বললাম, ''এক মাসের ভাড়া কত টাকা মাসিমা?''

মাসিমা কিছু বলবার আগেই লোকটা বললে, ''দশ টাকা—''

আমি বললাম, ''আমার কাছে দশটা টাকা আছে, আমি টাকাটা দিয়ে দেব মাসিমা?''

''তুমি দেবে?''

লোকটা বললে, "ও দিক না এখন, পরে না-হয় আপনি ওকে দিয়ে দেবেন।''

আমি এ-কথার কোনও জবাব না দিয়ে পকেট থেকে দশ টাকার একটা নোট বার করে লোকটাকে দিলাম। লোকটা টাকাটা ছোঁ মেরে নিজের পকেটে পুরে ফেললে।

পুলিস কমিশনারের বোনের অপমান হবে এ আমি নিজের চোখে দাঁড়িয়ে দেখতে পারব না।

আমি সেদিন সেখানে আর দাঁড়ালাম না। বাড়ি চলে এলাম।

টাকাটা শাশ্বতদের বাড়িওয়ালাকে দিয়ে মনে খুব তৃপ্তি পেলাম।

ক'দিন ধরে আর শাশ্বতর দেখা পেলাম না। অত বড়লোক মামা, সেখানে গিয়ে বোধহয় খুব আরামে কাটাল সে।

আমি মাঝে-মাঝে গিয়ে খবর নিতাম। দরজার কড়া নেড়ে

জিজ্ঞেস করতাম, ''মাসিমা, শাশ্বত এসেছে?''

মাসিমা দরজা খুলে দিয়ে বলতেন, ''না বাবা, সে তো আসেনি।''

আমি বলতাম, ''এখনও আসছে না কেন সে?''

মাসিমা বলতেন, ''গরমের ছুটি রয়েছে তো, তাই সেখানে আরাম করছে।''

আমারও গরমের ছুটি চলছে তখন। কিন্তু আমার তখন আরাম নেই। আমার তো আর কোনও বন্ধু-বান্ধব ছিল না। ক্লাসের মধ্যে শাশ্বত ছাড়া আর কারও সঙ্গে মিশে আনন্দ পেতাম না। আমি একলা-একলা ঘুরে বেড়াতাম। বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকতে ভাল লাগত না।

মা বকতেন, বলতেন, ''ওর সঙ্গে তোর অত ভাব কেন? ওই ছোঁড়াটার সঙ্গে?''

আমাদের বাড়ির কেউই শাশ্বতকে পছন্দ করত না। তাই শাশ্বতকে 'ছোঁড়া' বলত সবাই। শাশ্বতকে বাড়ির লোকেদের পছন্দ না হওয়ার কারণ শাশ্বতরা ছিল গরিব। দ্বিতীয় কারণ ও লেখা-পড়ায় ভাল ছিল না। লেখা-পড়ায় খারাপ হওয়া যতটা খারাপ তার চেয়ে বেশি খারাপ গরিব হওয়া। আমার বাড়িতে মা-বাবা-দাদারা কেউই গরিব লোকেদের দেখতে পারতেন না। আমি সেটা বুঝতে পারতাম। তাই আমি চাইতাম না যে শাশ্বত আমাদের বাড়িতে আসুক। আমার সামনে শাশ্বতকে কেউ অপমান করবে এ আমি প্রাণ থাকতে সহ্য করতে পারতাম না।

এসব কথা আমি শাশ্বতকে মুখেও বলতাম।

শাশ্বত বলত, ''আমাকে কেউ ঘেন্না করলে আমার বয়ে গেছে। তুই তো জানিস, আমি কাউকে পরোয়া করি না।''

আমি বলতাম, ''তা তো জানি। কিন্তু তোকে কেউ অপমান করলে আমার মোটে সহ্য হয় না। আমার বাড়ির লোকেরা তোকে দেখতে পারে না, স্কুলের মাস্টাররা তোকে দেখতে পারে না, ক্লাসের ছেলেরাও তোকে কেউ পছন্দ করে না, এতে আমার যে খুব খারাপ লাগে।''

শাশ্বত বলত, ''তাহলে তুইও আমার সঙ্গে মেশা ছেড়ে দে। তুই-ই বা কেন আমার সঙ্গে মিশিস? না মিশলেই পারিস। আমার তাতে কোনও ক্ষতি নেই।''

শাশ্বত এই রকমই। বড় অভিমানী ছিল সে।

সে বলত, ''আমি আপন মনে নিজের কাজ করে যাব। তাতে কারও ভাল লাগুক আর খারাপই লাগুক, তাতে আমার কী এসে যায়? আমি জানি আমি কখনও অন্যায় করিনি, করবও না।''

আমি শাশ্বতর কথাগুলো মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতুম। আর সেই সঙ্গে নিজেও শাশ্বতর মতো হতে চেষ্টা করতুম।

এক-এক সময়ে শাশ্বত রেগে যেত। বলত, ''দ্যাখ, আমি জানি তোরা সবাই আমাকে ঘেন্না করিস।''

আমি বলতাম, ''অন্য সবাই হয়তো ঘেন্না করে, কিন্তু আমি তোকে ঘেন্না করি না। আমি ভগবানের নামে দিব্যি করে বলতে পারি, তুই বিশ্বাস কর।''

শাশ্বত বলত, ''কেন, তুই আমাকে ঘেন্না করিস না কেন? আমার মধ্যে তুই কী পেয়েছিস?''

আমি বলতাম, ''তোকে আমি যে খুব ভালবাসি। সেটা তুই বুঝতে পারিস না?''

শাশ্বত বলত, ''তুই ঘেন্না করলেও আমার তাতে কিছু আসবে যাবে না। এ পৃথিবীতে যে সব-কিছু সহ্য করতে পারে, সে-ই থেকে যায়।''

''একথা তোকে কে বললে?''

শাশ্বত বললে, ''আমার মামা। মামা বলেছে একদিন পৃথিবীতে গরিবদেরই জয়-জয়কার হবে। আর বড়লোকরা সব নীচে নেমে যাবে। তাদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে। দেখিসনি, আমাদের

পাড়ায় ওই যে নাজিরদের মস্ত বড় ভাঙা বাড়ি রয়েছে। একদিন ওদের খুব বোলবোলা ছিল। ওদের ঘোড়ার গাড়ি ছিল, গেটে বন্দুক নিয়ে দারোয়ান দাঁড়িয়ে থাকত, ওদের বাড়ির ছেলেরা খুব বাবুয়ানি করত, এসব আমার শোনা কথা। কিন্তু আজ? আজ ভাইতে-ভাইতে মামলা, এ ওর মুখ দেখে না, সব আলাদা-আলাদা হাঁড়ি, এসব কেন হল?''

আমি জিজ্ঞেস করতাম, ''কেন হল রে?''

শাশ্বত বলত, ''বেশি বড়লোক হলে ওই রকমই হয়।''

আমি বলতাম, ''আমরা? আমরাও কি ওই রকম হয়ে যাব? আমাদেরও ভাইতে-ভাইতে মামলা হবে?''

''বেশি টাকা হলে তোদেরও ওইরকম হবে।''

তারপর একটু থেমে বলত, ''সেই জন্যেই তো মামা বলেন বেশি টাকা থাকা পাপ। বেশি টাকা থাকলে ছেলেরা আলসে হয়ে যায়, কাজ-কর্ম করতে চায় না, কেবল আড্ডা মেরে-মেরে বেড়ায়। তাতেই তাদের সর্বনাশ হয়। আমিও তাই বেশি টাকা চাই না—''

সত্যিই শাশ্বতর জামা-কাপড়ের বাহার ছিল না। সাধারণ আধ-ময়লা শার্ট পরেই চালিয়ে দিত সব সময়ে। কিন্তু আমার বাড়িতে অন্য ব্যবস্থা ছিল। একটা শার্ট দু'দিন পরলেই মা রাগারাগি করতেন। সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে অন্য ফর্সা শার্ট পরতে বাধ্য করতেন।

বলতেন, ''ও-রকম ময়লা শার্ট রোজ-রোজ পরলে লোকে বলবে এদের পয়সা নেই, এরা গরিব।''

আমি মাকে বলতাম, ''তা গরিব বললে ক্ষতি কী? গরিব হওয়া কি দোষের?''

মা বলতেন, ''দোষের নয় তো কী? গরিবদের কেউ ভাল নজরে দেখে?''

আমি বলতাম, ''কেন, আমার বন্ধু শাশ্বত তো আধ-ময়লা জামা-কাপড় পরে, সেটা কি খারাপ? ওই তো আমাদের পাড়ার নাজিররা এককালে কত বাবুয়ানি করেছিল, এখন কি সে অবস্থা আছে?''

মা জিজ্ঞেস করতেন, ''এসব কথা তোকে কে শিখিয়েছে? ওই বাউণ্ডুলে ছেলেটা?''

আমি সগর্বে বলতাম, ''হ্যাঁ, কিন্তু তুমি যা ভাবছ ও তা নয়। ও গরিব হতে পারে কিন্তু বাউণ্ডুলে মোটেই নয়। ওরা খুব বড়লোক। ওইরকম সাদাসিধে ভাবে থাকে তাই তুমি ওই কথা বললে। ওর মামা কে জানো?''

মা বলতেন, ''জেনে আমার দরকার নেই। আমি যা দুচক্ষে

তে পারি না তাই-ই হয়েছে আমার ছেলে।''

বাবা একদিন আমাকে ধরলেন। বললেন, ''এসব কী শুনছি? তুমি নাকি যার-তার সঙ্গে মেশো। খবরদার বলছি যার-তার সঙ্গে মিশো না, ওতে স্বভাব চরিত্র খারাপ হয়ে যাবে। যারা লেখা-পড়ায় ক্লাসে ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়, কেবল তাদের সঙ্গেই মিশবে। আর মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। যাও—''

বাবার বকুনি চুপ করে সহ্য করলাম। মুখে কিছু বললাম না। কিন্তু মনে মনে বড় কষ্ট পেতে লাগলাম। শাশ্বতর বাইরেটাই সবাই দেখে, কিন্তু ভেতরটা কেউই দেখলে না। সে যখন একদিন ভবিষ্যতে বড় হবে তখন তোমরাই আবার ওকে বাহবা দেবে। তখন তোমরাই সবাই ওর গুণগান করবে। তোমাদের সমাজের এই-ই নিয়ম।

সেদিন একটু ফাঁক পেয়েই শাশ্বতদের বাড়িতে গেলাম।

আমার ডাক শুনেই শাশ্বত বাইরে বেরিয়ে এল। বললে, কী রে, এত সকালে? কী হয়েছে?"

আমি আমার একটা শার্ট সঙ্গে করে লুকিয়ে এনেছিলাম। বললাম, ''তোকে এই শার্টটা দিতে এলাম।''

"কেন?" শাশ্বত অবাক হয়ে গেল।

আমি বললাম, ''তোর জন্যে আমার বাবার কাছ থেকে কাল খুব বকুনি খেতে হয়েছে। তুই ময়লা শার্ট পরে থাকিস বলে আমার মা-বাবা দু'জনেই যাচ্ছেতাই করে আমাকে খুব কথা শুনিয়েছে।''

শাশ্বত আমার কথা শুনে শব্দ করে হেসে উঠল। তার সে হাসি আর থামতেই চায় না। আমাদের কথার আওয়াজ শুনে মাসিমাও বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, "কী হয়েছে রে খোকা? তোর এত হাসি কিসের?"

শাশ্বত বললে, "এই দেখ না মা, বিনু আমাকে ওর একটা শার্ট দিতে এসেছে।''

মাসিমা অবাক হয়ে গেলেন ছেলের কথা শুনে। বললেন, শার্ট? কিসের শার্ট? পুরনো না নতুন?"

শাশ্বত বললে, ''পুরনো। ওর নিজের পরা শার্ট। আমি ময়লা শার্ট পরার জন্যে ওকে নাকি ওর বাবা-মায়ের কাছে খুব বকুনি খেতে হয়েছে।''

''কেন, তুই ময়লা শার্ট পরিস, তার জন্যে ওর বাবা-মা ওকে বকতে গেলেন কেন?''

এতক্ষণ আমি কিছুই বলিনি।

এবার বললাম, ''মাসিমা, শাশ্বত ময়লা জামা পরে থাকে বলে আমার বড় লজ্জা করে। আমার মা আমাকে ময়লা জামা মোটে পরতে দেয় না। এদিকে আমি ফর্সা জামা পরব আর ও আমার বন্ধু হয়ে ময়লা জামা পরে থাকবে এ আমার মোটে ভাল লাগে না।''

শাশ্বত মায়ের দিকে চেয়ে বললে, "জানো মা, বিনুটা একেবারে আস্ত পাগল।''

বলে আবার আগেকার মত হো-হো করে হাসতে লাগল।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, "হ্যা রে, তুই ভেবেছিস ফর্সা জামা-কাপড় পরলেই মানুষ ভদ্রলোক হয়ে যায়? ফর্সা জামা-কাপড় দিয়ে সংসারে মানুষের বিচার হয়? তা যদি হত তাহলে তো চোর-ডাকাত-জুয়োচোর সবাই ভদ্রলোক রে। ও জামা আমি নেব না। তুই যেমন নিয়ে এসেছিস তেমনি ফিরিয়ে নিয়ে যা। তোর বাবা-মা'কে বলিস আমি ইচ্ছে করলে তোদের মতো ফর্সা জামা-কাপড় পরতে পারি। সে ক্ষমতা আমার আছে। কিন্তু কেন পরব? যেদিন আমাদের দেশে গরিব মানুষ বলে কেউ থাকবে না, যেদিন সবাই ফর্সা জামা-কাপড় পরতে পাবে, সেদিন আমিও ফর্সা জামা-কাপড় পরব। যা তুই এখন—''

বলে শাশ্বত বাড়ির ভেতরে চলে যাচ্ছিল।

কিন্তু মাসিমা বললেন, ''ওরে খোকা, তুই ওর ওপর রাগ করছিস কেন? আহা ও তোকে ভালবাসে। ভালবেসে তোকে শার্ট দিতে এসেছে আর তুই এইরকম করে ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছিস? ওর মনে কত কষ্ট হচ্ছে বল তো?''

বলে আমার দিকে চেয়ে মাসিমা বললেন, ''দাও বাবা দাও, শার্টটা দাও, তুমি কিছু মনে কোরো না। ও ওমনি বড় একগুঁয়ে।''

আমি মাসিমার হাতে আমার দামি শার্টটা তুলে দিয়ে যেন একটু স্বস্তি পেলাম। মনে হল এ শার্টটা পরলে কেউ আর ওকে আগের মতো তাচ্ছিল্য করবে না, গরিব বলে ঘেন্নাও করবে না।

শার্টটা মাসিমার হাতে দিয়ে বললাম, ''শাশ্বতকে বলবেন ও যেন এটা পরে, ছুঁড়ে ফেলে না দেয়।''

মাসিমা বললেন, ''না না, ওর কথায় কিছু মনে কোরো না বাবা তুমি, ও শার্ট পরবে। আমার ওপর তুমি ছেড়ে দাও, আমি ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক ওকে পরিয়ে ছাড়ব—''

শার্টটা নিয়ে মাসিমা ভেতরের দিকে একবার উঁকি-ঝুঁকি মারলেন।

আমি আমার বাড়ির দিকে চলে আসছিলাম। বস্তিটা পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ব এমন সময়ে পেছন থেকে মাসিমার গলার আওয়াজ পেলাম, ''ও বাবা, শোনো—''

আমি পেছন ফিরে দেখে অবাক। দেখি মাসিমা তাড়াতাড়ি আমার দিকেই আসছেন। আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লাম।

বললাম, ''আমাকে ডাকছিলেন মাসিমা?''

মাসিমা একেবারে আমার মুখের সামনে এসে দাঁড়ালেন। গলাটা নামিয়ে বললেন, ''শার্ট তো দিলে, কিন্তু আর একটা কথা বলব তোমাকে বাবা?''

আমি বললাম, ''কী বলবেন বলুন না আপনি।''

আমি তখনও বুঝতে পারিনি মাসিমা আমাকে কী বলতে চান।

মাসিমা বোধহয় একটু দ্বিধা করছিলেন।

আমি আবার বললাম, ''বলুন না মাসিমা, বলুন? কী বলছিলেন বলুন না—''

মাসিমা বললেন, ''বলো আগে, তুমি আমার কথা রাখবে?''

আমি বললাম ''নিশ্চয়ই রাখব, বলুন আপনি—''

মাসিমা তেমনি গলা নিচু করেই বললেন, ''খোকাকে যেন তুমি কিছু বোলো না বাবা। ও জানতে পারলে আবার ভীষণ রাগ করবে। জানো তো ও কীরকম একরোখা একগুঁয়ে ছেলে।''

আমি বললাম, ''না আমি শাশ্বতকে বলব না, আপনি কী বলবেন বলুন না।''

মাসিমা বললেন, ''শার্ট তো ওকে দিলে বাবা, তোমার একটা প্যান্ট দিতে পারো? ওর সব প্যান্ট ছিঁড়ে গেছে। তা কেনবার পয়সাও নেই আমার হাতে। যদি দু'টো প্যান্ট দিতে পারো তো আরও ভাল হয়।''

আমি বললাম, ''ঠিক আছে মাসিমা, আমি দেব আপনি কিছু ভাববেন না, ওর আর আমার মাপ তো একই, আমি প্যান্ট নিয়ে এসে আপনাকে দিয়ে যাব।''

মাসিমা বললেন, ''কিন্তু দেখো বাবা, ও যেন টের না পায়। টের পেলে কিন্তু খেপে যাবে, কিছুতেই পরতে চাইবে না। ও বড় একরোখা একগুঁয়ে ছেলে, তা তো তুমি জানো। ও যখন থাকবে না তখন তুমি এসে আমার হাতে চুপি-চুপি দিয়ে যেও—''

বললাম, ''ঠিক আছে মাসিমা, আপনি কিছু ভাববেন না। যা করবার আমি তা করব।''

"কিন্তু তোমার বাবা-মা?"

বললাম, ''আমার বাবা-মাও কিছু জানতে পারবে না।''

বলে চলে আসছিলাম, হঠাৎ পেছন থেকে মাসিমা আবার ডাকলেন।

''শোনো বাবা, আর একটা কথা শোনো।''

আমি পেছন ফিরে দাঁড়ালাম।

মাসিমা বললেন, ''সেদিন বাড়িভাড়ার জন্যে যে দশটা টাকা দিয়েছিলে, সেটা কিন্তু এখন শোধ দিতে পারব না বাবা। আমার হাত একেবারে খালি। আসছে মাসে মাইনেটা পেলেই তোমাকে দিয়ে দেব।''

''মাইনে?''

মাইনের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। মাসিমা কি তবে চাকরি করেন নাকি কোথাও?

মাসিমা বললেন, ''আমি আমাদের পাশের বাড়িতে চাকরি করি কিনা।''

আমি আকাশ থেকে পড়েছি তখন একেবারে। এতদিন তো একথা জানতাম না।

জিজ্ঞেস করলাম, ''আপনি চাকরি করেন?''

মাসিমা বললেন, ''চাকরি না করলে চলবে কী করে বাবা?''

বললাম, ''আমি তো জানতাম না। শাশ্বত তো আমাকে সে-কথা কখনও বলেনি—''

মাসিমা বললেন, ''খোকা তো জানে না সে-কথা।''

''শাশ্বত জানে না?''

''জানলে তো তুমিও জানতে পারতে। বাইরের কেউই তেমন জানে না। খোকা জানতে পারলে খুব রাগ করবে বলে ওকেও কিছু বলিনি। আর সে কেবল নামে মাত্র চাকরি। ঠিক চাকরি বলতে যা বোঝায় তা নয়। ওই আমাদের বাড়ির কাছেই এককালের জমিদার নাজিরদের বাড়ি, তাদের সকলেরই অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, শুধু একজন শরিকেরই অবস্থাটা একটু ভাল। তারা নিজেরা কল-কারখানা করে মাথা খাড়া করে একটু দাঁড়িয়েছে। তাদের বাড়িতেই আমি একটা চাকরি পেয়েছি—''

মাসিমার কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, ''আপনি কি সেখানে ঝিয়ের কাজ করেন নাকি?''

''না বাবা, অত খারাপ চাকরি নয়। তাদের বাড়ির এক বউ আমাকে খুব যত্ন-আত্তি করে। আমার অবস্থা দেখে ওই কাজ দিয়েছে।''

''কী কাজ করতে হয় আপনাকে?''

মাসিমা বললেন, ''বউয়ের চুল বেঁধে দিই, পায়ে আলতা মাখিয়ে দিই, আর সাবান দিয়ে গা ঘষে চান করিয়ে দিই। এসব কাজ বউ নিজেই পারে, কিন্তু আমাকে সাহায্য করার নাম করে একটা কাজও দিয়েছে। তার বদলে মাসে তিরিশটা টাকা দেয় আমার হাতে। আমিও তা হাত পেতে নিই। তার থেকে দশ টাকা চলে যায় বাড়ির ভাড়া মেটাতে, আর হাতে থাকে কুড়িটা টাকা। তা তুমি বুঝবে না, আজকাল কুড়ি টাকাতে কিছুই হয় না।''

''কিন্তু শাশ্বতর মামা কিছু সাহায্য করে না?''

''আমার ভাইয়ের অবস্থা খারাপ নয়, ভালই। কিন্তু তাদের সাহায্য নেবই বা কেন? কারও কাছে হাত পাততে যে কী লজ্জা তা আমার চেয়ে ভাল করে আর কেউ জানে না বাবা।''

তারপর একটু থেমে পেছন ফিরে দেখে নিয়ে বললেন ''তুমি যেন এসব কথা খোকাকে কিছু বোলো না বাবা। ও কিছুই জানে না। তোমাকেও বলতুম না। তুমি যে বাড়িওয়ালাকে দশটা টাকা দিয়েছ তা আমি এখন দিতে পারছি না বাবা, দিতে একটু দেরি হবে। বড্ড টানাটানি চলছে এখন।''

কথাটা শেষ হবার আগেই শাশ্বত হঠাৎ দরজার বাইরে এসে আমাদের দেখতে পেয়েছে। চেঁচিয়ে বললে, ''মা, বিনুর সঙ্গে কী কথা বলছ?''

সঙ্গে সঙ্গে মাসিমা ভয় পেয়ে বললেন, ''না কিছু বলছি না—''

বলে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেলেন, কিন্তু শাশ্বতর তবু সন্দেহ গেল না। সে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, ''মা কী বলছিল রে তোকে?''

বললাম, ''না কিছু না, এমনি।''

''কিছু না মানে? নিশ্চয় কিছু বলছিল। নইলে শুধু শুধু কেউ বাড়ির বাইরে এসে আড়ালে তোর সঙ্গে কথা বলে?''

বললাম, ''এমনি কোনও বিশেষ কথা নয়। তোর মামার কথা হচ্ছিল।''

''তা আমার মামার কথা তোর সঙ্গে হচ্ছিল কেন?''

আমি বললাম, ''এই তোর মামা কীরকম বড়লোক, কত বড় চাকরি করে, সেইসব কথা বলছিলেন তোর মা।''

শাশ্বত বললে, ''তা আমার মামা কত বড় চাকরি করে সে-কথা তোর কাছে বলে মায়ের লাভ কী।''

আমার মনে হল শাশ্বত বোধহয় আমার মিথ্যে কথাটা ধরে ফেলেছে। কিন্তু মাসিমার কাছে আমি কথা দিয়েছি তাঁর কথা-গুলো কিছুই বলব না।

তাই বললাম, ''বিশ্বাস কর তুই, আর কিছু কথা হয়নি।''

শাশ্বত বোধহয় সৌভাগ্যক্রমে আমার কথাটা বিশ্বাস করলে।

বললে, ''দেখ, একটা কথা তোকে বলে রাখি। মা যদি কক্ষনো তোর কাছে টাকা চায়, তুই যেন ভুলেও মাকে টাকা দিস না, বুঝলি?''

আমি বললাম, ''তোর মা আমার কাছে টাকা চাইতে যাবেন কেন?''

শাশ্বত বললে, ''না, তোকে বলে রাখলুম কথাটা। মায়ের ওই রকম স্বভাব আছে টাকা চাওয়ার, অথচ আমার মামা আমার জন্যে মাসে চারশো করে টাকা দেয়, তা জানিস? মা সব টাকা লুকিয়ে রাখে আর লোকের কাছে বলে বেড়াবে টাকা নেই। খবরদার বলছি, মাকে টাকা দেবার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে তবে দিবি, বুঝলি?''

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম, ''বুঝেছি—''

বলে শাশ্বতর হাত থেকে যেন পালিয়ে বাঁচলাম।

*

সেই শাশ্বত আজ এতদিন পরে, এত যুগ পরে, এত বছর পরে আমার কাছে এসেছে। এ যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। অবস্থার চাপে পড়ে সব মানুষই বদলায়, কিন্তু শাশ্বত কি অন্য সব মানুষের মতো? নিজের দারিদ্র্য, নিজের হীনতা সে চিরকালই তো আমার কাছে গোপন করে এসেছে। হাজার বিপদে পড়েও আমার কাছে কি বাইরের কোনও লোকের কাছে মাথা নিচু করেনি। সেই শাশ্বতর চেহারা এ কী হয়েছে।

শাশ্বত যেন কী বলি-বলি করেও বলতে পারছিল না।

কিন্তু তার আগেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, ''তুই চা খাবি?''

শাশ্বত সহজেই মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানাল।

অথচ এককালে কত অহঙ্কার ছিল এই শাশ্বতর। মনে আছে একদিন তাকে নিয়ে ভবানীপুরের দিকে গিয়েছিলাম।

একটা রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, ''কিছু খাবি?''

শাশ্বত বললে, ''তুই নিজে খাবি তো খা। আমার খিদে পায়নি, আমি খাব না।''

শাশ্বতর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম সে যেন একটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি দিয়ে রেস্টুরেন্টের দিকে চেয়ে দেখছে। যেন

এরকম তৃতীয় শ্রেণীর রেস্টুরেণ্টের ভেতরে ঢুকতে তার ঘেন্না হচ্ছে।

অথচ দুদিন আগেই শাশ্বতদের বাড়িতে গিয়ে দেখি শাশ্বতর মা জ্বরে অঘোর অচৈতন্য হয়ে শুয়ে পড়ে আছেন। বাড়িতে শাশ্বত নেই।

আমি গিয়ে ডাকলাম, ''মাসিমা।''

আমার ডাকে মাসিমা চোখ তুলে চাইলেন। দেখলাম মাসিমার চোখ দুটো লাল জবা ফুলের মতো।

মাসিমা বললেন, "কে বাবা, বিন্দু?"

"হ্যাঁ, মাসিমা, আমি বিন্দু। আপনার কী হয়েছে? জ্বর? জ্বর হয়েছে?''

মাসিমা কোনও রকমে বলতে পারলেন, ''হ্যাঁ বাবা, আমি দুদিন ধরে আর উঠতে পারছি না। সারা শরীরে বাতের মতো ব্যথা।''

মাসিমার কপালে হাত দিতেই হাতটা যেন পুড়ে গেল।

বললাম, ''আপনার কপাল তো পুড়ে যাচ্ছে।''

মাসিমা বললেন, "আমার আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না বাবা। মরে গেলেই বাঁচি।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ''শাশ্বত কোথায়?''

মাসিমা সেই রকম কাঁপতে-কাঁপতেই বললেন, "কে জানে কোন্ চুলোয় গেছে। তার জন্যে ভেবে-ভেবেই তো আমার এত জ্বালা। সে মরলে আমি বাঁচি, আমি মরলেও সে বাঁচে।''

আমি বললাম, ''আপনি একটু কষ্ট করে শুয়ে থাকুন, আমি এখুনি ডাক্তার ডেকে আনছি। আজ সকালেও তো শাশ্বতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কত গল্প করেছি অনেকক্ষণ ধরে, আমাকে তো আপনার অসুখের কথা কিচ্ছু বলেনি, আশ্চর্য!''

মাসিমা বললেন, ''ও ওই রকম। ওর বুক ফাটলেও মুখ ফুটবে না। আমিও উঠে ভাত রাঁধতে পারছি না, বাজার করতে পারছি না, নাজিরদের বাড়ি কাজেও যেতে পারছি না, ও-ও তাই। ও-ও দু'দিন ধরে ভাত খেতে পাচ্ছে না, তা জানো?"

''তা ও যে বলছিল ওর মামা আপনাকে মাসে চারশো করে টাকা দেয়।''

''সব বাজে কথা। ওর কথা তুমি বিশ্বাস করো? মাসে চারশো টাকা দেবার ক্ষমতা আছে আমার ভায়ের? সে-ই বলে মাসে কেরানিগিরি করে আড়াইশো টাকা মাইনে পায়। তারই বলে নিজের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। সে দেবে আমাকে টাকা। একটা টাকা দেবার ক্ষমতা নেই তার, আর সে দেবে চারশো টাকা!''

আর বেশি কথা বাড়ালাম না। তাড়াতাড়ি একজন পাড়ার ডাক্তার এনে মাসিমাকে দেখালাম। তারপর ওষুধ কিনে এনে মাসিমাকে খাওয়ালাম। তারপর অনেকক্ষণ পাশে বসে মাসিমার মাথা টিপে দিতে লাগলাম।

মাসিমা বললেন, ''তুমি যা করলে আমার নিজের ছেলেও তা জীবনে কখনও করেনি। কী আর বলব তোমাকে। তোমার উপকারের কথা আমি জীবনে ভুলব না বাবা। তুমি যে বাড়ি-ভাড়ার দশটা টাকা সেবার দিয়েছিলে সে আমি শোধ করবই। আর এই যে ডাক্তার-খরচ ওষুধ-খরচ এটাতেও তোমার কত খরচ হল আমাকে বোলো, এও শোধ করে দেব আমি বাবা। আমি তোমার ধার রাখব না। আগে আমাকে বাবা তুমি একটু উঠে দাঁড়াতে দাও—''

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ''আপনি এসব কথা বলবেন না। আগে আপনি ভাল হয়ে উঠুন।''

মাসিমা বললেন, ''তুমি আর কতক্ষণ এখানে বসে থাকবে বাবা, তুমি এবার তোমাদের বাড়ি যাও, তোমার বাবা-মা আবার ভাববে।''

আমি বললাম, ''আমি কাল আবার আসব'খন, এখন আসি মাসিমা। দরকার হলে আবার ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আসব।"

বলে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম। বেলা হয়ে গিয়েছিল খুব। রবিবার। দেখি উলটোদিকের রাস্তা দিয়ে শাশ্বত আসছে। চেহারাটা শুকনো-শুকনো। দেখেই বোঝা যায় দু'তিন দিন ভাত খায়নি।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ''কী রে,কোথায় গিয়েছিলি?''

শাশ্বত বললে, ''নাটোরের মহারাজার বাড়ি থেকে আসছি—''

''সেখানে কী করতে?''

শাশ্বত বললে, "একটা মীটিং ছিল।"

''কীসের মীটিং?''

শাশ্বত বললে, "আর বলিসনি। সব্বাই আমাকে চাইবে। আমি একলা মানুষ, কত লোকের কথা ভাবব? দেখ না, নাটোরের মহারাজা ডেকে পাঠিয়ে বললে বিলেত যাচ্ছে, তাই একলা যেতে ভাল লাগছে না, তাই আমাকে বললে, তুই আমার সঙ্গে চল।"

''বিলেত যেতে বলছে তোকে?''

''হ্যাঁ রে, কী ঝামেলা আমার বল দিকিনি। আমার নিজের মামা কতবার বিলেত যাবার জন্যে বলছে তাই-ই বলে আমি যেতে পারছি না, আমি ওই বুড়োর ফাই-ফরমাশ খাটতে বিলেত যাব?''

আমি মনে-মনে শাশ্বতর কথা শুনে হাসলাম। কিন্তু বাইরে তাকে কিছু বুঝতে দিলাম না। বললাম, ''নাটোরের মহারাজার সঙ্গে তোর আলাপ হল কবে? কী করে?''

শাশ্বত বললে, ''আরে নাটোরের মহারাজা তো আবার বাবার ফ্রেণ্ড। দুজনে খুব ভাব ছিল এককালে। সেই ছোটবেলা থেকেই আমার সঙ্গে আলাপ। আমাকে খুব ভালবাসে মহারাজা! আমি তখন সব খেতে বসেছি, এমন সময় মহারাজার ম্যানেজার এসে আমাকে ডাকলে। বললে মহারাজা সাহেব আপনাকে ডেকেছে।''

''তারপর?"

"তারপর এই সেখান থেকেই তো আসছি।''

''তুই মহারাজাকে কী বললি?''

''আমি স্পষ্ট বলে এলুম, আমার এখন বিলেত যাবার সময় নেই।''

আমি অবাক হয়ে গেলাম শাশ্বতর কথা শুনে।

নাটোরের মহারাজার সঙ্গে বিলেত যাবার এরকম সুযোগ পেয়েও শাবত তা ছেড়ে দিলে!

বললাম, "কেন তুই রাজি হলি না ভাই! কত দূরে-দূরে দেশে ঘুরে বেড়াতে পারতিস। অথচ একটা পয়সাও পকেট থেকে খরচ করতে হত না।''

শাশ্বত বললে, ''দূর, নিজের দেশটাই ভাল করে ঘুরে দেখতে পারলুম না, আর আমি যাব সাহেবদের দেশ দেখতে? জানিস, আমাদের দেশে কত গরিব লোক আছে। তারা আধবেলা পেটপুরে খেতেই পায় না, তাদের এত কষ্ট। সেই গরিবদের দুঃখ-কষ্টের কথা ভেবে-ভেবেই রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না। তাই তো আমি রাত্তিরে লুকিয়ে-লুকিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি।''

''কেন, রাত্তিরে রাস্তায় বেরিয়ে কী হয়?''

শাশ্বত বললে, "রাত্তিরেই তো মানুষের আসল রূপটা দেখা যায় রে। দিনের বেলা তো সবাই কোথায়-কোথায় ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু রাত্তিরে সবাই রাস্তায় ফুটপাথের ওপর যে-রকম ভাবে শুয়ে থাকে তা দেখলে তোর চোখ ফেটে জল বেরোবে। সে-দৃশ্য চোখ মেলে দেখা যায় না।"

আমি নিজে কখনও রাত জেগে রাস্তায় বেড়াতে বেরোইনি। আমার বাড়িতে রাত ন'টার পর বাইরে থাকলে বকুনি খেতে হয়। মায়ের নিয়ম ছিল বাড়ির সবাইকে রাত ন'টার ভেতরে সব কাজ
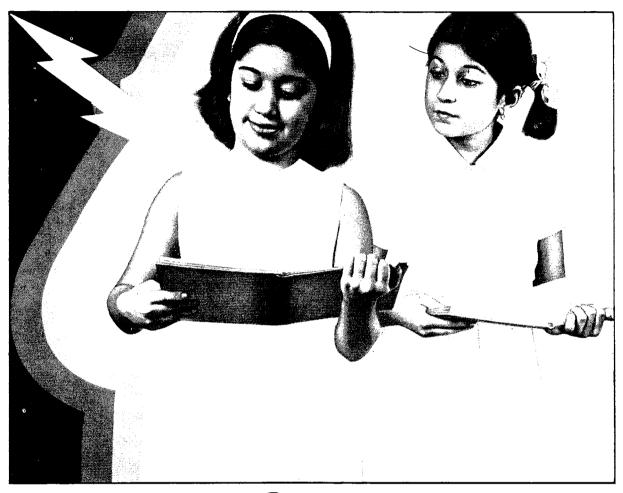
বাড়িতে আসতেই হবে। আর ভোর ছ'টার মধ্যে সকলকে ছেড়ে ঘুম থেকে উঠতে হবে। এই নিয়ম যে মানবে না সেদিন খেতে পাবে না। এই-ই ছিল শাস্তি। আমার দাদারাও নিয়ম বরাবর মেনে এসেছেন, বাবাও সেই নিয়ম মানতেন।

আমার এ নিয়ম ভাল লাগত না। মনে হত আমি যেন বন্দী আছি বাড়িতে। তাই হিংসে হত শাশ্বতকে। ভাবতুম স্বাধীন। মায়ের কথা শোনবার দায়-দায়িত্ব নেই ওর।

শাশ্বত আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলে, রে, কী ভাবছিস?''

বললাম, ''তোর ওপর আমার খুব হিংসে হচ্ছে।''

"কেন?"

''তুই কেমন স্বাধীন। তোর যা ইচ্ছে তাই করতে পারিস। বাড়িতে মা নিয়ম করে দিয়েছে, রাত ন'টার পর আর কেউ বাইরে থাকতে পারবে না। সবাইকে খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে হবে।''

শাশ্বত বললে, ''মায়ের কথা শুনলে তো আমার চলবে না আমাকে পরে অনেক বড়-বড় কাজ করতে হবে, এখন থেকে তার ট্রেনিং নিচ্ছি। এই তো আমার বাড়িতে মায়ের জ্বর হয়েছে। মা রাঁধতেও পারছে না, তা বলে কি আমি দিন-রাত পাশে বসে মায়ের সেবা করছি।''

''তাহলে রান্না করছে কে তোদের?''

শাশ্বত বললে, ''কেউ না।''

"তাহলে তুই কী খাচ্ছিস?''

''আরে আমার খাওয়ার ভাবনা? আমি যেখানে যাব সেখানেই তারা আমাকে খাতির করে খাওয়াবে।''

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, ''কেন?"

শাশ্বত বললে, "আরে সবাই তো ভেতরে ভেতরে জানে আমার মামা পুলিস কমিশনার। আমি যদি মামাকে একটু বলে অমনি মামা সকলকে অ্যারেস্ট করে হাজতে পুরে ফেলবে। এই তো আজ নাটোরের মহারাজা আমাকে কত কী খাওয়ালে। চপ, কাটলেট, পোলাউ, মাছের কালিয়া। এত খেয়েছি যে নড়তে পারছি না। আর খাইয়ে-দাইয়ে যেই বলেছে মহারাজার সঙ্গে বিলেত যেতে আর আমি বুঝতে পেরেছি এত খাওয়ানোর মানেটা কী! বুঝলাম, নিজের স্বার্থেই আমাকে খাইয়েছে।''

আমি বুঝতে পারলুম, শাশ্বতর সমস্ত কথা মিথ্যে। আমারই সঙ্গে মিথ্যে কথা বলত বলে আমার বড় কষ্ট হত শাশ্বতর জন্যে। কিন্তু আমি ওকে এত ভালবাসতুম যে, ওর মুখের সামনে কিছু বলতে পারতুম না। অন্য সকলকে ছেড়ে ওর সঙ্গেই তাই মিশতুম।

রাস্তায় যেতে-যেতে একটা রেস্টুরেন্টের সামনে আসতেই বললুম, ''চল, দোকানে কিছু খেয়ে নিই। খাবি?''

আমি জানতুম শাশ্বতর মা তিন দিন জ্বরে পড়ে আছেন, রান্না করতে পারেননি, তাই শাশ্বতরও খাওয়া হয়নি, উপোস করে আছে। অথচ লজ্জায় ছোট হবার ভয়ে সে-কথা মুখেও বলতে পারছে না।

শাশ্বত দোকানের সাইনবোর্ডটা একবার দেখে নিলে।

বললে, "আমার খিদে নেই, আমি খাব না। তোর যদি খিদে পেয়ে থাকে তো তুই খা গিয়ে। আমি পাশে বসে থাকব।''

তারপর বললে, ''দ্যাখ, তোরা এইসব বাজে রেস্টুরেন্টে খাস, এখানে যদি আমার মামা এই অবস্থায় আমাকে দেখে ফেলেন তো কী ভাববেন বল দিকিনি।"

''কী আর ভাববে?"

শাশ্বত বললে, ''আমার মামা এসব মোটে দেখতে পারেন না। আমাকে প্রায়ই মামা বলেন, যদি খেতে হয় তো চৌরঙ্গির বড়-বড় সাহেবি হোটেলে খাবি। এখানকার খাবার সব ভেজাল জিনিস দিয়ে তৈরি। ভেজাল ঘি, ভেজাল তেল, ভেজাল মাংস, ভেজাল পচা মাছ। আর চৌরঙ্গির সাহেবি হোটেলে সব খাঁটি জিনিস। আর তা ছাড়া আমি তো ভাগ্নে হই, আমার লজ্জা আমার অপমান মামারও অপমান কিনা।''

রেস্টুরেন্টে ঢুকে আমি অনেক কিছু খাবারের অর্ডার দিলুম। কাটলেট, চপ, ফিশ-ফ্রাই, টোস্ট, অমলেট, অনেক কিছু।

শাশ্বতর দিকে চেয়ে দেখলুম, তার চোখ দুটো চকচক করছে। বুঝলাম, তিন দিন উপোস করে তার পেট তখন খিদের জ্বালায় চোঁ-চোঁ করছে। তবু লজ্জায় মুখে কিছু বলতে পারছে না সে।

আমি এক-মনে এক-এক করে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খেতে লাগলাম।

খানিক পরে তাকে বললাম, ''কী রে, খাবি? একটু চেখে দেখ না তুই কীরকম রেঁধেছে এরা।''

শাশ্বত বললে, ''ভাই, এইসব জায়গায় আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। ঘেন্না করে এসব ছোট হোটেলে খেতে। আর তাছাড়া নাটোরের মহারাজা তো আমাকে পেট ভরে এসব খাইয়ে দিয়েছে এক্ষুনি।''

আমি বললাম, "তবু একটু চেখেই দেখ না।"

এতক্ষণে শাশ্বত বোধহয় আর লোভ সামলাতে পারলে না। বললে, ''আচ্ছা, তুই যখন বলছিস তখন একটুখানি কেটে দে, চেখে দেখি, খুব সামান্য দিবি, বেশি যেন না হয়।''

আর-একটা প্লেট আনতে বলে দিলাম বয়কে। প্লেট আসতেই আমি আধখানা ফিশফ্রাই তুলে দিলাম তার প্লেটে।

''এ কী করলি? এ কী করলি? অতখানি দিলি কেন?'' বলে শাশ্বত চেঁচিয়ে উঠল।

আমি বললাম, ''দ্যাখ না খেয়ে। না খেতে ভাল লাগে তো ফেলে দিস।''

শাশ্বত একবার খাবার আগে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখতে লাগল ভাল করে।

বললাম, ''রাস্তার দিকে চেয়ে কী দেখছিস?''

শাশ্বত বললে, ''দেখছি কেউ আমাকে দেখে ফেলছে কি না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ''কে আর দেখবে তোকে?''

শাশ্বত বললে, "কিছু বলা তো যায় না, হয়তো মামা থাকতে পারেন বাইরে।''

আমি বললাম, ''দূর, তোর মামা হলেন পুলিস-কমিশনার, তিনি কখনও এখানে থাকতে পারেন? তাঁর আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, এদিকে চেয়ে দেখতে তাঁর বয়ে গেছে।"

শাশ্বত বললে, "তুই জানিস না, আমার মামাকে জানলে তুই আর এ-কথা বলতিস না। মামা ছদ্মবেশে সব জায়গায় ঘুরে বেড়ান। কে কোথায় কী করছে, কে ঘুষ নিচ্ছে, কে চুরি করছে, সমস্ত মামার নখ-দর্পণে।'' বলে, পাছে কেউ দেখতে পায় সেই ভয়ে, শাশ্বত কাঁটা-চামচ দিয়ে সেই আধখানা ফ্রাইটা একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়েছে। মুখে পুরে একেবারে গিলে ফেলেছে।

বললাম, "কী রে, কেমন লাগল খেতে?"

শাশ্বত তখন সবটা খেয়ে ফেলেছে। বললে, "বিশ্রী একেবারে বিশ্রী। তুই এত বিশ্রী ফিশ-ফ্রাই খাচ্ছিস কী করে বুঝতে পারছি না। তুই যদি চৌরঙ্গির সাহেবি হোটেলের ফিশ-ফ্রাই খেতিস তো তা জীবনে ভুলতে পারতিস না। এ একেবারে ভেজাল জিনিস। আসলে এটা ভেটকি-মাছের ফিশ-ফ্রাই নয়, তেলাপিয়া মাছের ফিশ-ফ্রাই। এ সম্বন্ধে তোর সঙ্গে বাজি লড়তে পারি। বাজি লড়বি?''

আমি বললাম, "কিন্তু এদের কাটলেটটা ভাই সত্যিই ভাল, আসল চিকেন কাটলেট—"

শাশ্বত বললে, "না বাবা, আমি আর খাব না। আমার গা-বমি-বমি করছে।"

"তুই একটুখানি শুধু চেখে দেখ, আমার কথাটা রাখ তুই একবার।"

শাশ্বত বললে, "না ভাই, না, আমি জেনে-শুনে বিষ খাব না ভাই—"

আমি তার আপত্তি না শুনে তার প্লেটে পুরো একটা চিকেন কাটলেট তুলে দিলাম।

শাশ্বত রাগে ফেটে পড়ল, "কেন এটা দিলি তুই? জানিস এ-সব দোকানে আমি জীবনে খাই না।"

আমি বললাম, "এটা খাঁটি জিনিস, এটাতে ভেজাল নেই, তুই একবার খেয়ে দেখ—"

শাশ্বত নিছক অনুরোধে পড়ে কাটলেটটা গপ্‌-গপ্‌ করে খেয়ে ফেলে রাস্তার দিকে আবার চেয়ে দেখলে: ছদ্মবেশী মামা কোথাও লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখছেন কি না। বাইরের লোক চিনতে পারুক আর না-পারুক, শাশ্বত তার নিজের মামাকে চিনতে পারবেই।

"বললাম, কীরকম খেলি? ভাল?"

"আরে দূর! এর নাম কাটলেট? এ তো কচ্ছপের মাংসের কাটলেট। আমি চিকেন কাটলেট জীবনে কখনও খাইনি ভেবেছিস? এর আগাগোড়া ভেজাল। আজকে বাড়িতে গিয়েই আবার একটা ওষুধ খেয়ে ফেলতে হবে।"

কিন্তু আশ্চর্য, 'খাব না' 'খাব না' করে শাশ্বত দুটো কাটলেট, দুটো বড়-বড় ফিশ-ফ্রাই, তিনটে চপ খেয়ে ফেললে। আমি যা খেলুম শাশ্বত তার প্রায় ডবল খেলে।

তারপর আমরা উঠলুম। আমি মানি-ব্যাগ বার করে খাবারের দাম দিয়ে দিলুম।

শাশ্বত জিজ্ঞেস করলে, "কত দিলি?"

আমি বললাম "তেরো টাকা চার আনা।"

শাশ্বত বললে "ভেজাল বলেই এত সস্তা হল। এই জিনিসই চৌরঙ্গির সাহেবি হোটেল হলে পঞ্চাশ টাকার বিল হত। তোর তেরো টাকা চার আনার বিষ খাওয়ার চেয়ে সে অনেক ভাল। তোকে বলে রাখছি আর কক্ষনো এমন করে বিষ খেয়ে টাকা নষ্ট করিসনি।"

শাশ্বতর কথা শুনে আমি হাসলুমও না, কাঁদলুমও না। আমি শুধু এই ভেবে মনে তৃপ্তি পেলুম, আমি অভুক্ত, অহঙ্কারী, অভিমানী মানুষটাকে পেট ভরে খাওয়াতে পেরেছি। যে মুখ ফুটে কখনও নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করবে না, বরং মিথ্যে আত্মগর্বে নিজেকে প্রবঞ্চনা করে যাবে তাকে কৃপা করা, করুণা করাও তো এক ধরনের আনন্দ। সেই আনন্দই হত আমার শাশ্বতর সঙ্গে মিশে।

সেদিন স্কুলে গিয়ে দেখি শাশ্বত স্কুলে আসেনি। রোল-কলের সময় তার নামও ডাকা হল না। মাস্টারমশাইকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "স্যার, শাশ্বতর নাম ডাকলেন না?"

স্যার ভাল করে রোল-কলের খাতাটা আবার দেখলেন। বললেন, "শাশ্বতর নাম কাটা গেছে।"

আবার জিজ্ঞেস করলাম, "নাম কাটা গেল কেন স্যার?"

মাস্টারমশাই বললেন, "এ খাতায় তো কিছু লেখা নেই, বোধহয় মাইনে দেয়নি—"

আমি তো অবাক হয়ে গেলাম কথাটা শুনে। ক্লাসের শেষে স্কুলের অফিসে গিয়ে খোঁজ নিলাম। সেখানে গিয়ে জানলাম শাশ্বতর ছ' মাসের মাইনে বাকি!

ছ' মাস মাইনে দেয়নি শাশ্বত। চার টাকা করে মাস-মাইনে, তাও দেয়নি সে। বোধহয় আগেই শাশ্বত জানতে পেরেছিল যে তার নাম কাটা গেছে তাই আর সেদিন স্কুলে আসেনি। স্কুল থেকে ফেরার পথে আর বাড়ি গেলাম না। সোজা শাশ্বতদের বস্তি-বাড়িতে চলে গেলাম। তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখি সদর দরজায় তালা-চাবি বন্ধ। বুঝলাম, শাশ্বতর মা নিশ্চয় নাজিরদের বাড়ি সেই চাকরিটা করতে গেছেন।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। কিন্তু মাসিমা কি শাশ্বত, কারোরই দেখা পেলাম না। আস্তে আস্তে নিজের বাড়ির দিকে চলে এলাম।

মা জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে ইস্কুল থেকে ফিরতে এত দেরি হল যে? সেই বখাটে ছোঁড়াটার বাড়িতে গেছলি বুঝি?"

আমি কোনও জবাব না দিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলাম। বড় কান্না পাচ্ছিল শাশ্বতর কথা ভেবে। কেন সে অমন মিথ্যেবাদী হল? কেন সে আমাকে তার দুঃখের কষ্টের কথা বলে না? তার মা যে পয়সার জন্যে পরের বাড়ি ঝি-গিরি করেন তা বলতে লজ্জা করে কেন? নিজের দারিদ্র্যের কথা অন্যের কাছে না বলুক আমার কাছে বলতে দোষ কী? আমি তো তাকে ভালই বাসি। তার চরিত্রের অত দোষ থাকতেও আমি তো তাকে কোনও দিন কিছু বলিনি। আমি তো তাদের বাড়িওয়ালার বাকি ভাড়া মিটিয়ে দিয়েছি। আমার নিজের জামা-প্যান্ট তার মায়ের হাতে দিয়ে এসেছি যাতে সে ভাল জামা-প্যান্ট পরতে পারে। এ তার কী-রকম স্বভাব! তাহলে সে যে বলেছে তার মামা পুলিস কমিশনার সেটাও কি মিথ্যে?

বিকেল বেলা স্কুল থেকে ফিরে আমার জল-খাবারের ব্যবস্থা থাকে। সেদিন খেতে গিয়ে আমার যেন গলায় সব আটকে গেল। আমি যেন আর কিছুতেই খেতে পারলুম না। ভাবলুম, আমি এত পেট ভরে ভরে খাচ্ছি, আর শাশ্বত আমার বয়েসি হয়েও কিছু খেতে পাচ্ছে না। তবু লজ্জায় সে কারও কাছে মাথা নিচু করবে না। এ তার কী অদ্ভুত উদ্ধত স্বভাব! আমাকে তো সব মন খুলে বলতেও পারত! কেন বলে না আমাকে?

আমি চুপি চুপি বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "কী, আমাকে বলবে কিছু?"

আমি আমতা-আমতা করে বললাম, "আমার কিছু টাকার দরকার হয়েছে, দেবে?"

"টাকা?" বাবা চমকে উঠলেন। বাবার কাছে আগে কখনও এমন করে টাকা চাইনি।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "টাকা কী করবে তুমি?"

বললাম, "দরকার আছে!"

"তা মায়ের কাছে গিয়ে টাকা চাও না।"

বললাম, "না, মা টাকা দেবে না, তুমি টাকা দাও—"

"কত টাকা?"

বললাম, "চব্বিশ টাকা!"

"চব্বিশ টাকা?" বাবা চব্বিশ টাকা শুনে একটু অবাকও হলেন, বিরক্তও হলেন।

বললেন, "চব্বিশ টাকা নিয়ে কী করবে?"

বললাম "আমাদের ইস্কুলের একটা ছেলের ছ' মাসের মাইনে বাকি পড়েছে। তাই তার ক্লাস থেকে নাম কাটা গেছে। চব্বিশটা টাকা না দিলে তার খাতায় নাম উঠবে না।"

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "তার টাকা বাকি পড়েছে কেন?"

বললাম, "তাদের অবস্থা যে খারাপ! তার কী দোষ? অবস্থা খারাপ হলে কেউ মাইনে দিতে পারে?"

বাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন, "ছেলেটা লেখা-পড়ায় কেমন? ভাল করে পাস-টাস করে?"

আমি বললাম, "অবস্থা খারাপ হলে কেউ ভাল করে

...পাস করতে পারে? বাড়িতে আমার তবু মাস্টারমশাই আছেন, তার তো তাও নেই—"

"তাহলে স্কুলের মাইনে দিয়ে কী হবে? ওই চব্বিশটা টাকাই তো জলে যাবে।"

বললাম, "না, জলে যাবে না, আমি বলছি তোমার টাকা জলে যাবে না। আমি তাকে ভাল করে পড়তে বলব। আমি মাস্টারমশাইয়ের কাছে যা শিখব তা তাকে শিখিয়ে দেব!"

আমি বাড়ির আদুরে ছেলে। আমার পীড়াপীড়িতে বাবা আর আপত্তি করতে পারলেন না। আমাকে চব্বিশটা টাকা দিয়ে দিলেন।

টাকাটা হাতে নিয়ে আমি বাবাকে বললাম, "এই টাকার কথা যেন মাকে বলো না বাবা, তুমি।"

বাবা বললেন, "আচ্ছা, বলব না—"

টাকাটা নেবার পরই শাশ্বতদের বাড়ি যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তখন বাড়িতে মাস্টারমশাই এসে গেছেন, তাই আর যাওয়া হল না। আমি মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়তে বসে গেলাম।

পর দিন সকালেও যাওয়া হল না। ক্লাসের পড়া সেরে যেতে আর সময় ছিল না। একেবারে ভাত খেয়ে স্কুলে চলে গেলাম। একটু আগে-আগেই গেলাম। গিয়ে সোজা চলে গেলাম হেড-ক্লার্কের অফিসে।

বললাম, "স্যার, আমি মাইনে দিতে এসেছি—"

হেড-ক্লার্ক মশাই আমাকে অনেক দিন আগে থেকেই চিনতেন।

জিজ্ঞেস করলেন, "মাইনে?"

বলে খাতাটা বার করলেন। বললেন, "কোন্ মাসের মাইনে? তোমার তো মাইনে দেওয়া আছেই—"

বললাম, "আমার না স্যার, শাশ্বতর— ছ' মাসের মাইনে দেওয়া বাকি পড়েছে বলে তার নাম কাটা গেছে। সেই ছ' মাসের মাইনেটা আমি দিতে এসেছি—"

"কেন? শাশ্বতর মাইনে তুমি দিতে এসেছ কেন? সে কোথায়?"

আমি আর কী বলব এর জবাবে। বললাম, "সে কোথায় জানি না।"

বলে রসিদটা নিয়ে আমি ক্লাসে চলে গেলাম। মনে খুব আনন্দ হল। আবার শাশ্বত ক্লাসে আসতে পারবে, আবার তার সঙ্গে আমার রোজ দেখা হবে। আবার দু'জনে একসঙ্গে বেড়াতে পারব।

হেড-ক্লার্ক মশাই বুঝলেন কি বুঝলেন না জানি না। হয়তো মনে-মনে একটা কারণ খুঁজতে চেষ্টা করলেন যে, শাশ্বতর স্কুলের মাইনেটা আমি দিলাম কেন?

পৃথিবীতে একজন মানুষ যে আর-একজন মানুষের জন্যে এমন উপকার করতে পারে এটা আজকালকার যুগে হয়তো কেউ কল্পনাই করতে পারে না। কিন্তু সেই যুগে আমার মনে হত আমি শাশ্বতর জন্যে বোধহয় সব কিছু করতে পারি। এমন-কী, দরকার হলে প্রাণও দিতে পারি।

স্কুলের পর আমি ঠিক করলাম বাড়িতে আগে না গিয়ে আগে শাশ্বতকে গিয়ে খবরটা দেব। তাই শাশ্বতর বাড়ির দিকেই পা বাড়ালাম।

কিন্তু শাশ্বতর বাড়িতে যাবার আগেই যে সেখানে আর এক নাটকের অভিনয় হতে শুরু করেছে তা আমি জানতাম না তখনও।

দুপুরবেলা মাসিমা ঘরের ভেতরে নিজের তক্তপোশের ওপরে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। একটাই তো মাত্র ঘর। সেই ঘরে শাশ্বত শুত তক্তপোশের ওপর আর মাসিমা শুতেন মেঝের

ওপর বিছানা পেতে। আর কল হোক পায়খানা হোক সব এজমালি। অর্থাৎ বস্তির যত ভাড়াটে তাদের সকলের জন্যে ওই একটা কল-পায়খানা।

তারই ভাড়া মাসে দশ টাকা। সেই দশটা করে টাকাও মাসে দিতে পারত না শাশ্বতরা।

আমার বড় দুঃখ হত শাশ্বতর জন্যে। মানুষ বিপদে পড়লে একটু হতাশ হয়ে পড়ে। তখন কেউ বা ঠাকুর-দেবতার আশ্রয় নেয় আর কেউ বা পরের কাছে নিজের দুঃখ-কষ্ট প্রকাশ করে কান্নায় ভেঙে পড়ে হালকা হবার চেষ্টা করে।

কিন্তু শাশ্বত ছিল উলটো প্রকৃতির। মনে হত সে যেন অন্য পৃথিবীর লোক। শোক কষ্ট বিপদ যেন তাকে স্পর্শ করতে পারত না। যত তার বিপদ আসত ততই সে আরও মিথ্যেবাদী হয়ে উঠত। ততই যেন সে আরও বুক ফুলিয়ে বেড়াত। আমি যে তার এত বড় হিতাকাঙ্ক্ষী, সেই আমার কাছেও সে তার মনের কথা প্রকাশ করত না। আমাকেও সে অবিশ্বাস করে নিজেকে প্রবঞ্চনা করত। আমার তাই কেবল মনে হত হয়তো সে নিজেকেও বিশ্বাস করত না।

এ-রকম চরিত্র আমি অন্তত জীবনে একটাও দেখিনি। কিংবা কোনও গল্প-উপন্যাসেও আমি এমন চরিত্র পড়িনি।

এতদিন পরে সেই শাশ্বতকে আমার অফিসে দেখে আমার সেই সব দিনকার সমস্ত কথা মনে পড়তে লাগল। কত ছেলের সঙ্গেই তো ছেলেবেলায় একসঙ্গে একই ক্লাসে বছরের পর বছর পড়েছি। কেউ পরবর্তী কালে বড় হয়েছে, নাম করেছে, কেউ বা বেশি কিছু না করতে পারুক কোনোরকমে একটা ছোট-খাটো অফিসে একটা ছোটখাট চাকরি নিয়ে টিঁকে আছে।

কিন্তু শাশ্বত? সেই শাশ্বত, যাকে আমি সব চেয়ে ভালোবাসতুম, যার বিপদের দিনে আমি আমার সাধ্যের অতীত সাহায্য করতে চেষ্টা করতুম, সে যে একদিন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল তার কোনও খোঁজ পাইনি। অনেককে জিজ্ঞেস করেছি শাশ্বতর কথা।

সতীশ বলে একজন আমাদের ক্লাসের ভাল ছেলে ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করতেই সে বলেছিল, "সেই চালবাজ শাশ্বতর কথা বলছিস? সে তো তোরই বন্ধু ছিল, তার সঙ্গেই তো তোর বেশি মাখামাখি, বেশি ভাব ছিল। তার কথা তুই আমাকে জিজ্ঞেস করছিস?"

আমি বলেছিলাম, "চালবাজ সে তা আমিও জানতুম, তা বলে সে কি মানুষ নয়? সে যে গরিব, সে যে চালবাজ তার জন্য কি সে দায়ী?"

সতীশ বলেছিল, "সে দায়ী নয় তো কে দায়ী?"

মনে আছে আমি তার জবাবে বলেছিলাম, "সংসারে সব মানুষই যে বড়লোকের ঘরে জন্মাবে তার তো কোনও মানে নেই। অনেকে তো গরিবের ঘরেও জন্মায়।

সতীশ বলেছিল, "সে যদি গরিব তো গরিবেরই মতোই তার থাকা উচিত ছিল। কেন সে গরিব হয়েও অমন আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে চাইত? কেন সে কথায়-কথায় রাজা-উজির মারত?"

আমি বলেছিলাম, "তোদের অত অহঙ্কার ভাল নয় সতীশ! তুই যদি গরিব বিধবা মায়ের ছেলে হতিস, আর বস্তি-বাড়িতে একখানা দশ টাকা ভাড়ার ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতিস তাহলে তার মনের দুঃখটা বুঝতিস। দুঃখ-কষ্টে কেউ মাথা হেঁট করে, আবার কেউ বা দুঃখে-আঘাতে ঘা খেয়ে সন্নিসি হয়ে বনে চলে যায়। আবার কেউবা আত্মসম্মান বাঁচাবার জন্যে চালিয়াত হয়ে ওঠে। শাশ্বতর তা-ই হয়েছিল। সে মাথা হেঁট করতে পারেনি, সন্নিসিও হতে পারেনি, তাই চালবাজ হয়ে উঠেছিল। এটা তার দোষ নয়, দোষ তাদের যারা এই বর্তমান সমাজের লোক।"

পরবর্তী কালের এ-সব কথা এখন থাক। আগে সেই আগেকার কথাগুলো বলি।

সেদিন মাসিমা দুপুরবেলা শাশ্বতর তক্তপোশের ওপর শুয়ে একটু আরাম করছিলেন। হঠাৎ বাইরে থেকে কে যেন হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "চারুবালা দাসী—চারুবালা দাসী—"

সঙ্গে-সঙ্গে সদর দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হতে লাগল খটাখট খটাখট শব্দ করে।

মাসিমার ঘুম ভেঙে গেছে। বললেন, "কে?"

বাইরে থেকে তেমনি হেঁড়ে গলায় জবাব এল, "আমি কোর্ট থেকে এসেছি, শমন আছে—"

মাসিমা কথাগুলোর মানে কিছু বুঝতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি নিজের গায়ের কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন। খুলে দিতেই দেখলেন একজন ষণ্ডামার্কা লোক দাঁড়িয়ে আছে।

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, "কী চাই বাবা তোমার? কাকে চাই?"

লোকটা বললে, "আমি বেলিফ, আদালত থেকে আসছি শমন ধরাতে। চারুবালা দাসী কার নাম?"

মাসিমা বললেন, "আমার নাম বাবা, আমার নাম—আমিই চারুবালা দাসী—"

লোকটা একটা কাগজ মাসিমার হাতের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "এই শমনটা নাও, এখানে একটা সই দিয়ে দাও—"

"সই?"

মাসিমা সই করতে জানেন না।

বললেন, "আমি তো নাম সই করতে জানি না বাবা। আমি লেখা-পড়া জানি নে। আমার ছেলে বাড়িতে নেই, সে বাড়ি আসুক, তখন সই করে নোব, কাগজটা তুমি রেখে যাও বাবা—"

লোকটা বললে, "আমার দাঁড়াবার সময় নেই, সই না দিলে আমি শমনটা দরজায় লটকে দিয়ে যাব—"

মাসিমা বললেন, "আমার ছেলে ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি একটু অপেক্ষা করতে পারবে না বাবা?"

লোকটা বললে, "তাহলে দু'টো টাকা লাগবে! দু'টো টাকা দিলে আমি দু'দিন পরে আসব—"

মাসিমা বললেন, "আমি গরিব মানুষ, আমি দু'টো টাকা কোথায় পাব বাবা এখন? আমার হাতে তো এখন একটা কানা-কড়িও নেই—"

লোকটা বললে, "তাহলে একটা টাকাই না-হয় দিন, আমি শমনটা না-হয় দু'দিন ঝুলিয়ে রাখব!"

মাসিমা বললেন, "একটা টাকাই যদি থাকবে তো আমি কি তাহলে তোমাকে দিতুম না বলতে চাও? আমি তো পরের বাড়ি ঝি-গিরি করে মাসে কুড়ি টাকা মাইনে পাই, তাতেই আমার আর আমার ছেলের দুজনের পেট চলে। এখন তো মাসের শেষ, তারপরে আমার ছেলের ইস্কুলের মাইনে ছ'মাস বাকি পড়ে গেছে, তার নামও কাটা গেছে ইস্কুলের খাতা থেকে। আমি বড় গরিব লোক বাবা—"

কিন্তু কোর্টের পেয়াদার যদি মায়া-দয়া- দাক্ষিণ্যই থাকবে তাহলে সে কোর্টের পেয়াদা হয়েছে কেন? কোর্ট যে পাথর-পাষাণ, দয়া-মায়া-হীন জড় বস্তু তা চারুবালা দাসী জানতেন না, তাই অত অনুনয়-বিনয় করতে আরম্ভ করছিলেন।

বলেছিলেন, "গরিব মানুষকে একটু দয়া করবে না বাবা?"

লোকটা বলছিল, "টাকা পেলে তবে আমরা মায়া-দয়া করি মা। আমরা কোর্টের পেয়াদা, আমরা টাকাকেই কেবল চিনি, দয়া-মায়াকে চিনি না। টাকা না পেলে আমরা এ-শমন দরজায় লটকে দিয়ে যাব। তখন এ-বাড়ি থেকে কোর্টের লোক পুলিস এনে আপনাদের ভাগিয়ে দেবে। আপনার মাল-পত্র রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে।"

লোকটার সঙ্গে মাসিমার এই সব কথা হচ্ছে এমন সময় আমি সেখানে গিয়ে হাজির হলাম।

আমি সেখানে গিয়ে একটা অচেনা লোককে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, "আপনি কে?"

লোকটা নিজের পরিচয় দিয়ে বললে, "এই শমনটা সই না করলে আমি এটা এই দরজায় লটকে দিয়ে যাব, তাহলেই আমার ডিউটি খতম।"

বললাম, "কিন্তু মাসিমা যে লেখা-পড়া জানেন না, সই করবেন কী করে? শাশ্বত এলে সে সই করে নেবে'খন—"

লোকটা বললে, "তাহলে দুটো টাকা দিতে হবে।"

"কেন?"

লোকটা বললে, "আমাকে তো নিজের ডিউটি করতে হবে। আমি কোর্টে গিয়ে বলব আসামীকে বাড়িতে পাইনি!"

বললাম, "আমার কাছে একটা টাকা আছে, তাতে যদি হয় তো আপনি বলুন, আমি দিয়ে দিচ্ছি—"

লোকটা বললে, "তাই-ই দাও—"

আমি পকেট থেকে একটা টাকা বেলিফের হাতে দিলাম। লোকটা খুশি মনে হাসতে-হাসতে চলে গেল। যাবার সময় মাসিমাকে বলে গেল, "এ বাড়ি ছাড়ার নোটিস। আজ নোটিস দিলাম না, কিন্তু বেশি দিন তো আমি আটকে রাখতে পারব না। কাল হোক পরশু হোক, এ-শমন আমাকে জারি করতেই হবে। বাড়িওয়ালা আপনার নামে বাড়ি থেকে উৎখাত করবার

মামলা এনেছে, একজন উকিলের ব্যবস্থা করে ফেলুন তাড়াতাড়ি—"

বলে লোকটা টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজে চলে গেল।

মাসিমা আমার দিকে চেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়তে পড়তে বললেন, "আমাদের কী হবে বাবা? বাড়ি ছাড়তে হলে আমরা কোথায় যাব?"

আমি মাসিমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "আপনি কিছু ভাববেন না মাসিমা, আমি সব ঠিক করে দেব। আজ আমি শাশ্বতর স্কুলের ছ'মাসের বকেয়া মাইনে মিটিয়ে দিয়েছি। খাতায় আবার তার নাম উঠবে। তাকে কাল আবার ইস্কুলে যেতে বলবেন।"

মাসিমার চোখ দিয়ে এবার জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

বললেন, "তোমাকে কী বলে আশীর্বাদ করব বাবা জানি না। আর-জন্মে নিশ্চয় তুমি আমার ছেলে ছিলে। নিজের পেটের ছেলেও এমন করে কারও জন্যে কিছু করে না। এখন এদিকে বাড়ির কী হবে বলো? ও লোকটা তো বলে গেল আবার কাল পরশু আসবে, এসে আবার জ্বালাবে আমাকে, তখন কে আমাকে বাঁচাবে?"

আমি বললাম, "আপনি কিছু ভাববেন না, আমার বাবা মস্ত বড় উকিল। আমার বাবা সব কিছু ঠিক করে দেবে। আমার বাবার কাছে নিয়ে যাব আপনাকে। কী করতে হবে তা বাবা আপনাকে সব বলে দেবেন।"

মাসিমা বললেন, "কিন্তু আমি তো বাবা মেয়েমানুষ, কোর্ট-ঘর করতে পারব না।"

আমি বললাম, "সে শাশ্বত করবে—"

মাসিমা বললেন, "হা ভগমান, তার ভরসাতে থাকলেই হয়েছে। সে ততক্ষণ রাজা-উজির মেরে বেড়াবে।"

আমি বললাম, "সে-সব কথা পরে হবে, আপনি আগে আমার বাবার কাছে চলুন তো, বাবা যা বলবে তাই-ই হবে।"

তখন বেলা গড়িয়ে সন্ধে হয়ে এসেছিল। তখন মাসিমার নাজিরদের বাড়ি যাবার তাড়া।

মাসিমা বললেন, "তাহলে আমি আমার চাকরিটা আগে সেরে আসি, তারপর তুমি আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যেও—"

তাই-ই ঠিক হল। আমি মাসিমাকে রেখে আমাদের বাড়ি চলে গেলাম।

মা বললেন, "কী রে, ইস্কুল থেকে আসতে আজ এত দেরি কেন রে তোর?"

বললাম, "একটা কাজ পড়েছিল—"

মা বললেন, "তোর আবার কাজ কী? তুই তো কাজ করে একেবারে উলটে যাচ্ছিস।"

আমি আর সে-কথার কোনও জবাব দিলাম না। বাবা বাড়ি আসতেই আমি আবার শাশ্বতদের বাড়ি চলে গেলাম। তখন দেখি মাসিমা নাজিরদের বাড়ি থেকে কাজ সেরে ফিরছেন।

বললাম, "চলুন মাসিমা, এবার বাবা বাইরের ঘরে গিয়ে বসবেন, কোনও লোক আসবার আগেই আপনার সঙ্গে বাবার কথা বলিয়ে দেব।"

মাসিমা তৈরি হয়েই ছিলেন। মাসিমাকে নিয়ে আমাদের বাড়ি এলাম।

বাবা তখন সবে জলটা খেয়ে নিজের বৈঠকখানার ঘরে এসে বসেছেন।

আমি গিয়ে সোজা বাবাকে বললাম, "বাবা, এই আমার বন্ধুর মা'কে সঙ্গে করে এনেছি—" বাবা তো অবাক।

মাসিমা তার আগেই একেবারে বাবার পায়ে হাত ছুঁয়ে মাথায় ঠেকিয়েছেন।

বাবা এই অতর্কিত আক্রমণে একেবারে চমকে উঠে বলে উঠলেন, "থাক, থাক, কী হয়েছে মা—"

আমিই মাসিমার হয়ে বললাম, "মাসিমা বড় বিপদে পড়েছেন বাবা, এঁকে তোমাকে বাঁচাতেই হবে।"

বাবা আমার দিকে চাইলেন। বললেন, "মাসিমা মানে?"

আমি বুঝিয়ে বললাম, "আমার ক্লাস-ফ্রেন্ড শাশ্বতের মা। বড় বিপদে পড়েছেন। বাড়িওয়ালা এঁর নামে মামলা করেছে বাড়ি ছেড়ে দেবার জন্যে।"

বাবা বললেন, "নিশ্চয়ই ভাড়া বাকি পড়েছে। নইলে বাড়িওয়ালা মামলা করবে কেন? তা কত মাসের ভাড়া বাকি পড়েছে?"

বললাম, "প্রায় আট মাসের মতন।"

বাবা বললেন, "তাহলে তো বাড়িওয়ালা মামলা করবেই—"

আমি বললাম, "মামলা করেছে, কিন্তু এখনও কিছু হয়নি। শুধু একজন বেলিফ এসেছিল, সে শমন দিতে চাইছিল, তাকে এক টাকা ঘুষ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে।"

বাবা খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলেন, তারপর বললেন "তা তোমরা অন্য বাড়িতে চলে যাও না। এখন কত টাকা ভাড়া তোমাদের?"

মাসিমা বললেন, "দশ টাকা।"

"তাহলে সে বস্তি-বাড়ি! তাই বলো। এখন কি আর ওই ভাড়াতে ঘর পাবে? এখন তো ওই ভাড়ায় আর এক ফালি বারান্দাও পাবে না। তা দশ টাকা মাত্র ভাড়া, তাও নিয়ম করে দিতে পারলে না? জানো, আজকাল তিন মাস ভাড়া বাকি পড়লেই ভাড়াটেকে উৎখাত হয়ে যেতে হয়!"

মাসিমা বললেন, "দশ টাকা মাসে যদি দিতেই পারতুম, তাহলে কি আজ আমার এই দুর্ভোগ?"

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার আর কে আছে?"

মাসিমা আমাকে দেখিয়ে বললেন, "এই আপনার ছেলের বয়সী এক ছেলে আমার, তা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমি বিধবা মানুষ, পরের বাড়ি ঝি-গিরি করে মাসে কুড়ি টাকা করে পাই। আর কোনও আয় নেই আমার!"

বাবা বললেন, "তা তুমি বাকি ভাড়া সমস্ত একসঙ্গে মিটিয়ে দিতে পারবে?"

মাসিমা বললেন, "না, তা পারব না।"

বাবা বললেন, "তাহলে আমি আর কী করতে পারি। তোমাকে ও-বাড়ি শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিতেই হবে। আমি কিছু করতে পারব না—"

মাসিমার চোখ দু'টো কান্নায় ভারী হয়ে এল।

আমি আর থাকতে পারলুম না। আমি বাবাকে বললাম, "তোমাকে মাসিমার জন্যে কিছু করতেই হবে বাবা।"

বাবা বললেন, "আমি উকিল বলে কি আইনের কর্তা? আইনে যা আছে জজ্ তো তাই-ই করবে।"

আমি বললাম, "তুমি যদি কিছু না করতে পারবে, তাহলে গরিব লোকদের কী হবে?"

বাবা বললেন, "আইন বড়লোক-গরিবলোক মানে না। যা ন্যায্য তাই-ই করবে!"

আমি বললাম, "তাহলে গরিবদের কী হবে? তারা কি পথে বসবে?"

বাবা বললেন, "হ্যাঁ, পথে বসা ছাড়া আর উপায় কী? কলকাতার রাস্তায় কত হাজার-হাজার লোক তো পথেই বসে বসে সংসার করে। দেখিসনি?"

আমি বললাম, "তা ওরা যে গরিব তার জন্য কি ওরা দায়ী?"

বাবা বললেন, "ওরা দায়ী নয় তো কে দায়ী?"

আমি বললাম, "কেন, আমরা দায়ী। আমরাই তো ওদের গরিব করে রেখেছি?"

বাবা এবার খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, "খুব বড়-বড় কথা বলতে শিখেছিস তো। এসব কথা কোথায় শিখেছিস তুই?"

বললাম, ''বইয়ে পড়েছি।''

বাবা যেন অবাক হয়ে গেলেন আমার কথা শুনে। বললেন, "বইতে পড়েছিস? কোন বইতে পড়েছিস? যে বইতে এ-সব কথা লেখা থাকে সে-বই ছিঁড়ে ফেলে দে। আজকাল এই সব বই স্কুলে পড়ায় নাকি? কই দেখি, সে-বই নিয়ে আয় তো আমার কাছে।"

আমি বললাম, "স্কুলের বই নয়, বাইরের বই থেকে পড়েছি—"

বাবা বললেন, "যে-সব বইতে ও-সব কথা লেখা থাকে, সে-সব বই আর এখন থেকে পড়িস না। মানুষ গরিব হয় নিজের দোষে। কেউ কাউকে গরিব করে না। যারা পরিশ্রম করে না, মানুষকে ঠকায়, তারাই গরিব হয়।"

আমি প্রতিবাদ করলাম। বাবাকে বললাম, "না, আমি বলছি তা ঠিক নয়। যারা পরকে ঠকায় তারাই আমাদের দেশে বড়লোক হয়।''

বাবা বললেন, "তা আমিও কি গরিবদের ঠকিয়ে বড়লোক হয়েছি বলতে চাস?"

আমি বললাম, "তুমি খুনের আসামীকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচিয়ে মোটা টাকা নাওনি? যে তোমাকে মোটা টাকা দিয়েছে তুমি তার পক্ষ নাওনি? গরিবদের কখনও তুমি একবারও বাঁচিয়েছ? গরিবদের কথা একবারও তুমি ভেবেছ?"

বাবা চিৎকার করে উঠলেন, "চুপ কর। বড় জ্যাঠা হয়েছিস তো তুই! বড়দের সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয় তাও জানিস না?"

তারপর মাসিমার দিকে চেয়ে বাবা বললেন, "যাও মা, তুমি এখন যাও। আমি তোমার জন্যে কিছু করতে পারব না।"

মাসিমা চলে যাচ্ছিলেন।

আমি থামিয়ে দিলাম। বললাম, "আপনি যাবেন না মাসিমা। আপনার জন্যে যদি বাবা কিছু না করেন তো আমিও এ-বাড়িতে আর থাকব না। আমিও এ-বাড়ি থেকে চলে যাব।"

বাবা বললেন, "না মা, তুমি কিছু মনে কোরো না। আমার ছেলের কথা তুমি শুনো না। তোমার মামলা আমি করতে পারতুম, কিন্তু তুমি যে ভাড়া বাকি ফেলেছ, এর ওপর আমিই বা কী করতে পারি, আর জজসাহেবই বা কী করতে পারে। কারোর বাবার সাধ্যি নেই এ-ব্যাপারে তোমার কিছু উপকার করতে পারে!"

মাসিমা চোখের জল ফেলতে-ফেলতে চলে যাচ্ছিলেন, আমিও মাসিমার সঙ্গে চলে যাচ্ছিলাম।

কিন্তু বাবা বাধা দিলেন। চেয়ার থেকে উঠে আমার হাতটা ধরে ফেললেন। বললেন, "তুই কোথায় যাচ্ছিস?"

আমি বললাম, "আমি আর এ-বাড়িতে থাকব না—"

বাবা বললেন, "কেন, ওরা তোর কে?"

আমি বললাম, "মাসিমার ছেলে শাশ্বত আমার বন্ধু, আর কেউ নয়।"

বাবা বললেন, "তা ওদের মামলা হলে তোর কী ক্ষতি?"

আমি বললাম, ''ওরা রাস্তায় বসে ভিক্ষে করবে, আর আমাকে তাই দেখতে হবে? সে আমি দেখতে পারব না। শাশ্বত আমার প্রাণের বন্ধু।"

বাবা বললেন. "যত বাজে ছেলের সঙ্গে কেন তোর বন্ধুত্ব?

ভাল ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারিস না?"

আমি বললাম, "শাশ্বত গরিব হতে পারে, কিন্তু ভাল ছেলে!"

"পরীক্ষায় ফার্স্ট হয় তোর বন্ধু?"

বললাম, "না।"

"তাহলে ?"

বললাম, "পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়াকে আমি বড় গুণ বলে মনে করি না। আমাদের পাড়ার ইস্কুল থেকে অনেক ছেলেই তো ফার্স্ট হয়েছে, তারপর এখন তারা রাস্তার ধারে বসে বসে আড্ডা দেয়, বিড়ি খায়। আমি দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কটা পরীক্ষায় পাস করেছিলেন ?"

"তুই যে খুব বড়-বড় কথা শিখেছিস !"

বাবা আমাকে নিয়ে ভেতরে গেলেন। মা তখন সংসারের তদারকিতে ব্যস্ত ছিলেন। মায়ের সামনে আমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন, "দেখছ, তোমার ছেলে কী বলছে ?"

ওই অসময়ে বাবাকে বাড়ির ভেতরে আসতে দেখে মা অবাক। বললেন, "কী বলছে ?"

বাবা বললেন, "বলছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি লেখা-পড়া শেখেনি, তবু কত বড়লোক হয়েছে।"

মা আরও অবাক। বললেন, "তা যা-ইচ্ছে বলুক না ও. তোমার কী ? তুমি কাজ করতে-করতে আবার বাড়ির ভেতরে উঠে এলে কেন ?"

বাবা বললেন, "আমি কি সাধে উঠে এসেছি। তোমার ছেলের যা কাণ্ড! কোথা থেকে কোন এক বুড়িকে ধরে নিয়ে এসেছে আমার কাছে। বলে কিনা আমাকে বিনা পয়সায় তার মামলা করে দিতে হবে!"

মা কিছু বুঝতে পারলেন না। বললেন, "বুড়ি? কে বুড়ি? কিসের মামলা ?"

বাবা বললেন, "সে-কথা তুমি ওকেই জিজ্ঞেস করো না।"

মা আমার দিকে চেয়ে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কে রে ? কোন বুড়ি ? কী মামলা ?"

আমি বললাম, "শাশ্বতর মা। মাসিমা বড় বিপদে পড়েছেন। বাড়ি-ভাড়া দিতে পারেননি বলে তাঁর বাড়িওয়ালা মামলার নোটিস দিয়েছে !"

মা বললেন, "তা তাদের মামলা, তাতে তোর কী ? তে নামে তো কেউ মামলা করেনি !"

আমি বললাম, "বা রে, আমার নামে মামলা না করলেই ব কিন্তু বাড়িওয়ালা যদি ওদের নামে মামলা করে ওদের বা থেকে উচ্ছেদ করে দেয়, তখন কোথায় যাবে শাশ্বতরা !"

মা বললেন, "ওই এক শাশ্বত হয়েছে। একটা বখাটে ছেলে বন্ধু হয়েছে তোর। তার যা হয় হোক, তাতে তোর কী। তার রাস্তায় বসুক আর জাহান্নমেই যাক, তা নিয়ে তোর মাথা-ব্যথা কেন ?"

বাবা বললেন, "আবার শুনেছ ওর কথা ? বলে কিনা আমি ওদের মামলার ভার না নিলে ও বাড়ি থেকে চলে যাবে! আমি তাই তোমার কাছে ওকে ধরে আনলুম। তুমি ওকে ঘরের দরজায় তালা-চাবি দিয়ে বন্ধ করে রেখে দিও তো! আমার কোর্টের অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। আমি যাই—"

বলে বাবা চলে গেলেন তাঁর নিজের ঘরে।

মা আমার দিকে চেয়ে বললেন, "শুনলি তো ? তোকে এখন যদি ঘরের ভেতরে বন্ধ করে রাখি, তখন ? তখন কী হবে ?"

আমি বললাম, "কতদিন আমাকে বন্ধ করে রাখবে তোমরা ? যেদিন দরজা খুলবে সেই দিনই আমি শাশ্বতদের বাড়িতে চলে যাব, আর তোমাদের কাছে আসব না—"

"তবে রে!" বলে মা আমাকে একটা ঘরের ভেতরে পুরে দরজায় শেকল লাগিয়ে দিলেন। আর আমিও গুম হয়ে সেখানে বসে রইলুম।

অনেক রাত্রে মাস্টারমশাই পড়াতে এলেন।

বাবা মাস্টারমশাইকে বললেন, "আপনি কী-রকম মাস্টার-মশাই হয়েছেন? কী-রকম শিক্ষা দিচ্ছেন আমার ছেলেকে, আমার মুখের ওপর কথা বলে!"

বলে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বললেন।

মাস্টারমশাই সবই শুনলেন। কিন্তু তিনি আর কী বলবেন। বললেন, "তাহলে আজকে আর পড়াব না?"

বাবা বললেন, "পড়ান, কিন্তু ঘরের ভেতরে বসে। ওকে আমি আর কদিন স্কুলে যেতে দেব না। দেখি, ও কী করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়! আমি স্কুলের হেড-মাস্টারকেও এ-সম্বন্ধে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি।"

মাস্টারমশাই সেদিন আর বাইরের ঘরে পড়ালেন না। ও-বিষয়ে কোনও কথাও জিজ্ঞেস করলেন না। শুধু নিয়ম-মাফিক পড়া পড়িয়ে চলে গেলেন।

আমিও কিছু বললুম না। আমারও খুব জেদ। আমি ভাঙব তবু মচকাব না। দাদারা অফিস থেকে বাড়ি এলেন। মায়ের কাছ থেকে সমস্তই তাঁরা শুনলেন। বাবার নির্দেশের বিরুদ্ধে তাঁদেরও কিছু বলবার ক্ষমতা নেই।

মা খেতে ডাকতে এলেন।

আমি বললাম, "আমি খাব না—"

বাবার কানে গিয়ে কথাটা উঠল। বাবা সব শুনে বললেন, "না-খায় না-খাবে! অমন ছেলের উপোস করাই ভাল।"

মা আর কিছু বলতে সাহস করলেন না। আমাদের বাড়িতে বাবার হুকুমই শেষ কথা।

বাবা শুধু জানালা দিয়ে একবার জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, খাবি না কেন?"

আমি বাবার কথার কোনও জবাব দিলাম না। বাবা অগত্যা নিজে খেয়ে-দেয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। তারপর মা চুপি চুপি আমার জানালার কাছে এলেন।

গলা নিচু করে জিজ্ঞেস করলেন, "এই, খাবি?"

আমি বললাম, "না, কিছুতেই খাব না।"

মা আবার বললেন, "কেউ জানতে পারবে না, চুপিচুপি খেয়ে নে, আমি ভেতরে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, খেয়ে নে। কাউকে কিছু বলব না। না খেলে শরীর খারাপ হবে, তোর অসুখ করবে! খেয়ে নে।"

আমি বললুম, "না আমি কিছুতেই খাব না।"

সত্যিই আমি সেদিন কিছুতেই খেলাম না। ক্রমে চাকর-বাকর-ঠাকুর-ঝি সবাই খেয়ে নিলে। বাড়ি অন্ধকার হয়ে গেল। চারদিকে সমস্ত চুপচাপ। রাত্রের অন্ধকারে আমি একা-একা সেই অন্ধকার ঘরে পড়ে রইলাম। শাশ্বত আর মাসিমার কথা ভাবতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম বাবা যদি মাসিমার মামলা না করেন তাহলে আমি সুযোগ পেলেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যাব। আর কখনও এই বাড়িতে আসব না। বাবা-মা-দাদা কারোরই মুখদর্শন করব না। বাড়ির সবাই আমার শত্রু। কেউ আমাকে ভালবাসে না এ-বাড়িতে।

হঠাৎ জানালার দিকে একটা ঠুক-ঠুক করে আস্তে শব্দ হল।

"কে? কে টোকা দিচ্ছে ওখানে?"

টপ করে জানালাটা খুলেই দেখি বাইরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

"কী রে বিনু, কী করছিস?"

শাশ্বতর গলা। তখন চিনতে পারলাম। শাশ্বত কী করে জানলে যে আমাকে বাবা ঘরে চাবি-তালা দিয়ে বন্দী করে রেখেছেন। কী করে জানলে আমি না খেয়ে উপোস করে আছি?

বললাম, "তুই কী করে জানতে পারলি রে যে, আমি কিছু খাইনি? কী করে জানতে পারলি যে, আমাকে বাবা ঘরে বন্ধ করে রেখে দিয়ে গেছেন?"

শাশ্বত বললে, "মার কাছে শুনলুম।"

"মাসিমা বলেছেন?"

"হ্যাঁ।"

শাশ্বত বললে, "কেন তুই আমার জন্যে এত কষ্ট করছিস?"

বললাম, "করব না? বাড়িওয়ালার অত টাকা ভাড়া বাকি পড়েছে। এখন যদি তোদের সে-লোকটা রাস্তায় বার করে দেয়? তাহলে কী হবে?"

শাশ্বত হাসতে হাসতে বললে, "তখন রাস্তাতেই বাস করব! কত লোক তো রাস্তাতেই ঘর-সংসার পেতে বসেছে, দেখিসনি? তাতে কী হয়েছে? দেখিসনি সেখানেই তাদের বিয়ে হচ্ছে, রাস্তার কলে চান করছে, আয়নাতে মুখ দেখতে-দেখতে মাথার চুল আঁচড়াচ্ছে, তারা যদি রাস্তায় থাকতে পারে তো আমরা রাস্তায় থাকতে পারব না কেন? আমরাও তো তাদের মতো গরিব লোক রে—"

বললাম, "তুই যে বলেছিলি তোর মামা পুলিস-কমিশনার? তোর মামাকে একবার খবরটা দে না। দেখ না, তোর মামা যদি কিছু সাহায্য করতে পারেন!"

শাশ্বত বললে, "দূর, ও-সব বাজে কথা!"

আমি বললাম, "বাজে কথা মানে?"

শাশ্বত বললে, "আমি তোকে সব বাজে কথা বলেছিলাম।"

বললাম, "তুই বাজে কথা বলেছিলি?"

শাশ্বত বললে, "হ্যাঁ রে, সমস্ত বাজে কথা! তুই বুঝতে পারিসনি?"

আমি বললাম, "না। তুই আমার কাছে মিথ্যে কথা বলে-ছিলি?"

শাশ্বত বললে, "তুই বড় সরল। অত সরল ভাল-মানুষ হলে এ যুগে চলে না রে! তোর কপালে অনেক কষ্ট আছে। এ তো মিথ্যের যুগ, ধাপ্পাবাজির যুগ রে। ধাপ্পা না দিতে পারলে আমরা এখানে কেউ টিঁকতে পারব না ভাই।"

তারপর একটু থেমে বললে, "তোকে এতদিন যা কিছু বলেছি, সব মিথ্যে কথা ভাই। এই তোরাই আমাদের মিথ্যেবাদী ধাপ্পাবাজ বানিয়েছিস। তোদের টেক্কা দেবার জন্যেই আমাকে বলতে হয়েছিল আমার মামা পুলিস কমিশনার, তোদের টেক্কা দেবার জন্যেই বলতে হয়েছিল আমার বাবার বন্ধু নাটোরের মহারাজা। কতদিন আমাকে আর আমার মাকে না-খেয়ে আর উপোস করে থাকতে হয়েছে তা জানিস? তোদের কাউকে তা জানাইনি। নিজের দুঃখের কথা এ যুগে অন্যদের বললে তারা কি আমার উপকার করবে কেউ? শুধু হাসবে। এ-যুগে দুঃখের কথা কেউ শুনতে চায় না ভাই, তাই তো বড়-বড় কথা বলতুম তোদের কাছে, যাতে তোরা আমাকে একটু পাত্তা দিস!"

বললাম, "কিন্তু তা বলে আমার কাছেও তুই ধাপ্পা দিবি?"

শাশ্বত বললে, "কী করব আমি বল? ছোট বয়েসে জ্ঞান হবার আগেই আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন। তখন আমার বয়েস ছ'মাস। সেই ছ'মাসের বাচ্চাকে নিয়ে মা পরের বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে বড় করেছেন। একটু জ্ঞান হতেই দেখলুম পৃথিবীটা বড় খারাপ জায়গা। তোর সুখের ভাগ নিতে সবাই তৈরি, কিন্তু তোর দুঃখের ভাগ কেউ নেবে না। আমি যদি লোকদের বলি আমি ঝিয়ের ছেলে, তাহলে, ভালবাসা দূরে থাক, সবাই আমাকে ঘেন্না করবে। তাই তখন থেকেই মিথ্যে কথা বলা শুরু করলাম। এক কথায় বলতে গেলে এই সমাজটাই আমাকে মিথ্যেবাদী, ধাপ্পাবাজ করে তুলল। কিন্তু মার কাছে যখন শুনলুম তুই আমাদের বাড়িয়ালার বাকি ভাড়া মিটিয়ে দিয়েছিস, আমার স্কুলের ছ'মাসের মাইনে দিয়ে খাতায় আমার নাম আবার উঠিয়েছিস তখন তোর ওপর আমার ধারণা বদলে গেল। আমার জন্যে সত্যিই তুই খুব কষ্ট পাচ্ছিস, না রে?"

আমি বললাম, "কষ্ট তো পাচ্ছিই, কিন্তু তার চেয়েও বেশি কষ্ট পাচ্ছি তোর কথা ভেবে। তোদের যদি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় তো তোরা কোথায় যাবি তাই-ই কেবল ভাবছি—"

শাশ্বত বললে, "আমাদের কথা তুই কিছু ভাবিসনি! আমাদের মতন আরও অনেক গরিব লোক আছে এই কলকাতায়, তুই একলা কত লোকের দুঃখ দূর করতে পারবি! আমাদের মতো লোক চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে, আমাদের বোধহয় মরাই ভাল রে—আমাদের মতো লোকের বেঁচে থাকাটাই অন্যায়!" বলে শাশ্বত বোধহয় কাঁদতে লাগল। অন্ধকারে তার মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। কিন্তু খানিক পরে সে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সেই কান্নার শব্দে হঠাৎ আমার ঘুমটা ভেঙে গেল।

*

যখন চোখ চাইলাম দেখি দিনের আলোয় চারদিকে আলোময় হয়ে উঠেছে। ভাবলাম এ কোথায় রয়েছি আমি? সামনে আমার কে দাঁড়িয়ে?

মনে হল ডাক্তার। কারণ ভদ্রলোকের গলায় স্টেথিসকোপ ঝুলছে। তাহলে কি আমি অজ্ঞান হয়ে ছিলাম এতক্ষণ?

তারপরেই বাবার গলা শুনতে পেলাম। বাবা বললেন, "ওই তো চোখ খুলেছে, তাহলে জ্ঞান হয়েছে এখন!"

আশেপাশে চেয়ে দেখলাম মাও দাঁড়িয়ে আছেন এক কোণে। তাঁর কাছে দাদারা। সকলের মুখের চেহারাই গম্ভীর। আমি বুঝতে পারলাম না আমার কী হয়েছে। তাহলে হয়তো আমি স্বপ্নের মধ্যেই শাশ্বতকে দেখেছি।

বাবা বললেন, "এখন কেমন দেখলেন?"

ডাক্তারবাবুর কথাও কানে এল। বললেন, "মনের কোনও জায়গায় আঘাত লাগলেও এরকম হয়। হার্টটাও ঠিক আছে। আমার মনে হয় মেনটাল শকের জন্যেই এটা হয়েছিল। জ্বরটা যখন চলে গেছে তখন আর কোনও ভয় নেই—"

দাদা উদ্বিগ্ন চোখে বললেন, "কিন্তু মানসিক শক কিসে হতে পারে? এইটুকু বয়েসে তো মনে কোনও আঘাত লাগা সম্ভব নয়।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "ছোট বয়েসে অনেক সময় কারও কাছ থেকে বকুনি খেলেও এ রকম হতে পারে! কেউ কি ওকে কিছু বলেছিল?"

বাবা বললেন, "আমিই ওকে বকেছিলুম!"

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কেন, কী করেছিল ও?"

বাবা বললেন, "ওর স্কুলের একটা ছেলের মাকে নিয়ে এসেছিল আমার কাছে। তাদের বাড়িওয়ালা তাদের উচ্ছেদ করতে চাইছিল। তাই তার বিধবা মায়ের হয়ে আমাকে ব্যবস্থা করতে বলেছিল। সেই নিয়ে আমার সঙ্গে ওর খুব তর্ক হয়। তর্কের সময় তো খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। আমাকে অনেক যা-তা কথা শুনিয়েছিল। আমিও ওকে দু'কথা শুনিয়েছিলাম।"

"তারপর?"

"তারপর ও রাত্তিরে রাগ করে আর কিছু খায়নি। আমি ওকে একতলার একটা ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলাম। পরদিন সকালবেলা দেখা গেল ঘরের ভেতরে অজ্ঞান হয়ে শুয়ে পড়ে আছে। তারপর গায়ে হাত দিয়ে দেখি জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। তখন পাড়ার ডাক্তারকে ডাকা হল। কিন্তু সেইদিন থেকেই ও প্রলাপ বকছিল।"

ডাক্তারবাবু সব শুনে বললেন, "খব অন্যায় করা হয়েছে ওর ওপর। আমরা বড়রা সাধারণত ছোট ছেলে-মেয়েদের মানুষ বলেই মনে করি না। তাদেরও যে মন বলে একটা জিনিস আছে তা ভাবি না। ওকে তালা-চাবি দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে না-খেতে দিয়ে খুবই অন্যায় করেছিলেন। যা হোক, এখন থেকে ওর ওপর যেন কোনও মানসিক পীড়ন না হয়। তা যদি করেন তাহলে আর ওকে বাঁচানো যাবে না।"

আমি কান পেতে সব শুনছিলাম। আমি একবার ওঠবার চেষ্টা করতে গেলাম, কিন্তু ডাক্তারবাবু বাধা দিলেন।

বললেন, "এখন ওর ওঠা-হাঁটা একদম বারণ। অন্তত এক মাস দেড় মাস কেবল বিছানায় শুয়ে থাকবে ও। আর সব সময়ে যে-কেউ একজন ওর কাছে বসে থাকা চাই।"

ডাক্তারবাবু ওষুধ লিখে দিয়ে চলে গেলেন।

আমাকে এক দেড় মাস এমনি বিছানায় শুয়ে থাকতে [illegible] শুনে আমি খুব কষ্ট পেলাম মনে-মনে। তারপর [illegible] অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

মনে আছে কী কষ্টে আমার সে দিনগুলো [illegible] বাবা নয় মা সারা দিন আমার পাশে বসে থাকতেন।

মা মাঝে-মাঝে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, "এখন কেমন আছিস রে?"

আমি বলতাম, "আমি কবে উঠে হেঁটে বেড়াতে পারব?"

মা বলতেন, "এখন শরীর তোর খারাপ, একটু ভাল হলেই উঠে বেড়াতে পারবি?"

"কবে ভাল হব আমি?"

মা বলতেন, "এত বড় একটা ভারী অসুখ গেল, এখন তোর ভাল হতে একটু সময় লাগবে।"

"আর কত সময় লাগবে?"

মা বলতেন, "এবার ডাক্তারবাবু এলে তাঁকে জিজ্ঞেস করব। তিনি বললেই তুমি উঠে হেঁটে বেড়াতে পারবে!"

ডাক্তারবাবু আমাকে দেখতে এলে তাঁকেও আমি ওই একই কথা জিজ্ঞেস করতাম। বলতাম, "আবার কবে উঠতে পারব ডাক্তারবাবু?"

ডাক্তারবাবু বলতেন, "আর বেশি দিন শুয়ে থাকতে হবে না তোমাকে। আর একটু সুস্থ হয়ে নাও। যে-ওষুধটা দিলুম এটা খেলেই গায়ে একটু জোর পাবে, তখন তুমি স্কুলে যেতে পারবে!"

তারপর ভাল হতে আরও প্রায় দু' এক মাস লাগল। শরীর তখনও দুর্বল। ভাল করে ঘুম হয় না। দিনের বেলা ঘরের মধ্যে একটু-আধটু ঘোরা-ফেরা করি। কিন্তু একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

শেষকালে অনেক কষ্টের পর একদিন সুস্থ হয়ে উঠলাম।

সেদিন দুপুরবেলা সবাই যখন ঘুমোচ্ছে তখন আর থাকতে পারলাম না। মনটা কেমন ছটফট করতে লাগল। টিপি-টিপি পায়ে সদর দরজাটা খুলে রাস্তায় বেরোলাম। তারপরে টলতে টলতে গিয়ে হাজির হলাম শাশ্বতদের বাড়িতে।

বাইরে থেকে ডাকতে লাগলাম, "মাসিমা, ও মাসিমা—"

দরজার কড়া-নাড়া শুনে কে একজন বাইরে বেরিয়ে এল। একেবারে অচেনা মুখ। জিজ্ঞেস করলে, "কে?"

আমি বললাম, "মাসিমা, মাসিমা বাড়িতে নেই?"

মহিলাটি তবু বুঝতে পারলেন না, বললেন, "কার মাসিমা? কোন মাসিমা?"

আমি বললাম, "এখানে শাশ্বত থাকে না? শাশ্বত আমার বন্ধু, আমরা একই ইস্কুলে একই ক্লাসে পড়ি। তারা তো এই বাড়িতেই থাকত। সে নেই?"

মহিলাটি বললেন, "তারা দুমাস আগে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। বাড়িওয়ালা তাদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে। আমরা এ-বাড়িতে নতুন এসেছি—"

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "তারা এ-বাড়ি ছেড়ে কোথায় গেছে বলতে পারেন?"

মহিলাটি বললেন, "না!" বলে দরজাটা দড়াম করে আমার মুখের ওপরেই বন্ধ করে দিলেন।

আমি আর কী করব! খানিকক্ষণ সেখানেই হতভম্বের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। শরীর তখন আমার আরও টলছে। তাহলে কি যা ভয় করেছিলাম তাই-ই হয়েছে? তাদের কি বাড়িওয়ালা শেষ পর্যন্ত জোর করে তাড়িয়ে দিয়েছে!

বাড়ির দিকে যাব কি না ভাবছি। কিন্তু ভয় হচ্ছিল যদি রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে পড়ে যাই?

দেখলাম একজন লোক আসছে রাস্তা দিয়ে।

জিজ্ঞেস করলাম, "হ্যাঁ মশাই, বলতে পারেন এখানে এই বাড়িতে যারা থাকত, তারা কোথায় গেল?"

ভদ্রলোক বললেন, "আমি এ-পাড়ার লোক নই, আমি অন্য পাড়ায় থাকি, এ-পাড়ার খবর আমি বলতে পারব না—" বলে ভদ্রলোক যে-দিকে যাচ্ছিলেন সেই দিকেই চলতে লাগলেন।

আমি সেই দুর্বল শরীর নিয়ে আর কোথায়ই বা যাব তখন, আর কাকেই বা জিজ্ঞেস করব। আস্তে-আস্তে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। কিন্তু শরীর তখনও টলছে। মাথাও ঘুরছে। তারপর হঠাৎ কী যে হল, মাথাটা বোঁ-বোঁ করতে লাগল। মনে হল যেন পড়ে যাব।

তারপর আর কিছু মনে নেই।

*

তারপর যখন চোখ খুললাম, দেখি ডাক্তারবাবু আবার আমার সামনে বসে আমার বুক পরীক্ষা করছেন। আমার বাবা-মা-দাদা-রাও পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন।

তাঁদের কথাবার্তা থেকেই জানতে পারলাম যে, আমি নাকি রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। কারা বুঝি সেই অবস্থায় আমাকে দেখতে পেয়ে বাড়িতে এনে তুলে দিয়ে গিয়েছিল।

আমি যে সেদিন বেঁচে গিয়েছিলাম এও আমার পরম সৌভাগ্য। তার পরদিন থেকে সবাই আমাকে সব সময় পাহারা দিত, যাতে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে কোথাও যেতে না পারি।

তারপর ক্রমে-ক্রমে সুস্থ হয়েছি। আবার স্কুলে যেতে শুরু করেছি। পৃথিবী তার আপন নিয়মে ঘুরতে-ঘুরতে কত বছর এই সূর্যটাকে প্রদক্ষিণ করেছে। তারপর জীবন-চক্রের নাগর-দোলায় চেপে আরও কত দীর্ঘ সময় কেটে গেছে। আমরাও সেই আর আগেকার পাড়ায় নেই। আমার বাবা-মাও মারা গেছেন। আমরা ভাই-ভাই আলাদা হয়ে গিয়েছি। কোথায় রইল সেই শাশ্বত আর কোথায় রইল সেই মাসিমা—তাদের খবর রাখবার সুযোগ বা ইচ্ছে কোনওটাই আর হয়ে ওঠেনি।

হঠাৎ এত বছর পরে আমার অফিসে শাশ্বতকে দেখে তাই একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, "আমার খবর কী করে পেলি তুই?"

শাশ্বত চা খেতে-খেতে বললে, "আজকাল তোর নাম কে-না জানে। যে-কোনও লোককে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে।"

আবার জিজ্ঞেস করলাম, "মাসিমা কেমন আছেন?"

শাশ্বত বললে, "কোনও মানুষ কি এতদিন বাঁচে? আমি মাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি ভাই। মা মুখ বুজে সমস্তই সহ্য করে গিয়েছেন। এ দুঃখ আমার যাবে না।"

বললাম, "তা এতদিন পরে আমার কাছে তোর কী উদ্দেশ্যে আসা, তাই বল—"

শাশ্বত বললে, "আজও তোকে মিথ্যে বলেছি, ভাই। ছেঁড়া জামা আর প্যান্ট পরে তোকে ধোঁকা দিয়েছি। এখন আর আমি গরিব নই। একটা বাড়ি করেছি, সেইজন্য..."

"বাড়ি? নতুন বাড়ি?"

"হ্যাঁ, সেই বাড়ির গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে একটা ছোটখাট উৎসবের আয়োজন করেছি। তোকে সেদিন আসতে হবে।"

"কবে?"

"আসছে বুধবার।" বলে আমার দিকে একটা ছাপানো কার্ড এগিয়ে দিলে। দেখলাম ঠিকানাটা বালিগঞ্জের রাসবিহারী এভিনিউয়ের ওপর।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। এ নিশ্চয়ই খুব বড় বাড়ি। বললাম, "কত খরচ পড়ল রে বাড়ি তৈরি করতে?"

শাশ্বত বললে, "প্রায় পাঁচ লাখ টাকার কাছাকাছি—একটা পুরোনো বাড়ি ছিল আগে, সেটা দু'লাখ টাকায় কিনে ভেঙে ফেলেছিলাম, তারপর সেই জমির ওপর নতুন বাড়ি তৈরি করাতে লাগল আরও তিন লাখ টাকা। এই হল মোট পাঁচ লাখ টাকা!"

আমি যেন আমার চোখের সামনে তখন সর্ষেফুল দেখছি! যে শাশ্বতরা একদিন দশ টাকা করে মাসে বাড়ি-ভাড়া দিতে না পারার জন্যে বাড়ি থেকে উৎখাত হয়ে গিয়েছিল সেই শাশ্বতই কি এই শাশ্বত! মনে হল আমি যেন আরব্য উপন্যাসের কাহিনী শুনছি।

বললাম, "কী করে এ-রকম হল রে? তুই তো স্কুল ছেড়ে দিয়েছিলি—"

শাশ্বত বললে, "তুই জানিস না বোধহয় আমাদের একদিন দশ-টাকা বাড়ি-ভাড়া দেবার মতো ক্ষমতা ছিল না। আমাদের বাড়ি-ভাড়ার টাকাও একদিন তুইই দিয়ে দিয়েছিলি, আমার স্কুলের খাতাতে আমার নাম কাটা যাবার পরও তুই-ই ছমাসের মাইনে দিয়ে দিয়েছিলি।"

বললাম, "তুই জানতে পেরেছিলি সে-কথা?"

শাশ্বত বললে, "জানব না কেন? কিন্তু ভাই আমি সেই লজ্জাতেই তোর সঙ্গে আর দেখা করতুম না।"

বললাম, "কিন্তু তাতে লজ্জা কিসের?"

শাশ্বত বললে, "আমি তোর সামনে যত রাজ্যের মিথ্যে কথা বলতুম, তাইই তো বড় লজ্জা করত আমার। আমার মা নাজিরদের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতেন, তাতেও আমার বড় লজ্জা হত। আমি তাই মাকে খুব বকতাম। বলতাম, কেন তুমি বিনুকে সব কথা খুলে বলে দাও? আমার মা শুনে বলতেন, বলতে লজ্জা কিসের তাতে? আমরা তো নিজের দোষে গরিব হইনি। ভগবান আমাদের গরিব করলে আমরা কী করব।"

একটু থেকে শাশ্বত আবার বলতে লাগল, "দ্যাখ, ছোটবেলায় আমি কত বোকা ছিলুম। গরিব হওয়ার মধ্যে যে লজ্জার কিছু নেই, সেটা তখন বুঝতাম না ভাই। তাই তোদের চোখে উঁচু হয়ে থাকবার জন্যে কেবল বড়-বড় কথা বলে তোদের ধাপ্পা দিতুম। তোকে কতবার বলেছি পুলিস-কমিশনার আমার মামা, সে-কথা তোর মনে আছে?"

বললাম, "খুব মনে আছে।"

"তখন তুই আমার কথা শুনে কী ভাবতিস?"

বললাম, "আমি তোর কথা সব বিশ্বাস করতুম প্রথম-প্রথম।"

"তারপরে?"

বললাম, "তারপর তোর মুখে বড়-বড় কথা শুনে আমার বড় দুঃখ হত তোর জন্যে। তুই জানিস না আমি তোকে কত ভালবাসতুম! তোর জন্যে ভেবে ভেবে আমার অসুখ করে গিয়েছিল। আমার বাবা-মার কাছেও সে জন্যে কতবার কত বকুনি খেয়েছি। শেষ পর্যন্ত একদিন বাবা আমাকে আমার ঘরের মধ্যে পুরে বাইরে থেকে তালা-চাবি বন্ধ করে দিলেন, যাতে আমি তোদের বাড়ি না যেতে পারি। আর সেই রাত্রেই আমার এমন অসুখ হল যে, দেড়মাস আমি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারিনি। তারপর একদিন লুকিয়ে-লুকিয়ে তোদের বাড়িতে তোকে খুঁজতে গেলুম, দেখি তোরা সে-বাড়িতে আর নেই। তার আগেই বাড়িওয়ালা তোদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে।"

শাশ্বত বললে, "সেদিন খুব কষ্ট গেছে ভাই আমাদের। একে মার শরীর খারাপ, তার ওপর কোর্টের পেয়াদা আর পুলিস এসে

আমাদের ঘরের সব জিনিসপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিলে। মনে আছে মা সেদিন রাস্তায় বসে পাড়ার সমস্ত লোকের চোখের সামনে হাউ-হাউ করে কেঁদেছিলেন—"

কথাগুলো বলতে-বলতে শাশ্বতর চোখ-দুটো ছল-ছল করে উঠল।

জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর কোথায় গিয়ে উঠলি তোরা?"

এর জবাবে শাশ্বত যা বললে, তা যেমন করুণ তেমনি মর্মান্তিক। সেদিন সে-বস্তি ছেড়ে আর-একটা বস্তিতে গিয়ে উঠল মা আর ছেলে। সেটা ঘর নয়, সেটাকে ঘর না বলে রাস্তা বললেই ঠিক বলা যায়। মায়ের কষ্ট দেখে শাশ্বতরও সেদিন যে-শিক্ষা হয়েছিল তাই-ই তাকে ভবিষ্যতের সঠিক রাস্তা দেখিয়েছিল। সেই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মায়ের একদিন খুব জ্বর হল। শাশ্বতর কাছে তখন একটাও পয়সা নেই যে, ডাক্তার ডেকে দেখায়। মা বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন। শেষকালে বস্তির লোকদের কাছ থেকে পয়সা ভিক্ষে করে কোনওরকমে কয়েকজনের হাতে-পায়ে ধরে মাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে সৎকার করে এল।

জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর?"

শাশ্বত তারপর সংসারে একেবারে একলা হয়ে গেল। তখন মাথা গোঁজবার মতো, অবলম্বন করবার মতো একটা আশ্রয়ও নেই তার। সে তখন সত্যিকারের নিঃসহায়, নিঃসম্বল। সে একদিন নিরুদ্দেশ যাত্রা আরম্ভ করল। হাওড়া স্টেশনে গিয়ে দেখলে একটা ট্রেন ছাড়ছে। সেই ট্রেনেরই একটা কামরায় সে উঠে বসল। ভোরবেলা ট্রেনটা গিয়ে পৌঁছল কাশীতে। স্টেশনে নেমে সকলের নজর এড়িয়ে শহরের মধ্যে গিয়ে পৌঁছল। হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে পৌঁছেছে।

সেখানে তখন অনেক লোক গঙ্গায় স্নান করছে। সকাল-বেলার গঙ্গা। লোকে বললে তার নাম দশাশ্বমেধ ঘাট। কেউ স্নান করছে। কেউ ভিক্ষে করছে। শাশ্বতও গিয়ে দাঁড়াল তাদের মধ্যে। এক জায়গায় ভীষণ ভিড়। সেখানে একজন বিধবা মহিলা ভিখিরিদের কচুরি বিলোচ্ছেন।

শাশ্বত নিজেও সেখানে হাত পেতে দাঁড়াল। তার হাতেও দুখানা কচুরি পড়ল।

অনেক দিন পরে শাশ্বতর পেটে কিছু পড়ল। সেই দশাশ্বমেধ ঘাটেই সে-দিনটা কাটল। কিন্তু তারপর? তারপর কী করে পেট চলবে?

কিন্তু পরের দিনও সেই মহিলাটি আবার এসে কচুরি বিলোতে লাগলেন। সেদিনও কচুরি নিয়ে খেল শাশ্বত। তারপর যখন মহিলা স্নান করে বাড়ি ফিরছেন তখন শাশ্বত তাঁর পিছু নিলে।

মহিলাটি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কে তুই?"

শাশ্বত সেদিন প্রথম সত্যি কথা বললে। বললে, "মা আমি একজন গরিবের ছেলে। সংসারে আমার কেউ নেই—"

মহিলাটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কী চাস তুই?

শাশ্বত বললে, "আমি আপনার সেবা করতে চাই মা।"

"সেবা?"

শাশ্বত বলে, "আমি শুধু আপনার কাছে থাকব আর আপনার সেবা করব। তার বদলে আমাকে দুটি খেতে দেবেন।"

শাশ্বত বলতে লাগল, "সেই-ই প্রথম জানলুম ভাই যে মিথ্যে বড়াই করে বড়লোক সাজার চেয়ে সত্যি কথা বলে ছোট হলেই জীবনে লোকের কাছ থেকে বেশি ভালবাসা পাওয়া যায়।"

তারপর সেই মহিলার সঙ্গে শাশ্বত তাঁর বাড়িতে গেল। সেখানে গিয়ে নিজের দারিদ্র্যের সব কাহিনী অকপটে বলে গেল। সেদিন থেকে সেই বাড়িতেই সে থেকে গেল। আর তার বদলে দুটি খেতে পেলে।

আমি চুপ করে শাশ্বতর সব কথা শুনছিলাম। বললাম, "তারপর?"

শাশ্বত বললে, "তারপর জানি না কী করে কী হল। সমস্ত কথা বলবার এখন সময় নেই। পরে একদিন বলব। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সেই কাশীতেই আমি আমার জীবনের চরম শিক্ষা পেয়ে গেলাম।"

"কী করে?"

শাশ্বত বললে, "ওখানকার এমন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হল যাঁর বাড়িতে অনেক বই। আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে বই পড়তে আরম্ভ করলাম, যত বড় লোকের জীবনীগুলো পড়তে-পড়তে একটা জিনিস লক্ষ করলাম যে, গরিব হওয়া লজ্জারও জিনিস নয়, আর অপমানেরও জিনিস নয়। সব বড়-বড় লোক প্রথম জীবনে গরিবই ছিলেন, তারপর ঘা খেয়ে খেয়ে পরে বড় হয়েছেন। ওইগুলো পড়ে আমি বুকে খুব সাহস পেলাম ভাই। তখন থেকে আমার মনে একটা ধারণা হল যে, জীবনে হতাশ হওয়াটাই সবচেয়ে বড় পাপ। একদিন বুড়ি-মায়ের কাছ থেকে ছ'আনা পয়সা চেয়ে নিয়ে একটা ঝুড়ি কিনে নিলাম বাজার থেকে। সেই ঝুড়িতে করে ছোলাভাজা বিক্রি করতে শুরু করলাম।"

আমি বললাম, "তোর লজ্জা করল না?"

শাশ্বত বললে, "না, তখন থেকে লজ্জা করা ছেড়ে দিলাম, সত্যি কথা বলা শুরু করলাম। আমার বুড়ি-মাকে সব কথা খুলে বললাম। বুড়ি মাও বললেন—খুব ভাল করেছিস। সঙ্গে-সঙ্গে রোজ একবার বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়ে প্রণামও করে আসবি। তাহলে দেখবি, তোর খুব উন্নতি হবে পরে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর?"

শাশ্বত বলতে লাগল, "তারপর সেই ছ'আনা পয়সা দিয়ে ঝুড়ি কিনে ছোলাভাজার ব্যবসা থেকে শেষকালে আজ আমি বড়বাজারে মস্ত বড় আড়তদার। আমি এখন লাখ-লাখ টাকার মাল সাপ্লাই করি ফরেন কাম্পিতে। আমার অফিসে এখন দেড়শো লোক খাটে। কিন্তু আমি এখনও বুড়ি-মায়ের সেই উপদেশ মেনে চলেছি। আমি এখনও এইরকম সাদাসিধে পোশাক পরে চালাচ্ছি, মিথ্যে কথাও বলি না, বাজে লজ্জাও আমার নেই—"

"কিন্তু মিথ্যে কথা না বলেও কি ব্যবসা করে বড়লোক হওয়া যায়?"

শাশ্বত বললে, "বড় হওয়া যে যায় তা তো আজ আমি নিজের জীবন দিয়েই প্রমাণ করে দিয়েছি। এইটুকু সময়ের মধ্যে সব কথা বলা যাবে না। অন্য একদিন বলব তোকে সব। আমার অফিসে একদিন তোকে নিয়ে যাব। তাহলে আসছে বুধবার দিন আমার গৃহপ্রবেশের ব্যাপারে যাচ্ছিস তো?"

বললাম, "নিশ্চয় যাব।"

শাশ্বত চলে গেল। আমি আমার অফিসের জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলাম একটা দামি গাড়িতে গিয়ে উঠল শাশ্বত। সেই সাদাসিধে পোশাক, সেই সাধারণ চেহারা। মনে হল ওকে যেন ওই গাড়িতে মোটেই মানাচ্ছে না।

✱

ঠিক দিনে ঠিক সময়ে শাশ্বতর দেওয়া কার্ডের ঠিকানা দেখে সন্ধেবেলা যথাস্থানে পৌঁছে আমি আরও অবাক। এ কী করেছে শাশ্বত! এ যে একেবারে রাজসূয় ব্যাপার। সত্যিই কি শাশ্বত যা বলেছে সব সত্যি? আজকালকার যুগে তো সবাই বলে ধাপ্পা-বাজি না করলে বড় হওয়া যায় না। যত দিন যাচ্ছে ততই তো এ-ধারণাটা লোকের মনে দৃঢ় হয়ে যাচ্ছে। সবাই তো বলে এ-যুগ ধাপ্পাবাজির যুগ, মিথ্যে কথার যুগ, ট্যাক্স ফাঁকি দেবার যুগ। তাহলে শাশ্বতর এ-সব হল কী করে? সৎপথে থেকেও কি এত ঐশ্বর্য করা যায়? আমার বড় সন্দেহ হল। নাকি শাশ্বত আমাকে যা বলে গিয়েছিল সব মিথ্যে?

নতুন বাড়ি। পুরনো বাড়িটা দু' লাখ দিয়ে কিনে, তারপর সেই জমিতে আরও তিন লাখ টাকা খরচ করে এই বাড়িটা করেছে।

সামনে অসংখ্য গাড়ির সার। অভ্যাগত নিমন্ত্রিতদের ভিড়। তার মধ্য দিয়ে সামনের দিকে এগোতে লাগলুম। কোথাও কোনো চেনা মুখ দেখতে পাচ্ছি না। তবু এগিয়ে চলেছি।

হঠাৎ পেছন থেকে আমার নাম ধরে কে আমায় ডাকলে।

আমি পিছন ফিরেই দেখি শাশ্বত। সেই একই সাদাসিধে পোশাক, সাধারণ ধুতি-পাঞ্জাবি চটি। দেখি চোখদুটো জলে ভরে গিয়ে ছল-ছল করছে।

আমার দিকে চেয়ে শাশ্বত একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, "তুই এসেছিস? আমি খুব খুশি হয়েছি ভাই।"

আমি বললাম, "তোর এ রকম চেহারা হয়েছে কেন? শরীর খারাপ নাকি?"

শাশ্বত বললে, "না, ও কিছু নয়—"

বলে এক হাত দিয়ে চোখদুটো মুছে নিয়ে বললে, "সেই সবই শেষ পর্যন্ত হল ভাই, কিন্তু আমার মনে তেমন আনন্দ নেই।"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কেন রে?"

শাশ্বত বললে, "আজ কেবল আমার মার কথা মনে পড়ছে ভাই। শেষ পর্যন্ত সব কিছু হল আমার, কিন্তু যিনি এ-সব দেখলে সবচেয়ে খুশি হতেন, সেই মা-ই আজ আর নেই, মা কিছুই দেখে যেতে পারলেন না।"

ছবি অনুপ রায়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রায় চৌদ্দ পুরুষের বসতবাড়িটা দারুব্রহ্মবাবুকে বিক্রি করে দিতে হচ্ছে। বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই ভাল। একে তো এত বড় বাড়ি কেনার খদ্দের নেই, তার ওপর যদি বা খদ্দের জোটে তারা ভাল দাম দিতে চায় না। বলে, এই অজ পাড়াগাঁয়ে ও বাড়ি কিনে হবেটা কী? কথাটা সত্যি। তবে বহুকাল আগে এ গ্রাম ছিল পুরোদস্তুর একখানা শহর। এই বাড়িতে দারুব্রহ্মের যে ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ বাস করতেন তিনিই ছিলেন এই জঙ্গলের রাজা। তখনকার আস্তাবল, দ্বাদশ শিবের মন্দির, পদ্মদিঘি, দেওয়ান ই আম, দেওয়ান ই খাস, নহবতখানা, শিশমহল সবই এখনো ভগ্নদশায় আছে। ফটকের দুধারে মরচে-পড়া দুটো কামানও। এতদিনে খদ্দের পাওয়া গেছে।

দারুব্রহ্মের অবস্থা খুবই খারাপ। এবেলা ভাত জুটলে ওবেলা খুদও জুটতে চায় না। নিজে বিয়ে করেনি। বাপের একমাত্র সন্তান। বাপ গত হয়েছেন, সুতরাং বুড়ি মা আর তাঁর দুমুঠো জুটে যাওয়ার কথা, কিন্তু বংশের নিয়ম মানতে হয় বলে এক পাল অপোগণ্ড নিষ্কর্মা আত্মীয়-স্বজনকে ঠাঁই দিতে হয়েছে। তারা দিন-রাত চেঁচামেচি করে মাথা ধরিয়ে দেয়। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই দারুব্রহ্মের চুল পাকতে লেগেছে, আশা-ভরসা গেছে। বুড়ি-মা বিয়ের জন্য মেয়ে দেখে রেখেছেন। কিন্তু মেয়ের বাপ এই হাড়-হাভাতের হাতে মেয়ে দিতে রাজি নন। অপমানটা খুব লেগেছে দারুব্রহ্মের। বাড়ি কেনার খদ্দের জুটে যাওয়ায় খানিকটা নিশ্চিন্ত। হাজার পঞ্চাশেক টাকা পেলে মায়ে পোয়ে কাশীবাসী হবে, ঠিক করেই রেখেছে।

শেষবার চৌদ্দ পুরুষের বসতবাড়িটা ঘুরে-ঘুরে দেখছিল দারুব্রহ্ম। ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ সত্যব্রহ্ম ছিলেন দারুণ মেজাজি। একটা মশা সেবার তাঁর নাকে হুল ফোটানোয় রেগে গিয়ে তিনি মশা মারতে কামান দাগার হুকুম দেন। কিন্তু তোপদার এসে খবর দিল, কামানের মশলা নেই। সত্যব্রহ্ম তখন বললেন, কুছ পরোয়া নেই। বন্দুক আনো। শোনা যায়, কম-সে-কম শতখানেক গুলি চালানোর পর মশাটা বাস্তবিকই মরেছিল। এখনো দরবার ঘরের দেয়ালে সেইসব গুলির জখম রয়েছে। দারুব্রহ্ম সেগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে একটা দুটো তিনটে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফেলল।

ঊর্ধ্বতন নবম পুরুষ পূর্ণব্রহ্মের খুব শিকারের শখ ছিল। তাই বলে জঙ্গলে-টঙ্গলে গিয়ে ঘোড়ার পিঠে বা মাচানে বসে শিকার করতেন না। খুব আমুদে অলস লোক। দোতলা থেকে নীচে নামতে হলেই গায়ে জ্বর আসত। তিনি দোতলায় একটা আলাদা ছাদ তৈরি করে মাটি ফেলে জঙ্গল বানিয়ে নিয়েছিলেন। সেখানে আগে থেকে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখা শেকলে-বাঁধা বাঘ থাকত। তিনি জঙ্গলে ঘুরে-ঘুরে বাঘের দেখা পেলেই গুলি করতেন। আর বাঘটাও লুটিয়ে পড়ত। অবশ্য সবাই জানত বন্দুকে ভরা গুলিটা আসলে ফাঁকা গুলি। আর বাঘটা ছিল পোষা। সেই এক বাঘই কত বাঘের মরণ মরেছে। দোতলায় উঠে দারুব্রহ্ম সেই জঙ্গলের ধ্বংসাবশেষের দিকে চেয়ে থাকে। দীর্ঘ-শ্বাসের ঝড় বইতে থাকে।

ঊর্ধ্বতন তৃতীয় পুরুষ কৃষ্ণব্রহ্ম ছিলেন পালোয়ান। দু'হাতে দু'মন ওজনের দুটো মুগুর ঘুরিয়ে রোজ দুবেলা ব্যায়াম করতেন। সেই মুগুর দুটো দোতলার সিঁড়ির মুখেই রাখা। দারুব্রহ্ম মায়াভরে সে দুটোকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে চোখ বুজে রইল কিছুক্ষণ।

তিনতলার সব ঘর বহুকাল হল তালাবন্ধ। ছাদ ফেটেছে, জানালার শিক আছে তো পাল্লা নেই। পাল্লা থাকলে শিক নেই। বাদুড় চামচিকের বাসা। যত রাজ্যের পুরনো জিনিসের আবর্জনা ডাঁই করে রাখা। শেষবারের মতো সবকিছু দেখে নেওয়ার জন্য দারুব্রহ্ম তালা খুলে ঢুকে পড়ল। কাঠের সিন্দুক, দেয়াল আলমারি, ভাঙা ঝাড়লন্ঠন, পুরনো নাগরা, ভাঙা খাট, কত কী চারদিকে ছড়ানো।

কাঠের সিন্দুক খুলে এটা-সেটা নাড়াচাড়া করছিল দারুব্রহ্ম আর এটা-সেটা ভাবছিল। এমন সময় হাত ফসকে কী একটা যেন মেঝেয় পড়ে গেল। একটু চমকে উঠল দারুব্রহ্ম। চমকাবারই কথা। জিনিসটা পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা ঝলকানি আর সেই সঙ্গে খানিক ধোঁয়া বেরোলো। দারুব্রহ্ম জিনিসটা কুড়িয়ে নিতে গিয়ে দেখে, সেটা একটা প্রদীপ। প্রদীপটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবছে, চোখে পড়ল ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা সামনেই পাকিয়ে পাকিয়ে একটা লম্বা রোগা সুঁটকো লোকের চেহারা নিচ্ছে।

"কে রে?" দারুব্রহ্ম চেঁচিয়ে ওঠে।

লোকটা গোটা চারেক হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বলল, "আমি? আমি হচ্ছি প্রদীপের দৈত্য।"

দারুব্রহ্ম হাঁ। ব্যাটা বলে কী? সে বলল, "ইয়ার্কির জায়গা পাওনি? দিনে-দুপুরে ব্যাটা চুরির মতলবে বাড়িতে ঢুকে বসে আছ।"

লোকটা ভয় খেয়ে বলে, "সত্যি না। অনেককাল কেউ ডাকা-ডাকি করেনি বলে বেশ হাজার দেড়েক বছর একটানা ঘুমিয়ে এই উঠলাম। চুরি-টুরি কিছু হয়ে থাকলে আমি কিন্তু জানি না।"

দারুব্রহ্ম সাহসী বংশের লোক। সহজে ভয় খায় না। তবে সে বুঝল, লোকটা গুল দিচ্ছে না। প্রদীপটাও আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ হতে পারে। তার বংশের অনেকেরই নানা বিদঘুটে জিনিস সংগ্রহের বাতিক ছিল। সে বলল, "বটে? তা তোর কাজটা কী?"

আবার গোটা কয়েক হাই তুলে বিশুদ্ধ বাংলাতেই লোকটা বিরস মুখে বলল, "আমার আবার কাজ কী? দেড় হাজার বছর পরে ঝুটমুট কাঁচা ঘুমটা ভাঙালেন, এখন যা করতে বলবেন তাই করতে হবে। কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি, প্রথমেই শক্ত কাজ দেবেন না, আমার এখনো ঘুমের রেশ কাটেনি। গা ম্যাজ-ম্যাজ করছে।"

দারুব্রহ্ম বুঝল, এ ব্যাটা আলাদীনের সেই দৈত্যই বটে, তবে ফাঁকি মারার তাল করছে। সে বলল, "বাপু হে, অত রোয়াব দেখালে কি চলে? বরাবর অনেক বড়-বড় কাজ করে এসেছ, সব খবর রাখি। এখন পিছোলে চলবে কেন?"

লোকটা ব্যাজার হয়ে বলে, "সে করেছি, কিন্তু বহুকাল অভ্যাস নেই কিনা। তাছাড়া ঘুমোলে হবে কী, খাওয়া তো আর জোটেনি। দেড় হাজার বছর টানা উপোস। শরীরটা দেখুন না কেমন শুকিয়ে গেছে। আগে বরং কিছু খাবার-দাবার ছিল।"

"তারপর?"

"তারপর যা বলবেন একটু-আধটু করে দেব।"

দারুব্রহ্ম লোক খারাপ নয়। দৈত্যটার সুড়ুঙ্গে চেহারা দেখে তার কষ্টও হল। বলল, "চলো, দেখি মুড়িটুড়ি কিছু পাওয়া যায় কিনা।" বলে লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে নীচে নামল দারুব্রহ্ম। বাড়ির কেউই লোকটাকে দেখে তেমন গা করল না। গা করার মতো কিছু নেই। দারুব্রহ্ম তাকে নিজের ঘরে নিয়ে ধামা ভরে মুড়ি আর বাতাসা খাওয়াল। সব-শেষে দেড় ঘটি জল খেয়ে লোকটা বলল, "এ যা খাওয়ালেন এতে তো একটা ঢেকুরও উঠবে না। যাকগে, ওবেলা কী রান্না হবে?"

দারুব্রহ্ম একটা শ্বাস ফেলে বলল, "একদিন এ বাড়ির অতিথিরা মাংস-পোলাও খেয়ে একটা করে মোহর দক্ষিণা নিয়ে যেত। সেদিন তো আর নেই। যদি ওবেলা হাঁড়ি চড়ে তবে দুটো ডাল-ভাত জুটতে পারে।"

লোকটা মন খারাপ করে বলল, "ডাল-ভাত। ছোঃ।"

দারুব্রহ্ম হেসে ফেলে বলল, "তুমি দেখি উলটো কথা বলতে লেগেছ। প্রদীপের দৈত্যই কোথায় খাবার-দাবার জোগাড় করে আনবে, তা না তুমিই উলটে চাইতে লাগলে।"

লোকটা জবাব দিল না। ধোঁয়া হয়ে প্রদীপের মধ্যে মিলিয়ে গেল। রাত্রে সকলের খাওয়া হয়ে গেলে দারুব্রহ্ম প্রদীপটা ঠুকে আবার দৈত্যটাকে জাগায়। দৈত্যটা চারজনের খোরাক একা খেয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, "আমার খোরাকটা একটু বেশিই। তা ভরপেট না হলেও ক্ষতি নেই কিন্তু একটা ঢেকুর তো উঠবে। এতে তো একটা ঢেকুরও উঠল না।" একটা হাই তুলে "যাই ঘুমোই গিয়ে" বলে দৈত্যটা আবার প্রদীপের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল।

পরদিন দেখা গেল, দৈত্যকে একবেলা খাওয়াতে গিয়েই চালের ডোল ফাঁকা হয়ে গেছে। দারুব্রহ্ম ভাবল, আহা বেচারা। কতকাল খায়নি। একদিন তো ব্যাটার কাছ থেকে সুদে-আসলে সবই উশুল করব, কদিন বরং পেট ভরে খাক।

দারুব্রহ্ম পুরনো সব দলিল-দস্তাবেজ বের করে খুঁজতে-খুঁজতে সন্ধান পেল, চৌমারির চরে তাদের কিছু জমি বহুকাল ধরে আছে, কিন্তু খাজনা বা ফসল আদায় হয়নি। একটা তেলকলের অংশিদারিরও সন্ধান পেল। খুঁজে পেতে দেখল, পুরো একটা তহসিলের খবরও সে এতকাল রাখত না। ছেঁড়া ছাতা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়ল দারুব্রহ্ম। দাগ-নম্বর ধরে-ধরে খুঁজে-পেতে জমির সন্ধান পেল। প্রজারা তাকে দেখে প্রথমে একটু বেগড়বাই করলেও স্বীকার করল যে, বহুকাল তারা খাজনা বা ফসল দেয়নি। বাবা-বাছা বলে তুতিয়ে-পাতিয়ে তাদের কাছ থেকে দারুব্রহ্ম কিছু আদায় করার চেষ্টা করছিল। এমন সময় মোড়ল চোখ মুছতে-মুছতে এসে বলল, "জমির মালিককে বঞ্চিত করেছি বলেই আমাদের ঘরে লক্ষ্মী নেই। আপনি যান। আমরা নিজে থেকেই পৌঁছে দেব যা দেওয়ার।"

দারুব্রহ্ম তেলকলে গিয়ে দেখল সেটা বেশ রমরম করে চলছে। দারুব্রহ্ম কাগজপত্র বের করে তার দাবি-দাওয়া জানাতেই তেলকলের মালিক মূর্ছা গেল। ভেঙে উঠে বলল, "দলিলে দেখছি আপনি দশ আনার মালিক। তবে আমার থাকবে কী? যাকগে, এসব তো জানা ছিল না। কবেকার কথা সব। এখন একটা বন্দোবস্ত করা যাবে। আপনি যান।"

তহসিলটাও দারুব্রহ্মকে হতাশ করল না। প্রজারা বলল, আমরা কি জানি ছাই যে, এ-জমিরও মালিক আছে। তবে আমরা নিমকহারাম নই, বঞ্চিত করব না।

দিন দুই বাদে দারুব্রহ্ম বাড়িতে ফিরে দেখে চারটে গরুর গাড়ি বোঝাই ধান, দু কলসি কাঁচা টাকা আর আনাজপাতি, তেল মশলা সব এসেছে। সেদিন দারুব্রহ্ম বড়াতি দশজনের রান্না রাঁধিয়ে প্রদীপ ঠুকে দৈত্যকে বের করে বলল, "খাও বাপু, পেট ভরে খাও। এ-বাড়িতে অতিথির ঢেকুর ওঠে না, এ-কথা শুনলে আমার পূর্বপুরুষরা স্বর্গ থেকে অভিশাপ দেবে।"

কিন্তু উঠল কই? দশজনের ভাত সাবাড় করে দৈত্য করুণ মুখে বলল, "বটে?"

দারুব্রহ্ম হাঁ হয়ে গেল।

রাত্রিবেলা বিশজনের খোরাক শেষ করেও কিন্তু দৈত্য ঢেঁকুর তুলল না। সাতদিনে চার গরুর গাড়ির চাল শেষ। বাড়ি-সুদ্ধ লোক জেনে গেছে যে, এত খেয়েও দৈত্যটার ঢেঁকুর উঠছে না। তারা রোজ দুবেলা এসে খাওয়ার সময় দৈত্যকে ঘিরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে, কবে কখন ঢেঁকুর ওঠে। কিন্তু উঠল না। কিন্তু ঢেঁকুর না উঠলেও পাহাড়-প্রমাণ খাওয়ার ফলে কদিনের মধ্যেই সুস্থ দৈত্যটার চেহারা পুরোপুরি ঘটোৎকচের মতো হয়ে উঠল। মুগুরের মতো হাত, পাটাতনের মতো বুক, মুলোর মতো দাঁত, তালগাছের মতো লম্বা।

দারুব্রহ্মেরও জেদ চেপেছে। তাদের এত বড় রাজবংশে একটা পুঁচকে দৈত্য এসে খেয়ে ঢেঁকুর তুলছে না—এ কেমন কথা? এ বাড়িতে ভোজ খেয়ে লোকে পাক্কা দেড়দিন মেঝেয় পড়ে থাকত। গুরুজন ভোজ খেয়ে গঙ্গাযাত্রায় পর্যন্ত গেছে। সেই বাড়ির এই অপমান?

দারুব্রহ্ম নাওয়া-খাওয়া ভুলে আদায় উশুল করতে লাগল। তেলকলের ভার নিজে নিল। আরও সব নতুন নতুন কারবার খুলতে লাগল। গাড়ি-গাড়ি চাল আসছে বাড়িতে, বস্তা-বস্তা আনাজ, ঘি, দুধ, দৈ। এ সবই একদিন দৈত্যের ওপর দিয়ে উশুল হবে। আগে ব্যাটা ঢেঁকুরটা তো তুলুক।

এর মধ্যেই একদিন বাড়ির খদ্দের এসে হানা দিয়েছিল। তখন দুপুরবেলা, দারুব্রহ্ম প্রদীপ ঠুকে দৈত্যকে মাত্র খেতে ডেকেছে। দৃশ্যটা দেখে খদ্দের চেয়ারসুদ্ধ উলটে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।. তারপর থেকে আর আসেনি। কিন্তু বাড়ি বিক্রি এখন মাথায় উঠেছে দারুব্রহ্মের। বিক্রির মানেও হয় না। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপটা যখন হাতে পেয়েছে তখন আর অভাবও থাকবে না। খামোখা পূর্বপুরুষের ভিটে বিক্রি করবে কেন? সে তাই মিস্ত্রি ডেকে বাড়িটা মেরামত করাতে লাগল। সব খরচই উশুল হবে।

মৌরসি পাট্টায় আরও কিছু জমি নিল দারুব্রহ্ম। চাষবাস বাড়িয়ে ফেলল। কারবারগুলোও বেশ ফেঁপে-ফুলে চলছে। গোশালায় গরু, আস্তাবলে ঘোড়া, বাড়ির সামনে জুড়িগাড়ি। শুকনো বাগানে আবার গাছ লাগানো হল, তাতে ফুল ফুটল। বাড়িটা কলি ফেরানোর পর আবার ঝলমল করতে লাগল। এর মধ্যেই দারুব্রহ্মের জন্য যে মেয়েটি দেখা হয়েছিল তার বাবা এসে হাতজোড় করে বলল, "আমার মেয়েটি নিলে ধন্য হই।" তা তিনি হলেনও। নহবতখানায় সানাই বাজল, দারুব্রহ্ম বিয়ে করে এসে বিরাট ভোজ দিয়ে সাত গাঁয়ের লোককে খাওয়াল।

কিন্তু সাত গাঁয়ের লোকের মতো খাবার একা খেয়েও ব্যাটা দৈত্যটা কিন্তু ঢেঁকুর তুলল না। তবে বলল, "খিদেটা এবারে একটু কমেছে। পেটের জ্বলুনিটা তেমন নেই।" বলে ফের ঘুমোতে চলে গেল। নতুন বউয়ের সামনে এই অপমানে কান লাল হয়ে উঠল দারুব্রহ্মের। বলতে নেই সে এখন লাখোপতি। একটা দৈত্যের পেট ভরাতে পারবে না? পরদিন থেকে সে কাজকর্ম দ্বিগুণ করে দিল।

মাসখানেক বাদে সে একশো গাঁয়ের লোকের ভোজের আয়োজন করে দৈত্যটাকে ডাকল। খুবই লজ্জার সঙ্গে প্রকাণ্ড চেহারার বিকট দৈত্যটা এসে আসনে বসে। আচমন করে একটু ভাত মেখে মুখে দিয়েছে কি দেয়নি অমনি একটা বাজ পড়ার আওয়াজে আঁতকে উঠল সবাই। ঘড় ঘড়াত। ঘড়ঘড়াত। ঘড় ঘড়াত। পরপর তিনবার। অমনি চারদিকে হৈ-হুল্লোড় ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। বাচ্চারা হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল। তুলেছে। তুলেছে। দৈত্য ঢেঁকুর তুলেছে।

মাথা নিচু করে দৈত্যটা উঠে পড়ল। আঁচিয়ে যখন প্রদীপের মধ্যে ঢুকতে যাবে তখনই গিয়ে দারুব্রহ্ম তাকে ধরল, "এই যে বাপু। এই দিনটারই অপেক্ষা করছিলাম। ঢেঁকুর তো তুললে, এবার তো কাজকর্ম কিছু করতে হয়।"

দৈত্যটা অবাক হয়ে চেয়ে বলল, "আপনি হুকুম করলে সবই করতে হবে মালিক। কিন্তু কাজটা আর বাকি রেখেছেন কী? লোকে আমাকে পেলেই গাড়ি চায়, বাড়ি চায়, ধনদৌলত চায়। আমি দিইও। কিন্তু আপনার যা দেখছি,এর ওপরেও আমাকে কিছু করতে হবে নাকি?"

দারুব্রহ্ম কথাটা আগে ভেবে দেখেনি। এখন দেখল। বাস্তবিকই তার যা আছে তার ওপর আর-কিছু চাওয়ার মানেও হয় না। সে মাথা চুলকে বলল, "তা বটে। তবে কিনা—"

দৈত্যটা করুণ মুখ করে বলল, "যে-বাড়িতে খেয়ে আমার ঢেঁকুর ওঠে, বুঝতে হবে সে-বাড়ির ত্রিসীমানায় কোনো অভাব নেই। ঝুটমুট আমাকে আর খাটাবেন কেন? দেড় হাজার বছরের ঘুমটা আর কয়েক হাজার বছর চালাতে দিন। শরীরটা বড় ম্যাজ-ম্যাজ করছে।"

দারুব্রহ্ম একটা শ্বাস ফেলে বলল, "তাই হোক।"

দৈত্যটা প্রদীপের মধ্যে মিলিয়ে গেল। দারুব্রহ্ম সেটাকে আবার সাবধানে কাঠের সিন্দুকে ভরে রাখল।

খুকুর সকাল

সুনীল বসু

চোখ খুলে দেখি রোজ সোনালি পৃথিবী,
ফুলগুলো হেসে বলে, 'ও খুকু, কী নিবি?'
আমি বলি, 'ফুল নেব, শালিকের ছানা
লাল নীল প্রজাপতি, কাঁচপোকা-ডানা!'
সকালেই উঠে আমি করি লেখা-পড়া
সবচেয়ে ভাল্লাগে ছবি-আঁকা ছড়া।
বড়দিদি ডেকে বলে, 'বেড়াবি নে তুই,
ওই দেখ ভোরবেলা ফোটে কত জুঁই!
শিশিরের গুঁড়ো মেখে ছুটোছুটি করি
রোদ্দুর-রঙ মেখে আলোছায়া ধরি!'
ছোড়দিটা রোজ বলে, 'তুই ঘরকুনো,
শুধুই পারিস দিতে হাওয়া, ধুপধুনো,
তোকে দিয়ে হয় ভাল ঠাকুরের পুজো,
কর্পূর-গুঁড়ো দিয়ে জলে ভরা কুঁজো।'
ও বাড়ির কাকিমা তো সকালেই স্নান
সেরে-টেরে মেলে দেন শাড়ি টান-টান।
কী মজার কথা বলে খাঁচাটার টিয়া,
'দুধ-রুটি খেতে দে না, ও রামধনিয়া।'
রবিবার, তাড়া নেই, বাবা তাই ছাতে
এক মনে নিম-ডাল ঘষে যান দাঁতে।
কাঁসার বাটিটা এনে মা ডাকেন, 'খুকু
আয় সোনা খেয়ে যা তো এই দুধটুকু!
বাবাকেও ডেকে দিস—চা দিয়েছি তাঁর,
দুপুরে সারতে হবে পুজোর বাজার।'

ছবি : দেবাশিস দেব

ঝড়বৃষ্টি

আলোক সরকার

একটা ছিল ব্রহ্মদৈত্য
তার ছিল এক স্যাঙাত
নৃত্য শুরু করল যখন
হল বজ্রপাত।
হয়েছে তো বয়েই গেল।
ব্রহ্মদৈত্য বলে,
তাল দিচ্ছেন আকাশঠাকুর
মুখ ঢেকে কম্বলে।
নিকষ কালো কম্বলের
মাঝেমাঝেই জরি
ঝলমলানো সোনার ঝালর,
কত হাজার ভরি!
এদিক ওদিক ফুল ঝরছে
হাততালিও এক ক্রোর
অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে
দর্শকদের এনকোর।
বাঁ দিক হেলে ব্রহ্মদৈত্য
কোমর বাঁকায় স্যাঙাত
গীতিবাদ্যি সমান তালে.
হুড়মুড়িয়ে হঠাৎ
ঠ্যাং ভাঙলেন দত্যিমশায়,
দেখে আকাশঠাকুর
হো হো করে এমন হাসেন
বুক করে গুরগুর।

পেণ্টাগন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আমরা পাঁচ বন্ধু। আমি, শ্যামল, মলয়, সুখেন আর নিতু। পাড়ায় আমাদের নাম হয়েছে পেণ্টাগন। আমরা ছিলুম চারজন, নিতু আসায় চতুর্ভুজ পঞ্চভুজ হয়েছে। নিতু বিহারের ছেলে। ডেহরি-অন-শোনে বাড়ি ছিল। মা বাবা দু-জনেই মারা যাবার পর এখানে চলে এসেছে মামাদের কাছে। আমাদের মধ্যে নিতুকেই সবচেয়ে সুন্দর দেখতে। এক মাথা কোঁকড়া চুল। বিহারের জল হাওয়ায় সবল শরীর। যা খায় তাই হজম হয়। সর্দি নেই, কাশি নেই, জ্বর নেই, মাথা বাথা নেই। নিতুর অনেক গুণ। ভারী সুন্দর গান গায়। সুন্দর ছবি আঁকে। কখনও রেগে যায় না। রাগালেও রাগে না। হেসে সব ভুলিয়ে দেয়।

আমরা চারজন এক স্কুলে, একই ক্লাসে পড়ি। নিতু হঠাৎ বিহার থেকে চলে এসেছে। মামারা নিতুকে নিয়ে কী করবেন মামারাই জানেন। তিন মামার তিন রকম মত। বড় মামার স্টেশনারি দোকান। বড় মামা বলেন, নিতুকে ব্যবসা শেখাব। মেজমামা একটা কারখানায় কাজ করেন। তাঁর মত, সুযোগ পেলেই নিতুকে অ্যাপ্রেণ্টিস করে ঢুকিয়ে দোব। ছোট-মামার কোনও মত নেই। তিনি সেতার বাজান। শিল্পী-শিল্পী ভাব। সাতেও নেই পাঁচেও নেই। সাধনা নিয়েই ব্যস্ত। সব দেখেশুনে নিতুর ধারণা হয়েছে, তার কিছুই হবে না। সকলেই চাইছেন, নিতু রোজগারে নেমে পড়ুক। নিজের পায়ে না দাঁড়ালে কে বসে-বসে খাওয়াবে!

বেলা চারটের সময় রোদের তেজ যখন কমে আসে, রাস্তায় যখন লম্বা-লম্বা ছায়া নেমে আসে, আমরা তখন বই বগলে হই-হই করতে-করতে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে আসি। খেলার মাঠে ফুটবল পড়ার শব্দ ওঠে। পিঁ পিঁ করে বাঁশি বাজতে থাকে। আমরা খেলি না। খেলার মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখি। তারপর আমাদের একটা জায়গা আছে, সেখানে গিয়ে পা ছড়িয়ে বসি। নিতু আসে। গানে-গল্পে সন্ধে নেমে আসে। যে-যার বাড়ি গিয়ে পড়তে বসি।

জায়গাটা হল গঙ্গার ধারের একটা ভাঙা ঘাট। পাশেই বিশাল বটগাছ। শিবের মন্দির। রাধাকৃষ্ণের মন্দির। পাড় ঢালু হয়ে জলের দিকে নেমে গেছে। শ্যামল খুব ভাল ছবি আঁকতে পারে। তার পকেটে থাকে স্কুল থেকে কুড়িয়ে আনা রঙ-বেরঙের চক। ভাঙাঘাটের পৈঠেতে সে রোজই কিছু না কিছু ছবি আঁকে। কোনওদিন প্রধান শিক্ষকের মুখ। কোনও দিন অঙ্কের স্যার। কোনও দিন স্কুলের দরোয়ান। মাঝে মাঝে পড়ার বইয়ের গল্পের চরিত্র। ছবিতে সকলেরই স্বভাব সুন্দর ফুটে ওঠে। হেডস্যারের তিরিক্ষি মেজাজ। অঙ্কের স্যারের মারমুখী স্বভাব। দরোয়ানের দেহাতি মুখ। রোজই আঁকে। রোজই মুছে যায়। কে যে মুছে দেয়। মনে হয় মাঝ-রাতে যখন আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ি, তখন চুপিচুপি জোয়ারের জল এসে সব মুছে দিয়ে যায়।

আজ আমরা অনেকক্ষণ বসে আছি। সূর্য সেই কখন ছ্যাঁক করে জলে ডুব দিয়েছে। আকাশে কত রকমের মেঘ, কত রকমের রঙ। রং-বেরঙের পাল তুলে নৌকো চলেছে, নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ। কোথায় যাচ্ছে কে জানে। সবই মহাজনী নৌকো। নুন বোঝাই, খড় বোঝাই।

শ্যামল বললে, "নিতুর আজ কী হল বল তো?"

মলয় বললে, "বড় মামা হয়তো দোকানে বসিয়ে কলকাতায় সিনেমা দেখতে গেছে।"

"নিতুটার যে কী হবে?" সুখেনের ভীষণ ভাবনা।

মলয় বললে, "নিতুটা না এলে বড় বিপদে পড়ে যাব। একটা অঙ্ক খুব আটকে গেছে রে! একটা করতে পারলে পুরো চ্যাপটারটা হয়ে যাবে।"

নিতুর অঙ্কে ভীষণ মাথা। খড়ি দিয়ে ভাঙা ঘাটের শান-বাঁধানো ধাপে ঝটাঝট অঙ্ক কষে আমাদের অবাক করে দেয়।

সুখেন বললে, "দেখবি, নিতুটা মস্ত বড় গাইয়ে হবে। ওর যা গলা! যে কোনও গান একবার শুনলেই অবিকল গাইতে পারে।"

নিতুর ভাবনায় আমাদের গল্পটল্প সব থেমে গেছে। পকেটের চানাচুর মিইয়ে এল। নিতু না এলে খেতে পারছি না। এদিকে সন্ধে হয়ে আসছে। আকাশে ওড়ার আগে বটের ডালে বসে পেঁচা ডাকছে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে।

সুখেন জলের দিকে একটা ঢিল ছুঁড়ে দিয়ে বললে, "নিতুটাকে ওর মামারা আমাদের হাতে ছেড়ে দিক না? স্কুলের সেক্রেটারিকে ধরে ওকে আমাদের ক্লাসে ঠিক ভর্তি করে দিতে পারব। দেখবি ও ঠিক ফার্স্ট হবে। স্কুলের মাইনেও লাগবে না, কিচ্ছু না।"

আমরা উঠে পড়ব ভাবছি, হঠাৎ নিতু এসে হাজির হল।

"কী রে এত দেরি করলি! কী হয়েছিল?"

নিতু পান খেয়েছে। ঠোঁট লাল। হঠাৎ সন্ধেবেলা পান! ভাল খাওয়া-দাওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। ঠোঁট লাল, মুখ শুকনো। সুখেন বেশ কিছুক্ষণ নিতুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, "তোর আজ একটা কিছু হয়েছে। নিশ্চয় কিছু হয়েছে।"

"কী আবার হবে?" যাই হোক না কেন, নিতু কখনও কারুর নিন্দে করে না। সবাই ভাল।

আমি চানাচুরের ঠোঙাটা বের করে বলুম, "তুই আসছিস না বলে খেতে পারছি না। নে, ধর।"

নিতু হাত পেতে চানাচুর নিল। সুখেন বললে, "তুই নুকোচ্ছিস। সত্যি করে বল তোর কী হয়েছে।"

"আমার আবার কী হবে। আমার যা হবার সবই তো হয়ে গেছে।"

নিতু চানাচুর খেতে লাগল। নিতুর ডান গালটা বাঁ গালের চেয়ে লাল হয়ে আছে। আমি লক্ষ করে করে ঠিক ধরেছি। চানাচুর চিবোতেও যেন বেশ কষ্ট হচ্ছে।

"নিতু, তোর গালটা কেন লাল হয়ে আছে রে?"

"মনে হয় রক্ত বেড়েছে। স্বাস্থ্য ভাল হলে মানুষের গাল গোলাপি হতে থাকে।"

"তা একটা গাল হবে কেন?"

"একটা-একটা করেই তো হয়। প্রথমে ডান, তারপর বাঁ।"

"ও।" ও বলেই চুপ করতে হল।

দিনের আলো নিবে আসছে দেখে মলয় পকেট থেকে অঙ্কটা বের করে ফেলল। সেই বিশ্রী ঝামেলা। পিতা পুত্রের বয়েস নিয়ে চিরকালের ঝামেলা। দশ বছর আগে আর দশ বছর পরে। ক্লাসে অঙ্কের স্যার একদিন মলয়কে ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড় করিয়ে এইরকম একটা অঙ্ক কষতে দিয়েছিলেন। মলয় অ্যায়সা অঙ্ক করেছিল, আমরা হেসে মরি। পুত্রের বয়েস পিতার বয়েসের চেয়ে দশ বছর বেশি হয়ে গেল। মলয় প্রথমটায় ধরতেই পারেনি, কেন সবাই হাসছে। মলয় সমানে তর্ক করে গেল, আজকাল ওরকম হয় স্যার, সব পুত্র তো ভবিষ্যতে পিতা হতে পারে। অতীতের পুত্র ভবিষ্যতের পিতা। এই তো জগতের নিয়ম। মাথায় ডাস্টারের গাঁট্টা খেয়ে ব্ল্যাকবোর্ড থেকে সরে এসে কান ধরে বেঞ্চিতে দাঁড়িয়ে রইল। স্যার মুখ ভেঙচে বললেন, "ওরে আমার দার্শনিক রামছাগল রে!"

সেই অঙ্ক নিতু ধরেই করে দিলে। পিতা পিতাই রইল, পুত্র পুত্র। কোনও স্থান-পরিবর্তন হল না। উত্তরও মিলে গেল। আমরা অবাক হয়ে যাই, নিতু এত অঙ্ক কবে কোথায় শিখল! বিহারের স্কুলে। খুব কাঁচা লংকা খেলে অঙ্কের মাথা খোলে। নিতুর ধারণা। মলয়ও খেতে শুরু করেছে। এখনও মাথা তেমন খোলেনি। দেখা যাক ফাইনালে কী হয়।

নিতু এইবার গান ধরেছে, ''তু গঙ্গা কি মৌজ ম্যায় যমুনা কি ধারা।" ওপারের মন্দিরে ফুট-ফুট করে আলো জ্বলে উঠছে' এপারের মন্দিরে আরতির তোড়জোড় শুরু হচ্ছে। টিং-টিং করে ঘণ্টা বাজছে। আমাদের উঠতে হবে। একটা দিন শেষ হয়ে গেল। কড়া নিয়ম। সন্ধের সময় বাড়ি ফিরতে হবেই। বটের ডাল থেকে হুস-হুস করে বাদুড় উড়ে যাচ্ছে।

নিতু কিন্তু উঠল না। বসেই রইল।

"কী রে, তুই যাবি না?"

"কোথায় যাব?"

"কেন? বাড়িতে।"

"আমার বাড়ি বলে কিছু আছে?"

কথাটা ঠিকই। নিজের বাড়ি আর মামার বাড়িতে অনেক তফাত। মা মারা গেলে মামার বাড়িতে আর কী থাকে?

"তুই তা হলে কী করবি?"

"এখানে অনেকক্ষণ বসে-বসে গান গাইব। মন্দিরে আরতি শুরু হবে দেখব। তারপর শ্যামলদের বাড়ির রকে গিয়ে বসে থাকব।"

আমি বললুম, "তুই আমাদের বাড়িতে চল।"

"না রে, তোরা এখন লেখাপড়া করবি। আমি গেলে তোদের মা-বাবা বিরক্ত হবেন।"

"কিচ্ছু বিরক্ত হবেন না। তুই চল না। তুইও বসে-বসে পড়বি।"

এমন একগুঁয়ে ছেলে, কিছুতেই উঠল না। বললে, "যার যা জায়গা। তোদের বাড়ি আছে, মা বাবা আছে, ভবিষ্যৎ আছে, আমার কী আছে বল?"

নিতু আবার গান ধরল, ''বচপনকী দিনকো দিলসে না জুদা কর না।"

নিতু একা বসে রইল গঙ্গার ভাঙাঘাটে। আমরা খেলার মাঠের পাশ দিয়ে বাড়িমুখো হলুম। কিছুটা পথ যেতেই নিতুর ছোটমামার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হন্তদন্ত হয়ে আসছেন।

"তোমরা নিতুকে দেখেছ? আমাদের নিতু।"

''হ্যাঁ, গঙ্গার ধারে একা-একা বসে আছে।''

"দেখেছ, কী কাণ্ড, সারাদিন না খেয়ে আছে।"

নিতু সারাদিন না খেয়ে আছে। কই একবারও তো সে কথা আমাদের বলল না! আবার পান খেয়েছে। নিতুর ছোটমামাকে অনুসরণ করে আবার আমরা ঘাটে ফিরে এলুম। ফিরে আসতে আসতে দূর থেকেই নিতুর গলা কানে এল, "ও জি ও ওও, তু গঙ্গা কি মৌজ মৈ যমুনা কি ধারা।"

আমাদের আবার ফিরে আসতে দেখে নিতু অবাক হয়ে গেল, "এ কী তোরা?"

নিতু প্রথমে তার ছোটমামাকে দেখতে পায়নি। বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। বটের ডালে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে পেঁচা ডাকছে।

"নিতু!" ছোটমামার গলা শুনে নিতু উঠে দাঁড়াল।

"ছোটমামা তুমি?"

''হ্যাঁ, আমি। চল বাড়ি চল।''

"না, আমি যাব না।"

"যাবি না কেন?"

নিতু চুপ করে আছে। আমরা একসঙ্গে প্রশ্ন করলুম, "কেন যাবি না?" তোর কী হয়েছে? তুই সারাদিন না-খেয়ে আছিস কেন? তুই সে কথা আমাদের বললি না কেন?"

আমাদের খুব অভিমান হয়েছে। কেন হবে না! নিতু আমাদের বন্ধু। তার কিছু হওয়া মানে আমাদেরও হওয়া।

নিতু ধরা-ধরা গলায় বললে, "আমি ঘরের কথা কাউকে

...তে চাই না। মা মারা যাবার দিন আমাকে বলে গিয়েছিলেন, ...র কী হবে জানি না, তবে তোকে মুখ বুজে অনেক কিছু ... করতে হবে। যাই হোক, হাসিমুখে থাকবি। নিজের দুঃখের ... পরকে বলবি না।"

নিতুর কথা শুনে আমাদের খুব রাগ হল। আমরা এত নিতু-...তু করি। আমরা হলুম নিতুর পর! বেশ তবে তাই হোক। ...তুর ছোটমামাই বুঝুন নিতুর ব্যাপার। আমাদের কী?

"চ রে, চ।" আমরা ফাঁকা খেলার মাঠের পাশ দিয়ে অন্ধকার ... ধরে যে যার বাড়ি ফিরে গেলুম।

পরের দিন আবার যখন আমরা গঙ্গার ধারে ফিরে এলুম ...লের আসরে, তখন নিতুর ওপর আমাদের রাগ পড়ে গেছে। ...তুর ওপর কি রাগ করা যায়? মলয়ের আবার একটা অঙ্ক ...কেছে। এবার সেই বিদঘুটে চৌবাচ্চাটা। এক দিক দিয়ে জল ...চ্ছে আর দু দিক দিয়ে জল বেরোচ্ছে। মলয় বলল, "সারা ...কাল চেষ্টা করেও এই চৌবাচ্চা ভরতে পারলুম না।"

শ্যামল বললে, "আগে একটা মিস্ত্রি ডেকে ফুটো বন্ধ করা, ...রে যদি ভর্তি হয়!"

"সে তো অ্যালাউ করবে না। ওই তিন ফুটোঅলা সর্বনেশে ...নিসটাই ভরতে হবে, তা না হলে অঙ্ক!"

সুখেন বললে, "আমি পকেটে করে আজ খাবার এনেছি। ...তু থাক না থাক, পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা করে ধাপ্পা মারুক। ...জ আর ভুলছি না। আগে খাও, তারপর অন্য কথা।"

গল্পে-গল্পে সময় কাটছে, নিতুর কিন্তু আসার নাম নেই। ...র্য ডুবে গেল। মন্দিরে-মন্দিরে আলো জ্বলে উঠল। শ্যামলই ...মে আবিষ্কার করল লেখাটা। নিচু হয়ে ঘাটের পৈঠাতে আগের ...নের আঁকা ছবি দেখতে দেখতে লাফিয়ে উঠল, "এই দেখ। নিতু ...ী লিখে রেখে গেছে!"

আমরা ঝুঁকে পড়লুম। দিনের শেষ আলোয় লেখাটা পড়া ...ল, "আমি চলে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি জানি না। এখানে আমার ...ন হল না। যেখানেই থাকি তোদের কথা চিরকাল মনে ...কবে—নিতু।"

আমরা অবাক হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। ...ই বিশাল পৃথিবীতে নিতু বেমালুম হারিয়ে গেল। আমরাও ...র কথা ভুলে বড় হতে হতে প্রায় বুড়ো হয়ে এলুম। আমাদের ...ই পেন্টাগন আর নেই। পাঁচটা বাহু পাঁচ দিকে ছিটকে গেছে। ...র কেউ নিতুকে মনে রেখেছে কি না জানি না, আমার মন ...কে নিতু কিন্তু মুছে যায়নি। আমার সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনেও ...তু বড় হয়েছে। নিতুকে আরও বেশি মনে পড়ত যখনই ...ডিওতে বৈজু বাওরার ওই গান দুটো শুনতুম। কতদিন ...তুর মামাদের জিজ্ঞেস করেছি, বিরক্ত হয়ে বলেছেন, জানি না।

কী ভাবে কী হয়! মনে ইচ্ছে থাকলে হারানো মানুষের সঙ্গে ...ভাবেই বোধহয় যোগাযোগ হয়ে যায়। অফিসের কাজে ...মান গেছি। আন্দামান থেকে জাহাজে 'হাটবে' বলে একটা ...পে গিয়ে নেমেছি। জেটিতে সরকারি জীপ এসেছে। দ্বীপের ...রে একটা স্কুল দেখতে যাব। বিশাল-বিশাল গর্জন গাছের ...রে মধ্যে দিয়ে ট্রাঙ্ক রোড। জীপ ছুটছে। আমি সামনে বসে ...ি ড্রাইভারের পাশে। আমাদের পেছনে বসে আছেন আরও ...জন। প্রকৃতিতে তন্ময় হয়ে গেছি। এমন দৃশ্য জীবনে ...খিনি। ঘাড়ের কাছে আঙুলের ছোঁয়ায় চমকে উঠেছি।

"চিনতে পারিস?"

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন ফিরে তাকালুম। ফর্সা একটি মুখ। ...কা নীল ডোরাকাটা শার্ট। খুব চেনা মুখ। কোথায় দেখেছি, ...থায় দেখেছি।

"তুই নিতু?"

"ইয়েস, আমি নিতু।"

আনন্দের ওপর আনন্দ। ডবল আনন্দ। যে স্কুলে চলেছি, নিতু সেই স্কুলের শিক্ষক। আনন্দে চোখে জল এসে গেছে। পরশমানিক পেলেও মানুষের বোধহয় এত আনন্দ হয় না।

কথা ছিল স্কুল আর দ্বীপের অন্যান্য অংশ দেখে সন্ধের মুখে জাহাজে ফিরে যাব। রাত একটার সময় জাহাজ নোঙর তুলে বহু দূরে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দিকে চলে যাবে। রাতের খাওয়া জাহাজেই হবে। নিতু বললে, "তুই আমার এখানে রাতের খাওয়া সেরে যা। আমি ঠিক সময়ে তোকে বন্দরে পৌঁছে দোব।"

রাজি হয়ে গেলুম। তিরিশ বছর পরে নিতুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা। তিরিশ বছর ধরে যে-প্রশ্নটা মনে মনে ঘুরছিল সেইট দিয়েই শুরু করলুম, "তুই খাসনি কেন? তোর গালের ডান দিকটা লাল কেন?"

নিতু হো-হো করে হেসে উঠল। আমরা তিরিশটা বছর পেছিয়ে গিয়ে সেই গঙ্গার ধারে যেন বসে আছি। আসলে বসে আছি একটা ঢালু সবুজ মাঠে, পাঁচশো ফুট উঁচু একটা গর্জন গাছের তলায়। সামনে ট্রে-তে চা-বিস্কুট।

নিতু বললে, "তা হলে শোন। চড়-চাপড় রোজই দু একটা জুটত, গ্রাহ্য করতুম না। সেদিন যা হয়েছিল তাকে বলে ধোলাই, আড়ং ধোলাই। কারণটা শুনবি? সকালে বড়মামা আমাকে দোকানে বসিয়ে কেনাকাটায় গেলেন। যে-সব জিনিস বিক্রি হয় তার দামও বলে গেলেন। কেবল একটা জিনিসের দাম বলতে ভুলে গেলেন, আর আমিও খেয়াল করিনি, সে জিনিসটা হল সুতোয় বাঁধা হাতলাট্টু। সেই যে ছেলেবেলায় যাকে আমরা বলতুম ইয়োইয়ো। জিনিসটা তখন খুব চলেছিল।।"

নিতু এক চুমুক চা খেল। "দোকানে খদ্দেরপাতি তেমন হত না। প্রথমেই যে এল সে একটা ছেলে। কিনবে ওই লাট্টু। মহা বিপদ। দাম জানি না। আবার খদ্দের লক্ষ্মী, হাতছাড়া করতে মনে লাগে। অনেক ভেবে মনে হল ও জিনিসের দাম আর কত হবে, এক আনা। ছেলেটো লাফাতে লাফাতে কিনে নিলে। ছেলেটা চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই ব্যবসা একবারে জমজমাট হয়ে উঠল। মনে মনে ভাবলুম, কী পয়া দোকানদার! মামা বসলে একটাও খদ্দের আসে না, ভাগ্নে বসতে-না-বসতেই লাইন দিয়ে খদ্দের আসছে। দেখতে দেখতে দু ডজন লাট্টু শেষ। দুপুরে দোকান বন্ধ করার সময় বড়মামা এলেন। খুব গদগদ হয়ে বললুম, কী বিক্রি! দু' ডজন লাট্টু শেষ। কত করে বেচলি? বেশ সস্তা দামে, এক আনায় একটা। হাতে হাতে পুরস্কার। সপাটে ডান গালে এক চড়। রাসকেল, এই একটা লাট্টুর দাম দশ আনা, আবার এক চড়।"

নিতু হো-হো করে হেসে উঠল। চাঁদ উঠেছে, গর্জন গাছের মাথার উপর। কী নির্জন দ্বীপ। নিতু আর আমি পাশাপাশি বসে আছি। পেন্টাগনের দুটো বাহু অনেকদিন পরে জোড়া লেগেছে। আর তিনটে বাহুর একটা মলয়, মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার হয়েছিল, দুর্ঘটনায় মারা গেছে তিন বছর আগে। আর দুটো বাহু শ্যামল আর সুখেন বিদেশে চলে গেছে।

"তারপর?"

নিতু বললে, "তারপর পথেই জীবন, পথেই মরণ আমাদের। মা বলতেন, মামার বাড়িতে পড়ে থাকলে মানুষ, মানুষ হতে পারে না। বাবা বলতেন, জীবন একটা খেলা, একটা চ্যালেঞ্জ। সেই খেলতে খেলতে কোথায় চলে এসেছি দেখ।"

"দেশে আর ফিরবি না?"

"দেশ? কে আছে আমার? কার কাছে ফিরব? এখানকার শ্মশানটা কত সুন্দর জানিস? সমুদ্রের বেলাভূমিতে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ে চিতার আগুন নিবিয়ে দেয়। মানুষের অস্থি আর সমুদ্রের ঝিনুক পাশাপাশি থাকে।"

ছবি : দেবাশিস দেব

আজ্ঞে হুজুর

সাধনা মুখোপাধ্যায়

ঠকঠকিয়ে নরম কাঠে
ঠুকছে কে আলপিন ?
—আজ্ঞে হুজুর, দোষ করিনি
প্রাতঃপ্রণাম নিন।

মটমটিয়ে কে বাগানের
ভাঙছে রে ডালপালা ?
—আজ্ঞে হুজুর, কানে শুনি না,
আমি নিরেট কালা।

দুড়দাড়িয়ে গাঁইতি দিয়ে
ভাঙে কে ঘর-বাড়ি ?
—আজ্ঞে হুজুর মেরামতি
না করে কি পারি।

ঝনঝনিয়ে সার্সি ভাঙে
ওইখানেতে কে রে ?
—আজ্ঞে হুজুর, দোষ আমারই
এইবারে দেন ছেড়ে।

ফটফটিয়ে আমার স্কুটার
চড়ল কে রে ওই ?
—আজ্ঞে হুজুর, বেড়াতে যাই
সত্যি কথাই কই।

হাস্যকর

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

অট্টহাসি হাসেন যখন
অটল চট্টোপাধ্যায়,
কাছের দূরের গাছে তখন
পাখিরা সব টাল খায়।

চিন্তাহরণ চৌকিদার
কেউ জানে না বৌ কি তার
চিন্তাভাবনা না-করে
শুনতে গিয়েছিল ভোরে
অটলবাবুর অট্ট!
হাস্য শুনে চমকে পিলে
তুলল পটল হঠাৎ ও।

তখন এল দারোগা
কাঁপছিল ভাই তারো গা,
কিন্তু তিনি কর্ণে আগেই
তুলো ঠেসে যথেষ্ট
হাসির শব্দ আসছে—বা নেই
করেছিলেন সে-টেস্টও।
খুব সহজে এ-কারণেই
অটল হলেন অ্যারেস্টও।

এখন অটল জেলে থাকেন
এবং তিনি একা-একাই
মুচকি হাসির চাষ করেন।

ছবি দেবাশিস দেব

দাওয়াই

রঞ্জন ভাদুড়ী

খুটুস-খাটুস শব্দে যখন কাটল হঠাৎ ঘুমের ঘোর
হ্যারিকেনটা উসকে দেখেন, ঘাপটি মেরে সিঁদেল চোর
লুকিয়ে আছে জালার পাশে। শুধোন তিনি, 'নাম কী তোর?'

চোর ভাবে, কী বিপত্তি এ—ক্যাম্‌নে ওনার ভাঙল ঘুম!
নিশুত রাতে টিনের চালে বৃষ্টি পড়ে ঝুমুর-ঝুম।
আবার তিনি হাঁকার ছাড়েন, 'মুখে-কুলুপ কোন হো তুম?'

শিথান থেকে রামদাখানা নিলেন তুলে এক হাতে,
আর-এক হাতে হ্যারিকেনটা—ঘেবড়ে গিয়ে চোর তাতে
ডুকরে বলে, 'মা-ঠাকরুন, ভুগছি আমি আমবাতে

হুমোপাথি আলোপাথি করালুম চিকিচ্ছে ঢের—
শুনতে পেলুম আপনি নাকি দাওয়াই জানেন এই রোগের
তাই তো এলুম শরণ নিতে মায়ের ছিরিচরণের।'

এবংবিধ বাক্যি শুনে বৃদ্ধা জগদম্বা দে
বলেন, 'ভারী তুষ্ট হলুম তোর মুখের এই সম্বাদে
বলছি দাওয়াই—মন দিয়ে শোন্—শিগগিরি তুই লম্বা দে।'

ছবি দেবাশিস দেব

ঢের হয়েছে

শ্যামলকান্তি দাশ

ঢের হয়েছে, তড়পানি রাখ,
মিথ্যে করিস তক্ক রে,
এই বয়েসে হঠাৎ বাপু
মরবি কেন শখ করে!
মরার অনেক রাস্তা আছে
সময়মতো নিস বেছে
তার আগে এই তেলচিটচিট
গামছাখানা দিস কেচে।
তারপরে তুই টুকুস করে
আসিস দেখে ছাদখানা,
ভূতভুতুড়ের নাচন দেখে
হোস না বাপু আধখানা।
ভূত ভাগানো কঠিন বটে
গায়ে ওদের জোর কত,
কিন্তু ওরা পাগল-ছাগল
একেবারে তোর মতো।
এ কী রে তুই কাঁপিস কেন
হাঁচিস কেন ফ্যাঁচ করে,
কথায়-কথায় তুই তো চোরের
মুণ্ডু কাটিস ঘ্যাঁচ করে।
তাহলে তুই চোরই তাড়াস,
চোরগুলো খুব বিটকেলে
ফক্কিকারি বেরিয়ে যাবে
ছিঁচকেগুলোর ইঁট খেলে।
কাজেই একটু সমঝে চলিস
থাকিস বাছা সাবধানে,
চোখের দেখা রাখতে লিখে
কলম এবং জাবদা নে।

ছবি দেবাশিস দেব

ঘোড়া-সাহেবের কুঠি

বিমল কর

ছবি সমীর সরকার

তারাপদ অফিস থেকে মেসে ফিরতেই বটুকবাবুর সঙ্গে দেখা। বটুক বললেন, "ওহে তোমার সেই ম্যাজিশিয়ান কিকিরা এসেছিলেন। আবার আসবেন। বলে গেছেন, তুমি যেন মেসেই থাকো।"

সামান্য অবাক হল তারাপদ। আজ সপ্তাহ দুই হল, কিকিরা কলকাতা-ছাড়া। দু-দুটো রবিবার তারাপদ আর চন্দন অভ্যেস-মতন কিকিরার বাড়ি গিয়েছে, গিয়ে ফিরে এসেছে। কিকিরার দেখা পায়নি। সর্বজ্ঞ বগলাচন্দ্রও কিছু বলতে পারল না। বরং মনে হল, বগলা খানিকটা চটেই রয়েছে কিকিরার ওপর। সংসারের যা কিছু বগলাই করবে—চন্ডীপাঠ থেকে জুতো পালিশ, আর বগলাকে বিন্দুমাত্র কিছু না জানিয়ে একটা লোক বেপাত্তা হয়ে বসে থাকবে—এ কেমন কথা! বগলার কি ভাবনা-চিন্তা হয় না! যাবার সময় বগলার হাতে কিছু টাকাপয়সা গুঁজে দিয়ে কিকিরা নাকি বলে গেছেন : "বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি। সাবধানে থাকবি। তারা আর চাঁদু এলে বলবি, দিন সাত-আট পরে ফিরব।"

সেই সাত-আট দিন পনেরো-ষোলো দিনের মাথায় গিয়ে ঠেকল। যাক্, কিকিরা ফিরে এসেছেন, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

নিজের ঘরে গিয়ে তারাপদ জামা-প্যান্ট ছাড়ল। ছেড়ে সার্বেকি লুঙ্গি জড়াল; তারপর সাবান আর গামছা নিয়ে নীচে নেমে গেল স্নান সারতে। আজ তার মন বেশ হালকা। একটা দিন আর, পরশু থেকে পুজোর ছুটি শুরু। আজই মাইনে পেয়ে গিয়েছে। অফিস-টফিসে কাজ করার সময় ছুটিছাটা পাওয়া যে কত আনন্দের, তারাপদর আগে জানা ছিল না। এখন জানছে। অবশ্য এ-সবই কিকিরার দয়ায়। কিকিরা বেছে-বেছে, নিজে তদ্বির করে তারাপদকে এই চাকরিটা জুটিয়ে দিয়েছেন। বেসরকারি চাকরি, কিন্তু অল্প। ছোট অফিস। কোনো গোলমাল নেই। যাও, খাতা খুলে কলম ধরে হিসেবপত্র মেলাও, চা-সিগারেট খাও, ছুটি হলে বাড়ি ফিরে এসো। ভালই লাগছে তারাপদর। সে স্বপ্নেও ভাবেনি মাস গেলে শ ছয়েক টাকার মতন তার পকেটে আসবে! চাকরি পাবার প্রথম দিকে ভেবেছিল, টাকা যখন আসছে হাতে, তখন বটুকবাবুর মেস ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। কিন্তু যাওয়া হল না। এতকাল থাকতে-থাকতে কেমন মায়া পড়ে গিয়েছে বটুক-বাবুর মেসের ওপর, নিজের ওই হতকুৎসিত ঘরের ওপরেও। এক সময় বটুকের টাকার তাগাদায় তারাপদ কেঁচো হয়ে থাকত, এখন বটুককেই কেঁচো করে রেখেছে! না না, বটুকবাবু মানুষ

খারাপ নয়, কথাবার্তার ধরনটাই যা খরখরে। বটুকবাবু যদি মন্দ হতেন, তারাপদ কি তার দুর্দিনে টিঁকে থাকতে পারত এই মেসে! না, তারাপদ নেমকহারামি করতে পারবে না বটুকবাবুর সঙ্গে। বটুকের জয় হোক।

নীচের শ্যাওলা-পড়া কলতলা থেকে স্নান সেরে 'বটুকের জয় হোক' গাইতে-গাইতে তারাপদ তার ঘরে ফিরে এল। ফিরে এসে মুখ মুছে চুল আঁচড়াচ্ছে, দরজায় পায়ের শব্দ শুনল। মুখ না ফিরিয়েই তারাপদ বলল, "আসুন, কিকিরা মশাই! কোথায় যাওয়া হয়েছিল, স্যার?"

কোনো সাড়াশব্দ কানে এল না।

ঘুরে দাঁড়াল তারাপদ। দরজার সামনে বটুকবাবু দাঁড়িয়ে! হাসল তারাপদ। "ও, আপনি! টাকা চাইতে এসেছেন?"

"না; বলতে এসেছি, তুমি বড় এঁচোড়ে-পাকা হয়ে গিয়েছ! আমি তোমার ইয়ার? খুব যে গান গাইতে-গাইতে এলে!"

তারাপদ জোরে হেসে উঠল। "আপনার কানে গিয়েছিল? সরি, বটুকদা! ভেরি সরি। তা আপনার টাকটা এখন নেবেন?"

"আজ বেস্পতিবার। কাল দিও। মাইনে পেয়েছ?"

মাথা হেলাল তারাপদ

বটুক বললেন, "তোমায় একটা কথা বলব ভাবছি। দুলাল-বাবু আজ দু'তিন মাস ধরে ভুগছেন। কেউ বলছে আলসার, কেউ বলছে লিভার খারাপ হয়েছে। তোমার ওই ডাক্তার-বন্ধুকে বলে হাসপাতালে ঢুকিয়ে দাও না, ভাই; মানুষটার একটা চিকিৎসা হয়!"

তারাপদ দু'মুহূর্ত বটুকবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, "আগে কেন বলেননি? আমি চন্দনকে বলব। নিশ্চয় বলব।"

এমন সময় কিকিরাকে দেখা গেল। বটুকবাবু চলে গেলেন।

"কী গো অফিসের বাবু? কখন ফেরা হল?" কিকিরা ঘরে ঢুকে বললেন।

"খানিকটা আগে। তা আপনার হঠাৎ-আবির্ভাব কেন কিকিরা-স্যার? কোথায় হাওয়া হয়েছিলেন?"

"অজ্ঞাতবাসে গিয়েছিলাম। মাঝে-মাঝে তোমাদের এই কলকাতায় হাঁপিয়ে উঠি। তখন দু-চার দিন কোথাও পালিয়ে যাই।"

"দু-চার দিন তো নয়, স্যার; আপনি সপ্তাহ দুই ডুব মেরে ছিলেন। বগলা ফায়ার হয়ে গিয়েছে—, তা জানেন?"

"ও একটা আস্ত উজবুক। পইপই করে বলে গেলাম তুই ভাবিস না, আমি দিন কতকের জন্যে এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি। অনেক দিন যাইনি। ক'দিন থেকে আসব। তা হতচ্ছাড়া যাকেই পেয়েছে, তার কাছেই প্যানপ্যান করেছে।"

"গিয়েছিলেন কোথায়?"

"বেশি দূরে নয়। আসানসোলের কাছে কালীপাহাড়ি বলে একটা জায়গা আছে। কোলফীল্ডকে কোলফীল্ড, আবার গ্রামও।"

"সেখানে বন্ধু আছে?"

"পুরনো বন্ধু বাপু। একসঙ্গে খেলাধুলো করেছি। স্কুল ফ্রেন্ড।...তা নাও, সাজগোজ শেষ করো; চলো একটু ঘুরে আসি।"

তারাপদ অবাক হয়ে বলল, "এই ভিড়ের মধ্যে কোথায় ঘুরবেন! পুজোর ভিড়। রাস্তাঘাটে হাঁটা যায় না। আজ পঞ্চমী তা জানেন?"

"সব জানি। নাও, পাজামা চড়িয়ে নাও। চলো।"

তারাপদ কিছু বুঝল না। কিকিরা যখন বলছেন তখন যেতেই হবে। বলল, "একটু চা হবে না কিকিরা-স্যার?"

"সে বাইরে হবে। তুমি ঝটপট নাও তো।"

তারপদ গায়ে গেঞ্জি গলাতে লাগল।

পার্ক তো নয়, নেড়া মাঠ। বর্ষার দৌলতে কোথাও-কোথাও সামান্য ঘাস গজিয়ে কোনো রকমে টিকে ছিল। কিকিরা বেছে-বেছে একটা জায়গায় বসলেন। কাছাকাছি কেউ নেই।

তারাপদও বসল। বসে একটা সিগারেট ধরাল।

কিকিরা হাত বাড়ালেন। "দাও তো, একটা ধোঁয়া দাও।"

তারাপদ প্যাকেট দিল সিগারেটের।

কিকিরা ন'মাসে ছ'মাসে শখ করে সিগারেট খান। গোটা কয়েক কাঠি নষ্ট করে সিগারেট ধরালেন। বললেন, "তোমার অফিস কবে বন্ধ হচ্ছে?"

"কাল অফিস হয়ে।"

"খুলবে কবে?"

"খুলবে দ্বাদশীর দিন। তবে আমার লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত ছুটি। অ-বাঙালিরা দেওয়ালির ছুটি পাবে চার দিন, আমরা শুধু কালীপুজোর দিন।"

"ভালই হল। আমরা তা হলে কালকেই কালীপাহাড়ি স্টার্ট করতে পারি।" কিকিরা বেশ সহজভাবেই বললেন।

তারাপদ অবাক হয়ে কিকিরার দিকে তাকাল। "কালী-পাহাড়ি! সেখানে যাব কেন?"

কিকিরা হাসিমুখে বললেন, "পুজোর এই ভিড় হই-হট্ট-গোলের মধ্যে কলকাতায় থেকে কী করবে? চারদিকে শুধু মাইক আর ঢাকের বাজনা। আমার সঙ্গে ঘুরে আসবে চলো। তোফা থাকবে, পোলাও-মাংস খাবে, কত সিন-সিনারি দেখবে—ধানখেত, পলাশ ঝোপ, কাশফুল, মাঝে-মাঝে বৃষ্টি। শরৎকাল দেখবে হে, রিয়েল শরৎকাল। পদ্য পড়েছ ঃ আজি কি তোমার মধুর মুরতি হেরিনু শারদ প্রভাতে...? সেই জিনিস দেখবে।"

তারাপদ সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। কেমন সন্দেহ হচ্ছিল তার। কিকিরা শরৎকাল দেখতে কালীপাহাড়ি যাবেন? বর্ধমান লোকালে গিয়েও তো শক্তিগড় থেকে শরৎকাল দেখে আসা যায়।

"কিকিরা স্যার," তারাপদ বলল, "খুলে বলুন তো ব্যাপারটা?"

"কেন, কেন! খোলাখুলির কী আছে! একেবারে সিম্‌পিল্ ব্যাপার। পুজোর ছুটিতে দিন কয়েক একটু নিরিবিলিতে থেকে আসা—।"

"তা ঠিক," তারাপদ অবিকল কিকিরার মতন করে বলল, "ভেরি সিম্‌পিল। তবে কিনা আপনি এই দিন-পনেরো নিরি-বিলিতে কাটিয়ে এলেন, আবার সেই একই জায়গায় নিরি-বিলিতে কাটাতে যাচ্ছেন তো, তাই বলছিলাম ব্যাপারটা কী?"

"তোমাদের বড় সন্দেহ-বাতিক!"

"সঙ্গদোষ স্যার! আপনার রহস্য দেখে-দেখে আমরাও সাসপিশাস হয়ে উঠেছি।...তা সত্যি করে বলুন তো এবারের মিস্ট্রিটা কী? আবার কোনো ভুজঙ্গ-কাপালিক?"

"না।"

"রাজবাড়ির ছোরা-গোছের কিছু পেয়েছেন?"

"না হে, না।"

"তবে?"

কিকিরা বললেন, "এবার দুটো শক্ত কাজ করতে হবে, একই সঙ্গে। ওঝাগিরি করব একদিকে, আর অন্যদিকে একটা খুন।"

"খুন? মার্ডার?" তারাপদ চমকে উঠল। বড়-বড় চোখ করে দেখতে লাগল কিকিরাকে।

কিকিরা বেশ সহজভাবেই বললেন, "তুমি ভেবো না, এমন ছিমছাম, নীট অ্যান্ড ক্লীন খুন হবে যে, কারুর সাধ্য হবে না আমাদের ধরে।"

তারাপদ বলল, "আপনি একলাই যান, খুন সেরে ফেলুন।

ম যাচ্ছি না।''

কিকিরা হেসে ফেললেন। তারাপদর কাঁধের কাছে থাপ্পড় মেরে বললেন, "তুমি একটি আস্ত হাঁদা। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার কথা শোনোনি কখনো? বিষ দিয়ে বিষক্রিয়া নষ্ট করা? শোনোনি? এটাও হল সেই রকম। একটাকে হেভেনে পাঠিয়ে দেব, আর-একটাকে হেল্ থেকে টেনে তুলব।''

''হেভেনে কাকে পাঠাবেন? আমাকে?'' তারাপদ ঠাট্টা করে বলল।

''ঠিক ধরেছ! তোমার মাথার ঘিলু অনেককাল জমাট ছিল। এবার দেখছি গলে যাচ্ছে। শীতকালে নারকেল-তেল যে-ভাবে গলে, সেই ভাবে।''

রসিকতা করে তারাপদ বলল, ''আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার হাতে।''

কিকিরা জোরেই হাসলেন। হাসি সামলে বললেন, ''এবার কাজের কথা বলি। কাল রাত্রের প্যাসেঞ্জারে আমরা যাচ্ছি। তুমি গোছগাছ করে আমার বাড়িতে সন্ধের মধ্যে চলে আসবে। আর চন্দনের সঙ্গে কাল সকালে দেখা করে বলবে, সে কবে যেতে পারবে?"

''চাঁদু পারবে না।''

''কেন?''

''অনেক কষ্টে দিন চারেক ছুটি ম্যানেজ করেছে; বাড়ি যাবে মা-বাবার কাছে।''

''বেশ তো, বাড়ি থেকে ফিরে এসে যাবে।''

''ওর হস্পিটাল-ডিউটি নেই?''

''তুমি বড় বাগড়া দাও। বেশ, স্যান্ডেল-উডকে বলো, কাল আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে। দুপুরের পর আমি থাকব। বুঝলে? সকালে আমাকে পাবে না। দুপুরের পর পাবে।''

''বলব।''

''ব্যাস তা হলে ওঠো। কাল দেখা হবে।''

''আপনি কিন্তু ব্যাপারটা বললেন না?''

''অত অধৈর্য হচ্ছ কেন? কাল ট্রেনে যেতে-যেতে বলব।'' কিকিরা উঠলেন।

তারাপদকেও উঠতে হল।

পা বাড়িয়ে কিকিরা বললেন, ''একটা ব্যাপার বেশ মন দিয়ে ভেবো তো! তেতলার সমান উঁচু থেকে একটা লোক যদি লাফিয়ে পড়ে, সে মাটিতে না-পড়ে আর-কোথায় যেতে পারে? হাওয়ায় কি মিলিয়ে যাওয়া যায়"

তারাপদ কিছুই বুঝল না।

॥ দুই ॥

ষষ্ঠীপুজোর দিন হাওড়া স্টেশনে পা দেয় কার সাধ্য। ভিড়ে-ভিড়াক্কার, থিকথিক করছে মানুষ। রাশি-রাশি মালপত্র। পায়ে-পায়ে কুলি। হাজার কয়েক লোক একই সঙ্গে কথা বলছে, চেঁচাচ্ছে, দৌড়ঝাঁপ করছে। দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়।

কিকিরা বুদ্ধি করে প্যাসেঞ্জারের টিকিট কিনেছিলেন। রাত্রের দিকে প্রায় শেষ ট্রেন। যারা যাবার তারা মেলে, এক্সপ্রেসে, পুজো স্পেশ্যালে চলে যাবার পর ঝড়তি-পড়তি ভিড়টা পড়ে ছিল মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারের জন্যে। মামুলি যাত্রী ছাড়া এ-গাড়িতে কেউ চড়ে না। তবু ভিড় কম হল না।

একেবারে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনেছিলেন কিকিরা। একটু আরামে যেতে চান আর কী! বললেন, "ক' ঘণ্টার নবাবি করে নিচ্ছি, বুঝলে তো, তারাপদ। প্যাসেঞ্জারের ফার্স্ট ক্লাস—তাও কালীপাহাড়ি পর্যন্ত। আমাদের মতন বাবুর এইটুকুই দৌড়।"

চার বার্থের কামরা। কিকিরা আর তারাপদ ছাড়া অন্য দুজনই অবাঙালি। একজন হলেন, বিশাল চেহারার এক পাঞ্জাবি ভদ্রলোক, যাবেন বর্ধমান পর্যন্ত। অন্যজন বোধহয় আসানসোলের কোনো ব্যবসাদার, প্রচুর লটবহর নিয়ে উঠেছেন গাড়িতে, মারোয়াড়ি। কিকিরার সঙ্গে মালপত্র তেমন বেশি না হলেও একটা বড়সড় ট্রাংক রয়েছে।

গাড়ি ছাড়ার পর বিশাল চেহারার পাঞ্জাবি ভদ্রলোক সটান শুয়ে পড়লেন, সঙ্গে একটা অ্যাটাচি ছাড়া কিছু নেই। মারোয়াড়ি ভদ্রলোক গন্ধমাদন নীচে রেখে, ওপরে বসলেন, পা ঝুলিয়ে। সামান্য আলাপ - পরিচয়ের চেষ্টাও করলেন, কিকিরা তেমন উৎসাহ দেখালেন না।

ঘেমে প্রায় নেয়ে উঠেছিল তারাপদ। হাতমুখে জল দিয়ে এসে রুমালে ঘাড় গলা মুছে জলের বোতল খুলে জল খেল।

কিকিরা বসে ছিলেন নীচের বার্থে।

গাড়ি চলতে শুরু করার পর বাতাস আসছিল। রাত হয়েছে। বাতাসও ঠাণ্ডা।

কিছুক্ষণ দু'জনেই গায়ে হাওয়া লাগিয়ে শরীরটা জুড়িয়ে নিলেন।

কিকিরাই কথা বললেন প্রথমে। বললেন, "চন্দন বলেছে, বাড়ি থেকে ফিরে এসে দিন-দুই হাসপাতাল করবে। তারপর ডুব দিতে পারবে।"

তারাপদ বলল, "জানি। ওর ডাক্তারির আপনিই বারোটা বাজাবেন।"

"কে বলল! চাঁদুবাবুর হাসপাতাল তো আর মাস দুই পরে শেষ হয়ে যাচ্ছে, তারপর বাবুকে চরে বেড়াতে হবে।"

ঠাট্টা করে তারাপদ বলল, "আপনার সঙ্গে চারবার প্ল্যান করেছে নাকি?"

হাসলেন কিকিরা।

কিছুক্ষণ হাসিঠাট্টার কথা হল। গাড়ির ভেতর গুমোটভাব ছিল, সেটাও কেটে গিয়েছে বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে। লিলুয়ায় গাড়ি থেমে আবার চলতে শুরু করেছে।

তারাপদ বলল, "কালীপাহাড়িতে তো নিয়ে চললেন কিকিরা-স্যার; কিন্তু কেন নিয়ে যাচ্ছেন সেটা এবার বলুন।"

"বলছি, বলছি—" কিকিরা পা তুলে আরাম করে বসলেন। "তোমাদের কোথাও নিয়ে গেলেই রহস্যের গন্ধ পাও, তাই না?"

ঠাট্টার গলায় তারাপদ বলল, "তা পাই। কেন পাব না, বলুন। আপনি হলেন কিকিরা দি ওয়ান্ডার! মিস্টিরিয়াস ম্যাজিশিয়ান।"

কিকিরা বললেন, "তা হলে শোনো। একটু গৌরচন্দ্রিকা গেয়ে শুরু করি?"

"করুন।"

সামান্য চুপ করে থেকে কিকিরা শুরু করলেন, "আমার এক বন্ধু আছে ছেলেবেলার। আগেই তো বলেছি একেবারে অল্প বয়েসের বন্ধু। তার নাম ফকিরচন্দ্র রায়। আমরা বলতাম ফকির। ফকিররা দু তিন পুরুষ ধরে কালীপাহাড়িতে থাকে। নামে ফকির হলেও ওরা মোটামুটি ধনী লোক। এক সময়ে জমিজমাই ছিল ওদের সব, সে ওর ঠাকুরদার আমলে। বাবার আমলে জমি-জায়গা ছাড়াও কোলিয়ারিতে নানা রকমের কনট্রাকটারি ধরেছিল। তাতে আরও ফেঁপে ফুলে ওঠে। বিস্তর পয়সা এলে যা হয়—নবাবিতে ধরে যায়, ফকিরদেরও তাই হল, নবাবিতে ধরল। পয়সা ওড়াতে লাগল চোখ বুজে। কিন্তু ওই যে বলে, চিরদিন সমান যায় না, ফকিরদেরও হল তাই। অবস্থা পড়তে শুরু করল, রবরবা কমতে লাগল।"

তারাপদ বলল, "কেন?"

কিকিরা বললেন, "ঠাকুরদার আমলে ছিল এক। বাবা-কাকার আমলে হল তিন। ফকিরের বাবার আরও দুই ভাই ছিল।
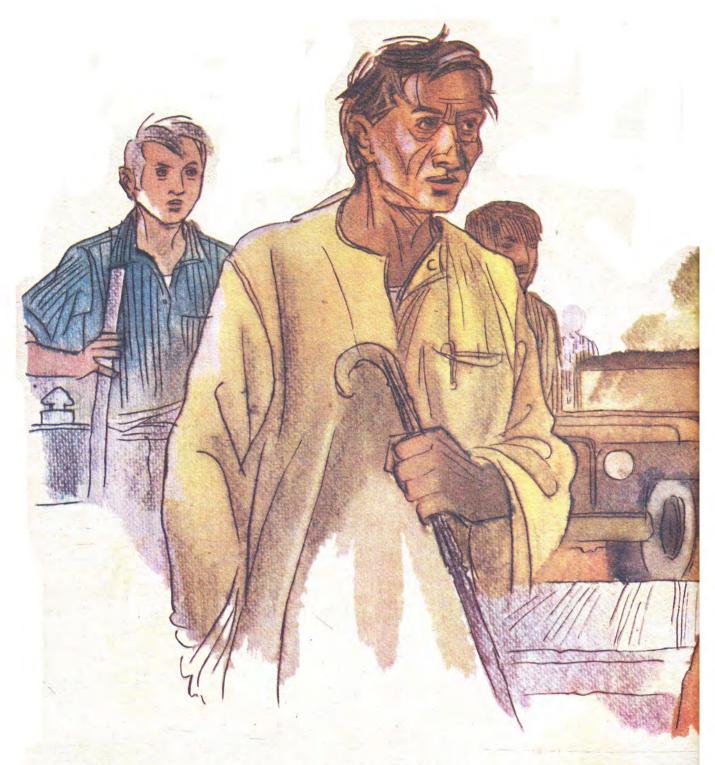
ফকিরদের আমলে সেটা আরও ভাগ হয়ে গেল। তার মানে এই নয় যে, সে ফকির হয়ে গিয়েছে, এখনও যা আছে তাতে তোমার - আমার মতন মানুষের বরাতে থাকলে বর্তে যেতুম।"

"মানে এখনও বেশ আছে?"

"ওদের কাছে বেশ নয়, তোমার-আমার কাছে যথেষ্ট।"

"গোলমালটা কোথায়?"

"মুখে শুনলে গোলমালটা ভাল বুঝতে পারবে না। চোখে দেখলে আঁচ করতে পারবে খানিকটা। তাহলেও ঘটনাটা ছোট করে শুনে রাখো।" কিকিরা একবার মুখ ফিরিয়ে বাইরেটা দেখে নিলেন। আবার স্টেশন এসে গেল। বললেন, "ফকিরদের বিষয়-সম্পত্তি এখন একরকম ভাগ-বাঁটরা হয়ে গিয়েছে। যে-সব সম্পত্তি কেউ কাউকে ছাড়তে রাজি নয়, তাই নিয়ে কোর্ট-কাছারি চলছে। এইরকম এক সম্পত্তি ঘোড়া-সাহেবের কুঠি।"

"ঘোড়া-সাহেবের কুঠি? সেটা আবার কী?"

"একটা বাড়ি। যেমন-তেমন বাড়ি অবশ্য নয়; দুর্গ বলতে পারো। পাথরের তৈরি। এক-একটা পাথর হাতখানেকের বেশি লম্বা। চওড়াও আধ হাত।"

"কী পাথর?"

"এমনি পাথর, সাধারণ। পাথরের বাড়ি দেখোনি?"

তারাপদ ঘাড় হেলাল। দেখেছে।

গাড়ি থামল। সামান্য থেমে আবার চলতে শুরু করল। তারাপদ বলল, "বলুন তারপর। ঘোড়া-সাহেবটা কে?"

কিকিরা বললেন, "অনেকদিন আগেকার কথা বলছি। তা
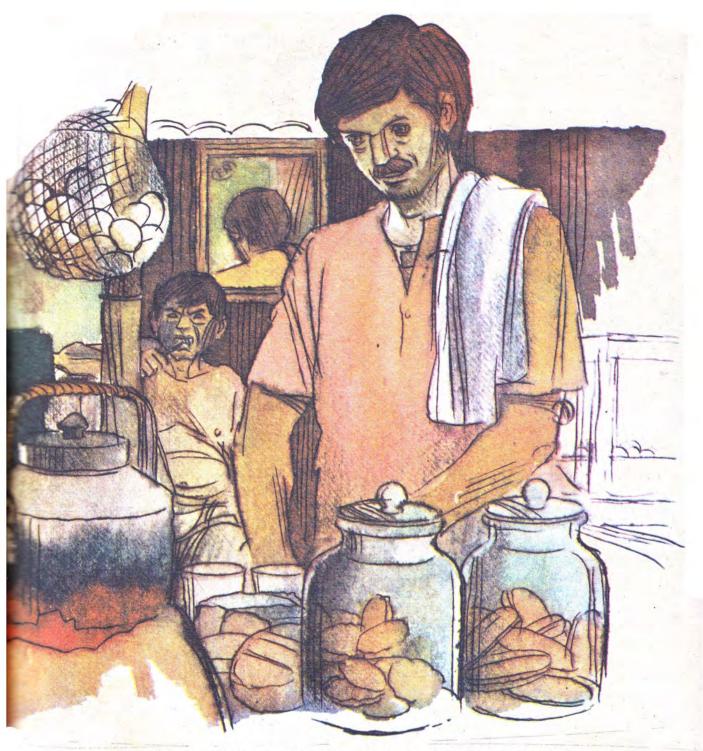
ধরো বছর পঞ্চাশ তো বটেই। তখন ব্রিটিশ রাজত্ব। এ-দিককার অনেক কোলিয়ারির মালিকানা ছিল সাহেবদের। ম্যানেজার ইঞ্জিনীয়ার বেশিরভাগই ছিল সাহেব। ওয়েলকাম কোলিয়ারিজ বলে একটা কোম্পানি ছিল সাহেবদের। এদিকে তাদের ছোট-বড় অনেকগুলো কয়লাকুঠি ছিল। ফারকোয়ার সাহেব বলে এক সাহেব ছিল। সে-ই কয়লাকুঠিগুলোর সর্বেসর্বা। এজেন্ট অ্যান্ড জেনারেল ম্যানেজার। ঘোড়া-সাহেবের কুঠি ছিল তাঁর বাংলো আর অফিস দুই-ই।"

"তা ঘোড়া-সাহেব নাম হল কেন?" তারাপদ জিজ্ঞেস করল।

"সাহেবের ঘোড়া-বাতিক ছিল। আস্তাবল ছিল বাংলোয়, ঘোড়া রাখতেন, ঘোড়ার তদ্বির করার জন্যে লোকজন থাকত। সাহেব নিজে প্রায়ই ঘোড়ায় চড়ে সকাল-বিকেল টহল মারতেন। তাই লোকে নাম দিয়েছিল ঘোড়া-সাহেব।"

তারাপদ মাথা নাড়ল। ব্যাপারটা যেন সহজ হল এতক্ষণে। বলল, "ঘোড়া-সাহেবের বাড়ি আপনি দেখেছেন?"

"দেখেছি বই কী! আমাদের ছেলেবেলায় ওটা দেখার মতন জিনিস ছিল। ধরো কলকাতায় যেমন মনুমেণ্ট। সবাই অন্তত একবার তাকিয়ে দেখে। ঘোড়া-সাহেবের কুঠি দেখা ছিল সেই-রকম। ওখানকার মানুষ, গাঁ-গ্রামের লোক, কোলিয়ারির লোক-জন, সবাই দেখত। বাইরে থেকেই। বিঘে আট-দশ জমি, মস্ত পাঁচিল, নানা রকম গাছগাছালি, ফুলের বাগান, মধ্যিখানে দোতলা বাংলো ঘোড়া-সাহেবের। পাশেই ছিল নালার মতন এক নদী, নুনিয়া। বর্ষায় জল থাকত, অন্য সময় শুকনো। ... তা আমাদের যখন বাচ্চা বয়েস, তখন ঘোড়া-সাহেব বুড়ো হয়ে

পড়েছেন। তিনি আর বেশিদিন থাকেননি, নিজের দেশে ফিরে গেলেন। অন্য কে একজন এল, তার নাম মনে নেই।"

"আপনিও কি কালীপাহাড়ির লোক?"

"না না, লোক নই। আমার মামা কাজ করত একটা কোলিয়ারিতে। মাঝে মাঝে মামার বাড়ি গিয়ে থাকতাম। আর ফকিরের সঙ্গে আমার ভাব স্কুলে। আমি শহরের স্কুল-বোর্ডিংয়ে থেকে পড়তাম, ফকির আসত বাড়ি থেকে।"

তারাপদ এবার একটা সিগারেট ধরাল। "তারপর বলুন কী হল?"

কিকিরা বললেন, "ওয়েলকাম কোম্পানির সুদিন ফুরলো। ঘুষিকের দিকের একটা কোলিয়ারিতে বিরাট এক অ্যাকসিডেণ্ট হল। আরও পাঁচরকম গোলমাল। ওয়েলকাম কোম্পানি তাদের কোলিয়ারি বেচে দিতে লাগল দু-একটা করে। ঘোড়া-সাহেবের কুঠি ফাঁকা হয়ে গেল। মারোয়াড়ি, কচ্ছিরা কোলিয়ারি কিনে নিতে লাগল। এক বাঙালি ভদ্রলোকও কিনলেন একটা। তিনিই ওই ঘোড়া-সাহেবের কুঠিটা কিনেছিলেন। বাগান-টাগানের বেশির ভাগই তখন নষ্ট। কিন্তু সেই ভদ্রলোক বেশিদিন বাঁচেননি। অ্যাকসিডেন্টে মারা গেলেন। তখন ফকিরদের উঠতি সময়, টাকা আসছে বস্তা-বস্তা। ফকিরের বাবা আর কাকা বেশ শস্তায় ওই কুঠি সেই ভদ্রলোকের স্ত্রীর কাছ থেকে কিনে ফেললেন। কেন যে কিনলেন নিজেরাও জানেন না। পয়সা আছে, লোকের কাছে চাল দেখাতে হবে বলেই বোধহয়। ওই কুঠিতে কেউ কিন্তু থাকতে যায়নি। খানিকটা ভয়ে, খানিকটা দরকার পড়েনি বলে। ঘোড়া-সাহেবের কুঠি ধীরে-ধীরে জঙ্গল হয়ে আসতে লাগল। ফকিরের বাবা কাকা এক-একসময় এক-একরকম প্ল্যান করতেন বাড়িটাকে নিয়ে। কাজে কিছুই করতেন না। শেষে ফকিরদের মন্দ দিন এল। মারা গেলেন ফকিরের বাবা। বছর কয় পরে মেজকাকা। ফকিররা সব সেয়ানা হয়ে উঠেছে ততদিনে, জমিজমা ব্যবসাপত্র দেখছে। শরিকের ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। সেটা আর থামল না। পরিবার আলাদা হল, ভাঙল, বিষয়-সম্পত্তি ভাগাভাগি হতে লাগল, মামলা ঝুলতে থাকল মাথায়।" কিকিরা একটু থামলেন। আবার বললেন, "ফকিরের নিজের ছোট ভাই তার সব বেচেবুচে বিদেশে চলে গেছে। কাকার ছেলেদের মধ্যে ছোট জন পুরীতে থাকে। ব্যবসা করে হোটেলের।"

প্যাসেঞ্জার গাড়িটা আপন খেয়ালে চলছে। থামছে, চলছে, আবার থামছে। লোকও উঠছে নামছে কম নয়।

তারাপদ বার দুই হাই তুলল। বলল, "ঘোড়া-সাহেব কুঠির ইতিহাস তো শুনলাম। কিন্তু গণ্ডগোলটা কী নিয়ে?"

কিকিরা বললেন, "গণ্ডগোল বাড়িটা নিয়ে। ফকিররা বাড়িটা তাদের বলে দাবি করছে, আবার তার খুড়তুতো ভাই বলছে, বাড়ি তাদের।"

"এটা তো মামলা-মকদ্দমা করে ঠিক করতে হবে। বাড়িটা কাদের! তাই না?"

"হ্যাঁ, সেই রকমই। কিন্তু এর মধ্যে একটা কান্ড ঘটে গিয়েছে।"

"কী কান্ড?"

"ওই বাড়ির দোতলায় একজন খুন হয়েছে।"

"খুন হয়েছে?" তারাপদ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল কিকিরার দিকে।

কিকিরা বললেন, "খুন হয়েছে, কিন্তু যে-খুন হয়েছে, তাকে ঘরে কিংবা নীচে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খুন হবার পর সে বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছে।"

তারাপদ বলল, "তা আবার হয় নাকি?"

"হয় না," মাথা নাড়লেন কিকিরা। "তুমিও জানো হয় না, আমিও জানি হয় না। কিন্তু ফকিরের বড় ছেলে বলছে সে স্বচক্ষে খুন দেখেছে।"

তারাপদ বিশ্বাস করল না। বলল, "সে কেমন করে বলছে? খুনের সময় সে ছিল সামনে?

"হ্যাঁ, ছিল।"

"বয়েস কত ছেলেটির?"

"বছর কুড়ি একুশ। ফকিরদের সব অল্পবয়সে বিয়ে-থা হত। কাজেই তার বড় ছেলে এখন সাবালক।"

তারাপদর সন্দেহ হল। বলল, "ছেলেটার মাথায় গোলমাল নেই তো?"

"আগে ছিল না। এই ঘটনার পর হয়েছে। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে আছে; ভূতে পেলে যেমন হয়।"

তারাপদ ঠিক ধরতে পারল না। "কেন?"

"ভয়ে।" বলে একটু থেমে কিকিরা আবার বললেন, "ওর মাথায় ঢুকেছে, পুলিস ওকে ধরবে। এটা ওর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ।"

"উদ্দেশ্য?"

"উদ্দেশ্য নানা রকম হতে পারে। তবে একটা উদ্দেশ্য, ফকিররা যেন আর ঘোড়া-সাহেবের কুঠির দিকে নজর না দেয়।"

"তার মানে—"তারাপদ বলল, "ফকিরের খুড়তুতো ভাইরা প্যাঁচ মেরে কুঠিটা বাগাবার চেষ্টা করছে?"

"ভাইরা নয়, ভাই। খুড়তুতো এক ভাইকে নিয়েই গোলমাল। ফকির তাই বলে।"

তারাপদ কিছুক্ষণ যেন কিছু ভাবল, তারপর বলল, "একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না। খুনই যদি হবে তবে তো সেটা পুলিসকে জানানো হয়েছে। আর পুলিস যদি জানে, তারা তো মুখ বুজে থাকবে না। ফকিরের ছেলেকেই বা ধরবে কেন?"

কিকিরা পকেট থেকে নস্যির ডিবে বার করলেন। বাহারি চৌকোনো ডিবে। তারাপদ আগে কখনো কিকিরাকে নস্যি নিতে দেখেনি। অবাক হল। কিছু অবশ্য বলল না।

নস্যির টিপ নাকের কাছে ধরে আস্তে আস্তে টানলেন কিকিরা। বললেন, "মজাটা তো সেইখানে, তারাপদবাবু! যে খুন হয়েছে তাকে যদি জলে-স্থলে খুঁজে না পাওয়া যায়—তবে পুলিসের কাছে কে প্রমাণ করবে অমুক লোক খুন হয়েছে। বড় জোর বলতে পারে—আমাদের অমুক লোক বেপাত্তা হয়েছে। ফকিরের খুড়তুতো ভাই পুলিসে যায়নি, যেতে পারছে না—শুধু এই কারণেই। প্রমাণ কী খুনের? কিন্তু থানায় না গিয়ে আড়ালে থেকে ফকিরকে চাপ দিচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে, আর তার ছেলেটাকে তো আধ-পাগলা করে তুলেছে। বুঝলে?"

"কিন্তু ফকিরের ছেলে তো খুনি নয়।" তারাপদ বলল।

"সে বলছে নয়। কিন্তু অন্যপক্ষ যদি প্রমাণ করতে পারে ফকিরের ছেলে খুনি—তা হলে!"

তারাপদ কিছু বুঝল, কিছু বুঝল না। বলল, "ভাল বুঝলাম না।"

"মুখে শুনে এর বেশি কিছু বুঝবে না। জায়গায় চলো: থাকো কয়েকদিন। ওদের সবাইকে চোখে দেখো—তখন বুঝতে পারবে।"

কিকিরা জল খাবার জন্যে উঠলেন। ওয়াটার বটল ঝুলছিল একপাশে।

জল খেয়ে আরামের শব্দ করলেন কিকিরা। "একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক, কী বলো?"

তারাপদ বলল, "নিন।"

একেবারে ভোরের মুখে কালীপাহাড়ি পৌঁছব। তুমিও শুয়ে পড়ো।।"

তারাপদর আবার হাই উঠল। সারাটা দিন কম হুড়োহুড়ি

...ন। একবার চন্দনের কাছে, তারপর অফিস, অফিস থেকে ... কিছু কেনাকাটা, সেখান থেকে কিকিরার বাড়ি। চরকিবাজি ... আজ।

হাই-জড়ানো গলায় তারাপদ বলল, "আমি কিন্তু মড়ার ঘুম ...ব। আপনি সময়-মতন ডাকবেন।"

কিকিরা বললেন, "তুমি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও।"

॥ তিন ॥

তখনও ভোর হয়নি, সাদাটে ভাব ফোটেনি আকাশে, গাড়ি ...সে কালীপাহাড়ি স্টেশনে পেঁছিল। কিকিরা খানিকটা আগেই ...রাপদকে ঘুম থেকে ডেকে দিয়েছিলেন।

স্টেশনে গাড়ি থামতেই দু'জনে মালপত্র সমেত নেমে ...লল। তারাপদর লাগেজ বলতে একটা সুটকেস আর ...ঝোলা। কিকিরার সঙ্গে ছিল কালো রঙের এক ট্রাভেলিং ...ক, গোটা দুই বেয়াড়া সুটকেস। ট্রাংকটা যে কেন ...ঙ্গে নিয়েছেন কিকিরা, তারাপদর মাথায় আসছিল না। ...কাতায় তারাপদ জিজ্ঞেস করেছিল, "এই গন্ধমাদনটা আপনি ...ন নিচ্ছেন? ওঠাতে-নামাতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে।" কিকিরা ...নিকটা রহস্য করে জবাব দিয়েছিলেন, "ওটায় আমার ...দৌলত থাকে বাপু। সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।" তারাপদ আর ...ছু বলেনি।

প্ল্যাটফর্মে নেমে তারাপদ বলল, "এখনও রাত রয়েছে।"

"আরে না, দেখতে-দেখতে ফরসা হয়ে যাবে।"

স্টেশনে লোক কিন্তু খুব একটা কম নামল না। বেশির ...ই গাঁ-গ্রামের মানুষ। প্লাটফর্মে তখনও বাতি জ্বলছে।

এমন বিদঘুটে সময় যে, কুলিও জুটছিল না। কোনো ...মে দু'জনে মালপত্র প্ল্যাটফর্মে নামাতে পেরেছে। এখন ...কাল না-হওয়া পর্যন্ত হাঁ করে বসে থাকা।

"আপনার বন্ধুর বাড়ি থেকে লোক আসবে না?" তারাপদ ...লল।

"আসবে। এত ভোর-ভোর আসা, একটু দেরি হচ্ছে ...বোধহয়।"

"আমরা তাহলে কী করব?"

"এখানে বসে থাকি খানিকক্ষণ।"

তারাপদর গা শিরশির করছিল। শরৎকাল। ভোর হয়ে ...সার আগের মুহূর্ত। এই সময় গা শিরশির করাই ...ভাবিক। ওভারব্রিজের বাঁ দিকে মস্ত-মস্ত গাছ। ডান দিকে ...র বাড়ি। আসলে স্টেশনটা নীচে, দু পাশে বালিয়াড়ির মতন ...চু জমি।

একটা সিগারেট ধরিয়ে তারাপদ কাছাকাছি পায়চারি করতে ...গল। বেশ লাগছে ঠান্ডা বাতাস, একটু হিম-হিম ভাব ...রেছে। আকাশ সাদা হয়ে আসছে বোধহয়। কিকিরা ঠিকই ...লেছিলেন।

আর খানিকটা পরে একেবারে ফরসা হবার মুখে-মুখে ...কিরের বাড়ি থেকে জনা-দুই লোক চলে এল।

দু'জনেই কিকিরার চেনা। লোচন আর নকুল। লোচন ...কিরদের বাড়ির কাজের লোক, বাইরের কাজকর্মগুলো সে ...রে; আর নকুল গাড়ির ড্রাইভার।

কিকিরার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে দু জনে ভারী ট্রাংকটা ...তুলে নিল। বললে, গাড়িতে রেখে আবার আসছে।

তারাপদ কৌতূহলের সঙ্গে দু'জনকেই দেখছিল। ...দু'জনেই গড়নে-পেটনে তাগড়া। নকুল বেঁটে, বয়েসেও কম, ...পঁচিশ হবে। একমাথা চুল, ভোঁতা মুখ। লোচনের বয়েস ...খানিকটা বেশি, বছর পঁয়ত্রিশ তো হবেই। মাথায় সে মাঝারি।

দু'জনে যেভাবে অক্লেশে ভারী ট্রাংকটা নিয়ে ওভারব্রিজে উঠতে লাগল, মনে হল এ-সব তাদের কাছে সাধারণ ব্যাপার।

তারাপদ তারিফ করার গলায় বলল, "গায়ে বেশ ক্ষমতা তো?"

কিকিরা বললেন, "ওরা কি কলকাতার লোক হে, রোদে-জলে তেতেপুড়ে মানুষ। ওই নকুল সের দেড়েক ভাত নাকি একপাতে বসে খেতে পারে। বিশ-পঁচিশখানা রুটি হজম করা ওর কাছে কিছুই নয়।"

হাসল তারাপদ। "খাইয়ে লোক।"

"শুধু খাইয়ে নয়, খুন-জখম করতেও ওস্তাদ।"

ঘাবড়ে গেল তারাপদ। "মানে? ও কি খুন-জখম করে বেড়ায়?"

"খুন করে কি না জানি না, তবে জখম করে। ফকিরের গাড়ি নকুলই চালায়। ফকির একলা বড়-একটা দূরে কোথাও যায় না গাড়ি নিয়ে।"

"কেন?"

"এমনিতে তো শত্রুর অভাব নেই আজকাল। তার ওপর ব্যবসাপত্রের জন্যে দূরে যখন যেতে হয়, কাঁচা টাকা সঙ্গে থাকে। হয় আদায় করে ফিরছে, না হয় সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। রাত-বিরেত হয়ে যায়। এ-সব জায়গায় হামেশাই ডাকাতি হয়।"

"নকুল তা হলে ফকিরবাবুর বডিগার্ড?" তারাপদ বলল।

"খানিকটা তাই।"

ফরসার ভাব আরও বেড়ে গেল। এখন কাছাকাছি অনেক কিছুই চোখে পড়ছে স্পষ্টভাবে। তারাপদ স্টেশন, গাছপালা, প্লাটফর্ম দেখছিল।

লোচন আর নকুল ফিরে এল।

জিনিসপত্র উঠিয়ে চার জনেই এবার এগিয়ে চলল ওভারব্রিজের দিকে।

তারাপদ হাঁটতে হাঁটতে গন্ধ শুঁকছিল। সকালের গন্ধ। গাছগাছালি থেকে কী সুন্দর গন্ধ উঠেছে এই সকালে, বনতুলসীর ঝোপ বাঁ দিকে, তারই সামান্য তফাতে মাঠ। ওভারব্রিজের বাঁ দিক থেকে চোখে ফিরিয়ে সামনে তাকালে কিছুটা দূরে কয়লার স্তূপ চোখে পড়ে, সেই কয়লার একটা কাঁচা গন্ধও যেন বাতাসে মেশানো রয়েছে।

"এ-দিকে হে," কিকিরা তারাপদকে ডান দিকে টানলেন।

ওভারব্রিজের ডান দিক দিয়ে নীচে নামলেই স্টেশনের কম্পাউন্ড। একটা জীপগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বোঝাই যায় ফকিরবাবুর জীপ। দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, বেশ পুরনো কাজ-চালানো গোছের গাড়ি।

স্টেশনের দোকানপত্র এক-এক করে খোলার তোড়জোড় চলছিল। চায়ের স্টলের সামনে উনুনে ধোঁয়া উঠছে, দুটো কুকুর ঘুমিয়ে রয়েছে একপাশে, বারোয়ারি কলতলায় নিমের দাঁতন হাতে একটা কুলি দাঁড়িয়ে আছে।

তারাপদ বলল, "এক কাপ চা খেয়ে নিলে হত না?"

"বেশ তো, চলো," কিকিরা বললেন, "আমারও হাই উঠছে।" বলেই লোচনকে ডাকলেন, "লোচন, চা-সেবা হবে নাকি? তোমরা মালগুলো রেখে এসো।"

স্টলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন কিকিরা। চায়ের কথা বললেন।

চা-অলা সকালের বউনির জন্যে মন দিয়ে চা করতে লাগল।

"কেমন লাগছে, তারাপদ?"

"ভালই লাগছে।"

"খানিকটা ভেতর দিকে চলো, আরও ভাল লাগবে। একসময় বড় সুন্দর জায়গা ছিল— এখন কোলিয়ারি আর

কয়লা সব গিলে খাচ্ছে। গাছপালা, মাঠঘাট কতটুকু আর আছে!"

চা তৈরি হল। কিকিরা লোচনদের ডাকলেন।

খানিকটা সঙ্কোচ বোধ করলেও লোচনরা কাছে এল, চায়ের খুরি হাতে নিয়ে আবার জীপগাড়ির দিকে চলে গেল।

তারাপদ আর কিকিরা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চা খেতে লাগলেন।

তারাপদ হঠাৎ বলল, "ফকিরবাবুর জীপ দেখে মনে হচ্ছে ওটারও ঘুম ভাঙেনি।" বলে হাসল। "কেমন ময়লা দেখছেন?"

কিকিরা বললেন, "কোলিয়ারির গাড়ি ওই রকমই হয় হে, এ কি তোমার কলকাতা? কয়লার দেশ। চলো না, রাস্তাঘাটের চেহারা দেখবে।"

জীপগাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তারাপদ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "ফকিরবাবুর কি ওই একটিই ছেলে?"

"দুটি ছেলে, একটি মেয়ে। বড় বিশু—মানে বিশ্বময়; ছোট, অংশু। মেয়ে সকলের ছোট। পূর্ণিমা। বড় মিষ্টি দেখতে! ফকিরের ছেলেমেয়েদের সকলকেই দেখতে সুন্দর। ফকির নিজেও দেখতে সুপুরুষ ছিল। গ্রামে যাত্রাপার্টি করেছিল ফকির, রাজাটাজা সাজত।" কিকিরা হাসলেন।

চা খাওয়া শেষ করে তারাপদ আবার একটা সিগারেট ধরাল। একটা কথা সে স্পষ্টই বুঝতে পারছিল: কিকিরা ফকিরের বাল্যবন্ধু শুধু নন, ফকিরকে তিনি ভালবাসেন। কিকিরার কথাবার্তা বলার ধরনে সেটা বোঝা যায়।

পয়সা মিটিয়ে দিয়ে কিকিরা বললেন, "চলো, যাওয়া যাক।"

কিকিরা আর তারাপদকে সামনেই বসিয়ে নিল নকুল। পেছনে মালপত্র সমেত লোচন।

স্টেশনের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে গাড়ি ডান দিকে ঘুরল।

তারাপদর ভালই লাগছিল। কিকিরা মিথ্যে বলেননি। জীপ মিনিট দশেক ধরে চলছে, সকালও হয়ে গিয়েছে, রোদ উঠল এইমাত্র, রাস্তা ভাল নয়, কিন্তু চারপাশে কত রকম দৃশ্য ছড়িয়ে আছে। মস্ত-মস্ত নিমগাছ, বট, ছোট-ছোট কুঁড়ে, সাঁওতাল গোছের মেয়ে-পুরুষ চোখে পড়ছে, মুরগি চরছে কুঁড়ের সামনে, কুকুর, হঠাৎ খানিকটা জায়গায় ধানের খেত, তারপরই নেড়া মাঠ, কোথাও সামান্য জল জমে রয়েছে পুকুরের মতন, শালুক ফুল ফুটেছে, আবার দূরে তাকালে কোলিয়ারির পিটও দেখা যাচ্ছে।

দেখছিল তারাপদ। জায়গা বেশ শুকনো, পানা-পুকুর কিংবা বাঁশঝাড় চোখে পড়ে না। বরং পলাশ-ঝোপ আর কুল-ঝোপই বেশি চোখে পড়ে। হ্যাঁ, একপাশে অনেক কাশফুল ফুটে আছে। বাতাসে দুলছে। চোখ জুড়িয়ে যায়।

জীপ আরও খানিকটা এগিয়ে বাঁ দিকে ঘুরল।

কিকিরা বললেন, "আর তিন-চার মিনিট।"

তারাপদর হঠাৎ ঢাকের আওয়াজ কানে এল। কোথায় যেন ঢাক বেজে উঠল। এই বাজনা একেবারেই আলাদা, কলকাতার মতন নয়, কানে বড় মিষ্টি লাগছিল। মনে পড়ল, আজ সপ্তমী পুজো। কলকাতায় থাকলে তারাপদ এতক্ষণে বটুকবাবুর মেসে পড়ে-পড়ে ঘুমোত। আর এখানে সে চোখ চেয়ে-চেয়ে সব দেখছে: ওই যে কত বড় ধানখেত, সবুজ হয়ে রয়েছে, মাথা দুলছে ধানের শীষের; ওই দেখো কত বিরাট এক পুকুর, আট দশটা আমগাছ ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে; ছোট্ট এক টুকরো খেত, সবজি ফলেছে। চোখ যেন জুড়িয়ে গেল তারাপদর। আকাশ রোদে-রোদে ভরে উঠছে, পাখি উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে সাঁতরে।

কেমন যেন ঘোর এসেছিল তারাপদর, আচমকা জীপগা[ড়ির] হর্নে চমকে উঠল। তারপরই দেখল, দোতলা এক বিরাট বা[ড়ির] সামনে এসে তাদের গাড়ি থামল। ওই বাড়িরই গা-লাগ[োয়া] ঠাকুর-দালান থেকে ঢাকের শব্দ আসছে।

কিকিরা নেমে পড়লেন। তারাপদ আগেই নেমেছে।

"ফকিরদের বাড়ি," কিকিরা বললেন, "আদি বাড়ি।"

বাড়িটা দেখলেই বোঝা যায় এ-কালের সঙ্গে তার কো[নো] সম্পর্ক নেই, পুরনো ঢঙ, পুরনো ছাঁদ। কলকাতায় চিৎপু[রের] গলির মধ্যে, বউবাজারের এ-গলি ও-গলিতে এই ছাঁদের ন[...] দেখেছে তারাপদ। সামনের দিকে কোনো ভাঙচুর নেই, একে[বারে] সটান, লম্বার দিকটা বেশি, বড়-বড় থাম, মোটা পা[...] খড়খড়ি-করা দরজা জানলা। রং-চং তেমন কিছু চো[খে] পড়ছিল না।

লোচন আর নকুল জিনিসপত্র নামাতে লাগল।

তারাপদ জিজ্ঞেস করল, "এ-বাড়ি কত কালের?"

"সামনের দিকটা অনেককালের। শ' খানেক বছরের। পেছ[নের] দিকটা পরে হয়েছে—ফকিরের বাবা-কাকারা করেছিলে[ন]। তাও সেটা ধরো বছর পঞ্চাশ-ষাট আগেকার।"

"ঠাকুর-দালান বাইরে কেন?"

"অন্দর-মহল আলাদা রাখার জন্যে। গ্রামের লোকজন আ[সে] যায়, দু-চারটে দোকানও বসে, তার ওপর ওই যাত্রা—এ-সা[বের] জন্যে বোধহয়। ভেতরেও ফকিরদের গৃহদেবতার [...] রয়েছে।"

কথা বলতে-বলতে তারাপদ কিকিরার সঙ্গে ভেতরে এ[...] এসে অবাক হয়ে গেল। বাইরে থেকে বোঝাই যায় না যে, ভেতর [...] স্কুল-বাড়ির মতন। মাঝখানে মস্ত চাতাল— অনায়াসেই টেনি[স] খেলা যায়—এত বড়সড় ফাঁকা জায়গা। আর চারদিক ঘি[রে] ফকিরের বাড়ি। সবটুকুই প্রায় দোতলা, শুধু একপাশে খানিকটা একতলা। দোতলার বারান্দা আর রেলিং দে[খা] যাচ্ছিল।

এক তলার দিকটা আঙুল দিয়ে দেখালেন কিকিরা। "[...] আমাদের আস্তানা। বাইরের লোকজন এলে ওখানে থাকে।"

"কিন্তু আপনি তো বাইরের লোক নন, স্যার।"

"না, ঠিক সে-ভাবে নই, তবে যেখানের যা আচার। আ[মি] যখনই আসি ওখানে থাকি।"

"আসেন মাঝে-মাঝে?"

"আসি। ফকির আমার নিতান্ত বন্ধুই নয়, ভাইয়ের মতন।"

তারাপদ আর কিছু বলল না।

প্রায় গোটা বাড়ি পাক দিয়ে তারাপদ নিজেদের জায়গা[য়] এসে পৌঁছল। ততক্ষণে লোচনেরা ঘর খুলে দিয়েছে। জিনিসপত্রও রাখছে নামিয়ে। ফকিরদের বাড়ির লোকজনের গ[লা] পাওয়া যাচ্ছিল। দু-একজনকে দেখাও গেল।

ঘরে ঢুকে তারাপদ থমকে দাঁড়াল। তাকাল চারপা[শে]। তারপর বলল, "বাঃ! বেশ ঘর তো!"

পছন্দ হবার মতনই ঘর। বড়সড়। বিরাট-বিরাট জানল[া], কাচের সার্সি আর খড়খড়ি দুইই রয়েছে। দরজা জানলা সব খোলা। বাইরে গাছপালা, বাগান। রোদ নেমেছে বাগানে।

কিকিরা বললেন, "এটা আমার ঘর; তোমারটা পাশে।"

তারাপদ অবাক হয়ে বলল, "এত বড়-বড় ঘরে মাত্র একজনে[র] থাকবার ব্যবস্থা?"

হাসলেন কিকিরা। বললেন, "একেই বলে বনেদিয়ানা। ফকি[রের] লাটের ব্যাপার!" বলে আবার হাসলেন, "আমরা ফকিরে[র] বড়লোকি দেখে ওকে ঠাট্টা করে লাট বলতাম।"

তারাপদ আসবাবপত্র দেখছিল। যা যা প্রয়োজন সব

...হে : খাট, টেবিল, চেয়ার, আলনা। একেবারে সাজানো-...হনো।

...লোচনরা গেল পাশের ঘর খুলতে।

তারাপদ ঘরের বাইরের দিকের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ...শ দেখছিল। এ-দিকটায় বাগান। গাছগাছালি কম নয়। ...ও ঢাক বাজছে। শিউলি ফুলের গন্ধও পাচ্ছিল তারাপদ।

হঠাৎ বিশ্রী কানফাটা আওয়াজে চমকে উঠল তারাপদ। ...-সঙ্গে সরে গেল একপাশে। গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ। ...য় অনেকটা ছড়িয়ে গিয়েছে শব্দটা। কাক ডাকছে, পাখিরা ... পেয়ে ডেকে উঠল। উড়তে লাগল গাছপালার মাথায়।

কিকিরা চেঁচিয়ে বললেন, "দরজার কাছ থেকে সরে ...।"

তারাপদ সরে গেল। আর কোনো শব্দ হল না।

॥ চার ॥

হাত-মুখ ধুয়ে কিকিরা আর তারাপদ চা খেতে বসেছে, ...চন এসে বলল, কর্তাবাবু আসছেন।

তারাপদর মনটাই বিগড়ে গিয়েছিল। সপ্তমী পুজোর ...লটা শুরু হয়েছিল ভাল, চমৎকার লাগছিল তারাপদর, ...খ জুড়িয়ে আসছিল, ঝরঝরে লাগছিল শরীর-মন, হঠাৎ ...থেকে একটা বন্দুক ছোঁড়ার আওয়াজে সব নষ্ট হয়ে গেল। ... বন্দুক ছুঁড়ল, কেনই বা ছুঁড়ল, তাও বোঝা গেল না।

কিকিরা বললেন, "দেখো তারাপদ, বন্দুক যেই ছুঁড়ুক, ...মাদের লক্ষ করে ছোঁড়েনি। তা যদি ছুঁড়ত তবে আগেই ...ড়ত। জীপে করে যখন আসছিলাম। বাড়িতে পেঁছিনোর পর ...ন আমাদের দিকে নজর দেবে? ওটা অন্য কিছু। ফকির ...সুক, জানা যাবে।"

যুক্তিটা তারাপদও স্বীকার করল। মন কিন্তু বিগড়েই ...কল।

"ফকিরবাবুর খুড়তুতো ভাইরা কোথায় থাকেন?" তারাপদ ...জ্ঞেস করল।

"ভাইরা মানে অমূল্যদের বাড়ি। সে-বাড়ি এখান থেকে ...ক মাইলটাক হবে। এই যে বাড়ি দেখছ ফকিরদের, এই ...মই দেখতে, তবে বাহার একটু বেশি, আকার কিছু ছোট।"

"আপনি তো ওদের চেনেন?"

"মুখে চিনি একজনকে, ফকিরের খুড়তুতো ভাইকে ...মূল্যকে। অমূল্যর ছেলেমেয়েদের চিনি না।"

"মানুষ কেমন?"

"সুবিধের নয় শুনেছি। বুদ্ধি খুব প্যাঁচালো, বুকের ...টা রয়েছে অমূল্যর, শুনেছি খুনটুন করিয়েছে, বেআইনি ...জকর্ম করে।"

তারাপদ এক কাপ চা শেষ করে আরও এক কাপ ঢালতে ...গল। এখানে সবই বোধহয় এলাহিকান্ড। সাত-আট কাপ চা ...রি করে একটা কাচের পটে করে দিয়ে গিয়েছে লোচন, বড় ...া কাচের প্লেটে একরাশ মিষ্টি।

চটির শব্দ পাওয়া গেল বাইরে। ফকির রায় ঘরে ঢুকলেন। ...রাপদ তাকাল।

কোনো সন্দেহ নেই ফকির রায় সুপুরুষ। মাথায় বেশ ...ম্বা, ছ'ফুট তো হবেই। গায়ের রঙ নিশ্চয় টকটকে লালই ...ল কোনো সময়ে, বয়েসে এবং এই কয়লার দেশে সে-রঙ ...লে এখন তামাটে দেখায়। কাটা-কাটা চোখমুখ, নাক লম্বা, ...ন শক্ত। মাথার চুল কোঁকড়ানো। অবশ্য চুল বেশি নেই ...াথায়। অল্পস্বল্প পেকেছে।

ফকির একেবারে সাদামাটা পোশাকেই এসেছেন। পরনে দামি ...া লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, হাতে সিগারেটের প্যাকেট আর

লাইটার। গলা আর গেঞ্জির ফাঁকে পইতে দেখা যাচ্ছিল।

"এই যে কিঙ্কর, তুমি তা হলে ঠিক সময়-মতনই এসে পড়েছ?" ফকির বললেন।

কিকিরা বললেন, "আমি ভাবছিলাম, তোমারই না ভুল হয়ে যায়।...আলাপ করিয়ে দিই। এই হল সেই তারাপদ। এর কথা তোমায় বলেছি। আমার সাকরেদ। আর এক সাকরেদ—চাঁদু ডাক্তার, সে পুজোর পর আসবে।" বলে কিকিরা তারাপদর দিকে তাকালেন, "তারাপদ, ফকিরের পরিচয় তো তুমি শুনেছ। এখন চোখে দেখো।"

তারাপদ হাত তুলে নমস্কার জানাল।

ফকিরও নমস্কার জানিয়ে কাছে এসে চেয়ার টেনে বসলেন।

কিকিরা বললেন, "নাও, চা খাও। আজ তোমার সকাল-সকাল ঘুম ভাঙল নাকি?"

বাড়তি কাপ ছিল। কিকিরা চা ঢেলে দিলেন।

ফকির বললেন, "ঘুমোলাম কোথায় যে ভাঙবে! সারা রাত জেগে। সকালে চোখ লেগেছিল, তা তুমি আসবে ... , একবার লোচনকে দেখতে বেরুলাম। ফিরে আর ঘুম এল না। নানান চিন্তা।" ফকির চায়ের কাপ তুলে নিলেন।

তারাপদ ফকিরের মুখ দেখছিল। মণির রঙ বেশ কটা, চোখের পাতা মোটা। সারা মুখে ক্লান্তি ও অশান্তির ছাপ। অনিদ্রার জন্যে ফকিরের চোখমুখ শুকনো দেখাচ্ছিল।

কিকিরা বললেন, "খানিকটা আগে বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ হল? ব্যাপারটা কী?"

ফকির একটু চুপ করে থেকে বললেন, "বিশু ছুঁড়েছে।"

কিকিরা যেন চমকে উঠলেন, "সে কী! বিশু? বিশু বন্দুক পেল কোথায়? তার কিছু হয়নি তো?"

"না, কিছু হয়নি।...বন্দুকটা আমার। কদিন ধরে ঘরেই রাখছি, কেমন একটা ভয় এসে গিয়েছে কিঙ্কর। কিসের ভয় তোমায় ঠিক বোঝাতে পারব না। আমার শোবার ঘরে হাতের নাগালের মধ্যে রাখি বন্দুকটা।"

পুজোর
বাহার
তন্তুজ
শাড়ী
বাংলার তাঁতের কাপড়
দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড
ABC/T/96/80 BEN

"তা না হয় রাখো; কিন্তু বিশুর হাতে গুলিভরা বন্দুক গেল কেমন করে? তা ছাড়া তুমি নিজেই জানো, বন্দুক তো বড় কথা, একটা সামান্য ছুরি ওর হাতে পড়াও সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার।"

ফকির অপরাধীর মতন মুখ করলেন। "সবই জানি ভাই। তবু কেমন করে যে হল...!"

"কেমন করে?"

"আমার মনে হয়, আমি যখন নীচে লোচনকে ডেকে দিতে এসেছিলাম তখন বোধহয় বিশু আমার ঘরে ঢুকেছিল।"

"ও ঘুমোয়নি?"

"হয়তো রাত্তিরে ঘুমিয়েছিল। ঘুম ভেঙে গিয়েছিল শেষ রাত্রে।"

"ওকে তো ঘুমোবার ওষুধ খাওয়ানো হয়?"

"খায়। তবে সব সময় যে সমান কাজ করবে ওষুধে—তা তো নয়।"

কিকিরা আর কোনো কথা বললেন না। বোধহয় ফকিরকে চা খাবার সময় দিলেন।

ফকির চা খেতে-খেতে একটা সিগারেট ধরালেন। অন্যমনস্ক, চিন্তিত। তারাপদর দিকে তাকালেন ফকির। ম্লান হাসলেন, "আমি বেশ খানিকটা পারিবারিক গন্ডগোলের মধ্যে আছি। কিঙ্করের কাছে শুনেছেন?"

মাথা হেলাল তারাপদ। "শুনেছি।...গুলির শব্দে বেশ ঘাবড়েই গিয়েছিলাম।"

ফকির সিগারেটে প্যাকেটটা তারাপদর দিকে ঠেলে দিলেন। "ঘাবড়ে যাবার মতনই ব্যাপার। বন্দুকে টোটা ভরা ছিল। বিশু একটা অঘটন ঘটাতে পারত। ঘটায়নি এই আমার সৌভাগ্য। মা বাঁচিয়েছেন।" ফকির হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বোধহয় দেবী দুর্গাকেই স্মরণ করলেন।

তারাপদ বেশ খুঁটিয়ে লক্ষ করছিল ফকিরকে। শক্ত মানুষ নিশ্চয়, সংসারের আপদ-বিপদে পোড় খাওয়া, তবু ফকিরকে কেমন ভীত চিন্তিত দেখাচ্ছে।

কিকিরা হঠাৎ বললেন, "বিশু এমনিতে কেমন আছে?"

"সেই রকমই। উনিশ-বিশ। ভালমন্দ বোঝা যায় না। তবে আগের চেয়ে খারাপ নয়।"

"ডাক্তার আসছে?"

"কাল আসেনি। পরশু এসে দেখে গিয়েছে।"

"কে থাকছে ওর কাছাকাছি?"

ওর মা থাকত। গত পরশু দিন ভবানী এসেছে। ভবানীই থাকে এখন।"

"ভবানী কে?"

"আমার ভাগ্নে। বড়দির ছেলে। বিশুর চেয়ে বছর দুয়েকের বড়, দুজনে মেলামেশা বরাবরই।"

কিকিরা চুপ করে গেলেন। কিছু ভাবছিলেন।

তারাপদ অনেকক্ষণ কথাবার্তা কিছু বলেনি। তার মনে হল, দু-একটা কথা বলা দরকার ফকিরবাবুর সঙ্গে, নয়তো বড় খারাপ দেখাচ্ছে। তারাপদ বলল, "বিশু বন্দুক ছুঁড়তে পারে? না এমনি অন্ধাধাড়াক্কা ছুঁড়ে ফেলেছে?"

ফকির তাকালেন তারাপদর দিকে, "পারে। আমার ছোট ছেলেও বন্দুক ছুঁড়তে জানে।"

কথাটা এমনভাবে বললেন ফকির যে, তারাপদর মনে হল, এ-বাড়ির ছেলেদের ওটা শিখে রাখতেই হয়।

"ও বাড়ির খবর কী?" কিকিরা জিজ্ঞেস করলেন।

"অমূল্যদের কথা বলছ? কাল একবার এসেছিল। ওরাও আজকাল দুর্গা পুজো করে, বলতে এসেছিল। বিশুকে দেখতে চাইছিল। এড়িয়ে গিয়েছি।"

কিকিরা কপাল কুঁচকে চোখ ছোট করে ফকিরকে দেখছিলেন। দেখতে-দেখতে বললেন, "কিছু বলল?"

"না, সরাসরি কিছু বলল না। তবে হাবেভাবে বুঝিয়ে গেল, বিশুকে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল।"

"তুমি কিছু বললে না?"

"বলেছি। ঘুরিয়ে বলেছি। বিশুর যদি কেউ ক্ষতি করার চেষ্টা করে আমি তাকে ছেড়ে দেব না। আমার হাতে সে মরবে।" ফকিরের কটা চোখ ঝকঝক করে উঠল প্রতিহিংসায়।

কিকিরা তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে নিলেন। "না না, এখন মাথা গরম করে কাজ করার সময় নয়, ফকির। মাথা গরম করলে কিচ্ছু হবে না। ঠান্ডা মাথায় যা করার করতে হবে। তা ছাড়া তুমি অত ভাবছ কেন? অমূল্যদের হাতে যদি তেমন কোনো প্রমাণ থাকত তবে তারা থানা-পুলিস না করে বসে থাকত নাকি এতদিন?"

"সবই জানি, ভাই। আমার বরাতের দোষ, নয়তো আর কী বলব বলো? আমি নিজেই বুঝতে পারি না, বিশু কেন, কার পাল্লায় পড়ে ঘোড়াসাহেবের কুঠিতে গেল? কী দরকার ছিল তার ওখানে যাবার?"

কিকিরা বললেন, "ছেলেমানুষ, এত কি বুঝতে পেরেছিল!... যাক সে পরে ভাবা যাবে। এখন অন্য কটা কাজের কথা বলি শোনো।"

"বলো?"

"তোমার কাছে তোমাদের সাত-পুরুষের একটা বংশলতিকা গোছের কি আছে না?"

"আছে একটা। সাতও হতে পারে, দশও হতে পারে।"

"সেটা একবার পাঠিয়ে দিতে পারো না?"

"অনায়াসেই পারি।"

"তা হলে পাঠিয়ে দিও, এ-বেলাতে।...এবার আর একটা কথা বলো, তোমার বাবা কাকারা তিন ভাই ছিলেন তো?"

"হ্যাঁ। তিন ভাই দুই বোন।"

"অমূল্যের বাবা তোমার মেজো কাকা? ছোট কাকা মারা গেছেন। কবে তুমি জানো?"

"জানি বই কী। বছর বারো—হ্যাঁ, মোটামুটি তাই হবে।"

"তুমি বলেছিলে এখানে মারা যাননি।"

"না। ছোটকাকার শেষের দিকে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী ভাব হয়েছিল। বাড়ি ছেড়ে চলে যেত। কোথায় ঘুরে বেড়াত কে জানে! কেউ বলত শ্মশানে বসে সাধনা করে, কেউ বলত পঞ্চকোট পাহাড়ের তলায় ধুনি জেবলে বসে থাকে। আমরা সঠিক কিছু জানি না।"

"ছোটকাকা মারা গিয়েছেন এটা কেমন করে জানলে?"

"একদিন এক গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী এসে খবর দিয়েছিল।"

"কী ভাবে মারা গিয়েছিলেন ছোটকাকা?"

"সাপের কামড়ে।"

"মৃতদেহ তোমরা কেউ দেখোনি তো?"

"না। বরাকর নদীতে মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।"

"সেই কাকার কে কে আছে?"

"কাকিমা বেঁচে আছেন। কাকার ছেলেমেয়ে নেই। কাকিমা এখানে থাকেন না। বহুকাল। বাপের বাড়ি কাশীতে। সেখানেই থাকেন। আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই নেই। তা তুমি এ-সব জিজ্ঞেস করছ কেন? সবই তো আগে শুনেছ!"

কিকিরা তারাপদর দিকে আঙুল তুলে দেখালেন, "তারাপদ শুনে রাখল।...যাক, তুমি একবার তোমাদের ওই বংশের লিস্টিটা পাঠিয়ে দাও। ভাল করে একবার দেখব। আর শোনো, আজ বিকেলে আমি আর তারাপদ একবার ঘোড়া-সাহেবের

কুঠিতে যাব। তারাপদকে দেখিয়ে আনব কুঠিটা। তুমি কিছু ভেবো না। আমরা সাবধানে যাব-আসব।"

॥ পাঁচ ॥

ফকির রায়দের বাড়ি থেকে ঘোড়া-সাহেবের কুঠি মাইল দুয়েকের পথ। মাঠঘাট ভেঙে গেলে সামান্য কম। ফকির চেয়েছিলেন, কিকিরাদের সঙ্গে নকুল যাক জীপ নিয়ে; কিকিরা রাজি হননি। জীপের দরকার নেই, মাঠ ভেঙে হাঁটা পথে তাঁরা চলে যাবেন। জীপ সঙ্গে থাকলে পাঁচজনের চোখ পড়বে, হাঁটা পথে বেড়াতে বেরুলে কে আর নজর করবে।

বিকেল ছোট হয়ে আসছে, আলো থাকতে-থাকতেই কুঠিতে পৌঁছতে চান কিকিরা; পড়ন্ত বেলার রোদ নিস্তেজ হয়ে আসার আগেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন তারাপদকে নিয়ে।

রোদ সরাসরি মুখে লাগায় সামান্য অস্বস্তি হচ্ছিল তারাপদর। নয়তো এই হাঁটা পথ তার ভালই লাগছিল। এখানকার মাঠের চেহারা খানিকটা আলাদা, অনবরত উঠছে আর নামছে, যেন ঢেউ-খেলানো মাঠ, মাটির রঙ কোথাও-কোথাও গেরুয়া রঙের হলেও বেশির ভাগটাই কালচে গোছের। পায়ে-পায়ে পলাশ-ঝোপ, আর আকন্দ। কিকিরা চিনিয়ে দিচ্ছিলেন: ওটা শিশুগাছ, ওকে বলে অর্জুন।

কিকিরা যে এই অঞ্চলের অনেক কিছুই জানেন, বেশ বোঝা যাচ্ছিল। এমন-কী, তিনি ঘোড়া-সাহেবের কুঠি যাবার মেঠো রাস্তাও বেশ চেনেন।

তারাপদ একবার ঠাট্টা করেই বলেছিল, "কিকিরা স্যার, ঠিক রাস্তায় নিয়ে যাবেন তো?"

কিকিরা জবাব দিয়েছিলেন, "চলো দেখবে, সব জায়গায় মার্কা করে এসেছি।"

কথাটা ঠিকই। কদিন আগেই কিকিরা ফকিরের বাড়িতে এসে দশ-পনেরো দিন থেকে গিয়েছেন, তখন লোচনকে নিয়ে বার তিনেক এই হাঁটা পথেই ঘোড়া-সাহেবের কুঠিতে গিয়েছেন এসেছেন। অবশ্য কোথায় কী মার্কা করে এসেছেন তিনিই জানেন।

মাঠ দিয়ে যেতে-যেতেই সামান্য তফাতে কয়লাখনিও চোখে পড়ছিল। লোহার উঁচু-উঁচু থাম, তার মাথায় বিশাল চাকা ঘুরছে, ডুলি উঠছে নামছে, কয়লার টব গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে কুলি মজুর, এক-এক জায়গায় কয়লার পাহাড় জমে আছে, বাতাসে কেমন কয়লা-কয়লা গন্ধ।

বেশ খানিকটা রাস্তা এগিয়ে এসে গাছপালা ঝোপ-ঝাড় পাওয়া গেল। ছায়াও ঘন। তারাপদ বলল, "স্যার, একটু জল খেয়ে নিই। আপনার বন্ধুর বাড়িতে যেভাবে খেয়েছি তাতে গলা পর্যন্ত বুজে আছে এখনও।"

তারাপদর কাঁধেই জলের বোতল ঝুলছিল। কিকিরাই নিতে বলেছিলেন। তারাপদ জল খেল।

কিকিরাও জল খেয়ে নিলেন। ঢিলেঢালা পোশাক তাঁর, হাতে একটা সরু ছড়ি, হাতলটা ছাতার হাতলের মতন বাঁকানো। ঘন খয়েরি রঙ ছড়িটার; বোঝাই যায় না ওটা লোহার।

জল খেয়ে তারাপদ একটা সিগারেট ধরাল। আবার হাঁটতে লাগল দুজনেই।

হাঁটতে হাঁটতে কিকিরা বললেন, "তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করি তারাপদ। ফকিরদের যে বংশতালিকা দেখলে, তা থেকে কিছু আন্দাজ করতে পারো?"

তারাপদ বলল, "সত্যি কথা বলতে কী কিকিরা, ওই টেবল—কিংবা বলুন চার্ট—এর ছেলে অমুক, তার ছেলে তমুক—এ-সব আমার মাথায় ঢোকে না। একরাশ নাম দেখলাম এই মাত্র।"

"তা ঠিক। নাম থেকে কী আর বোঝা যায়?" বলে সামান্য চুপ করে থেকে কিকিরা আবার বললেন, "আচ্ছা ফকিরের ছোটকাকা সম্পর্কে তোমার কী মনে হয়?"

"ছোটকাকা! মানে সেই সন্ন্যাসী! তিনি তো মারা গিয়েছেন।"

"হ্যাঁ। কিন্তু কেউ চোখে দেখেনি। লোকের মুখের খবর থেকে জেনেছে ফকিররা।"

তারাপদ বেশ অবাক হয়ে কিকিরার মুখের দিকে তাকাল। "আপনার কথা বুঝলাম না। আপনার কি মনে হয় ছোটকাকা মারা যাননি?"

"তা আমি বলছি না। হয়তো গিয়েছেন।...আবার ধরো নাও যেতে পারেন?"

"মানে?"

"মানেটা তো এখন বোঝা যাচ্ছে না। ...তাছাড়া আরও একটা ব্যাপারে আমার খটকা লাগছে। ফকিরের ঠাকুরদারা দুই ভাই। বড় হলেন ফকিরের ঠাকুরদা। ছোটজনের একটি ছেলের নাম দেখতে পেলাম ওই লিস্টিতে, কিন্তু তারপর আর কোনো নাম নেই। অর্থাৎ ফকিরদের ছোট ঠাকুরদার বংশের মাত্র একজনকে পাচ্ছি। অন্যরা কোথায়? কেউ কি ছিল না?"

তারাপদ এত জটিল ব্যাপার বুঝল না। বলল, "আপনার সন্দেহটা আমি বুঝতে পারছি না।"

কিকিরা হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, "বিষয়-সম্পত্তি, ধন-দৌলত নিয়ে বড়-বড় রাজ-রাজড়াদের মধ্যে যত না গন্ডগোল বাধে, এই সব ছোটখাট রাজা-টাইপের লোকের মধ্যে তার চেয়ে ঢের বেশি গোলমাল। উটকো বড়লোকদের মধ্যে আকছার। তাছাড়া এই সব এলাকায় পারিবারিক ঝগড়াঝাটি, খুনোখুনি, মামলা-মকদ্দমা খুব বেশি। আমার মনে হচ্ছে, ফকিরদের ফ্যামিলিতে আরও কিছু রহস্য আছে।"

"সে তো আপনারই জানার কথা। ফকিরবাবু আপনার বন্ধু।"

"বন্ধুরাও সব সময় সব কথা বলে না। যেমন আজ ফকির বলল, তার ছেলে বিশু বন্দুক ছুঁড়েছিল। আমার কিন্তু কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না।"

তারাপদ কোনো কথা বলল না। বরং কিকিরার মাথায় কেমন করে এত উদ্ভট চিন্তা আসে ভেবে অবাক হচ্ছিল।

আরও কিছুক্ষণ হেঁটে আসার পর কিকিরা তাঁর ছড়ি তুলে দূরে কিছু দেখালেন। বললেন, "ওই যে দেখো, দেখতে পাচ্ছ? ওটাই ঘোড়া-সাহেবের কুঠি।"

তারাপদ দূরে তাকাল। গাছপালার জঙ্গলের মতন খানিকটা জায়গা, ঘর-বাড়ি কিছুই চোখে পড়ে না। তারাপদ বলল, "ওই জঙ্গলটা?"

"আর-একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবে।"

বেশি এগিয়ে যেতে হল না, গাছপালার ফাঁক দিয়ে একটা বাড়ির সামান্য অংশ চোখে পড়ল। তারাপদ বলল, "নদী কোথায়? আপনি বলছিলেন বাড়ির পাশে নদী আছে?"

"নদী নয়; নালা। এখানকার লোক নদীই বলে। নুনিয়া নদী। এখান থেকে দেখতে পাবে না। বাড়ির কাছে গেলে পাবে। নুনিয়া ও-পাশ দিয়েই চলে গিয়েছে।"

"জল নেই?"

"বর্ষাকালে থাকে। ভরেই থাকে। এখন হাঁটুতক থাকতে পারে। চলো দেখা যাবে।"

"আপনি কদিন আগেই এসেছিলেন, তখন ছিল?"

"অল্প।"

কথা বলতে-বলতে কুঠির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তারাপদরা। সামান্য পরে একেবারে কাছাকাছি এসে গেল।

ঘোড়া-সাহেবের কুঠির কাছে এসে তারাপদ থমকে দাঁড়াল।

কিকিরার কথা থেকে এতটা বোঝেনি সে। এখন বুঝতে পারছে। বিশাল-বিশাল গাছপালায় ঘেরা একটা পরিত্যক্ত, ভাঙা দুর্গের মতনই দেখতে। মনে হয়, এককালে এখানে বোধহয় কোনো রাজাগজা দুর্গ বানিয়ে থাকত।

কিকিরা বললেন, "এদিক দিয়ে এসো। পেছন দিক দিয়ে হবে।"

"কেন? সামনে কেউ থাকে?"

"সাবধানের মার নেই। তাছাড়া সামনে দিয়ে ঢুকতে পারবে না। সদর-ফটকটা কাঁটা-তার দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে। আসা-যাওয়ার পথ বন্ধ। আগাছার পাঁচিল হয়ে গেছে ওখানটায়।"

তারাপদ কিকিরার কথামতন তাঁর পেছন-পেছন এগুতে লাগল। নালার মতন নদীটাও চোখে পড়ল এবার। বালি আর পাথর, মাঝ-মধ্যিখানে গোড়ালি-ডোবা জল। চারদিক ফাঁকা, মাঠ আর মাঠ, একেবারে নেড়া মাঠই বলা যায়, গাছপালা নামমাত্র।

এবড়ো-খেবড়ো জমি, কাঁটা-ঝোপ, বনতুলসীর ভেতর দিয়ে এগুতে-এগুতে তারাপদ বুঝল, কিকিরা একটা ঢোকার রাস্তা আগেই বেছে রেখে গিয়েছেন। অবশ্য না বেছে রাখলেও চলত, কেননা কুঠিবাড়ির চারদিকে যে মানুষ-সমান উঁচু পাঁচিল, তার অনেক জায়গাই ভেঙে গিয়েছে, ভেতরের গাছপালার শেকড় পাঁচিল ফাটিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া ওই আম-জাম-জারুলের ডালপালা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, সামান্য চেষ্টা করলেই পাঁচিলের বাইরে থেকে হাত পাওয়া যায়।

রোদের তাত আর নেই, আলোও মরে এসেছে। চারদিক থেকে গাছপালার জংলা গন্ধ ছড়াচ্ছিল, বনতুলসীর গন্ধ বেশ ভারী, অজস্র নয়নতারা ফুটে আছে, কাঁটাঝোপে নানা রঙের ছোট-ছোট ফুল।

অনেকটা হেঁটে এসে কিকিরা বললেন, "এসো। ওই ফাটলটার মধ্যে দিয়ে ঢুকে যাব।"

"পেছনে কোনো ফটক নেই?"

"আছে। গোটা দুয়েক আছে। ছোট ছোট। সেদিকটা এত অপরিষ্কার নয়। তবু ওখান দিয়ে ঢুকব না।"

"কেন বলুন তো? বাড়ির চেহারা দেখে মনে হচ্ছে এখানে কেউ ভুলেও পা দেয় না। এক যদি ভূতটুত থাকে তো আলাদা কথা।" তারাপদ ঠাট্টা করেই বলল শেষের কথাগুলো।

কিকিরা বললেন, "ভূতের কাছে সাহস দেখানো ভাল। কিন্তু অদ্ভুতের কাছে নয়। এখানে যদি অদ্ভুত কিছু দেখো। এসো। সাবধানে আসবে।"

ভাঙা পাঁচিলের গায়ে আতা-ঝোপ, কোনোরকমে শরীরটাকে গলানো যায়। কিকিরা রোগা মানুষ, দিব্যি গলে গেলেন। তারাপদ কিকিরার মতন করে সাবধানে ভেতরে মাথা গলিয়ে দিল।

পাঁচিলের এ-পারে গাছ। লতাপাতার জঙ্গল। দু-চার পা এগুতেই বড়-বড় গাছের সারি। কতকালের পুরনো। ডাল-পালায় ছায়া করে রেখেছে নীচেটা। খানিক পরে সূর্য ডুবে গেলে হয়তো অন্ধকার হয়ে যাবে।

কিকিরার পাশে-পাশে আসছিল তারাপদ। গাছপালা পেরিয়ে আসতেই ঘোড়া-সাহেবের কুঠির মুখোমুখি হল। না, তারাপদ কল্পনাই করতে পারেনি এই কুঠি এত বড়, শুধু আর শেষ চোখে যেন ধরাই যায় না। বিশাল বাড়ি। গড়নটা কলকাতার পুরনো সাহেববাড়ির মতন, অন্তত পাশ থেকে সেই রকমই দেখাচ্ছে। পাথরের বাড়ি। রোদে বৃষ্টিতে পড়ে থাকতে থাকতে পাথরের গায়ে শ্যাওলা ধরে-ধরে কালচে রঙ হয়ে গিয়েছে। বিশাল-বিশাল জানলা। জানলার মাথাগুলো বাঁকানো। খড়খড়ি করা পাল্লা। কোনোটা বন্ধ, কোনোটা ভেঙে জানলার গায়ে ঝুলছে। ভেতরের সার্সিও ভাঙাচোরা। বাড়ির গা-বেয়ে বাঁধানো নালা ছিল চারপাশে জল যাবার জন্যে, আবর্জনায় ভরতি হয়ে সেখানে আগাছা জন্মেছে নানারকমের।

বাড়িটা দোতলা হলেও অনেক উঁচু দেখাচ্ছিল। সেকালের বাড়ি, তার ওপর সাহেব-বাড়ি—উঁচু ভিত, উঁচু ছাদ—দোতলাই বোধহয়, সাধারণ বাড়ির চারতলার কাছাকাছি। তারাপদ বলল. 'কত উঁচু হবে? ওই ছাদ পর্যন্ত?"

"তা বলতে পারব না। আগেকার দিনে বাংলো-বাড়ির ঘরও যত বড় হত, মাথার ছাদও তত উঁচু হত। এতে ঘর ঠাণ্ডা থাকে, বাতাস-চলাচল ভাল হয়। আসলে এইটেই ছিল তখনকার ধরন। কলকাতার বনেদি পুরনো বাড়িতেও এই রকম দেখবে।"

"আপনি তেতলা থেকে লাফ মারার কথা বলেছিলেন না? তেতলা কোথায়?"

"এ-বাড়ির দোতলার ছাদ কম করেও সাধারণ বাড়ির তেতলা হবে। তাই নয়? আমি কতটা উঁচু থেকে লাফ মারা হয়েছিল সেটা বোঝাতে চেয়েছিলাম। ধরো, পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ ফুটের কাছাকাছি হবে ছাদটা।"

তারাপদ অত বুঝল না।

কিকিরা ধীরে-ধীরে বাড়ির সামনের দিকে এগুতে লাগলেন। এক সময় বাংলো ঘিরে রাস্তা ছিল। সেই রাস্তা এখন ঘাস আর বুনো লতায় ভর্তি, ফাটল ধরেছে, এবড়ো-খেবড়ো হয়ে আছে।

"একটু সাবধানে," কিকিরা বললেন, "সাপখোপ আছে কিন্তু।"

তারাপদ সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে উঠল। সাপের নামে গা শিরশির করে উঠেছিল। বলল, "আপনি কি আমাকে সাপের মুখে ফেলবেন?"

কিকিরা হাসলেন। "কলকাতার ছেলে তোমরা, সাপের নামেই চমকে ওঠো। না, তোমায় সাপের মুখে ফেলব না। আমি নজর রাখছি।"

তারাপদ ভয়ে-ভয়ে বলল, "বিষাক্ত সাপ রয়েছে?"

"থাকলে বিষাক্তই থাকবে," কিকিরা মজার গলায় বললেন। "কেউটে, গোখরো!"

তারাপদ দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, "তা হলে আর এগিয়ে দরকার নেই। ফিরে চলুন। বিকেল শেষ হয়ে আসছে। এখুনি ঝপ করে অন্ধকার হয়ে যাবে। সাপের মুখে পড়ার চেয়ে ফিরে যাওয়াই ভাল।"

কিকিরা বললেন, "তা ঠিক। অন্ধকারে এ-বাড়ির চারপাশে ঘোরাঘুরি করা ভাল না। বিপদ হতে পারে। বাড়িটা তোমাকে চোখের দেখা দেখাবার জন্যে এনেছিলাম। কেমন দেখছ?"

"পুরনো সাহেবি কেল্লার মতন?"

কিকিরা তাঁর ঢিলেঢালা পোশাকের ভেতর থেকে বায়নোকুলার বের করে তারাপদকে দিলেন। বললেন, "এটা চোখে দিয়ে দেখো।"

তারাপদ দূরবিন চোখে লাগিয়ে দেখতে লাগল বাড়িটা। সেকেলে কোনো বিশাল ইমারতের মতনই দেখাচ্ছিল। দেওয়ালের গায়ে গাছ পর্যন্ত গজিয়ে গিয়েছে।

"কত ঘর আছে জানো এই বাড়িটায়?" কিকিরা বললেন. "মোটামুটি কুড়ি পঁচিশটা। বাড়ির সামনের দিকে ছিল ঘোড়া-সাহেবের অফিস। পেছনে থাকত খানসামা, বাবুর্চি, আয়া। আস্তাবল ছিল আলাদা। ঘোড়া থাকত। সাহেব থাকত ওপরে। বুড়োবুড়ি। মেয়ে থাকত দার্জিলিংয়ে। ছেলে বিলেতে।"

তারাপদ লক্ষ করছিল, বিকেল পড়ে যাবার পর খুব তাড়া-তাড়ি ছায়া ঘন হয়ে আসছে। হয়তো আর আধ ঘন্টার মধ্যে অন্ধকার নেমে যাবে। তার অশান্তি হচ্ছিল। ভয় করছিল। এত গাছপালা জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে তার সাহস হচ্ছিল না। বাড়িটাও ভীষণ ভুতুড়ে দেখাচ্ছিল। দূরবিন নামিয়ে [illegible]

তারাপদ।

কিকিরা আবার এগ্রুচ্ছেন দেখে তারাপদ বলল, "আবার কোথায় যাচ্ছেন?"

"চলো, সামনেটা একবার দেখে আসবে?"

"না। অন্ধকার হয়ে যাবে।"

"হবে না। এসো। আমার সঙ্গে টর্চ আছে।"

"আপনি স্যার বেশি-বেশি সাহস দেখাচ্ছেন। অন্ধকার হয়ে গেলে এই ঝোপঝাড় গাছপালা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাব কেমন করে?"

"চলে যেতে পারব। এসো। দাঁড়িয়ে থেকো না।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারাপদ পা বাড়াল। তার ভাল লাগছিল না।

খানিকটা এগিয়ে তারাপদ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিকিরাও দাঁড়ালেন।

"কিসের শব্দ?" তারাপদ বলল।

"বাড়ির ভেতর থেকে আসছে?" কান পেতে থাকলেন কিকিরা।

শব্দটা দূরে মেঘ ডাকার মতন লাগছিল অনেকটা। বাড়ল। তারপর থেমে গেল হঠাৎ।

তারাপদর গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। কিকিরার দিকে তাকিয়ে থাকল বড়-বড় চোখ করে।

কিকিরা যেন কিছু ভাবছিলেন। বললেন, "না, ফিরেই চলো।"

"শব্দটা কিসের?"

"বুঝতে পারছি না। মনে হল, কোনো ভারী জিনিস কেউ সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে দিয়েছে। কাঠের সিঁড়ি। শব্দ হচ্ছিল।"

"বাড়িতে কেউ আছে তা হলে?"

"থাকাই সম্ভব। যে আছে সে হয়তো আমাদের দেখতে পেয়েছে। বোধহয় ভয় দেখাল।" কিকিরা তারাপদকে টেনে নিয়ে ফিরতে লাগলেন।

॥ ছয় ॥

অষ্টমী পুজোর দিন সকাল থেকেই মেঘলা। বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে মেঘলা আরও ঘন হয়ে এল। বৃষ্টি যেন মেঘের নীচে দাঁড়িয়ে আছে—যে-কোনো সময় ঝাঁপিয়ে পড়বে। ওরই মধ্যে ফকির রায়দের ঠাকুর-দালানে পুজো চলছিল। ঢাক বাজছে, ফকিরদের বুড়ো পুরোহিত পুজোয় বসেছেন, অন্দরমহলের লোকজন বাইরে, ঠাকুর দালানে, গ্রামের অনেকেই এসেছে পুজোতে। কলকাতার বারোয়ারি পুজো নয়, গ্রামের বাড়ির পুজো, তারাপদ একপাশে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ পুজো দেখল। ভালই লাগছিল তার। শহুরে জাঁকজমক নেই, অথচ কিসের যেন এক সাদামাটা সৌন্দর্য রয়েছে।

শেষ পর্যন্ত তারাপদ ঠাকুর-দালান ছেড়ে চলে এল। ঘরে গেল না। কাছাকাছি খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করার জন্যে বেরিয়ে পড়ল। বৃষ্টি আসতে পারে। এলেও ক্ষতি নেই। কাছাকাছি থাকবে তারাপদ।

ফকির রায়দের বাড়ির শ'খানেক গজের মধ্যেই গ্রাম। বোধ হয় গ্রামের শুরু, কেননা, যত পুব দিকে যাওয়া যায় ততই ঘরবাড়ি বেশি করে চোখে পড়ে। পাকা বাড়ি, কাঁচা বাড়ি, দু-রকম বাড়িই রয়েছে। চোখে দেখলে মনে হয়, নিতান্ত ছোট গ্রাম নয়। তিরিশ-চল্লিশ ঘর লোকের বসবাস তো নিশ্চয়। কোথাও আকন্দগাছের বেড়া, কোথাও কাটাগাছের, বাঁশের খুঁটি আর কাঁটাতার দিয়েও কেউ-কেউ বেড়া বেঁধেছে, নানা ধরনের গাছপালা, শিউলি করবী জবা, কোথাও লাউ কিংবা কুমড়োর মাচা। পুজো বলেই বাড়ির সামনের দাওয়া নিকোনো, গ্রামের মুদির দোকানের বেঞ্চিতে বসে আছে কেউ কেউ, ময়রা-দোকানে ফুলুরি ভাজা চলছে, একরাশ ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে।

তারাপদ যেন মজা পাচ্ছিল। ফুলুরি খাবার সাধ হলেও এগুল না। সময় বুঝে এক বেলুনঅলাও হাজির হয়েছে। কাঁধে কাগজের খেলনা, কাঁধের ঝুলিতে বেলুন, এক হাতে সাইকেলের পাম্প, মুখে একটা বিচিত্র হুইসল। মাঝে মাঝে হুইসল বাজাচ্ছে।

এগিয়ে আসতেই তারাপদ পুকুর দেখতে পেল। খুব বড় নয়। পুকুরের চার দিকেই কিছু গাছপালা। জনা দুই লোক পুকুরের পাশে সবজি-খেতে কাজ করছে।

আরও সামান্য এগুতেই পেছন থেকে যেন কে ডাকল। দাঁড়াল তারাপদ। ঘুরে তাকাল।

বাউল বৈরাগী গোছের কে একজন এগিয়ে আসছে। বোধ হয় গাছপালার আড়ালে ছিল—চোখে পড়েনি।

কাছে এসে লোকটি তারাপদকে দেখল সামান্য, তারপর হাত জোড় করে নমস্কার করল। "বাবু নতুন বটে। চিনতে লারছি।"

তারাপদ লোকটাকে নজর করতে লাগল। বয়েস হয়েছে। একমাথা বাবরি চুল। জট পড়েছে যেন। মুখে দাড়ি, অর্ধেক সাদা হয়ে গেছে। গায়ে একটা আলখাল্লা ধরনের জামা। হয়তো কোনো কালে জামাটার রঙ গেরুয়া ছিল, এখন মাটির মতন রঙ ধরেছে। পায়ে ছেঁড়া ফাটা চটি। লোকটা মাথায় লম্বা। তবে রোগা। মুখের আদলও লম্বা। সাদামাটা নিরীহ মুখেই তাকিয়ে ছিল লোকটা।

তারাপদ বলল, "হ্যাঁ, আমি নতুন।"

"কুথা থেকে আসছেন বটে?"

"কলকাতা।"

"কে আছেন হেথায়? লিজের লোক?"

"ফকিরবাবুর বাড়িতে উঠেছি। তুমি এখানে থাকো?"

"আজ্ঞা, না। আমার গাঁ দামড়া। চতুর্দিকেই ঘুরি ফিরি। বাবু ঘুরতে এসেছেন?"

"হ্যাঁ, বেড়াতে।"

"একা বটে?"

"না," মাথা নাড়ল তারাপদ। "সঙ্গে লোক আছে" বলে তারাপদ হঠাৎ কেমন সাবধান হয়ে গেল। সন্দেহের চোখে লোকটাকে দেখল। "তোমার নাম কী?"

লোকটা আচমকা কেমন থতমত খেয়ে গেল। মুখে এক রকম হাসি। সামান্য যেন শুকনো দেখাল হাসিটা। তারপর বলল, "আমাদের নির্দিষ্ট ডাক নাই, বাবু। যে যেমন ডাকে। কেউ হাঁকে খেপা, কেউ ডাকে বোরেগি। আমার নাম শশিপদ পণ্ডিত।"

তারাপদ হাসির মুখ করল। "বাঃ, বেশ নাম।"

আরও দু-একটা মামুলি কথার পর তারাপদ আকাশের দিকে তাকাল। বলল, "বৃষ্টি আসবে। আমি চলি।"

শশিপদ দাঁড়িয়ে থাকল। তারাপদ ফিরতে লাগল। অনেকটা এগিয়ে এসে পেছন ফিরে তাকাল একবার, দেখল, শশিপদ পুকুরের দিকে চলে যাচ্ছে।

তারাপদ খুব সময়ে বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিল। বৃষ্টি নেমে গিয়েছে। দু-চার ফোঁটা জল গায়ে মাথায় মেখে তারাপদ কিকিরার ঘরে গিয়ে হাজির।

কিকিরা জানলার কাছে চেয়ার টেনে বসে আছেন। সামান্য তফাতে টেবিলের ওপর একটা বন্দুক পড়ে আছে।

তারাপদ বেশ অবাক হল। বন্দুক কেন ঘরে! কার বন্দুক?

"ঘরে বন্দুক কেন, কিকিরা?" তারাপদ বলল।

কিকিরা খুবই অন্যমনস্ক। কিছু ভাবছেন। আজ সকালেও তারাপদ কিকিরাকে অন্যমনস্ক দেখেছে।

তাকালেন কিকিরা। "বেড়ানো হল?"

"হ্যাঁ, তা হয়েছে। কিন্তু বন্দুক সামনে রেখে বসে আছেন

...ন ?"

"দেখছিলুম। বোসো।"

জলের ছাঁট এদিকের জানলায় আসছে না। বাইরের কালচে ... আরও ঘন হয়ে বৃষ্টি বেশ জোরেই নেমেছে।

তারাপদ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। বলল, "ফকিরবাবুর ...ক ?"

মাথা নাড়লেন কিকিরা। "না। আমার।"

"আপনার বন্দুক? আপনার আবার বন্দুক হল কবে?" ...রাপদ বিশ্বাস করতে পারছিল না। আবার একবার বন্দুকটার ...কে তাকাল।

কিকিরা বললেন, "ওটা আমারই বন্দুক। ম্যাজিক-বন্দুক ...তে পার। ম্যাজিক দেখাবার সময় দরকার হত। বাইরে থেকে ...ছু বুঝবে না। ভেতরে তেমন কিছু নেই।"

তারাপদ নিশ্বাস ফেলল। "সত্যি-বন্দুক তা হলে নয়। ... আপনি আনলেন কেমন করে? সঙ্গে তো দেখিনি?"

"ট্রাংকে ছিল। খোলা যায় পার্টসগুলো।"

"সত্যি কিকিরা, আপনি মিস্টিরিয়াস—" তারাপদ হেসে ...লল। "কালো ট্রাংকটায় কি ম্যাজিকের জিনিস ভরে ...নেছেন?"

"কিছু কিছু এনেছি। দাও, একটা ধোঁয়া দাও।"

তারাপদ সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই দিল কিকিরাকে। দু...েই সিগারেট ধরাল।

তারাপদ বলল, "এবার আপনাকে আমি সারপ্রাইজ দেব। ...নিকটা আগে একজনের সঙ্গে আলাপ হল। নাম শশিপদ ...। বলল, বৈরাগী।"

তাকালেন কিকিরা। "এই গ্রামের লোক?"

"না, ঠিক এই গ্রামের নয় বলল।" বলে তারাপদ শশিপদর ...গে দেখা হবার ঘটনাটা পুরো বলল।

কিকিরা কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, "লোচনকে জিজ্ঞেস ...লেই বোঝা যাবে ওই নামে আশেপাশের গ্রামে কেউ থাকে কি ...। তা ছাড়া এই গ্রামে আসা-যাওয়া করলে লোকে নিশ্চয় ...কে চিনবে।"

"ডাকব লোচনকে?"

"এখন কি তাকে পাবে? শুনছিলাম এই সময়টায় সন্ধি-...জো। ফকির তাই বলছিল।"

জানলার বাইরে আরও তোড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। মেঘও ডাকছিল। ...রের দিকে তাকিয়ে তারাপদ বলল, "ফকিরবাবুর সঙ্গে দেখা ...ছিল?"

"হ্যাঁ। খানিকটা আগে উঠে গেল। স্নান করে সন্ধিপুজো ...তে যাবে।"

ইতস্তত করে তারাপদ আবার বলল, "কালকের কথা ...লেছেন?"

"বলেছি।...ফকির বিশ্বাসই করল না, ঘোড়া-সাহেবের ...তে কেউ থাকতে পারে। বলল, পুরনো বাড়ি, অনেক কিছুই ...চুরে পড়ে। হয়তো কিছু ভেঙে পড়েছিল।"

"কোথাও কিছু নেই, ভেঙে পড়বে?"

"হতে পারে। তা আমি ঠিক করলাম, আগামী কাল ...লের দিকে আমরা আবার ঘোড়া-সাহেবের কুঠিতে যাব।" ...ে মুহূর্তের জন্যে থেমে আবার বললেন, "এবার শুধু তুমি ... আমি নয়। সঙ্গে ফকির থাকবে। নকুলকেও সঙ্গে নেব। ...কে নিতে পারলে আরও ভাল হত। কিন্তু তাকে নেবার ... নেই।"

"বিশুকে কেন নেবেন?"

"ঠিক কোথায়, কোন জায়গায় খুনের ব্যাপারটা ঘটছিল ... জানা দরকার। কখনো শুনছি পুব দিকের ঘরে, কখনও শুনছি উত্তর দিকের ঘরের বড় জানলার কাছে। সঠিকভাবে বলতে পারছে না।"

"যে জানালার কাছেই হোক, তফাত কোথায়?"

"তফাত," কিকিরা তারাপদর চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে থেকে একটু যেন হাসির মুখ করলেন, "তফাত অনেক। সে তুমি এখনও বুঝতে পারবে না।"

"আপনি বুঝেছেন?"

"না," মাথা নাড়লেন কিকিরা, "বুঝিনি; বোঝার চেষ্টা করছি।"

তারাপদ চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল। বৃষ্টির তোড় কমে এসেছে খানিকটা। শরৎকালের বৃষ্টির অনেকটা এই ধরন।

কিকিরা বললেন, "তোমার সঙ্গে খানিক পরামর্শ করা যাক।...কাল থেকে আজ পর্যন্ত যা দেখলে তাতে কিছু আন্দাজ করতে পারো?"

তারাপদ ভাবল সামান্য। মাথা নাড়ল। "না, আমি কিছুই আন্দাজ করতে পারছি না। সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে অপরিষ্কার।"

"যেমন?"

"প্রথমত ধরুন, ঘোড়া-সাহেবের কুঠি নিয়ে ফকিরবাবুদের মধ্যে রেষারেষি এত বেশি হবে কেন? অন্য পাঁচটা সম্পত্তি যদি তাঁরা ভাগাভাগি করে নিয়ে থাকতে পারেন, এটাও পারতেন। যদি ভাগাভাগিতে রাজি না-থাকতেন, মামলা-মকদ্দমা করতেন—তারপর কোর্টের বিচারে যা হবার হত। মামলা তো ও'দের হাতের পাঁচ।"

কিকিরা বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ। ফকিররা পাঁচ-সাতটা মামলা তো লড়ছেই, আর-একটা বেশি হলে কোনো ক্ষতি হত না। কিন্তু তারা লড়ছে না। কেন? এর নিশ্চয় কোনো কারণ রয়েছে। কারণটা কী?"

"সে তো আপনার বন্ধু ফকিরবাবু বলবে।"

"ফকির বলছে না। এড়িয়ে যাচ্ছে। ও যা বলছে তাতে মনে হয়, নেহাতই রেষারেষির ব্যাপার। আমার কিন্তু তা মনে হয় না।"

"আপনার কী মনে হয়?"

"ঘোড়া-সাহেবের কুঠির মধ্যে অন্য কোনো রহস্য আছে। সেটা যে কী রহস্য তা আমি তোমায় বলতে পারছি না।"

"যদি কোনো রহস্য থাকে—সেটা কি এতকাল পরে জানা গেল?"

কিকিরা বললেন, "বোধহয় তাই। তা বলে ভেব না আমি বলছি দু'দশ দিনের মধ্যে জানা গিয়েছে। হয়তো আরও আগে গিয়েছে। তবে খুব বেশিদিন আগে নয়।"

তারাপদ কী মনে করে ঠাট্টার গলায় বলল, "কোনো গুপ্ত-ধনের খবর পাওয়া গিয়েছে নাকি?"

কিকিরা বললেন, "হতে পারে।"

তারাপদ চুপ করে থাকল।

সামান্য পরে কিকিরাই আবার বললেন, "দ্বিতীয় ব্যাপারটা হল, ফকিরের ছেলে বিশু কেন ঘোড়া-সাহেবের কুঠিতে গিয়েছিল?"

কেন গিয়েছিল তারাপদ জানে না, কিকিরাও নয়। ফকিরও বলেছেন তিনি জানেন না। সত্যি বলেছেন না মিথ্যে বলেছেন তিনিই জানেন।

তারাপদ যা শুনেছে তা এই রকম : ঘোড়া-সাহেবের কুঠির কাছাকাছি নুনিয়ার এক পাশে এক সাধু এসে আড্ডা গেড়েছিল। বিশাল এক বটগাছের তলায় বসে থাকত সাধুবাবা। ধুনিও জ্বালাত না, গাঁজাও খেত না। শুধু একটা ত্রিশূল সাধুবাবার সামনে মাটিতে পোঁতা থাকত। ... [illegible]

জংগল কুকুর। সাধুবাবার খবর কিছুদিনের মধ্যে সর্বত্র রটে যাবার পর অনেকেই বাবাকে দেখতে যেত। অসুখ-বিসুখের ওষুধ চাইত, ভাগ্যে কী আছে জানতে চাইত। সাধুবাবা কথাবার্তা বড় বলত না, ওষুধ-বিষুধও দিত না। তবে খেয়ালের মাথায় দু-এক জনকে গাছ-গাছড়ার কথা বলে দিয়েছে। বিশুর এক বন্ধু আছে কাছাকাছি এক কোলিয়ারিতে। ম্যানেজারের ছেলে। সে-বেচারির মা অসুখে খুব ভুগছিল। ছেলেটির বাবা সাধুবাবার কাছে গিয়েছিল দৈব কোনো ওষুধ চাইতে। বন্ধুর মুখ থেকে সাধুবাবার কথা শুনে বিশু সাধুর কাছে গিয়েছিল। সাধুবাবা বিশুকে পরের দিন একা দেখা করতে বলে। বিশু জিজ্ঞেস করেছিল, কেন সে দেখা করবে? সাধুবাবা কথার কোনো স্পষ্ট জবাব দেয়নি; শুধু বলেছিল ঃ 'তোর মঙ্গল হবে।'

পরের দিন যাব কি যাব-না করে বিশু সাধুবাবার কাছে যায়। বাড়িতে কাউকে কিছু বলেনি। বিকেলের পর সাধুবাবা বিশুকে যেতে বলেছিল। বিশু সেই সময়েই যায়। বিকেল শেষ হয়ে আসার পর সাধুবাবা অন্য যে দু-পাঁচজন ছিল তাদের সরিয়ে দিয়ে, বিশুকে নিয়ে ঘোড়া-সাহেবের কুঠির মধ্যে ঢোকে। সঙ্গে অন্য কেউ ছিল না। শুধু কুকুরটা ছিল। কুঠির মধ্যে বেশ খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে শেষে সাধুবাবা তাকে দোতলার বড় একটা ঘরে নিয়ে যায়। সেই ঘরে বিশু আরও দুজনকে দেখতে পায় ঃ একজন চরণমামা, মানে অমূল্যর শালা, অন্য একজন চরণের সঙ্গী, বিশু তাকে চেনে না।

সাধুবাবার সঙ্গে চরণমামার কথা-কাটাকাটি বেধে যায়, কুকুরটা চেঁচাতে থাকে, আর হঠাৎ চরণমামার সঙ্গী সাধুবাবার কুকুরটাকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারে। প্রচণ্ড জোরে। এত আচমকা ঘটনাটা ঘটে যায় যে, বিশু প্রথমটায় ভয় পেয়ে পালাতে যাচ্ছিল। পালাতে গিয়ে তার সঙ্গে চরণের সঙ্গীর ধাক্কা লাগে। বন্দুক পড়ে যায় সঙ্গীর হাত থেকে। বিশু সেটা কুড়িয়ে নিতে যায়। বন্দুকটা সে তুলেই নিচ্ছিল। চরণমামা তার হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নেয়। তখনই সাধুবাবাকে গুলি করা হয়। সাধুবাবা জানলা দিয়ে লাফ মারছে—বিশু দেখেছে। তারপর কী হয়েছে তার খেয়াল নেই। শুধু সে যে পালাতে পেরেছিল এইটুকু তার মনে আছে।

যা শুনেছে তারাপদ সেই ঘটনা থেকে স্পষ্ট করে কিছুই ধরা যায় না। তবু একবার ঘটনাটা ভেবে নিল।

তারাপদ বলল, "সাধুবাবা বোধহয় বিশুকে কোনো গোপন খবর দিতে চাইছিল। দেখাতে চাইছিল কিছু।"

কিকিরা বললেন, "হতে পারে। নাও পারে। সেই খবর শোনার জন্যে বিশু গিয়েছিল? না, এমনিই গিয়েছিল? মনে রেখো, বিশু ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষের মনে নেহাতই একটা কৌতূহল থাকতে পারে। কিংবা ধরো, বিশু খানিকটা ভয়ও পেয়েছিল। সাধুবাবার কথা না শুনলে পাছে অমঙ্গল হয়।"

"সেই সাধুবাবাই বা কোথায় গেল?"

"সেটাও একটা রহস্য।...রহস্য অনেক। কে এই সাধুবাবা? কোথায় গেল সে? কেন ওই কুঠিবাড়িতে চরণ গিয়েছিল, তার সঙ্গীই বা কে? বন্দুক কেন ছিল চরণদের সঙ্গে? এতগুলো কেনর কোনো জবাবই পাচ্ছি না, তারাপদ।"

তারাপদ বলল, "আপনার একার পক্ষে কি এতগুলো কেনর জবাব খুঁজে পাওয়া সম্ভব, কিকিরা? আমার মনে হয়, ফকিরবাবুর উচিত ছিল পুলিসের কাছে যাওয়া।"

মাথা নাড়লেন কিকিরা। "তাতে লাভ হত না।"

"কেন?"

সাধুবাবাই যেখানে বেপাত্তা সেখানে বিশু কেমন করে প্রমাণ করত যে, সাধুবাবা তাকে কুঠিতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল? তা ছাড়া, চরণ আর চরণের সঙ্গী কুঠিতে ছিল এটাও সে প্রমাণ করতে পারত না। কেননা, চরণরা অস্বীকার করত।"

"তা হলে চরণরাই বা কেমন করে বিশুকে ফাঁসাতে পারে?"

"পারে না। পারছে না বলেই চুপ করে আছে। তবে ওরা একেবারে চুপ করে নেই। বাইরে চুপ। ভেতরে-ভেতরে ফকিরকে অস্থির করে তুলেছে।"

তারাপদ চুপ করে থাকল। তার মাথায় কিছু আসছিল না।

বৃষ্টি থামেনি। তোড় অনেকটা কমে এসেছে। কালচে আলো অল্প পরিষ্কার হয়েছে।

মাথার চুল ঘাঁটতে-ঘাঁটতে কিকিরা বললেন, "কাল আমরা ঘোড়া-সাহেবের কুঠিতে যাব। তন্ন-তন্ন করে সব দেখব। চরণরা মিছেমিছি কুঠিতে যাবে না। তারা কেন যেত? কী তাদের উদ্দেশ্য? আর ওই সাধুবাবাই বা কে?"

তারাপদ বলল, "চরণ নিশ্চয় অমূল্যর কথা-মতন কাজ করত? তাই না?"

"নিশ্চয়। তাছাড়া চরণ লোক ভাল নয়। পাকা শয়তান বলে আমি শুনেছি।"

তারাপদ আর কোনো কথা বলল না।

॥ সাত ॥

পরের দিন ফকিরের যাওয়া হল না। আগের দিন রাত্রে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পা হড়কে পড়ে গোড়ালি মচকে ফেলেছেন। বাঁ পায়ের গোড়ালি গোদের মতন ফুলে গিয়েছে; ব্যথা প্রচণ্ড। বসার ঘরে বসে গুলাব লোশান লাগাচ্ছেন।

ফকির যেতে পারলেন না, কিন্তু তিনি নকুলকে সঙ্গে দিলেন। বললেন, "গাড়ি নিয়ে যাও, নকুলও সঙ্গে থাক।"

জীপের রাস্তা সরাসরি নয়, খানিকটা ঘোরা পথে যেতে হয়। রাস্তাও পাকা নয়, কোথাও মাটি আর নুড়ি-ছড়ানো রাস্তা, কোথাও ঘেঁষ ছড়ানো, কোথাও বা একেবারে মেঠো পথ।

সঙ্গে লোচনও ছিল।

যেতে-যেতে সাধারণ কিছু কথার পর কিকিরা লোচনকে বললেন, "সেই শশিপদর খবর পেলে, লোচন?"

"আজ্ঞা না। দামড়া গাঁয়েও নাই।" লোচন বলল।

"নেই তো গেল কোথায়? ওর বাড়ি দামড়া গাঁয়ে।"

লোচন বলল, "উ মস্ত খেপা, বাবু! আজ হেথায়, কাল

...ধায়—, কুথায় যে থাকে খেপা কেউ বলতে লারে। তবে ...য়ের লোকে বলল বটে খেপা গাঁয়ে ঘোরাফেরা করছিল।''

নকুল গাড়ি চালাতে-চালাতে বলল, ''শশিপদ বড় একটা ...ব বটে, বাবু। চিতি সাপেরও বিষ নামায়।''

কিকিরা আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, ''তাই নাকি! শশী তো ...শী লোক, হে। শুনি কিছু, বলো বটে উর কথা।''

তারাপদ মুচকি হাসল। কিকিরার কথা শুনেই।

লোচন শশিপদর বৃত্তান্ত বলতে লাগল, মাঝে-মাঝে নকুলও ...ছিল দু চার কথা।

শশিপদ দামড়া গ্রামের লোক। বরাবরই খেপাটে ধরনের। একটা কুঁড়ে ঘর আর একফালি সবজি বাগানের বেশি ওর কিছু ছিল বলে কেউ জানে না। গানটান গাইতে পারত শশী। গ্রামের ...দলে গানটান গাইত। শশীর মাসি মারা যাবার পর অনেকদিন ...আর নিজের গ্রামে ছিল না। কোথায় চলে গিয়েছিল কে জানে! ...বার ফিরে এল। একেবারে বোষ্টম বৈরাগীর বেশ। ফিরে আসার ...র জানা গেল, শশী ওঝাগিরি শিখেছে। গাছ-গাছড়ার ওষুধ ...তে পারত, কাউকে সাপে কামড়ালে বিষ নামাত। শশিপদর হাতে ...পে কামড়ানো লোক অনেকেই বেঁচে গিয়েছে। যারা মারা ...য়েছে তাদের জন্যে শশী অনেক করেছিল, বাঁচাতে পারেনি। ...র হাসপাতালে পাঠিয়েও তো সাপে-কামড়ানো রোগী মরে। ...াট কথা, শশিপদ খেপা হলেও তার কতক গুণ রয়েছে।

কিকিরা আর-কিছু জিজ্ঞেস করলেন না, শুধু তারাপদকে ...লেন, ''এদিকে সাপের উৎপাত বেশ, বুঝলে তারাপদ। ...ঝে-মাঝেই সাপের কামড়ে লোক মারা যায়।''

তারাপদ প্রথমটা ধরতে পারেনি, পরে কিকিরার চোখের দিকে ...াকিয়ে ধরতে পারল। কিকিরা বোধহয় ফকিরের ছোটকাকার ...্যাপারটা ইঙ্গিত করলেন। অবশ্য এই দুইয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক তারাপদ খুঁজে পেল না। ফকিরের ছোটকাকা সাপের কামড়ে মারা গিয়েছেন, আর শশিপদ সাপের ওঝা। এই দুয়ের সম্পর্ক কী?

তারাপদ কিছু জিজ্ঞেসও করল না।

ঘোড়া-সাহেবের কুঠির পেছন দিকে একটা গাছতলায় জীপ রেখে চারজনে কুঠির ভাঙা পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকল।

তারাপদ চারদিকে তাকিয়ে দেখল একবার। মাথার ওপর সূর্য দেখা যাচ্ছে না, গাছে আড়াল পড়েছে, রোদও তেমন গায়ে লাগে না বড়-বড় গাছপালার জন্যে। পাখির ডাক ছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই। নির্জন, নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে কুঠিটা। আলোয় স্পষ্ট।

আগের বার বিকেলের দিকে এসেছিল বলে, কিংবা প্রথম এসেছিল বলেই তারাপদর ভয়-ভয় লেগেছিল। আজ আর লাগছে না। তাছাড়া তারা চারজন রয়েছে। নকুল আর লোচন কি কিছু কম!

বাইরে ঘোরাঘুরি না করে কিকিরা প্রথমেই বললেন, ''লোচন, সোজা ভেতরে ঢুকব। নকুল, তুমি সবার পেছনে থাকবে। তোমার হাতের ওই লোহার রডে শব্দ করো না।''

নকুল গাড়িতে একটা হাত তিনেক লম্বা লোহার রড সব সময় রেখে দেয়। সেটা হাতে নিয়ে এসেছে। লোচনের হাতে কিছু নেই। তারাপদরও খালি হাত। কিকিরার হাতে সেই সরু ছড়ি। আলখাল্লা ধরনের ঢিলেঢালা জামার পকেটে কী আছে কে জানে।

কুঠিবাড়ির সামনের দিকে ঢাকা বারান্দা। বারান্দাটা চাঁদের কলার মতন বাঁকানো। বিশাল বারান্দা চওড়াও কম নয়। সাত আট ধাপ সিঁড়ি উঠে বারান্দা। মাঝের দরজাটা যেন পাহাড়। খোলার উপায় নেই। পাশাপাশি ঘর অনেক। দরজাও রয়েছে পর-পর। একটা দরজার জানলা ভাঙা। লোচন কিকিরাকে ডাকল।

সেই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল চারজনেই।

ভেতরে পা দিতেই তারাপদ বিশ্রী গন্ধ পেল। কতকালের ধুলোবালি, আবর্জনা জমে-জমে গন্ধ হয়েছে। বন্ধ বাতাস। দরজার পাল্লা ভাঙা থাকার দরুন আলো আসছিল মোটামুটি। উলটো মুখের জানলাও আধ-খোলা। তারাপদ পকেট থেকে রুমাল বার করে নাক চাপা দিল।

কিকিরা ঘরটা একবার দেখলেন। একেবারে ফাঁকা ঘর। ভেতরের পলেস্তারা ভেঙে পড়েছে, একদিকে কিছু কাঠকুটো জড়ো করা, সাপের খোলস, মরা টিকটিকি, ঝুল আর মাকড়শার জালের কোনো অভাব নেই। সাপ, ছুঁচো সবই থাকা সম্ভব এই ঘরে।

কিকিরা বললেন, ''লোচন, প্রথমে নীচের ঘরগুলো দেখে নিই, পরে দোতলায় উঠব।

বাড়িটার সুবিধে এই, পাশাপাশি ঘরের মধ্যে আসা-যাওয়া করার জন্যে দরজা রয়েছে, দরজার পাল্লাগুলো ভাঙাচোরা, একটা হয়তো আছে, অন্যটা নেই; কোথাও কোথাও একেবারেই নেই। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে অসুবিধে হয় না। ঘরগুলো বড়-বড়, বেশ বড়, মাথার ছাদ ধরতে হলে লম্বা সিঁড়ি চাই, লোহার কড়ি বরগা, জানলাগুলো বেশির ভাগই বন্ধ, রোদে-জলে কাঠের এমন অবস্থা হয়েছে যে, সেই বন্ধ জানলা আর খোলার উপায় নেই। সমস্ত ঘরেই দুর্গন্ধ। আসবাবপত্রের মধ্যে কদাচিৎ কোনো ভাঙাচোরা চেয়ার কিংবা টেবিল চোখে পড়ে।

কিকিরা তারাপদকে বললেন, ''নীচের তলাটা ছিল ঘোড়া-সাহেবের অফিসঘর। এজেন্টস অফিস।

তারাপদর মনে হল, অফিসঘর বলেই হয়তো পাশাপাশি ঘরে আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা। অফিসের অংশটা মোটামুটি দেখে নিয়ে কিকিরা ভেতর-দরজা দিয়ে সরু বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। এটা ভেতর দিকের বারান্দা। প্যাসেজ বলা যায়। প্যাসেজের ওদিকে আরও কতকগুলো ঘর। প্যাসেজের গা দিয়ে চওড়া সিঁড়ি উঠে গিয়েছে দোতলায়। কাঠের সিঁড়ি।

তারাপদ বুঝতে পারল, নীচের তলার দুটো অংশ। সামনের দিকে অফিস ছিল। পেছনের দিকে কী ছিল? কিকিরা বললেন, ''চাপরাশি, পিয়ন, বয়-বাবুর্চিরা থাকত।''

প্যাসেজে দাঁড়িয়ে কিকিরা বললেন, "লোচন, ও-পাশে বারান্দায় গিয়ে একবার দেখো তো কোনো দরজা খোলা পাও কি না?''

লোচন বারান্দার দিকে চলে গেল।

তারাপদ বলল, ''কিকিরাস্যার, এটা দেখছি একেবারে ভূতের বাড়ি হয়ে গিয়েছে। এখানে ঢুকলে মানুষ এমনিতেই মরে যাবে।" বলতে-বলতে তারাপদ হাঁচল। বন্ধঘর, ধুলো ময়লা আর দুর্গন্ধে তার মাথা ধরে উঠছিল।

কিকিরা বললেন, ''তা ঠিক। তবে ভূতের একটু-আধটু চিহ্ন দেখতে পেলে ভাল হত, তাই না? চলো, দোতলায় চলো, সেখানে যদি দেখতে পাই।"

লোচন ফিরে এল। বলল, দরজা দিয়ে ঢোকার কোনো উপায় নেই। সবই বন্ধ। শুধু বন্ধ নয়, এমনভাবে আটকে আছে যে, একটু নড়ানোও যায় না। তবে ভাঙা জানলা দিয়ে ভেতরে ঢোকা যায়।

কিকিরা একটু ভেবে বললেন, ''আগে দোতলাটা ঘুরে আসি। পরে ওদিকটা দেখব, লোচন।''

নকুল হাতের রডটা কাঁধে তুলে এদিক-ওদিক ঘুরছিল। কথাবার্তা বলছিল না। কিন্তু তার চোখমুখ থেকে বোঝা যাচ্ছিল সে খুব সতর্ক, বাইরে গাছপালার শব্দ হলেও কান খাড়া করে

শুনেছে।
কিকিরা সিঁড়ি উঠতে লাগলেন। পেছনে তারাপদরা। কাঠের সিঁড়ি। শব্দ হচ্ছিল। পুরু হয়ে ধুলো জমে আছে সিঁড়িতে। ধুলো, পাখির পালক, ছেঁড়া-খোঁড়া কাগজ, আরও নানান আবর্জনা। সিঁড়ির ধাপ কোনো-কোনোটা নড়বড়ে, কোনোটা আধ ভাঙা। পায়ের দাগ স্পষ্ট করে বোঝার উপায় নেই, কাঠের রঙ কালচে হয়ে গিয়েছে, ধুলো আর কাঠের রঙ প্রায় এক।
বাইরের আলো থাকায় সিঁড়ি দিয়ে উঠতে কোনো অসুবিধে হল না।
দোতলায় আসতেই বাইরের আলোয় চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। অজস্র গাছপালার মাথায় গায়ে শরতের রোদ মাখানো। কাল বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় ধোওয়া-মোছা গাছপালা যেন সকালের উজ্জ্বল রোদে আরও সবুজ হয়ে গিয়েছে। বাতাসও রয়েছে এলোমেলো।
তারাপদ বেশ কয়েক বার হাঁচার পর রুমালে নাক-মুখ মুছে নিয়ে আলোর দিকে তাকাল।
নীচের তলার মতন দোতলাতেও টানা বারান্দা। বারান্দার ধার ঘেঁষে মোটা মোটা থাম। কোনো কোনো থাম ধসে যাচ্ছে। মেঝে ধুলোয় ভরতি, গাছের শুকনো পাতা জমে রয়েছে, আরও নানান রকম আবর্জনা।
কিকিরা প্রথমে বাঁদিকেই পা বাড়ালেন। নীচের তুলনায় ঘরের সংখ্যা কম লাগছিল চোখে। নীচের তলায় পর-পর দরজা ছিল। ওপরে পাশাপাশি দরজা কম। বিশাল-বিশাল দরজা-জানলা। দরজা বন্ধ, জানলা কোথাও-কোথাও খোলা, কাচের সার্সি ভাঙা। সামনের ঘরটারই জানলা খোলা ছিল।
জানলা টপকেই ঘরে ঢুকলেন কিকিরা। তারাপদরাও সাবধানে জানলা টপকাল।
রোদ বা আলো কোনোটাই ঘরে ঢোকার উপায় নেই। জানলা দিয়ে যেটুকু আলো আসছিল।
কিকিরা হাতের টর্চ জ্বাললেন।
তারাপদ টর্চের আলোয় ঘরটা অনুমান করার চেষ্টা করল। এত বড় ঘরে টর্চের আলো কিছুই নয়। ঘরের চারটে দেওয়াল যেন চারপ্রান্তে। বিরাট একটা ভাঙা টেবিল পড়ে আছে একদিকে। কোনো বড়সড় ছবির ভাঙা ফ্রেম। একটা পা-মচকানো আর্ম চেয়ার।
কিকিরা টর্চের আলোয় মেঝে দেখালেন। তারাপদর মনে হল, দাবার ছকের মতন দেখতে মেঝেটা। পা দিয়ে ধুলো সরাল। "কিসের মেঝে? কাঠের?"
"সিমেন্টের," কিকিরা বললেন, "লাল আর কালো রঙ দিয়ে চৌকো-চৌকো ডিজাইন করা।"
লোচন বলল, "মাথার উপর শিকলি ঝুলছে বটে, বাবু!"
কিকিরা টর্চের আলো ফেললেন ছাদের দিকে। একসময় বোধহয় ঝাড়বাতি গোছের কিছু ঝোলাতেন ঘোড়া-সাহেব। ঝাড় নেই, কিন্তু গোটা দুয়েক শেকল ঝোলানো রয়েছে। কিকিরা বললেন, " সাহেবের বাতি ঝুলত গো! লাও, চলো।"
জানলা টপকেই বাইরে আসতে হল।
পর-পর তিনটে ঘর দেখলেন কিকিরা। কোনটা কিসের ঘর ছিল বোঝা দায়। কোনোটা হয়তো খাবার, কোনোটা বসার, কোনোটা বা শোবার।
বাঁদিকের ঘরগুলো দেখা হয়ে যাবার পর ডান দিকে এগুলেন কিকিরা।
ডানদিকের প্রথম ঘরটার জানলার সবই রয়েছে। কাচই যা ভাঙা। দরজা খোলা ছিল।
দরজা দিয়েই ভেতরে এলেন কিকিরা। ফাঁকা ঘর। দুপাটি পুরনো দোমড়ানো জুতো মাত্র পড়ে আছে। বুট জুতো।
কিছুই পাওয়া গেল না। কিকিরা যেন হতাশই হলেন।
আবার বারান্দায় এসে পা বাড়াতেই তারাপদ হঠাৎ বলল, "কিকিরা?"
"কী?"
"পায়ের দিকে তাকান," তারাপদ বলল।
মেঝের দিকে তাকালেন কিকিরা। তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। হাত দিয়ে ইশারায় লোচন আর নকুলকে দাঁড়াতে বললেন।
"কিসের দাগ কিকিরা?" তারাপদ জিজ্ঞেস করল।
মাটিতে বসে কিকিরা ভাল করে নজর করলেন। বললেন, "কোনো ভারী জিনিস টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেন। ধুলোটুলোয় ঘষটানো দাগ।" বলে সামনের ঘরের দিকে তাকালেন। দাগটা ঘর পর্যন্ত গিয়েছে। ঘরের দরজা বন্ধ। জানলাও। এতক্ষণে একটিমাত্র জানলা চোখে পড়ল, যা অটুট।
কিকিরা উঠে দাঁড়ালেন। "দরজাটা খোলা যায় কি না দেখ তো, নকুল?"
নকুল প্রথমে ধাক্কা মারল, শেষে লোহার রড্ গলাবার চেষ্টা করল দরজার ফাঁকে, পারল না।
জানলাটা অবশ্য শেষ পর্যন্ত খোলা গেল।
কিকিরা জানলা টপকে ভেতরে ঢুকলেন।
টর্চের আলোয় এই ঘর একেবারে অন্যরকম দেখাল। ঘরটার অনেকটা পরিষ্কার। একপাশে লোহার স্প্রিং দেওয়া খাট, ছোবড়ার গদি রয়েছে খাটের ওপর, যদিও পুরনো গদি। কোণের দিকে মাটির কলসি আর কলাইয়ের মগ রাখা। দু'চারটে শুকনো শালপাতা পড়ে আছে ঘরের পাশে। লণ্ঠনও চোখে পড়ল। শিস-ওঠা কাচ। মাদুর গুটিয়ে রেখেছে কেউ।
বাইরের দিকের জানলা বন্ধ ছিল। বড়-বড় দুই জানলা হাত আট-দশ অন্তর। কিকিরা নকুলকে জানলা দুটো খুলে দিতে বললেন, "সাবধানে খুলো হে!"
লোচন আর নকুল জানলা দুটো খুলে দিল। খুলে দিয়েই লোচন যেন কী বলল! আলো এল জানলা দিয়ে, ঘর স্পষ্ট হল।
তারাপদ ঘরটা দেখতে লাগল। বিশাল ঘর, সেই একই রকমের লাল-কালোর চৌকো-ঘর-কাটা সিমেন্টের মেঝে। মাথার ওপর এক জোড়া শেকল ঝুলছে। ঘরের এক কোণে একটা বর্শা দাঁড় করানো।
কিকিরা ডানদিকের জানলার কাছে গিয়ে এক-মনে কখনো জানলা, কখনো বাইরেটা দেখছিলেন। একবার ডানদিকের জানলাটা দেখেন, আবার গিয়ে বাঁদিকেরটা। জানলার কাঠের ওপর হাত বোলান। বেশ কিছুক্ষণ জানলা দেখার পর তারাপদকে ডাকলেন।
কাছে গেল তারাপদ।
ডানদিকের জানলাটা দেখালেন কিকিরা। তারাপদ অবাক হয়ে দেখল, পর-পর প্রায় গায়ে-গায়ে দুটো জানলা। একই মাপ।
কিকিরা বাইরের দিকটাও দেখালেন। "দেখো, নীচেও দেখো।"
তারাপদ অবাক হয়ে দেখল, লোহার একটা ঘোরানো সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়েছে। সিঁড়িটা বাড়ির বাইরে থেকে দেখার উপায় নেই, কেননা সিঁড়ির বাইরের তিনটে দিকই ইটের গাঁথনি দিয়ে গোল করে ঘেরা। সেই গাঁথনির জায়গায়-জায়গায় ইট খসে যাওয়ায় আলো ঢুকছে সিঁড়িতে। সুড়ঙ্গর মতন দেখায় সিঁড়িটা।
তারাপদ সরে গিয়ে বাঁদিকের জানলা দেখল। কিছু বুঝতে পারল না।
কিকিরা বললেন, "বাঁদিকের ওই জানলা আর এই ডান-

কের জানলাটায় তফাত বুঝতে পারছ? আসলে ডানদিকেরটা জানলা। দু আড়াই ফুট তফাত দুটো জানলার মধ্যে। মাঝ-খানে ফাঁক। এই ফাঁক দিয়ে গলে গেলেই ওই সিঁড়ি। তুমি লক্ষ করে দেখো, সিঁড়িটা ওপরের দিকে একেবারে জানলা পর্যন্ত উঠে আসেনি। খানিকটা নিচুতে শেষ হয়েছে। তার মানে, এই সামনের দিকের জানলাটা টপকে ফাঁকের মধ্যে দিয়ে গলে গেলেই সিঁড়িটা ধরতে পারা যাবে। আমি যতটা জানি, এই রকম ডবল জানলা এক-সময় য়ুরোপে দেখা যেত যুদ্ধবাজ রাজ-রাজড়াদের প্রাসাদে। কেন জান? তখন কথায়-কথায় কাটাকাটি রক্তারক্তি চলত। কে যে শত্রু হবে কখন, কেউ জানত না। কাজেই ঘরের মধ্যে আচমকা শত্রুর সামনাসামনি হলে বাঁচবার এই একটা পথ খোলা থাকত। ঘোড়া-সাহেব কেন এমন জানলা বানিয়েছিলেন জানি না। শখ করে কিংবা আভিজাত্যের জন্যে হতে পারে। অন্য কারণও থাকতে পারে।"

তারাপদ বলল, "সাধুবাবা তাহলে এই পথ দিয়েই হাওয়া হয়ে গিয়েছিলেন?"

কিকিরা মাথা নাড়লেন, "অবশ্যই।"

"তাহলে এই ঘরেই সেই কাণ্ড ঘটেছিল?"

"এই ঘরে।" বলে কিকিরা নিশ্চিন্তভাবে নিজেই জানলার চারদিক পরীক্ষা করতে লাগলেন।

॥ আট ॥

ঘোড়া-সাহেবের কুঠি থেকে ঘুরে আসার পর তিন-চারটে দিন দেখতে-দেখতে কেটে গেল। এই ক'দিনে কিকিরা যেন সামান্য কাহিল হয়ে পড়েছেন। আপন খেয়ালে যে তিনি কী করছেন তারাপদ বুঝতে পারত না। অর্ধেক সময় ঘরে বসে কিছু লিখছেন, না হয় কাগজ পেন্সিল নিয়ে কুঠি বাড়ির নকশা করছেন, কিংবা ফকিরের সঙ্গে কথা বলছেন। কিকিরা ফাঁকে ফাঁকে কুঠিবাড়ির বাইরে-বাইরেও ঘুরে আসছিলেন লোচনকে নিয়ে। তারাপদকে একরকম ছুটিই দিয়েছেন. বলেছেন তামাশা করে, "খাও হে তারাপদবাবু, খেয়ে আর ঘুমিয়ে গায়ে গত্তি লাগিয়ে নাও ক'দিন, তারপর তোমার এলেম দেখা যাবে। আসুক চন্দন।"

তারাপদর বাস্তবিক কিছু করার ছিল না। খাওয়া আর ঘুম ছাড়া করার কীই বা আছে। ফকিরদের বাড়িতে পুরনো বইপত্তর ছিল কিছু, সেকেলে বই। সেই বই পড়ে সময় কাটাত। আর বিকেলের দিকে ঘুরে বেড়াত এদিক ওদিক। একদিন কিকিরার সঙ্গী হয়ে কুঠিবাড়ির বাইরে বাইরেও ঘুরে এসেছে আবার।

কিকিরা যে একটা মতলব আঁটছে, তারাপদ সেটা বিলক্ষণ বুঝতে পারছিল। কিন্তু মতলবটা কী, তা ধরতে পারছিল না।

এমন সময় চন্দন চলে এল। ত্রয়োদশীর দিন। স্টেশনে জীপ নিয়ে গিয়েছিল নকুল, সঙ্গে তারাপদ।

জীপ গাড়িতে আসতে-আসতে দু'পাঁচটা কথার পর চন্দন বলল, "কতদূর এগুল ব্যাপারটা?"

তারাপদ বলল, "কিকিরাই জানেন।"

"তুই কিছু জানিস না? তা হলে করছিস কী?"

"আমি কিছুই করছি না। খাচ্ছিদাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি। আর মাঝে-মাঝে কিকিরার হেঁয়ালি শুনছি।"

"তোর দ্বারা কিছু হবে না, তারা। এত অলস হয়ে গিয়েছিস। ক'দিনে চেহারাটাও তো নাড়ুর মতন গোল করে ফেলেছিস। গালে চর্বি জমে গিয়েছে।"

তারাপদ হাসল। বলল, "টাটকা দুধ ঘি মাছের ব্যাপার, বুঝলি না?"

চন্দন বন্ধুর পিঠে থাপ্পড় মারল। হাসল। তারপর বলল, "ঘোড়া-সাহেবের কুঠিটা কী বস্তু রে?" কলকাতাতেই কিকিরার মুখে চন্দন ব্যাপারটা মোটামুটি শুনেছিল। বাড়িতে একটা চিঠিও পেয়েছিল তারাপদর।

তারাপদ বলল, "বস্তুটা একটা পুরনো ভাঙাচোরা কেল্লা বলতে পারিস। সেকেলে সাহেবসুবোর ব্যাপার, দু'হাতে টাকা উড়িয়ে বাড়ি বানিয়েছিল।"

চন্দন বলল, "সেখানে কিছু পাওয়া গেল?"

"না। তবে একটা ব্যাপার জানা গিয়েছে। আমি নিজেও দেখেছি প্রমাণ, কেউ একজন ওখানে আস্তানা গেড়েছিল হালে। হয়তো এখনও গেড়ে আছে।"

"লোকটা কে?"

"বলতে পারব না।"

নকুল জীপটাকে থামিয়ে দিয়ে রাস্তায় নামল। বনেট খুলে কী যেন করে আবার বন্ধ করল। ফিরে এসে গাড়িতে উঠল।

"কী হয়েছিল, নকুল?" তারাপদ জিজ্ঞেস করল।

"হরনের তারটা খুলে গিয়েছিল, বাবু। লাগাই দিলাম।"

আবার গাড়ি চলতে শুরু করলে চন্দন বলল, "কিকিরার বন্ধুর ছেলে কেমন আছে?"

"এখন একটু ভাল শুনেছি। আমি ছেলেটিকে সামনা-সামনি দেখিনি। তফাত থেকে দেখেছি।"

অবাক হয়ে চন্দন বলল, "সে কী! তুই আজ হপ্তাখানেক হল এখানে রয়েছিস—ছেলেটাকেই দেখিসনি?"

"কেমন করে দেখব। ও নীচে আসে না। ওকে আসতে দেওয়া হয় না। দোতলায় নিজের ঘরেই থাকে, বেশির ভাগ সময়। কিকিরাও দু'একদিন মাত্র ওপরে গিয়ে ওকে দেখে এসেছেন।"

চন্দন আর কিছু বলল না। সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল। নকুল গ্রামের পথ ধরল এবার।

দুপুর আর বিকেলটা চন্দন আয়েস করে কাটাল। খেল, ঘুম দিল, তারাপদ আর কিকিরার সঙ্গে বকবক করল। এই একটা হপ্তা কেমন করে কেটেছে তার বৃত্তান্ত শোনাল তারাপদ বন্ধুকে। কিকিরা যতটা পারলেন ফকির, অমূল্য, ঘোড়া-সাহেবের কুঠি এ-সবের ইতিহাস শোনালেন চন্দনকে। তারপর বললেন, "আজ রাত্রে আমরা একটা কনফারেন্স করব, স্যাণ্ডেলউড। তুমি, আমি আর তারাপদ। তার আগে তোমায় একটা-দুটো খুচরো কাজ করতে হবে।"

"কী কাজ?"

"ফকিরের ছেলে বিশুকে একবার দেখবে। আমি ফকিরকে বলে রেখেছি। সেই সঙ্গে ফকিরের পায়ের চোটটা।"

"ফকিরবাবুকে তো সকালে দেখলাম। ও দেখার কিছু নেই। গোড়ালি মচকালে সারতে সময় লাগে।"

"তবু একবার দেখো।"

"বেশ, দেখব।" বলেই চন্দনের কিছু মনে হল, বলল, "বিশু নীচে নামবে, না আমাকে ওপরে যেতে হবে?"

"দেখি কী হয়!...তবে সন্ধের পর আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না, আমরা তিনজনে বসব। বুঝলে?"

মাথা নাড়ল চন্দন। যা বলেছেন কিকিরা, তা-ই হবে।

সন্ধের মুখে চা খাওয়ার সময় ফকির নিজেই বিশুকে নিয়ে নীচে এলেন। ভবানীও সঙ্গে ছিল।

ফকির অল্প খোঁড়াচ্ছিলেন। সকালের মতনই।

কিকিরা বললেন, "তুমি যতটা কম সিঁড়ি-ভাঙাভাঙি করলেই পারো, ফকির। আমরাই ওপরে যেতাম।"

ফকির হাসলেন। বললেন, "চেয়ারে পা তুলে বসে থাকা কি আমাদের পোষায়, কিঙ্কর। আগে এ-সব চোট গায়ে মাখতাম না এখন ভাই বয়েস হচ্ছে।" বলে চন্দন আর তারাপদর দিকে তাকালেন। "আমার ছেলেকে আনলাম—" বলে বিশুকে দেখালেন। তারপর ভবানীকে দেখিয়ে বললেন, "আমার

Knit Cashmilon.

2 purl, 2 plain, 1 purl, 1 plain.

You know the feeling of making a warm and woolly sweater? Now make it warmer and woollier with Cashmilon — the amazing acrylic fibre.

It has the warmth of wool. And yet it's marvellously light. The colours are brilliant. The texture and feel, unique. And it's mothproof like nothing before. Isn't it wonderful to have all these qualities in just one fibre?

The name is CASHMILON.

The amazing acrylic fibre made by IPCL

IPCL is the licenced user of Cashmilon the brand name of Asahi Chemical Industry Company Ltd., Japan.

HTB-IPL-6272

...। বিশুর খুব বন্ধু।"

কিকিরা বিশুকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বসালেন। ...কে বসতে বললেন।

তারাপদ বিশুকে মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। ফকির ...চেহারা ঠিকই, কিন্তু বিশু তার বাবার চেয়েও সুন্দর। বিশুর ... অংশুকে আগেই দেখেছে তারাপদ, গল্পটল্পও করেছে। ...মানুষ। স্কুলে পড়ে। অংশুও দেখতে ভাল। তবে বিশুর ... নয়। ওদের বোন পূর্ণিমাকেও দেখেছে তারাপদ। ... মেয়ে। খানিকটা দুরন্ত। সেও চমৎকার দেখতে। ...-মাঝে নীচে এসে কিকিরার ওপর হামলা করে ... তারাপদকে বেসমের লাড্ডু খাইয়েছিল। বেশ ...। তবু ভাইবোনদের মধ্যে বিশু সেরা। ছিপ-...প চেহারা, গায়ের রঙ খুবই ফরসা, একমাথা কোঁকড়ানো ... কাটাকাটা মুখ-চোখ, ঠোঁট দুটো পাতলা। সবই সুন্দর। ...তু বিশুর মুখে কেমন যেন একটা ভয়ের ছাপ, চোখ দুটোয় ... ঘুম ভাব।

ভবানীকেও দেখল তারাপদ। সাধারণ চেহারা। তবে চালাক-...র বলেই মনে হয়। চন্দন বিশুকে দেখছিল। ফকিরকে বলল, "...নে দেখা হবে না। আপনি ওকে নিয়ে পাশের ঘরে চলুন।" ...ই একটু থেমে হঠাৎ বলল, "আচ্ছা, ওকে কি কোনো ঘুমের ...ে খাওয়ানো হয়?"

"হ্যাঁ। ডাক্তারবাবু যা দিয়েছে তাই খায়।"

"ক-বার খায়?

"দু'তিন বার বোধহয়।"

"এতবার?...আশ্চর্য! চলুন—পাশের ঘরে যাই।"

চন্দন উঠল।

ফকির বিশুকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

কিকিরা ভবানীর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তারাপদ ...টা সিগারেট ধরাল। ধরিয়ে বিশুর কথা ভাবতে লাগল।।

হঠাৎ কিকিরার একটা কথা কানে গেল। কিকিরা ভবানীকে ...ছেন, "তুমি এখন এখানেই থাকবে কিছুদিন, না ফিরবে?"

ভবানী বলল, "কালীপুজো পর্যন্ত থাকব।"

তারাপদ অন্যমনস্কভাবে ভবানীর দিকে তাকাল। কেন ...াল সে বুঝতে পারল না। চোখের দিকে তাকাল। কটা চোখ। ...া ভুরু। তারাপদর কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল।

ভবানী উঠে দাঁড়াল। "আমি যাই, মামা। বড়মামুর দেরি ...।"

"যাবে? এসো!

ভবানী চলে গেল।

তারাপদ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর ...ই নিঃশব্দে দরজার কাছে গেল। মুখ বাড়িয়ে দেখল বাইরেটা।

ফিরে এসে নিচু গলায় বলল, "কিকিরা, ভবানী বাইরে ...িয়ে আছে।"

কিকিরা বললেন, "তুমি বোসো।"

ফকির আর বিশু আরও খানিকটা পরে এ-ঘরে এল। ...নও পেছনে-পেছনে। ফকির অবশ্য আর বসলেন না, বললেন, "...ঙ্কর, আমরা যাই। সকালে দেখা হবে।...ভাল কথা, কাল ...বার অমূল্যদের বাড়ি যাব। খুড়িমাকে প্রণাম করে আসা ...নি বিজয়ার পর। যাব তো, কিন্তু...তুমি কী বলো?"

কিকিরা একটু ভেবে বললেন, "নিশ্চয় যাবে। একশো বার ...ে। আমি বলি কি, তুমিও একদিন অমূল্যকে কোনো ছুতোয় ...বাড়িতে ডেকে আনো।"

"ওকে ডেকে আনব? কেন?"

"সে না হয় পরে বলব। ভেবে দেখো ডাকতে পারবে কি না? ...ন যাও—ছেলেটাকে আর দাঁড় করিয়ে রেখো না।"

"আচ্ছা, চলি—।" ফকির তিনজনের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসলেন। তারপর ছেলেকে নিয়ে চলে গেলেন।

সামান্য চুপচাপ। চন্দন চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

কিকিরা বললেন, "বিশুকে কেমন দেখলে, চন্দন?"

চন্দন তারাপদর কাছ থেকে সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরাল বলল, "আপনি যেমন বলেছিলেন তেমন তো মনে হল না।"

কিকিরা আর তারাপদ দুজনেই যেন অবাক হয়ে চন্দনের দিকে তাকালেন।

চন্দন নিজের থেকেই বলল, "আমার মনে হল, এমনিতে ওর কোনো অসুখ নেই। তবে খানিকটা নার্ভাস হয়ে রয়েছে। আর-একটা জিনিস দেখলাম, ওকে ঘুমের ওষুধ একটু বেশিই খাওয়ানো হয়েছে। দেখলেন না, কেমন ঝিমোনো ভাব—।"

কী ভেবে কিকিরা বললেন, "শরীর-মনের কোনো ক্ষতি হয়েছে?"

"না। তা আমার মনে হল না।"

"সেরে যাবে?

"না-সারার কী আছে কিকিরা? একটা আচমকা শক হয়তো পেয়েছে। কিন্তু সেটা মানুষ নিজের থেকেই ধীরে-ধীরে সামলে নেয়। বিশু পাগলও হয়নি, উন্মাদও নয়। ভাববার মতন কিছু দেখলাম না। বরং বলতে পারেন, ওকে নিজের থেকে ধাক্কাটা সামলাতে না দিয়ে গাদাগুচ্ছের ওষুধ খাইয়ে আর চারপাশ থেকে বেঁধে রেখে 'সিক' করে দেওয়া হয়েছে।"

কিকিরা যেন খুশি হলেন। বললেন, "তুমি যা বলছ তা যেন সত্যি হয়।"

চন্দন ঠাট্টা করে বলল, "আমি ঘোড়ার ডাক্তার নই কিকিরা স্যার।"

তারাপদ জোরে হেসে উঠল।

কিকিরাও পালটা ঠাট্টা করে বললেন, "অবোলা জীবের ডাক্তারি করা আরও কঠিন হে স্যান্ডেলউড। পেটে ব্যথা হলেও সে বলতে পারবে না, মাথা ধরলেও নয়। বুঝলে?"

আরও দু'চারটে হাসি-তামাশার কথা হল। তারপর কিকিরা বললেন, "এবার কাজের কথা হোক, কী বলো তারাপদ?"

মাথা নাড়ল তারাপদ।

একটু চুপচাপ বসে থেকে কিকিরা বললেন, "চন্দন, তুমি তো মোটামুটি সবই শুনেছ। ঘোড়া-সাহেবের কুঠিটাই যা তোমার দেখা হয়নি। তা সেটাও কাল-পরশু দেখিয়ে আনব। এখন কাজের কথা শুরু করি।"

চন্দন আর তারাপদ তাকিয়ে থাকল। কিকিরার দিকে।

কিকিরা বললেন, "আমি অনেক ভেবেচিন্তে দেখেছি, ঘোড়া-সাহেবের কুঠি নিয়ে যে ঝঞ্ঝাট বেধেছে সেটা নেহাত ওই বাড়িটা নিয়ে নয়। তোমরা বলবে, কেন—বাড়ি নিয়ে নয় কেন? তার জবাবে আমি তারাপদর কথাটাই বলব, বাড়ি নিয়ে ঝঞ্ঝাট হলে সেটা আইন-আদালত করে ফয়সালা হতে পারত। তা কেন হচ্ছে না? কেন অমূল্য আর ফকির দু'জনেই ওই বাড়ির ওপর ঝুঁকে পড়েছে? ঠিক কি না বলো? তাছাড়া, ঘোড়া-সাহেবের কুঠি এতকাল পড়ে থাকল—কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাল না, হঠাৎ আজ মাস দুই ধরে দু তরফের টনক নড়ে ওঠার কারণ কী?"

চন্দন বলল, "ফকিরবাবু আপনাকে কী বলছেন?"

"কিছুই তো বলছে না। ওর কথাবার্তা থেকে বরং মনে হয়, বিশুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কুঠিতে নিয়ে গিয়ে অমূল্যরা একটা ভয়ঙ্কর কিছু করবার মতলব এঁটেছিল। পারেনি। এখন ফকিরের রোখ চেপে গিয়েছে।"

তারাপদ বলল, "ভয়ঙ্কর কী করত, কিকিরা?"

"লুকিয়ে রাখতে পারত, গুম করত, মেরে ফেলতেও পারত।"

"কেন? নিজের ভাইপোকে কেউ মেরে ফেলে?"

"টাকা-পয়সা-সম্পত্তির লোভে খুন-খারাপি তো হয়েই থাকে।"

চন্দন বলল, "তা ঠিক। কথায় বলে অর্থই অনর্থের মূল। রাজবাড়ির সেই কেস না কিকিরা? কিন্তু আমি ভাবছি বিশু একজন অচেনা সাধুবাবার কথায় বিশ্বাস করে তার পেছন-পেছন কুঠিবাড়িতে গেল কেন?"

কিকিরা হাতের আঙুল মটকাতে-মটকাতে বললেন, "তুমি ঠিকই ভাবছ। নেহাত কৌতূহলের জন্যে যেতে পারে, কিংবা ভয়ে। আমি ভাবছি, এ-ছাড়া অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে কি না?"

তারাপদ বলল, "তা কেন ভাবছেন?"

"ভাবছি এই জন্যে যে, বিশু সাধুবাবার কথায় ভুলে না হয় কুঠিবাড়িতে গেল, কিন্তু সেই সময় অমূল্যের শালা চরণ তার লোক নিয়ে সেখানে হাজির থাকবে কেন? কেন চরণরা গিয়েছিল? কে তাদের নিয়ে গিয়েছিল?"

চন্দন কান চুলকোতে-চুলকোতে বলল, "আপনি কি বলতে চান, ওই সাধুবাবাই বিশুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে অমূল্যের শালার হাতে তুলে দিয়েছিল?"

মাথা নাড়লেন কিকিরা। "না, অতটা বলতে পারছি না। তা যদি হত, তবে বিশুকে চরণদের হাতে তুলে দিয়ে সাধুবাবা পালাত। কিন্তু তা তো হয়নি। উলটে সাধুবাবার সঙ্গে চরণদের কথা-কাটাকাটি হয়েছে। সাধুবাবাকে গুলি করা হয়েছে।"

"গুলি খেয়ে সাধুবাবা পালিয়েছে," তারাপদ বলল,"ম্যাজিক দেখিয়ে উধাও!"

কিকিরা বললেন, "গুলি খেয়েছে কি না তা বলতে পারব না; তবে বিশুর মুখে আমি যা শুনেছি তাতে বুঝতে পারলাম, চরণদের সঙ্গে সাধুবাবার কথা কাটাকাটি আর ঝগড়া থেকে বিশু বুঝতে পারছিল, চরণরা সাধুবাবার কাছে কিছু জানতে চাইছিল; সাধুবাবা বলছিল না।"

"সেই রাগেই কি বন্দুক চালায় চরণরা?"

"তাই তো মনে হয়।"

সামান্য চুপচাপ থেকে তারাপদ চন্দনকে বলল, "আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না, চাঁদু। সাধুবাবাও একটা মিস্ট্রি। বিশুকে কেনই বা ডেকে নিয়ে যাবে, আর কেনই বা উধাও হয়ে যাবে। লোকটার কোনো ট্রেসই আর পাওয়া গেল না।"

কিকিরা বললেন, "আমার কাছে এখন দুটো প্রশ্নই আসল।"

"প্রশ্ন দুটো কী?" চন্দন বলল।

"ওই সাধুবাবা লোকটি কে? কেন সে হঠাৎ এসে হাজির হয়েছিল এখানে। মজার ব্যাপার কী জানো, সাধুবাবা এখানে আসার সময় থেকেই ওই কুঠিবাড়ি নিয়ে গণ্ডগোল কেন?"

"আর আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন?"

"দ্বিতীয় প্রশ্ন, কী জন্যে সাধুবাবা বিশুকে নিয়ে কুঠিবাড়িতে গিয়েছিল। কেন বলেছিল বিশুকে যে, কুঠিবাড়িতে গেলে তার ভাল হবে। আর কেনই বা চরণ সাধুবাবার সঙ্গে ঝগড়া চেঁচামেচি করছিল? কী জানতে চাইছিল? কেন তারা সাধুবাবার পিছু ধরেছিল?"

তারাপদ বলল, "আপনি বলতে চাইছেন, সাধুবাবাই সব গণ্ডগোলের মূল?"

"নিশ্চয়।"

চন্দন বলল, "সাধুবাবার হাওয়া হয়ে যাবার ব্যাপারটা...?"

"ওটা স্রেফ চালাকি! এক ধরনের ম্যাজিক। সেই ঘর, জানলা, সিঁড়ি তোমায় দেখাব। দেখলেই বুঝতে পারবে। আমিও ওখান থেকে ভ্যানিশ হতে পারি। ওটা কিছু নয়। তবে হ্যাঁ, কুঠি-বাড়ির একটা ঘরে 'ডবল উইনডো' আছে এটা সাধুবাবা কেমন করে জানল? আর কেনই বা সে ওই ঘরটাই বেছে নিয়েছিল, নিয়ে বিশুকে নিয়ে গিয়েছিল?" বলে একটু থেমে আবার বললেন কিকিরা, "প্রথমে আমার মনে হয়েছিল ম্যাজিকে যে-রকম ভ্যানিশিং ট্রিক দেখানো হয়—এখানেও তাই হয়েছে। জানলাটা দেখার পর বুঝতে পারছি—ওটা একটু অন্যরকম। সাধুবাবা সব জেনেই ঘর বেছেছিল। মানে, জানলার ব্যাপারটা সে জানত।"

চন্দন আর তারাপদ পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

চন্দন বলল, "তারা বলছিল, ওই ঘরে কেউ একজন এখন থাকে।"

"থাকার চিহ্ন দেখেছি। লোক দেখিনি। হয়তো কেউ একজন ঘরে থাকত, পাহারা দিত। খুব সম্ভব সাধুবাবারই আস্তানা ছিল ওটা। কিন্তু কেন? ওই ঘরে কী আছে?"

কেউ কোনো কথা বলল না।

অনেকক্ষণ পরে চন্দন বলল, "সাধুবাবাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না?"

কিকিরা বললেন, "চেষ্টা করছি। লোক লাগিয়েছি।" বলে তারাপদর দিকে তাকালেন। বললেন, "তোমার একটা কথা বলা হয়নি, তারাপদ। লোচন আজ বিকেলে বলছিল যে, শশিপদকে আবার তার গ্রামে দেখা গিয়েছে।"

"শশিপদ কে?" চন্দন জিজ্ঞেস করল।

"সাপের ওঝা," কিকিরা যেন কেমন করে হাসলেন, "ওই ওঝাটিকে ধরতে হবে হে। নকুলকে আমি বলেছি।...নাও, ওঠো রাত হল। আর নয়।"

॥ নয় ॥

পরের দিন সন্ধের মুখে লোচন এসে কানে-কানে কথা বলার মতন করে কিছু বলল কিকিরাকে। কিকিরা তারাপদদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। খানিকটা আগে চন্দন আর তারাপদকে নিয়ে ঘোড়া-সাহেবের কুঠি ঘুরে এসেছেন। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন খানিকটা। লোচনের কথায় ব্যগ্র হয়ে বললেন, "কই, কোথায়?" তাকে নিয়ে এসো।"

লোচন মাথা নেড়ে বলল, "ইখানে আসবেক নাই, বাবু! খেপাকে নকুল ধরে রেখেছে।"

কিকিরা বললেন, "বেশ, চলো।" বলে তারাপদর দিকে তাকালেন, "তোমার শশিপদ। চলো, দেখে আসবে চলো।"

বাড়ির বাইরে ঠাকুর-দালানের পেছন দিকে একটা ঘরে নকুল শশিপদকে ধরে বেঁধে বসিয়ে রেখেছে। ঘরে আলো নেই। চার দিকে গাছপালা, ডোবা; মস্ত একটা তেঁতুল গাছ সামনে।

কিকিরা আসতেই নকুল দরজার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল।

"পেলে কোথায়, নকুল?" কিকিরা জিজ্ঞেস করলেন।

"কাছকেই ছিল। সাহানা ঠাকুরের বাড়ির কাছে খেপা ঘুর-ঘুর করছিল।"

কিকিরা ঘরের মধ্যে তাকালেন। অন্ধকার। ঘুপচি ঘর। বাইরে চাঁদের আলোয় চারদিক ভেসে যাচ্ছে। কাল কোজাগরী পূর্ণিমা।

কিকিরা বললেন, "অন্ধকারে তো ঠাওর করতে পারছি না। বাইরে আনো হে, নকুল। শশি-ওঝাকে দেখি।"

"আজ্ঞা, যদি ছুট দেয়?"

"দেবে না। তুমি আছ না?" বলে কিকিরা শশিপদকে বাইরে ডাকলেন।

শশিপদ বাইরে এল। বাইরে এসে দেখল সবাইকে। তারাপদকেও। তারপর হাত জোড় করে নমস্কার করল।

কিকিরা চাঁদের আলোয় যতটা পারেন খুঁটিয়ে দেখলেন শশিপদকে। তারপর বললেন, "দাওয়ায় দু-দণ্ড বসা যাক,

শশিপদ ; কী বলো?”

বলার সঙ্গে-সঙ্গে বসে পড়ল শশিপদ। ওর চোখে কেমন যেন ঝিমুনি-ভাব।

কিকিরাও বসলেন। তারাপদ আর চন্দন দাঁড়িয়ে থাকল। লোচন সামান্য তফাতে। নকুল একপাশে দাঁড়িয়ে।

কিকিরা যেন শশিপদকে খানিকটা ভরসা দেবার জন্যে বললেন, “তোমার কথা অনেক শুনেছি, শশিপদ। আমি তোমায় দেখতে চেয়েছিলাম। দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করব বলে।”

শশিপদ কথার জবাব দিল না, হাত জোড় করে আবার নমস্কার করল কিকিরাকে। তারাপদ আর চন্দন হাসল।

সন্দেহ হল কিকিরার। “তুমি কি কিছু খেয়েছে?”

“আজ্ঞা। অ্যাফিম।”

“তা বেশ করেছ। ...আচ্ছা শশিপদ, তুমি নাকি সাপের মস্ত ওঝা?”

“আমি লিজে কী বুলব?” শশিপদ নিজের কান মলে আবার নমস্কার করল।

“তা অবশ্য ঠিক। নিজের গুণ গাইতে নেই। ...তা শশিপদ, তোমায় দু-একটা পুরনো কথা জিজ্ঞেস করব। বলবে?”

শশিপদ ঘাড় তুলে দেখল চারপাশ। তারপর আঙুল তুলে নকুলদের দেখাল। বলল, “উয়াদের কাছে রা কাড়ব না। বড় নিরদয়,যেতে বলুন কেনে উদের।”

কিকিরা নকুল-লোচনদের চলে যেতে বললেন। শশিপদ বায়না ধরল, তারাপদরাও সরে যাক।

অগত্যা ওরা সরে গেল।

কিকিরা বললেন, “এবার বলো?”

“আজ্ঞা করুন।”

“আমি করব? বেশ, তাহলে আমার প্রথম কথা, তুমি আমায় সত্যি করে বলো, ফকিরবাবুর ছোটকাকাকে তুমি চিনতে?”

শশিপদ মুখ তুলে তাকাল। বলল, “বিলক্ষণ চিনতাম।” শশিপদর ঝিমনো গলা যেন হঠাৎ ধাতে এল। অবাক হলেন কিকিরা।

“তিনি কি সাপের কামড়ে মারা গিয়েছেন?”

“না আজ্ঞা,” মাথা নাড়ল শশিপদ।

“তুমি কি তাঁর ওঝাগিরি করেছিলে?”

কপালে দু হাত জোড় করে ঠেকাল শশিপদ। “ভগবান যাঁকে বাঁচান কর্তা, তাঁর আয়ু লয় হয় না। আমি ছোটবাবুর কাছে ছিলাম। বিষধর তাঁকে কামড়াইছিল বটে, কিন্তু তিনি বিষ খেয়ে লিলেন।”

কিকিরা অকারণ তর্ক করলেন না। ফকিরের ছোটকাকার বিষ হজম করার ক্ষমতা থাক বা না থাক, তাতে কিছু আসে যায় না। আসল কথা ফকিরের কাকা সাপের কামড়ে মারা যায়নি।

কিকিরা বললেন, “তবে যে এরা জানে ছোটকাকা মারা গেছেন সাপের কামড়ে?”

শশিপদ এবার সোজা হয়ে বসল। তাকাল কিকিরার দিকে। বলল, “ছোট মুখে বড় কথা হয়, কর্তা। যদি শোনেন তো বলি।”

“শুনব বলেই তো তোমায় খুঁজছি, শশিপদ।”

সামান্য চুপ করে থেকে শশিপদ বলল, “ই সংসার বড় পাপের জায়গা কর্তা। ধন-দৌলত হল গিয়ে সব্বনেশে। ছোটবাবু মারা যান নাই, বাবু। উ সব হল গিয়ে রটনা।”

কিকিরা বললেন, “আমার তাই মনে হয়েছিল শশিপদ। ছোট-বাবু যদি সত্যিই মারা যেতেন তবে কেউ-না-কেউ তাঁকে দেখত। অত বড় ঘরের ছেলে, করুন না কেন ধর্মকর্ম, সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়ান না যেখানে খুশি, তা বলে তিনি মারা যাবার পর কেউ কোনো খবর দেবে না, দেখবে না মানুষটাকে—এ হয় নাকি?”

শশিপদ বলল, “ভাইদের হাত থেকে বাঁচতে বাবু রটনা

করেছিলেন।”

“এত বড় মিথ্যে রটনা কেউ করে? অকারণে?”

“জানি না, কর্তা!”

“বেশ, তোমায় জানতে হবে না। জানলেও তুমি বলবে না। ...একটা কথা বলো, ছোটবাবু এখনও বেঁচে?”

শশিপদ ঘাড় হেলাল।

“কোথায় আছেন তিনি?”

“জানি না।”

“তুমি আবার মিথ্যে কথা বলছ! ...আমি বলছি, ওই যে সাধুবাবা এই গাঁয়ে এসেছিলেন, তিনিই ছোটবাবু?”

শশিপদ কিকিরাকে দেখল। হাসল যেন, বলল, “যা ভাবেন। আমি জানি না।”

কিকিরা বুঝতে পারলেন আফিংখোর শশিপদ খুব সহজ মানুষ নয়। বললেন, “তুমি আমায় ভুল বুঝছ, শশিপদ। আমার কোনো স্বার্থ নেই। ফকিরবাবু আমার বন্ধু। আমি বিশুর জন্যে এসেছি। ফকিরবাবু বড় কষ্টে আছেন।”

শশিপদ যেন হাসিখুশি মুখ করল; বলল, “তা জানি বাবু। ...একটা কথা বুঝতে লারি। ফকিরবাবু আপনার বন্ধু, কিন্তুক উ মিছা কথা বলে কেন?”

কিকিরা অবাক হবার ভান করে বললেন, “মিছে কথা? কিসের মিছে কথা?”

“আপনি জানেন বটে।”

“না শশিপদ, আমি জানি না।”

একটু ভাবল শশিপদ, বলল, “ফকিরের বেটাকে সে লিজে সাধুবাবার কাছে পাঠাইছিল!”

“নিজে গিয়েছিল শুনেছি।”

“সব্বৈব মিছা, সব্বৈব মিছা”—শশিপদ জোরে-জোরে মাথা নাড়ল, “ফকির লিজে তার বেটাকে পাঠাইছিল। সাধুবাবার কাছে পাঠাইছিল, কর্তা। কেন পাঠাইছিল?”

“কেন?”
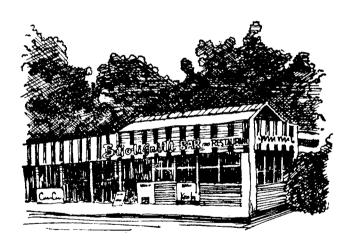
"আপনি জেনে লেবেন। ফকির আপনার বন্ধু বটে।"
"তুমি বলবে না?"
"না।"
কিকিরা কিছু যেন ভাবলেন। পরে বললেন, "তুমি অমূল্যের লোক?"
"সে আপনি যা ভাবেন, কর্তা।"
কিকিরা এবার অধৈর্য, বিরক্ত হলেন। শশিপদ বড় একগুঁয়ে, জেদি। ভয় দেখিয়ে ওকে বাগে আনা যাবে না। লোভ দেখিয়েও নয়।
কিকিরা বললেন, "তা হলে তোমায় একটা কথা বলি, শশিপদ! তোমার সাধুবাবা কোথায় আছেন আমি জানি না। কিন্তু কেন তিনি এখানে এসেছিলেন আমি জানি। যে-ঘর থেকে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেই ঘরের সব খবর আমি জেনেছি। একটা কথা তুমি জেনে রেখো, কুঠিবাড়ির মধ্যে যা আছে, আমি কাল-পরশুর মধ্যে তা বার করে আনব। আমার সঙ্গে যে নতুন বাবুটিকে দেখলে, উনি কলকাতার পুলিসের লোক। ওঁকে আনিয়েছি। অমূল্যকে বলো, ওর যদি ক্ষমতা থাকে—আমাদের সঙ্গে কুঠিবাড়িতে দেখা করতে। ফয়সালা সেখানেই হবে। ...যাও, তুমি যাও।"
শশিপদ এবার কেমন হতভম্ব হয়ে বসে থাকল খানিক। কিকিরাকে দেখল। তারপর উঠে দাঁড়াল। দু হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করল কিকিরাকে। কোনো কথা না বলে চলে গেল।

ঘরে এসে কিকিরা সব বললেন তারাপদদের।
চন্দন বলল, "এই কাঁচা কাজটা করলেন কেন, কিকিরা? একেবারে আলটিমেটাম দিয়ে দিলেন?"
"উপায় ছিল না।"
"কিন্তু কুঠিবাড়িতে কী আছে আপনি জানেন না।"
"জানি না বলেই তো ধাপ্পা দিলাম।"
"ধাপ্পায় যদি কাজ না হয়?"
"না হলে আর কী করব! ...তবে আমি যা যা সন্দেহ করেছিলাম, তার অনেকগুলোই মিলে গেল।"
"যেমন?"
"যেমন ধরো প্রথম হল, ফকির সব কথা বলছে না। দুই হল, ফকিরের ছোটকাকা বেঁচে আছেন। তিন হল, কুঠিবাড়ি নিয়ে সমস্ত গণ্ডগোল বেধেছে সাধুবাবা এখানে আসার পর, কাজেই ওই কুঠিতে এমন-কিছু আছে, যার কথা সাধুবাবা ছাড়া অন্য কেউ জানে না...।"
কথার মধ্যে তারাপদ বলল, "আপনার কথা থেকে মনে হচ্ছে, ফকির আর অমূল্য দুই তরফই সাধুবাবাকে চোখে-চোখে রেখেছিল।"
"হ্যাঁ।"
"কেন?"
"চিনতে পেরেছিল বলে।"
"কাকা বলে চিনতে পেরেছিল?"
"অবশ্যই।"
"তাহলে বাড়িতে আনল না কেন?"
"জানি না। হয়তো আনতে চায়নি।"
চন্দন বলল, "আপনার বন্ধু ফকিরই আপনাকে ঠকাল, কিকিরা।"
কিকিরা বললেন, "আমি এই ব্যাপারটায় বড় অবাক হয়ে গিয়েছি, চন্দন। ফকির কেন এমন করবে? ...যাক গে, কালই এর একটা হেস্তনেস্ত করব, না হয় পরশু।"

॥ দশ ॥

পূর্ণিমার পরের দিন কিকিরা দলবল নিয়ে ঘোড়া-সাহেবের কুঠিতে হাজির হলেন। তখন সন্ধে হয়-হয়। কুঠির বাইরে জীপ-গাড়িতে লোচন আর নকুল। চারদিকে নজর রেখে বসে থাকার কথা, কিন্তু এই বিশাল কুঠিবাড়ির চারদিক তাদের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। যতটা চোখ যায় দেখছিল। কাল কোজাগরী গিয়েছে, আজও ফুটফুটে জ্যোৎস্না, আকাশ মাঠ ভেসে যাচ্ছে চাঁদের আলোয়।
কিকিরা আজ ফকিরকে সঙ্গে নিয়েছেন। ফকির প্রথমটায় আসতে চাননি, কিকিরা তাকে বুঝিয়ে বলেছেন, "তোমার যাওয়া দরকার। তুমি না গেলে আমার কাজের কাজ কিছুই হবে না।" কাজেই ফকিরও এসেছেন। সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন।
নীচের তলায় ঘোরাঘুরির কোনো দরকার ছিল না; সোজা দোতলায় উঠে এসে কিকিরা বারান্দায় দাঁড়ালেন। সন্ধে যত ঘন হয়ে আসছে, জ্যোৎস্না তত উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। গাছপালার মাথায় জ্যোৎস্না, অর্ধেকটা বারান্দায় চাঁদের আলো এসে পড়েছে। চারদিক নিঝুম। বাতাস দিচ্ছিল। অনেকটা তফাতে রাশি-রাশি জোনাকি উড়ছে।
কিকিরার হাতে বড় টর্চ, আর সেই সরু ছড়ি। ফকিরের হাতেও বড় টর্চ। তারাপদর এক হাতে লন্ঠন; বাড়ি থেকে বয়ে আনতে হয়েছে; কেননা কুঠিবাড়ির ঘরে যে-লন্ঠনটা আছে সেটা জ্বলবে কি না কে জানে। এ-সব কিকিরার পরামর্শ। তারাপদর অন্য হাতে একটা ঝোলানো ব্যাগ, তার মধ্যে খুচরো কতক জিনিস, চন্দনের কাঁধে বন্দুক। ফকির বন্দুকটা সঙ্গে করে এনেছেন। চন্দন বন্দুক বইছিল।
বারান্দায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর কিকিরা ফকিরকে বললেন, "চলো, ঘরে যাই।"
দোতলার সেই ঘর যেমন ছিল সেই রকমই পড়ে আছে। তারাপদ লন্ঠনটা জ্বালাল। কিকিরা জানলা দুটো খুলে দিলেন।
চারজনে বসে-বসে সিগারেট শেষ করলেন। তারাপদ একবার বারান্দায় গেল, ফিরে এল।
ফকির বললেন, "তুমি কি সত্যিই মনে করো, অমূল্য আসবে?"
মাথা নাড়লেন কিকিরা। "আসবে। আসা উচিত।"
চন্দন বলল, "যদি না আসে?"
"তাহলে বুঝব, আমার চালাকি খাটল না।"
ফকির আর কিছু বললেন না। চন্দন তারাপদকে নিয়ে আবার বারান্দায় চলে গেল।
সময় যেন আর কাটছিল না। চুপচাপ বসে থাকাও যায় না। কিকিরা ফকিরের সঙ্গে মাঝে-মাঝে কথা বলছিলেন। তারাপদ আর চন্দন ঘরে এল।
তারাপদ বলল, "কোথাও কোনো ট্রেস পাচ্ছি না কিকিরা, অমূল্য বোধহয় এলেন না।"
কিকিরা বললেন, "দেখো, ... পর্যন্ত কী হয়।"
আরও খানিকটা সময় কাটল। কিকিরা উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করলেন। ফকিরকে মাঝে-মাঝে এ-কথা সে-কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। আবার একসময় ফিরে এসে লোহার খাটটায় বসলেন।
ফকির ক্লান্ত হয়ে হাই তুললেন। চন্দন হতাশ হয়ে নিশ্বাস ফেলল। বলল কিছু।
কিকিরাও হতাশ হয়ে পড়ছিলেন।
হঠাৎ একেবারে আচমকা ঘর-কাঁপানো শব্দ হল, আর সঙ্গে-সঙ্গে ছিটকে গেল লন্ঠনটা, কাচ ভাঙল, মাটিতে পড়ে দপদপ করে জ্বলতে জ্বলতে নিবে গেল। ঘরের মধ্যে কেমন ধোঁয়াটে ভাব, কেরোসিন আর গন্ধকের গন্ধ।

কিকিরা আর ফকির প্রায় লাফ মেরে খাটের তলায় বসে পড়েছেন ততক্ষণে, তারাপদ আর চন্দন দেওয়ালের দিকে সরে গেছে।

জানলার দিকে তাকালেন কিকিরা। জানলা দিয়ে এসেছে গুলিটা। ঘর অন্ধকার। টর্চ জ্বালানো উচিত নয়, জ্বালালেই বিপদ। কিকিরা ফকিরের হাতে চাপ দিলেন, ফিসফিস করে বললেন, "টর্চ জেলো না।"

ঘর থমথম করতে লাগল।

জানলা দিয়ে কেউ ভেতরে আসছিল। বাইরের জ্যোৎস্নার দরুন তাকে অস্পষ্ট, ভুতুড়ে ছায়ার মতন দেখাচ্ছিল।

"কে, অমূল্য?" ফকির অস্ফুট গলায় আচমকা বললেন।

মূর্তি ততক্ষণে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে, জানলার কাছে। বলল, "হ্যাঁ।"

"তুমি আমাদের ওপর বন্দুক চালালে?"

"বন্দুক চালাইনি। পটকা চালিয়েছি। বাতিটা নিবিয়ে দিলাম। টর্চ জ্বালবার চেষ্টা করো না। তোমার সেই পুরনো বন্ধু কোথায়?"

ফকির চুপ করে থাকলেন। কিকিরা জবাব দিলেন, "আমি হাজির রয়েছি।"

"হাজির রয়েছেন তা জানি। আমিও হাজির। আপনি আমায় আসতে বলেছিলেন?"

"শশিপদ বলেছে?"

"হ্যাঁ।"

"হ্যাঁ, বলেছিলাম।"

"কেন?"

"কথা বলব বলে।"

"কিসের কথা?"

"তোমাকে তুমিই বলছি, রাগ করো না, তুমি ফকিরের ছোট ভাই।"

"বেশ বলুন।"

কিকিরা যে অন্ধকারে সন্তর্পণে কী করছিলেন ফকিরও জানতে পারছিল না। কিকিরা বললেন, "এই কুঠিবাড়ি নিয়ে তোমাদের দুই ভাইয়ের ঝগড়ার মিটমাট হয় না?"

অমূল্য রাগল না, তবু গলার স্বর অন্যরকম শোনাল। "আপনি আমাদের মধ্যে নাক গলাতে কেন এসেছেন? বাড়ির ব্যাপার বাড়ির মধ্যেই মিটে যাওয়া ভাল।"

"তুমি আমায় ভুল বুঝছ! আমি নাক গলাতে আসিনি। তা ছাড়া আমি এসে খারাপ তো কিছু করিনি। ধরো, এই বাড়ির মধ্যে যে-জিনিসটা রয়েছে সেটার হদিস তো পেয়েছি।"

এবারে অমূল্য উপহাসের গলায় বলল, "আমার চোখে আপনি ধুলো দেবার চেষ্টা করবেন না। কলকাতা থেকে দুটো ছোকরাকে সঙ্গে করে এনেছেন। তার মধ্যে একটাকে আপনি পুলিসের লোক বলে চালাতে চাইছিলেন। সে ডাক্তার।"

কিকিরা ঘাবড়ালেন না। বললেন, "তোমার সব দিকে নজর আছে, লোকজনও জায়গা-মতন রেখে দিয়েছ, দেখছি। ফকিরের বাড়িও বাদ দাওনি। কিন্তু, এই ব্যাপারটায় ভুল করছ।"

"কোন ব্যাপারে?"

"এই বাড়ির মধ্যে কী আছে তা আমি জানতে পেরেছি।"

"অসম্ভব। আপনি পারেন না।"

"বেশ, তা হলে তুমি আমার জানার একটা নমুনা দেখো।... যেখান দিয়ে তুমি উঠে এসেছ, সেখানে যাও। ওই জানলাটার কাছে। প্রথম জানলার ডান দিকের কাঠের মাথার দিকে হাত দাও! একটা জায়গায় ছোট্ট গর্ত-মতন দেখবে। একটা আঙুল বড় জোর ঢুকতে পারে। সেখানে আস্তে-আস্তে চাপ দাও...। সোজা চাপ দেবে। যখন বুঝবে লোহার মতন কিছুতে আঙুল ঠেকছে—তখন জোরে চাপ দেবে। যাও, দেখো।"

অমূল্য সামান্য চুপ করে থাকল, ভাবল। "কী হবে চাপ দিলে?"

"যা হবে দেখতেই পাবে। জানলার ডান দিকের কাঠ সরে ফোকর বেরুবে।"

"আপনি যে সত্যি কথা বলছেন তার প্রমাণ কী?"

"দেখতেই পাবে। সাধুবাবা ওই জিনিসটি হাতছাড়া করেননি।"

"তাহলে আপনিই বা করছেন কেন?"

"আমি যা বলেছি তুমি মন দিয়ে শোনোনি। আমি বলেছি, হদিস পেয়েছি, বলিনি সেটা আমার হাতে এসেছে।"

"আপনি হদিস পেয়েছেন অথচ হাতাননি? দাদা আপনাকে বৃথাই এনেছে?" অমূল্য বিদ্রূপ করল যেন।

"না, হাতাতে পারিনি। এক জায়গায় আটকে গিয়েছি।"

অমূল্য আর কোনো কথা বলল না, জানলার দিকেই ফিরে গেল।

কিকিরা তাঁর সেই ছড়ির মধ্যে থেকে লিকলিকে গুপ্তিটা আগেই বার করে নিয়েছিলেন। আস্তে-আস্তে নিঃশব্দে উঠলেন। ওঠার আগে ফকিরের হাতে চাপ দিলেন সামান্য।

অমূল্য জানলার কাঠের ফ্রেমে হাত রেখে দাঁড়াল। বন্দুকটা বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতে কাঠের চারদিক হাতড়াতে লাগল।

কিকিরা ছায়ার মতন অমূল্যের পিছনে গিয়ে গুপ্তির ডগাটা একেবারে তার ঘাড়ের কাছে ছোঁয়ালেন।

চমকে উঠে অমূল্য হাত নামাল।

কিকিরা শান্ত গলায় বললেন, "বন্দুক ধরার চেষ্টা আর কোরো না। আমার এই গুপ্তি দিশি নয়, বিলিতি, উইনস্টন কম্পানির, তোমার গলা ফুটো হয়ে যাবে।"

অমূল্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

কিকিরা ফকিরকে টর্চ জ্বালতে বললেন। টর্চ জ্বালালেন ফকির। আলোয় অমূল্যকে দেখা গেল। কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে।

কিকিরা তারাপদকে বন্দুকটা সরিয়ে নিতে বললেন। তারাপদ এগিয়ে এসে বন্দুকে সরিয়ে নিল। একনলা বন্দুক।

ফকির কিকিরার পড়ে থাকা টর্চটা মাটি থেকে উঠিয়ে নিয়ে সেটাও জেলে ফেললেন।

সামান্য চুপচাপ। কিকিরা অমূল্যকে ঘরে দাঁড়াতে বললেন। জোড়া টর্চের আলোয় অমূল্যকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কালো প্যান্ট, কালো জামা, পায়ে মোটা কেডস। স্বাস্থ্যবান চেহারা।

কিকিরা বললেন, "তুমি যথেষ্ট সাহসী, কিন্তু চালাক নও। আমি ম্যাজিশিয়ান, কথায় ভুলিয়ে দশ আনা কাজ হাসিল করি। যাক গে, তোমার সঙ্গে সরাসরি কয়েকটা কথা বলতে চাই। ফকির এখানে রয়েছে। কথা বলতে রাজি আছ?"

অমূল্য ভাবল কিছু। বলল, "রাজি। কিন্তু একটা কথা, আমি আপনাদের কাউকে গুলি করতে চাইনি। চাইলে করতে পারতাম। আমার গুলি ফসকায় না। তা ছাড়া, আমি কিন্তু একা আসিনি। আপনাদের মতন আমারও লোক আছে নীচে। আমার যদি কোনো ক্ষতি হয় তা হলে..."

কিকিরা বললেন, "না, তোমার ক্ষতি হবে না। আমি জানি তুমি আমাদের কারুর ওপর গুলি চালাওনি।"

"বেশ, তাহলে বলুন।"

কিকিরা গুপ্তিটা নামিয়ে নিলেন। বললেন, "তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে এই কুঠিবাড়ি নিয়ে রেষারেষি শুরু হল কেন হঠাৎ?"

অমূল্য কোনো জবাব দিল না।

কিকিরা বললেন, "সাধুবাবা এখানে আসার পর তোমাদের এই রেষারেষি। ওই সাধুবাবা যে তোমাদের ছোটকাকা তা নিশ্চয় জানতে পেরেছিলে!"

"পেরেছিলাম। কাকা নিজেই লোক মারফত গোপনে খবর দিয়েছিল।"

"তাঁকে তোমরা বাড়িতে নিয়ে যাওনি কেন?"

অমূল্য একবার ফকিরের দিকে তাকাল। "সেটা অসম্ভব ছিল।"

"তোমাদের কাকা তাহলে এখানে এসেছিলেন কেন?"

"দাদাকে জিজ্ঞেস করুন।"

কিকিরা ফকিরের দিকে তাকালেন।

ফকির সামান্য চুপচাপ থাকার পর বড় করে নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, "আমি যা বলতে চাইনি, কিঙ্কর, এবার আর তা না বলে উপায় নেই। আমি যা বলছি, তা সত্যি। ...আমাদের ছোটকাকা আমাদের বংশের কুলাঙ্গার। অনেক কাল আগের কথা, আমার বাবা, মেজকাকা—মানে অমূল্যর বাবা—দুজনেই জীবিত। মেজকাকার নতুন বাড়িও তৈরি হয়ে গিয়েছে। আমাদের তখন বয়েস কম, বাড়িতে প্রায়ই ছোটকাকাকে নিয়ে গন্ডগোল হতে শুনতাম। দিনদিন অশান্তি বেড়েই চলল। শেষে একদিন ছোটকাকা উধাও হয়ে গেল। কিছুদিন পরে ফিরে এল গেরুয়া পরে। আবার একদিন উধাও। তারপর শুনলাম, কাকা আমাদের বংশের সমস্ত সৌভাগ্যের যা মূল সেটা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। আমাদের বাড়িতে চার পুরুষের এক মনসামূর্তি ছিল, সোনার মূর্তি, অপরূপ দেখতে, মূর্তির চোখে হিরে। আরও কিছু দামি পাথর ছিল গায়ে। মূর্তির সঙ্গে ছিল একটা সোনার সাপ, তার দু চোখে দুটো লাল চুনি। এই মূর্তি কোনোদিন বাইরে থাকত না, থাকত সিন্দুকের চোরা-খোপের মধ্যে। মনসাপুজোর দিন তার পুজো হত বাড়িতে। ঠাকুরঘরে। আবার সেটা সিন্দুকে তুলে রাখা হত।" ফকির থামলেন, যেন একটু দম নিচ্ছিলেন।

কিকিরা বললেন, "নিশ্চয় খুব মূল্যবান মূর্তি?"

"তা তো হবেই—টাকায় শুধু মূল্যবান নয়, অমন মূর্তি ভূ-ভারতে খুঁজে পাবে কি না সন্দেহ! ...আমাদের বংশে ওই মূর্তির অন্য মূল্য। সে তোমরা বুঝবে না। ছোটকাকা ওই মূর্তি নিয়ে পালিয়ে যাবার পর কাকাকে আমরা ত্যাগ করলুম। বাবা আর মেজকাকা শপথ করিয়ে নিলেন, ভবিষ্যতে কোনোদিন ওই কুলাঙ্গার আর এই বংশের কারও কাছে যেন একদিনের জন্যেও আশ্রয় না পায়। তাকে বিষয় সম্পত্তির এক কানাকড়িও যেন না দেওয়া হয়। ...আমরা এই প্রতিজ্ঞা ভাঙিনি। কেমন করে ভাঙব?"

কিকিরা বললেন, "বেশ, প্রতিজ্ঞা না হয় না ভাঙলে কিন্তু তোমাদের ছোটকাকা যে জীবিত এটা জানতে?"

মাথা নাড়লেন ফকির। "না, আমরা জানতাম কাকা মারা গিয়েছে। বিশেষ করে সাপের কামড়ে মারা যাবার খবর শুনে আমাদের মনে হয়েছিল, যা হওয়া উচিত তাই হয়েছে। মা মনসাই তাঁর শোধ নিয়েছেন।"

"কিন্তু ওই কাকা এখানে কেন এসেছিলেন? তাঁর উদ্দেশ্য কী ছিল?"

"উদ্দেশ্য কী ছিল আগে বুঝিনি। যখন খবর পেলাম কাকা এসে ঘোড়া-সাহেবের কুঠির কাছাকাছি রয়েছে, গোপনে দেখা করতে বলেছে—তখন ভেবেছিলাম হয়তো কাকা বুড়ো বয়সে তার কৃতকর্মের জন্যে অনুতাপ জানাতে চায়। তারপর শুনলাম, কাকা আমাদের বংশের সেই মূর্তি আর সাপ নিজের কাছেই গচ্ছিত রেখেছিল, এখন তা ফেরত দিয়ে যেতে চায়।"

"কে তোমায় এ-কথা বলেছে?"

"বিশু।"

"তুমি নিজে কেন কাকার সঙ্গে দেখা করতে যাওনি?"

"রাগে, ঘেন্নায়। তা ছাড়া আমি গেলে কাকা কিছু বলত না। বিশুকেই যেতে বলেছিল।"

কিকিরা অমূল্যর দিকে তাকালেন। বললেন, "তুমিও কি নিজে যাওনি, অমূল্য?"

"আমি নিজেই একদিন গিয়েছিলাম। কাকা আমায় ওই একই কথা বলেছিল—দাদা যা বলল।"

"তারপর? সাধুবাবা যেদিন বিশুকে নিয়ে এই কুঠিবাড়িতে এল, সেদিন তুমি নিজে না এসে তোমার শালা চরণকে পাঠালে কেন?"

অমূল্য চুপ। তার মুখ কেমন শক্ত, কালো হয়ে আসছিল। দাঁতে দাঁত চাপল অমূল্য। হঠাৎ দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। "আমি বলব না, বলতে পারব না।"

তারাপদ, চন্দন দুজনেই পাথরের মতন দাঁড়িয়ে।

কিকিরা বললেন, "আমি বলছি। জানি না ঠিক বলছি কি না! ...তোমার কাকা তোমায় বলেছিলেন, তিনি বিশুকে ভুলিয়ে কুঠিবাড়ির এই ঘরে নিয়ে আসবেন। তোমার কাজ হবে, বিশুকে গুলি করে মারা। তাকে আগে মারবে, তারপর তিনি তোমায় মনসা-মূর্তি দেবেন। তাই না?"

অমূল্য ছটফট করছিল। বলল, "হ্যাঁ। কাকা তাই বলেছিল। কিন্তু আমি অমূল্য রায়। মামলা-মকদ্দমা, জমিজিরাত নিয়ে লাঠালাঠি ফৌজদারি করতে পারি; নিজের ভাইপোকে গুলি করতে পারি না।"

"নিজের হাতে পারবে না বলে চরণদের পাঠিয়েছিলে?"

অমূল্য রুক্ষভাবে কিকিরার দিকে তাকাল। "হ্যাঁ।...কিন্তু আপনি যা বলছেন তা নয়। আমি চরণকে বলেছিলাম, ওই শয়-

তানের কাছ থেকে আগে মূর্তির খবর জেনে নেবে, তারপর তাকে কুকুরের মতন গুলি করে মারবে। বিশুর গায়ে যেন আঁচড় না পড়ে।" কথা শেষ করার আগেই অমূল্য প্রায় কেঁদে ফেলল ; জড়ানো গলায় বলল, "আমি ইতর নই, জন্তু নই ; বিশুকে চরণরাই যে পরে কুঠির বাইরে এনেছে, সে-খবর আপনি রাখেন ?"

"না। তবে আমার সন্দেহ ছিল।"

"দাদা আপনাকে যা বলেছে আপনি তাই বিশ্বাস করেছেন।"

কিকিরা সামান্য অপেক্ষা করে অমূল্যকে বললেন, "আমি তোমার সমস্ত কথা বিশ্বাস করছি, অমূল্য। বিশুকে গুলি করার দরকার হলে চরণরা যে-কোনো সময়ে সেটা করতে পারত। সাধু-বাবার সঙ্গে বচসা করত না।" বলে অমূল্যর কাঁধে হাত দিলেন, যেন সান্ত্বনা জানালেন।

অমূল্য ক্ষোভের গলায় বলল, "দাদা আপনাকে ভুল বুঝিয়েছে। বিশুর সঙ্গে আমার শত্রুতা নেই।"

ফকির চুপ করে ছিলেন।

কিকিরা ফকিরকে বললেন, "ফকির, তুমি আমার কাছে অনেকগুলো বাজে কথা, মিথ্যে কথা বলেছ। শুধু মিথ্যে বলোনি, নিজের ছেলেটাকে তুমি লোকের চোখের আড়ালে রেখেছ, তাকে অনর্থক একগাদা ঘুমের ওষুধ খাইয়েছ, অ্যাবনরমাল করে রেখেছ ! কেন ? তোমার কি সবসময় ভয় হত, বিশু স্বাভাবিক থাকলে সব কথা সাফসুফ বলে দেবে ?"

ফকির নিচু মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন, "হ্যাঁ, সে-ভয় ছিল। তবে তোমায় আমি আগেই বলেছি, আমাদের বংশের এমন কয়েকটা কথা আছে যা আমরা বাইরে বলতে চাই না। বলতে পারি না। বলা নিষেধ। ছোটকাকার কথা, মনসার মূর্তির কথা আমি বাইরে প্রকাশ করতে চাইনি। আজ বাধ্য হয়ে বললাম তোমায়।"

"ঝপাৎ"

পরাগ রায়/১৩ বছর

সোমনাথের বাড়িতে সেদিন কেলেঙ্কারীর একশেষ।
বরাবরের মত সেদিনও সোমনাথের মা রান্নাঘরের
কঞ্জালগুলো একটা ঠোঙ্গায় ভরে ছুঁড়েছেন রাস্তায়। আর
পড়বি তো পড়
সোমনাথের বাবার
গায়ে গিয়ে ফাটলো
ঠোঙ্গাটা।
ডিমের খোলা,
মাছের আঁশ, চুল
আর ওষুধের নোংরা
মেখে বাবা যখন
বাড়ি ঢুকলেন, তখন
লজ্জায় সকলের
মাথা হেঁট।
কেলেঙ্কারীটা হতে
তবে সকলের টনক
নড়লো।
আর এ বদ অভ্যেস তো কলকাতার
ঘরে ঘরে "বাবার ঘটনাটা থেকেই
যদি সকলের শিক্ষা হয়ে যেতো-?"
সোমনাথ ভাবছিল।

"তা অবশ্য বললে, ফকির", কিকিরা একটু ইতস্তত করে বললেন, "আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, তুমি আর অমূল্য—দুজনেই আলাদা-আলাদা ভাবে তোমাদের কাকার কাছ থেকে মূর্তিটি পেতে চেয়েছিলে। তার জন্যেই এত।"

ফকির চুপ। অমূল্যও কথা বলল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর কিকিরা বললেন, "ফকির, আমি যেদিন তারাপদকে নিয়ে তোমার বাড়িতে এলাম, দোতলা থেকে কে বন্দুক ছুঁড়েছিল ? তুমি বলেছ বিশু। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়নি।"

"আমি ছুঁড়েছিলাম," ফকির বললেন।

"কেন ?"

"তোমায় ঠকাতে চেয়েছিলাম। না না, ঠকানোই বা কেন ! আমি তোমায় বোঝাতে চেয়েছিলাম, বিশু কেমন—কী বলব—পাগল-পাগল ব্যবহার করছে। ...আমায় তুমি ক্ষমা করো, ভাই।"

কিকিরা কেমন ম্লান মুখ করে হাসলেন। বললেন, "আমায় তুমি সব কথা যদি খুলে বলতে ফকির, ভাল হত। তুমি অন্যায় করেছ ! তা ছাড়া, আমার মনে হয়, তুমি আমায় অন্যভাবে একটা কাজে লাগাতে চেয়েছিলে—সেই মনসামূর্তি যদি আমি খুঁজে বার করতে পারি এই কুঠিবাড়ি থেকে, তাই না ?"

মাথা নাড়লেন ফকির। "না, কিঙ্কর ; আমি মোটেই তা চাইনি। তুমি কলকাতা থেকে হঠাৎ আমার কাছে সেবার বেড়াতে এলে ! এসে দেখলে আমি ঝঞ্ঝাটে রয়েছি। আমি তোমায় সব কিছু খুলে বলতে পারছিলাম না। বিশু তখনও ধাক্কা সামলাতে পারেনি। আমি যে কী করব ঠিক করতে না পেরে বোকার মতন নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছি। তোমায় মিথ্যে কথা বলেছি, ছেলে-টাকেও জবুথবু করে রেখেছি। তুমি না এলে ব্যাপারটা এতদূর গড়াত না বোধহয়। তবে সত্যি বলছি, পরে আমার মনে হয়েছিল, তুমি যদি কুঠিবাড়ি থেকে মনসামূর্তি উদ্ধার করতে পারো—ভালই হয়। অবশ্য সে-আশা আমার কমই ছিল।"

"কম ছিল, তবু তোমাদের বিশ্বাস ছিল মূর্তিটা এই বাড়িতেই আছে।"

"হ্যাঁ," অমূল্য বলল, "কাকা যদি ও-ভাবে পালিয়ে যায় তবে মূর্তি কোথায় থাকবে ?"

কিকিরা বললেন, "সে-মূর্তি উদ্ধার হবে কেমন করে ! তোমাদের ছোটকাকা অনেক আগেই তা বেচেবুচে দিয়েছেন। বাইরে সন্ন্যাসী হলেও ভেতরে কি তিনি তাই ছিলেন ? যে-মানুষ বাড়ি থেকে লক্ষ টাকার জিনিস চুরি করে সে-মানুষ কি সাধু ?"

অমূল্য বলল, "তাই যদি হবে, তবে কাকা এসেছিল কেন এখানে ?"

"কেন এসেছিলেন বুঝতে পারো না ?"

"না।"

"প্রতিশোধ নিতে। যাকে তোমরা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ, বংশ থেকে বাদ দিয়েছ, এক কানাকড়ি সম্পত্তিও দাওনি, সে যে তোমাদের ক্ষমা করবে, একথা বিশ্বাস করা মুশকিল। তার হাতে যতকাল টাকা পয়সা ছিল, ফুর্তিফার্তা করে দিন কাটিয়েছে। তারপর হয়তো তার দুর্দিন গিয়েছে। শেষে যখন বুঝল, তোমাদের ভাইয়ে-ভাইয়ে সম্পত্তি নিয়ে ভাগাভাগি গণ্ড-গোল রেষারেষি চলছে, তখন সে এল। এল মতলব নিয়ে। তোমাদের মধ্যে আরও রেষারেষি, খুনোখুনি বাধিয়ে এই বংশ প্রায় শেষ করে দিতে। ধরো, অমূল্য—তুমি যদি বিশুকে সত্যিই খুন করতে, ফকির তোমায় ছাড়ত না, সেও তোমায় খুন করত। দু তরফে বিদ্বেষ, খুনোখুনি, রক্তারক্তি চলত। তারপর কোথায় গিয়ে এই শত্রুতার শেষ হত, ভগবানই জানেন।"

"কাকা এত নীচ ?"

"নীচ, উন্মাদ। তার যদি অনুতাপ হত, সে গাছতলায় বসেই তোমাদের দুজনকে ডেকে মনসামূর্তি ফেরত দিত। কেন সে এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে যাবে?"

অমূল্য রাগে কাঁপছিল। বলল, "আমি সেদিন চরণকে বলেছিলাম ওকে কুকুরের মতন গুলি করে মারতে। আর কোনোদিন যদি দেখতে পাই, আমি তাকে নিজের হাতে গুলি করে মারব।"

"আর কোনোদিন তাকে পাবে না। আর কি সে আসে?... নাও চলো, রাত হয়ে যাচ্ছে।"

ঘরের বাইরে এসে কিকিরা অমূল্যকে বললেন, "ওই ঘোরানো লোহার সিঁড়ি, ওই জানলার কথা তুমি আগে জানতে?"

মাথা নাড়ল অমূল্য। "না, কেমন করে জানব। এখানে কে আসে? যদি জানতাম তা হলে কি কাকা পালাতে পারত! আমরা ভেবেছিলাম গুলি খেয়ে জানলা দিয়ে লাফ মেরেছে। পরের দিন খোঁজ করতে গিয়ে সিঁড়িটা দেখি। সিঁড়িটা বড় অদ্ভুত, বাগানে গিয়ে শেষ হয়েছে। গাছপালার মধ্যে। কাকা ওখান থেকেই পালিয়েছে।"

কিকিরা বললেন, "শশিপদ বলেছে, তোমাদের কাকা এখনও বেঁচে আছে।"

"শশিপদ কাকার হয়ে খবরাখবর দিত। আমি তাকে পয়সা দিয়ে কাজে লাগিয়েছিলাম। আজ সে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। ভয়ে। সহজে আর আসছে না।"

কুঠিবাড়ির নীচে এসে কিকিরা বললেন, "তোমার লোকজন কোথায়? ডাকো।"

অমূল্য একটু হাসল। তারপর শিস দেওয়ার মতন করে শব্দ করল। তীক্ষ্ণ শব্দ। বলল, "চলুন, ওরা আসবে। পেছনেই।"

হাঁটতে-হাঁটতে কিঙ্কর বললেন, "একটা কথা তোমাদের দুজনকেই বলি। রক্তে যদি তোমাদের মামলা-মকদ্দমা থাকে ভাই, তবে সেটা আর কে রুখবে। তবে এই খুনোখুনি-রক্তারক্তিটা ভাইয়ে ভাইয়ে না থাকাই ভাল। ...তা ছাড়া, যা গিয়েছে তা যখন আর ফিরে আসবে না, তখন তোমরা ও নিয়ে আর চিন্তা কোরো না। তোমাদের কাকা যা চুরি করে নিয়ে পালিয়েছিলেন, সেটা তোমাদের বংশের সৌভাগ্যের লক্ষ্মী হতে পারে—কিন্তু তিনি যা দিতে এসেছিলেন সেটা দুর্ভাগ্য। তোমরা বেঁচে গিয়েছ!"

ফকির চঞ্চল হয়ে পড়েছিলেন, কিকিরার হাত ধরে ফেললেন আবেগে। বললেন, "কিঙ্কর, আমি তোমার কাছে বড় ছোট হয়ে গেলাম। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি যা করেছি তা দায়ে পড়ে। বোকার মতন কাজ করেছি। আমায় ক্ষমা করো।"

কিকিরা ফকিরের কাঁধে হাত রেখে হেসে বললেন, "আমি সবই বুঝেছি। নাও চলো। চলো, অমূল্য।"

পেছনে পায়ের শব্দ শোনা গেল। মুখ ফিরিয়ে তাকালেন কিকিরা। তারপর হেসে অমূল্যকে বললেন, "তুমি দেখছি অনেক সৈন্যসামন্ত এনেছিলে।"

অমূল্য লজ্জা পেয়ে হাসল।

তারাপদ আর চন্দন কিকিরার পেছনে। চাঁদের আলোয় অতগুলো মানুষ ঘোড়া-সাহেবের কুঠির বাগান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, যেতে-যেতে শুনল দমকা বাতাস এসে গাছপালার পাতায় কেমন এক শব্দ তুলেছে।

সত্যি-মিথ্যের ধাঁধা

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীতে বহু ধাঁধা শুধু সত্যি-মিথ্যের ধাঁধা নামেই পরিচিত হতে পারে। এর কিছু এত প্রাচীন যে, কবে প্রথম কোন্ দেশে এর উৎপত্তি, ঠিক বলা যাবে না। কিন্তু ধাঁধাগুলো যে জব্বর তাতে সন্দেহ নেই। মোটামুটিভাবে এগুলো বুদ্ধির ধাঁধা। অঙ্কের মতোই নির্ভুল একটা উত্তর রয়েছে, সেই উত্তরে পৌঁছতে হবে লজিকের হাত ধরে। দ্যাখো তো, পারো কি না। লজিক শুনে ভয় পাবার কিছু নেই, মাথা ঠাণ্ডা রেখে সম্ভাবনাগুলোকে যাচাই করে দেখা—এই মাত্র।

প্রথম ধাঁধা ॥ চারটি ছেলে। অলোক, বিজন, বিকাশ আর মৃদুল। এদের মধ্যে একজন বল খেলতে গিয়ে আলমারির কাঁচ ভেঙেছে। চারজনকে ডেকে প্রশ্ন করা হল, কে ভেঙেছে। তারা যে উত্তর দিল, তা এই রকম—

অলোক ঃ বিজন ভেঙেছে কাঁচ।
বিজন ঃ মৃদুল ভেঙেছে।
বিকাশ ঃ আমি কাঁচ ভাঙিনি।
মৃদুল ঃ বিজন মিথ্যে করে বলেছে যে, আমি কাঁচ ভেঙেছি।

এর মধ্যে একজনের উত্তরই মাত্র সত্যি। এটা ধরে নিয়ে বলতে পারো, কে ভেঙেছে কাঁচ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ দুই ভাই। দু-জনকে দেখতে হুবহু এক-রকম। শুধু একজন সব সময় সত্যি কথা বলে, অন্যজন বলে সব সময় মিথ্যে কথা। কোনও আগন্তুকের পক্ষে বোঝা শক্ত, কে সত্যি বলে আর কে মিথ্যে।

এরা বসে থাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ দুই রাস্তার মোড়ে। খুব গোলমেলে মোড়, সেই মোড় থেকে একটি রাস্তা গিয়েছে শহরের দিকে, অন্যটি জঙ্গলের দিকে। নতুন লোকরা গাড়ি নিয়ে সেই মোড়ে আসে। কোন্ রাস্তা শহরে গিয়েছে জানতে চায়। প্রশ্ন করলে, কখনও উত্তর দেয় সত্যবাদী, কখনও মিথ্যেবাদী। ফলে কেউ ঠিক রাস্তা পেয়ে শহরে পৌঁছে যায়, কেউ বনের মধ্যে গিয়ে বিপদে পড়ে। অথচ একটি মাত্র প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যায় সেই মোড়ে। একটির বেশি দুটি প্রশ্নের উত্তর দেবে না দুই ভাই।

এক বুদ্ধিমান ভদ্রলোক একদিন সেই মোড়ে এলেন তাঁর গাড়ি নিয়ে। তিনি আগেই জানতেন, এই মোড়ের ছেলে-দুটির একজন সত্যি বলে, একজন মিথ্যে। এও জানতেন যে, এরা একটি মাত্র প্রশ্নেরই জবাব দেয়। এ-কথাও তাঁর অজানা ছিল না যে, তিনি ধরতে পারবেন না—কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যেবাদী। তাই তৈরি হয়েই এসেছিলেন।

তিনি একটি মাত্র প্রশ্ন করলেন দু-ভাইয়ের একজনকে। এবং সেই উত্তরের ভিত্তিতে ঠিক-ঠিক বেছে নিলেন শহরে যাবার রাস্তা।

ভদ্রলোকের প্রশ্নটা কী ছিল, বলতে পারো?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ এক দ্বীপে দু-ধরনের অধিবাসী থাকে। এক-দল গুহাবাসী, অন্য দল বৃক্ষবাসী। বৃক্ষবাসীরা সব সময় বলে সত্যি কথা, গুহাবাসীরা সব-সময় বলে মিথ্যে কথা। এদেরও কারও চেহারা কিংবা পোশাক দেখে নতুন লোক বুঝতে পারবে না যে, সে গুহাবাসী না বৃক্ষবাসী।

এক ভদ্রলোক সেই দ্বীপে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে গল্প বললেন বন্ধুদের। বললেন, ''আমার কোনও অসুবিধে হয়নি ওই দ্বীপে। নেমেই প্রথমে যার সঙ্গে দেখা হল, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি ভাই গুহাবাসী না বৃক্ষবাসী? উত্তরে সে বলল, 'আমি গুহাবাসী।' সে-লোকটার সঙ্গে বন্ধুত্ব করলাম। সেই আমাকে দ্বীপ ঘুরিয়ে দেখাল।''

বন্ধুরা গল্পটা শুনে বুঝতে পারল যে, ভদ্রলোক দারুণ একটা মিথ্যে বলেছেন। ওর কথা সত্যি হওয়া অসম্ভব।

কেন অসম্ভব বলতে পারো?

চতুর্থ ধাঁধা ॥ সেই গুহাবাসী আর [illegible]বাসীদের নিয়েই আরেকটি ধাঁধা। মনে রাখতে হবে, গুহাবা[illegible] সবসময় মিথ্যে কথা বলে, বৃ[illegible]বাসীরা সবসময় সত্যি কথা

একজন নতুন লোক সেই দ্বীপে গি[illegible]। তিনি দেখলেন তিনজন অধিবাসী একসঙ্গে আসছে। তিনি [illegible]ম লোকটিকে প্রশ্ন করলেন : তোমরা গুহাবাসী না বৃক্ষবাসী? প্রথম লোকটি জবাবে বলল : আমরা সবাই গুহাবাসী।

দ্বিতীয় লোকটি বলল : না, কথাটা সত্যি নয়। আমাদের মধ্যে দু-জন মাত্র গুহাবাসী।

আগন্তুক তৃতীয় অধিবাসীর দিকে তাকালেন। তৃতীয় জন বলল, দু-জনের কারো কথাই সত্যি নয়।

তিনজনের তিনরকম কথা শুনে আগন্তুক বুঝতে পেরে গেলেন, এদের মধ্যে কজন বৃক্ষবাসী আর কজন গুহাবাসী। কী করে?

পঞ্চম ধাঁধা ॥ এ-ধাঁধাটাও আরেকটা দ্বীপের লোকজন নিয়ে। কিন্তু আরেকটু গোলমেলে।

ব্যাপার হল কী, এই দ্বীপের ছেলেরা সবসময় সত্যি কথা বলে। মেয়েরা পরপর দুটো সত্যি অথবা পরপর দুটো মিথ্যে বাক্য বলে না। তারা প্রথমে যদি সত্যি বাক্য বলে, তাহলে পরের বাক্য বলবে মিথ্যে। প্রথম বাক্য যদি মিথ্যে বলে, পরের বাক্যটা বলবে সত্যি। ছোট-বড় সকলেই এই নিয়মে চলে।

এই দ্বীপের এক দম্পতি আর তাদের সন্তান রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। পথে এক আগন্তুকের সঙ্গে দেখা।

আগন্তুক বাচ্চাটিকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি ছেলে না মেয়ে।'

বাচ্চাটি এমন জড়ানো ভাষায় জবাব দিল যে, লোকটি একবর্ণও বুঝতে পারলেন না। বাচ্চাটির নাম ধরা যাক, পম।

দম্পতির মধ্যে একজন তখন পরিষ্কার ভাষায় বললেন, "পম বলল যে, আমি ছেলে।"

অন্যজন বললেন আগন্তুককে, ''পম মেয়ে। পম মিথ্যে বলেছে।"

আগন্তুক একটু হকচকিয়ে গেলেন। পরে ঠান্ডা মাথায় ভাবতে লাগলেন।

অনেক ভেবে, বুঝতে পারলেন, পম ছেলে না মেয়ে।

তিনি তো বুঝলেন। তোমরা বলতে পারো, পম ছেলে না মেয়ে? আর ওর বাবা-মার মধ্যে কে কী বলেছেন?

উত্তর

(১) যদি ধরা যায় অলোক ভেঙেছে, তাহলে বিকাশ এবং মৃদুলের উত্তর সত্যি হয়ে ওঠে। যদি ধরা যায় বিজন ভেঙেছে, তাহলে অলোক, বিকাশ এবং মৃদুল—এই তিনজনের কথাই সত্যি হয়ে যায়। মৃদুল যদি ভেঙে থাকে, তাহলে বিজন এবং বিকাশ দুজনেই সত্যি উত্তর দিয়েছে বুঝতে হবে। অথচ বলা হয়েছে যে, মাত্র একজনের উত্তরই সত্যি। সেদিক থেকে দেখলে বোঝা যাচ্ছে, বিকাশ ভেঙেছে কাঁচ এবং সেক্ষেত্রে একমাত্র মৃদুলের উত্তরটিই সত্যি প্রমাণিত হচ্ছে, বাকি তিনজনই মিথ্যে উত্তর দিয়েছে।

(২) ভদ্রলোক যে-কোনো একজনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করবেন যে—''তোমার ভাইকে যদি শহরে যাবার রাস্তা দেখাতে বলি, তাহলে সে কোন্ রাস্তাটা দেখাবে?'' এর উত্তরে যে-রাস্তাটা দেখাবে উত্তরদাতা, তার উল্টো রাস্তাটাই হবে শহরের রাস্তা। কেন? ধরা যাক ভদ্রলোক মিথ্যেবাদী ভাইকে এ-প্রশ্নটা করলেন। মিথ্যেবাদী ভাই এর উত্তরে তাঁকে জঙ্গলে যাবার রাস্তাটা দেখাবে, কেননা সে জানে—সত্যবাদী ভাই ঠিক রাস্তাই বলবে, কিন্তু সে যেহেতু নিজে মিথ্যে বলে, তাই সত্যবাদী ভাইয়ের দেখানো রাস্তাটার উল্টোটার কথাই উচ্চারণ করবে। অর্থাৎ বনের রাস্তা দেখাবে।

প্রশ্নটা যদি সত্যবাদী ভাইকে করা হয়, তাহলে সেও এ-প্রশ্নের উত্তরে জঙ্গলের রাস্তা দেখাবে। কেননা সে জানে—মিথ্যেবাদী ভাই এ-প্রশ্নের উত্তরে শহরের রাস্তা না দেখিয়ে জঙ্গলের রাস্তা দেখাত, তাই সে সত্যের খাতিরে সেই রাস্তাটাই দেখাবে। অর্থাৎ দু-ক্ষেত্রেই জঙ্গলে যাবার রাস্তাটা দেখাবে যে-কোনো ভাই। তার উল্টো পথটাই হবে শহরের পথ।

(৩) ভদ্রলোক সত্যিই মিথ্যে বলেছেন। কেননা, ওই দ্বীপের সমস্ত অধিবাসীই নিজেদের 'বৃক্ষবাসী' বলবে। কারণ, বৃক্ষবাসীরা সত্যি কথা বলে, তাই তারা নিজেদের বৃক্ষবাসী বলবে।

আবার গুহাবাসীদের কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয়, আপনি বৃক্ষবাসী না গুহবাসী? তাহলে মিথ্যেবাদী বলেই সে জবাবে বলবে, আমি বৃক্ষবাসী।

তাই ভদ্রলোক যে বললেন, ওই দ্বীপের একটি লোক তাকে বলল যে, 'আমি গুহাবাসী'—তা সত্যি হতে পারে না। ভদ্রলোক বানিয়ে বলেছেন।

(৪) তিনজনই বৃক্ষবাসী নয়, প্রথমেই বোঝা যাচ্ছে, কেননা, বৃক্ষবাসীরা সত্যি বলে সবসময়, সেক্ষেত্রে তিনজন তিনরকম উত্তর দেবে না।

তিনজনই গুহাবাসী নয়। কেননা, তাহলে প্রথম জনের কথা সত্যি হয়, যা অসম্ভব। কেননা গুহাবাসীরা সত্যি বলবে না অতএব হয় দু-জন অথবা একজন বৃক্ষবাসী।

দু-জন বৃক্ষবাসী হলে—দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা অসত্য, তৃতীয় ব্যক্তির কথা সত্য, আবার প্রথম জনের কথাও অসত্য। এটা অসম্ভব। কেননা, দুজনই সত্যি কথা বলবে, যদি দু-জন বৃক্ষবাসী থাকে।

তাহলে একজনই এদের মধ্যে বৃক্ষবাসী।

তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা সত্যি এবং সেই তাহলে বৃক্ষবাসী। আর দু-জন গুহাবাসী।

(৫) ধরা যাক, পম ছেলে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় বক্তা তার মা, যিনি প্রথম বাক্যটি মিথ্যে বলেছেন। দ্বিতীয়টি বলেছেন সত্যি, বা বলতে বাধ্য সত্যি। কিন্তু ওই দ্বীপের ছেলেরা মিথ্যে বলে না। সুতরাং একটা অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে দুটো বাক্যের মধ্যেই। সুতরাং, পম ছেলে নয়।

ধরা যাক, পম মেয়ে। সেক্ষেত্রে প্রথম বক্তা যদি বাবা হন, দ্বিতীয় বক্তা হল মা। সেক্ষেত্রে মায়ের প্রথম বাক্যটি সত্যি, দ্বিতীয় বাক্যটি হবে মিথ্যে। কিন্তু এতেও অসুবিধে হয়। কেননা, পমকে তাহলে সত্যি বলতে হয়েছে, আমি মেয়ে (নইলে মায়ের দ্বিতীয় বাক্যটি মিথ্যে প্রমাণিত হয় না)। আবার পম যদি নিজেকে মেয়েই বলে থাকে তাহলে প্রথম বক্তা হিসেবে বাবার কথা মিথ্যে প্রমাণিত হয়। কিন্তু ছেলেরা মিথ্যে বলে না। সুতরাং এর মধ্যেও অসঙ্গতি রয়েছে।

সুতরাং প্রথম বক্তা মা, দ্বিতীয় বক্তা বাবা।

পম মিথ্যে বলেছে, বলেছে 'আমি ছেলে।' মা একটি বাক্য বলেছেন, এবং সেটি মিথ্যে।

বাবা পরের বক্তা। দুটো বাক্যই সত্যি বলেছেন।

পম মেয়ে।

দাদা-ভাই

রাত দুটো—হঠাৎ আগুন-সংকেত বেজে উঠল...প্রচণ্ড আওয়াজ...

আগুন কোথায়?
বাচ্চাদের ওয়ার্ডে!

জিম, আমরা দুজনে একই জিনিস ভাবছি কি?
কী ভাবছেন, মিথ্যে ঘণ্টা তো? হ্যাঁ।

বাচ্চাদের ওয়ার্ডে কেউ অ্যালার্ম বাজিয়েছে। কার এমন ভয়ংকর কাজ!

সকলে নিশ্চয়ই শুনেছে ঘণ্টা। আর-সবাই জেগে উঠেছে, এদেরও জাগা উচিত ছিল...

তবু দেখছি সব ঘুমিয়ে কাদা! একটু ডেকেডুকে দেখব ডাঃ গিলেস্পি?
সকালে দেখো।

রাতে কাউকে তুমি অ্যালার্ম চালু করতে দেখোনি বলছ!
সত্যি বলছি, দেখিনি। এ ওয়ার্ডে কেউ কিছু করেনি, আপনার দিব্যি।

কী জানি, মনে হচ্ছে যেন দেখলাম, বাইরে থেকে পা টিপে ঢুকে অ্যালার্মে হাত দিল—মানে পষ্ট দেখিনি, তবে...

কী রকম দেখতে লোকটা?
কী জানি, আপনার মতোই লাগল তো!

ঠিক হ্যায় বিপদ কেটেছে। মোটকু, এবার তই পাহারায় দাঁড়া।

দারুণ খেল দেখিয়েছিস তোরা, ঐ ডাক্তারটার জেরায় টঁু শব্দটি করিসনি কেউ। হ্যাঁ রে, কারো কলজে ধুকপুক করছে না তো?

ধুকপুক না করাই ভাল। এই রক্ জেণ্টির হাতে সে আস্ত থাকবে না তাহলে!

আমি যা প্ল্যান করেছি, তাতে ওরা চোখে সর্ষেফুল দেখবে। আর টেরটিও পাবে না কে করছে, শুধু চাই তোমাদের মুখে তালাচাবি।

আচ্ছা রক্, কী হবে এসব করে?
চুপ! যা বলছি করে যা!

হাসপাতালে মিথ্যে অ্যালার্ম, সর্বনেশে কথা। আশা করি আর ঘটবে না।
বলা খুব মুশকিল স্যার!

ধোঁয়া! ধোঁয়ার গন্ধ!
আরে! বাচ্চাদের ওয়ার্ডে!
CHILDRENS

আমি অ্যালার্ম দিচ্ছি। জলদি! ওয়ার্ড থেকে বাচ্চাগুলোকে সরিয়ে আনো!

দারুণ জমেছে খেলা!

ব্লেয়ার হাসপাতালের বাচ্চাদের ওয়ার্ডে অদ্ভুত সব অগ্নিকাণ্ড ঘটতে লাগল।
কোনো হদিস?
না!

তুমি বলছ ঠাট্টা?
তাই তো লাগছে। মারাত্মক ক্ষতি তো কিছু হয়নি।

বড়কত্তার ঘুম চুকে গেছে ভাইসব। তবে এই তো কলির সন্ধে। রক্ জেণ্টি অ্যাদ্দিন শুধু নমুনা দেখিয়েছে, এবার...

আবার আগুন নাকি, রক?
ধুস্ মোটকু, আজ রাত্রে দুসরা খেল্।

আজ আর আগুন না, দমকলের নলের মুখটা খুলে দেব শুধু
শ্শ্, কে আসছে!

ডাঃ কিল্ডেয়ার, এখানে সব শান্ত
একটু বেশি শান্ত যেন

ঠিক আছে, বিপদ ভেগেছে। তুই খাড়া থাক, আর আমি দমকলের পাইপে জল ভর্তি আছে কি না দেখে আসি।

ঠিক হ্যায়! রেডি... সেট!
FIRE HOSE

জ্যাক! দৌড়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়্!

কী ব্যাপার এখানে?
কী জানি। দমকলের পাইপ কে ছেড়ে দিয়েছে!

জিম, আর ব্যাপারটাকে ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। যেই করুক ক্ষতি হয়েছে প্রচুর—আর যে হয়নি এই ভাগ্য। পুলিসে খবর দাও।

আমার অনুমান, বাচ্চাদের কেউ এর পেছনে আছে। পুলিসে যাবার আগে আমি একটু দেখতে চাই।

এই যে ডাঃ কিলডেয়ার, বাচ্চাদের ওয়ার্ডের সকলের ফাইল—
ধন্যবাদ।

হঠাৎ বাচ্চাদের ব্যাপারে এত উৎসাহ যে স্যার?
আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওদেরই কেউ এসব কাণ্ড করছে।

ফাইলের রেকর্ড থেকে একটা সূত্র পাব নিশ্চয়ই। নইলে... ডাঃ গিলেস্পি তো পুলিস ডাকবেন।

রাত জেগে ডাঃ কিলডেয়ার বাচ্চাদের ওয়ার্ডের রুগিদের রেকর্ড পড়তে লাগলেন।

জন জেণ্ট্রি, ১৩ বছর, ডাকনাম 'রক্'।

কাজটা মিটে গেলে এই ডাক্তার-ফাক্তারগুলো ল্যাজ তুলে পালাবে। তবে কেউ যদি টুঁ শব্দটি করে, আমার হাতে তার রক্ষে নেই কিন্তু।
ওয়ার্ড।

তাহলে তুমি বলছ এই রক্ জেণ্ট্রিকে সরিয়ে নিলে সব উৎপাত বন্ধ হবে?

দেখাই যাক না স্যার। উৎপাত থামলেই বুঝব কে ছিল এর পেছনে।

অ্যানবি, এসেছ!
বলিনি আসব? ঝামেলা হচ্ছে নাকি?

তাহলে ঐ কিলডেয়ার ব্যাটা তোকে জ্বালাচ্ছে! কেন?

খুব পেছনে লেগেছে দাদা। আমি শাসিয়েছি, যদি বাড়াবাড়ি করে তবে—
এই 'তবে' মানে আমি, তাই তো?

তা দাদা, বাজারে তোমার মতো নামডাক আর কার?
এই, আস্তে! এসব কথা আকাশ ফাটিয়ে বলার কী আছে?

ওসব নামডাকের কথা ছাড়্। কিলডেয়ার হুজ্জত করছে, কেসটা কী?
বলছি শোনো—

ব্যবস্থা করো যাতে লোকটা আমার ত্রিসীমানায় না আসে, হবে না?
হবে। ও জানে তুই আমার ভাই?

না বোধহয়। তবে জেনে যাবে, তাই না?
জেনে যাবে।
BLAIR

এই কিলডেয়ারটা খতে কী-রকম?
মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আসবে, দেখো তখন।

আমি আড়ালে দাঁড়াচ্ছি। ব্যবস্থা একটা হবেই ভাবিস নে রক্।
ঐ পাজিটাকে ভাগাও দাদা।

ছেলেটির রকম-সকম কী বুঝছ?
ভাল নয়, তবে সামলানো যাচ্ছে—

তুমি ডাঃ কিলডেয়ার?
হ্যাঁ, কী চাই বলুন।

চাই যে, রক্ জেণ্ট্রির পেছনে লাগবে না তুমি। ওখানে ঝামেলা পাকালে তুমি ঝামেলায় পড়বে, বুঝেছ?

গা থেকে হাত তুলে নিন, কথা বলছি। আর কথাটা পষ্ট করে বোঝানোর জন্যে...

কী, আমার গায়ে হাত! দিন ঘনিয়ে এসেছে তোমার।
মহাশয় কে, জানতে পারি?

ধরা যাক রক্ জেণ্ট্রির ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আমি...
তাই বুঝি?

কতটা ঘনিষ্ঠ? দাদার মতো, তাই না মিঃ অ্যালবি জেণ্ট্রি?

চিনেছ তাহলে? তার মানে তুমি জানো কিসের ব্যবসা আমার। তবু তর্ক করছ, কলজের জোর আছে বলতে হবে।

তর্ক করছি কারণ আমি ডাক্তার, আর আপনার ভাই রুগি, এ-হাসপাতালে অনেক রুগির একজন

আমরা সারিয়ে তুলব তাকে, অন্যদেরও সারাব। সে-কাজে আপনি ব্যাঘাত ঘটাচ্ছেন মিঃ জেণ্ট্রি।

শোনো, আমি কাউকে দু'বার সাবধান করি না। আমার ভাইয়ের সঙ্গে হুজ্জতি কোরো না, বুঝলে?

কথাটা ঢুকল মাথায়? ভুললে তোমার মরণ!
আমি হুকুম মানি, কিন্তু সেটা ওপরওয়ালাদের।
আর কারো নয়, আপনারও নয়।
পিঁপড়ের পাখা গজায় কখন, জানো তো?

কী ডাক্তারসাহেব, কথাবার্তা হল?
হল। তোমার দাদা অ্যালবির সঙ্গে।

একটু সমঝে চলবেন, আমি ওকে বুঝিয়ে বলব!
তার দরকার নেই রুক্,

আমার দেখাশোনা আমি নিজেই করতে পারব। এখন চুপ করে ঘুমোও, খবরদার উঠবে না।

কী, আমাকে হুকুম!

বখা ছেলের মতো করবে তো...

বখা ছেলেকে টিট করব আমি
ডাক্তার, তুমি শেষ হয়ে যাবে এবার, নিজের মরণ ডেকে আনলে।

বেশ তো, ওপরে রিপোর্ট করো। কাজটা আমার পছন্দ না, কিন্তু তোমাকে সিধে করতে হবে তো?

ফুঃ, নালিশ কে করবে! শুধু দাদার কানে কথাটা তুলে দেব আমি। তারপর দেখবে কী হয়!

তোমার ঠ্যাংদুটো ক'দিন আস্ত থাকে দেখো।

হ্যাঁ দাদা, কিলডেয়ার মেরেছে আমাকে।

কিচ্ছু করিনি। হঠাৎ খেপে গিয়ে দমাদম মারতে লাগল...

হয়তো বোঝাতে চাইল, তোমাকে সে থোড়াই কেয়ার করে!

স্কেটিং করতে বেরুচ্ছেন?
বুঝলে কী করে?

ছেলেবেলায় স্কেটিং খুব করেছি। ছ'দিন বন্ধ ঘরের কাজ, এবার একটু খোলা বাতাস চাই।

ব্রিজের কাছে আসুক, তারপর হাসপাতালের ফোন এসেছে বলে ধরে আনো!
যাচ্ছি অ্যালবি।

ডাঃ কিলডেয়ার? ব্রেয়ার হসপিটাল থেকে ফোনে ডাকছে।
স্কেট দুটো খুলে এই এক্ষুনি যাচ্ছি।

কোন দিকে যাচ্ছি? ক্লাবহাউজ ঐ দিকে না?
আসলে ফোনটা এসেছে একটা বাড়িতে।

অ্যালবি জেণ্ট্রি। আগেই বোঝা উচিত ছিল
তা তো ছিলই। দেরি করে ফেলছ চাঁদ।

একবার সাবধান করেছি, ভাইয়ের সঙ্গে হাঙ্গামা কোরো না। সে-কথা শোনোনি।

লোকটার বুদ্ধি মোটা! শিক্ষা হয় দেরিতে। তবু শিক্ষা তো দিতেই হয় একটু।

এও এক ধরনের সাবধান করে দেওয়া বুঝলে ডাক্তার। ডাক্তার হয়েছ, মাথায় ঘিলু তো আছে একটু। এবার সমঝে চলবে তো?

বাঃ বাবা, সকালবেলাতেই নেশা আরম্ভ করেছে! এ কী মশাই, আপনাকে তো মাতাল
বোধ হচ্ছে না...

না, আমি ডাক্তার। এইমাত্র গুন্ডার হাতে পড়েছিলাম, রিপোর্ট করতে হবে।
সে কী!

থাকগে, ধরবেন একটু? দেখি যদি ট্যাক্সি...
রিপোর্ট করবেন না?

থানায় যাবেন না বলছেন? এ-রকম করে মেরেছে, রিপোর্ট করবেন না?
থাকগে, অনেক উপকার করলেন ভাই।
TAXI

আশ্চর্য। ভয় পাবার মতো লোক বলে মনে হল না, তবে ভেতরে-ভেতরে...

এ আমার লড়াই, নিজের মতো করে লড়ব।

তাহলে কিলডেয়ারের একদফা ধোলাই হয়েছে, না দাদা? এবার বুঝবে কত ধানে কত চাল!

কী ডাক্তারসাব, দুষ্টুমি করছিলেন নাকি? এমন দশা কে করল?

ঐ যে, ভাড়াটে গুণ্ডা, অ্যালবি জেণ্টি। চেনো?

আমার সঙ্গে মিছে হুজ্জত করবেন তো দাদা আপনাকে রগড়ে দেবে, বুঝলেন তো?

কাজেই পথে আসুন—আমাকে আগের ওয়ার্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যান। ব্যস, ছুটি!

তা হচ্ছে না রকু।

কিলডেয়ার বলছে, সে হচ্ছে না?" ঠিক আছে। বলেছি তো, শিখতে সময় লাগে ওর।

অর্থাৎ আরেকবার একটু পালিশ করতে হবে বাছাধনকে। এবার এসে কেঁদে পড়বে তোর কাছে।

একটা লোক দেখা করতে চায়, বলছে, ডাক্তার, তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে কথা বলবে।
কী?

কী ডাক্তার, আমার পরিশ্রম বাঁচাতে এতটা পথ এলে?
শোনো জেন্ট্রি,

একবার তো মারলে আমাকে, লাভ হল কিছু? বোকার মতো ফের ওতে যেয়ো না।

আমি দেখব নাকি সোনার-চাঁদকে?
ভাগো। আমিই শায়েস্তা করছি।

জানি না কেন, ডাক্তারসাহেব ভয় পেয়েছেন বলে তো মনে হচ্ছে না। কেন বলুন তো স্যার?

বাজারে খেটেখুটে একটু নাম করেছি, আমার ধমকানিতে লোকে হার্টফেল করে। তোমার ব্যাপারটা কী?

ব্যাপারটা এই, তুমি তোমার ভাইকে ভালবাস তো? চিন্তা কর তার ভালমন্দ নিয়ে?
অ্যাঁ?

তা ভাল তো বাসিই। তাতে তোমার কী এসে-যাচ্ছে?

আমিও রক্ জেন্ট্রির ভালমন্দ নিয়ে ভাবছি। শুধু আমার রুগি বলে নয়, আমার দেশের ছেলে বলেও ভাবছি।

ঠাট্টা করছ, কিলডেয়ার?
না!

আচ্ছা, দু মিনিট সময় পাচ্ছ ডাক্তার। আস্ত হাত-পা নিয়ে এ ঘর থেকে কেন বেরুতে দেব তোমায়, সেটা বুঝিয়ে দাও আমাকে।

তোমার ভাই তো ভাবে তুমি একাধারে নাদির শা, আইনস্টাইন আর আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট। তুমিও তাই ভাবো?

তা, সে আর এমন কী মিছে কথা?
ডাহা মিথ্যে। তুমি ভীরু। এমন ভীরু যে দুটো অস্ত্রধারী বডিগার্ড ছাড়া রাস্তায় বেরোও না।

বত্রিশ বছরের জীবনে অর্ধেক সময় তুমি জেলে কাটিয়েছ, আর খুব সম্ভবত···

বাকি সময়টাও ফাটকে পচবে তুমি। মানুষ কি এভাবে বাঁচে?
এবার তুমি মরছ!
© King Features Syndicate.

যা বুঝেছি, তোমার হাতে পিস্তল ভাল চলে, কিন্তু ঘুষিতে তোমার দখল কম, কাজেই সে-চেষ্টা কোরো না, আমার কথা অন্তত শেষ করতে দাও।

তোমার ভাইয়ের কাছে তুমি অতিমানব, কিংবা দেবতা। বড় হয়ে সে তোমারই মতো হতে চায়। আরেক অ্যালবি জেন্টি

কিন্তু সে যখন ফাঁসবে, তখন তুমি কোথায়? জেলে তো? সেও শেষ পর্যন্ত ওখানেই পৌঁছুবে—কয়েদখানায়।

আমাকে মারলে এ ভবিষ্যৎ বদলাবে না। বৃথা পরিশ্রম কেন করবে?

বেরোও, নইলে শেষ করে দেব তোমায়।
এই কথা কটি বলব বলেই এসেছিলাম।

ডাক্তার...দাঁড়াও।

রক্ সম্বন্ধে যা বললে শুনে নিয়েছি। আর কী? বাকি কথাটাও ঝেড়ে কাসো।

আচ্ছা, আচ্ছা, মানলাম না-হয় যে, আমার
ভাই আমারই মতো
কিন্তু আটকাব তাকে?

ওর সঙ্গে একবার সত্যি কথা বলে দেখেছ?
কী বলছ! জীবনে মিথ্যে বলিনি ওকে।

বলেছ একথা যে, দিনের প্রত্যেকটি মিনিট তুমি ভয়ে কুঁকড়ে থাকো?
কী?

ভয়ে কুঁকড়ে থাকি তা বলতে যাব কেন?
থাকো না?

ছ-সাতটা খুনের কেসে পুলিস তোমাকে সন্দেহ করছে। তার মানে যে-কোনো মুহূর্তে—

হাতে হাতকড়া পড়তে পারে তোমার তারপর সারা জীবন অন্ধকার জেলে...

ভাইকে বলি, আমি ভয়ে শিঁটিয়ে মরছি এই তুমি চাও?
হ্যাঁ, তাতে তার পথ বেছে নেওয়ার সুবিধে হবে।

ও আমার কথা বিশ্বাস করবে না. ভাববে ঠাট্টা করছি।
হতে পারে, তবে দ্যাখোই না বলে।

রক্ চালাক ছেলে। জীবনে ও একটা কিছু হতে চায়। ঠিক রাস্তাটা দেখাও ওকে।

আচ্ছা। আমি বলছি আমি চাই আমার ভাই অন্যরকম করে মানুষ হোক। তাকে বোঝাব কী বলে?
সে তুমি জানো।

তবে সে যদি দেখে গুণ্ডা হয়ে জীবন সার্থক হয়েছে—তা এখন তুমি ভাবছ না তবে হয়তো—

মক্কেল কী চাইছে হে অ্যালবি?
আমাকে শেষ করতে।

কর্তার হুকুম, সেই লোকটাকে আজ খতম করতেই হবে।
যদি বলি পারব না আজ?

কর্তার হুকুমের পরে? তোমার কি মাথা খারাপ হল?
তাই হল বোধহয়। তবে একটা কথা গ্যাজ,

এ-কাজটা আমি একা করব। আজ তোমার ছুটি।
একা? মরণ নাচছে তোমার—

এ কী, একার কাজ?
না হোক তবু সঙ্গে লোকজন আজ ভাল লাগছে না।

আপনি দাদার কাছে গিয়েছিলেন কেন?
জেনে ফেলেছ তাহলে? কে খবর দিল? অ্যালবি?

সে আপনার নামে থুতু দেয়। অবাক লাগছে, ওর ঘর থেকে জ্যান্ত ফিরলেন কী করে? পায়ে ধরে কান্নাকাটি করেছিলেন বুঝি?

আমার দাদা কোথায়, আর আপনি কোথায়! হিংসেয় জ্বলে মরছেন তো!
কে বলল তোমায়?

তাহলে গিয়েছিলেন কেন? সাধ করে সাপের গর্তে হাত ঢুকোতে!
না, ঠিক তা নয়, রক্। কথা বলতে।

এইমাত্র খবর এল
TVS NEWS

এইমাত্র খবর পাওয়া গেল যে, কিছুক্ষণ আগে উত্তরাঞ্চলে দু দল গুণ্ডার মধ্যে গুলি-বিনিময় হয়েছে

জুয়োর আড্ডার মালিক 'মোটা' লিয়ন্স ছিল এক দিকে, আর…

ভাড়াটে খুনী অ্যালবি জেন্টি ছিল আরেক পক্ষে...

প্রধানত পিস্তলের লড়াই হয় এ দুজনের মধ্যে। 'মোটা' লিয়ন্সের সঙ্গে আরো লোকজন ছিল।

দুজন ওখানেই মারা যায়। আর আহত লিয়ন্স আর জেন্ট্রিকে রেয়ার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে...

এরা কারা?
একজন তো মোটা লিয়ন্স। আরেকটা কে চিনি না।

ও অ্যালবি, আমার দাদা...বেঁচে আছে তো?
এক্ষুনি জেনে এসে বলছি তোমায়।

এরা কারা, নার্স?
'মোটা' লিয়ন্স, আর...

অ্যালবি জেন্ট্রি।

আলবি?
এখনও শ্বাস পড়ছে, রক্, অপারেশন চলছে ওর।

দাদা বু-বাঁচবে?
ঠিক বুঝতে পারছি না। দেখে আসছি আবার।

জিম কিলডেয়ার দেখল, আহত খুনী মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে।

ঘুমোওনি রক্?
না। দাদা —

এইমাত্র ঘরে নিয়ে গেল ওকে। ভাল নয়—

দাদা গুলিতে মরতেই পারে না। ওর মতো টিপ আর কার ছিল? অন্যের গুলি ওকে ছুঁতেই পারে না!

একটু ঘুমিয়ে নাও বরং। ওষুধ দেব ?
না। দাদার জ্ঞান ফিরে আসুক আগে।

আমাকে দেখতে চায় যদি ? নিয়ে যাবেন তো ডাঃ কিলডেয়ার ?
আমার কেস তো নয়, তবু দেখব–

আমার দাদার মতো কেউ না, কিছু হয়নি ওর, তাই না ?

অ্যালবি জেন্ট্রির অবস্থা কেমন ?
খারাপ। ভাইকে দেখতে চায়। ভাইটা কে ?

রক্ জেন্ট্রি, এ হাসপাতালেই আছে, দেখার সময় থাকবে তো ?

বলা কঠিন ! কয়েকটা ঘণ্টা কাটলে বুঝতে পারব। আশা কম।

জীবনমৃত্যুর সীমানায় ত্রিশঙ্কু অবস্থায় রয়েছে অ্যালবির প্রাণ।
দাদা ?

ওর জ্ঞান ফিরেছে, রক্।
সেরে উঠবে, তাই না ?

তোমাকে খুলেই বলি। ডাক্তাররা খুব একটা আশা দিচ্ছেন না। তবে তোমাকে দেখতে চাইছে।

ক্-কেন দেখতে চায় কিছু বলেছে ?
না। তবে বেশিক্ষণ থেকো না।

দেখবেন, আপনাদের বোকা বানিয়ে ও বেঁচে উঠবে, ও মরতেই পারে না, তাই না ডাক্তারবাবু ?
এসে গেছি আমরা।

রক্ এলি ?
হ্যাঁ দাদা, এই তো আমি।

তুমি মরবে না দাদা, বলো, মরবে না। এইমাত্র ডাক্তার কিলডেয়ারকে বলেছি আমি, তোমায় ছুঁতেই পারে না কেউ।
পারে রে ভাই, পারে। এইবার পেরেছে।

সময় বেশি নেই। মন দিয়ে শোন্—আমার যে জীবন, তাতে মজা আছে, তবে কী জানিস,...

সে-মজা বেশিদিন টেঁকে না। যত মজা ততই মুখামি, ততই সর্বনাশ।

ভাই, মন দিয়ে শোন্, বয়স কম, এখনও তোর হাতে সময় আছে, ঠিক কর্ কী হবি।

আমার মতো হোস্ তো আমার এই দশা হবে তোর, বত্রিশ নম্বর জন্মদিনের আগেই সটকান দিতে হবে।

এ রাস্তা ছেড়ে অন্য কিছু হ'। কারখানার কুলি, ট্রাক-ড্রাইভার—যা খুশি—যে-কাজে পিস্তল লাগে না—

আমার মতো হোস না। ডাঃ কিলডেয়ারের কথা শোন্, জানি

ওঁকে দু চক্ষে দেখতে পারিস না তুই, তবে উনিই তোর সহায়... আঃ, চোখ জড়িয়ে আসছে, এখন যা।

দাদাকে আর দেখতে পাব?
না রক্।

দাদা বলল, আপনি আমার সহায়। সে জানল কী করে?
কথাটা সত্য বলে।

অ্যালবি তোমাকে বোঝাতে চাইছিল যে, পিস্তলের ভরসায় যে সাহস, সেটা মুহূর্তের, তোমার চেয়ে বড় পিস্তল নিয়ে এলে কেউ, তুমি শেষ হয়ে গেলে।

এখন তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কী করব জানি না। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন একটু?
নিশ্চয়ই, যথাসাধ্য করব, কথা দিলাম। তোমার দাদাকেও কথা দিয়েছি যে।

এক ছিল

আদিনাথ নাগ

এক ছিল ডাক্তার, জোব্বা পোশাক তার,
সাজগোজে বড় আতিশয্য।
রোগী-সান্নিধ্যে ডাকতারি বিদ্যে
ভুলে গিয়ে চেঁচাত অসহ্য।
নাসিকাটা বোঁচা ভারী, গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি,
টেকো-মাথা খাঁদা ভটচায্যি।
কেহ এলে ডাক দিতে মাথা ঢেকে পাগড়িতে
বলে, "চলো, চটপট যাচ্ছি।"
একদিন রাত্রিতে এসেছিল ডাক দিতে
খালি গায়ে শ্রীনিবাস দর্জি।
ডাক্তার উঠে এসে হতবাক্, জীবনে সে
হয়নিকো এত আশ্চয্যি।—
এত জামা যে বানায় জামা নেই তার গায় !
ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকছে ;
এ-বেটার আচরণ পাগলেরই লক্ষণ,
কেতাবে তো সেরকমই লিখছে।
এই ভেবে দর্জিকে ঢোকাল সে ডানদিকে
ছোট এক কুঠরিতে ধমকে।
দেখে-শুনে শ্রীনিবাস করে শুধু হা-হুতাশ,
ভয়ে তার পিলে গেছে চমকে।
তালা এঁটে দরজাতে ডাক্তার বলে, "রাতে
এই ঘরে থাকো আজ আটকা।
রাঁচি থেকে কাল আমি ওষুধ আনাব দামি
বহুবিধ খাঁটি-নামী-টাটকা।"
শ্রীনিবাস বলে, "বাবু, রোগী মোর বেটা, হাবু,
তিনদিন নাই খিদে-তেষ্টা....।"
ডাক্তার শুনে ভাবে, কেমনে এ পার পাবে ?
বড় ভুল বকছে যে শেষটা।

ছবি দেবাশিস দেব

বার্লিখেকো চার্লি

পবিত্র সরকার

এক যে ছিল দারুণ রসিক
থাকত না সে চুপ করে,
হঠাৎ-হঠাৎ হাসির কথা
ফেলত বলে ধুপ্ করে।
না দিত সে নোটিস কোনো,
না বলত সে, 'সামলে হে !
রসিকতা আসছে তেড়ে
হাঁচির মতো হামলে হে !'
যে-যার মনে বলছি কথা
রসিকতায় ছুঁড়ত ঢিল,
ছিঁড়ত যত কথার সুতো,
পড়ত মুখে সবার খিল।
নিবত সবার মুখের হাসি,
মনটা হত খুব বেজার,
দূর থেকে তার আওয়াজ পেলে
দেখত সবাই পথ যে-যার।
কেউ দিয়েছে টিটকিরি তায়
কেউ বলেছে, 'মাথায় ছিট !'
বক দেখিয়ে, ভেংচি কেটে
কেউ চেয়েছে করতে ঢিট।
কিন্তু তাতে হয়নি ঘায়েল
রসিকতার খায়েশ তার ;
বুঝল সবাই, একটি কেবল
পথ রয়েছে শায়েস্তার—
তখন তাকে গিলিয়ে দিল
গামলা-তিনেক বার্লি রে,
আদালতের হুকুম এনে
নাম দিল তার 'চার্লি' রে।
এখন তাকে করছে তাড়া
বার্লি-খাওয়া গন্ধ ভাই,
রসিকতার মুখ রয়েছে
একেবারে বন্ধ তাই ॥

জোনাকি-ভূতের বাড়ি

সমরেশ বসু

গোগোলের আপন মামা ছাড়াও, আরও কয়েকজন মামা আছেন। তাঁরা সকলেই মায়ের নানারকম সম্পর্কের দাদা বা ভাই। মায়ের নিজের সহোদর দাদা বা ভাই, সকলেই থাকেন কলকাতা থেকে বেশ দূরে। ছোটমামা তো কিছুকাল আগেও লখনৌতে ছিলেন। সম্প্রতি শিলিগুড়িতে বদলি হয়ে এসেছেন।

মায়ের এক পিসতুতো ভাই থাকেন রানাঘাটে। নাম হেরম্ব-কুমার চক্রবর্তী। মা তাঁকে হারুদা বলে ডাকেন। গোগোল বলে হারুমামা। হারুমামার বাড়ি রানাঘাটে। তিনি চাকরিও করেন রানাঘাটে খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবনে। মাঝে-মধ্যে কলকাতায় এলে, গোগোলদের বাড়িতে আসেন। মানুষটি সাদাসিধে। মুখে হাসি লেগে থাকে, কিন্তু কথা বলেন কম। রোগা বলা চলে না, তবে বেশ লম্বা। ধুতি পাঞ্জাবি ছাড়া তাঁকে আর কোনো বেশেই দেখা যায় না। সত্যি বলতে কী গোগোলের মনে হয়েছে, ওর আপন

ছবি সুনীল শীল

বা অন্য সম্পর্কের মামাদের মধ্যে হারুমামা বোধহয় সব থেকে গরিব। তিনি নিজেও বলেন, "গোগোল, আমি তোমার এক গরিব মামা। তোমার মা বাবাকে এত করে বলি, একবার রানাঘাটে আমাদের বাড়ি আসতে। কিছুতেই নাকি ওদের সময় হয় না। তুমিই একবার বাবা-মাকে জোর করে নিয়ে চলো।"

হারুমামা গরিব বলে বাবা-মা যেতে চান না, তা ঠিক নয়। তবে তিনি যতবার এসেছেন, প্রত্যেকবারই মা আর বাবাকে রানাঘাটে যাবার কথা বলেছেন। মা-বাবা বলেন, যাব। কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। অথচ, কলকাতা থেকে রানাঘাট কত কাছে। হারুমামার মুখে গোগোল শুনেছে, তাঁদের বাড়ির কাছেই চুর্নি নদী। আসলে তাঁদের বাড়ি চুর্নি নদীর ওপারে। কালীনারায়ণপুরে। রানাঘাট বললে লোকে সহজে বুঝতে পারে বলে, রানাঘাটের নাম করেন। রানাঘাটের ওপারে চুর্নি নদীর ধারেই তাঁদের বাড়ি। কালীনারায়ণপুর গ্রাম হলেও, সেখানে হাটবাজার গঞ্জ আছে। গ্রামটাও নাকি খুব বড় আর অনেককালের প্রাচীন। বাড়িতে আছেন মামিমা, আর গোগোলের থেকে দু বছরের বড় এক মামাতো দাদা। গোগোলের থেকে বছর পাঁচেকের ছোট একটি বোন। সেই দাদা আর বোন, জীবনে মাত্র দু'বার নাকি কলকাতায় এসেছে। একবার চিড়িয়াখানা দেখতে। আর একবার জাদুঘর আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। হারুমামা হেসে বেশ সহজভাবেই বলেন, "আমার সময় হয় না। তা ছাড়া কলকাতায় বেড়াতে আসতে অনেক টাকা খরচ হয়ে যায়। আমি গরিব মানুষ, বেড়াবার টাকা কোথায় পাব।"

গোগোলের খুব ইচ্ছে, কালীনারায়ণপুরে হারুমামার বাড়ি বেড়াতে যায়। মা-বাবাকেও অনেকবার বলেছে। মা-বাবা খালি বলেন, "হ্যাঁ, যাব। দু একটা দিন হাতে নিয়ে যেতে হবে তো। ফাঁক পেলেই একবার ঘুরে আসব।"

হারুমামা এমনিতে কম কথা বলেন। কিন্তু গোগোলের সঙ্গে অনেক কথা বলেন। গোগোলের চেষ্টায়, কাশ্মীরের সেই ব্যাঙ্ক-ডাকাতরা ধরা পড়ার পর থেকেই, তিনি ওকে আদর করে "খুদে গোয়েন্দা" বলে ডাকেন। তারপরে যত ঘটনা ঘটেছে সবই তিনি গোগোলের মুখ থেকে শুনেছেন। আবার তিনিও গোগোলকে অনেক গল্প শুনিয়েছেন। সবই অনেককালের আগের ডাকাতদের গল্প। বলতে-বলতে আবার হেসে মজা করে বলেন, "সেই সব ডাকাতদের আমলে তুমি যদি থাকতে, তা হলে কী ঘটত, আমি তাই ভাবি।"

রানা ডাকাতের গল্প গোগোল হারুমামার কাছ থেকেই প্রথম শুনেছে। রানা ডাকাতের নাম থেকেই নাকি জায়গাটার নাম রানাঘাট হয়ে গেছে। হারুমামা অবশ্য সেটা নিশ্চয় করে বলতে পারেন না। তবে রানাঘাটের লোকে তা-ই বলে। গল্পটাও খুব দারুণ। রানা ডাকাত নাকি আদপে মানুষ খুন করত না। সে টাকা-পয়সা-সোনা-দানা যা চাইত, তা পেলেই চলে যেত। নেহাত কেউ কথা না শুনলে, দু চার ঘা লাগিয়ে দিত।

সব থেকে আশ্চর্য রানার ডাকাত হওয়ার গল্প। যা শুনে, গোগোল মনে-মনে রানাকে ভালবেসে ফেলেছে। আসলে রানাঘাটের নাম নাকি ছিল ব্রহ্মডাঙা। কতকাল আগের কথা, হারুমামা ঠিক বলতে পারেন না। তাঁর ধারণা দুশো বছর আগের ঘটনা। রানা ছিল ব্রহ্মডাঙার এক গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে। তার ছিল এক ছোট বোন। সেকালে মেয়েদের ন' দশ বছরের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যেত। বোনকে সে খুব ভালবাসত। কিন্তু তারা এত গরিব ছিল, কিছুতেই বোনের বিয়ে দিতে পারছিল না। সেকালের সমাজও ছিল খুবই নিষ্ঠুর। গরিব হলেও, তারা মানতে চাইত না। তাদের এক কথা, যেমন করে হোক মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে।

রানার বোনের বয়স দশ পেরোতেই গাঁয়ের লোকেরা যা-তা বলতে আরম্ভ করেছিল। শেষ পর্যন্ত ঘটিবাটি বিক্রি করে, আর রানার মায়ের যেটুকু সোনা ছিল, তা দিয়েই বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। হলে হবে কী। সোনার গহনা যা দেবার কথা ছিল, তার থেকে একটু কম হয়ে গেছল। তা দেখেই, বরের বাবা বরকে বিয়ের পিঁড়ি থেকে তুলে নিয়ে চলে যায়। ওদিকে রানার বোন তখন কনে সেজে বসে আছে। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। ঘটনাটা খুবই অপমানকর আর লজ্জার। রানার বোন ভোররাত্রে, বাড়ির পিছনে পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করে। তারপর থেকেই রানা বাড়ি থেকে চলে যায়। কোথায় যায়, কেউ জানত না। তার বোনের শোকে বাবা-মা-ও বেশিদিন বাঁচেননি।

এই ঘটনার বেশ কিছুকাল পরে রানা ডাকাতের আবির্ভাব। তার নাম শুনলেই বড়লোকদের বুক কেঁপে উঠত। কিন্তু সে ডাকাতি করার জন্যই ডাকাত হয়নি। সে চারদিকে খবর রাখত, কোথায় কোন গরিব লোক টাকার অভাবে তার মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না। খবর পেলেই, সে তার দলবল নিয়ে, চুর্নি নদীতে নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। কোনও ধনী যাত্রীর নৌকো পেলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ত। সোনা-দানা টাকা পয়সা যা পেত, লুট করে নিয়ে, সেই গরিব মেয়ের বাবা-মাকে দিয়ে আসত। গরিবের মেয়ের বিয়ে হয়ে যেত নির্বিঘ্নে। আসলে, সে চাইত, কোনও গরিবের মেয়েই যেন তার বোনের মতো অভাবে আর অপমানে, জলে ডুবে না মরে।

হারুমামার কাছ থেকে রানা ডাকাতের গল্প শোনার পরে, গোগোল চুর্নি নদী আর রানাঘাট দেখার জন্য মনে-মনে খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এমন কিছু দূরেও নয়। শেয়ালদা থেকে ট্রেনে যেতে ঘণ্টা দুয়েকের পথ। গোগোলের ইস্কুলে শনি রবিবারে ছুটি থাকে। ও প্রায়ই মাকে বলত, "চলো মা, হারুমামার বাড়িতে এ-সপ্তাহে বেড়িয়ে আসি।"

মা বলতেন, "কী করে যাব। তোমার বাবার তো শনিবারে ছুটি নেই। হারুদার বাড়ি গেলে দু-একটা দিন থাকতেই হবে, নইলে ছাড়বেন না। সেরকম সুযোগ এলেই যাব।"

গোগোল মনে-মনে যতই অস্থির হোক, দু-তিন দিনের ছুটির সুযোগ আর আসে না। ওর এলেও বাবার আসে না। বাবা মা'কে বলেন, "তুমিই গোগোলকে নিয়ে ঘুরে এসো। আমি তোমাদের শেয়ালদায় ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব।"

মা বাবাকে বলেন, "তুমিই তো বলো, সেই কবে চুর্নি নদী দেখেছ, আবার দেখতে ইচ্ছে করে। যাবই যখন এক সঙ্গে যাব। তুমি অফিস থেকে দুদিন ছুটি নেবার ব্যবস্থা করো। বাবা আর ছেলে, দুজনেরই চুর্নি নদী দেখার সাধ মিটবে।"

বাবা হেসে বলেন, "গোগোল তো কেবল চুর্নি নদী দেখতে চায় না। ও চায় রানা ডাকাতের দেশ আর তার চুর্নি নদী দেখতে। তবে নদীটা সত্যি সুন্দর আর নামটাও। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। দেখা যাক, কবে নাগাদ অফিস থেকে ছুটি নিতে পারি।"

গোগোল ভাবে, গ্রীষ্মের আর পরীক্ষার পরে শীতের লম্বা ছুটি, বাবা ঠিকই ছুটি নিতে পারেন। আর সামান্য দু' তিন দিনের ছুটি নিতেই যত অসুবিধে। অবশ্য প্রত্যেক বছরেই যে বাবা গ্রীষ্মে শীতে লম্বা ছুটি নিতে পারেন, তা নয়। গোগোল এও জানে, অফিসের কাজের চাপে, বাবার পক্ষে দু' তিন দিনের ছুটি নেওয়াও অনেক সময় মুশকিল হয়ে যায়।

হঠাৎ ম্যাজিকের মতো ঘটনা ঘটে গেল। বাবা এক বৃহস্পতিবার বিকেলে অফিস থেকে ফিরে জানালেন, বিশেষ একটা কারণে, তিনি শুক্র শনি ছুটি পেয়ে গেছেন। তার মানে শুক্র শনি রবি, তিন দিন টানা ছুটি। বাবা নিজেই বললেন, এই ছুটিতেই হারুমামার বাড়ি বেড়িয়ে আসবেন। গোগোলকে

শুক্রবারটা ছুটি নিতে হবে। শনি-রবিবার তো এমনিতেই ছুটি। ভাগ্যিস, গোগোলের এ সময়ে উইকলি পরীক্ষা ছিল না। বেড়িয়ে এসে, সোমবার দিন ইস্কুলে একটা অ্যাপলিকেশন দিয়ে দিলেই হবে। যদিও গোগোল এরকম হঠাৎ-ছুটি কখনও নেয় না। কিন্তু হারুমামার বাড়ি যাবার উপলক্ষে একটা দিনের জন্য বাবা মা দুজনেই রাজি হয়ে গেলেন।

শুক্রবার দিন সকালবেলা জলখাবার খেয়েই, বাবা মার সঙ্গে গোগোল বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে একটা মাত্র স্যুটকেসে কয়েকদিনের জামাকাপড়, তোয়ালে, দাঁত মাজার পেস্ট, ব্রাশ, বাবার দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম নেওয়া হয়েছিল। হতে পারে জায়গাটা কলকাতা থেকে মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল দূরে। তবু গোগোল মনে-মনে খুব খুশি আর উত্তেজিত। হারুমামাকে কোনো খবর দেওয়া ছিল না। একরকম ভালই। মামা মামি সবাইকে বেশ চমকে দেওয়া যাবে। হারুমামা নিশ্চয় অফিসে থাকবেন। বাড়ি এসে গোগোলদের দেখে থ হয়ে যাবেন। গোগোল মনে-মনে এক চোট হেসে নিল।

ট্যাক্সিতে করে শেয়ালদায় পৌঁছে আগেই টিকেট কাউন্টারে লাইন দিতে হল। গোগোল বাবার পাশে পাশে। মা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কাউন্টারে পৌঁছে বাবা যখন কালীনারায়ণপুরের টিকেট চাইলেন, গোগোল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "কালীনারায়ণপুর কেন? আমরা তো রানাঘাটে যাব। সেখান থেকে চুর্নি নদীতে নৌকোয় করে কালীনারায়ণপুর যাব!"

বাবা হেসে বললেন, "নদীর ওপারে কালীনারায়ণপুর স্টেশন আছে। আমরা সেই স্টেশনে নেমে হারুমামার বাড়ি যাব।"

গোগোল একটু বোকা বনে গেল। হারুমামার কথা থেকে ও বুঝতেই পারেনি, কালীনারায়ণপুরে কোনো স্টেশন আছে। ধারণা করেছিল, রানাঘাটে নেমে, নৌকো ছাড়া কালীনারায়ণপুরে যাওয়া যায় না। মনটা একটু খারাপও হয়ে গেল। ভেবেছিল ট্রেন থেকে নেমেই নৌকোয় চাপতে পারবে। তবে হারুমামা নিশ্চয়ই নৌকোয় চাপাবেন।

টিকিট কেটেই দৌড়োতে হল। ট্রেন ছাড়তে মাত্র দু'তিন মিনিট বাকি ছিল। কিন্তু ট্রেনে এত ভিড়, ব্যারাকপুরের আগে বসবার জায়গা পাওয়া গেল না। তাও মা আর গোগোলের জায়গা হল। বাবা বসতে পেলেন নৈহাটিতে পৌঁছে। বাবার কাছেই জানা গেল, নৈহাটি জংশন স্টেশন। এখান থেকে ট্রেন বদলে গঙ্গার ওপর জুবিলি ব্রিজ পেরিয়ে, ব্যান্ডেল যাওয়া যায়। রানাঘাটও নাকি জংশন স্টেশন। ওখানে প্রধান লাইন চলে গেছে বহরমপুরে। শান্তিপুরের শাখা লাইন। আর বনগাঁয়ে যাবার লাইনও আছে।

কল্যাণীর পর থেকেই, দু ধারের ছবি অন্যরকম। সবুজ খেত আর মাঠ এবং গ্রাম। রানাঘাটে পৌঁছে দেখা গেল, বেশ বড় স্টেশন আর জমজমাট। গোগোল হেসে বলল, "মা হারুমামা এখন এখানেই কাজ করেন। অথচ জানতে পারছেন না, আমরা এখান দিয়ে যাচ্ছি।"

মা হেসে বললেন, "তাইতে বুঝি তোর খুব মজা লাগছে?"

গোগোল বলল, "সত্যি মজা লাগছে। ইচ্ছে করছে, এখানে নেমেই হারুমামার অফিসে চলে যাই।"

মা বললেন, "তা যাবে বই কী। চুপ করে বোস।"

রানাঘাটে গাড়ি একটু বেশিক্ষণ দাঁড়াল। তারপরে গাড়ি ছেড়ে কিছুটা এগোতেই বাবা বললেন, "গোগোল, নজর রেখো এবার চুর্নি নদী দেখা যাবে।"

বাবার কথা শেষ হতেই গোগোল জানালা দিয়ে চুর্নি নদী দেখতে পেল। এত সুন্দর ছোট নদী ও কখনো দেখেনি। নদীটা অনেক নীচে। রেললাইন আর ব্রিজটা যেন হঠাৎ অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। কিন্তু জলটা আশ্চর্য পরিষ্কার। ঠিক কাঁচের মতো। আর জলের নীচে যেন কী সব দেখা যাচ্ছে। দেখতে-দেখতেই ট্রেন নদী পেরিয়ে গেল। গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "বাবা, নদীর জলের নীচে কী সব যেন দেখা যাচ্ছিল!"

বাবা বললেন, "ওগুলো জলের নীচে নানারকম জলজ ঘাস, গুল্ম আর লতাপাতা। চুর্নিনদীর এটাই সৌন্দর্য, জলের নীচে কাঁচের মতো সবই প্রায় স্পষ্ট দেখা যায়। এখন বসন্তকাল। বর্ষাকালে যখন জল ঘোলা হয়ে যায়, তখন আর দেখা যায় না।"

গোগোলের চোখের সামনে নদীটাই ভাসতে লাগল। জলের নীচে পর্যন্ত দেখা যায়, এরকম নদীর কথা ও ভাবতেই পারে না। ঐ সব ঘাস-গুল্ম-লতাপাতার মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক সাপ আছে। ভাবতেই ওর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ও জিজ্ঞেস করল, "বাবা, ঐ নদীতে কি কেউ সাঁতার কাটে?"

বাবা বললেন, "কেন কাটবে না? অবশ্য তুমি যেরকম সাঁতার শিখেছ, চুর্নিতে সাঁতার কাটতে পারবে না। জলে খুব স্রোতের টান।"

"কিন্তু যারা সাঁতার কাটে, জলের ঘাস আর গুল্মে তাদের পা আটকে যায় না?"

"আটকাবে কেন? জলের নীচে ডুব দিলে আলাদা কথা। আর যারা ডুব দেয়, তারা আটকে গেলেও, ঠিক ছাড়িয়ে নিয়ে আসতে পারে।"

"কিন্তু ঐ সব ঘাস-গুল্মের মধ্যে নিশ্চয়ই সাপ আছে?"

"তাও থাকতে পারে! তবে জলের ও-সব সাপ বিষাক্ত নয়। জলঢোঁড়া বা হেলে জাতীয় সাপ থাকতে পারে।"

বাবার কথা শেষ হতে-না-হতেই কালীনারায়ণপুর স্টেশন এসে গেল। বাবা এক হাতে স্যুটকেস, আর অন্য হাতে গোগোলের হাত ধরে নামলেন। পিছনে মা। ট্রেনটা এক মিনিটও দাঁড়াল না। ছেড়ে চলে গেল। গোগোল দেখল, মস্ত লম্বা একটা মাত্র প্ল্যাটফরম। মাঝখানে একটা টিনের শেড। এরকম এক প্ল্যাটফরমওয়ালা স্টেশন গোগোল কখনো দেখেনি। প্ল্যাটফরম থেকে নীচে সিঁড়ি নেমে গেছে। স্টেশনটা সেখানেই। টিকেট-কলেকটরও নীচেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাবা টিকেট দিয়ে বেরিয়ে এসে বললেন, "এখন তবু একটা প্ল্যাটফরম হয়েছে। আগে তাও ছিল না। স্টীম-ইঞ্জিনে টানা ট্রেনের দু'ধাপ পাদানি বেয়ে লাফিয়ে নামতে হত।"

স্টেশনের কাছে বেশ ভিড়। আশেপাশে অনেক দোকানপাট অথচ মোটেই শহরের মতো দেখতে নয়। গোগোল জিজ্ঞেস করল, "আমরা যাব কী করে?"

বাবা বললেন, "হেঁটেই যাব। আমাদের তো আবার সেই চুর্নি নদীর ধারেই যেতে হবে। বেশি দূরে নয়। আর এখানে তুমি কোনো গাড়িঘোড়ার আশা করতে পারো না। তবে, হারু-দাদার বাড়ি যাবার রাস্তাটা আমার ঠিক মনে নেই।"

মা বললেন, "আমার আছে।" বলে মা আগে-আগে চলতে লাগলেন। গোগোল বাবার সঙ্গে মায়ের পিছনে-পিছনে চলতে লাগল। কাঁচা বাড়ি, কোঠাবাড়ি, পুকুর, বাগান, আঁকাবাঁকা রাস্তার দু'পাশে। নতুন বাড়ি প্রায় একটাও চোখে পড়ল না। কোঠাবাড়িগুলো সেকেলে আর পুরনো। একটা মন্দিরও দেখা গেল। গোগোলেরা চলেছে পাড়ার ভিতর দিয়ে। অনেকেই ওদের তাকিয়ে দেখছে।

প্রায় দশ মিনিট হাঁটার পরে, মা একটা পাঁচিল-ঘেরা খোলা দরজার সামনে দাঁড়ালেন। ভিতরে দেখা যাচ্ছে, একটা পুরনো একতলা বাড়ি। ইঁটে নোনা ধরেছে, জায়গায়-জায়গায় শ্যাওলা

"আমি একজন সাহিত্যিক !
আমার রচনা-শৈলীর মতই আমার বেশবাস, দেবে নতুন কল্পনার আভাস !"

সবার রুচি-মাফিক পোশাকের জন্যে
নানান পছন্দসই মনোলোভা কাপড় !
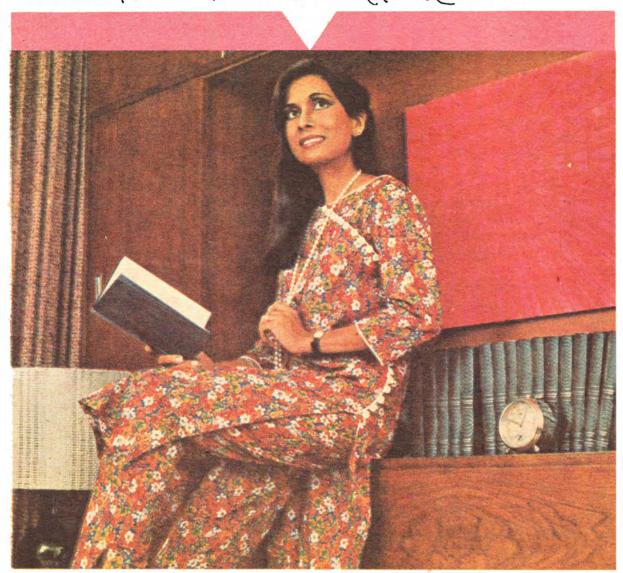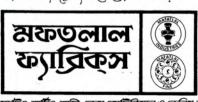
সুটিং, শার্টিং, শাড়ী, ড্রেস মেটিরিয়াল ও ডেনিম।

মফতলাল ইণ্ডাস্ট্রীজ্ নিউ শরক মিল্‌স মফতলাল ফাইন

MF-21 BEN

জমেছে। দরজা-জানালার আলকাতরার রঙও উঠে গেছে। এক-তলা বাড়িটার একধারে, বাঁধানো রকের শেষে একটা মাটির দেওয়াল খড়ের চালাঘরও দেখা যাচ্ছে। সামনের উঠোনে একটা কুকুর শুয়ে ছিল। আর-কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। কুকুরটা হঠাৎ গোগোলদের দেখতে পেয়ে, দাঁড়িয়ে উঠে, ঘেউঘেউ চিৎকার জুড়ে দিল।

বাবা বললেন, "দেখে তো মনে হচ্ছে, হারুদাদের সেই বাড়িটাই। কেউ নেই নাকি?"

বাবার কথা শেষ হতে না হতেই, চালাঘরের পাশ থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে এলেন। বয়স বোধহয় মার মতো হবে। শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে বেরিয়ে এলেন। গোগোলদের দেখে অবাক চোখে ভুরু কুঁচকে তাকালেন, আর মাথার ঘোমটা একটু টেনে দিলেন। গোগোল মা-বাবার মুখের দিকে দেখল। নিশ্চয় কোনো অচেনা বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু মা ঠোঁট টিপে হাসছেন কেন?

চালাঘরের ছাদ থেকে উঠোনে বেরিয়ে আসা মহিলা হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। দরজার দিকে ছুটে আসতে-আসতে বললেন, "নীতি ঠাকুরঝি না? আশ্চর্য, আমি কি স্বপ্ন দেখছি?"

মা বললেন, "তাই তো মনে হচ্ছে চারু বউদি। তুমি আমাদের চিনতেই পারছ না। আমি কিন্তু তোমাকে ঠিক চিনতে পেরেছি।"

চারু বউদি যাঁকে বলা হল, তিনি দরজার বাইরে ছুটে এসে মায়ের হাত ধরলেন। "ইশ্! না চিনলে আমি কী করে তোমার নাম বললাম? এসো, ভেতরে এসো।" বলে মাকে টেনে নিতে নিতে বাবাকে বললেন, "আসুন, ভেতরে আসুন নন্দাই মশাই।"

তারপরেই যেন তিনি গোগোলকে দেখতে পেলেন। অমনি গোগোলের একটি হাত চেপে ধরে একেবারে গায়ের কাছে টেনে নিলেন, বললেন, "এই নাকি আমাদের সেই গোগোল? বাহ্ কী সুন্দর ছেলে তোমার নীতি ঠাকুরঝি।"

গোগোল খুবই লজ্জা পেয়ে গেল। মা বললেন, "সুন্দর না আর কিছু। খালি দুষ্টুমি করে, আর আমাদের জ্বালিয়ে মারে।"

এ-সব কথার মধ্যেই গোগোলরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কুকুরটাও ঘেউ-ঘেউ বন্ধ করেছে। মায়ের চারু বউদি বললেন, "না না, বেশ সুন্দর ছেলে হয়েছে। ওর মামার মুখে আমি অনেক কথা শুনেছি। কিন্তু ওকে আমি এই প্রথম দেখলাম।"

মা বললেন, "গোগোল, ইনি হচ্ছেন তোমার মামিমা। হারুমামার বউ। প্রণাম করো।"

গোগোল নিচু হয়ে প্রণাম করতে গেল। মামিমা মায়ের হাত ছেড়ে দিয়ে, গোগোলকে জোর করে টেনে তুলে বললেন, "না বাবা, পেন্নাম-টেন্নাম করতে হবে না। এমনিতেই আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি। এসো, ঘরে এসো।"

মামিমা রকে উঠে, সবাইকে নিয়ে দালানে ঢুকলেন। লম্বা দালান। দালানের ধারে-ধারে ঘর। মামিমা গোগোলের হাত ছেড়ে দিয়ে, এদিক-ওদিক ছুটে কয়েকটা সুতোয় বোনা আসন যোগাড় করে পাতলেন। বললেন, "কিন্তু নীতি-ঠাকুরঝি তোমার দাদা তো তোমাদের আসার কথা আমাকে কিছু বলেনি?"

মা বললেন, "কী করে বলবে? হারুদাকে আমরা কিছু বলিনি, কোনও চিঠিও দিইনি। গোগোলের তাড়ায় হঠাৎ না জানিয়েই চলে এলাম।"

চারু মামিমা খুশিতে ডগমগ হয়ে, গোগোলের গাল টিপে দিয়ে বললেন, "সত্যি! গোগোলের তাড়ায় এসেছ? খুব ভাল হয়েছে। তোমরা বোসো। আমি আগে একটু চা করি।" বলে

বাবার দিকে ফিরলেন, বললেন, "ও নন্দাই মশাই, স্যুটকেসটা হাত থেকে নামান। কেউ চুরি করবে না।"

বাবা লজ্জা পেয়ে হেসে, দেওয়াল ঘেঁষে স্যুটকেস রাখলেন। বললেন, "আমি ভাবছি, চারু বউদি বোধহয় আমাকে দেখতেই পাচ্ছেন না।"

চারু-মামিমা বললেন, "দরজাতেই তো আপনাকে ডাকলাম। দোষ দিচ্ছেন কেন? বসুন। চা করে নিয়ে আসি। আর গোগোলকে আগে কিছু খেতে দিই।"

গোগোল বলল, "না না, আমি এখন কিছু খাব না। আমি নদী দেখতে যাব।"

ওর কথা শুনে সবাই হেসে উঠলেন। বাবা বললেন "একটু অপেক্ষা করো, আমিই তোমাকে নিয়ে যাব।"

ইতিমধ্যে মা আর মামিমার কথা থেকে জানা গেল, হারু-মামা কাজে গেছেন। ছেলেমেয়েরা সবাই ইস্কুলে। একমাত্র ঠিকে ঝিও চলে গেছে। মামিমার সঙ্গে মাও দালানের বাইরে চলে গেলেন। গোগোল বাবার সঙ্গে দালান আর ঘরগুলোর ভেতরে ঢুকে দেখতে লাগল। দেখার মতো তেমন কিছু নেই। দেওয়ালে টাঙানো পুরনো ফোটো, নানারকমের ক্যালেন্ডার। সেকালের উঁচু ধরনের খাট, আর বিছানা। ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে বাগান আর পাঁচিল দেখা যাচ্ছে। দু'তিন রকমের পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। বাবা বললেন, "গোগোল, এখন এরকম দেখছ। এক সময়ে হারুমামাদের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। অনেক জমি পুকুর ছিল। জমির ধান, পুকুরের মাছ, গোরুর দুধ, কোনো কিছুর অভাব ছিল না।"

গোগোল জানতে চাইল, এখন কেন এরকম অবস্থা হল। বাবা বললেন, "সে অনেক কথা। হারুমামার অন্যান্য ভাই দাদারা আলাদা হয়ে চলে গেছেন। অভাবে জমিজমা বিক্রি হয়ে গেছে। সেসব তুমি এখন বুঝবে না। কেবল জেনে রাখ, মানুষের জীবন চিরকাল একরকম থাকে না।"

এ-সব কথাবার্তার মধ্যেই, চারু মামিমা সবাইকে মুড়ি মুড়কি আর মন্ডা ভরা থালায় খেতে দিলেন।

মা নিজের হাতে চা করে নিয়ে এলেন। চারু-মামিমা হঠাৎ বাড়ির বাইরে কোথায় চলে গেলেন। আর ফিরে এলেন একটু পরেই।

কলকাতায় সাধারণত মুড়ি-মুড়কি মন্ডা খাওয়া হয় না। গোগোলের সত্যি খিদেও পেয়েছিল। খাওয়া হয়ে যেতেই বাবাকে বলল, "চলো বাবা, নদীর ধারে চলো।"

বাবা, মা আর মামিমাকে বলে, গোগোলকে নিয়ে চললেন। চালা ঘরের পাশ দিয়েই রকের শেষে একটা খোলা দরজা। সেই দরজা দিয়ে বাবার সঙ্গে বেরিয়ে গোগোল দেখল, চারপাশে গাছপালা, আর ঘন ছায়া। দূরে-দূরে কয়েকটা বাড়ি। খানিকটা যেতেই দেখা গেল চূর্ণি নদী। নদীর ধারে এসে গোগোলের দু চোখ খুশিতে জ্বলজ্বল করে উঠল। ওপারে একটা বাঁধানো ঘাটে অনেকে স্নান করছে। এপারে ঘাট নেই, কিন্তু মাটির ধাপের সিঁড়ি নেমে গেছে। এপারেও অনেকে স্নান করছে। ওপারে চেহারাটা অন্যরকম। অনেক বেশি বড়-বড় বাড়ি, পাকা রাস্তায় সাইকেল-রিকশা চলেছে। সব থেকে যেটা অবাক করল, তা হচ্ছে, গোগোলের থেকেও ছোট ছেলেমেয়েরা দিব্যি সাঁতার কাটছে। স্রোতের টানের সঙ্গে তারা রীতিমত লড়াই করছে।

নদীটা এতই ছোট, ওপারের সব লোককে স্পষ্ট দেখা তো যাচ্ছেই,—এমন-কী তাদের কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে। গোগোল আরও খানিকটা নীচে নেমে জলের দিকে দেখল। জলের নীচে সবুজ ঘাস-গুল্ম-লতা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। স্রোতের টানে সব একদিকে ঢলে পড়েছে আর সাপের মতোই কিলবিল করছে।

ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের একটুও ভয় নেই।

গোগোল কতক্ষণ এরকম দেখছিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ কাঁধে কার হাতের চাপ পড়তেই ফিরে তাকিয়ে দেখল, হারুমামা। হারুমামা গোগোলকে একেবারে দুহাতে তুলে ধরলেন, বললেন, "আমার খুদে গোয়েন্দা ভাগ্নেটি সত্যি এসে পড়েছে!"

গোগোলের অস্বস্তি হল। মাটিতে নেমে বলল, "আপনি তো ওপারে অফিসে ছিলেন। এখন কী করে এলেন? বিকেলে আসবার কথা তো।"

হারুমামা বললেন, "তোমার মামিমা পাড়ার একটি ছেলেকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিলেন। আমি অমনি একটা রিকশা চেপে খেয়াঘাটে এলাম। নৌকোয় এপারে এসেই দৌড়ে তোমাদের কাছে।"

বাবাও কাছে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন। হারুমামা বললেন, "তুমি যে-ভাবে সব দেখছ, তোমাকে নিয়ে আমি নদীতে চান করব। তবে আজ নয়, কাল সকালে। তোমার ভাইবোনদের নিয়ে। এখন চলো বাড়ি যাই।"

বেলা গড়িয়ে বিকেল না হতেই, ইস্কুল থেকে আগে বাড়ি ফিরল মামাতো বোন চিনি। গোগোলের থেকে বছর খানেকের ছোট। চিনি খেতে মিষ্টি আর বোন চিনি দেখতে সত্যি মিষ্টি। ওর আধঘণ্টা বাদেই এল মামাতো দাদা তিনু। গোগোলের থেকে বছর দুয়েকের বড়। দেখতে-দেখতেই তিনজনের মধ্যে খুব ভাব জমে উঠল। তিনু তো ইস্কুল থেকে এসে, একটু পরেই গোগোলকে নিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল। চারু-মামিমা তাড়াতাড়ি তিনুদাকে ভাত খাইয়ে দিলেন। চিনিও খেয়ে নিল। তারপরে তিনজনে নদীর দিকে গেল।

যাবার আগে হারুমামা সাবধান করে বলে দিলেন, "তিনু জলের ধারে যাসনি, আর বেশি দূরেও নয়।"

তিনু বলল, "আমরা বাড়ির কাছেপিঠেই থাকব।"

তিনুর খুব ইচ্ছে ছিল না, চিনি ওদের সঙ্গে আসুক। গোগোল বলল, "চিনি তা হলে একলা পড়ে যাবে। ও আমাদের সঙ্গে থাকুক।"

তিনজনেই নদীর ধারে আশেপাশে বেড়াতে লাগল। বেড়াতে বেড়াতে চারদিকে-পাঁচিল-ভাঙা একটা একতলা বাড়ির সামনে এসে পড়ল। আশেপাশে বাড়ি নেই। নদীর ওপারটাও ফাঁকা জঙ্গল আর পোড়া জমি। গোগোল এগিয়ে যেতেই, তিনুদা ওর হাত টেনে ধরে বলল, "আর যেও না গোগোল। ও বাড়িটা ভূতের বাড়ি।"

ভূতের বাড়ি! গোগোল অবাক চোখে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল। ভাঙা পাচিলের ফাঁক দিয়ে বাড়িটার অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। দরজা-জানালাগুলো ভাঙাচোরা হলেও, সবই বন্ধ। ভাঙাচোরা ফাঁক দিয়ে কেবল ভিতরের অন্ধকার দেখা যায়। কয়েক জায়গায় ইঁটের দেওয়ালে বড় বড় ফাটল। বাড়িটার এক পাশে একটা বাঁশঝাড়। আরও কয়েকটা ঝাড়ালো গাছের ছায়ায় নিঝুম বাড়িটা দেখলে, সত্যি কেমন গা ছমছম করে। কিন্তু গোগোল কখনও ভূতের বাড়ি দেখেনি, ভূতও দেখেনি।

চিনি বলল, "এটা জোনাকি-ভূতের বাড়ি। এখানে আমরা একদম আসিনে। চলো, তাড়াতাড়ি চলে যাই।"

তিনুদাও বলল, "হ্যাঁ, গাঁয়ের কেউ এদিকটায় আসে না। চলো, চলে যাই।"

গোগোল ওদের সঙ্গে ফিরে চলল। জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু জোনাকি-ভূতের বাড়ি মানে কী?"

তিনুদা বলল, "সন্ধের পর অন্ধকার হলেই বাড়িটার দরজা-জানালার ফাঁকে-ফাঁকে টিপ-টিপ করে জোনাকি জ্বলতে দেখা যায়। আমাদের বাড়ি থেকেও দেখা যায়।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু জোনাকি আবার ভূত হয়

কেমন করে?"

চিনি বলল, "ভূতের কথা কি কেউ বলতে পারে? তারা জোনাকি হতে পারে, মৌমাছি প্রজাপতি গোরু ছাগল সবই সাজতে পারে। আবার মানুষও হয়ে যেতে পারে।"

তিনুদা বলল, "বছর খানেক আগে ও বাড়ির পোড়োয় একটা লোককে ঘাড় ভেঙে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। রানাঘাট থেকে পুলিস এসেছিল। বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল। কিছুই দেখতে পায়নি। লোকটাকে কে কী ভাবে মারল, পুলিসও ধরতে পারেনি। অনেকদিন নজরও রেখেছিল, কিন্তু কিছুই জানতে পারেনি। কেবল একটা ডাইনির মতো বুড়ি আছে, ঐ বাড়িটার থেকে একটু দূরে একটা চালাঘরে থাকে। সে-ই একমাত্র বাড়িটার পাঁচিলের গায়ে ঘুঁটে দেয়। সে আমাদের বাড়িতেও ঘুঁটে দিতে আসে। তার কাছে শুনেছি, অনেক রাত্রে, সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন বাড়িটার ভেতর থেকে নাকিসুরে কান্নার শব্দ ভেসে আসে। আর দড়াম-দড়াম করে দরজা-জানালার শব্দ হয়।"

চিনি বলল, "আমি কখনো ঘুঁটেউলি বুড়িটার সামনে যাই নে। আমার মনে হয়, ওই বুড়িটাই আসলে ভূত।"

তিনুদা শুধরে দিল, "মেয়েমানুষ কখনো ভূত হতে পারে না। পেতনি হয়। নয়তো শাঁকচুন্নি।"

চিনি বলল, "ভূতেরা অনেকরকম বেশ ধরতে পারে। জোনাকি ভূত, দিনের বেলা বুড়ির বেশে ঘুঁটে দেয়। মা তো সেইজন্য ওকে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেয় না। বাইরে থেকেই ঘুঁটে নেয়।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "মামিমা সব জেনেও বুড়িটার কাছ থেকে ঘুঁটে নেন কেন?"

তিনুদা বলল, "না নিলে যদি আমাদের ওপর ওর খারাপ নজর পড়ে, সেইজন্য।"

গোগোলের খুবই অদ্ভুত লাগল। বাড়ি ফিরেও হারুমামাকে জিজ্ঞেস করল। হারুমামাও বললেন, "বাড়িটা ভাল নয়। বহুকাল খালি পড়ে আছে। আমরা শুনেছি, ও বাড়িতে অনেককাল আগে একটি বউ নাকি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। যাদের বাড়ি, তারা সব কলকাতায় থাকে। এখানে আসে না। তবে একটা লোককে মরা অবস্থায় ও-বাড়ির পোড়োয় পাওয়া গেছল বছর খানেক আগে। পুলিস তার কোন কূলকিনারা করতে পারেনি। আজকাল সবাই বলে জোনাকি-ভূতের বাড়ি। ওটা কিছু নয়। খালি বাড়ি, ঘরগুলো নিশ্চয়ই স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডা। জোনাকিরা রাত্রে উড়তে পারে। ভূতের বাড়ি ঠিক জানিনে। তবে ওরকম পোড়ো খালি বাড়ি দেখলেই কেমন খারাপ লাগে। বিশেষ করে বছর খানেক আগে একটা মরা লোককে পোড়োয় পড়ে থাকতে দেখে, কেউ আর ওদিকে যায় না।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "আর ঐ ঘুঁটেউলি বুড়িটা?"

হারুমামা বললেন, "বুড়িটার সত্যি সাহস আছে। কবে কোথা থেকে যে বুড়িটা এসে ঐ বাড়ির কাছেই একটা চালা করে আছে, খেয়ালই করিনি। সারাদিন গোবর কুড়োয়, আর ঐ বাড়ির পাঁচিলেই ঘুঁটে দেয়। সে নাকি বাড়িটার ভেতর থেকে অনেক রকম শব্দ শুনতে পায়। আমরা অবশ্য কিছুই শুনতে পাইনে।"

গোগোল এরকম বাড়ি কখনও দেখেনি। ভূতের গল্প পড়েছে। কিন্তু ভূত কেমন তা ভাবতেই পারে না। তিনুদা অবশ্য বলেছে, ভূত আসলে কংকালের মতোই দেখতে। কেবল তার চোখ দুটো জ্বলে। জোনাকিগুলো আসলে হয়তো সেই জলন্ত চোখেরই ছিটেফোঁটা। কারণ, ভাঙা দরজা-জানালার ফাঁক দিয়ে তো আর পুরো চোখ দুটো দেখা যেতে পারে না।

গোগোলের সেই জোনাকি দেখবার খুবই ইচ্ছে হল। রাত্রে, খাবার আগে, তিনুদা আর চিনির সঙ্গে ও ছাদে উঠল। অন্ধকারে বাড়িটা ঠিক দেখা যায় না। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পরে ভূতুরে বাড়িটা অস্পষ্ট ছায়ার মতো দেখা গেল, আর হঠাৎ জোনাকি জ্বলে উঠতে দেখা গেল। দরজা-জানালার ফাঁকে-ফাঁকে, টিপটিপ জোনাকি জ্বলছে। আবার কখনো উড়ে-যাওয়ার মতো লম্বা সরু ঝিলিকও দেখা যাচ্ছে। অথচ, আশেপাশে আরও জোনাকি দেখা যাচ্ছে। সেগুলো গাছের ঝোপেঝাড়ে, নয়তো নীচের দিকে, ঘাসের কাছে।

গোগোলের মনে-মনে ভীষণ কৌতূহল হল। সত্যি কি ভূতের জ্বলন্ত চোখের স্ফুলিঙ্গ জোনাকির মতো দেখা যাচ্ছে? খুব ইচ্ছে হল, কাছে গিয়ে দেখে আসে। কিন্তু সেটা যে অসম্ভব, তাও জানে।

পরের দিন তিনুদা, চিনি ইস্কুলে তো গেলই না, হারুমামাও অফিসে গেলেন না। বাড়িতে রীতিমত উৎসব লেগে গেল। নিজেকে গরিব বললেও, হারুমামাদের একটা পুকুর আছে। সেখান থেকে মাছ ধরা হল। তারপর সবাই মিলে চুর্নিতে চান করতে যাওয়া হল। তিনুদা আর চিনি দিব্যি সাঁতার কাটল। বাবাও কয়েকবার এপার-ওপার করলেন। গোগোলকে হারুমামা নিজেই ধরে-ধরে সাঁতার কাটালেন। স্রোতের খুব টান। তাছাড়া জলের নীচে লম্বা ঘাস আর গুল্ম দেখে ওর একটু ভয়ও হল। অথচ তিনুদা ডুব দিয়ে জলের নীচের ঘাস-গুল্ম ছিঁড়ে নিয়ে এল। তিনুদার দুঃসাহসে গোগোল অবাক হয়ে গেল।

বেলা এগারোটার মধ্যেই স্নান আর সাঁতার কাটা শেষ। সকাল আটটায় এক প্রস্থ জলখাবার খাওয়া হয়ে গেছল। চুর্নি থেকে ফেরার পরে চারু-মামিমা আবার অনেকটা সন্দেশ খেতে দিলেন। গোগোলের তখন তেমন খিদে পায়নি। মামিমা বললেন, "আজ রান্না হতে দেরি হবে। এখন একটু সন্দেশ খেয়ে নাও।"

তিনুদা আর চিনিকেও দিলেন। তারপরে মা বাবা হারুমামা দালানে বসে গল্প জুড়ে দিলেন। কাছেই মামিমা বঁটি পেতে মাছ কুটতে বসে গেছেন। গোগোল বেরিয়ে পড়ল তিনুদা আর চিনির সঙ্গে। এদিকে-ওদিকে খানিকটা ঘুরে গোগোল নিজে থেকেই জোনাকি ভূতের বাড়ির দিকে পা বাড়াল। খানিকটা যাবার পরেই তিনুদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, "গোগোল, ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?"

গোগোল বলল, "চলো না, একটু কাছে গিয়ে দেখে আসি।"

চিনি আঁতকে উঠে বলল, "না না গোগোলদা, ও বাড়ির কাছে যেও না। তোমার কি একটু ভয় নেই?"

গোগোলের একটু ভয় যে নেই, তা নয়। কিন্তু ওর কৌতূহলটা তার চেয়ে বেশি। ও বলল, "বাড়িটার কাছে যাব না। আমরা নদীর ধার দিয়ে নেমে, বাড়িটার ওপাশে যাব। ওদিকটা দেখে চলে আসব।"

তিনুদা ঠিক করতে পারল না, কী করবে। চিনি চোখ বড় করে বলল, "ওদিকটায় তো সেই ডাইনি বুড়িটা আছে।"

গোগোল বলল, "ডাইনি বুড়ি বলছ কেন? ও তো ঘুঁটেউলি। তোমাদের বাড়ির দরজায়ও আসে। ও আমাদের কী করবে?"

তিনুদা চিনির দিকে তাকাল। চিনিও তাকাল। ওর চোখে ভয়। তিনুদা বলল, "নদীর ধার দিয়ে গেলে বাড়িটা দূরে থাকবে। তেমন দেখাই যাবে না। যাবি চিনি?"

চিনি তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে বলল, "না বাবা আমি যাব না।"

গোগোল বলল, "তিনুদা, তুমি আর আমি যাই চল।"

তিনুর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সাহস পাচ্ছে না। অথচ গোগোলের কাছে হার মানতেও লজ্জা করছে। চিনি বলল, "যেও না দাদা। আমি বাড়ি গিয়ে এখুনি বাবাকে বলে দেব।"

গোগোল বলল, "আমরা তো বাড়ির মধ্যে ঢুকব না। নদীর ওপাশ থেকে ওপরে উঠে, ওদিকটা দেখেই আবার চলে আসব।"

তিনুদা যেন একটু সাহস পেয়ে বলল, "হ্যাঁ, আমরা তো বাড়ির মধ্যে ঢুকব না।"

গোগোল নদীর দিকে পা বাড়িয়ে ডাকল, "এসো তিনুদা।

omorrow is here
Gold Star
message
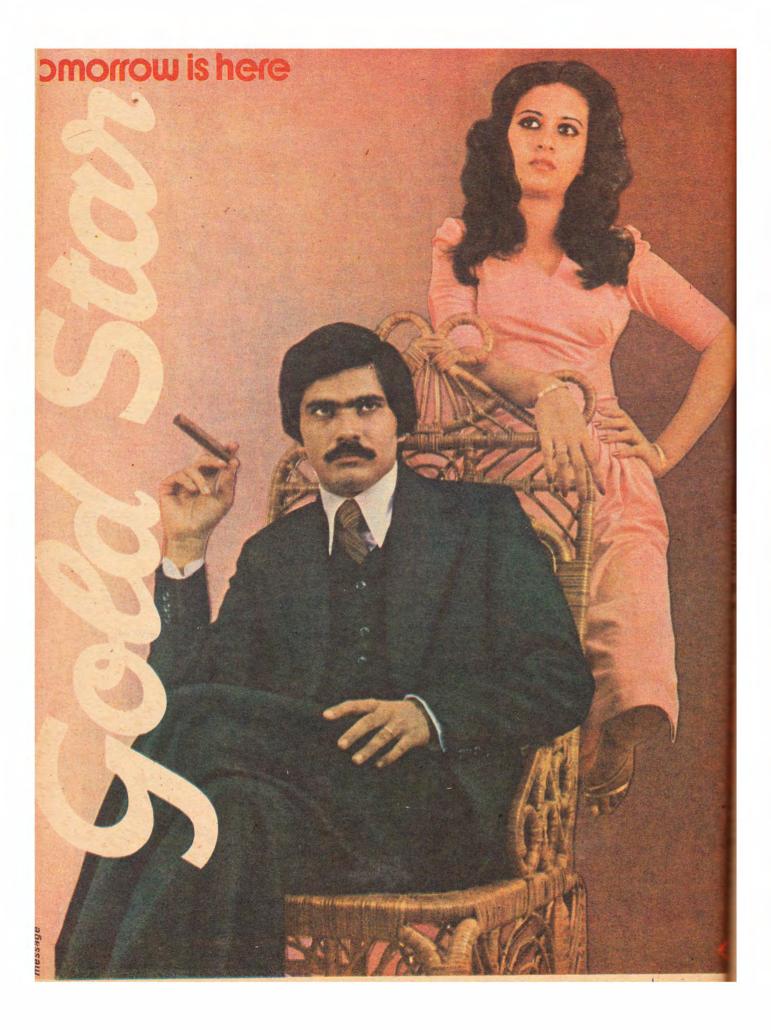
চিনিও এসো।"

তিনু গোগোলের সঙ্গে এগিয়ে গেল। চিনি চিৎকার করে বলল, "যেও না বলছি।"

গোগোল তবু নদীর ধারে এগিয়ে গেল। তিনুও পিছনে-পিছনে চলল। চিনি বাড়ির দিকে দৌড় দিল। গোগোল আর তিনু নদীর ধারে এসে পড়ল। উঁচু ঢালু পাড়ে হাঁটু ডুবে যাওয়া জঙ্গল। কয়েকটা বড়-বড় গাছও আছে। ওপারটাও জঙ্গল আর পোড়ো। এপারে ওপারে, এদিকে কোনো লোকজন নেই। স্নানের ঘাট নেই। কেউ স্নানও করছে না। কিন্তু গোগোলের চোখে পড়ল, ওদের হাঁটু-ডোবা জঙ্গলের মধ্যে, পায়ে-হাঁটা রাস্তার সরু দাগ রয়েছে। ও বলল, "দেখেছ তিনুদা, এখানে পায়ে চলার দাগ আছে। তাহলে এদিক দিয়ে মানুষ যায়।"

তিনু বলল, "বোধহয় এখান দিয়েই বুড়িটা যাতায়াত করে।"

গোগোল ভাবল, একটা বুড়ি কতবার যাতায়াত করে? তার জন্য এরকম সরু রাস্তার দাগ পড়ে? কিন্তু চারদিকটা সত্যি ভারী নিঝুম। তিনু বলল, "চলে এসো গোগোল, আর যাবার দরকার নেই।"

গোগোল বলল, "এখানে ভয় কিসের? চলো না, আরও একটু এগিয়ে গিয়ে আমরা ওপরে উঠব।"

তিনুদা কিছু বলতে পারল না। গোগোলের পিছনে-পিছনে চলল। খানিকটা গিয়ে গোগোল দাঁড়িয়ে পড়ল। আশ্চর্য, এখানে নদীর ধারটা কেমন চ্যাটাং-মতো। আর এখানে-সেখানে কয়েকটা সরু গভীর গর্ত। এমনকী পায়ের ছাপও অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর সেই পায়ের ছাপ ওপরের জঙ্গলের দিকে উঠে মিলিয়ে গেছে। তিনুদা বলল, "কী দেখছ গোগোল?"

গোগোল বলল, "এখানটা দ্যাখো তিনুদা, মানুষের পায়ের ছাপের মতো দাগ রয়েছে। আর এই গর্তগুলো কিসের?"

তিনু দেখে অবাক হয়ে গেল। একবার ওপারের জঙ্গল আর পোড়োর দিকে মুখ তুলে দেখল। বলল, "আশ্চর্য তো! দেখেই মনে হচ্ছে, এখানে নৌকো আসে। গর্তগুলো দেখে মনে হচ্ছে, নৌকো বাঁধবার জন্য এখানে বাঁশের লগি পোঁতা হয়।"

গোগোল হেসে বলল, "আর তোমরা বলো, এদিকে কেউ আসে না। না এলে এসব দাগ থাকবে কেন?"

তিনুদা তো খুবই অবাক হয়ে গেল। আর ভাবনায়ও পড়ে গেল। বলল, "তাহলে কি জেলেরা এখানে মাছ ধরতে আসে? কিন্তু সবাই বলে, এদিকে কেউ আসে না।"

গোগোল বলল, "কেউ দেখতে পায় না বলেই জানতে পারে না। এখন দেখতে পাচ্ছ তো, এদিকে লোক আসে। চলো, আরও খানিকটা এগিয়ে আমরা বাঁদিকে ওপরে উঠব। এখান দিয়ে সোজাসুজি উঠলে, একেবারে বাড়িটার সামনে পড়ে যাব।"

তিনুদা বলল, "তার দরকার নেই। এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে ওঠাই ভাল। তবে বুড়িটার জন্যই আমার ভয় লাগছে।"

গোগোল হাঁটতে-হাঁটতে বলল, "তোমরা বলো বুড়িটা ডাইনি। আসলে তো ঘুঁটেউলি। তোমাদেরও ঘুঁটে দেয়।"

তিনুদা বলল, "তা দেয়। তবু বুড়িটাকে দেখলেই কেমন ভয় লাগে।"

দুজনেই বেশ খানিকটা এগিয়ে বাঁ দিকে উঁচুতে তাকাল। বাড়িটার এক পাশের মাথা দেখা যাচ্ছে। গোগোল এবার উপরে উঠতে লাগল। এদিকটায় জঙ্গল আর মাটিতে কোনরকম পায়ের ছাপ নেই। দুজনেই ওপরে উঠে এল। কোথাও কেউ নেই। বাড়িটার পাঁচিল এদিকেও ভাঙাচোরা। একটা দরজাও আছে। দরজাটার সামনে একগুচ্ছ জঙ্গল। তিনু গোগোলের হাত টেনে ধরে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "ওই যে দেখছ চালাঘরটা, ওটাতেই সেই বুড়ি থাকে। রেললাইনের ওপর থেকে চালাটা দেখা যায়। কিন্তু বুড়িটা দেখছি এদিকে কোথাও নেই।"

গোগোল মুখ ফিরিয়ে দেখল, বেশ খানিকটা দূরে উঁচু রেল লাইন। ঐ লাইনটাই রানাঘাট থেকে চূর্ণি নদীর ওপর দিয়ে এসেছে। ও আবার বাড়িটার দিকে তাকাল। ওদের কাছ থেকে বাড়িটা প্রায় কুড়ি হাত দূরে। এদিকেও দরজা জানালা সব বন্ধ। তবে দু-একটা জানালার পাল্লা ভেঙে পড়েছে। একটা দরজার একটা পাল্লা খোলা। গোগোল ভাঙা পাঁচিলের দিকে এগিয়ে গেল। তিনু বলল, "কোথায় যাচ্ছ?"

গোগোল বলল, "একটু কাছে থেকে দেখে আসি।"

কিন্তু তিনুদা দাঁড়িয়েই রইল। বলল, "দুপুরবেলাও ভূতেরা বেরোয়।"

গোগোল ভেবে অবাক হল, তার থেকে দু বছরের বড় হয়েও, তিনুদা চিনির মতো কথা বলছে। রাতের জোনাকি - ভূত দিনের বেলা দেখা যাবে কেমন করে? অবশ্য সত্যিই যদি ভূত থাকে। গোগোল কখনো ভূত দেখেনি। গল্পের বইয়ে পড়েছে। তবে সেগুলো যে ভূত, তা মোটেই প্রমাণ হয়নি। ও বলল, "তবে তুমি দাঁড়াও, আমি একটু কাছে থেকে দেখে আসছি।"

তিনুদা দাঁড়িয়েই রইল। গোগোল মানুষ পেরুবার মতো হাঁ-করা ভাঙা পাঁচিলের কাছে এগিয়ে গেল। অবাক হয়ে দেখল, সেখানে মানুষের পায়ের ছাপ রয়েছে। অথচ বাড়িতে ঢোকবার দরজার কাছে ঘন জঙ্গল। ও তিনুদার দিকে ফিরে বলল, "তিনুদা, দেখবে এসো, এখানে মানুষের পায়ের ছাপ রয়েছে।"

তিনুদার অবস্থা খারাপ। সে আশেপাশে ভয়ের চোখে দেখতে-দেখতে বলল, "থাকুক। তুমি চলে এসো।"

কিন্তু গোগোলের কৌতূহল তখন বেড়ে গেছে। বলল, "তুমি দাঁড়াও, আমি একটু ভেতরের উঠোনটা দেখে আসি।"

তিনু আর কিছু বলবার আগেই, গোগোল পাঁচিলের হাঁ-করা ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। কেউ কোথাও নেই, ফাঁকা আর নিঝুম। উঠোনের চারপাশে শুকনো একরকমের কাঁটিঘাস গজিয়েছে। তার মাঝে-মাঝে এলোমেলো পায়ের ছাপও রয়েছে। ভূতের কি পায়ের ছাপ পড়ে? গোগোল বাড়িতে ঢোকবার এক পাল্লা খোলা দরজাটার দিকে তাকাল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সেদিকে। রকে উঠে, দরজার কাছে গিয়ে ভিতরে উঁকি দিল। অন্ধকার। আর একটা ভ্যাপসা গন্ধ। কিন্তু অন্যরকমের গন্ধও যেন পাওয়া যাচ্ছে। কিসের গন্ধ? মনে করার চেষ্টা করতেই, ওর খেয়াল হল, গন্ধটা সিগারেটের ধোঁয়ার। আশ্চর্য! এখানে সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ আসছে কোথা থেকে? ও তিনুদাকে বলবার জন্য মুখ ফেরাল। তাকে দেখা গেল না।

গোগোল কয়েক সেকেন্ড ভাবল। তারপর ভিতরে ঢুকে পড়ল। সামনেই একটা ঘর। আবছা অন্ধকার। একতলা হলেও বেশ বড় বাড়ি। ঘরটার দু পাশে কয়েকটা ঘরের দরজা। সবই যেন বন্ধ। মেঝেতে পুরু ধুলোর আস্তরণ। তার মধ্যে মানুষের পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। তা হলে কি ভিতরে কোনো মানুষ আছে? সিগারেটের গন্ধটাই বা কোন দিক থেকে আসছে?

গোগোল আশেপাশে তাকিয়ে, ডান দিকে এগিয়ে গেল। একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বন্ধ দরজা। হাত দিয়ে একটু ঠেলা দিতেই, দরজাটা খুলে গেল। ভেবেছিল, নিশ্চয় ঘরটা অন্ধকার হবে। কিন্তু জানালার কাঠের জাফরি এত ভাঙা-চোরা, অনেক ফাঁক রয়েছে। সেই ফাঁক দিয়ে ঘরে একটু আলো এসেছে। কিন্তু গোটা ঘরটা ভরতি ওগুলো কী? মনে হচ্ছে পলিথিন দিয়ে ঢাকা।

ভূতের বাড়িতে এসব কী? গোগোল এগিয়ে গেল। পলিথিন ধরে টান দিতেই, একটু শব্দ হল। আর দেখল, নতুন কাপড়ের বড় বড় বাণ্ডিল। ভূতের বাড়িতে নতুন কাপড়ের বাণ্ডিল কেন? গোগোল সরে গিয়ে আর-এক দিকের পলিথিনের ঢাকনা তুলল। দেখল চটের বড়-বড় বস্তা ঠাসা কী সব রয়েছে। ভাল করে

দেখেই বুঝল, সব চিনির বস্তা। পিঁপড়েও রয়েছে। আশ্চর্য। ভূত কি এত চিনি খায় নাকি?

এবার পাশের আর একটা ঘরের দিকে ওর নজর পড়ল। দরজাটা খোলা। হালকা আলোও আছে। গোগোল সেই ঘরে ঢুকল। দেখল একটা জানালার পাল্লা বা গরাদ অর্ধেক নেই। সেখানে পলিথিনের ঢাকা দেওয়া কিছু নেই। কেবল ঘর ভরতি মুখ-আঁটা বড় বড় টিন। গন্ধেই টের পাওয়া যাচ্ছে, সবগুলোই সরষের তেলের টিন। ভূতে কি তেলও খায়?

ঠিক এই সময়েই সামান্য শব্দে গোগোল মুখ ফিরিয়ে দেখল, দুটো ঘরের মাঝখানের দরজায় একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। পায়জামার ওপরে গেঞ্জি গায়ে, ষণ্ডা-মতো লোকটার মুখ শক্ত। অবাক চোখ দুটো যেন ধক-ধক করে জ্বলছে। তার ডান হাতের আঙুলের ফাঁকেও সিগারেট জ্বলছে। মোটা গলায় চাপা গর্জনের স্বরে বলল, "এই ছুঁচো, তুই কোথা থেকে এখানে ঢুকলি রে? কে তুই?"

ভূতের বদলে ষণ্ডামার্কা মানুষ। চিনি বলেছিল, ভূতেরা অনেক রকম বেশ ধরতে পারে। এও কি তাই নাকি? গোগোল কোনো জবাবই দিতে পারল না। লোকটার মুখ আরও শক্ত আর ভয়ংকর হয়ে উঠল। বলল, "জানিস এটা ভূতের বাড়ি? ঢুকলে আর বেরোনো যায় না? মরবার পাখনা গজিয়েছে?"

গোগোলের বুকের মধ্যে তখন ঢিপ-ঢিপ করছে। তবু ভয়ে ভয়ে সত্যি কথাটাই বলল, "আমি ভূত দেখতে এসেছিলাম।"

"ভূত দেখতে?" লোকটা খ্যাঁক করে উঠল, "দেখাচ্ছি ভূত। ঘাড় মটকে এখুনি তোর ভূতের মজা দেখাচ্ছি।"

তার কথা শেষ হবার আগেই পিছন থেকে আর একটা লোক এসে পড়ল। বলল, "কে রে জিতু?"

গোগোল দেখল, সেই লোকটাও বেশ যন্ডা-মতো। জিতু নামে লোকটা বলল, "কে জানে কে। এ এলাকার কেউ নয়। ছুঁচোটা কেমন করে ঢুকে পড়েছে।"

পিছনের লোকটা আর-একটু এগিয়ে এল। বলল, "তা হলে তো ছাড়াছাড়ি নেই। শিগগির ধরে ঘাড়টা মটকে দে, তারপরে নদীর জলে ফেলে দিয়ে আয়।"

গোগোল ভয় পেলেও ঝট করে পাল্লা-খোলা, গরাদ বিহীন জানালাটা দেখে নিল। ইতিমধ্যে জিতু নামে লোকটা ঘরের মধ্যে পা বাড়িয়েছে। গোগোল তেলের টিনের ওপর লাফ দিয়ে উঠল। জিতু চিৎকার করে উঠল, "আরে এ ছুঁচো নয়, সাপ দেখছি। পালাচ্ছে।" বলে সেও তেলের টিনের ওপর উঠতে গেল। কিন্তু পা হড়কে পড়ে গেল।

গোগোল গরাদ-ভাঙা পাল্লা-খোলা জানালা দিয়ে লাফিয়ে নীচে পড়ল। পায়ের একটা স্যান্ডেল খুলে ছিটকে পড়ে গেল। কিন্তু ওর তখন সেদিকে নজর নেই। শুকনো কাটিঘাসের ওপর দিয়েই পাঁচিলের দিকে ছুটল। পিছনেও ধুপ করে শব্দ হল আর চিৎকার শোনা গেল, "জিতু, তুই একটা আস্ত মোষ। শিগগির আয়, পুঁচকে শয়তানটা পালাচ্ছে।"

গোগোল পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, একবার পিছন ফিরে দেখল। দুজনেই ছুটে আসছে। কিন্তু তিনু নেই। বরং ওর জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে একটা শননুড়ি-চুল বিটকেল বুড়ি। সে হুঁইম'াই শব্দ করে গোগোলের দিকে তেড়ে এল।

গোগোল দেখল, নদীর পাড়ের দিকে যাবার উপায় নেই। ও সোজা রেললাইনের দিকে দৌড় লাগাল। পিছন ফিরে আর একবার দেখল। লোক দুটোই বেশ পেছনে। কিন্তু ছুটে আসছে। গোগোলের মাথার ঠিক নেই। ওরা হাতে পেলেই ঘাড় মটকে নদীর জলে ফেলে দেবে। ও রেললাইনের দিকে গিয়ে একটু দমে গেল। রেললাইন বেশ উঁচুতে। ওপরে একটা লোকও দেখা যাচ্ছে
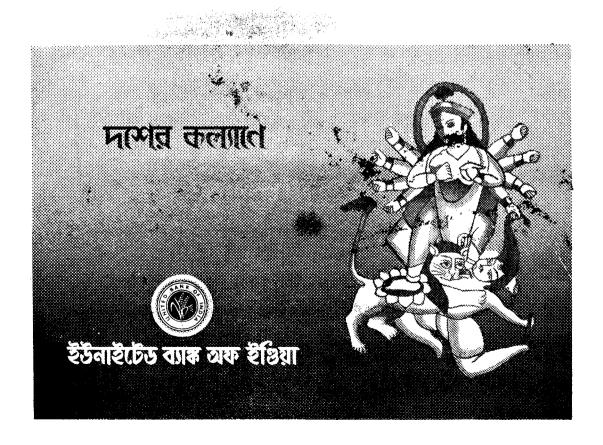
অথচ ওপরে না উঠেও উপায় নেই। ও মরণপণ হয়ে ওপরে উঠতে লাগল। পিছনে তখন লোক দুটোর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তার সঙ্গে কারোর গলা, "ওকে ধরতেই হবে। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

গোগোল রেললাইনের ওপরে উঠে, দিক ঠিক করতে পারল না। রেললাইনের ডান দিক ধরে দক্ষিণে ছুটতে লাগল। খেয়ালই নেই, ওদিকে রয়েছে চূর্নির ব্রিজ। দৌড়তে দৌড়তে ব্রিজের সামনে এসে থমকে গেল। নীচের দিকে তাকিয়ে ওর মাথাটা ঘুরেই গেল। পিছন থেকে শোনা গেল, "এবার কোথায় যাবে রে? নীচে পড়েই মরবে।"

গোগোল ভাবল, নীচে পড়ে যাই হোক, ও ব্রিজের ওপর দিয়েই যাবে। ভেবেই, রেলের স্লিপারের ওপর এক পা করে এগোতে লাগল। পিছনে চিৎকার শোনা গেল "ছেলেটা নির্ঘাত মরবে।"

গোগোলের তখন পিছন ফিরে দেখবার সময় নেই। তখন পিছনে আরও অনেক লোকের গলার স্বর ভেসে আসতে শোনা গেল, "রেল আসছে, রেল আসছে।"

গোগোল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে তাকিয়ে দেখল, সত্যি একটা ট্রেন দূরে দেখা যাচ্ছে। কোনোরকমে একবার সাহস করে নীচে তাকাল। অনেক নীচে চূর্নি নদী। ও একবার পিছন ফিরে দেখল। ব্রিজের ওপারে অনেক লোক জমে গেছে। কিন্তু তার মধ্যে সেই ষণ্ডা দুটো আছে কি না বুঝতে পারল না। ও সামনে ফিরে, দু হাত তুলে নাড়তে লাগল। কিন্তু ট্রেনটা এগিয়েই আসতে লাগল।

কী করবে গোগোল? এত উঁচু থেকে চূর্নিতে পড়লে, ডুবেই মরে যাবে। পাশে কোনো রেলিং পর্যন্ত নেই। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতেই, ও গায়ের জামা খুলে উঁচুতে হাত তুলে নাড়াতে লাগল। ট্রেনটা তখন ব্রিজের প্রায় কাছে। কিন্তু নানারকম শব্দে ব্রেক কষে, গাড়িটা ব্রিজের খানিকটা এসে থেমে গেল। গোগোল সাবধানে একটা-একটা করে স্লিপার পার হতে লাগল। ইলেকট্রিক ট্রেনের সামনে আসতেই, অনেক যাত্রীর হৈচৈ শোনা গেল। সামনের ইঞ্জিনের লোকটা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, "মরবে নাকি? শিগগির সামনের ডান্ডা ধরে, ওপরের তক্তার ওপর উঠে বসে পড়ো।"

গোগোলের তা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ও সামনেই দেখল, ইঞ্জিনের সামনে দু দিকে দুটো রড রয়েছে। বাফারও আছে। কিন্তু ডান্ডা ধরে বসবার মতো চওড়া জায়গাই আছে। ও সেখানে উঠে ডান্ডা ধরে বসে পড়ল। হাত-পা ঠক-ঠক করে কাঁপছে। এঞ্জিনম্যান জানালা দিয়ে দেখে, ভোঁ বাজিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। খুব আস্তে-আস্তেই ব্রিজটা পেরিয়ে গাড়ি আবার দাঁড়াল। সেখানে তখন লোকের ভিড়ে তিল-ধারণের জায়গা নেই।

এঞ্জিনম্যান নেমে এসে, গোগোলকে দু হাতে ধরে নামাল। চোখে-মুখে রাগ আর উত্তেজনা। পারলে যেন দু ঘা লাগিয়েই দেয়, এমনি কড়া ধমক দিয়ে বলল, "চলো, তোমাকে আমি এক্ষুনি পুলিসে দেব। কেন তুমি ব্রিজের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলে?"

গোগোল কোনো জবাব দিতে পারল না। ওর চোখে জল এসে পড়ল। এর মধ্যেই হারুমামা, বাবা আর তিনুদা এসে হাজির। গোগোল হারুমামাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, "হারু-মামা, জোনাকি-ভূতের বাড়িতে দুটো ডাকাত ছিল। তাদের তাড়া খেয়ে আমি ব্রিজের ওপর উঠে পড়েছিলাম।"

আশেপাশে অনেকেই ভয়ে আর বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল, "জোনাকি ভূতের বাড়ি ঢুকেছিল? সর্বনাশ। তা হলে নিশ্চয় ভূতে তাড়া করেছিল।"

গোগোল বলল, "ভূত না, ডাকাত। সেখানে অনেক কাপড় চিনি আর সরষের তেল ডাঁই করা রয়েছে।"

গোগোলের কথা শুনে সবাই হতবাক। ট্রেনের এঞ্জিনম্যান বলল, "আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। সামনে সিগন্যাল দেওয়া রয়েছে। আপনারা এ-ছেলের নাম-ধাম টুকে রাখবেন। আমাকে রিপোর্ট করতে হবে।" বলেই সে লাফিয়ে ট্রেনের সামনের দরজা দিয়ে উঠে পড়ল। কয়েকবার ভোঁ দিয়ে, গাড়ি চালিয়ে দিল।

এদিকে সবাই তখন নানারকম কথাবার্তা বলছে। কোথা থেকে একজন সেপাইও চলে এল। সে বলল, "সবাই চলুন তো, জোনাকি-ভূতের বাড়িটা দেখি গিয়ে।"

হারুমামাকে সবাই চেনে। তিনি বললেন, "আপনারা যান। এ-ছেলেটি আমার ভাগ্নে। কী হল না হল, সব দেখে আমাদের বাড়িতে আসবেন।"

দেখা গেল, হারুমামার কথা কেউ অগ্রাহ্য করল না। সেপাইয়ের সঙ্গে সবাই ছুটল। আর, হারুমামা গোগোলের হাত ধরে বাড়ির দিকে চললেন। সঙ্গে বাবা আর তিনুদা।

ঘণ্টা খানেক পরেই হারুমামার বাড়িতে রানাঘাট থানার ও সি, অন্য একজন বড় অফিসার আর বেশ কয়েকজন সেপাই এসে হাজির। পিছনে বিশাল একদল লোক। অফিসার বললেন, "হারু-বাবু, আপনার ভাগ্নেটি কোথায়?"

গোগোল ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অফিসার এসে গোগোলের হাত ধরে হেসে বললেন, "তুমি এইটুকু ছেলে, সাংঘাতিক কাজ করেছ। জোনাকি-ভূতের বাড়িটা আসলে বাংলাদেশে চোরাই মাল পাঠাবার একটা গুদাম। চোরাই চালানদাররা বাড়িটাকে ভূতের বাড়ি সাজিয়ে রেখেছে।"

সবাই তখন গোগোলকে দেখবার জন্য ব্যস্ত। সবাই চিৎকার করছে, "আমরা গোগোলকে দেখব, গোগোলকে দেখব।"

অফিসার নিজেই গোগোলকে কাঁধের ওপর তুলে ধরলেন, "দেখুন। ভূত দেখতে গিয়ে ও কী বিরাট চুরির ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছে।"

হারুমামা তো রীতিমত লাফালাফি করতে লাগলেন। হাসছেন আর বলছেন, "হ্যাঁ, ও হল খুদে গোয়েন্দা গোগোল।"

কিন্তু গোগোল দেখল মা আর মামিমা রকে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। কিন্তু চিনি আর তিনুদাও হারুমামার সঙ্গে নাচছে আর হাসছে।

থানার ও সি বললেন, "প্রায় তিন লাখ টাকার মাল ধরা পড়েছে। আমরাও জানলাম, বাড়িটা আসলে ভূতের বাড়ি সাজিয়ে রাখা হয়েছিল।"

হারুমামা জিজ্ঞেস করলেন, "জোনাকির মতো টিপটিপ করে কী জ্বলত?"

ও সি হেসে বললেন, "পেন্সিল টর্চ। বেশি আলো জ্বাললে সব দেখা যাবে। ওখান থেকে নৌকোয় করে রানাঘাটে মাল নিয়ে ওরা মাজদিয়ার ওদিকে বর্ডারে মাল পাচার করত। একটা পাজি বুড়ি সব সময় ওখানে পাহারা দিত, কিন্তু গোগোলকে সে ঢুকতে দেখেনি। তাকেও আমরা ধরেছি।"

সবাই এগিয়ে এসে গোগোলকে একবারটি ছুঁতে চাইল। অফিসার গোগোলকে রকের কাছে, মায়ের সামনে নামিয়ে দিলেন। ওর গাল টিপে আদর করে বললেন, "সত্যি, সাহসী ছেলে। তবে বড় দুঃসাহস। ব্রিজের ওপর একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। তবু বলব, শাবাশ গোগোল। শাবাশ।"

হারুমামা এসে গোগোলকে একেবারে বুকে জড়িয়ে কোলের ওপর তুলে নিলেন।

পুলিস অফিসাররা বসলেন দালানের মধ্যে। তাঁদের খুব চায়ের তেষ্টা পেয়েছে। বাইরে তখনও বিস্তর লোক গোগোলকে দেখবার জন্য অপেক্ষা করছে।

হাথিয়াগড়ের বুদ্ধমূর্তি

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

বিকেলে দুই পাগল
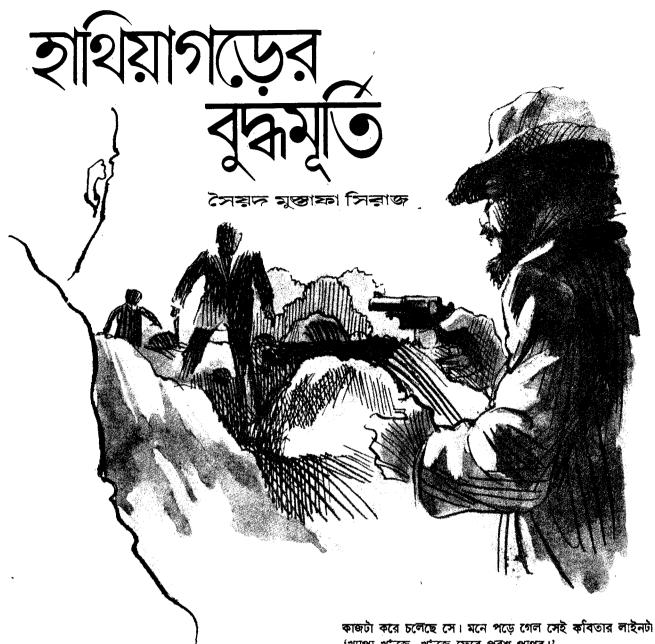
এই পাহাড়ি নদীর নাম হাথিয়া। এ নামের কারণ বুঝতে দেরি হল না। যতদূর চোখ যায়, উজানে ও ভাটিতে নদীর বুকে অসংখ্য কালো-কালো পাথর ছড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ তাকালে মনে হবে, ওপারের জঙ্গল থেকে হাতির পাল নেমেছে। হাতি বা হাথি থেকেই হয়তো হাথিয়া।

কিন্তু জল কোথায়? পাথরের ফাঁকে শুকনো বালি শুধু। মার্চ মাসের এই নিরিবিলি বিকেলে শুকনো নদীটাকে বেজায় ভুতুড়ে ঠেকছিল। শ্মশান দেখলে যেমন লাগে।

তবে এখন তো বসন্তকাল। তাই দু'তীরের গাছপালা খুব চেকনাই হয়ে হরেকরকম ফুলের রঙ ছেড়েছে। পাখপাখালিও ডাকছে। হালকা নরম রোদ্দুর এখন গোলাপি রঙ ধরেছে। আর আকাশটাও চমৎকার নীল।

হঠাৎ এক আজব দৃশ্য চোখে পড়ল।

একটু দূরে নদীর মধ্যে পাথরের খাঁজে-খাঁজে একটা লোক কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। একটা করে ছোট্ট পাথর কুড়িয়ে কী পরখ করছে আর ছুঁড়ে ফেলছে। খুব ব্যস্তভাবে এই অদ্ভুত কাজটা করে চলেছে সে। মনে পড়ে গেল সেই কবিতার লাইনটা 'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর।'

ক্রমশ দেখলুম, সে আরও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। পাথ কুড়োচ্ছে আর ছুঁড়ে ফেলছে খালি। ব্যাপারটা কী? কয়েক প এগিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখে মনে হল, লোকটা নিশ্চ পাগল।

পোশাকে-চেহারায় কিন্তু রীতিমত ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছে। ঢ্যাঙা শিড়িঙ্গে গড়ন। ঢিলেঢালা স্যুট পরনে। বেফাঁ টাইও দেখতে পাচ্ছিলুম। এমন মানুষ পরশপাথর খুঁজে বেড়াচ্ছে হাথিয়া নদীতে। কাজেই বদ্ধ পাগল ছাড়া কিছু নয়।

এইসময় অকারণে ডাইনে একবার মুখ ফেরালাম। ফের ব বনে গেলাম।

নদীর এই পাড়ে সবুজ ঘাসের জমিতে অনেক ঝোপঝাড় রয়েছে। সেখানে দেখি, আরেক ভদ্রলোক হাতে একটা ছোট্ট জা নিয়ে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ একবার লাফ দিতেই তাঁর টুপিটি পড়ে গেল। কিন্তু তাকিয়েও দেখলেন না। দৌড়ে গিয়ে ঝোপে ঢুকলেন।

তাঁর মাথার টাকে রোদ্দুর ঝকমকিয়ে উঠল এবং তাঁর মুখে সাদা দাড়িও দেখা গেছে।

এর মানেটাই বা কী? হাথিয়াগড়ে এসে ডাইনে-বাঁয়ে পাগল দেখার কথা ভাবিনি। তবে রাঁচি নাকি এখান থেকে তত বেশি দূরে নয়।

হুঁ, তাহলে যা ভেবেছি তাই। রাঁচির পাগলাগারদ থেকে পাগলেরা যেভাবেই হোক বেরিয়ে পড়েছে। তাছাড়া এর মানে হয় না। উদ্বিগ্ন হয়ে তক্ষুনি বাংলোর দিকে রওনা দিলুম। খবরের কাগজের লোক। এমন একটা খবর যখন পাওয়া গেছে, এক্ষুনি কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

বিষ্ণুমন্দির আবিষ্কার

বাংলো থেকে হাথিয়াগড় বসতি-এলাকার দূরত্ব দু কিলোমিটার। চৌকিদারের সাইকেলে সেখানে গিয়ে ডাকঘরে খবরটা টেলিগ্রাম করে দিলুম। কাল দৈনিক সত্যসেবকে বেরুবে। বস্তুর বিদ্রোহের খবর তো কাগজে বেরোয়। পাগলবিদ্রোহের খবর এই প্রথম। শুধু বিদ্রোহ নয়, গারদ ভেঙে পলায়ন!

পোস্টমাস্টার ভদ্রলোক আঁতকে উঠে আমার দিকে তাকালেন। চোখ টিপে বললুম, "প্লীজ দাদা, চেপে যান। বুঝতেই তো পারছেন, স্কুপ নিউজ..."

টেলিগ্রাম করে দিয়েই ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করে ফেললেন। আমি সাবধানে চারদিকে নজর রেখে নিরিবিলি আলো-আঁধারি রাস্তায় কীভাবে যে বাংলোয় ফিরলুম কহতব্য নয়। পাগলকে আমি ভীষণ ভয় পাই।

একটা টিলার গায়ে এই বাংলো। মোটে তিনটে ঘর। আর দুটোয় কে বা কারা এসেছেন জানি না। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আমার মতো আরও সাংবাদিক আজ হাথিয়াগড়ে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁরা বিকেলেই ফিরে গেছেন। আমি থেকে গেছি। দৈবাৎ বাংলোর একটা ঘর খালি ছিল। পেয়ে গেছি। ফিরব কাল সকালে।

সাংবাদিকরা এসেছিলেন কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ব দফতরের ডাকে। সম্প্রতি এখানে মাটি খুঁড়ে পুরাতত্ত্ববিদরা খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের একটি বিষ্ণুমন্দির উদ্ধার করেছেন। তার প্রতিষ্ঠাতা নাকি একজন গ্রীক সম্রাট।

শুধু মন্দির নয়, মন্দিরে একটি খুদে বিষ্ণুমূর্তি রয়েছে। সেটা ভারী অদ্ভুত। মূর্তিটার কাছে হাত নিয়ে গেলে থরথর করে কাঁপতে থাকে। স্বচক্ষে ব্যাপারটা দেখে অবাক হয়েছি। রাতেই খবরের বয়ান তৈরি করে ফেলব। চৌকিদারকে চা দিতে বলে বারান্দায় বসলুম। দিনের আলো দ্রুত কমে আসছে।

হঠাৎ দেখলুম, বিকেলে নদীর বুকে এবং পাড়ে ছোটাছুটি করে বেড়ানো দুই পাগল পাশাপাশি হৃষ্টমনে কথা বলতে বলতে এই বাংলোর দিকেই উঠে আসছে। তাঁরা লনের ওপাশে গেট খোলামাত্র চোখে পড়ল, একজনের হাতে লাঠি বা ছোট্ট বল্লম, অন্যজনের হাতে একটা পাথর রয়েছে। সর্বনাশ! আমাকেই আক্রমণ করতে আসছে না তো?

তক্ষুনি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলুম। আগে জানলে বিষ্ণুমন্দিরের খবর আনতে কে এই অখদ্যে জায়গায় ছুটে আসত!...

প্রকাণ্ড মুণ্ড

চৌকিদার ডাকছিল, "স্যার! চায় লিজিয়ে!" ভয়ে-ভয়ে বললুম, "বারান্দায় রাখো, যাচ্ছি।" ভাবলুম, নিশ্চয় পাগলদুটো চলে গেছে। নইলে চৌকিদারের ওপর হামলা করত এতক্ষণ।

বেরিয়ে এলুম। চেয়ারে বসে চায়ের কাপে হাত দিয়েছি, সেইসময় ওপাশের ঘর থেকে সেই টাক ও দাড়িওলা পাগলটিকে বেরোতে দেখা মাত্র কাপ উলটে গেল। বারান্দার আলোটা মৃদু। ছানাবড়া চোখে তাকিয়ে আছি তো আছি।

তারপর প্রচণ্ড জোরে হেসে উঠলুম। "হ্যাল্লো ওল্ড ডাভ! আপনি!"

"হ্যাল্লো ডার্লিং!"

আমাদের প্রখ্যাত ওল্ড ডাভ অর্থাৎ বুড়ো ঘুঘু কর্নেল নীলাদ্রি সরকার সস্নেহে আমার কাঁধে থাপ্পড় মেরে পাশেই বসলেন। চা পড়ে গেছে দেখে জিভ চুকচুক করে চৌকিদারকে ফের চা আনার নির্দেশ দিলেন। তারপর বললেন, "তুমি যে এসেছ, বিকেলেই শুনেছি। তা..."

কথা কেড়ে বললুম, "কিন্তু হে প্রাজ্ঞ ঘুঘুমশাই, বিকেলে নদীর ধারে আপনাকে ওই অবস্থায় দেখে চিনতেও পারিনি। ভেবেছিলুম, রাঁচির গারদ ভেঙে পালিয়ে এসেছে কেউ।"

কর্নেল অট্টহাসি হেসে বললেন, "প্রজাপতি ধরছিলুম। হাথিয়াগড়ে এক বিরল প্রজাতির প্রজাপতি আছে, জানো জয়ন্ত? এদের পাখায় অবিকল যেন চীনা-ড্রাগন আঁকা!"

চৌকিদার চা দিয়ে গেল। চা খেতে-খেতে চাপা গলায় চোখ নাচিয়ে বললুম, "আমাদের বৃদ্ধ গোয়েন্দাপ্রবর একজন প্রকৃতিবিদও বটেন, ভুলে গিছলুম। যাই হোক, হাথিয়াগড়ে বিষ্ণুমন্দির বা আজব বিষ্ণুমূর্তির সঙ্গে আশা করি আপনার আগমনের কোনো সম্পর্ক নেই?"

কর্নেল জোরে মাথা দুলিয়ে কেন যেন একটু চড়া গলায় বললেন, "মোটেও না ডার্লিং! বিশেষ করে এই প্রজাপতির আশ্চর্য গুণ কী জানো? রাতে এদের পাখা থেকে জ্বলজ্বলে আভা ঠিকরে পড়ে। যদি দেখতে চাও, আমার ঘরে এসো।"

এই সময় দ্বিতীয় 'পাগলের' আবির্ভাব ঘটল। কর্নেল বললেন, "জয়ন্ত, আলাপ করিয়ে দিই। ইনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্বের প্রখ্যাত অধ্যাপক ডঃ দোলগোবিন্দ ঢোল। ডঃ ঢোল, ইনি আমার স্নেহভাজন শ্রীমান জয়ন্ত চৌধুরী। কলকাতার দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক।"

ডঃ ঢোল আমাকে আমল না দিয়ে গম্ভীর মুখে বসলেন। তারপর বললেন, "হ্যাঁ, তখন যা বলছিলুম কর্নেল সরকার! হাথিয়া নদীতে যতগুলো ওইরকম পাথর কুড়িয়ে পেয়েছি, সবগুলোতে বিষ্ণুর মুখ আঁকা। তাই আমার সিদ্ধান্ত, এ নদীর উজানে কোথাও এক বিশাল মন্দির-গুচ্ছ ছিল, এই মন্দিরটা তারই অংশ। তবে ওই বিষ্ণুমূর্তিটা কিন্তু মহাজাগতিক।"

কর্নেল বললেন, "তার মানে?"

"তার মানে, ওটা মহাকাশের কোনো নক্ষত্রলোক থেকে কীভাবে এসে পড়েছিল। অবশ্য শনিগ্রহের চাকার মধ্যে যে খণ্ড-খণ্ড প্রকাণ্ড বস্তুপিণ্ড রয়েছে, সেখান থেকেও আসতে পারে।"

কর্নেল বিড়বিড় করে বললেন, "খণ্ড-খণ্ড প্রকাণ্ড বস্তুপিণ্ড!"

ফিক করে হাসলেন ডঃ ঢোল। "ওটা অনুপ্রাস!"

কর্নেল আমাকে অবাক করে গম্ভীর মুখে বললেন, "আচ্ছা ডঃ ঢোল, চ্যবনপ্রাশ আর অনুপ্রাসে কি কোনো সম্পর্ক আছে? মানে, আপনার ঘরে তখন প্রকাণ্ড চ্যবনপ্রাশের কৌটো দেখলুম কিনা!"

ডঃ ঢোল 'অ্যাঁ' বলে কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর হো হো করে হেসে বললেন, "আপনি মশাই যেন কী! খালি পাখি-প্রজাপতির পেছনে ঘুরেই জীবনটা নষ্ট করলেন। সেজন্যেই তো বলছিলুম, ভাষাটা একটু ভাল করে শিখুন।"

বুঝতে পারলুম না, কেন কর্নেল এই পুরাতত্ত্ববিদের কাছে অজ্ঞ মূর্খ সেজে থাকতে চাইছেন! ডঃ ঢোল লম্বা বক্তৃতা শুরু করলেন। ইতিমধ্যে চা খাওয়া হয়ে গেল। তারপর কর্নেল আমার হাত ধরে ওঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। আমার মুখে প্রশ্ন ছিল। উনি সেটা আঁচ করে ঠোঁটে আঙুল রেখে বললেন, "চুপ! কোনো কথা নয়। আর শোনো, রাতে তুমি আমার ঘরেই শোও। প্রশ্ন

কোরো না।”

রহস্যের গন্ধে গা ছমছম করে উঠেছিল। তাই ভাল ছেলের মতো চুপ করে গেলুম। খাওয়াদাওয়ার পর কর্নেলের ঘরে শুতে এলুম। সেইসময় কর্নেল চাপা গলায় বললেন, “ঘুমিয়ে পোড়ো না কিন্তু।...না, প্রশ্ন নয়। চুপচাপ শুয়ে পড়ো।”

কিন্তু ট্রেনজার্নির ক্লান্তি ছিল। কখন ঘুমিয়ে গেছি কে জানে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল কী এক হট্টগোলে। বাইরে কে কোথায় প্রচণ্ড চেঁচামেচি করছে। ঘরে টেবিলল্যাম্প জ্বলছে। কর্নেল নেই। দরজা ভেজানো রয়েছে। বাইরে গিয়ে দেখি, চৌকিদার বল্লম তুলে হাথিয়াগড় জঙ্গলের ভাল্লুকদের মুণ্ডুপাত করছে। কর্নেল হাঁটু গেড়ে বসে মূর্ছিত ডঃ ঢোলকে সজ্ঞান করার চেষ্টা করছেন।

জ্ঞান হলে চোখ খুলেই ডঃ ঢোল বললেন, “প্রকাণ্ড মুণ্ড।”

পরে জানা গেল, জানলায় ওই বস্তুটি দেখেছেন। মুণ্ডের বড়বড় দাঁতও নাকি ছিল। চৌকিদার বলল, “ভালু! ভালু! মাঝে-মাঝে ভালুক আসে বাংলোয়।”

ডঃ ঢোল তো কিছুতেই একা ঘরে শোবেন না। অগত্যা ওঁকে কর্নেলের ঘরের মেঝেয় বিছানা করে দেওয়া হল। দুধারে দুটো খাটে আমি ও কর্নেল, মধ্যিখানে নীচে ডঃ ঢোল। এমন ভিতু মানুষ কখনো দেখিনি।”

বিষ্ণুমূর্তির অন্তর্ধান

সকালে সেই বিষ্ণুমন্দিরের কাছে গিয়ে অবাক হলুম। পুলিসে ঘিরে ফেলেছে জায়গাটা। কর্নেল ভোরে কখন বাংলো থেকে বেরিয়ে গেছেন। একজন সেপাইকে জিগ্যেস করে শুনলুম, বিষ্ণুমূর্তি চুরি হয়ে গেছে। কড়া পাহারার ফাঁক গলে কখন কীভাবে চোর ঢুকেছিল, কে জানে! তক্ষুনি বাংলোয় ফিরে গেলুম। কর্নেলকে খবরটা দেওয়া উচিত। ধুরন্দর গোয়েন্দা উনি। ওঁর নাকের ডগায় এমন ঘটনা ঘটল যে!

ডঃ ঢোলের ঘরের দরজায় তালা। কিন্তু কর্নেল ফিরেছেন। ওঁর ঘরে ঢুকে দেখি, টেবিলে একটা সছিদ্র জার এবং তাতে প্রজাপতি রয়েছে কয়েকটা। মন দিয়ে কী দেখছেন-টেখছেন। হন্তদন্ত হয়ে বললুম, “শুনেছেন কর্নেল? বিষ্ণুমূর্তিটা চুরি গেছে!”

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, “যাক না। ক্ষতি কী!”

“ক্ষতি কী মানে? কী বলছেন আপনি!” অবাক হয়ে বললুম। “কয়েক হাজার বছরের পুরনো প্রত্নানিদর্শন! তাছাড়া এমন আশ্চর্য কম্পমান জীবন্ত একটা ধাতুমূর্তি! বিজ্ঞানেও এ একটা বিস্ময়কর ঘটনা নয় কি?”

কর্নেল বললেন, “হুম্, জয়ন্ত, তার চেয়ে আরও বিস্ময়কর ঘটনা দেখার জন্য তোমাকে গত রাতে জেগে থাকতে বলেছিলুম। তুমি কিনা বেঘোরে ঘুমিয়ে কাটালে!”

এ-কথায় দমে গিয়ে ভয়ে-ভয়ে বললুম, “অ্যাঁ, বলেন কী। গত রাতে কি আর কিছু ঘটেছিল? নিশ্চয় সেই প্রকাণ্ড মুণ্ডটা এ ঘরের জানলায় হামলা করেছিল?”

“ডার্লিং, তুমি ঠিকই অনুমান করেছ।” বলে বৃদ্ধ গোয়েন্দা-প্রবর চুরুট ধরালেন। তারপর জানলার দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে ফের বললেন, “তাছাড়া রাঁচির পাগলাগারদ থেকে পাগল পালানোর অনুমানও সত্য। তুমি তোমার কাগজে নিছক ভুল খবর পাঠাওনি। তবে পলাতক পাগলের সংখ্যা মাত্র এক।”

খুশি হয়ে বললুম, “এবার যদি বলি, সেই প্রকাণ্ড মুণ্ডুটা সেই পলাতক পাগলেরই, তাতে কি ভুল হবে?”

কর্নেল হাসলেন। “জয়ন্ত, তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি ইদানীং বেজায় খুলেছে দেখে খুব খুশি হলুম। তো চলো, এবার এ বুড়োর সঙ্গে হাথিয়াগড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করবে। ডার্লিং, বসন্তকালে হাথিয়াগড়ের তুলনা হয় না!”

তক্ষুনি মনমরা হয়ে বললুম, “নিশ্চয় কোনো দুর্লভ প্রজাতির পাখির পেছনে বনবাদাড় পাহাড় টো-টো করে ঘুরিয়ে মারবেন! আমাকে কিন্তু আজই ফিরতে হবে।”

কর্নেল সস্নেহে আমার কাঁধে হাত রেখে আশ্বাস দিলেন "মোটেই না, মোটেই না।”

অনুপ্রাস ও চ্যবনপ্রাশ

কিন্তু বুড়োর পাল্লায় পড়লে এরকম হবে জানা কথা! বাংলো থেকে নেমে গিয়েই শুরু হল ওঁর বিদঘুটে আচরণ। নদীর ধার অবধি গেলেন চোখে বাইনাকুলার রেখে এবং আছাড়ও খেলেন প্রচুর। তারপর হঠাৎ আমার কাঁধ চেপে বসিয়ে দিলেন। নিজেও বসলেন। বড় একটা পাথরের আড়ালে বসে পড়ার পর বাচ্চা ছেলের মতো হেসে আঙুল তুলে ফিসফিস করে বললেন, “দেখছ জয়ন্ত, কত খণ্ড-খণ্ড প্রকাণ্ড বস্তুপিণ্ড পড়ে রয়েছে নদীতে!”

বললুম, “ডঃ ঢোলের কথাটা আপনাকে পেয়ে বসেছে! কী যেন বলে একে—অনুপ্রাস!”

“কিন্তু চ্যবনপ্রাশের সঙ্গে এর গূঢ় সম্পর্ক রয়েছে ডার্লিং!”

হো-হো করে হেসেই ফেলতুম, বুড়ো বাঘের জোরালো থাবার মতো হাতটা আমার মুখে চেপে বললেন, “চুপ, চুপ! এবার হামাগুড়ি দাও। স্টার্ট!”

উপায় নেই। পাথরের আড়ালে হামাগুড়ি দিচ্ছি তো দিচ্ছি। এই করে নদীর বুকে অনেকখানি এগিয়ে একখানে থামতে হল। কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, “ওই দ্যাখো!”

যা দেখলুম, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ডঃ ঢোল ঠিক কালকের মতো পাথর কুড়িয়ে পরখ করছেন। পুরাতাত্ত্বিকরা যা করেন। কিন্তু কর্নেল কি তাই দেখার জন্য এমন লুকোচুরি করছেন?

কর্নেলের দিকে ঘুরেছি, এমন সময় একটা চাপা গর্জন শুনলুম। চমকে উঠে দেখি, ডঃ ঢোলের সামনে মাটি ফুঁড়ে যেন একটা লোক গজিয়েছে। নোংরা প্যান্টশার্ট পরনে, একমুখ গোঁফদাড়ি, জ্বলজ্বলে চোখ। একটা পাথর তুলে সে ডঃ ঢোলকে শাসাচ্ছে। কিন্তু লোকটার শরীরের তুলনায় মাথার গড়ন দেখার মতো। একটা কাঠির মাথায় ফুটবল বসালে যেমন হয়। প্রকাণ্ড মুণ্ডু বটে!

তারপরই যা দেখলুম, আতঙ্কে শিউরে উঠলুম। ডঃ ঢোলের হাতে একটা ছোরা। লোকটার দিকে তিনি এগোচ্ছেন, আর লোকটা পিছিয়ে যাচ্ছে। দুচোখে আতঙ্ক।

তারপর কানে তালা ধরে গেল কর্নেলের গর্জনে, “খবর্দার!” এ বুড়োর এমন সিংহমূর্তি কখনও দেখিনি। হাতে রিভলভার নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। ডঃ ঢোল ঘুরে দেখেই ছোরা ফেলে দিলেন এবং পালানোর চেষ্টা করলে কর্নেল ফের বাজখাঁই চেঁচিয়ে বললেন, “নড়লেই মারা পড়বে পশুপতি। এক পা এগিও না!”

পশুপতি! ছিলেন ডঃ দোলগোবিন্দ ঢোল, হয়ে গেল পশুপতি! আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। কর্নেল এগিয়ে গিয়ে পশুপতির পায়ের কাছ থেকে কী একটা তুলে নিলেন।

আরে! এ তো দেখছি একটা মস্তবড় চ্যবনপ্রাশের কৌটো! এরপর কর্নেল সেই আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, “পাথরটা ফেলে দিন ডঃ ঢোল। পশুপতি আর আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।”

আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি তো আছি।...

রহস্য ফাঁস

চ্যবনপ্রাশের কৌটো থেকে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের

বিষ্ণুমূর্তি বেরুল। আমাদের এই বুড়োর কেরামতির তুলনা হয় না। নকল ডঃ ঢোল অর্থাৎ পশুপতিকে পুলিসের জিম্মায় দিয়ে কর্নেল বাংলোয় ফিরলে জিজ্ঞেস করলুম, "হাই ওল্ড ডাভ! রহস্যটা কী?"

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে আরামে বসে বললেন, "এ - রহস্যের রহস্য এখন আর নেই। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, প্রাচীন বিষ্ণু-মূর্তি চুরির ঘটনা।"

"আহা, আপনি টের পেলেন কীভাবে?"

"তিনটি সূত্র থেকে। প্রথম সূত্র ঃ ডঃ ঢোল আমার চেনা। অথচ এই লোকটা দিব্যি নিজেকে ডঃ ঢোল বলে পরিচয় দিয়েছিল। দ্বিতীয় সূত্র ঃ চ্যবনপ্রাশ। অতবড় কৌটোয় চ্যবনপ্রাশ নিয়ে কেউ বিদেশ-বিভুঁয়ে ঘোরে না। তৃতীয় সূত্র ঃ জানলায় প্রকাণ্ড মুণ্ডের আবির্ভাব। ডঃ ঢোলের মাথার গড়ন অস্বাভাবিক, সেটা নিশ্চয় লক্ষ করেছ? প্রকাণ্ড মুণ্ড শুনেই বুঝেছিলুম, লোকটা কে।"

"তাহলে কি উনিই গতরাতে পশুপতির ঘরের জানলায়..."

বাধা দিয়ে আমার বৃদ্ধবন্ধু বললেন, "হুম! তবে আমি অনুপ্রাস-চ্যবনপ্রাশ নিয়ে রসিকতা করায় ধূর্ত পশুপতি টের পেয়েছিল, আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে। অবশ্য কাল দুপুরের মধ্যেই এক ফাঁকে মূর্তি চুরি করে এনে বিকেলে সেটা লুকোতে গিয়েছিল নদীতে। কিন্তু আমি কাছাকাছি থাকায় পারেনি। রাতে নিশ্চয় ফের যেত। কিন্তু মানসিক হাসপাতাল থেকে ডঃ ঢোল পালিয়ে এসে এই বাংলোয় রাত কাটানোর জায়গা খুঁজবেন, সে ভাবেওনি। আর ডঃ ঢোলও জানলা দিয়ে পশুপতিকে দেখে অবাক। বেচারা চৌকিদারের তাড়া খেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পশুপতিও ভড়কে গিয়েছিল। তবে ডার্লিং, এর আগে একটু ভূমিকা আছে।"

"বলুন, বলুন!"

"হাথিয়াগড়ে মাটির তলায় প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির থাকার সম্ভাবনা ডঃ ঢোল বরাবর বলতেন। সম্প্রতি যে মাটি খোঁড়ার কাজ হল, তা ওঁরই চেষ্টায়। কিন্তু তার আগেই উনি প্রচণ্ড মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্ক রোগের পাল্লায় পড়লেন। মানসিক হাসপাতালে ওঁকে ভর্তি করানো হল। সেই ফাঁকে ওঁর পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পশুপতি ডঃ ঢোল সেজে এখানে চলে এল। আজকাল বিদেশে এসব প্রাচীন মূর্তি পাচার হচ্ছে চড়া দরে। কাজেই এই মওকায় সে দাঁও মারতে চেয়েছিল। ডঃ ঢোলকে পুলিস যখন-খুশি মন্দিরে ঢুকতে বাধা দেবে কোন সাহসে? তিনিই কিনা এই পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারের পেছনে।"

বলে বৃদ্ধ ঘুঘুমশাই চোখ বুজে কান পেতে কী যেন শুনতে থাকলেন। তারপর আচমকা বাইনোকুলারটা টেবিল থেকে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। বুঝলুম, কী দুর্লভ প্রজাতির পাখির ডাক শুনেছেন! এ বেলার মতো নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে হাথিয়াগড়ের বনবাদাড় আর পাহাড় ভেঙে পাখির পেছন-পেছন ঘুরবেন। বুড়ো হাড়ে এত সয়!

ফিরে এলাম

সুনীলকুমার নন্দী

ভিতর থেকে মুখ ঘুরিয়ে বাইরে খুঁজেছি
বাইরে আলোর জোয়ারে স্নান,
ধন্য আলোর পুণ্য ; মাগো,
ঝলমলে বুক শূন্য।

ভিতর থেকে মুখ ঘুরিয়ে অনেক দেখেছি
জীবন দিয়ে মানুষ চেনা, কে যে গভীর কখন; মাগো,
কেউ না এদের আপন।

ভিতর থেকে মুখ ঘুরিয়ে অনেক পেয়েছি
আলতো সোহাগ, যা কিনা তা-ও
কাজ ফুরলে আর না; মাগো,
সেই পুরনো বায়না।
ভিতর থেকে মুখ ঘুরিয়ে এবার বুঝেছি
কোথায় তোমার শক্তি মাগো,
কোথায় বাঁচার উৎস—
মাটি-জলে খনির খাদে, ছড়িয়ে থাকা শস্য

ফিরে এলাম তোমার কাছে অন্ধকারে তাই তো!

ছবি : দেবাশিস দেব

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধে হব-হব হতেই রোজকার মতো দেখ্-না-দেখ্ লোডশেডিং ঝপাং করে এসে সব-কিছু ভতাং করে দিল। চি'-হু'্ চি'-হা করে চে'চাতে-চে'চাতে জলের পাম্পটা গাঁক করে থেমে যেতেই বোঝা গেল রেডিয়োতে রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছিল। কেননা যেই 'আমি ঝ—' পর্যন্ত হয়ে —'ড়ের রাতে' কথাগুলো খুব খুদে-খুদে আর আধো-আধো মতো হয়ে উপে গেল অমনি দেখা গেল টেলিভিশনের পর্দায় হাসি-হাসি মুখে প্রোগ্রাম বলতে বলতে —চু'-ই-ইঃ করে গলার স্বর সমেত মহিলাটি পিছু হটে 'যাব না যাব না' করেও মিলিয়ে যেতে বাধ্য হলেন।

অন্ধকার বলে অন্ধকার! পিক্লুর মনে হল লোডশেডিং-এর নাম হওয়া উচিত ছিল কিষ্কিন্ধ্যার রাজা।

কয়েক সেকেন্ড গিলে-খাওয়া চুপচাপ। তারপর আশপাশের প্রত্যেকটি বাড়ি 'রে রে' করে দেশলাই, দেশলাই রবে খেপে উঠল। ছোট, বড়, মাঝারি—মোটামুটি টিমটিমে ধরনের সব কেরোসিন বা মোমবাতি জ্বলে উঠতেই ঝাঁকে ঝাঁকে মশা দল বেঁধে 'হ'াউ ম'াউ খ'াউ' করে মানুষের রক্ত হরদম খেয়ে নেবার জন্যে জানলা, দরজা, ফুটোফাটা দিয়ে বাড়িগুলোতে ঢুকে পড়তে থাকল।

চে'চামেচি হট্টগোল ছাপিয়ে, অন্ধকারের মাথা ফ'ুড়ে ছোট্কার সেই পাড়া-মাতানো সপ্তমে বাঁধা গলা কানে এল— "ঘণ্টা পাঁচেকের মতো কম্ম সারা। আরে, আরে এ কী রে! দেশলাইটা ঠিক এইখানে রেখেছিলাম। গেল কোথায়? যে যেখানে আছ দাঁড়িয়ে থাকো—হ্যাঁ হ্যাঁ, যে যেখানে দাঁড়িয়ে! ন'ড়ো না একটুও—সব ব্যাগড়বাঁই হয়ে যাবে। পিক্লু! তোর হবি-রুমটা খোলা না বন্ধ? সাপটা ঝাঁপি-চাপা আছে তো?"

ওপর থেকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে পিক্লুর গলা ভেসে এল, "বোঝা যাচ্ছে না।"

"সর্বনাশ! বোঝা যাচ্ছে না মানে কী?"

পিকলুর 'হবি-রুম' এ-বাড়ির বেশির ভাগের আতঙ্ক। ছোটবেলা থেকে পিক্লুকে ওর জ্যাঠামণিরা একটু বেশি আদর দেওয়ার ফলে ওর এইসব শখগুলো মেটানো হয়ে থাকে। কেননা, খুব ছোট থেকেই পিক্লুর মা নেই, আর তারপর বাবা বিদেশে চাকরি নিয়ে আছেন।

বেশ কিছুদিন হল পিক্লুর মাথায় জীব-বিজ্ঞানের পোকা কিলবিলিয়ে ওঠে। তখন বড় জ্যাঠামণির আশকারায় একতলার গুদোমের একটা বড় অংশ জুড়ে হয় পিকলুর 'হবি-রুম'। ব্যাঙ আর ব্যাঙাচি, পিঁপড়ে আর মাকড়সা, গুবরে-পোকা আর লাল-মাছ ইত্যাদি প্রভৃতি বাসিন্দাদের নিয়ে পিকলুর এই গবেষণার ঘরে ছোটকা ছাড়া আর-একজন নিয়মিত এসে পিকলুকে উৎসাহ দিত। সে হল পিকলুর বাবিমামা। বাবিমামার ব্যাঙ-ব্যাঙাচি-গুবরেপোকা ধরার অসাধারণ ক্ষমতার জন্যে ওকে পিকলু ওর গবেষণা-ঘরের অনারারি মেম্বার করে নেয়। আর ছোটকা তো গান গেয়ে লালমাছের নাচ দেখাতে পারে। পাখির শিস দিয়ে ওঠে। তাই ছোটকা জীবজগতের অনারারি প্রফেসর।

কিন্তু গতবছরের বৃষ্টিতে এক দারুণ বিপর্যয় হল। 'হবি-রুমে' হুড়হুড় করে জল ঢুকে পড়ায় জীবন্ত পোকামাকড়দের অনেকগুলো মিছিল ভাসতে-ভাসতে সিঁড়ি পর্যন্ত পেঁছে রেলিং টপকে-টপকে উঠে পড়ে দোতলায়। তাতেও খুব ক্ষতি হত না। হল জ্যাঠামণির বড় মেয়ে পিকলুর দিদিভাইয়ের পাকামির জন্যে। একটা বিছে—ইয়া বড়সড় তেঁতুলে-বিছে দেখে, মস্ত ঝাঁটা দিয়ে যেই-না এক ঘা কষাতে গেছে—ঝপাং! হয়ে গেল লোডশেডিং। ঝাঁটা আছড়ে পড়ল ভুল জায়গায়। বিছেটা দিদিভাইয়ের পা বেয়ে উঠল সর-সর করে। তারপর যা হল সে একেবারে যাচ্ছেতাই কান্ড। জ্যাঠামণির হুকুমে 'হবি-রুম' প্রোমোশন পেয়ে গেল চিলেকোঠায়। মেজজ্যাঠামণি বললেন, "ওপরে থাকাই ভাল। বেশি বৃষ্টি হলে উড়ে যাবার অথবা নর্দমা দিয়ে সাঁতরে পালাবার চান্স পাবে। তবে জানিস পিকলু, তোর এত অমেরুদন্ডী প্রাণী না পোষাই ভাল।"

কথাটা শোনামাত্র দ্বিগুণ উৎসাহে পিকলু ছোটকাকে নিয়ে ছোটখাটো মেরুদন্ডী প্রাণী কিনতে হাট, মেলা, বড়-বড় বাজার মার্কেট সব ঘুরে ঘুরে খরগোশ, গিনিপিগ, সাদা ইঁদুর ইত্যাদি কিনে বসল। কিন্তু মুশকিল বাধল একটা সাপ নিয়ে। নিউ মার্কেটে ছোটকার এক পরিচিত সাপওয়ালা পিকলুর হাতে একটা ঝাঁপিসুদ্ধ লিঙলিঙে সাপ তুলে দিয়ে বলেছিল, —"নিয়ে যাও খোকা। এ সাপের ফণা গজাবে, ভয়ানক বিষ

...বে। তখন আমায় নিয়ে যেও, গিয়ে হাঁ করিয়ে সাপের বিষ ...করে বার করে দাওয়াই বানায়, তোমায় শিখিয়ে দেব।'' ...নে যতই ভয় করতে লাগল ততই ইচ্ছে বেড়ে গেল। ছোটকা ...রায় সায় দিতেই পিকলু দুরুদুরু বুকে সাপ নিয়ে বাড়ি ...সেই সটাং হবি-রুমে পুরে দিয়েছিল ওটাকে।

কিন্তু নির্ঘাত খিদের জ্বালায় একটু আগে ও ছটফট ...রছিল। বিশেষ করে ঘরে যখন অতগুলো গিনিপিগ আর সাদা ...দুরের গন্ধ। তাই একটু আগেই পিকলু যেই-না সাপের ...পিতে উঁকি দিয়েছে অমনি আলো ঝপাং করে নেভার ...হূর্তে ও দেখতে পেল কী যেন একটা লিকলিকে-মতো ...রসর করে সরে, মিলিয়ে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে নেমে এসে পিকলু ...মকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সদরের মুখে ছোটকা, বাইরের দিকে ...য়ে হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে, কাকে যেন অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। ...কহাতে একটা মোমবাতি মাথার ওপর ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের ...য়দায় ধরা। পিকলুকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, "আর ভয় ...েই রে পিকলু! এসে গেছে—আ গিয়া। তোর ববিমামা ...জির। আরে, আসুন আসুন, স্যার। আজ সন্ধ্যায় এ-বাড়িতে ...পনার মতো একজন ভয়ঙ্কর বিচক্ষণ ডাক্তার এবং একজন ...ঝার দরকার খুব বেশি। পিকলু, আমি বেরুচ্ছি।" তারপর ...লা নামিয়ে ফিসফিস করে বলে গেল, "দোহাই পিক, সাপটাকে ...ভজিয়ে-ভাজিয়ে ঝাঁপিতে ভরিস। গোপালের মা-র কাছ থেকে ...ক বাটি দুধ আর কলা চেয়ে নে। কাজ হবে। যদি ভেনম হয় ...কেউ বাঁচবে না। পয়জন হলে তবু যা-হোক তোর ডাক্তারমামা ...ক-আধজনকে বাঁচাতে পারবে।"

এই না বলে, তিলমাত্র সময় খরচ করে ববিমামার হাতে ...মোমবাতিটা ধরিয়ে দিয়ে ছোটকা হাসিমুখেই ছুটে বেরিয়ে ...গেল।

পিকলুর ববিমামাও এক হাত ওপরে তুলে ফ্লোরেন্স ...নাইটিংগেলের মতো বাতি-হাতে ভেতরে এসে দাঁড়াল। পকেট ...থেকে স্টেথোস্কোপটা বিষধর সাপের ফণার মতো উঁকি দিচ্ছে। ...আহ্লাদে গদগদ নিটোল মুখটি এখন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ...আছে। মোটা চশমার নীচে গোদা-গোদা চোখের ঠিক ওপরেই ...হুলুচুলু একরাশ কালো চুল আধুনিক কায়দায় ফেলে-রাখা। ...এত দুঃখেও মুগ্ধ পিকলুর মনে হল, ওর ববিমামার এইভাবে ...দাঁড়ানো, ঠিক সিনেমার জঙ্গল-সীনের হীরোর ক্লোজ-আপের ...মতো।

উঁচু-করে-ধরা মোমবাতির আলোর রশ্মির গন্ডির মধ্যে চট ...করে ঢুকে পড়ে পিকলু গা ঘেঁষে দাঁড়াতেই ববিমামা মোমবাতিটা একটা উঁচু জায়গায় আটকে রেখে, হাত নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার রে পিকলু? তোর ছোটকার নাটুকে কথাবার্তার মধ্যে কেবল ভেনম আর পয়জনটুকু কানে এল। ব্যাপারটা কী?"

পিকলু প্রায় ফুঁপিয়ে উঠে উত্তর দিল, "সাপ, সাপ বেরিয়েছে যে।" ববিমামা আঁতকে উঠল, "সে আবার কী? কোথায়, কখন, কবে—কী করে?"

তখন গলা নামিয়ে পিকলু ইতিহাসটা সংক্ষেপে ববিমামাকে শোনাল। মেরুদন্ডী প্রাণী কিনতে গিয়ে কেন যে মেরুদন্ডী সাপ কিনে বসল! আসল ভয় হচ্ছে ওর বিষের থলি। এই থলিতে কী জাতের বিষ আছে কে জানে! যদি ভেনম-জাতীয় বিষ হয় তাহলে কী সর্বনাশ যে হবে! আর যদি পয়জন, সমপল পয়জন হয়, তাও খারাপ।

ববিমামা পিকলুকে এবার নিজের গায়ের কাছে টেনে নিয়ে বলল, "ছি ছি! আগে ভাবতাম তোর ছোটকা পাগলাটে। এখন দেখছি বদ্ধ উন্মাদ। এই অন্ধকারে এখন করিটা কী? বাড়িতে আর কেউ নেই?"

ঠিক এই সময় হ্যাঁকো-চ্যাঁকো সব আলো নিয়ে গোপালের মা গজগজ করতে-করতে ঢুকল। ঘরে ঘরে এখানে-ওখানে হ্যারিকেন, ল্যাম্প-বাতি, কুপি, সব বসাতে থাকল আর বলতে লাগল, "এত জন্ম বেঁচে আছি, তা এমনটি দেখিনিকো। এই আলো, এই আঁধার। আজ টেলিফিশনে কেমন নাটক ছিল—কাজ সেরে নিয়ে বসবার যোগাড় করছি—তা গেল তো সব। —অ মা, মামাবাবু যে! এতগুলো পাস দিয়ে ডাক্তার হলে, একটু আলো তৈরি করতে শিখলে না গা? আমার পিকলুবাবা শিখবে। আলো না থাকলে চলে? ও মা গো! পিকলুবাবু কাঁদছ নাকি?"

"না না। আমায় একবাটি দুধ আর একটা কলা এনে দেবে গোপালের মা?"

"দুধকলা কী হবে গো? সাপ পুষবে নাকি?"

"না না, ববিমামা খাবে।"

ববিমামা একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠল, "সে কী কথা? আমি আবার—" পিকলু গা টিপতেই মামামশাই চুপ করে গেলেন। গোপালের মা হ্যারিকেন হাতে ওদের সামনে দিয়ে যেতে যেতে বলল, "বাড়িতে কি আর জন-মনিষ্যি আছে? দিদিমণিরা, মায়েরা সব সিনেমা গেলেন দুপুরে—অন্ধকার দেখে বোধ করি আর বাড়ি ঢুকছেন না। বাবুরা তো দেরিতেই আসবেন। বাবু বলে কথা। এক ছোটবাবু কাজ ছেড়ে দিয়ে এস্তক যখন-তখন পিকলুকে নিয়ে এটা-সেটা করেন, তাই ছেলেটা যা-হোক ইস্কুল থেকে এসে একটা সঙ্গী পায়। দাদাদের কথা বাদ দিচ্ছি। মিলিটারি টেম্পর নিয়ে বাড়িতে ঢোকে আর বেরোয়। আর পিকলুর বাপের কথা আর কী বলব—আহা-হা-হা একেবারে ভবঘুরে হয়ে গেল। এখন মা বলো, মামাবাড়ি বলো—ঐ তুমিই সব বাবা!"

ববির মনটা খারাপ হয়ে গেল। পিকলুর মা ছিল ওর একমাত্র দিদি। ওকে আদর করে ববি বলে ডাকত। তাই পিকলুকে ও ববিমামা বলতে শিখিয়েছে। যাতে দিদির দেওয়া নামটা ও অন্তত একজনের মুখে শুনতে পায়। জামাইবাবু তো বাইরের চাকরি নিয়ে ছন্নছাড়া হয়ে গেলেন। দিদির ভুল চিকিৎসা হয়েছিল। তাই ববি ডাক্তারিতে নাম লেখায়। পিকলু তখন খুব ছোট্ট। এখন ওর হঠাৎ এ-সব কথা মনে পড়ছে কেন?

ঠক করে এক বাটি দুধ আর একটা কলা পিকলুর সামনের টেবিলে বসিয়ে গোপালের মা কথার রেশ ধরেই বলে গেল, "নাও, খাও। গরম করতে পারলুম না বাবা। হিটার বন্ধ, গ্যাস নেই। উনুন তো ধরেনি কিনা। ঠাকুর দুপুরে তাস খেলে হাপসে পড়েছে। একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। দেখে দেখে বাপু আমাদের ভিরমি লেগে যায়।"

এত দুঃখেও ববিমামার চোখে হাসির ঝিলিক দিয়ে উঠল। পিকলুর কিন্তু এক চিন্তা। সাপকে দুধকলা খাইয়ে বশ করা। গোপালের মা চলে যেতেই ববিমামার দিকে করুণ চোখে চেয়ে বলল, "দুধকলা খেতে যদি সাপটা আসে—"

"আসবে না, ও-সব গপ্পকথা।"

"যদি আসে তাহলে ঝাঁপি পাব কোথায়? সে তো ছাতে হবি-রুমে পড়ে আছে।"

"নিয়ে আয়—।"

"সাপটা তো ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাব্বা!"

"তবে কিনলি কেন? যদি এতই ভয় তো একটা বেড়াল পুষলেই পারতিস।"

"বেড়াল আছে তো। তুমি জানো, তবু রেগে আছ বলে—"

ববিমামা মোমবাতিটায় অন্যমনস্কভাবে হাত দিয়ে ফেলে-

ছিল। সাঁই করে দেওয়ালে কালো ছায়ার বিজলি কেটে মোমবাতিটা সটাং মাটিতে পড়ে গেল। চারধার ছাই-ছাই অন্ধকার হয়ে গেল। গোপালের মা দরজার ওপারে একটু কমিয়ে যে হ্যারিকেনটা রেখে গিয়েছিল সেটার আলো দূরের স্বাতী-নক্ষত্রের চাইতেও মিটমিটে। কতদিন ভাল করে না-মুছবার ফলে চিমনির চোখে ছানি পড়েছে। পিকলু ভাবল, এইবার! কাঁহাতক এইভাবে থাকা যায়! এখুনি তো বাড়ির সবাই ফিরতে আরম্ভ করবে। তখন যা কান্ডটা হবে! ববিমামার হাতটা জোরে চেপে পিক্‌লু জিজ্ঞেস করে, "মামু! তোমার কাছে সাপের ওষুধ আছে তো?" খুব নরম হয়ে পড়লে পিক্‌লু ববিকে 'মামু' বলে ডেকে ফেলে। শুনে মামু তো হাঁ। সাপের ওষুধ পকেটে করে কেউ ঘোরে?

এমন সময় কী যেন সরসর করে দেওয়াল ঘেঁষে চলছে আর দেওয়াল বাইবার চেষ্টা করছে মনে হল। দেওয়ালের মাঝবরাবর একটা টিকটিকি। টিকটিকিটার এক হাত ওপরে একটা প্রজাপতি। জীববিজ্ঞানের এমন জ্যান্ত উদাহরণ সহজে চোখে পড়ে না। প্রজাপতিকে খাবে টিকটিকি। টিকটিকিকে খাবে সাপ। সাপকে কে খাবে?

"পিক্‌লু, নড়িসনে। ওই দেখ!" ববিমামার আঙুল-বরাবর তাকিয়ে পিক্‌লু দেখল সম্পূর্ণ অন্যদিকে একটা মোটা-মতো সাপ চুপ করে পড়ে আছে। এটা আবার কোথা থেকে এল? দুধকলা খেয়ে এর মধ্যেই মোটা হয়ে মরেছে নাকি? বুকের ভেতরটা বড্ড ঢিপঢিপ করছে পিক্‌লুর।

ওরা দুজন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হৈ-হৈ করে দিদি আর জ্যাঠাইমাদের দল সিনেমা দেখে আইসক্রীম খেয়ে ফিরল। বড়মার থিয়েটারি গলা দরজার কাছে শোনা গেল, "দেখেছ আক্কেল! ভরসন্ধেবেলা লোডশেডিং-এর মধ্যে হাট করে সদর-দরজা খোলা রেখে সব আড্ডা দেওয়া হচ্ছে বোধহয়। এদিকে ছিনতাই আর ডাকাতিতে দেশ উজোড় হয়ে গেল। থাকবে না। একদিন বাড়ি ফিরে দেখবে কিছু নেই—কেবল দরজা-জানলাগুলো পড়ে আছে ও গোপালের মা—কোথায় গেলে বাড়িঘর ফেলে—" বলে পিক্‌লুর বড়জ্যাঠাইমা তাঁর টর্চটা জ্বালতেই আলোটা সোজা ববিদের দুজনের ওপর গিয়ে পড়ল।
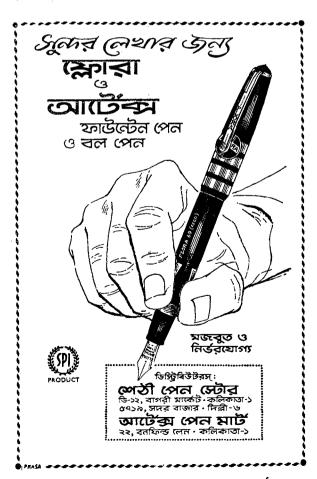
"এ কী! কী হয়েছে। দুটিতে বলির পাঁঠার মতো দাঁড়িয়ে আছে দেখ্‌।"

হি-হি হি-হি করে পিক্‌লুর দিদিরা হেসে উঠতেই, ববির গলার স্বর বেরিয়ে পড়ল। খানিকটা রাগে। চেঁচিয়ে বলল, "সাপ! ওই ঠিক পেছনে।"

কথাটা শোনামাত্র যা দৃশ্য হল! টর্চ গেল নিভে। বড়মার দু' মেয়ে আর মেজমার এক মেয়ে এ ওকে ঠেলে চেয়ারে, টুলে, সব তড়াক তড়াক করে উঠে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে গলায় বিশ্রী ধরনের চিৎকারের আওয়াজ বেরুতে থাকল। জ্যাঠাইমা দুজনে স্ট্যাচু হলেন। গলার স্বর বন্ধ। এবার পেছন থেকে জ্যাঠামণিরা ঢুকলেন। বড়জ্যাঠামণি মেজজ্যাঠামণিকে বলছিলেন, "যা দিনকাল পড়ছে, কী করে যে খরচ কমানো যায়! তার ওপর ইলেকট্রিক আর টেলিফোন বিল দেখলে তো—আরে কী ব্যাপার? এরা সব—কী হয়েছে, কী হয়েছে?" মেজজ্যাঠামণি আঁতকে উঠলেন, "দাদা, দ্যাখো দ্যাখো, ওরা ভীষণ ভয় পেয়েছে।"

এবার দৌড়ে ঢুকল পিকলুর মেজদা। পেছনে ছোড়দা। দুজনেই খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঢুকছিল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল। আবছা আলোয় এই ভুতুড়ে দৃশ্য দেখলে যে-কেউ আঁতকে উঠত। ওরা তো তার ওপর বেশ ভিতু ধরনের। পিক্‌লু গলা তুলে সভাসমিতির ঘোষকের মতো বলল, "একটা সাপ ঘুরছে। দুটোই হবে। একটার ভেনম বিষ। একটার পয়জন। কেউ ন'ড়ো না। টর্চ আছে?"

বড়মার টর্চটা হাত থেকে গড়িয়ে পড়ে সাপের পেটে ঠেকেছে কি না কে জানে!

ববিমামা হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, "একটা লোক পালাচ্ছে। ধর্ ধর্!" চেঁচানি শুনে লোকটা যে-দরজা দিয়ে পালাচ্ছিল সেটা ছেড়ে ছুটে এল এ-ঘরের দিকে। অন্ধকারে কিছুই বুঝতে পারছে না লোকটা। ওদিকে বামুনঠাকুরের ঘুম ভাঙিয়ে গোপালের মা তাকে নিয়ে ছুটে আসছে এদিকে। ভাবা যাচ্ছে না কী হতে পারে।

লোকটা ঘরের মধ্যে ঢুকে দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। এদিকে মুখ করে। সঙ্গে-সঙ্গে ববিমামা ভয়ডর ভুলে তাকে চেপে ধরল। লোকটা চেঁচিয়ে উঠল।

আলো! দপ দপ দপ দপ করে সব আলো জ্বলে উঠল একই সঙ্গে। পাখা ঘুরতে শুরু হল। অসম্ভব একটা ব্যাপার চোখে পড়ল সকলের। পিক্‌লুর হীরো ববিমামার এক হাতে লোকটা ধরা আছে অন্য হাত পিক্‌লুর হাতে জড়ানো। লোকটার পায়ে একটা সাপ জড়িয়ে জড়িয়ে উঠছে। দেওয়ালে প্রজাপতিটা নেই কিন্তু টিকটিকিটাকে আরও মোটা দেখাচ্ছে। মেঝের মোটা সাপটা আসলে একটা মোটা দড়ি। অন্যান্যরা ট্যাব্‌লোর একটি হাস্যকর ছবির মতো একেবারে মূর্তি বনে গেছে।

ববিমামার দিকে এগিয়ে এসে গোপালের মা বলল, "এ যে গোপালের বন্ধু পটল। তুই চুরি ধরলি কবে থেকে রে ছোঁড়া?"

"কান মলছি মাসি, আর করব না। অভাবে পড়ে—"

ববিমামা গম্ভীর হয়ে বলল, "অভাবে যা করেছ করেছ, এখন বেশি নড়াচড়া করলে সাপের কামড়ে মরবে। পায় সাপ জড়িয়ে উঠছে।"

"ওরে বাবা, বাঁচান দাদাবাবু, বাঁচান।"

এই 'বাঁচান', 'বাঁচান' শুনে ঘর নড়েচড়ে উঠল। মেয়েরা চেয়ার থেকে টুল থেকে নেমে পড়ল। ছেলেরা এগিয়ে এল।

মেজদা বলল, "পিক্লু, তোর স্নেকবাইটের কোনো ওষুধ নেই?"

বাবিমামা সকলকে সরে যেতে বলে পটলকে দেওয়ালে ঠেসে রাখল। "নড়ো না, নড়েছ কি ছোবল মেরেছে। ভেনম হলে কয়েক মিনিট, পয়জন হলে কয়েক ঘণ্টা।" শুনে পটলের চোখ কপালে উঠল।

শিস দিতে দিতে এবার বাড়ির শেষ সভ্য ঢুকল— ছোট্কা। এসেই হো-হো করে হাসির রোল তুলে সকলকে বিপর্যস্ত করে ফেলল।

"হচ্ছেটা কী? সাপটাকে টেনে ফেলে দাও না বাবি, ওটা হেলেসাপ। বিষ-টিষ কিচ্ছু নেই।" বলে এক টানে সাপটাকে পটলের পা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মাথার ওপর কয়েক পাক খাইয়ে সেটাকে আছাড় মেরে ফেলে দিল—"দিলাম মেরুদণ্ড ভেঙে। ও আর নড়বে না।—আরে টেবিলে দুধ-কলা কেন? আমারই জন্যে হবে।" বলে ছোটকা কলাটা চিবিয়ে খেয়ে ঢকঢক করে দুধটাও খেল।

পিক্লুর বড়মা এবার একগাল হেসে বললেন, "তুমি এতও জানো বাপু! ঘরে ঢুকেই কী করে বুঝলে যে ওটা হেলেসাপ?"

"জ্ঞান, জ্ঞান! জীববিজ্ঞানের জ্ঞান। বিধান রায় ঘরে ঢুকেই বলতে পারতেন রুগির টাইফয়েড না আমাশা। তাই না মামু-শাই?"

মামুমশাই তখন পিক্লুর সঙ্গে মিলে হেলেসাপের আদ্যোপান্ত দেখছে। পটলও বেশ সজাগ হয়ে সাপটা দেখতে শুরু করতেই গোপালের মা তার গালে ঠাস করে একটা চড় মেরে বলল, "আর চুরি করবি?" পটল ব্যা-ব্যা করে কান্না শুরু করতেই পিক্লুর মেজজ্যাঠামণি হেসে বললেন, "আর কক্খনো লোড-শেডিং-এর সময় চুরি করতে বেরুসনে যেন। শিক্ষা হল তো?"

"হ্যাঁ বাবু, খুব শিক্ষা হয়েছে।"

"হেলেসাপটা কেউটে হতে পারত।"

"পারত।"

"তুই মরে যেতে পারতিস!"

"পারতুম।"

"যাঃ!"

ছুটে পালাল পটল।

আলো এসে গেলেই সকলে খুশি হয়। তার ওপর কেউটে যদি হেলে হয়ে যায় তাহলে তো কথাই নেই।

যে যার ঘরে চলে যাচ্ছে, হঠাৎ পিক্লুর বড়দি চোখকুঁচকে তার বাবাকে বলল, "জানো বাবা, আমার সন্দেহ হয় সাপটা পিক্লুর হবি-রুম থেকে আমদানি হয়েছে।"

অন্য মেয়ে দুটিও হৈ-হৈ করে সমর্থন করে বলল, "হবি-রুমটা তার ওপর যা নোংরা আর যা বিকট গন্ধ!"

"খরগোশরা তো ভুড়ু মাখে না। তাই।" কথাটা বলে ছোটকা পিকলু আর বাবিমামাকে একধারে ডেকে নিয়ে গেল— "খবরদার কোনো তর্কাতর্কির মধ্যে যাবে না। সাপওয়ালাটাকে আমি হেলেসাপ দিতে বলেছিলাম। বাবি, তুমি আমায় কি পাষণ্ড ভাবো না একটা হাবা-ক্যাবলা মনে করো—অ্যাঁ? আর একটা ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সাপ বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে জেনেও আমি গানের আড্ডায় চলে যাব, তা হতে পারে? বড্ড দুঃখু দিলে ভাই।"

বাবিমামা অনেকক্ষণ একদৃষ্টে ছোট্কার দিকে চেয়ে থেকে বলল, "আমার মনে হয় আপনার ব্রহ্মতালুর মাঝখানটা চৌকো করে চেঁচে ফেলে সেখানে অবিরত বরফ দেওয়া উচিত। আরও ভাবি যে পিক্লুর—"

ঝপাং! আবার লোডশেডিং।

"—যে পিকলুর ভবিষ্যৎ অন্ধকার!" বলে ছোট্কা পিকলুর হাত ধরে গটগট করে সিঁড়ি বেয়ে ছাতে চলে গেল।

ছবি দেবাশিস দেব
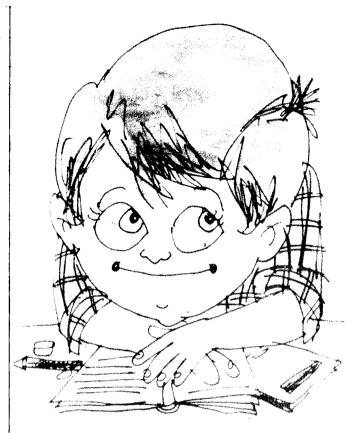
তোতনের বৃষ্টি

শিবশম্ভু পাল

রেলকম ঝমাঝম বৃষ্টিতে
তোতনের মন নেই হিস্ট্রিতে।

তোতন, কোথায় যাবি, কার কাছে?
একটু দূরেই টালাপার্ক আছে
পার্কে সমুদ্দুর দূরব্যাপী—
তোতন আঁতকে ওঠে ঃ জ্যোগ্রাফি

চেয়ে দ্যাখ ওই বাঁকা বিদ্যুৎ
কালিদাস লিখেছেন মেঘদূত,
'কালিদাস'-এ হ্রস্ব-ই, দীর্ঘ না—
'আজ আর ব্যাকরণ শিখব না,'
এই বলে তোতনের ওঠে হাই।

আকাশের সারা গায়ে মাখা ছাই।
ছাইগুলো আসে বল কোত্থেকে?
'বিজ্ঞান, জানে এটা প্রত্যেকে।
বাকি থাকে অঙ্ক ও ইংলিশ
দুটোতেই পাই উনচল্লিশ।'

তোতনের চোখ দুটো ছলছল
খিচুড়ির টগবগ, জিভে জল।

ছবি দেবাশিস দেব

অন্যরকম সুখ

সমরেশ মজুমদার

মনে মনে ছবি এঁকে চুপচাপ সেই ছবি দেখতে অয়নের ভীষণ ভাল লাগে। একটু সময় পেলেই, এই যেমন স্কুলে যেতে যেতে অথবা রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে যতক্ষণ ঘুম না আসছে ততক্ষণ ওই ছবিগুলোর মধ্যে বুঁদ হয়ে ডুবে থাকতে ইচ্ছে করে। কেউ সঙ্গে থাকলে অথবা কোনো শব্দ-টব্দ হলে মনের পর্দায় ছবিগুলো কিছুতেই ফুটতে চায় না। প্রথম-প্রথম চোখ বন্ধ করে কল্পনা করতে হত, এখন চোখ খুলে রাখলেও অসুবিধে হয় না। তবে সেই মুহূর্তগুলোয় আশেপাশের পৃথিবীটা কেমন মুছে মুছে যায় ওর কাছে। পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও চেনা মানুষ অচেনা হয়ে যায়।

ওদের স্কুলের বাংলার টীচার প্রশান্তবাবুর গল্প শুনে এইটে শুরু হয়েছিল। প্রশান্তবাবু দারুণ গল্প বলেন। সেসব গল্পে যদিও কিছু অবিশ্বাস্য ঘটনা থাকে, তবু ওঁর মুখ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কেউ নড়াচড়া করতে পারে না। একদিন প্রশান্তবাবু গল্প করছিলেন যে, তিনি একবার জাহাজে করে আদ্দিস আবাবা যাচ্ছিলেন। সারাদিন ঝোড়ো বাতাস আর প্রবল ঢেউয়ের সঙ্গে লড়ে জাহাজটা প্রায় কাহিল। বিকেলে সমুদ্র শান্ত হলে প্রশান্ত-বাবু ডেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন সামনে আদিগন্ত নীল জলরাশি যেন আকাশ থেকে নেমে এসেছে সরাসরি। আর তার সঙ্গমের জায়গাটায় লাল টকটকে সূর্য হাবুডুবু খাচ্ছে। ওখানে জলের রঙ আর আকাশের চেহারা অন্য জায়গা থেকে আলাদা। পৃথিবীতে এত সুন্দর দৃশ্য কোনো অদৃশ্যশিল্পী অবলীলায় এঁকে যান, যা একবার দেখতে পেলে মনে হয় জীবন ধন্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই প্রশান্তবাবুর মনে হল আকাশের এই প্রান্তে যখন এরকম রঙের খেলা চলছে তখন অন্য প্রান্তের অবস্থা কেমন? তিনি ডেক ঘুরে ওপাশে গিয়ে চমকে উঠলেন। আরে, এদিকের আকাশের শেষ সীমায় যে লাল রঙের ছড়াছড়ি। এ কী করে সম্ভব। একই সঙ্গে দুই আকাশে কি সূর্য অস্ত যায়? তবে এদিকের লাল রঙটা কেমন নিষ্প্রভ, ঝাপসা-ঝাপসা। এই সময় জাহাজের ক্যাপ্টেন পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন. প্রশান্তবাবু তাঁকে ডেকে ব্যাপারটা বলতে তিনি করুণ মুখে জানালেন. "ভেরি স্যাড, আমরা এই মাত্র খবর পেলাম বে অব বেঙ্গলে একটা জাহাজে খুব জোর আগুন লেগেছে. ওটা তারই আলো।" আর তখনই প্রশান্তবাবুর নজরে পড়ল সমুদ্রের জলের ওপর তেলের পাতলা আবরণ। বোধহয় ওই জ্বলন্ত জাহাজের তেল। অশান্ত সমুদ্রের ওপর তেল পড়ায় এখন ওদের জাহাজ নিশ্চিন্তে. চলছে। সমুদ্রের ওপর কোনো গাছপালা, পাহাড় কিংবা দেওয়াল না থাকায় ভারত-মহাসাগরে বসে বঙ্গোপসাগরের আগুন নাকি পরিষ্কার দেখা গিয়েছিল।

গল্পটা শোনার পর থেকেই মাথার ভেতরে একরাশ নীল জল, যার কোনো সীমা নেই, টলটল করতে লাগল। আর তারপরেই সে ছবিটা এঁকে ফেলল মনে মনে। একটা ছোট পালতোলা নৌকোয় সে একা ভেসে যাচ্ছে সমুদ্রের বুকে, মাছেরা এসে তার নৌকো ছুঁয়ে খেলা করে যাচ্ছে, দূরে একটা তিমিমাছ জল ছুঁড়ে ফাজলামি করছে ওর নৌকোর সঙ্গে। আর আকাশের সূর্যটা যেন পশ্চিমদিকে ঢলে পড়ে দাউ-দাউ করে জ্বলছে। ঠিক মায়ের

দূরের টিপের মতো লাল রঙ ফিনকি দিয়ে বেরুচ্ছে তা থেকে। সে, যেই একবার ছবিটা তৈরি হয়ে গেল, অয়ন একা হয়ে গেলেই সেই নৌকোর পালে হাওয়া লাগে।

দ্বিতীয় গল্পটা প্রশান্তবাবুরই। একবার গোবি মরুভূমিতে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। চারধারে শুধু খাঁ-খাঁ বালি, মাথার ওপর গনগনে সূর্য, কোথাও কোনো সবুজ তো দূরের কথা একটা প্রাণের চিহ্ন নেই। যে দলটার সঙ্গে তিনি ছিলেন তারা ওঁকে এমনভাবে ফেলে যাবে, কখনো চিন্তাও করেননি। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ, ভাল করে হাঁটতেও পারছেন না। উদ্‌ভ্রান্তের মতো খানিকটা এগোতেই তিনি পড়ে গেলেন। বালির ওপর মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে যে শরীরটা পড়ে ছিল সেটা খেয়াল আছে। তারপর যখন জ্ঞান ফিরল তাঁর, তখন দেখলেন অদ্ভুত দৃশ্য। কোথায় সেই আগুনঝরানো সূর্যটা নেই, মরুভূমিতে অদ্ভুত জ্যোৎস্না নেমেছে দুধের সরের মতো। কিন্তু তাঁর শরীরটা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, সামনে গোটা দশেক তাঁবু পড়েছে, তাঁবুগুলোর সামনে একটা জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে তাতে ভেড়ার মাংস সেঁকা হচ্ছে। তার নরম গন্ধে নাক জুড়িয়ে গেলেও বাঁধনটার অর্থ প্রশান্তবাবু কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না। আগুনটা ঘিরে জনা চল্লিশেক বেদুইন নারী-পুরুষ বিভিন্ন রকম বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বিশ্রী আওয়াজ করছে। দুপুরে যে জায়গাটা ছিল শ্মশানের মতো ভয়ংকর, এখন এই রাত্রে সেই জায়গাই স্বর্গের মতো সুন্দর। কিন্তু একটু বাদেই সেটা আর স্বর্গ থাকল না প্রশান্তবাবুর কাছে। বেদুইনদের সর্দার তাঁর জ্ঞান হয়েছে দেখে এগিয়ে এসে একহাতে অবলীলায় তাঁকে ওপরে তুলে আগুনের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। দড়িটা এত শক্ত করে বাঁধা যে, একটুও নড়তে পারছেন না প্রশান্তবাবু। ওঁকে নিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুত উল্লাস উঠল সমবেত জনতার মধ্যে। তখনি তাঁর মনে পড়ল যে, মরুভূমিতে একদল নৃশংস যাযাবর থাকে যাদের মনে দয়া মায়া বলতে কিছু নেই। এরা অজানা মানুষ দেখলেই পুড়িয়ে আনন্দ পায়। এরকম একটা দলের খপ্পরে পড়েছেন তিনি।

একটা লোক এসে ওঁর পাঞ্জাবি ধুতি আর পাম্পশুটা হাত দিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। এরকম পোশাক জীবনে দেখেনি বোঝা যাচ্ছে। মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী তখন আর ভয় পেয়ে কী হবে। যদিও কয়েকটা উপজাতিদের ভাষা তাঁর জানা আছে, কিন্তু এরা যে ভাষায় কথা বলছে তার একবর্ণ তিনি বুঝতে পারছেন না। কাউকে পোড়াবার আগে বোধহয় ওরা গান গায়। সেটা এত কান-ফাটানো যে, প্রশান্তবাবু মরবার আগে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় গানটা গাইতে লাগলেন গলা খুলে। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল আশেপাশের সব শব্দ থেমে গেছে, চোখ খুলে দেখলেন সবাই ওঁর সামনে এসে জড়ো হয়ে মুগ্ধ চোখে গান শুনছে। তিনি একটু হতভম্ব হয়ে গান থামাতেই সর্দার ধমকে উঠল এবং ভঙ্গিতে বোঝাল গান গাইতে হবে। প্রশান্তবাবু আবার গান শুরু করতেই টুংটাং বাজনা বাজতে লাগল আর তারপরেই সেই কাণ্ডটা ঘটল। অতগুলো হেঁড়ে আর [illegible] গলা ওঁকে অনুসরণ করে গানটা গাইবার চেষ্টা করছে। সে যে কী বিকট অথচ কী সুন্দর। একজন দৌড়ে এসে তাঁর বাঁধন খুলে দিল। ব্যস, তারপরে প্রশান্তবাবুর কী খাতির, মাথায় করে রাখল ওরা, রাজার মতো পৌঁছে দিয়ে গেল গন্তব্যস্থলে।

শুধু সারাটা পথ ওদের গানটা শেখাতে হয়েছিল। গল্পটা শুনে ক্লাসের সবাই খুব ধরল ওই গানটা একবার শোনাতে। প্রশান্তবাবু বললেন, "আমি যে বেদুইনদের কথা দিয়ে এসেছি আর কাউকে ওই গান শোনাব না। তবে গানটা তোমরা জানো। রবীন্দ্রসঙ্গীত, আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। রবীন্দ্রনাথ সেদিন আমার প্রাণ বাঁচিয়ে দিলেন।"

গল্পটা দু-তিন দিন মনের ভেতর পাক খেল। আর তারপরই প্রথম কল্পনাটার পাশাপাশি আর-একটা ছবি তৈরি হয়ে গেল। আদিগন্ত বালি আর বালি, মাঝে-মাঝে ঝড়ে চারপাশ অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। খুব কুচকুচে কালো একটা উটে চেপে অয়ন সেই মরুভূমি পার হচ্ছে, তার গায়ে বেদুইনদের পোশাক, মুখে রবীন্দ্রনাথের গান। ওই বালির ঝড়টা এলেই উত্তেজনা বেড়ে যায়, উট টগবগিয়ে ছোটে।

এসব ব্যাপার কাউকে বলা যায় না। এমনকী খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও না। ইদানীং বাড়ির সবাই বলাবলি করছে অয়ন নাকি খুব গম্ভীর হয়ে গেছে, কী সব ভাবে। কেউ-কেউ জিজ্ঞাসাও করেছে, কিন্তু অয়ন কাউকে বলতে পারেনি। বললে যদি ছবিগুলো হঠাৎ হারিয়ে যায়।

এই সময় একদিন দুপুরে হঠাৎ স্কুল ছুটি হয়ে গেল আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে। এফ ডি আই বনাম জেলা স্কুলের ফুটবল ম্যাচ টাউন ক্লাবের মাঠে। ওদের ক্লাসের সবাই ছুটেছে সেখানে। অয়ন চুপচাপ একা তিস্তার দিকটায় চ'লে এল। তিস্তার গায়ে এখন বিরাট শক্ত বাঁধ। সেই বাঁধের ওপর দিয়ে গেলে ওদের বাড়ি কয়েক মিনিটের পথ। আজ বাঁধের ওপর আসতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। দু মাইল চওড়া নদীর ওপর থরে-থরে সাজানো কালো মেঘের দল। এদিকটায় বালির চর খটখটে হয়ে পড়ে আছে। নদীর ধারা এখন ওপারে বার্নিসের দিকে। সম্মোহিতের মতো অয়ন বইয়ের ব্যাগ পিঠে নিয়ে বালির চরে নেমে এল। খানিক আগেও রোদ ছিল, তাই বালি তেতে রয়েছে। কিছুদূর যেতেই ঝড় উঠল। শনশনে হাওয়া পাক খেয়ে যাচ্ছে, হাঁটা মুশকিল। তারপরেই বুকের ভেতর ধক করে উঠল ওর। জোরালো বাতাস শুকনো বালি তুলে নিয়ে চারপাশ অন্ধকার করে দিল। আশেপাশে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঠিক সেই মরুভূমির ছবিটার মতো। চোখের সামনে মনের ছবিটাকে দেখতে পেয়ে হকচকিয়ে গেল অয়ন। চোখ চাওয়া যাচ্ছে না বালির ঝাপটায়। প্রাণপণে দৌড়তে লাগল সে বাঁধের দিকে। পায়ের জুতো বালিতে বসে যাচ্ছে, মুখে চাবুকের মতো হাওয়া লাগছে। অয়নের মনে হল সে উটের পিঠে ছুটে যাচ্ছে। আর তখনি খেয়াল হল, এসব জায়গায় অনেক সময় শুকনো চোরাবালি থাকে, ওপরটা দেখে টের পাওয়া যায় না, পা পড়লেই পাতালে চলে যেতে হবে। বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে কেউ তাকে দেখতেও পাবে না, সে যদি মরে যায়! কিন্তু এত দৌড়েও পথটা ফুরোচ্ছে না কেন? সে মাত্র মিনিট আটেক হেঁটেছিল বালিতে, এত দৌড়লে অনেক আগেই বাঁধের কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা। হঠাৎ অয়নের পা কিছুতে আটকে যেতে সে আর ব্যালেন্স রাখতে পারল না। দড়াম করে আছাড় খেল বালিতে। মুখ গুঁজে পড়ে গেল সে। অকস্মাৎ ঘটে যাওয়ায় ওর সমস্ত শরীর স্থির হয়ে গেল, সেইভাবেই পড়ে রইল অয়ন। ওর মনে হচ্ছিল এইবার সে শেষ হয়ে যাবে, আর কখনো মায়ের মুখ দেখতে পাবে না। কিংবা এরকম তো হতে পারে এইসব চরে এমন কোনো যাযাবর দস্যু ঘুরে বেড়ায় যাদের কথা শহরের লোক জানে না, তারা ওকে বেঁধে নিয়ে যেতে পারে। এরা কি রবীন্দ্রনাথের গান শুনে মুগ্ধ হবে? অয়ন ঠিক ভরসা পাচ্ছিল না।

একটু বাদে অয়নের মনে হল হাওয়াটা যেন আচমকা থেমে গেছে। যেন কেউ সুইচ টিপে পাখা বন্ধ করল। কোনোরকমে উঠে বসে সে দেখল অনেক দূরে একটা রেখার মতো আকাশের শেষপ্রান্তে বাঁধটাকে দেখা যাচ্ছে। মাঝখানের বালির চর এখন স্থির, তবে অদ্ভুত ঢেউ খেলানো হয়ে গিয়েছে। জোলো গন্ধ ভেসে আসতেই সে উঠে কয়েক পা এগিয়ে নদীটাকে দেখতে পেল। অর্থাৎ ঝড়ের মধ্যে বাঁধের দিকে যাচ্ছে ভেবে [illegible] একদম উলটো দিকে চলে এসেছে।

নদীর দিকে তাকিয়ে অয়ন মুগ্ধ হয়ে দাঁড়াল। ওপারে তীর

রাত ঘুটঘুট

আশা দেবী

রাত ঘুটঘুট
ক'রে খুট খুট
খায় চিড়ে বুট
ধেড়ে ইন্দুর
যেই করি তাড়া
বলি, ''হবি সারা''
সেই তেড়ে ছুট
দেয় দুড় দুড়।
সব দেখে মামা
বলে, ''চুরি থামা
ডাকু হায় তুম
আভি সরে পড়।''
সেই শুনে ধেড়ে
বলে গোঁফ নেড়ে,
''শুনে হেসে মরি
ভাষাটা জবর ॥''

দেখা যাচ্ছে কিনা বোঝা যায় না। বিরাট নদীর বুকে বিশাল ঢেউয়েরা টালমাটাল হচ্ছে। ঘোলা জলের দিকে তাকালে বুক হিম হয়ে যায়। পায়ে-পায়ে সে জলের কাছে এসে দাঁড়াল। কিছু চুনো মাছ খেলা করছে ওখানে। মাথার ওপর জমে থাকা মেঘেরা এখন কেমন পাতলা হয়ে গেছে, বোধহয় ঝড় এসে ওদের ছত্রভঙ্গ করে গেছে। এই সময় অয়ন সেই লোকটাকে দেখতে পেল। পাশে একটা কাশবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে করুণ চোখে ওপারে তাকিয়ে আছে। আর আশ্চর্য, লোকটার সামনে কাশবনের আড়ালে একটা ছোট ডিঙি নৌকো বাঁধা, তাতে টুকিটাকি জিনিসপত্র।

লোকটা ওকে দেখে দাঁত বের করে হাসতেই অয়ন চমকে উঠল। এরকম ক্ষতবিক্ষত মানুষ সে কখনো দেখেনি। লোকটার আঙুলগুলো আস্ত নেই, ঠোঁটের অনেকটা ছিন্ন, কান ফোলা। তবু সে সাহস করে বলল, "তুমি এখানে কী করছ?"

লোকটা জবাব দিল, "আর কী করব বাবু, ভগবানকে ডাকছি। তিনি ইচ্ছে করলে ঢেউ কমিয়ে দিতে পারেন, আমার ওই পারে যাওয়ার খুব দরকার।"

"কেন?"

"আমার ছেলের বড় অসুখ বাবু, তার জন্যে ওষুধ আনলাম হাসপাতাল থেকে।" হাতে ঝোলানো নীল 'মিকচারের' শিশি দেখাল লোকটা।

"ওপারে যাবে তো এখানে দাঁড়িয়ে কেন, কিংসাহেবের ঘাটে চলে যাও। সেখান থেকে তো ফেরি নৌকো ছাড়ে।" অয়ন জানাল।

"ওরা পয়সা না দিলে পার করে না বাবু, আমার তো পয়সা নেই, তাই এই ডিঙিতে পার হই। এখন যদি ভগবান একটু সন্তুষ্ট হন, একা যেতে ভয় লাগে।" লোকটা নদীর দিকে আবার তাকাল। অয়নের খুব দুঃখ হল। ওর কাছে আজকে একটা পয়সাও নেই, থাকলে সে লোকটাকে দিয়ে দিত। ছেলের অসুখ, অথচ বেচারা যেতে পারছে না। হঠাৎ ওর মনে হল আজ টিফিন খাওয়া হয়নি। মা বাক্সে একগাদা ফল কেটে দিয়েছিলেন। ও চটপট সেগুলো বের করে লোকটাকে দিয়ে দিল, "তুমি এগুলো নাও, তোমার ছেলেকে দিও, তার খেতে ভাল লাগবে।"

লোকটা অবাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কেমন গলায় বলল, "আপনার পুণ্য হোক বাবু, রাজা হোন আপনি।"

একটু বাদেই নদী স্থির হতে শুরু হল। ঢেউ আছে তবে তার তেজ কম। অনেক কষ্টে লোকটা চার-আঙুল হাতেই ডিঙিতে উঠে লগি ঠেলল। স্রোতে পড়ার আগে সে একবার অয়নের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। তারপর তার নৌকোটা তর-তর করে ছুটে গেল মাঝ-নদীতে। স্রোত তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বার্নিসের দিকে।

অপলক চোখে সেই দৃশ্যটা দেখল অয়ন। আদিগন্তবিস্তৃত জলরাশির মধ্যে নৌকো করে ভেসে বেড়াচ্ছে লোকটা। যদিও এখন সূর্য মেঘের আড়ালে ঢাকা, তবু আকাশ কত সুন্দর।

বাড়ি ফেরার পথে বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে নিজের অজান্তে অয়ন আর-একটা ছবি এঁকে ফেলল মনে মনে। একটি রুগ্ণ জ্বরো মুখে টুকরো-টুকরো আপেল খাইয়ে দিচ্ছে ওই লোকটা। পরম তৃপ্তিতে ছেলেটার চোখ বোঁজা। তার বাবা বলছে, ''ভাল হয়ে যাবি খোকা, ভাল হয়ে দেখবি পৃথিবীতে কারো-কারো মন খুব ভাল।''

মরুভূমি কিংবা সমুদ্রের ছবি কল্পনা করে যা হয়নি এই ছবিটা মনজুড়ে বসতেই খোলা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল অয়ন। অথচ তার বুকে কোনো কষ্ট নেই, বরং অদ্ভুত সুখের অনুভূতি ছড়ানো।

খুব গভীর আনন্দে কেন কান্না আসে?

গোয়েন্দার চোখ

শেখর বসু

অনি ছোটমামার দারুণ ভক্ত। ছোটমামা ভক্ত গোয়েন্দা-গল্পের। দেখা হলেই ছোটমামা অনিকে মারাত্মক সব গল্প শোনায়। গল্প শুনতে-শুনতে অনির গায়ে কাঁটা দেয়, বুকের মধ্যে ধুপ্‌ধুপ করে, আবার অদ্ভুত একটা মজাও পায়। সব গল্পের শেষে খুনি ধরা পড়ে, সমস্ত রহস্যের কিনারা হয়। তবে এমনি-এমনি হয় না, পুরো কৃতিত্ব গোয়েন্দার। যত বড় অপরাধীই হোক না কেন, ঝানু গোয়েন্দার কাছে সবাই কেঁচো।

সেদিন একটা রোমাঞ্চকর গল্প শোনাবার পরে ছোটমামা অনিকে বলল, "আমি ঠিক করে ফেলেছি রে, বড় হয়ে গোয়েন্দাই হব।"

শুনে গা শিরশির করে উঠল অনির।

ছোটমামা গম্ভীরভাবে বলল, "গোয়েন্দা হলে সবসময় ভয়ংকর সব ব্যাপারের মধ্যে থাকা যায়। অপরাধী ধরে দেশের উপকার করা যায়। আর সবচাইতে বড় কথা হল, গোয়েন্দা হলে মরার ভয় থাকে না একটুও। খুনিরা গোয়েন্দাকে খুন করার কত চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই পেরে ওঠে না।"

কথাগুলো শুনতে শুনতে অনি অনেককিছু ভেবে ফেলল। ছোটমামা বড় হয়ে বিরাট গোয়েন্দা হয়েছে। ওর চারপাশে সব-সময় রহস্য-রোমাঞ্চ। খুনিরা ওকে ভয় করে যমের মতো। কিন্তু প্রত্যেক বড় গোয়েন্দারই তো একজন করে সহকারী থাকে। ছোট-মামার অ্যাসিসট্যান্ট কে হবে?

অনি একটু আদুরে গলায় বলল, "ছোটমামা, আমাকে তোমার অ্যাসিসট্যান্ট করে নাও।"

ছোটমামা অনির কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলল, "গোয়েন্দার অ্যাসিসট্যান্ট হওয়া কি অত সোজা! অ্যাসিসট্যান্টকেও অনেক-খানি গোয়েন্দা হতে হয়।"

"আমিও অনেকখানি গোয়েন্দা হব ছোটমামা।"

ছোটমামা এবারও পাত্তা দিল না অনিকে। "গোয়েন্দা হওয়া কি চাট্টিখানি কথা। একজন ভাল গোয়েন্দা হতে গেলে অনেক গুণ থাকা দরকার। প্রথমেই দরকার প্রচণ্ড বুদ্ধির। তোর আছে?"

উত্তরে অনি করুণ মুখ করে তাকাল।

একটু থেমে ছোটমামা আবার বলতে শুরু করল, "শুধু বুদ্ধি থাকলেই হবে না, অসম্ভব গায়ের জোরও থাকা দরকার। যুযুৎসু আর বক্সিংয়ে চ্যাম্পিয়ন হতে হবে। পিস্তলে হাত এমন পাকা করতে হবে যাতে একটা গুলিও ফসকে না যায়। ফোরেনসিক পরীক্ষার সমস্ত খুঁটিনাটি জানতে হবে। জানতে হবে কাকে বলে মাইক্রোফিল্‌ম, কাকে বলে আলট্রা ভায়োলেট রে, কাকে বলে অটোপসি, ডিকম্পোজড বডি শনাক্ত করার কৌশল শিখতে হবে—সে-সব অনেক কঠিন ব্যাপার। পারবি?"

অনির মুখ এবার কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠল।

তাই দেখে ছোটমামার দয়া হল একটু। বলল, "ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখ। তবে, খাটতে হবে খুব। স্কুলে যেমন শেখায় ঠিক সেইভাবে তোকে আমি শেখাব। মন দিয়ে শিখবি তো?"

অনির মুখ এবার হাসি-হাসি হয়ে উঠেছে। ও মাথাটা একপাশে অনেকখানি কাত করে বলল, "হ্যাঁ।"

ছোটমামা মুখটা ঠিক বড়দের মতো করে বলল, "আজকেই তোকে ফার্স্ট লেসন্‌ দিচ্ছি। তোর প্রথম কাজই হবে, পাওয়ার অব অবজারভেশন বাড়ানো।"

"সেটা আবার কী?"

"অবজারভেশন হল পর্যবেক্ষণ।"

"পর্যবেক্ষণের বাংলা কী?"

"দূর বোকা, পর্যবেক্ষণ তো বাংলা শব্দই। আসলে তোকে দেখার চোখ তৈরি করতে হবে। কবিতায় আছে না—যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পারো অমূল্য-রতন। আমার মনে হয়, কথাটা আসলে গোয়েন্দাদের উদ্দেশে বলা। অনেক সময় একটুখানি ছাই, এককুচি ধুলো থেকে আস্ত একটা রহস্যের কিনারা হয়ে যায়। তুই এবার থেকে ছোটখাট সবকিছু খুঁটিয়ে লক্ষ করবি। ফাইন্ডিং, মানে ওইসব থেকে যা পাবি, আমাকে রিপোর্ট করবি। ব্যস, আজকের পড়া এই পর্যন্তই।"

ছোটমামা চলে যাওয়ার পর থেকেই অনি চোখ বড়-বড় করে চারদিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু নতুন কিছু চোখে পড়ল না ওর। পড়ল পরদিন সকালেই। ঘুম থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল, বারান্দার এককোণে লালচে রঙের খুব সরু একটা ফিতে পড়ে আছে। ফিতে থেকে চোখ সরে যাওয়ার মুখেই ছোটমামার উপদেশ মনে পড়ে গেল অনির। দেখার চোখ তৈরি করতে হবে. ছোটখাট সবকিছু দেখতে হবে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে, তারপর...

অনি সরু ফিতেটা হাতে তুলে নিল। কোত্থেকে এল এটা?

একটু মাথা খাটাতেই ধরতে পারল, মিষ্টির প্যাকেটে এই ধরনের ফিতে বাঁধা থাকে। কিন্তু, মিষ্টির প্যাকেট বাঁধার ফিতে বারান্দায় এল কীভাবে!

ফিতে থাকলে মিষ্টির প্যাকেটও থাকবে। তবে, আজ সাত-দশদিনের মধ্যে মিষ্টির প্যাকেট তো এ-বাড়িতে ঢোকেনি। তাহলে কি এই ফিতেটা আরও আগে আনা কোনো মিষ্টির প্যাকেটের

মধুস্প্রে-কে ধন্যবাদ !

তার জন্যেই তো আমি কেমন বীরপুরুষ আর এমন ফুর্তিবাজ !

মায়ের সতর্ক যত্ন আর সজাগ স্নেহ মিশে তৈরি হল শিশুদের এই দুগ্ধাহার— মধুস্প্রে! সুষম, ভিটামিনে ভরপুর, সহজপাচ্য। দুধের যাবতীয় গুণের খুঁটিনাটি পরীক্ষার পর অতীব স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত। সুতরাং এতে অবাক হবার কিছুই নেই যে আপনার বাচ্চাটি মধুস্প্রে দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে... ভালবাসবে শুধু, মধুস্প্রেকেই !

জননীর স্নেহ আর পুষ্টির উপাদান মিশ্রিত রয়েছে মধুস্প্রে-র প্রতিটি কৌটোয়।

হরিয়ানা মিল্কফুডসের এক উত্তম উৎপাদন

IPB 2280

গায়ে জড়ানো ছিল? হতে পারে।

ফিতেটা হয়তো অনেকদিন পড়ে ছিল খাটের তলায়, আজ সকালে ঘর ঝাঁট দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে বারান্দায়। কিন্তু, খাটের তলায় পড়ে থাকলে ফিতের গায়ে ধুলো কিংবা সামান্য ঝুল-কালি জমে যেত না? তা তো হয়নি। দিব্যি চকচকে ফিতে। এ ফিতে নির্ঘাত আজ-কালের মধ্যে এ-বাড়িতে এসেছে। এমনি-এমনি অবশ্য আসেনি, এসেছে মিষ্টির প্যাকেটের গা জড়িয়ে।

অনি চমকে উঠল, একেই কি বলে 'ফাইন্ডিং'! সামান্য এক টুকরো ফিতে থেকে এক-এক করে কত কিছু জানা যাচ্ছে। আরও ভালভাবে দেখলে হয়ত আরও জানা যাবে। একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস থাকলে বেশ হত। গোয়েন্দারা এই ধরনের ছোটখাট সূত্র ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়েই তো পরীক্ষা করে থাকে।

অনিদের বাড়িতে আতস কাচ নেই, কিন্তু আতস কাচের সমস্যা মেটাল বাবার বই-পড়ার চশমা। এই চশমায় ছোট জিনিস বড় দেখায়। অনি বাবার চশমাটা পকেটে নিয়ে চলে গেল কোণের ঘরে। চশমার কাচ ফিতের ওপর ধরতেই সরু ফিতে বেশ চওড়া হয়ে গেল। কিন্তু খালি চোখে ও যা দেখেছিল, তার বাইরে আর কিছুই দেখতে পেল না। ফিতের ওপর দূরে দূরে কয়েকটা ইংরেজি হরফ ছাপানো।

বেশ কিছুক্ষণ পরীক্ষা চালাবার পরে অনি হতাশ হয়ে চশমাটা নামিয়ে রাখার মুখে দেখল, একটা হরফ কেমন যেন জড়িয়ে গেছে। সমান করতে গিয়ে দেখল, ফিতের ওই জায়গাটা কড়কড়ে। কড়কড়ে কেন?

নিশ্চয়ই এটা মিষ্টির রস। তার মানে এই ফিতেটা যে-প্যাকেটে বাঁধা ছিল সেই প্যাকেটে রসের মিষ্টি এসেছে। অনি আবিষ্কারের উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। এবার মিষ্টির প্যাকেটটা খুঁজে বার করতে হবে।

ও কাল রাতে খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাবা বাড়ি ফিরেছেন তার পরে। বাবা নিশ্চয়ই সঙ্গে করে মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে এসেছেন।

নিশ্চিন্তে অনুসন্ধান চালানো বেশ কঠিন। মা, ছোট বোন তিতলি আর কাজের লোক এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু হাল ছাড়লে চলবে না। ফাঁক বুঝে অনি প্রথমেই ফ্রিজ খুলল। ফ্রিজে আর সব আছে, শুধু মিষ্টির প্যাকেট নেই।

তাহলে?

কিছুক্ষণ পরে ও প্রত্যেকের চোখে ধুলো দিয়ে রান্নাঘরের তারের আলমারিটা খুলল। মা এই আলমারিতে মিষ্টিটিষ্টি রাখেন অনেক সময়, কিন্তু এখানেও মিষ্টির প্যাকেট নেই। নেই রান্নাঘরের তাকেও। মাঝেমধ্যে মিষ্টির প্যাকেট সোজাসুজি ঠাকুরঘরে চলে যায়, কিন্তু ঠাকুরঘরে কয়েকটা বাতাসা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না অনির।

মিনিট পঁয়তাল্লিশ ধরে অনুসন্ধান চালাল ও। কিন্তু চারটে ঘরের কোথাও মিষ্টির প্যাকেটের হদিস মিলল না। মন খারাপ হয়ে গেল অনির। তাহলে কি ওর পর্যবেক্ষণে কোনো ভুল ছিল?

আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, বাবা-মা রাত্তিরেই সব মিষ্টি খেয়ে ফেলেছেন! অবশ্য ওদের না দিয়ে ওঁরা কক্ষনো কিছু খান না। কিন্তু ঠাকুমা প্রায়ই বলেন না, 'মানুষের মন বলে কথা!' বাবা-মায়ের সেইরকম 'মানুষের মন' যদি হয়ে থাকে কাল রাত্তিরে। অনি একছুট্টে বাথরুমের পাশের টিনের ড্রামটা দেখে এল। ড্রামে আবর্জনা ফেলা হয়, কিন্তু আবর্জনার মধ্যে কোনো মিষ্টির প্যাকেট চোখে পড়ল না ওর।

এবার?

শোবার ঘরে একটা চেয়ারের ওপর বসে পুরো ব্যাপারটা আবার গোড়া থেকে ভাবতে শুরু করল অনি। নিশ্চয়ই কোথাও একটা ভুল থেকে গেছে। নাকি মূল সূত্রেই গোলমাল! এমনও তো হতে পারে, অন্য কোনো বাড়ি থেকে কাকের মুখে ফিতেটা এসেছে এ-বাড়ির বারান্দায়!

আরও কী যেন ভাবতে যাচ্ছিল অনি, এমন সময় ওর চোখে পড়ল, একটা পিঁপড়ের সারি মেঝে থেকে দেয়াল বেয়ে স্টীলের আলমারির মাথায় উঠে যাচ্ছে। খুবই সাধারণ দৃশ্য, কিন্তু ছোটমামার উপদেশ ওর মনে পড়ে গেল আবার। যতই তুচ্ছ জিনিস হোক না কেন, কোনো কিছুকেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে নেই।

সত্যিই তো, পিঁপড়েগুলো আলমারির মাথায় উঠছে কেন? ওখানে কি কোনো খাবার-দাবার আছে! কী খাবার? পিঁপড়েরা মিষ্টি খেতে ভালবাসে। ওর বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। মিষ্টির প্যাকেট কি আলমারির মাথায়!

অনি চেয়ারটা টেনে নিয়ে গেল আলমারির কাছে। কিন্তু নিচু চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে সাড়ে ছ'ফুট আলমারির মাথায় হাত পৌঁছল না ওর। চেয়ারের ওপর একটা ছোট্ট জলচৌকি এনে বসাল অনি। কিন্তু তাতেও কাজ হল না। তখন জলচৌকির ওপরে একটা গুঁড়ো দুধের টিন বসাল। টিনের ওপর খুব সাবধানে পা রেখে দাঁড়াল ও। ওই তো, ওই তো মিষ্টির প্যাকেট। রহস্য সমাধানের উত্তেজনায় প্যাকেটটা খামচে ধরল অনি। সঙ্গে সঙ্গে পা পিছলে গেল ওর।

চেয়ার, জলচৌকি, দুধের টিন আর অনি একসঙ্গে বিকট শব্দে আছড়ে পড়ল মেঝের ওপর। হাতে-ধরা মিষ্টির প্যাকেট থেকে সবকটা চমচম ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। মেঝে থেকে ওঠার আগেই ওই ঘরে ছুটে এল অনির মা, বাবা, তিতলি আর কাজের লোক।

তারপরের ঘটনা খুব করুণ।

অনির কানদুটো খুব শক্ত বলে কিছুতেই মায়ের হাতে উঠে এল না। সময়মতো কায়দা করে সরে গিয়েছিল বলে ওর পিঠটা ভাঙল না, তবে পিঠের ওপর মায়ের পাঁচ আঙুলের ছাপ পড়ে গেল স্পষ্ট।

মা চেঁচাতে-চেঁচাতে বলতে লাগলেন, "হতচ্ছাড়া ছেলে, তোর জন্যে একটা জিনিসও তুলে রাখা যাবে না। সবকিছু না চাইতেই পাস, তাও চুরি করা চাই। হ্যাংলা কোথাকার!"

কানের জ্বলুনি আর পিঠের ব্যথায় অনির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল টপটপ করে, কিন্তু 'হ্যাংলা' শব্দটা কানে যেতেই ওর আত্মসম্মানে লাগল। অনি কান্নাজড়ানো গলায় বলল "আমি চুরি করিনি, অবজারভেশন করছিলাম।"

"কী ভেশন্?"

অনি মায়ের প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। ওর হঠাৎ মনে হল, ও 'নীল ড্রাগন'দের খপ্পরে পড়ে গেছে। ঘরের মধ্যে মা, বাবা আর তিতলির বদলে দাঁড়িয়ে আছে নীল মুখোশ-পরা দস্যুরা।

বিকেলে ছোটমামা দুই বগলে দুটো ডিটেকটিভ বই নিয়ে এসে অনিকে জিজ্ঞেস করল, "কী রে তোর অবজারভেশন কদ্দুর বাড়ল? রিপোর্ট দে।"

অনি থমথমে মুখ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরে বলল, "যে গোয়েন্দা নিজের অ্যাসিসট্যাণ্টকে বাঁচাতে পারে না, আমি তার অ্যাসিসট্যাণ্টগিরি করতে চাই না।" বলেই ও ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ছোটমামা এই বয়েসেই কয়েকশো গোয়েন্দা-গল্প পড়ে ফেলেছে। যে-কারও একটা-দুটো কথা শুনে আর চলাফেরা দেখেই ধরে ফেলতে পারে, রহস্যটা কোথায়। কিন্তু অনির এই উদ্ভট ব্যবহারের রহস্য ছোটমামার কাছে রহস্যই থেকে গেল।

ছবি সুনীল শীল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দূরে এক টুকরো গাঢ় নীল রঙের মেঘ দেখে নী আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। হাততালি দিয়ে বলতে লাগল, "ঐ দ্যাখো, ঐ দ্যাখো, সত্যিকারের মেঘ! আমি কিন্তু আগে দেখেছি! ঐ মেঘটা আমার!"

রা বসে আছে ককপিটে। মেঘটা সেও দেখেছে। রা সেদিকেই তাকিয়ে ছিল। গত চার-পাঁচ দিন কোনো মেঘের চিহ্ন দেখা যায়নি। এই নীল রঙের মেঘটা কোথা থেকে এল কে জানে।

নী জিজ্ঞেস করল, "রা-দি, আমি কি এই মেঘটায় স্নান করতে পারি? বড্ড ইচ্ছে করছে।"

রা বলল, "আচ্ছা, করো। কিন্তু সেদিনকার মতন আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে পারবে না। আমরা পাঁচ পরা-মুহূর্তের বেশি খরচ করতে পারব না।"

রা রকেটের মুখ ঘোরাল।

রা-এর পুরো নাম রাভী। সবাই রা বলে ডাকে। যেমন নী-এর নাম নীলাঞ্জনা। তার কলেজের বন্ধুরা বলে নীলা, বাড়িতে ডাকনাম শুধু নী। নী-এর বয়েস চোদ্দ, এখন স্কুল শেষ হয়ে যায় দশ বছর বয়েসে, কলেজেও নী-র আর মাত্র একবছর বাকি।

নী সাঁতারের পোশাক পরে তৈরি হয়ে দরজার কাছে দাঁড়াল।
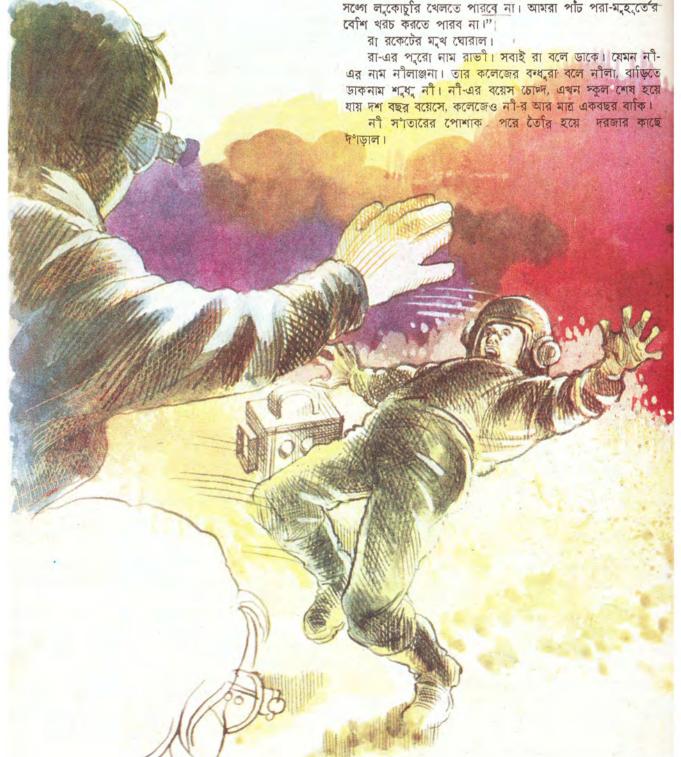
রা বলল, "দাঁড়াও, আগে ভাল করে দেখে নিই।"

রা রকেটটা নিয়ে মেঘটার চারপাশ একবার ঘুরে এল। সে দেখে নিতে চায়, এটা সত্যিই মেঘ না অভ্রলিকা। মহাশূন্যে দিনের পর দিন কোথাও মেঘ দেখা যায় না। কিন্তু মানুষের চোখ আকাশে মেঘ খোঁজে। তাই এক এক সময় চোখের ভুল হয়। ঠিক মরুভূমিতে মরীচিকা দেখার মতন আকাশেও নকল মেঘ দেখা যায়। এরই নাম দেওয়া হয়েছে অভ্রলিকা।

রা দেখে নিশ্চিন্ত হল। গাঢ় নীল রঙের বেশ ঘন মেঘ। এই রকম মেঘে স্নান করায় খুব সুবিধে। রা-রও খুব স্নান করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু দুজনের মধ্যে একজনকে থাকতেই হবে। নিয়ম হচ্ছে, যে আগে মেঘটা দেখবে, সেটা তার হবে। রা যদিও আগে দেখেছিল, কিন্তু সে-কথা বলল না। নী-টা ছেলেমানুষ, ও-ই করুক।

নী বলল, "যদি ঝিলমদা জেগে থাকত, খুব হিংসে করত আমায়।"

রা বলল, "নে, বেশি দেরি করিস না কিন্তু। ট্যাবলেট খেয়েছিস তো?"

নী বলল, "হ্যাঁ।"

রা দরজা খুলে দিতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল নী। দুহাত ছড়িয়ে পাখির মতন উড়তে-উড়তে ঢুকে গেল মেঘের মধ্যে। তারপর তাকে দেখতে পাওয়া গেল না।

এই মেঘের মধ্যে স্নান ভারী মজার। হালকা তুলো-তুলো মেঘগুলো গায়ে লাগলেই জলকণা হয়ে যায়। সাঁতার কাটলে সুড়ঙ্গ হয়ে যায় মেঘের মধ্যে, একটু পরেই বুজে যায় আবার।

রকেটের তলার দিকের ঘরে ঘুমোচ্ছে রাভীর স্বামী ঝিলম। ওদের দুজনেরই বয়স তেইশ বছর। মাত্র সাতমাস আগে বিয়ে হয়েছে ওদের, অর্থাৎ পৃথিবীর হিসেবে সাত মাস। এখানকার হিসেবে অন্যরকম। বিয়ের পরই ওরা এই রকেট নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছে। অবশ্য শুধু বেড়ানো নয়, একটা জিনিস আবিষ্কার করতে পারলে বিরাট পুরস্কার পাবার সম্ভাবনা আছে। পৃথিবী থেকে অনেকেই এখন মহাশূন্যে রকেট নিয়ে খোঁজাখুঁজি করছে।

অনেক বৈজ্ঞানিক একসঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে, সূর্যমণ্ডলের বাইরে কোথাও ঠিক পৃথিবীর মতন একটা গ্রহ আছে নিশ্চয়ই। সেখানে মানুষ আছে, আর তারা পৃথিবীর মানুষের মতনই হুবহু। সেই গ্রহটা এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। যে প্রথম সেই গ্রহের সন্ধান পাবে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ তাকে পুরস্কার দেবে। এখন পরমাণু রকেট বেরিয়ে যাবার ফলে সূর্যমণ্ডলের বাইরে ঘোরাঘুরি জলভাতের মতন সহজ।

রাভীর স্বামী ঝিলমের পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে ওদের এক বন্ধু ইউনুস। এই ইউনুস আগেও অনেক অভিযানে ঝিলমের সঙ্গে এসেছে। আর নীলাঞ্জনার এখন কলেজ ছুটি বলে ওকেও আনা হয়েছে সঙ্গে। ও খুব বেড়াতে ভালবাসে। নীলাঞ্জনার আর-একটা বড় পরিচয়, ও কবি।

মাঝখানে কবি খুব কমে গিয়েছিল। আজ থেকে সতেরো বছর আগে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আর আধুনিক শহর নাইরোবিতে বৈজ্ঞানিকরা এক সম্মেলনে বলেছিলেন, পৃথিবীতে যে

ছবি সমীর সরকার

হঠাৎ পাগলের সংখ্যা খুব বেড়ে যাচ্ছে তার কারণ এখন আর কেউ কবিতা লিখছে না। কোনো পত্রপত্রিকাতে আজকাল কবিতা ছাপা হয় না, দশ-বারো বছরের মধ্যে সারা পৃথিবীতে কোথাও একটাও কবিতার বই বেরোয়নি, এটা খুব খারাপ লক্ষণ। এক্ষুনি অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের কবিতা লেখার জন্য উৎসাহ দেওয়া উচিত। কবিতা লিখতে-লিখতে অনেকে আধ-পাগল হয়ে থাকবে, পুরো পাগল হবে না, সে বরং ভাল।

এখন আবার দু'চারজন কবিতা লিখতে শুরু করেছে। নীলাঞ্জনার একটা কবিতা রা-র খুব ভাল লাগে। সেটা হচ্ছে এইঃ

চাঁদের ও-পিঠে রাঙা-মাসিমার
মস্ত বাগান-বাড়ি,
লাল খরগোশ ঘাস ভেবে খায়
মেসোমশাইয়ের দাড়ি!

কবিতাটা মনে পড়লেই হাসি পায় রা-র। নীলাঞ্জনার মাসি আর মেসো সত্যিই চাঁদে এই কিছুদিন আগে বেশ বড় বাগানওয়ালা একটা বাড়ি বানিয়েছেন। নীলাঞ্জনার মেসো-মশাই নতুন-নতুন জন্তু-জানোয়ার বানান। আসার পথে রা দেখে এসেছে তাঁর বাগানে বেগুনি রঙের হরিণ, সবুজ ছাগল আর ঠিক বেড়ালের মতন ছোট-ছোট্ট সাদা ধপধপে হাতি। সেগুলো সত্যিকারের, জ্যান্ত।

আজ নীলাঞ্জনা মেঘে সাঁতার কাটতে গেছে। আজ নিশ্চয়ই ফিরে এসে মেঘ নিয়ে কোনো কবিতা লিখবে।

রকেটের ইঞ্জিনটা বন্ধ করে রা মাথা থেকে হেলমেটটা খুলে ফেলল। গুচ্ছ-গুচ্ছ চুল ছড়িয়ে পড়ল পিঠে। একটা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াতে লাগল। কতদিন রা স্নান করেনি। নী যদি একটু রকেট চালানো জানত, তা হলে নী ফিরে এলে ওকে কন্ট্রোল রুমে বসিয়ে রা এর পর সাঁতার কেটে আসত। ঝিলম আর ইউনুস ঘুমোচ্ছে, ওদের জাগাবারও কোনো উপায় নেই। আফ্রিকার সিয়েরা লিয়ন এখন মহাকাশচর্চার সবচেয়ে বড় জায়গা। সেখান থেকে রা রকেট-বিজ্ঞান শিখে এসেছে বলেই ওর হাতে রকেটের ভার দিয়ে ঝিলম আর ইউনুস নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছে।

দূরের আকাশে একটা কালো বিন্দু দেখে রা সেইদিকে চোখ রাখল। কোনো উল্কা হলে একটু ভয়ের কথা আছে। এদিককার মহাকাশের যে মানচিত্র আছে তাতে কিছুদিন আগে দু-একটা ভুল ধরা পড়েছে। সন্ধান মিলেছে অনেকগুলো উল্কা আর ভাঙা তারকার। রা একটা জুম টেলিস্কোপ তুলে নিয়ে দেখল। না, উল্কা নয়, আর-একটা রকেট। খুব সম্ভবত আমেরিকান রকেট। ওরা কি এই মেঘটাকে দেখতে পেয়েই আসছে? পরের মুহূর্তেই রা বুঝতে পারল, না, তা তো হতে পারে না। ওদের রকেটগুলো বড্ড পুরনো ধরনের, মহাশূন্যের মাঝখানে কোথাও স্থির হয়ে থেমে থাকার ক্ষমতা ওদের নেই।

রা মনে-মনে বলল, "আহা বেচারিরা!"

রা ইতিহাসে পড়েছে যে, অনেকদিন আগে আমেরিকান আর রাশিয়ানরা মহাকাশ-দৌড়ে খুব উন্নতি করেছিল। তারপর তাদের ছাড়িয়ে যায় চীন, তারপর ভারত। এখন তো আফ্রিকান-দের জয়জয়কার। ঐ কালো লোকদের যা বুদ্ধি, ওদের সঙ্গে কেউ পারে না। টাকাও ওদের বেশি। ঝিলমের গায়ের রং কুচকুচে কালো, ঠিক আফ্রিকানদের মতন, সেইজন্য পৃথিবীর কত মেয়ে ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল!

আমেরিকান রকেটটা শাঁ করে উড়ে বেরিয়ে গেল। নিশ্চয়ই ঐ রকেটের লোকরা মেঘের-পাশে-থেমে-থাকা রা-এর রকেট দেখে খুব হিংসে করছে!

কিছুই করবার নেই বলে রা একটা বই খুলে বসল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নামে কোনো এক লেখকের লেখা একটা উপন্যাস। এই লেখকের নাম এখনকার কেউ জানে না, এ সব বইও আজকাল কেউ পড়তে চায় না। পাওয়াও যায় না এ-ধরনের বই। এখনকার লেখকদের বই পাওয়া যায় ছোট্ট-ছোট্ট ক্যাসেটে, পড়তেও হয় না। যখন ইচ্ছে রেকর্ডার চালিয়ে দিলেই শুনে নেওয়া যায়।

রা ইতিহাস পড়তে ভালবাসে বলেই এরকম দু-চারখানা বই যোগাড় করেছে এক পুরনো জিনিসপত্রের দোকানে। বেশ মজা লাগে তার আগেকার যুগের এই সব গল্প পড়তে! মাত্র একশো বছর আগেকার কথা, তখন নাকি হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান-ইহুদি এই সব নানান ধর্ম আর জাত ছিল, তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াও করত। এদেশে-ওদেশে যুদ্ধ লাগত! সত্যি, মজার ব্যাপার, না? এ যুগের অনেক ছেলেমেয়ে এসব শুনলে বিশ্বাসই করতে পারবে না।

এখন কারুর নামে কোনো পদবি নেই, তাই কোনো জাতও নেই। সবাই মানুষ, এই শুধু পরিচয়। স্কুল-কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের শিখতে হয় মাত্র দুটো ভাষা। নিজের মাতৃভাষা আর এসপারান্টো। পৃথিবীর যে-কোনো লোক অন্য দেশে গিয়ে এসপারান্টো ভাষায় কথা বলতে পারে, সবাই বুঝবে। এই ভাষা শেখাও খুব সহজ। অবশ্য এই ভাষায় ইংরেজি শব্দ একটু বেশি, কিন্তু পৃথিবীর সব ভাষার শব্দই এর মধ্যে আছে। যেমন, আমি কবিতা লিখি, এর এসপারান্টো হচ্ছে, জ্য রাইট কবিতা!

যে-বইটা রা পড়ছে, তাতে এক জায়গায় আছে যে, একটা গরিবের ছেলের ওপর একজন বড়লোক খুব অত্যাচার করছে। পড়তে-পড়তে রা খুক্-খুক্ করে হাসতে লাগল। কী অদ্ভুত ছিল আগের যুগের মানুষগুলো! ওদের কি মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু ছিল না? শুধু ঝগড়া, মারামারি আর অত্যাচার আর দুঃখ! গরিব-বড়লোক আবার কী জিনিস? এখন তো ওসব কিছুই নেই। সব মানুষ সমান, যার যেমন গুণ, সে সেইরকম কাজ করে। কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়।

ডান দিকে এক জায়গায় দুবার লাল আলো জ্বলে উঠতেই রা বইটা নামিয়ে একটা রিসিভার তুলে নিল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা গলা ভেসে এল, "রকেট-সংখ্যা আলফা বিটা সাত দুই নয় শূন্য?"

রা বলল, "হ্যাঁ।"

ওদিক থেকে একজন জিজ্ঞেস করল, "জীবন কী রকম?"

রা বলল, "চমৎকার!"

"স্পেস স্টেশন সাতাশ থেকে বলছি...দশ নম্বর স্টেশন থেকে আপনাকে চাইছে...ধরে থাকুন, লাইন জুড়ে দিচ্ছি।"

একটুক্ষণ ধরে থাকার পর আবার একজন জিজ্ঞেস করল, "আলফা বিটা সাত দুই নয় শূন্য?"

"হ্যাঁ, বলছি।"

"জীবন কী রকম?"

"অপূর্ব সুন্দর। এখন বলুন তো, কী ব্যাপার?"

"পৃথিবী থেকে কেউ একজন কথা বলবে আপনার সঙ্গে। ধরে থাকুন, সাবমেরিন স্টেশনের সঙ্গে লাইন জুড়ে দিচ্ছি। আপনার প্রত্যেকদিন আনন্দে কাটুক!"

"ধন্যবাদ! আপনারও প্রতিটি দিন আনন্দময় হোক।"

সাবমেরিন স্টেশন শুনেই রা বুঝতে পেরেছে কার টেলি-ফোন। এই কিছুদিন হল তার মায়ের স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না। তাঁর একটু হাঁপানির অসুখ আছে বলে পৃথিবীর জল-হাওয়া সহ্য হয় না। অথচ অন্য কোনো গ্রহেও তিনি যাবেন না। সেই জন্য গত বছরে ভারত মহাসাগরে দু মাইল জলের তলার কলোনিতে যে শস্তায় জমি বিক্রি হচ্ছিল সেখানে রা-র বাবা জমি কিনে একটা ছোট বাড়ি করেছেন। রা অবশ্য বাড়িটা

এখনো দেখেনি, তবে শুনেছে বেশ ভাল জায়গা। ওখানে মাছ খুব শস্তা।

"হ্যালো, হ্যালো, কে ? ঝিলম ? শুনতে পাচ্ছ আমার কথা ?"

"না, মা। আমি রা বলছি ! হ্যাঁ, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি তোমার কথা !"

"ও, রা ? বাপরে বাপ ! আজকাল যা হয়েছে টেলিফোনের অবস্থা, কিছুতেই লাইন পাওয়া যায় না। সেই কখন থেকে তোকে ধরবার চেষ্টা করছি। শোন, তোকে একটা ভাল খবর দিচ্ছি। শুনতে পাচ্ছিস ?"

"হ্যাঁ, মা খুব পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। বলো—।"

"তবে কি আমারই কানের দোষ হ'ল ? তোর গলাটা যেন চিনতে পারছি না। শোন রা, আমাদের বাগানে যে কাঁচালঙ্কা-গাছ পুঁতেছিলুম, তাতে কাল ফুল ধরেছে, এবার লঙ্কা হবে! বুঝলি ?"

"উঃ মা! তোমাকে নিয়ে আর পারি না! এই তোমার ভাল খবর? এর জন্য টেলিফোন করলে? কত খরচ জানো?"

"ও-মা, ভাল খবর নয় ? আমাদের এই অতল নগরী চারশো দুই-তে আর কারও বাড়িতে কাঁচালঙ্কা-গাছ আছে? এখানে লঙ্কাই পাওয়া যায় না। তুই তো জানিস, আমি একটু ঝাল ছাড়া একদম খেতে পারি না। এত ভাল-ভাল চিংড়ি মাছ পাওয়া যায় এখানে, ইচ্ছে করে যে জিরে-পাঁচফোড়ন দিয়ে পাতলা ঝোল রাঁধব, কিন্তু তুই বল, কাঁচালঙ্কা ছাড়া জিরে-পাঁচফোড়নের ঝোল হয় ?"

"বুঝেছি, বুঝেছি, খুব ভাল খবর। আমরা ফিরলে তোমার গাছের কাঁচালঙ্কা দিয়ে ঝোল রেঁধে খাইয়ো। তোমরা সব কেমন আছ ?"

"ভাল আছি। তোরা ভাল আছিস তো ? খুব বেশি দূরে যাসনি যেন! জামাই কোথায়? তাকে একটু দে না, কথা বলি !"

"সে তো ঘুমোচ্ছে। কথা বলার উপায় নেই তো।"

"ও, ঘুমোচ্ছে ? বুঝেছি। তা কতদিন হল ঘুমোচ্ছে ?"

"আটদিন।"

"আর কতদিন ঘুমোবে ?"

"দাঁড়াও, হিসেব করে বলছি, হ্যাঁ আরও কুড়িদিন।"

"জাগলে আমায় একদিন টেলিফোন করতে বলিস। তোর বাবা হাঙর শিকার করতে গেছে। এখানে এসে খুব শিকারের শখ হয়েছে !"

"আচ্ছা মা, তোমরা সাবধানে থেকো, ভাল থেকো। এখন ছেড়ে দিই ?"

"তোরা কবে আসবি ?"

এ-কথার আর উত্তর দেওয়া হল না, লাইন কেটে গেল।

রিসিভারটা ঠিক জায়গায় রেখে ঘড়ি দেখল রা। এখনো নী ফিরল না কেন ? এবার তো তার চলে আসা উচিত।

তাকিয়ে চমকে উঠে দেখল নীল মেঘটা চলতে শুরু করেছে। খুব জোরে, প্রায় রকেটের মতন গতিতে সেটা চলে যাচ্ছে দূরে।

॥ ২ ॥

নী মনের সুখে সাঁতার কাটছিল মেঘের মধ্যে। একবার নামলে আর উঠতে ইচ্ছে করে না। নদী বা পুকুরে সাঁতার কাটার চেয়েও মেঘের মধ্যে সাঁতার অনেক আরামের, কারণ এতে হাত-পায়ের জোর খাটাতে হয় না। শুধু ভেসে গেলেই হয়।

মেঘের মধ্যে নিশ্বাস নেবারও কোনো অসুবিধে নেই। একটা ট্যাবলেট খেলে বুকের মধ্যে দু ঘন্টার মতন অক্সিজেন জমা থাকে, সেই দু ঘন্টা হাওয়াহীন জায়গাতেও ভেসে বেড়ানো যায়। নী হাতে একটা ঘড়ির মতন যন্ত্র পরে আছে, ঐ যন্ত্রটা তাকে রকেটটার সঙ্গে অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে রাখবে, দু হাজার গজের বাইরে যেতে দেবে না। হঠাৎ কোনো দরকার হলে ঐ যন্ত্রটাতেই রা তাকে খবর পাঠাবে।

নীল মেঘের মধ্যে নী একটা জলপরীর মতন চিতসাঁতার দিয়ে ভাসতে লাগল। বিন্দু-বিন্দু জলকণায় শরীরটা যেন একেবারে জুড়িয়ে যায়। নী এর আগেও কয়েকবার পৃথিবীর বাইরে বেড়াতে এসেছে। চাঁদে তার রাঙামাসিমার বাড়ি, সেখানে এসেছে দুবার। আর একবার গরমের ছুটিতে বাবা সবাইকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন বুধ-গ্রহে, তখন অবশ্য নী খুব ছোট, তবু তার একটু-একটু মনে আছে। বুধ-গ্রহটা খুব মজার, বিশেষ এক ধরনের জুতো পায়ে না-দিলে সেখানে হাঁটাই যায় না, যখন-তখন মাথাটা নীচে আর পা দুটো ওপরের দিকে উঠে যায় !

নী বাবার কাছে শুনেছে যে, আগে পৃথিবী থেকে অন্য গ্রহে বেড়াতে আসার অনেক ঝামেলা ছিল। জোব্বা-জাব্বা পরে, মুখে মুখোশ লাগিয়ে, পিঠে অম্লজানের কলসি নিয়ে ঘুরতে হত। নী দেখেছে তখনকার বি-গ্রহ যাত্রীদের ছবি। তারপর অম্লজান-বড়ি আবিষ্কার হবার পর সব কিছুই খুব সহজ হয়ে গেছে।

নী-র রাঙামাসিমা তো বলছেন, কলেজের পড়া শেষ হলে তাকে চাঁদে এসে থাকতে। চাঁদে কাজ পাওয়ার সুযোগ অনেক বেশি। আজকাল তো পৃথিবীতে মানুষ থাকতেই চায় না প্রায়। কলকাতা লন্ডন নিউইয়র্ক এই সব আগেকার দিনের পুরনো শহরগুলো খাঁ-খাঁ করছে। নী একবার বোম্বাই গিয়ে দেখেছিল, সেখানে হাজার-হাজার বাড়ি খালি পড়ে আছে, ঠিক যেন একটা ভুতুড়ে শহর। ভারত সরকার এখন ঐতিহাসিক ও পুরাকীর্তি সংরক্ষণ আইনে ঐ বাড়িগুলো একই অবস্থায় রেখে দিতে চাইছেন। আসামের মতন সুন্দর জায়গায় এখন তো মানুষ নেই বললেই চলে। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, সেখানকার টেলিফোন টেলিগ্রাফ পরমাণু-কেন্দ্র এসব চালাবারও লোক পাওয়া যাচ্ছে না। সরকার তাই বিজ্ঞাপন দিয়েছেন যে, যে-কোনো লোক, এমনকী বিদেশীরাও যদি আসামে এসে থাকতে চায়, তা হলে তাদের আগামী পাঁচ বছর খাবার-দাবারের কোনো খরচ লাগবে না। তারা একটি করে বাড়িও পাবে বিনা পয়সায়।

নী অবশ্য সূর্যমন্ডলের বাইরে আগে কখনো আসেনি। সূর্যের গ্রহগুলো তো সব জানা হয়ে গেছে, কোনোটাতেই মানুষের মতন প্রাণী কিংবা অন্য কোনো জীবজন্তুর সন্ধান পাওয়া যায়নি। সূর্যমন্ডলের বাইরেই এখন বেশি মজা। এখনো কত রকম অজানা জিনিস যে দেখা যায়। এই যে মাঝে-মাঝে টুকরো-টুকরো জলভরা মেঘ, এর কথাই বা কে জানত।

নী কতক্ষণ সাঁতার কেটেছে তার খেয়াল নেই। এক সময় সে টের পেল, সে শুধু একই জায়গায় থেমে আছে আর তার চারপাশ দিয়ে মেঘ উড়ে চলেছে। সে তখন দিক পাল্টাবার জন্য মাথা ফেরাল, কিন্তু সাঁতার কাটতে পারল না, তার হাত-পা চলছে না, মেঘই তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। এ কী ব্যাপার? অনেক চেষ্টা করল নী, তবু কিছুই হল না। ক্রমশই মেঘটার গতিবেগ বাড়ছে।

ভয় পেয়ে সে চিৎকার করে উঠল, "রা-দি! রা-দি!"

এখানে বাতাস নেই বলে গলার আওয়াজ কেউ শুনতে পাবে না। চেঁচিয়ে কোনো লাভ নেই। ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল নী'র। কোনোক্রমে মাথা তুলে সে দেখল, বহু দূর থেকে একটা সূক্ষ্ম আলোর রেখা এসে পড়েছে মেঘটার ওপর।

স্পন্দন
প্রকাশিত হল
অভিব্যক্তিতে—
সান গ্রেস
তমসো মা জ্যোতির্গময়
অভিজাত
হাল ফ্যাশনের
চূড়ায়
সান গ্রেস
ফ্যাব্রিক্স
নিবেদন করছেন
মিহির
টেক্সটাইল্‌স
ও
মাতুল্য
মিল্‌স
SUN GRACE

সুতো দিয়ে যেমন ঘুড়ি টানে, সেই রকমভাবে কেউ যেন ঐ আলো দিয়ে মেঘটাকে টানছে। নী এইটুকু বুঝতে পারল, নিশ্চয়ই ওটা কোনো চুম্বক আলো।

আর কিছু ভাবার সময় পেল না সে। মেঘের প্রচণ্ড গতি-বেগ সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

এদিকে রা যখন দেখল, মেঘটা উড়ে চলে যাচ্ছে, তখনই সে রকেটটা আবার চালু করে দিয়েছে। এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটার মধ্যে একটা বিপদের গন্ধ পেয়েছে সে। কিন্তু রা সহজে ঘাবড়াবার মেয়ে নয়। মহাকাশে অন্তত কয়েক কোটি মাইল রকেট চালিয়েছে সে এই বয়সেই, অনেক রকম বিপদের জন্য সে তৈরি থাকে।

ঝিলম আর ইউনুসকে ডাকবার কোনো উপায় নেই। ওরা বয়েস কমাবার ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমোচ্ছে, নির্দিষ্ট সময়ের আগে কিছুতেই ঘুম ভাঙবে না। সূর্যমণ্ডলের বাইরে ঘুরতে গেলে পৃথিবীর হিসেবে বয়েস অনেক বেড়ে যায়। প্রথম-প্রথম যে-সব অভিযাত্রী এদিকে এসেছিল, তারা কেউ-কেউ ফিরেছে পঁচিশ কিংবা তিরিশ বছর পরে, ততদিনে তারা বুড়ো হয়ে গেছে। এখন সেই সমস্যা নেই, এখন এই ট্যাবলেট খেয়ে নিয়ে ঘুমোলে বয়েসটা থেমে থাকে, তারপর এক মাস, দু' মাস বা এক বছর বাদে ঘুম ভাঙলেও সেই সময়টায় বয়স বাড়ে না। মহাকাশের সব অভিযাত্রীই পালা করে এই ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমোয়।

রা তার রকেটের গতি বাড়িয়ে দিয়ে মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটল। তারপর মেঘটার পাশাপাশি এসে রকেটের লেজের দিক থেকে অতি-বেগুনি রশ্মি ছড়াতে লাগল মেঘটার ওপর। এমন সুন্দর মেঘটাকে নষ্ট করে দিতে হল তার, কিন্তু আর উপায় তো নেই! ঠিক যেমন দেশলাই-কাঠি জ্বললে তুলোর বাণ্ডিল পুড়ে যায়, সেই রকম অতি-বেগুনি রশ্মিতে গলে যেতে লাগল মেঘটা।

প্রায় চোখের পলকেই অদৃশ্য হয়ে গেল পুরো মেঘটা, শুধু দেখা গেল নী-কে। ঠিক যেন অগাধ সমুদ্রে ভাসছে একটা ক্ষীরের পুতুল। নী-র হাত পা ছড়ানোর ভাব দেখেই ছ্যাঁত করে উঠল রা-র বুকের মধ্যে। নী এখনো বেঁচে আছে তো?

এর পর রা দেখল, মেঘটা গলে গেলেও নী-র শরীরটা থামছে না, সেটা তখনও ছুটে চলেছে সমান গতিতে। তার রকেটের পাশাপাশি চলছে বলেই প্রথমটা সে বুঝতে পারেনি। ঠিক যেমন দুটো ট্রেন বা দুটো বিমান পাশাপাশি সমান গতিতে ছুটলে মনে হয়, দুটোই থেমে আছে। তখনই রা প্রথম লক্ষ করল, নী-কে টানছে একটা সূক্ষ্ম আলোর রেখা। তার ভুরু কুঁচকে গেল। ওটা কিসের আলো?

বেশি চিন্তা করারও সময় নেই। রা আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে লেসার বীম দিয়ে কেটে দিল আলোর রেখাটাকে। তারপর ঠিক সুতো - কাটা ঘুড়িরই মতন আস্তে-আস্তে দুলতে লাগল নী-র দেহ।

এর পরের কাজটাই শক্ত। রকেটটার গতি কমাতে-কমাতেই সেটা নী-কে ছাড়িয়ে চলে যাবে বহু দূরে। তারপর ফিরে এসে এই বিরাট মহাকাশের মধ্যে ঐটুকু একটা মানুষকে খুঁজে বার করাই দারুণ কঠিন। রা রকেটের মুখটা ঘুরিয়ে গোল করে ফিরে আসতে-আসতেই নীকে ছাড়িয়ে সে চলে গেল বহু হাজার মাইল দূরে। তারপর রকেটের গতি একটু একটু কমিয়ে গোলটাকে ছোট করে আনতে লাগল। রকেট চালাতে-চালাতেই সে নানান রকম বোতাম টিপে অঙ্ক কষে যাচ্ছে।

এত রকম ব্যস্ততা ও উত্তেজনার মধ্যেও এই সময় রা-র হঠাৎ খুব একা লাগল। ইশ, এখন ঝিলম কিংবা ইউনুস যদি পাশে থাকত। তারপরই সে চমকে উঠল। আরেঃ! লেসার বীমের রেখাটা সে বন্ধ করতে ভুলে গেছে! সর্বনাশ! ওটা যদি নী'র গায়ে লাগত!

ঠিক হিসেব মতন ঘুরতে-ঘুরতে গোলটাকে ছোট করে এনে

নী-কে দেখতে পেল রা। এখনো নী সেই রকম ভাবেই দুলছে। নী-র ছোট্ট সুন্দর শরীরটা যেন একটা গোলাপ ফুলের পাপড়ি। আস্তে-আস্তে কাছে এসে একটা মস্ত বড় চায়ের ছাঁকনির মতন জিনিস বার করে সে লুফে নিল নী-কে। রকেটের ভিতরে এনেই নী-কে কোলে তুলে নিয়ে সে ছুটে গেল স্বয়ংক্রিয় হাসপাতালে। এটা রকেটের মধ্যে একটা ছোট্ট ঘর, এখানে সব রকম রোগের চিকিৎসা করে কম্পিউটার। রা-র আবার ডাক্তারি-জ্ঞান একটুও নেই, এই ব্যাপারে ইউনুসের খুব অভিজ্ঞতা আছে।

স্বয়ংক্রিয় হাসপাতালে নী-কে খাটে শুইয়ে দেওয়ামাত্র চিকিৎসা শুরু হয়ে গেল। কম্পিউটার থেকে দুটো হাত বেরিয়ে এসে ব্যবস্থা করতে লাগল সব কিছুর। হাত দুটো ইস্পাতের নয়, নরম রবারের, ঠিক মনে হয় কোনো মেয়ের হাত। রা চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, দেয়ালের একটা চৌকো জায়গায় নানান আলোতে নী-র হৃৎস্পন্দন, নাড়ির গতি, রক্তের চাপ—এইসবের হিসেব ফুটে উঠছে। ইউনুস থাকলে এই সব দেখলেই বলতে পারত, এর থেকে কোনো বিপদের ভয় আছে কি না।

তারপরই রা-র মনে পড়ল, ও হরি, ইউনুস থাকলেও তো কোনো লাভ ছিল না! ইউনুস তো এক বছরের জন্য নিঃশব্দ-বড়ি খেয়ে নিয়েছে। এই এক বছর ইউনুসের কথা বলার ক্ষমতা থাকবে না। এরা প্রায়ই এক বছর দু'বছরের জন্য কথা বলা কিংবা কানে শোনা এমনকী চোখে দেখা বন্ধ করে আয়ু বাড়িয়ে নেয়। শরীরের এক-একটা অঙ্গকে মাঝে-মাঝে এরকম বিশ্রাম দিলে তারা আরও জোরালো হয়।

রা-র বুকের মধ্যে ঢিপ-ঢিপ করছে। নী-র যদি কিছু হয়ে যায়, তা হলে ওর বাবা-মাকে সে কী বলে সান্ত্বনা দেবে! কেন সে মেয়েটাকে মেঘে সাঁতার কাটার জন্য নামতে দিল! অথচ, আগেও তো সে এরকম তিন-চারবার মেঘে সাঁতার কেটেছে, কখনো তো কোনো বিপদ হয়নি? ওই আলোর রেখাটা কোথা থেকে এল? ঝিলম জেগে থাকলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারত, ওটা কী! আবার খুব একা লাগল রা-র।

এই সময় খুব শান্ত মিষ্টি গলায় একজন বলল, "বেশি ভাবনা করো না রা, মেয়েটি ভাল হয়ে যাবে।"

রা মুখ তুলে বলল, "সত্যি, জিউস? ওঃ তোমায় কী বলে যে ধন্যবাদ দেব!"

"ওরকম মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে না থেকে আমায় জিজ্ঞেস করলেই তো পারতে।"

"আমি ভাবলাম, তুমি ব্যস্ত। তাই তোমায় বিরক্ত করিনি।"

"তোমার যখন একা-একা লাগে, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো না কেন?"

"ঠিক বলেছ, জিউস! এবার থেকে মাঝে-মাঝে এসে তোমার সঙ্গে গল্প করে যাব। তোমার কাজের অসুবিধে হবে না তো?"

"যতই কাজ থাকুক, আমারও তো মাঝে-মাঝে একটু বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে হয়! জীবন কী-রকম, রা?"

"অপূর্ব সুন্দর!"

"তোমার জীবন আরও মধুময় হোক, রা!"

কম্পিউটারটির থেকে আরও দুটো হাত বেরিয়ে এল, পুরুষের মতন হাত। রা সেই হাত দুটি চেপে ধরে বলল, "তুমি খুব ভাল জিউস, তোমার মতন আর দুটি দেখিনি কোথাও! আচ্ছা, জিউস, তুমি বলতে পারো, ঐ যে আলোর রেখাটা মেঘটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, ওটা কী?"

"ও-রকম আগে কখনো দেখিনি।"

"ওটা কি প্রাকৃতিক? না কেউ ইচ্ছে করে অমনি ভাবে টানছিল?"

"সেটাও বুঝতে পারলুম না!"

"সে কী, তুমি এত জ্ঞানী, তুমিও জানো না?"

"হা-হা-হা-হা! তুমি এত মজার কথা বলো, রা! জীবনে এখনো কত কিছু অজানা রয়ে গেছে, কত রহস্যের মীমাংসা হয়নি, দিন-দিন রহস্য বাড়ছে বলেই তো জীবনটা এত মজার। সব-কিছু জানা হয়ে গেলে তোমাদের কি আর বাঁচতে ভাল লাগবে?"

"তা ঠিক বলেছ। তবু আমার মনটা খুঁতখুঁত করছে। নী-কে আর-একটু হলেই আমরা হারাতাম। লেসার বীমে এ আলোর রেখাটা খুব সহজেই কেটে গেল অবশ্য—"

"তুমি জুপিটারকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। আমি একটু পরে জুপিটারের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ করে দেবার চেষ্টা করব। জুপিটার সব সময় এত ব্যস্ত থাকে যে, বেচারির নিশ্বাস ফেলারও সময় নেই।"

জুপিটার আর-একটি অতিকায় কম্পিউটার, সেটি বসানো আছে মহাশূন্যে স্টেশন নং একুশে। এর চেয়ে বড় কম্পিউটার মানুষ এখনো তৈরি করতে পারেনি। এটার খরচ দিয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ, তাই পৃথিবীর যে-কোনো দেশের মানুষ যে-কোনো সমস্যা নিয়ে জুপিটারকে প্রশ্ন করতে পারে।

"শোনো, রা, ঝিলমকে বলো, আলোর চুম্বকশক্তি নিয়ে তোমাদের আরও গবেষণা করা দরকার। এই ব্যাপারে আফ্রিকানরা তোমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে।"

"ঠিক বলেছ, জিউস!"

"ঐ দ্যাখো, মেয়েটি চোখ মেলেছে!"

রা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল নী-র দিকে। নী তার টলটলে চোখ দুটি মেলে তাকিয়ে আছে ওপরের দিকে। রা ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞেস করল, "কী রে, নী, এখন কেমন লাগছে? ওঃ, যা চিন্তায় ফেলেছিলি!"

নী কোনো উত্তর দিল না।

রা তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "এই নী, নী, আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস না? এই দ্যাখ, আমি রা-দি, তোর আর কোনো ভয় নেই—"

নী যে সত্যিকারের কবি তার প্রমাণ পাওয়া গেল এবার। জ্ঞান ফেরার পর সে প্রথম কথা বলল কবিতায়। সে বলল ঃ

"কালো মেঘ পাহাড়ের
বুকে গিয়ে কাঁদে,
লাল মেঘ ঝড় তোলে
মঙ্গলে চাঁদে,
নীল মেঘ ঘুম দেয়,
আলো দিয়ে বাঁধে,
সাদা মেঘ, সাদা মেঘ,
সাদা মেঘ, এসো!......"

॥ ৩ ॥

গোলাপি-রঙা রোদের মধ্য দিয়ে উড়ে চলেছে রকেটটা।

এদিকে একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে, যার আলোর রঙই গোলাপি। কিন্তু এমন সুন্দর রঙ হলেও এই আলো খুব গরম। একবার ঝিলম এই গোলাপি রোদের মধ্যে রকেটের বাইরে বেরিয়েছিল, তাতে তার পিঠ এমন ঝলসে গেছে যে, গোলাপি-গোলাপি ছাপ পড়ে গেছে। এই আলোর এলাকা থেকে খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে চায় রা।

নী খাবার তৈরি করে এনেছে, ওরা দু'জন পাশাপাশি বসে খাচ্ছে। খাওয়া মানে একটা করে স্যান্ডউইচ আর এক কাপ সুপ। দীর্ঘ যাত্রার সময় একসঙ্গে বেশি খাবার খাওয়া যায় না, খেলেই গা গুলোয়।

রা বলল, "নী, এবার তোকে রকেট চালানো শিখিয়ে দেব। তুই অ্যাসট্রো-ফিজিক্স পরীক্ষায় কী-রকম নম্বর পেয়েছিলি রে?"

নী লজ্জায় মুখ নিচু করে বলল, "বলব না!"

"ও মা, বলবি না কেন?"

"না, আমার ওসব কথা বলতে ভাল লাগে না!"

রা 'ওঃ হো-হো' বলে হেসে উঠল। তার মনে পড়ে গেছে। হাসতে-হাসতেই সে বলল, "ও, তুই তো সব পরীক্ষাতেই ফার্স্ট হোস, সেইজন্য বলতে লজ্জা পাচ্ছিস! তুই কী করে প্রত্যেকবার ফার্স্ট হোস রে? বেশি তো পড়াশুনো করতে দেখি না তোকে?"

নী বলল, "আমি কী করব, আমি একবার যা চোখে দেখি, তা সব আমার মনে থেকে যায়।"

"তোদের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হয়নি মহাকাশে?"

"সে তো পৃথিবী থেকে মাত্র পাঁচ হাজার মাইল ওপরে। সে আর এমন কী!"

"ঠিক আছে, আজ থেকে তোর রকেট চালানোয় হাতে খড়ি হবে। তুই আমার পাশে বসে আসন-বন্ধনীটা কোমরে বেঁধে ফ্যাল্।"

ঠিক এই সময় একটা লাল আলো জ্বলে উঠল এবং হিস্ হিস্ শব্দ হতে লাগল মাথার ওপরে। রা একটা রিসিভার তুলে নিতেই শোনা গেল, "এস ও এস, এস ও এস, সবাইকে ডাকছি, প্রক্সিমিটি লালগোলাপ, কেউ কি শুনতে পাচ্ছ...?"

কিছুক্ষণ শোনার পর রা রিসিভারটা আবার রেখে দিল।

নী জিজ্ঞেস করল, "কী হল? কে কথা বলল?"

রা নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অন্যমনস্ক ভাবে বলল, "লালগোলাপ নামে এদিকে একটা উপগ্রহ আছে, সেখানে একটা রাশিয়ান রকেট ক্রাশল্যান্ড করেছে। তাই সাহায্য চাইছে।"

"আমরা সেদিকে যাব না?"

"আমাদের তো কোনো দরকার নেই যাবার। ওরা চতুর্দিকে খবর পাঠাচ্ছে। এদিকে কাছেই রাষ্ট্রসংঘের একটা স্পেস-স্টেশন আছে, সেখান থেকে দমকল যাবে—"

"রা-দি, যদি কোনো কারণে রাষ্ট্রসংঘের স্পেস স্টেশন ওদের খবর শুনতে না পায়? ওরা বিপদে পড়েছে, আমাদের যাওয়া উচিত না?"

"আমরা শুধু-শুধু সময় নষ্ট করব কেন? এমনিতেই কতটা সময় খরচ হয়ে গেল! এই রাশিয়ান আর আমেরিকানদের ওপর আমার বড্ড রাগ হয়। ওদের দেশের অনেক লোক এখন খেতে পায় না, ওদের আবার রকেট ভাসাবার বিলাসিতা করবার কী দরকার? গত বছরের হিসেবে দেখেছি ঐ দুটো দেশের একুশ কোটি শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে! আফ্রিকা আর আমাদের দেশের সাহায্য না পেলে তো ওরা চালাতেই পারে না, তবু মহাকাশ গবেষণায় এত টাকা নষ্ট করা চাই! এই দ্যাখ না, এতটুকু দেশ বাংলাদেশ, কিন্তু কী দারুণ উন্নতি করেছে, সেই তুলনায় ঐ বড় বড় দেশগুলো—"

"রা-দি, তুমি যাই বলো, মানুষ বিপদে পড়লে আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত।"

"তুই যে একেবারে দয়ার অবতার হলি! দাঁড়া, আগে দেখি রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্পেস স্টেশন খবরটা পেয়েছে কি না!"

রা অনেকগুলি বোতাম টিপে রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্টেশনকে ধরবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনো সাড়া পেল না। তার ভুরু দুটো কুঁচকে গেল। আপন মনে সে বিড়বিড় করে বলল, "কোনো কারণে সারকিট জ্যাম হয়ে গেছে। ওরা বোধহয় কিছু শুনতে পায়নি।"

"রা-দি, তা হলে?"

"যেতেই হয় দেখছি। আবার অনেকখানি সময় খরচ! তুই পাঁচ নম্বর মানচিত্রটা বার করে এনে আমার সামনের এই ফ্রেমটাতে বসিয়ে দে।"

ককপিটের পাশেই মানচিত্র-লাইব্রেরি। নী চট করে সেখান থেকে পাঁচ নম্বর মানচিত্রটা খুঁজে এনে ফ্রেমে লাগিয়ে দিল। মানচিত্রটি ত্রিস্তর। ফ্রেমে বসাতেই যেন মহাকাশের একটা অংশ ওদের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল। খালি চোখে তাকালে এই মহাকাশকে শুধু মহাশূন্য বলে বোধ হয়, কিন্তু এই ম্যাপে কত রকম ফুটকি রয়েছে। আবার কিছু অদ্ভুত চেহারার, ঠিক খেলনার মতন, ছবি।

একটা ফুটকির দিকে আঙুল দেখিয়ে রা বলল, "এটা হল লালগোলাপ, একটা ছোট উপগ্রহ, বেশ দূরে আছে। খুব লাল রঙের পাতলা-পাতলা মেঘ এই উপগ্রহটা ঘিরে আছে, সেইজন্য দূর থেকে এটাকে লাল গোলাপের মতন দেখায়।"

অঙ্ক কষে নির্দিষ্ট গতি-পথ বার করে রা রকেটের মুখ ঘোরাল সেই দিকে। তারপর সে চেষ্টা করল বেতার-টেলিফোনে লালগোলাপের বিপন্ন রকেটটির সঙ্গে যোগাযোগ করবার। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তাদের আর ধরা গেল না। রা বেশ অবাক হল। সে নী-কে বলল, "তুই ধরেছিস যখন, যেতেই হবে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাদের রকেটে আর এক-জনের বেশি লোককে জায়গা দেওয়া যাবে না। ওদের রকেটটা যদি একেবারে নষ্ট হয়ে যায় আর তিন-চারজন মানুষ থাকে, তা হলে কী করব?"

নী বলল, "আমরা ওদের চিকিৎসা কিংবা খাবার দিয়ে সাহায্য করতে পারি অন্তত।"

"তুই কখনো ধ্যান-ট্যাবলেট খেয়েছিস, নী?"

"তুমি ভুলে যাচ্ছ, রা-দি, আমার এখনো পনেরো বছর বয়েস হয়নি। তার আগে ঐ ট্যাবলেট খাওয়া নিষেধ না?"

"মুশকিল হচ্ছে, আমি রকেট চালাচ্ছি তো, এখন আমার পক্ষে ঐ ট্যাবলেট খাওয়া ঠিক হবে না। অনেকক্ষণ ঘোর থাকে। তোর চোদ্দ বছর তো হয়ে গেছে, এখন খেলে দোষ নেই। তোর সাহায্য আমার দরকার এখন।"

হাতব্যাগ থেকে দুটি ট্যাবলেট বার করে নী-কে দিয়ে রা বলল, "এই দুটো তোর জিভের তলায় রেখে দে। তারপর চোখ বুঁজে শুধু লালগোলাপ গ্রহটার কথা চিন্তা কর। অন্য কোনো চিন্তা যেন মনে না আসে।"

নী ট্যাবলেট দুটো মুখে দিয়ে চোখ বুঁজে বসল। রা হাত-ঘড়িটা দেখে আবার মন দিল রকেট চালনায়।

ঠিক দশ মিনিট বাদে নী চেঁচিয়ে বলল, "দেখতে পাচ্ছি, রা-দি, দেখতে পাচ্ছি, অপূর্ব সুন্দর!"

রা বলল, "চোখ খুলিস না। চ্যাঁচাসনি! আস্তে-আস্তে বল্, আর ভাল করে দ্যাখ।"

"ঠিক ফুলের পাপড়ির মতন লাল-লাল মেঘ, সত্যি লালগোলাপের মতনই দেখতে গ্রহটাকে—"

"গ্রহ নয়, উপগ্রহ। যাই হোক, মেঘের ভেতর দিয়ে দ্যাখবার চেষ্টা কর। ওখানে ছোট-ছোট পাহাড় আছে।"

"দেখতে পাচ্ছি একটা পাহাড়। তার মাথার দিকে চাঁদের মতন কী যেন জ্বলছে।"

"চাঁদ নয়, ওটাই ওর গ্রহ। পাহাড়ের নীচের দিকে কিছু দেখতে পাচ্ছিস?"

"হ্যাঁ, ঐ যে একটা রকেট, কাত হয়ে পড়ে আছে, খুব জোর আঘাত লেগেছে মনে হচ্ছে।"

"কোনো মানুষ দেখা যাচ্ছে না?"

"তাও দেখা যাচ্ছে, একজন শুয়ে আছে মাটিতে, আর দু'জন বসে আছে পাশে।"

"সবাই পুরুষ, না মেয়ে আছে?"

"তা বোঝা যাচ্ছে না। সবার মাথায় স্পেস হেলমেট।"

"লালগোলাপে এমনিতে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বোধহয় ওদের অক্সিজান-বড়ি ফুরিয়ে গেছে।"

"রা-দি, ওদের সঙ্গে কথা বলা যায় না? এত কাছে মনে হচ্ছে, ঠিক যেন ডাকলেই শুনতে পাবে।"

"না, কথা বলা যায় না। তুই কাছে ভাবছিস, আসলে ওরা সাতচল্লিশ হাজার কিলোমিটার দূরে। এবার চোখ খোল, আর কষ্ট করার দরকার নেই।"

নী চোখ খোলার পরও মুখখানা হাসি-হাসি করে রইল। আপন মনে বলল, "আমি এখনো লালগোলাপ-উপগ্রহটা দেখতে পাচ্ছি মেঘগুলো দুলছে—"

রা বলল "এই তো তোদের নিয়ে মুশকিল! এইজন্যই অল্পবয়সীদের ধ্যান-বড়ি খাওয়াতে নিষেধ করে। ঘোর কাটতে চায় না। দাঁড়া আমি ব্যবস্থা করছি।"

রা একটা বোতাম টিপে দিতেই ডান পাশের দেয়ালের খানিকটা অংশ সরে গেল, সেখানে দেখা গেল একটা চৌকো সাদা পর্দা। আর একটা বোতাম টিপতেই সেই পর্দার ওপর শুরু হয়ে গেল সিনেমা। বৃহস্পতিগ্রহের লছমি পাহাড়ের চূড়ায় চারটি ছেলে-মেয়ের অভিযান। ফিল্মটা কুড়ি-পঁচিশ বছরের পুরনো, কিন্তু গানগুলো এত ভাল যে, এখনো ভাল লাগে। দুখানা গান গেয়েছে হংকংয়ের একটা ডলফিন। এই ডলফিনটা এসপারান্তো ভাষায় দারুণ গান গায়। নীর মেসোমশাই ওঁদের চাঁদের বাড়িতে একটা কোকিলকে চমৎকার পল্লীগীতি গাইতে শিখিয়েছেন। তার মধ্যে একটা গান সকলের খুব ভাল লাগে সেই গানটা হল "নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে।" এই পল্লীগীতিটা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে আগেকার দিনের একজন সাধু।

সিনেমা দেখতে-দেখতে এই দুটি মেয়ে মহাশূন্য দিয়ে উড়ে চলল অন্য একটা বিপদে-পড়া রকেটের মানুষদের উদ্ধার করতে।

সিনেমাটা শেষ হবার আগেই হঠাৎ রা এক সময় সুইচ বন্ধ করে দিয়ে বলল, "নী, শিগগির বাইরে দ্যাখ, এরকম সহজে দেখতে পাবি না!"
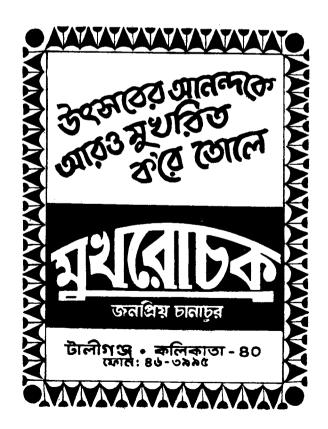
নী সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী দেখব? কই কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো?"

"ভাল করে তাকিয়ে থাক্!"

ধোঁয়ার মতন কী যেন ভাসছে। আকাশে এত ধোঁয়া এল কী করে?"

"আমি একটু বাঁ পাশে সরে যাচ্ছি, তখন ভাল করে দেখতে পাবি।"

সেই ধোঁয়া থেকে রকেটটা খানিকটা বাঁ পাশে সরে যেতেই নী চমকে উঠল। মনে হল, একটা প্রকাণ্ড বিড়াল যেন আকাশ জুড়ে হুমড়ি খেয়ে আছে, সারা শরীরটা টান-টান, পেছনের পা দুটো গুটিয়ে আছে শরীরের সঙ্গে, তার লেজটা শরীরের চেয়েও বড়। বেড়ালের মতন দেখতে বটে, কিন্তু সেটা যে কত হাজার কিলোমিটার লম্বা তার ঠিক নেই।

"ওটা কী, রা-দি?"

"কী বল্ তো। আন্দাজ কর!"

"এ রকম জিনিস কখনো দেখিনি।"

"ওটা একটা ধূমকেতু। তুই আগে ধূমকেতু দেখিসনি কখনো?"

"ছবিতে দেখেছি। কিন্তু ধূমকেতু যে এমন হয় জানতুম না তো!"

"আমাদের যাওয়া-আসার পথে তো অনেক ধূমকেতু পড়ে। কিন্তু এটার বিশেষত্ব হচ্ছে, এটা দেখতে ঠিক একটা জীবন্ত প্রাণীর মতন। এটাকে আমি আগে একবার মাত্র দেখেছি।"

"মনে হচ্ছে ঠিক যেন একটা বেড়াল লাফ দিয়েছে। আচ্ছা রা-দি, ঐ ধূমকেতুটার মধ্যে ঢোকা যায় না?"

"বেড়ালের পেটে ঢুকে যাবি, তারপর যদি আর বেরুতে না পারিস? তা ছাড়া আমরা একটা বিশেষ কাজে যাচ্ছি, এখন খেলা করবার সময় নয়।"

ধূমকেতুটার অনেকগুলো ছবি তুলে ফেলল নী। ওদের রকেট সেটাকে পাশ কাটিয়ে ছুটে চলল।

খানিক বাদেই দেখা গেল লালগোলাপ-উপগ্রহটিকে।

সেটির কাছাকাছি আসতেই নী উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, "ঠিক একরকম! ধ্যান-বড়ি খেয়ে ঠিক এইরকম দেখেছিলাম।"

রা ব্যস্ত হয়ে পড়ল নানারকম বোতাম টেপায়। পাতলা-পাতলা লাল রঙের মেঘ উড়ছে উপগ্রহটিকে ঘিরে। রা দুটি চশমা বার করে একটা পরে নিল নিজে, আর-একটা এগিয়ে দিল নী-র দিকে। এই চশমা না পরলে লালগোলাপ-উপগ্রহে নেমে কিছুই চোখে দেখা যায় না। নানারকম ট্যাবলেট বার করে রা নিজেও খেয়ে নিল, নী-কেও খাওয়াল। রকেটটা এক্ষুনি মাটি ছোঁবে।

শেষ ঝাঁকুনিটা সহ্য করার জন্য দু'জনেই আসন-বন্ধনী কোমরে বেঁধে, মাথার নীচে হাত রেখে চোখ বুজে রইল। রা গুনতে লাগল, এক দুই তিন চার । ঠিক দশ গোনার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকুনি লাগল বেশ জোরে।

রা চোখ খুলে বলল, "এসে গেছি!"

রকেট থেকে নামবার আগে রা একবার দেখে এল ঝাঁকুনির জন্য ঝিলম আর ইউনুসের কোনো অসুবিধে হয়েছে কি না। কিছুই হয়নি, দুটি কাচের বাক্সের মধ্যে ওরা দু'জনে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। দেখলে মনে হয় যেন দুটি পুতুল।

বাক্স দুটির ভেতর লাগানো আছে দুটি ঘড়ি। সময় হয়ে গেলেই খুব জোরে বেল বাজিয়ে ওদের ঘুম ভাঙিয়ে দেবে। ঘড়ি দেখে রা বুঝল, ওদের ঘুম ভাঙতে আর খুব বেশি দেরি নেই।

সিঁড়ি আগেই নেমে গেছে, এবার দরজা খুলে ওরা নেমে

এল নীচে। দু'জনেই ওভারকোট গায়ে দিয়ে নিয়েছে। লাল-গোলাপ-উপগ্রহটিকে ওপর থেকে যত সুন্দর দেখায় আসলে জায়গাটা অবশ্য তেমন সুন্দর নয়। মাটির রং বারুদ রঙের, এবড়ো খেবড়ো, কোনোরকম প্রাণীর চিহ্ন নেই এখানে। লাল রঙের মেঘগুলোতে অম্লজান নেই বলে কখনো বৃষ্টি হয় না, শুধু শোভা হয়েই ভেসে বেড়ায়।

রা বলল, ''সাবধানে হাঁটবি, ঠিক ভাবে পা ফেলে ফেলে, একটু তাড়াহুড়ো করলেই হোঁচট খেয়ে পড়বি।''

নী বলল, ''রা-দি, ঐ যে ধূমকেতুটা দেখলাম, ঐটা নিয়ে একটা কবিতা আমার মাথায় এসেছে।''

''পরে শুনব, এখন কবিতা শোনার মেজাজ নেই। ভাঙা রকেটটা দেখতে পাচ্ছিস?''

''কই, না তো!''

''চশমাটা ঠিক করে পরিসনি নিশ্চয়ই। দু'হাতে চেপে ঠিক করে বসিয়ে নে।''

অন্য একটা রকেট একটা টিলার পাশে কাত হয়ে পড়ে আছে। রা সেটার কাছে এসে ভুরু কুঁচকে তাকাল। রকেটটার রঙ কালো, গায়ে কোনো দেশের চিহ্ন আঁকা নেই, গড়নটাও অচেনা ধরনের। দরজাটা খোলা। কিন্তু সিঁড়ি নেই।

টিলার গায়ের সঙ্গে রকেটটা লেগে আছে বলে রা সেই টিলার ওপরে খানিকটা উঠে গিয়ে বলল, "তুই নীচে থাক, নী, আমি ভেতরটা দেখে আসছি।"

রা ভেতরে দরজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কবল, ''ভেতরে কেউ আছে?''

কোনো উত্তর এল না।

দু'তিনবার ডেকেও কোনো সাড়া না পেয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। ভেতরটা অন্ধকার। রা ওভারকোটের পকেট থেকে একটা পেন্সিল-টর্চ বার করল, সেটাতে অসম্ভব জোর আলো হয়। সেই আলোতে রা রকেটটার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত দেখল। ভেতরে কোনো জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। শুধু তাই নয়, রকেটটা দেখে রা-র মনে হল, এটা অনেকদিন চালু নেই, যন্ত্রপাতি অধিকাংশই অকেজো। খবর পাঠাবার যন্ত্রটি রা বেশ ভাল ভাবে নেড়েচেড়ে দেখল। যন্ত্রটা একেবারেই খারাপ, এই যন্ত্র দিয়ে খবর পাঠাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

রা নীচে নেমে এসে বলল, "আশ্চর্য।"

নী মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে কী যেন দেখছিল, মাথা তুলে বলল, "রা-দি, এখানে মনে হচ্ছে রক্তের দাগ।"

রা দেখল বারুদ-রঙা মাটির ওপরে খানিকটা কালো-কালো ছোপ। রক্ত হলেও হতে পারে। সে বলল, ''ওটা যদি রক্তের দাগ হয়ও, তা হলেও বেশ পুরনো, দু'এক দিনের নয়। কিন্তু এই রকেটের লোকজন গেল কোথায়? খবরই বা কে পাঠাল?''

''ভেতরে কেউ নেই?''

''বোধহয় আমাদের দেরি দেখে তারা অন্য কোথাও আশ্রয় নিয়েছে।''

''না, আমরা ভুল জায়গায় এসেছি। অন্য কোনো রকেটের যাত্রীরা আমাদের সাহায্য চেয়েছে। এটা এখানে পড়ে আছে অনেক আগে থেকেই।"

"না!"

''তা হলে? আমরা কি পায়ে হেঁটে খুঁজব, না আবার আমাদের রকেটে চেপে—"

নী-র কথা শেষ হল না। টিলার অন্য পাশ দিয়ে একসঙ্গে সমান তালে পা ফেলে-ফেলে এগিয়ে এল পাঁচজন মানুষ। তারা প্রত্যেকেই স্পেস-হেলমেট পরে আছে বলে তাদের মুখ দেখা যায় না ভাল করে। একজনের হাতে ঝোলানো একটা চকচকে ইস্পাত-রঙের চৌকো বাক্স।

ওদের পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকিয়ে নী বলল, "রা-দি, ঐ লোকগুলোকে আমার মোটেই ভাল বলে মনে হচ্ছে না। ওরা আসবার আগেই চলো আমরা রকেটে উঠে পালিয়ে যাই।"

রা বলল, "ছেলেমানুষি করিস না, চুপ করে দাঁড়া!"

লোকগুলি এসে ওদের চার পাশ ঘিরে দাঁড়াল।

॥ ৪ ॥

রা কোনো কথা বলল না।

অচেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলে প্রথমেই বলতে হয়, জীবন কী রকম, অথবা আপনার জীবন সুন্দর হোক, এই ধরনের কিছু। ছেলেরা আর মেয়েরা থাকলে প্রথমে ছেলেরাই বলে, সেটাই ভদ্রতা।

এরা সেরকম কিছুই বলল না। চৌকো বাক্সওয়ালা লোকটি একটু কাছে এগিয়ে এসে রা-র মুখের দিকে তাকিয়ে এসপারান্টো ভাষায় বলল, "বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই, আপনারা আমাদের বন্দী? আপনারা দু'জনেই চোখ থেকে চশমা খুলে ফেলুন।"

রা জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কে?"

লোকটি বলল, "প্রশ্ন করলেই উত্তর পাবার অধিকার সবার থাকে না। বিশেষত বন্দীদের থাকে না।"

লোকটার গলার আওয়াজ খুব কর্কশ। কিংবা ইচ্ছে করেই ওদের ভয় দেখাবার জন্যই বোধহয় হেঁড়ে গলায় কথা বলছে।

এবার রা কোটের পকেট থেকে ডান হাতটা বার করল। সেই হাতে খুব ছোট্ট একটা রিভলভার। সেটা দিয়ে সে লোকগুলোকে গুলি করবার কিংবা ভয় দেখাবার কোনো চেষ্টাই করল না। সামনের মাটিতে একখণ্ড পাথরের দিকে ট্রিগার টিপল। কোনো শব্দ হল না, কিন্তু দেখা গেল কোনো অদৃশ্য শক্তিতে সেটা মুড়মুড় করে ভেঙে যেতে যেতে একেবারে ধুলোর মতন গুঁড়িয়ে গেল।

রা মুখ তুলে বলল, "এই পিস্তলটা দিয়ে ইচ্ছে করলে মানুষ কিংবা তার চেয়েও বড় কোনো প্রাণীর দেহ গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়।"

চৌকো বাক্সওয়ালা লোকটি বলল, "এবার এদিকে দেখুন!"

লোকটি তার হাতের বাক্সটায় একটা বোতাম টিপতেই একটা আলোর রেখা গিয়ে পড়ল আর-একটা পাথরের ওপর। সঙ্গে-সঙ্গে পাথরটা এক লাফে উঠে গেল শূন্যে।

লোকটি বলল, "মানুষের চেয়েও কোনো বড় প্রাণীকে এই ভাবে আমি চোখের নিমেষে কাছে টেনে আনতে পারি কিংবা দূরে সরিয়ে দিতে পারি।"

রা জিজ্ঞেস করল, "আমার এই অস্ত্রটা আপনার বাক্সটাকে তার আগেই গুঁড়ো করে ফেলতে পারবে না বলতে চান?"

"চেষ্টা করে দেখুন।"

"তার দরকার নেই, আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট!"

"এবার আপনারা দু'জনে চশমা খুলে ফেলুন!"

"না, আমরা চশমা খুলব না।"

"বুঝতেই পারছেন প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই।"

ইনফ্রা রেড চশমা না পরে থাকলে এই লালগোলাপ গ্রহটিতে খালি চোখে কিছু দেখা যায় না তো বটেই, কয়েক ঘণ্টা সেরকমভাবে থাকলে অন্ধ হয়ে যাবারও সম্ভাবনা। রা তা জানে।

নী রা-এর বাঁ হাত চেপে ধরে বলল, "রা-দি, এই লোকগুলোই নিশ্চয়ই মেঘ-চোর।"

রা কিন্তু একটুও ভয় পায়নি। সে কোটের পকেট থেকে দুটো ট্যাবলেট বার করে একটা নী-কে দিয়ে বলল, চট করে
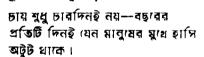
খেয়ে নে। একটু দূরে সরে দাঁড়া। খবর্দার, আমাকে আর ছুঁবি না।"

অন্য লোকগুলো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মতন। ওদের হাতে কিন্তু কোনো অস্ত্র নেই। বাক্সওয়ালা লোকটিই আবার বলল, "শুধু-শুধু সময় নষ্ট করবেন না। আপনারা চলুন, আপনাদের একটা তাঁবুতে রাখা হবে, সেখানে খাবার দাবারের কোনো কষ্ট নেই। আপনাদের চশমা দুটোও আমরা একটু পরে ফেরত দেব। আপনাদের রকেটটা আমাদের চাই।"

রা লোকটিকে ধমক দিয়ে বলল, "আপনারা বিপদে পড়ার ভান করে সাহায্য চেয়ে খুব অন্যায় করেছেন। ভবিষ্যতে আবার কেউ যদি বিপদে পড়ে সাহায্য চায়, আমরা কি তাকে অবিশ্বাস করব? ভাবব, আবার কোনো বদমাস লোক মিথ্যে সাহায্য চাইছে?"

লোকটি বলল, "সেরকম সুযোগই আর আপনাদের আসবে না।"

"আপনারা আমাদের রকেটটা নিতে চাইছেন। কিন্তু ঐ রকেটে আমাদের দু'জন সঙ্গী আছে। তারা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে।"

"আপনাদের পুরুষরা বুঝি মেয়েদের রকেট চালাতে দিয়ে নিজেরা ঘুমোয়?' বাঃ, চমৎকার তো!"

"কতটা চমৎকার, তা বোঝার ক্ষমতা আপনার নেই মনে হয়। যাই হোক, যা বলছিলাম, ওরা ঘুমিয়ে আছে ওদের জাগানোও যাবে না, নামানোও যাবে না। সুতরাং তাদের সুদ্ধ আপনারা রকেটটা নেবেন কী করে?"

"সে আমরা ব্যবস্থা করব! তাতে আমাদের কোনো অসুবিধে নেই।"

"তার মানে রকেট চালিয়ে দিয়ে এক সময় ওদের আপনারা কলা কিংবা কমলালেবুর খোসা ছোঁড়ার মতন বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন, তাই না? আপনারা জানেন না, মহাশূন্যে কোনো-রকম আবর্জনা ফেলা নিষেধ?"

"ভদ্রমহোদয়া, আপনি দেখছি খুব সুন্দর কথা বলতে পারেন। আমি দুঃখিত যে, আপনার সুন্দর-সুন্দর কথা শুনে সময় নষ্ট করতে পারছি না এখন। আমাদের সঙ্গে চলুন। আশা করি আমাদের জোর করতে বাধ্য করবেন না।"

"আপনারা কেন আমাদের বন্দী করছেন?"

"আমরা কে, কেন আপনাদের বন্দী করছি, এই সব ছেলে-মানুষি প্রশ্ন কেন করছেন? কোনোটারই উত্তর দেব না।"

"উত্তর দিতে হবে না, আমি বলছি শুনুন। আপনারা পৃথিবীর লোক নন। প্রথম সাহায্য চাইবার সময় আপনারা রাশিয়ান ভাষা বলেছিলেন, কিন্তু আপনারা যে রাশিয়ান নন, সেটা তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল। আপনারা যে এসপারান্টো বলছেন, তাও অন্যরকম। রকেটকে আপনি বলছেন রকাইট, কান্নুংগাকে আপনারা বলছেন কান্নুনজা, সুন্দরকে বলছেন, ছুইন্ডার! আপনারা শুক্রগ্রহের মানুষ, তাই না?"

শুক্রগ্রহের লোক অবশ্য পৃথিবীর মানুষই। আজ থেকে বাষট্টি বছর আগে মানুষ জয় করেছিল শুক্রগ্রহ, সেটা একুশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কথা। শুক্রগ্রহে আলো-হাওয়া খুব খারাপ বলে প্রথমে কয়েকজন ফাঁসির আসামিকে পাঠানো হয়েছিল সেখানে। তারা বেঁচে যেতে, তারপর থেকে বেশ কয়েক বছর শুধু চোর-গুণ্ডা-বদমাসদের নির্বাসন দেওয়া হত শুক্রগ্রহে। ক্রমশ সেই লোকগুলোই শুক্রগ্রহে চাষবাস করে, শহর বানিয়ে খুব উন্নতি করেছে। কিছুদিন হল তারা বিজ্ঞানেও খুব উন্নতি করেছে বলে শুনেছে রা। সে অবশ্য শুক্রগ্রহে একবারও যায়নি। লোকগুলো তা হলে এতদূর এগিয়েছে যে, সূর্যমণ্ডলের বাইরেও যেতে শিখেছে? এ-খবর পৃথিবীর লোক বোধহয় এখনো জানে না।

বাক্সওয়ালা লোকটি বলল, "আপনার বুদ্ধি আছে, তা স্বীকার করতেই হবে। এখন চলুন তো। চশমা যদি না খোলেন, তা হলে জোর করে খুলে নিতেই হবে।"

রা ওভারকোটের হাতা সরিয়ে ঘড়ি দেখল। ছোট রিভল-ভারটা সে আগেই পকেটে ভরে ফেলেছে। একেবারে খালি হাতে সে বাক্সওয়ালা লোকটির দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, "ছিঃ, ওরকম কথা বলে না। কোনো মেয়ের চোখ থেকে জোর করে চশমা খুলে নিতে নেই।"

রা আরও এক পা এগুতেই লোকটি বাক্সের বোতাম টিপল। তাতে রা পাথরের টুকরোটার মতন আকাশেও উড়ে গেল না, লোকটির কাছে গিয়ে হুমড়ি খেয়েও পড়ল না। সে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। রা হাসিমুখে লোকটির দিকে চেয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর ডান হাতটা বাড়িয়ে বলল, "আপনি আমায় ধরুন তো!"

স্পেস হেলমেট পরে থাকায় লোকটি যে কত অবাক হয়েছে তা তার মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই। তবে তার চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে গেছে। রা-কে সে ছুঁতে সাহস করল না।

রা বলল, "আপনি আমায় ধরবেন না? কিন্তু আপনাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তা হলে আমি আপনাকে একবার জড়িয়ে ধরি?"

রা লোকটির কাঁধে হাত রাখতেই লোকটি বাক্স সমেত ছিটকে গিয়ে দূরে পড়ল। অন্য লোকগুলোর মধ্যে দু-তিনজন ঠিক এই সময় দৌড়ে ধরতে গেল নী-কে, তাদেরও ঠিক একই অবস্থা হল। নী-র গায়ে হাত দেওয়া মাত্রই তারাও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

রা আর নী একটু আগে যে ট্যাবলেট খেয়েছে, তার ফলে তাদের শরীরে দারুণ শক্তিশালী বিরুদ্ধ-চুম্বকশক্তি জন্মে গেছে। কোনো জীবিত প্রাণী তাদের ছুঁতে পারবে না। এটা হচ্ছে সবচেয়ে নতুন আত্মরক্ষার অস্ত্র। এতে কেউ মরে যায় না, কিন্তু উচিত শাস্তি পায়।

যে একটা মাত্র লোক রা কিংবা নী-কে ছোঁয়নি, সে ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে দু-একবার এদিক-ওদিক তাকাল, তারপর দৌড়ে গেল রা-দের রকেটটার দিকে।

বাক্সওয়ালা লোকটা মাটিতে পড়ে গিয়েও চেঁচিয়ে বলল, "এস্ এস্, শিগগির রকেটটা দখল করো।"

লোকটা রকেটের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল তরতরিয়ে।

রা কিন্তু সেই লোকটাকে বাধা দেবার কোনো চেষ্টাই করল না। সে হাসিমুখে তাকিয়ে রইল নিজেদের রকেটটার দিকে। শুক্রগ্রহের লোকটি ভেতরে ঢোকার একটু পরেই আঁ আঁ করে দারুণ ভয়ার্ত চিৎকার শুরু করল। তারপর চিৎকারটা এমন ভাবে থেমে গেল যে, বোঝা যায়, লোকটি অজ্ঞান হয়ে গেছে।

রা বাক্সওয়ালার দিকে চেয়ে বলল, "তোমাদের ঐ বন্ধুটি আর ফিরবে না। মূর্খ, শেষ অস্ত্রটির কথা আগে কক্ষনো জানাতে নেই।"

তারপর সে নী-কে ডেকে বলল, "চল রে, নী, আমরা রকেটে ফিরে যাই।"

মাটিতে শুয়ে থাকা বাক্সওয়ালাকে রা বলল, "কী, আর একবার ছুঁয়ে দেব নাকি?"

লোকটি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "না, না, না, না!"

"আমরা এখন চলে যাচ্ছি বটে, তবে চিন্তা করবেন না, আমরা আবার ঠিক ফিরে আসব। ততক্ষণ পর্যন্ত গুড্ লাক। আপনারা কি পৃথিবীর হিসেব জানেন? পৃথিবীর সময়ের হিসেব অনুযায়ী আর ঠিক ষোলো মিনিট পরে আপনারা উঠে

দাঁড়াতে পারবেন। আচ্ছা ডাকাতবাবু, চলি এখন।"

নী একেবারে হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে আছে। তিনটে অত বড় বড় চেহারার লোক যখন তাকে ধরবার জন্য ছুটে এসেছিল, তখন আর-একটু হলেই সে ভয়ে দৌড় মারত। লোকগুলো কী ভাবে ছিটকে পড়ল তা সে বুঝতেই পারছে না। নী ছেলেমানুষ, সে এই অস্ত্রটার কথা কিছুই জানে না। সামান্য একটা ট্যাবলেট যে অস্ত্র হতে পারে, সে বুঝবে কী করে?

রা নী-র কাছে এসে বলল, "শোন্, তুই আগে আগে চল্। ভেতরে ঢুকেই দেখবি ঐ লোকটা অজ্ঞান হয়ে আছে। ভয় পাবি না, আর খবর্দার, কোনো কারণেই আমাকে ছুঁয়ে ফেলবি না কিন্তু। ভেতরে গিয়েই তুই স্নানের ঘরে ঢুকে পড়বি। সেখানে দেখেছিস তো জলের শাওয়ারের কলের পাশেই আর-একটা কল আছে? সেটা ভুঁতে-আলোর শাওয়ার। সেই আলোতে স্নান করে নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে!

নী প্রথমে সিঁড়ি দিয়ে রকেটে উঠল, তারপর উঠল রা। কক্‌পিটের কাছেই মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে সেই লোকটা। সেদিকে বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে রা রকেটের সিঁড়ি তুলে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর বলল, "ধন্যবাদ জিউস! জীবন সুন্দর তো?"

কমপিউটার জিউস খুব নরম বকুনির সুরে বলল, "রা, নীচে নামার আগে তোমার উচিত ছিল আমাকে একবার জিজ্ঞেস করা! হ্যাঁ, জীবন সুন্দর।"

রা বলল, "ভুল হয়ে গেছে। এই নী মেয়েটা এমন তাড়াহুড়ো করল! ছেলেমানুষ তো, বড্ড আবেগপ্রবণ। তবু আমি জানতাম, আমি ভুল করলেও তোমার সাহায্য পাবই!"

"রকেট তাড়াতাড়ি চালু করে দাও, রা। ওরা এক রকম গোলা ছোঁড়বার চেষ্টা করছে।"

"অদ্ভুত তো লোকগুলো! গোলা ছুঁড়ে আমাদের রকেটটা নষ্ট করে ওদের কী লাভ?"

"তুমি এন্ ফ্রিকোয়েন্সি মাইক্রোওয়েভ পাঠিয়ে দাও, তাতেই ওরা ঠান্ডা হয়ে যাবে।"

"না, না, আমি ওদের মারতে চাই না। আমি কোনো মানুষকেই মারতে চাই না। এই লোকগুলো বোধহয় পাগল, নইলে এমন করবে কেন?"

জিউস হা হা করে হেসে উঠল। জিউস এমনিতে খুব কম হাসে।

রা ততক্ষণে রকেট চালু করে দিয়েছে। ওভারকোটটা খুলে ফেলে সে হাল্কা হয়ে নিল। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল লালগোলাপের মেঘ ভেদ করে কতকগুলো আগুনের গোলা ছুটে আসছে। সেজন্য সে একটুও চিন্তিত হল না। ঐ গোলার একটাও তার রকেট ছুঁতে পারবে না।

রকেট চালু হবার পর আসন-বন্ধনী খুলে উঠে এসে মাটিতে-পড়ে-থাকা লোকটির পাশে দাঁড়াল। রকেট ছাড়ার সময় প্রথম ঝাঁকুনিতে লোকটি দেয়ালের গায়ে একটা ধাক্কা খেয়েছে।

রা বলল, "ইস ওর কথা খেয়াল করিনি তো!"

লোকটার একটা হাত পিঠের নীচে পড়েছে বলে নী সেটা ঠিক করে দিতে যাচ্ছিল, রা তাকে এক ধমক দিয়ে বলল, "এই কী করছিস? তুই লোকটাকে মারবি নাকি? এখনো আমাদের শরীর চুম্বক-বিরোধী হয়ে আছে না? যা, শিগগির স্নান করে আয়!"

দু'জনে দুটো বাথরুমে ঢুকে ঝটপট স্নান করে পোশাক বদলে বেরিয়ে এল। কড়া ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় ওদের চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে।

লোকটির কাছে এসে রা নী-কে বলল, "তুই ওর পা দুটো ধর তো, ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। দেরি হয়ে গেল!"

দু'জনে ধরাধরি করে ওকে নিয়ে এল স্বয়ংক্রিয় হাসপাতালে। লোকটিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে রা বলল, "জিউস একে একটু চটপট দেখবে?"

জিউস বলল, "তুমি ওর মাথা থেকে স্পেস-হেলমেটটা খুলে নাও।"

রা স্পেস-হেলমেটটা খুলে নিয়ে দেখল, লোকটির বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি, গালে অল্প-অল্প দাড়ি, বাঁ চোখের ঠিক ওপরেই একটা কাটা দাগ। লোকটির চুল ও দাড়ির রং হলদে-হলদে, তা দেখে রা অবাক হল না। শুক্রগ্রহে মানুষের চুল-দাড়ির রং এ-রকম বদলে গেছে, সে আগেই শুনেছে।

দুটি রবারের হাত বেরিয়ে এসে পরীক্ষা করতে লাগল লোকটাকে।

রা আবার জিজ্ঞেস করল, "লোকটা বাঁচবে তো জিউস?"

জিউস বলল, "তুমি যখন কোনো মানুষকে মারতে চাও না, তখন ওকে বাঁচতেই হবে।"

রবারের হাত দুটিই লোকটিকে পটাপট ইঞ্জেকশান দিতে লাগল।

একটু পরে জিউস বলল, "শোনো রা, এই লোকটি কতখানি হিংস্র, আমরা জানি না। জ্ঞান ফিরে পাবার পরই যদি ও তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে? ওর গায়ে যে-রকম শক্তি, তোমরা দু'জনে তো ওর সঙ্গে পারবে না!"

"তুমিই তো রয়েছ জিউস। তুমি আমাদের রক্ষা করবে।"

"তাতে একটু অসুবিধে আছে।"

"কিন্তু লোকটা রকেটে ওঠা মাত্রই তো তুমি ওকে ঠান্ডা করে দিলে।"

"হ্যাঁ তখন অতিকম্পন দিয়ে আমি ওকে মাটিতে ফেলে

দিয়েছিলাম। কম্পন আর একটু বাড়ালে ওর হাত-পাগুলো টুকরো-টুকরো হয়ে যেত। কিন্তু তোমরা কাছাকাছি থাকলে তো তা পারব না। সেইজন্যই আমি বলি কী, ওকে এখন ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করে রাখা হোক।"

"কিন্তু আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই যে! ওরা কেন আমাদের বন্দী করে রকেটটা নিয়ে নিতে চাইছিল, তা আমি জানতে চাই।"

"তুমি জেরা করে ওর পেট থেকে কথা বার করবে ভাবছ? তা তুমি পারবে না। বরং ইউনুস জেগে উঠুক—"

"তুমি যন্ত্র হয়েও মেয়ে আর ছেলেতে কেন তফাত করো বলো তো? ইউনুস ছেলে বলেই পারবে, আর আমি মেয়ে বলে পারব না?"

"আমি সেভাবে বলিনি। তুমি রাগ করছ কেন, রা? মনের শান্তি কত দুর্লভ, তা কি যখন-তখন নষ্ট করতে আছে? শান্তি, শান্তি, শান্তি, তোমার মন শান্ত হোক!"

জিউসের গলায় দুঃখের সুর পেয়ে রা তক্ষুনি বলল "আমি অন্যায় ভাবে রাগ করেছি জিউস। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।"

জিউস বলল, "তোমায় ক্ষমা চাইতে হবে না। সত্যিই তো আমি যন্ত্র;আমার রাগ নেই, দুঃখ নেই, হিংসা নেই, মায়া-মমতা নেই। তোমরা তো এগুলো আমায় দাওনি। মেয়ে-পুরুষের তফাতও আমি বুঝি না। আমি বলছিলাম কী, মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে দু'চোখের দৃষ্টি এক করে তার মনের কথা পড়ে ফেলার ব্যাপারে ইউনুস এক বছর ট্রেনিং নিয়েছে। তুমি তো সে ট্রেনিং নাওনি!"

"ও, ঠিক তো, আমি ভুলে গিয়েছিলাম! তা হলে—"

রা-র কথা শেষ হল না। শুক্রগ্রহের লোকটি লাফ দিয়ে খাট থেকে নেমেই নী-কে ধরে কাঁধে তুলে নিল।

তারপর রা-কে হুকুম করল, "এক্ষুনি রকেটের মুখ ঘোরাও। আমরা লালগোলাপে ফিরে যাব।

ব্যাপারটা একেবারে চোখের নিমেষে ঘটে গেল। জিউসের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে রা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। লোকটার জ্ঞান নিশ্চয়ই আগেই ফিরে এসেছে, এতক্ষণ ওদের কথা শুনেছে।

নী ছটফট করছে, কিন্তু লোকটির গায়ে দারুণ শক্তি। শক্ত করে চেপে ধরে আছে নী-কে।

জিউস বলল, "আমি এই ভয়ই পাচ্ছিলাম।"

লোকটি বলল, "আমার কোনো ক্ষতি করবার চেষ্টা করলেই এই মেয়েটিকে আমি আগে মেরে ফেলব! এক্ষুনি কর্কপিটে চলো, রকেট ঘোরাতে হবে।"

রা গম্ভীরভাবে বলল, "আমি জানি আপনার নাম এস। জীবন কী-রকম শ্রীযুক্ত এস?"

লোকটি বলল, "ওসব তোমাদের পৃথিবীর ন্যাকামি-কথা ছাড়ো! চলো কক্‌পিটে।"

রা হাত তুলে লোকটিকে আদেশ দিল, "আপনি ঐ মেয়েটিকে নামিয়ে দিন। আর ভদ্রভাবে কথা বলুন, শ্রীযুক্ত এস!"

এর উত্তরে লোকটি ঘরের দেয়ালে ঠকাস করে নী-র মাথাটা ঠুকে দিয়ে বলল, "এই দেখলে? আর-এক ঠোকায় এর মাথাটা ছাতু করে দিতে পারি। যদি এই মেয়েটিকে বাঁচাতে চাও, তবে আমার হুকুম মানতে তোমরা বাধ্য।"

নী চেঁচিয়ে বলল, "রা-দি, ও আমায় মেরে ফেলুক তবু তুমি ওর কথা শুনো না!"

লোকটা দড়াম করে লাথি দিয়ে হাসপাতাল ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে।

জিউস বলল, "রা, দ্যাখো, তোমরা বিজ্ঞানে এত উন্নতি করছ, তবু শেষ পর্যন্ত মানুষের গায়ের জোরই জিতে যাচ্ছে।"

রা বলল, "তুমি নজর রাখো, জিউস। ও কোনো-না-কোনো ভুল করবেই। গায়ের জোর নয়, শেষ পর্যন্ত জেতা যায় মনের জোরে।"

রা-ও হাসপাতাল-ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

নী-কে কাঁধে চেপে ধরে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে কক্‌পিটের সামনে। রা-কে দেখে সে বলল "অতিকম্পন দিয়ে আমাদের দুজনকেই মাটিতে ফেলে অজ্ঞান করার চেষ্টা যদি করো, তাহলে প্রথম ঝাঁকুনি লাগার সঙ্গে-সঙ্গে আমি মেয়েটাকে মেরে ফেলব। তারপর আমার যা হয় হোক।"

নী লোকটির একটা কান কামড়ে ধরল।

লোকটি যন্ত্রণায় দু'বার আ আ চিৎকার করেই রাগে গর্জন করে রা-কে বলল, "শিগগির ওকে বারণ করো। নইলে আমি এক্ষুনি ওকে শেষ করে দেব!"

রা বলল, "নী, ওরকম করে না! ছেড়ে দে। ও যতই অসভ্যতা করুক, তা বলে আমরা করব কেন!"

নী ওর কান ছেড়ে দিতেই লোকটি তাকে নামিয়ে নিজের সামনে রেখে কাঁধ দুটো শক্ত করে চেপে ধরে রইল। লোকটির পিঠ দেয়ালের দিকে।

কক্‌পিটের ওপরের দিকে বিপ বিপ শব্দ হতে লাগল। বাইরে থেকে কোনো খবর এসেছে।

লোকটি বলল, "ফোন ধোরো না! রকেটের মুখ ঘোরাও।"

রা বলল, "অত চেঁচিয়ে কথা বলার দরকার নেই। আমরা লালগোলাপেই ফিরে যাচ্ছি।"

রা নিজের আসনে বসে কয়েকটা বোতাম টিপল।

লোকটি বলল, "আমার সঙ্গে চালাকি কোরো না। অন্য কোনো দিকে গেলে আমি ঠিক বুঝতে পারব। তুমি স্ক্যানার দেখাও, কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যাচ্ছ, আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।"

রা বলল, "মূর্খ, আমি লালগোলাপে যাবার নাম করে যদি তোমাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্পেস-স্টেশন নং একুশে নিয়ে যাই, তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না। এই রকেটের স্ক্যানার দেখে বুঝতে পারে, এমন লোক মাত্র তিনজন আছে। কিন্তু আমি মিথ্যে কথা বলি না। তোমরা পৃথিবী থেকে অনেকদিন আগে শুক্রগ্রহে চলে গেছ বলে, আগেকার পৃথিবীর মানুষদের খারাপ দোষগুলো এখনো ভুলতে পারোনি। ঐ দ্যাখো লালগোলাপ!"

ককপিটের সামনের কাচে লালগোলাপ উপগ্রহের এক হাজার গুণ বড় করা ছবি ফুটে উঠল। সেটা ক্রমশ আরও বড় হচ্ছে।

লোকটির মুখে এবার হাসি ফুটে উঠল। সে জিজ্ঞেস করল, "কতক্ষণের মধ্যে পৌঁছোব?"

রা ঘড়ি দেখে বলল, "ধরো, আর পনেরো মিনিট।"

নী ব্যাকুলভাবে বলল, "রা-দি, তুমি কী করছ? ওরা আমাদের রকেটটা কেড়ে নিয়ে লালগোলাপে আমাদের ফেলে রেখে পালাবে। তাতে তো আমরা এমনিই মরব। তারচেয়ে বরং আমি একলা মরি। তারপর তুমি এই লোকটাকে শাস্তি দিও!"

রা বলল, "মরা কি অত সহজ নাকি? সুন্দর এই জীবন, সময় ফুরোবার আগে কেন এই জীবন নষ্ট হবে?"

আর তখনই রকেটের আর একটা চেম্বারে ঝিনঝিন ঝিনঝিন করে বেজে উঠল একটা ঘড়ির অ্যালার্ম। আওয়াজটা খুব জোর নয়। কিন্তু রা শুনতে পেয়েছে ঠিক।

॥ ৫ ॥

পৃথিবীর হিসেবে আঠাশ দিন, আর মহাকাশের হিসেবে একদিন পর ঘুম ভাঙল ঝিলমের। ঘড়ির অ্যালার্ম বাজে তার ঘুম ভাঙাবার জন্য নয়, অন্যদের জানাবার জন্য। ট্যাবলেট খাওয়া ঘুম কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক সময়ে ভাঙে।

চোখ মেলে ঝিলম এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটু অবাক হল। রা পাশে নেই কেন? হাত দিয়ে কাচের ডালাটা ঠেলে তুলল সে।

মহাশূন্যে অনেকদিন ঘুরে বেড়ালেও মানুষের শরীর এখনো পৃথিবীর নিয়মে চলে। এতক্ষণ পরে ঘুম ভাঙলেই খিদে পায় খুব, শরীর দুর্বল লাগে। সেইজন্যই গ্লুকোজ মেশানো কমলালেবুর রস নিয়ে একজন কারুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ম। উঠে বসতেই ঝিলমের মাথাটা যেন ঝিমঝিম করে উঠল, আর তখনই কে যেন তার কানের পাশে ফিসফিস করে বলল, "সুপ্রভাত, ঝিলম!"

ঝিলম বলল, "সুপ্রভাত, জিউস। জীবন সুন্দর তো?"

জিউস বলল, "ততটা সুন্দর বলতে পারছি না। এই রকেটে অন্য একজন লোক আছে,...সে তোমাদের সকলকে বন্দী করবার জন্য লালগোলাপ উপগ্রহে নিয়ে যাচ্ছে।"

"অ্যাঁ?"

"উত্তেজিত হয়ো না। উঠে দাঁড়িয়ো না। এক্ষুনি উঠলেই তুমি মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। আমি দুঃখিত। আমার হাত অত বেশি লম্বা নয় বলে তোমাকে ফলের রস পৌঁছে দিতে পারছি না। একটু বিশ্রাম নাও!"

সেই কাচের বাক্সের মধ্যেই বসে থেকে দু'হাতে মুখ ঢেকে ঝিলম জিজ্ঞেস করল, "রা আর নী কোথায়?"

"সেই লোকটা ওদের আটকে রেখেছে!"

"তুমি কী করছ? তোমাকে তো আটকে রাখেনি। তুমি ঐ একটা মাত্র লোককে—"

"এ ক্ষেত্রে আমি অসহায়।"

সঙ্গে-সঙ্গে ঝিলম উঠে দাঁড়াল।

জিউস বলল, "আর-একটু থাকো, আর একটু বিশ্রাম নাও, সময় হলে আমি বলে দেব—"

"আমি ঠিক আছি।"

কাচের বাক্সটার বাইরে বেরিয়ে এসে ঝিলম প্রায় টলতে-টলতে চলে এল পাশের রান্নাঘরে। ঘুম থেকে উঠে ঝিলম ফলের রস, তারপর টোস্ট, সসেজ, সমুদ্র-শ্যাওলার সালাড আর তিমিমাছের কেক খেতে ভালবাসে। এখন সে খুব তাড়াতাড়ি এক ঢোক ফলের রস, কয়েকখানা বিস্কিট আর গোটা ছয়েক নিউট্রিশন ট্যাবলেট খেয়ে নিল। রকেটের সব জায়গাতেই কথা বলার টিউব আছে, জিউস এখানেও ফিসফিস করে তাকে সব ঘটনাটা শুনিয়ে যাচ্ছে।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে, ঘুম-ঘরে আবার ঢুকে ঝিলম একটা পোশাকের ওয়ার্ডরোব খুলল। সেখানে কিছু পোশাক আর জুতো সাজানো। জুতোগুলোর মধ্যে ব্যস্তভাবে খুঁজতে লাগল ঝিলম, কিছুতেই যেন পছন্দমতন জুতোজোড়া খুঁজে পাচ্ছে না।

জিউস বলল, "জুতোর জন্য তুমি সময় নষ্ট করছ, ঝিলম? এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান!"

ঝিলম তাকে এক ধমক দিয়ে বলল, "বিপদে পড়লে দেখছি তোমারও মাথা খারাপ হয়ে যায়, জিউস! সব দিক চিন্তা করতে ভুলে যাও! মনে হচ্ছে তোমার একবার ওভারহলিং দরকার!"

এই রকেটে একমাত্র ঝিলমই জিউসকে ধমকে কথা বলতে পারে। ঠিক জুতো-জোড়া খুঁজে পেয়ে পরে নিতে-নিতে ঝিলম একবার ইউনুসের দিকে তাকাল। ইউনুসের ঘুম ভাঙতে আরও কয়েকদিন দেরি আছে।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলে ককপিট দেখা যায়। ককপিটের সামনে অনেকখানি লম্বা জায়গা। ঝিলম দেয়াল ধরে-ধরে একটু-একটু করে এগোতে লাগল, যেন পা ফেলতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে।

ঝিলমের বয়েস চব্বিশ, গায়ের রং কুচকুচে কালো, সে খুবই সুপুরুষ। সাদা ট্রাউজার্স আর হাতকাটা সাদা গেঞ্জি পরে আছে সে, তার সঙ্গে খুবই বেমানান টুকটুকে লাল রঙের জুতো। খুবই জোর করে পা টেনে-টেনে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল ওপরে।

রা এদিকেই তাকিয়ে ছিল। ঝিলমকে দেখেও একটা কথা বলল না।

নী উত্তেজনা দমন করতে পারল না। চেঁচিয়ে উঠল, "ঝিলমদা, চলে যাও, শিগগিরই চলে যাও!"

দেয়ালে ভর দিয়ে হাঁপাতে লাগল ঝিলম।

এস নামের লোকটি ঝিলমকে দেখে নীকে আবার শক্ত করে চেপে ধরে বলল, "কোনোরকম ছেলেমানুষি চেষ্টা করে লাভ নেই। আমরা এক্ষুনি লালগোলাপে নামছি।"

ঝিলম লোকটির কথা একেবারেই গ্রাহ্য না করে রা-র দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, "রা, আমি এই রকেটের কমান্ডার হিসেবে বলছি, এক্ষুনি এই রকেটের ট্রাজেকটরি বদলাও। আমরা রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্পেস স্টেশন নং ২৭-এ যাব। গড স্পীড!"

এস রা-কে বলল, "রকেটের গতি পালটালে এই মেয়েটার কী দশা হবে তা তুমি ভাল করেই জানো!"

রা একবার ঝিলমের দিকে আর একবার এস-এর দিকে

-কাল।

ঝিলম বলল, "রা, আমার হুকুম শুনতে পাওনি?"

রা ঝিলমকে বলল, "কমান্ডারের হুকুম আমি মানতে বাধ্য।"

এস ঝিলমের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলল, "এই খোকাটি দেখছি ভাল-মন্দ কিছুই বোঝে না। এখানে রক্তপাত হোক, ও চায়?"

রকেটের মুখটা তক্ষুনি যে বেঁকে গেল, তা বুঝতে কারুরই অসুবিধে হল না। সামনের স্ক্রীন থেকে লালগোলাপের ছবি সরে গেল।

এস নী-কে উঁচুতে তুলে দাঁত চিবিয়ে চিবিয়ে বলল. "এই মেয়েটাকে আছড়ে আমি ঐ মেয়েটাকে মারব। আমি ঠিক পাঁচ গুনব, তার মধ্যে রকেট যদি লালগোলাপের দিকে না ফেরে—"

ঝিলম বলল, "গুনবার দরকার নেই. তুমি ঐ মেয়ে দুটিকে মারো, আমি সেই দৃশ্যটা দেখতে চাই।"

ঝিলম দেয়াল থেকে হাত তুলে নিতেই স্প্রিংয়ের মতন লাফিয়ে চোখের পলক ফেলার আগেই এস্ নামে লোকটির ওপরে গিয়ে পড়ল। ধস্তাধস্তি বিশেষ হল না. তার আগেই ঝিলম নী-কে ছাড়িয়ে নিয়েছে। তারপর এস-এর চিবুকে পরপর ঘুঁষি মেরে চলল সে।

রা উঠে এসে বলল, "ঝিলম, এবার ছেড়ে দাও। হাজার হোক, মানুষ তো? মরে যাবে যে লোকটা!"

লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে। হাত-পা ছড়িয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে।

জোরে-জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে ঝিলম বলল, "এই বদমাসটা নী-কে কষ্ট দিয়েছে বলেই আমার অত রাগ হয়ে গিয়েছিল। আর একটু হলে বোধহয় ওকে আমি একেবারে শেষ করেই ফেলতাম!"

পা থেকে লাল জুতোজোড়া খুলে ফেলে ঝিলম নী-র দিকে চেয়ে বলল, "তোমার বেশি লাগেনি তো, নী?"

নী বলল. "না, ঝিলমদা! উঃ, তোমার গায়ে কী জোর! অতবড় চেহারার লোকটাকে তুমি ঘুঁষি মেরে ঠান্ডা করে দিলে? অত জোরে তুমি লাফ দিলেই বা কী করে?"

ঝিলম বলল, "ওসব কথা পরে হবে। আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমার জন্য খাবার তৈরি করে আনবে?"

রা বলল, "আমি তোমার জন্য খাবার এনে দিচ্ছি, ঝিলম। ততক্ষণ তুমি কন্ট্রোলে বসো।"

ঝিলম উঠে দাঁড়াতেই কমপিউটার জিউস জানাল, "এই লোকটি কিন্তু অজ্ঞান হয়নি। চোখ বুজে অজ্ঞানের ভান করে আছে।"

ঝিলম বলল, "ওর হাত দুটো বেঁধে রাখা দরকার, যাতে হঠাৎ কোনো পেজোমি করতে না পারে আবার। রা, দড়ি-টড়ি কিছু আছে?"

রা হাসিমুখে বলল, "দড়ি কোথায় পাব? রকেটে কখনো দড়ি লাগবে ভেবেছি নাকি?"

নী বলল, "আসবার সময় মা আমাকে যে কেকের বাক্সটা দিয়েছিলেন, সেটা একটা সুতো দিয়ে বাঁধা ছিল না?"

ঝিলম বলল, "সেটা ফেলে দাওনি তো? দ্যাখো তো সেটা অ্যালয় সুতো কি না!"

নী সুতোটা খুঁজে নিয়ে এল। খুব সরু সুতো, অনেকটা ঘুড়ি ওড়াবার সুতোর মতন, কিন্তু তাতে চার-পাঁচ রকমের রং। ঝিলম সুতোটা হাতে নিয়ে বলল, "বাঃ, এতেই কাজ চলবে। এই অ্যালয় সুতো কোনো গোরিলাও ছিঁড়তে পারে না।"

ঝিলম সুতোটা নিয়ে কাছে যেতেই লোকটা ধড়মড় করে উঠে বসল।

ঝিলম বলল, "আশা করি তুমি আবার আমায় ঘুঁষি মারতে বাধ্য করবে না! হাত দুটো উঁচু করো, আমি এই সুতোটা বেঁধে দেব!"

লোকটি বলল, "বাঁধবার দরকার নেই, আমি আর কিছু করব না।"

ঝিলম বলল, "তোমায় আমি বিশ্বাস করি না। যে একটা ছোট মেয়েকে তুলে আছাড় মারতে যেতে পারে, সে মানুষ নয়, অমানুষ।"

লোকটির হাত দুটো পিঠের দিকে নিয়ে সেই সরু সুতোটা দিয়ে বেঁধে ফেলল ঝিলম। তারপর তার কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা গোল বল বার করে আনল।

ঝিলম বলটা নেড়ে-চেড়ে দেখে বলল, "বিচ্ছিরি জিনিস! এ-রকম একটা জিনিস কেউ পকেটে ভরে রাখে?"

ঐ গোল বলটা একটা গ্রীনেড। সামান্য একটা টেনিস বলের মতন হলেও ঐ একটা গ্রীনেড দিয়েই এই রকেটটা উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

জিউস বলল, "ওটা হাতে রেখো না, ঝিলম। এক্ষুনি ওটা জলে ডুবিয়ে দাও!"

ঝিলম বলল, "জানি!"

বাথরুমে ঢুকে ঝিলম সেই বলটাকে সিঙ্কে ডুবিয়ে রেখে এল। তারপর কন্ট্রোল বোর্ডের সামনে চেয়ার নিয়ে বসতেই রা একটা প্লেটে সাজিয়ে খাবার এনে দিল তাকে।

ঝিলম বলল, "চমৎকার! এবার লক্ষ্মী মেয়ের মতন গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো তো!"

রা চমকে উঠে বলল, "সে কী! এখন আমি ঘুমোব?"

ঝিলম বলল, "নিশ্চয়ই? তোমার সময় হয়ে গেছে।"

রা মিনতি করে বলল, "না, এখন আমার একটুও ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না! এই লোকটাকে জেরা করতে হবে।"

"সে আমি করব। তোমার এখন জেগে থাকা চলবে না!"

"আমার বদলে নী ঘুমোতে যাক বরং!"

"ইউনুস জেগে উঠলে নী ঘুমোতে যাবে। ইউনুসের আর বেশি দেরি নেই।"

"একটা দিন না-ঘুমোলে কী হয়?"

"তোমার আঠাশ দিন বয়েস বেড়ে যাবে। আমরা আর যাই পারি, হারানো সময়কে কিছুতেই ফিরে পেতে পারি না। লক্ষ্মীটি, যাও!"

রা আর তর্ক করল না। ঘুমের ঘরে গিয়ে কাচের বাক্সটা খুলে একটা ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়ল।

নিজের খাবার শেষ করতে-করতে ঝিলম বলল, "নী, আমার পাশে এসে বসো। আমি যতক্ষণ খাই, ততক্ষণ তুমি একটা কবিতা শোনাও তো।"

নী বলল, "বেড়ালের মতন চেহারার একটা ধূমকেতু দেখে আমি একটা কবিতা বানিয়েছিলুম, তারপর এমন সব কাণ্ড হল যে, সেটা ভুলে গেলুম!"

"যাঃ! কবিতাটা হারিয়ে গেল? খুব দুঃখের কথা।"

"লালগোলাপে লোকগুলো যখন আমাদের ঘিরে ধরেছিল, তখন সত্যিই আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। রা-দি কিন্তু একটুও ভয় পায়নি। তুমি তো জানো না ঝিলমদা, এর আগেও কী একটা দারুণ কাণ্ড হয়েছিল। আমি একটা মেঘে সাঁতার কাটতে নেমেছিলুম—"

নী তখন মেঘ চুরির ঘটনাটা শোনাল।

ঝিলম খাবার শেষ করে কন্ট্রোল বোর্ডের অনেকগুলো বোতাম টিপতে লাগল টপাটপ করে। তারপর গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, মহাশূন্য স্টেশন নং চোদ্দতে পৌঁছোতে কতক্ষণ লাগবে, জিউস?"

"তিন ঘন্টা এগারো মিনিট সাত সেকেন্ড!"

"চমৎকার!"

চেয়ারটা হাত-বাঁধা লোকটির দিকে ঘুরিয়ে ঝিলম জিজ্ঞেস করল, "এবার তোমার গানটা শোনাও!"

লোকটি বললো, "গান? আমি তো গান জানি না!"

ঝিলম বলল, "যা জানো তাতেই হবে। শুরু করো, শুরু করো!"

"সত্যিই আমি গান জানি না!"

"তোমার গলায় যে সুর নেই, তা তো বুঝতেই পারছি। তোমার কাছ থেকে কি আমি ওস্তাদি গান শুনতে চাইছি? তোমার মাথার হলদে চুলই বলে দিচ্ছে তুমি শুক্রগ্রহের মানুষ। তোমরা তো বেশ উন্নতি করেছ শুনেছি। সূর্যমন্ডলের বাইরে এসে তোমরা রকেট চুরি করতে শুরু করলে কেন?"

"বললাম তো, আমি কোনো গান জানি না!"

"আমার কাছে এমন যন্ত্র আছে, যা একবার তোমার গায়ে ছোঁয়ালে শুধু গান কেন তুমি তিড়িং-তিড়িং করে নাচতেও শুরু করবে। কিন্তু সেটা আমি ব্যবহার করতে চাই না।"

"আমাকে মেরে ফেললেও আমার মুখ দিয়ে একটাও কথা বেরুবে না।"

"এর মধ্যে মেরে ফেলার কথা উঠছে কেন? তোমায় মারব কেন? তোমরা বুঝি এখনো কথায়-কথায় মানুষ মারো?

লোকটি ঝিলমের দিকে কটমট করে চেয়ে রইল। আর কোনো কথা বলল না।

ঝিলম হেসে উঠল হো হো করে।

নী বলল, "ঝিলমদা, লোকটার চোখ দুটো দ্যাখো! তাকালেই কী রকম গা ছমছম করে।"

ঝিলম বলল, "আজ থেকে সাত-আট দিন পরে দেখো, ওর সব কিছু বদলে যাবে। ওর চোখের দৃষ্টি নরম হয়ে যাবে, লোকের সঙ্গে মিষ্টি ভাবে কথা বলবে, কারুকে খুন করার কথা স্বপ্নেও ভাববে না।"

"লোকটা হঠাৎ এরকম বদলে যাবে?"

"হ্যাঁ। মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে অনেকগুলো এলাকা আছে জানো তো? তার মধ্যে ৪৭ নং এলাকাটা অপারেশান করে বদলে দিলেই ও একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যাবে!"

ঝিলম লোকটিকে আবার বলল, "তুমি বুঝি ভাবছ, তুমি চুপ করে থাকলেই তোমার কথা আমরা জানতে পারব না? দাঁড়াও না, ইউনুস জেগে উঠুক, তখন দেখবে কী মজা হয়!"

ঝিলম টেলিফোনটা হাতে নিতেই নী বলল, "রা-দি রাষ্ট্র-সঙ্ঘ স্পেস স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছিল। পারেনি। লাইন জ্যাম হয়ে ছিল।"

ঝিলম বলল, "জিউস, দেখো তো এখন পাওয়া যায় কি না!"

জিউস উত্তর দিল, "ট্রাজেকটরি বদলাবার পর তরঙ্গ পরিষ্কার হয়ে গেছে।"

টেলিফোনে ওদিক থেকে গলার আওয়াজ ভেসে আসতেই ঝিলম বলল, "হ্যালো, কে, রাইন? আমি ঝিলম বলছি। জীবন কী রকম?"

রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্পেস স্টেশন চোদ্দ থেকে রাইন বলল, "প্রত্যেক-দিন জীবনটা যেন বেশি ভাল মনে হচ্ছে, ঝিলম! অনেকদিন পর তোমার গলা শুনলুম। সদ্য ঘুম থেকে উঠেছ বুঝি?"

"হ্যাঁ, রাইন। ঘুম থেকে উঠেই দেখি আমাদের রকেটে একটা পাখি আটকা পড়েছে।"

"তাই নাকি? কোন্ দেশের পাখি?"

"যতদূর মনে হচ্ছে, শুক্রগ্রহের!"

"ওর ডানা দুটো ছেঁটে ওকে আবার আকাশে উড়িয়ে দাও!"

"ডানাদুটো ছাঁটার ভার তোমাদের নিতে হবে। আমার কাছে কাঁচি নেই।"

"শুক্রগ্রহের লোকদের ডানা ছাঁটতে আমার খুব ভাল লাগে জানো তো, আমার এক কাকা শুক্রগ্রহে গিয়ে কী রকম অদ্ভুত ভাবে বদলে গেলেন। মাঝখানে একবার এখানে এসেছিলেন, আমায় দেখে চিনতেই পারলেন না।"

"ঠিক আছে, সে তুমি দেখো। শোনো, দুটো কাজ করতে হবে। আমরা কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ওখানে গিয়ে পৌঁছচ্ছি আমাদের জন্য দুটো ঘর বুক করে রাখো। আর ঝটিক বাহিনীর দফতরে খবর দাও, লালগোলাপ-উপগ্রহে কিছু অদ্ভুত ব্যাপার শুরু হয়েছে। ওরা যেন খবর নিতে শুরু করে।"

"লালগোলাপটা কোথায়?"

"তুমি আকাশ-মানচিত্রে খুবই কাঁচা, আমি জানি, রাইন। তুমি ঝটিকা-দফতরে খবর দাও, ওরা ঠিক বুঝতে পারবে। ছেড়ে দিচ্ছি, আনন্দে থেকো, রাইন!"

"তোমার আনন্দ আরও বেশি হোক। একটু পরে দেখা তো হচ্ছেই, তখন এক সঙ্গে দু'জনে আনন্দ করা যাবে।"

টি-রি-রি-রিং করে অ্যালার্ম বেজে উঠতেই ঝিলম বলল, "এবার তোমার পালা, নী। ইউনুসের জন্য খাবার নিয়ে যাও। তারপর চুপটি করে ঘুমিয়ে পড়ো।"

নী বলল, "ইশ, এই সময় কারুর ঘুমোতে ইচ্ছে করে?"

ঝিলম বলল, "দেরি কোরো না, চটপট্ চলে যাও। আর শোনো, আগে ইউনুসকে কিছু বোলো না। ওকে চমকে দিতে হবে। তুমিও এই কথা শুনে রাখো জিউস!"

নী চলে যাবার পর লোকটা মুখ তুলে হিংস্র গলায় বলল "তোমরা আগুন নিয়ে খেলছ! আমার কোনো ক্ষতি করলে তোমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। ভাল চাও তো এখনো আমাকে লালগোলাপে ফিরিয়ে দিয়ে এসো।"

আবার হেসে উঠল ঝিলম।

॥ ৬ ॥

ইউনুস যে নিঃশব্দ-বড়ি খেয়ে কথা বলা এবং কানে শোনার ক্ষমতাকেও ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে তা ঝিলমের মনে ছিল না। একটু বাদে গ্লুকোজ আর অন্যান্য খাবার খেয়ে ইউনুস যখন ককপিটে এল তখন ঝিলম তার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

হাত বাঁধা একটা অচেনা লোককে মেঝেতে বসে থাকতে দেখে সে দারুণ অবাক হয়ে গেল। চোখ দুটি অনেক বড় করে ঝিলমের দিকে তাকাল সে।

ইউনুসও পরে আছে সাদা প্যান্ট ও গেঞ্জি। ঝিলমের গায়ের রং কুচকুচে কালো, ইউনুসের ফর্সা। সেইজন্য ঝিলমকে একটু-একটু হিংসে করে ইউনুস। প্রায়ই সে তেল মেখে রোদে শুয়ে থাকে রং কালো করবার জন্য। ইউনুসের মাথার চুল কোঁকড়া।

ঝিলম বলল, "দ্যাখো তো ইউনুস, এই পাখিটিকে চিনতে পারো কি না?"

ইউনুস এ-কথা শুনতেও পেল না, কিছু বুঝতেও পারল না।

ঝিলম আবার বলল, "এই পাখিটি বলছে ও গান জানে না। ওর মনের মধ্যে যে গানটা গুনগুন করছে, সেটা তুমি গেয়ে শুনিয়ে দাও তো!"

ইউনুস এবার এগিয়ে এসে ঝিলমের পিঠে খুব জোরে একটা কিল মারল।

ঝিলম বলল, "আরে আরে, আমায় মারছ কেন? মারতে হয়

যে ঐ লোকটাকে মারো। ঐ লোকটা নী-কে কত কষ্ট দিয়েছে জানো ?"

ইউনুস আবার কিল মারবার জন্য হাত তুলল।

ঝিলম বলল, "এ কী, এই কি ঠাট্টার সময় ?"

ইউনুস হঠাৎ পেছন ফিরে দৌড়ে চলে গেল। ফিরে এল একটা স্লেট ও পেন্সিল নিয়ে। তাতে বড় বড় করে লিখল, "কী ব্যাপার ?"

ঝিলম বলল, "ও, তাই তো ? তুমি এখন বোবা আর কালা। ভুলেই গিয়েছিলাম। যাঃ, এখন কী হবে ? তুমি আমায় মনে করিয়ে দিলে না কেন, জিউস ?"

জিউস উত্তর দিল, "তুমি ওর সঙ্গে মজা করতে চাইছিলে, তাই কিছু বলিনি !"

ইউনুসের হাত থেকে স্লেট-পেন্সিল নিয়ে ঝিলম খসখস করে লিখে যেতে লাগল। ইউনুস পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়তে-পড়তেই খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল, তার নিশ্বাস পড়তে লাগল ঘন-ঘন।

লেখাটা শেষ হওয়া মাত্র সে ছুটে গিয়ে খুব জোরে একটা চড় কষাল হাত-বাঁধা লোকটির গালে।

ঝিলম তাড়াতাড়ি স্লেটের উল্টো পিঠে লিখল, "বন্দীকে মারতে নেই।" উঠে গিয়ে ইউনুসের চোখের সামনে সেই লেখাটা দেখাল। তারপর সব লেখা মুছে দিয়ে ইউনুসের হাতে স্লেট-পেন্সিল তুলে দিয়ে ইঙ্গিত করল লোকটার সামনে বসে পড়তে।

ইউনুস লোকটির থেকে এক হাত দূরে বসে পড়ে লোকটির মুখের দিকে তাকাল। লোকটি অমনি চোখ বুজে ফেলে, মাথা নিচু করে চিবুকটা বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখল। ঝিলম জোর করে ওর মুখটা আবার উঁচু করবার চেষ্টা করল, কিন্তু এভাবে তো চোখ খোলানো যায় না !

ইউনুস স্লেটে লিখল, "শুক্রগ্রহের মাউন্ট অলিভের লোক... পেশায় ডাক্তার...লালগোলাপ...নাঃ, এভাবে পারছি না...আমার অসুবিধে হচ্ছে...ওষুধ খেয়ে আছি বলে আমার ঐ ক্ষমতাটা কাজ করছে না......"

ঝিলম বলল, "থাক, ছেড়ে দাও। এক্ষুনি তো আমরা রাষ্ট্র-সঙ্ঘের স্পেস স্টেশনে পৌঁছে যাব।"

ইউনুস তবু সেখানে বসে রইল। তার খুব আফসোস হচ্ছে। এই রকম সময়েও সে ঝিলমকে সাহায্য করতে পারছে না !

ঝিলম ফিরে গেল কন্ট্রোল বোর্ডের সামনে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই স্টেশনটির ডাকনাম আর্মস্ট্রং, সেটাকে এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দূর থেকে মনে হয় ঠিক একটা পুরনো কালের দুর্গের মতন, যদিও ইঁট-পাথর কিছুই নেই। সব কিছুই ফাইবার কাচ দিয়ে তৈরি। আগেরকার কালের ইংরেজিতে কোনো অসম্ভব জিনিসকে বলত "বিল্ডিং কাসল ইন দা এয়ার"। সেটাই যেন এখন সম্ভব হয়েছে। মহাশূন্যে ভাসছে একটা দুর্গ।

আর্মস্ট্রংয়ের সঙ্গে সিগন্যাল-বিনিময় শুরু করে দিল ঝিলম। রাইন জানাচ্ছে যে, সব ঠিকঠাক আছে। ঝিলমকে ঢুকতে হবে তিন নম্বর দরজা দিয়ে।

ঝিলম নামতে-নামতেই দেখতে পেল ঝটিকা-বাহিনীর প্রায় তিরিশজন লোক দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে। কয়েকজন লোক স্ট্রেচার নিয়ে তৈরি। দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে তারা ভেতরে উঠে এল।

ঘুমন্ত রা আর নী-র কাচের বাক্স দুটি স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে গেল কয়েকজন। ঝটিকা-বাহিনীর লোকেরা প্রায় চ্যাং-দোলা করে নামিয়ে নিল হাত-বাঁধা শুক্রগ্রহের লোকটিকে। চোখের নিমেষে তারা যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাইন এগিয়ে এসে ঝিলমকে জড়িয়ে ধরে বলল, "জীবনটা চমৎকার, না ঝিলম ?"

ঝিলম বলল, "বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে আরও চমৎকার হয়।"

রাইন এবার ইউনুসকে জড়িয়ে ধরে বলল, "কী সুন্দর এই বেঁচে থাকা, ইউনুস !"

ঝিলম বলল, "আমাদের এই বন্ধুটি এখন বোবা-কালা। ওর কাছ থেকে কিছু আশা কোরো না।"

রাইন বলল, "বোবা-কালা হবার আর সময় পেল না ? ভেবেছিলাম জমিয়ে আড্ডা দেব !"

ঝিলম বলল, "আমাদের জন্য ঘর ঠিক করা আছে তো ?"

রাইন বলল, "হ্যাঁ, আছে; তোমরা গিয়ে আধ ঘন্টা বিশ্রাম নাও। তারপর তুমি জেনারাল লী পো'র সঙ্গে দেখা করবে। তিনি তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

ঝিলম অবাক হয়ে বলল, "জেনারাল লী পো ? তিনি এখানে ?"

রাইন বলল, "তুমি যে-ব্যাপারে আমাদের খবর দিলে, ঠিক সেই ব্যাপারেই খোঁজ নিতে জেনারেল লী পো এখানে এসেছেন।"

জেনারাল লী পো জাপানের বিখ্যাত সেনাপতি। মাত্র এক বছর হল তিনি শান্তি-সেনাবাহিনীর প্রধান হয়েছেন। তাঁর হেড কোয়ার্টার মঙ্গলগ্রহে।

রাইনের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ঝিলম ইউনুসকে নিয়ে মনো-রেলে গিয়ে উঠল। ছোট্ট একটা ট্রেন সমস্ত জায়গাটা ঘুরে-

ঘুরে যায়। এখানে এক জায়গায় হোটেলের মতন সারি-সারি ঘর আছে, মহাকাশযাত্রীরা মাঝে-মাঝে বিশ্রামের জন্য এখানে আসে। ঘরগুলো হালকা নীল রঙের কাচ দিয়ে তৈরি, অদৃশ্য জায়গা থেকে সব সময় খুব হালকাভাবে বাজনা বাজে। ইচ্ছেমতন প্রত্যেক ঘরে সেই বাজনা বদল করা যায়, আবার থামিয়েও দেওয়া যায়।

ঘরে ঢুকে বিরাট তুলোর বিছানার ওপর শুয়ে পড়ে ঝিলম বলল, আঃ! ইউনুস অবশ্য সে-শব্দটুকুও উচ্চারণ করতে পারল না। নী আর রা-কে কাচের বাক্স থেকে বার করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে পাশের ঘরের বিছানায়। এখানকার আবহাওয়া খুব আরামের। একতলায় আছে বিরাট বড় কাফেটেরিয়া, সেখানে পৃথিবীর সব দেশের খাবার পাওয়া যায়।

ঠিক আধ ঘণ্টা বাদে ঝিলম অন্যদের হোটেলে রেখে একা গেল জেনারাল লী পো'র সঙ্গে দেখা করতে। গত শতাব্দীতে যিনি প্রথম চাঁদে পা দিয়েছিলেন, সেই নীল আর্মস্ট্রং-এর একটা মূর্তি বসানো আছে একটা বাড়ির সামনে। সেই বাড়িতেই এখানকার ঝটিকাবাহিনীর অফিস।

জেনারাল লী পো'র চেহারাটি বিরাট। দারুণ চওড়া কাঁধ, উচ্চতাতেও প্রায় সাত ফুট। চিবুকে দাড়ি, নাকের নীচে মোটা গোঁফ, কিন্তু তাঁর মুখখানা খুব শান্ত ধরনের।

ঝিলম ঘরে ঢুকে দু'হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে বলল. ''আপনার জীবন মধুময় হোক জেনারেল।''

জেনারাল লী পো উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাত বাড়িয়ে ঝিলমের কাঁধ ছুঁয়ে বললেন, ''তোমার জীবন আরও সুন্দর হোক। তুমিই অভিযাত্রী ঝিলম?''

''হ্যাঁ।''

''তুমিই মৃত গ্রহ নীলিকায় প্রথম গাছ আবিষ্কার করেছিলে?''

''হঠাৎ আমার চোখে পড়ে গিয়েছিল। এমন-কিছু কৃতিত্ব নেই, আমার!''

''হুঁ! হো-সানের কাছে তোমার নাম শুনেছি।''

''শ্রদ্ধেয় হো-সানের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল এর মধ্যে?''

''হ্যাঁ। আচ্ছা, সে-কথা থাক। লালগোলাপ উপগ্রহে তুমি ঠিক কী কী দেখেছ বলো তো?''

''লালগোলাপে আমি নিজে যাইনি। আমার স্ত্রী গিয়েছিলেন—''

''তাহলে তোমার স্ত্রীকেই আমার বেশি দরকার এখন।''

''দুঃখের বিষয়, তিনি এখন ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছেন।''

''ওঃ হো! তোমরা যে লোকটাকে ধরে এনেছ, সে খুবই কড়া ধাতের মানুষ। ওর কাছ থেকে কিছুই বার করা যাচ্ছে না। এই দ্যাখো, আমরা ওর মনের কতকগুলো ছবি তুলেছি। কিন্তু ও একসঙ্গে চার-পাঁচরকম চিন্তা করার শক্তি রাখে। মস্তিষ্কটা খুবই শক্তিশালী।''

''ঐ লোকটি একজন ডাক্তার, আমরা এইটুকু জেনেছি।''

''আশ্চর্য! ডাক্তার হয়েও ডাকাতি করে? এর মধ্যে আমরা শুক্রগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। ওখানকার সরকার কোনো দায়িত্ব নিতে চাইছে না। তারা বলছে, শুক্রগ্রহ থেকে একদল লোক বাইরে চলে গিয়ে সূর্যমণ্ডলেরও বাইরে কোনো জায়গায় নতুন কলোনি করেছে। সেই জায়গাটা ঠিক কোথায়, তা কেউ জানে না। ওরা কি তবে লালগোলাপে আড্ডা গেড়েছে?''

''লালগোলাপ তো ঠিক মানুষের থাকার উপযোগী নয়। ওখানে জল নেই। আলোটাও খারাপ।''

''তোমার স্ত্রী লালগোলাপে নেমেও উদ্ধার পেলেন কী করে? ওদের অস্ত্র কী রকম?''

ঝিলম এবার হাসল।

জেনারাল লী পো'ও হাসলেন, ''বুঝেছি!''

ঝিলম বলল, ''আমার স্ত্রীকে বন্দী করার চেষ্টা করে ঐ ডাকাতরা খুব ভুল করেছিল! বড় সাংঘাতিক মেয়ে!''

''এদিকে অন্তত এগারোটি রকেটের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।''

এই সময় জেনারালের টেবিলে একটা ছোট রেডিওতে আওয়াজ শোনা গেল, ''আমরা রেডি, জেনারাল।''

লী পো উঠে দাঁড়িয়ে ঝিলমকে বললেন, ''দশখানা রকেট নিয়ে আমরা লালগোলাপে যাচ্ছি। দেখে আসি ব্যাপারটা। ফিরে এসে তোমার সঙ্গে আবার কথা বলব। তুমি বিশ্রাম নাও।''

ঝিলমও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ''কিছু যদি না মনে করেন একটা কথা বলব? আমি কি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি?''

''তুমি যেমন আছ, সেই অবস্থাতেই যেতে পারবে?''

''নিশ্চয়ই।''

জেনারাল লী পো নিজে যে রকেটটায় উঠলেন, সেটাতেই সঙ্গে নিলেন ঝিলমকে। যাওয়ার পথে দু'জনে আরও অনেক কথাবার্তা হল। পৃথিবীতে চুরি বা ডাকাতি অনেক দিন বন্ধ হয়ে গেছে, গত পাঁচ বছরে পৃথিবীতে মানুষ খুন হয়েছে মাত্র দুটি, তাও প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে একটি জাহাজে একজন নাবিক হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়ে তার দু'জন সঙ্গীকে হাঙরের মুখে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু শুক্রগ্রহের লোকগুলি এখনো এরকম কেন? শুক্রগ্রহের লোকগুলি তো পৃথিবীর মানুষেরই বংশধর।

ঝিলম জিজ্ঞেস করল, ''অনেকখানি সময় কেটে গেছে। ওরা কি লালগোলাপে এখনো থাকবে?''

লী পো বললেন, ''লালগোলাপে যদি ঘাঁটি গেড়ে থাকে, তবে সবসুদ্ধু পালাবে কোথায়?''

''একটা ব্যাপারে আমার খট্‌কা লাগছে। রা ওদের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে এল, ওদের একজন লোককে ধরেও নিয়ে এল, তবু ওরা অন্য রকেট নিয়ে রা-কে তাড়া করে এল না কেন?''

''তার মানে ওদের রকেটের সে-রকম জোর নেই। সেইজন্যই ওরা আমাদের রকেট চুরি করতে চায়।''

''কিন্তু ওরা সূর্যমণ্ডলের এতটা বাইরে এসে ঘোরাঘুরি করছে, রকেটের সে-রকম উন্নতি করেনি?''

''চলো, গিয়ে দ্যাখা যাক, কী ব্যাপার!''

লালগোলাপের কাছাকাছি গিয়ে ঝটিকা বাহিনীর দশখানি রকেট নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ল। লালগোলাপ থেকে যদি হঠাৎ আক্রমণ করে তার জন্য তৈরি হয়ে আসা হয়েছে। আগে দেখা যাক, ওরা কোনো গোলাগুলি ছোঁড়ে কি না।

লালগোলাপের চারপাশে রকেটগুলো কয়েকবার ঘুরল। কিন্তু ওদের দিক থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। এবার আরও একটু নীচে নেমে এসে জেনারাল লী পো হুকুম দিলেন, ''ফায়ার!''

অমনি চারখানি রকেট থেকে বোমা ফেলা হতে লাগল। এই বোমাগুলিতে তেমন বেশি আওয়াজ হয় না। শুধু নীচে পড়ে ফটাস্ শব্দে ফেটে গিয়ে দারুণ ধোঁয়া ছড়ায়। এই বোমায় কেউ মরে না, আহতও হয় না, ধোঁয়া নাকে গেলেই সবাই ঘুমিয়ে পড়বে। এই বোমা পড়ার পর কারুর পক্ষেই জেগে থাকা সম্ভব নয়। সত্তর বছর আগে চীনের সঙ্গে দক্ষিণ আফরিকার যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে এই বোমা ব্যবহার করেই দক্ষিণ আফরিকার কালো মানুষরা জিতে যায়। পৃথিবীতে তারপর আর কোনো যুদ্ধ হয়নি।

দশটি ঘুম-বোমা ফেলার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা হল। লালগোলাপে কোনো লোক থাকলে, এমনকী মাটির নীচে লুকিয়ে থাকলেও তারা এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে বাধ্য।

এর পরেও বিপদের সম্ভাবনা আছে। রোবো দিয়ে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব কিছু না। রোবো তো আর ঘুমোবে না। তা ছাড়া কিছু স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থাকতে পারে। সেই জন্য এবার অন্য চারখানি রকেট থেকে খুব গোপন ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গ ছাড়া হতে লাগল। এই তরঙ্গে সমস্ত জানাশোনা যন্ত্র বিকল হয়ে যায়।

এর পরও ওদের কাছে অজানা কোনো যন্ত্র বা অস্ত্র থাকতে পারে। কিন্তু সেটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে।

জেনারাল লী পো এবার নামবার হুকুম দিলেন।

ধোঁয়া কেটে যাবার পর দেখা গেল লালগোলাপের এখানে সেখানে অনেকগুলো রকেট পড়ে আছে। কিন্তু কোথাও কোনো মানুষের চিহ্ন নেই। প্রত্যেকটি রকেট ঘুরে দেখা হল, দেখলেই বোঝা যায়, সেই রকেটগুলো বেশ কিছুদিন চালানো হয়নি।

ঝিলম বলল, "আমি বলেছিলাম, ওরা আগেই পালাবে!"

লী পো বললেন, "কিন্তু রকেট-চুরি যদি ওদের মতলব হয়, তাহলে এতগুলো রকেট ফেলে গেল কেন?"

"এখানে যে ওরা ঘাঁটি গড়েনি, তা বোঝাই যাচ্ছে।"

চশমা পরার অভ্যেস নেই বলে জেনারাল লী পো তাঁর চোখ থেকে ইনফ্রা রেড চশমাটা খুলে ফেললেন অন্যমনস্কভাবে।

ঝিলম বলল, "চশমা খুলে রাখবেন না, জেনারাল, ওটা বিপজ্জনক।"

লী পো বললেন, "রকেটগুলো সবই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, তা লক্ষ করেছ? একটাও শুক্রগ্রহের নয়। অথাৎ পৃথিবীর অভিযাত্রীদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে এখানে টেনে এনেছিল ঐ ডাকাতগুলো। তোমার স্ত্রীর মতন যারা চালাক নয়, তারা আর পালাতে পারেনি। তাহলে সেই লোকগুলো গেল কোথায়? ডাকাতরা তাদের ধরে নিয়ে গেল আর রকেটগুলো ফেলে গেল? এ তো বড় আশ্চর্য কথা! তুমি কী বলো ঝিলম?"

ঝিলম একটু চিন্তা করে বলল, "আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। শুক্রগ্রহের লোকেরা মানুষ চুরি করবে কেন? ওদের তো মানুষের অভাব নেই।"

এই সময় দূর থেকে কয়েকজন উত্তেজিতভাবে ডাকতে লাগল, "জেনারাল জেনারাল, এদিকে আসুন!"

লী পো বললেন, "ওরা কিছু দেখতে পেয়েছে। চলো, ওদিকে যাই।"

লালগোলাপ উপগ্রহটা পৃথিবীর চেয়ে তো বটেই, চাঁদের চেয়েও অনেক ছোট। এখানকার পাহাড়গুলোও বেঁটে-বেঁটে। একটা পাহাড়ের ওপর উঠলেই গোলাপের পাপড়ির মতন মেঘ গায়ের ওপর দিয়ে ভেসে চলে যায়। মেঘগুলো এত নিচু বলেই এখানে একটু দূরের জিনিস হলেই আর দেখা যায় না।

লী পো আর ঝিলম কিছুটা এগিয়ে এসে দেখল একটা ছোট পাহাড়ের সামনে ঝটিকা বাহিনীর দশজন সৈনিক সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একজন ক্যাপ্টেন কয়েক পা এগিয়ে এসে স্যালুট করে বলল, "এই পাহাড়ের একটা গুহার মধ্যে কয়েকজন মানুষ রয়েছে, জেনারাল!"

জেনারাল জিজ্ঞেস করলেন, "নিশ্চয়ই তারা ঘুমন্ত?"

ক্যাপ্টেন বলল, "জেগে থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই। অবশ্য গুহার ভেতরটা খুব অন্ধকার। রকেট থেকে ফ্ল্যাশ-লাইট আনতে পাঠিয়েছি।"

দু'জন সৈনিক তক্ষুনি দুটি ফ্ল্যাশ-লাইট নিয়ে উপস্থিত হল। জেনারাল লী পো ওভার-কোটের পকেটে হাত দিয়ে নিজেই প্রথমে ঢুকলেন গুহার মধ্যে।

গুহাটা বেশ চওড়া। গোল সুড়ঙ্গের মতন। ভেতরের দিকটায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। খানিকটা এগোবার পরই মনে হল মাটিতে পাশাপাশি পঁচিশ-তিরিশ জন লোক শুয়ে আছে। তীব্র ফ্ল্যাশ-লাইটের আলো সেখানে পড়া মাত্রই একটা বীভৎস দৃশ্য দেখা গেল।

জেনারাল অস্ফুট স্বরে বললেন, "এ কী?"

ঝিলম চট্ করে মুখটা ফিরিয়ে নিল। দৃশ্যটা সে সহ্য করতে পারেনি।

মাটিতে শুয়ে থাকা প্রত্যেকটি লোকের চোখ খুবলে তুলে নেওয়া হয়েছে।

জেনারাল লী পো ঝিলমের হাত ধরে টেনে আরও কাছে এগিয়ে গেলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, "যারা এই কাজ করেছে, তাদের প্রচণ্ড শাস্তি পেতে হবে। দ্যাখো ঝিলম, এরা শুক্রগ্রহের নয়। এরা পৃথিবীর মানুষ।"

ঝিলম তাকিয়ে দেখল, জেনারাল ঠিকই বলেছেন। কারুরই চুল হলদে রঙের নয়। কালো।

শুধু চোখই খুবলে নেয়নি, প্রত্যেকটি লোকের দু' কানেও ক্ষত, কানগুলো কেটে ফেলা হয়েছে, সেখান থেকে রক্ত গড়িয়ে জমাট বেঁধে আছে।

ঝিলম বলল, "ওঃ! এমনভাবে মানুষ খুন করল কেন? এদের খুন করে কার কী লাভ!"

ঝটিকা বাহিনীর ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার বলল, "এদের মারতে চাইলে তো শুধু একটা করে বুলেট খরচ করলেই হত। ওরা এত নিষ্ঠুর!"

জেনারাল লী পো বললেন, "আমি এখানে আর থাকতে পারছি না। চলো, বাইরে চলো!"

ঝিলম হঠাৎ বলে উঠল, "একটু দাঁড়ান, জেনারাল!"

তারপর শুয়ে-থাকা তৃতীয় মানুষটির কাছে গিয়ে পাশে বসে পড়ে সে করুণ গলায় বলল, "চোখ না থাকলেও আমি একে চিনতে পেরেছি। এই যে কপালের ডান দিকে একটা ক্রসের মতন কাটা দাগ। এ আমার বন্ধু ভের্লেইন। জেনারেল, আপনি বিখ্যাত অভিযাত্রী ভের্লেইনের নাম শোনেননি?"

"কোন ভের্লেইন? যে বৃহস্পতির আগুনের বলয়ের মধ্য দিয়ে রকেট চালিয়ে রেকর্ড করেছিল?"

"হ্যাঁ।"

"ইস! ঐ রকম একটা মানুষের এইরকম জঘন্য মৃত্যু?"

"জেনারাল, আমি ভের্লেইনের দেহটা নিয়ে যেতে চাই।"

ঝিলম সেই মৃত লোকটির গায়ে হাত দিয়েই চমকে উঠল। এ কী, ওর গা গরম কেন? তাড়াতাড়ি ভের্লেইনের বুকে হাত দিয়েই সে উত্তেজিত ভাবে আবার বলল, "জেনারাল, জেনারাল ভের্লেইন এখনো বেঁচে আছে।"

রক্ষী-বাহিনীর সৈনিকেরা সঙ্গে-সঙ্গে অন্য লোকগুলির বুকে হাত রেখে পরীক্ষা শুরু করল। দেখা গেল, মোট সাতাশ-জন লোকের মধ্যে চব্বিশজনই তখনও বেঁচে আছে। অন্য তিনজনের বুকে কোনো স্পন্দন নেই।

জেনারাল বলল "আশ্চর্য! এদের মারতে চায়নি। শুধু চোখ আর কান খুবলে নিয়েছে। কিন্তু কেন?"

ঝিলম বলল, "জেনারাল, এখনো এদের চটপট রকেটে তুলে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করা যায়। আর কিছুক্ষণ থাকলে এমনিই মরে যাবে।"

জেনারাল লী পো তক্ষুনি ঝটিকা-বাহিনীকে হুকুম দিলেন সব কটি লোককেই বিভিন্ন রকেটে তুলে নিতে।

গুহার বাইরে বেরিয়ে এসে ঝিলম বলল, "এবার আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি, জেনারাল!"

"কী বলো তো?"

"আমরা যাকে বন্দী করে নিয়ে গেছি, সে একজন ডাক্তার!"

"ওঃ হো! তুমি ঠিক ধরেছ তো! লোকগুলোকে ওরা মারতে চায়নি। ডাক্তার এনে ওরা লোকগুলোর চোখ আর কানের

পর্দা তুলে নিয়েছে।"

"কত সাবধানে ওরা অপারেশন করেছে, তা ভাবুন! লোক-গুলোকে বাঁচিয়ে রেখে তাদের চোখ আর কানের পর্দা তুলে নেওয়া কি সোজা কথা?"

"কিন্তু এই কাজই বা ওরা করল কেন? শুক্রগ্রহে কি চক্ষু-ব্যাঙ্ক আর কানের পর্দার ব্যাঙ্ক নেই?"

"সেটা খোঁজ নিতে হবে।"

"খোঁজ নেবার প্রশ্ন ওঠে না। নিশ্চয়ই আছে। শুক্রগ্রহের লোকদের তুমি এত অসভ্য ভেবো না। তা ছাড়া যেখানে এত ভাল ডাক্তার আছে, সেখানে ঐ সব ব্যাঙ্ক থাকবে না?"

"এরা শুক্রগ্রহ থেকে বেরিয়ে আসা একটি দল। হয়তো এরা আর শুক্রগ্রহে ফিরতেই চায় না। এবার বোঝা যাচ্ছে, রকেট চুরি ওদের উদ্দেশ্য নয়। মানুষের চোখ আর কানের পর্দা চুরি করাই ওদের আসল উদ্দেশ্য। রা আর নী যদি ধরা পড়ত, তা হলে তাদেরও এই অবস্থা হত!"

"কিন্তু হঠাৎ এত চোখ আর কানের পর্দা দরকার হল কেন ওদের? সাতাশ জনের চোখ-কান নিয়েছে, আরও মানুষকে বন্দী করতে চাইছিল!"

"এর একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে। শুক্রগ্রহের এই দলটি কোনো অচেনা জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। সেখানে হঠাৎ কোনো বিস্ফোরণে সেই দলের অনেকের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে আর কানের পর্দা ফেটে গেছে। তাই তারা এই সব চুরি করে নিজের দলের লোকদের চোখ আর কান আবার ঠিক করে দিতে চায়।"

"তোমার অনুমান সত্যি হতে পারে। এ তো আমরা শুধু লালগোলাপের ঘটনা দেখলাম। আর কোনো গ্রহে বা উপগ্রহেও তারা রকেট-অভিযাত্রীদের ভুলিয়ে ভালিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে তাদের চোখ আর কান উপড়ে নিচ্ছে হয়তো। এটা বন্ধ করতেই হবে! নির্বোধ, শয়তানের দল! এরকম ভাবে জ্যান্ত মানুষের চোখ আর কান নষ্ট না করে আমাদের ব্যাঙ্ক থেকে চাইলে কি আমরা চোখ-কান দিতাম না?"

"হয়তো ওদের এমন কোনো গোপন ব্যাপার আছে, যা আমাদের কাছে প্রকাশ করতে চায় না!"

রাগে, দুঃখে জেনারাল লী পো'র মুখখানা কুঁকড়ে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বললেন, "ওদের গোপন কথা আমি বার করবই। দেখি ঐ ডাক্তারটা কীভাবে গোপন কথা পেটে চেপে রাখতে পারে। এবার মার লাগাব, বুঝলে, স্রেফ মার! চলো, আর্মস্ট্রং-এ ফিরে চলো।"

দু'জনে গিয়ে উঠে বসল রকেটে।

॥ ৭ ॥

নী আর রা ঘুমিয়ে আছে। ইউনুস একা-একা একটু ঘুরতে বেরিয়েছে।

আর্মস্ট্রং নামের এই মহাশূন্যের স্টেশনটাতে পার্ক, থিয়েটার হল, সাঁতার কাটার পুকুর, হাসপাতাল, এই সব কিছুই আছে। মহাকাশ-অভিযাত্রীরা এখানে প্রধানত বিশ্রামের জন্যই আসে। অবশ্য বিরাট একটি গবেষণাগারও আছে। আর ঝটিকা বাহিনীর একটি প্রধান দফতরও বটে।

ইউনুস পার্কে গিয়ে বসল। এই পার্কে কিন্তু একটাও সত্যিকারের গাছ নেই। যদিও দেখলে মনে হবে ছোট-বড় অনেক গাছ ছড়িয়ে আছে, ফুলও ফুটে আছে কয়েকটাতে। এ সবই আলো দিয়ে তৈরি। সূর্যমন্ডলের বাইরে কোথাও এখনও গাছ বাঁচানো যায়নি। বরফ-ঢাকা একটা ছোট্ট গ্রহতে ঝিলম একটা গাছ আবিষ্কার করেছিল। সেটাও মোটেই গাছের মতন দেখতে নয়। খয়েরি রঙের একটা গুঁড়ি, ডাল বা পাতা কিছু নেই, সেই গুঁড়িটার গায়ে ব্যাঙের ছাতার মতন গোল-গোল জিনিস লেগে আছে। তাই নিয়েই পৃথিবীর খবরের কাগজগুলোতে কত হৈ চৈ!

ইউনুস ইচ্ছে করেই লোকজনদের এড়িয়ে পার্কে এসে বসল। কারণ সে কারুর কথাই শুনতে পাবে না, মুখেও কিছু বলতে পারবে না। তার খুব আফশোস হচ্ছে, ঠিক এই সময়েই কেন সে নিঃশব্দ-বড়ি খেল! এখন এত সব কান্ড হচ্ছে, অথচ সে যোগ দিতে পারছে না। অবশ্য আর বেশি দিন বাকি নেই। এই জায়গাটার আবহাওয়া পৃথিবীর মতনই বলে এখানে বয়েস বাড়ে না। কিন্তু একবার মহাশূন্যে রকেট নিয়ে বেরুলেই হু-হু করে দিন কেটে যায়।

ইউনুস একটা বেঞ্চিতে বসেছে, পাশেই একটা আলোর ফুলগাছের ঝোপ, তাতে যেন সত্যিকারের গাঁদা ফুল ফুটে আছে। একটু দূরে একটা ফোয়ারা, সেটাও জলের নয়, আলোর। মহাশূন্যে বেশি দিন থাকলে সত্যিকারের গাছ আর ফুল দেখার জন্য খুব মন কেমন করে।

একটি আফ্রিকান মেয়ে এসে বসল ইউনুসের পাশে।

ইউনুস মনে মনে ভাবল, এই রে! এই কালো কুচকুচে মেয়েগুলোর খুব রূপের গর্ব হয়। আর এদের বুদ্ধিও খুব সাঙ্ঘাতিক। এর সঙ্গে কথা না বললেই তো চটে যাবে!

ইউনুস ইশারা করে নিজের মুখ আর কান দেখিয়ে দিল।

মেয়েটি অবাক ভাবে চেয়ে বলল, "জীবন খুব সুন্দর, তাই না?"

ইউনুস আন্দাজেই কথাটা বুঝে ঘাড় হেলিয়ে বোঝাল যে, হ্যাঁ!

মেয়েটি আবার বলল, "আপনারা কোন্ রকেটে এসেছেন?"

ইউনুস আবার মুখ আর কানে হাত দিয়ে বোঝাল।

মেয়েটি তবু জিজ্ঞেস করল, "লালগোলাপ-উপগ্রহটি সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন?"

ইউনুস ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাত জোড় করল।

মেয়েটি এবার বলল, "আপনাকে দেখতে খুব বিচ্ছিরি!"

ইউনুস কিছুই বুঝতে না পেরে মেয়েটির চোখের দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টে।

"সত্যি কথা বলতে কী, আপনাকে অবিকল একটা সাদা শুয়োরের মতন দেখতে!"

ইউনুস মেয়েটির চোখের দিকে চেয়ে আছে।

মেয়েটি হেসে উঠে বলল, "সত্যিই তা হলে বোবা আর কালা? যাক্, তা হলে আর কোনো চিন্তা নেই।"

ইউনুস কিন্তু ভেতরে-ভেতরে দারুণ চমকে উঠেছে। কারণ সে মেয়েটির মনের কথা বুঝতে আরম্ভ করেছে। মেয়েটি ভাবছে, শুক্রগ্রহের এস্ নামে লোকটি এখানে এসে পড়বে এক্ষুনি। কেউ তাকে চিনতে না পারে, কেউ যেন বুঝতে না পারে, কেউ টের না পায়! এই বোবা-কালা লোকটিকে এখান থেকে সরানো দরকার।

মেয়েটি নানান অঙ্গভঙ্গি করে ইউনুসকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে, তার একজন বন্ধু এখানে আসবে, ইউনুস অন্য কোনো জায়গায় গিয়ে বসুক।

ইউনুস কিছুই বুঝতে না পারার ভান করে মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে মেয়েটির মনের কথা আরও পড়তে পারছে। এই মেয়েটিও একজন ডাক্তার। শুক্রগ্রহের লোকটিকে যেখানে পরীক্ষা করা হচ্ছিল, সেখানে এই মেয়ে-ডাক্তারটি ডিউটিতে ছিল। শুক্রগ্রহের লোকটি কোনোক্রমে একে হাত করেছে। তাকে এখান থেকে উদ্ধার করতে পারলে মেয়েটিকে সে অনেক কিছু দেবে বলেছে।

কী দেবে? সোনা! এই মেয়েটির দেহের ওজনের সমান সোনা। আফ্রিকার মেয়েরা এত বোকা হয়? সোনা নিয়ে ও কী করবে? ঠাকুমা-দিদিমার যুগের মেয়েরা সোনার গয়না পরত. এখন কেউ পারে না। তাছাড়া তো সোনার কোনো দাম নেই। ও হ্যাঁ, শুক্রগ্রহে সোনার এখনো খুব দাম আছে। এই মেয়েটি কি শুক্রগ্রহে চলে যেতে চায়? হ্যাঁ, বোঝাই যাচ্ছে ওর মনে-মনে তাই ইচ্ছে।

মেয়েটি চঞ্চলভাবে এদিক-ওদিক চাইছে। একটু বাদে সে বেঞ্চ ছেড়ে গিয়ে ফোয়ারাটার কাছে দাঁড়াল তখন দেখা গেল হাসপাতালের দিক থেকে হেঁটে আসছে একজন মানুষ। এখানকার ডাক্তারদের মতন সাদা পোশাক পরা, মাথায় একটা টুপি। সেই টুপিতে কপালের অনেকখানি ঢেকে আছে।

লোকটি এসে দাঁড়াল কালো মেয়েটির সামনে। তারপর ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল।

ইউনুস বুঝতে পারল, এই সেই শুক্রগ্রহের এস্। মাথার হলদে চুল ঢেকে নিয়েছে টুপিতে, এখানকার কোনো ডাক্তারের ছদ্মবেশ ধরেছে। কোনো ডাক্তারকে আচমকা মেরে তার পোশাকটা খুলে নেওয়াও আশ্চর্য কিছু নয়। লোকটির গায়ে অসম্ভব জোর।

ইউনুস তক্ষুনি লোকটিকে ধরবার চেষ্টা করল না। ঐ লোকটার কাছে কিংবা মেয়েটার কাছে কোনো অস্ত্র থাকা স্বাভাবিক। ইউনুসের কাছে কিছুই নেই। সে বেঞ্চে বসেই ওদের দিকে নজর রাখতে লাগল।

লোকটি একবার দেখল ইউনুসকে। মেয়েটি আবার তাকে কী যেন বলল, ইউনুসকে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছে লোকটি, তাই সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করল উল্টো দিকে। মেয়েটিও চলল তার সঙ্গে।

ইউনুস কী করবে প্রথমে ঠিক করতে পারল না। সে চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করতে পারবে না। কারুকে যে কিছু ডেকে বলবে তার উপায় নেই। অথচ ওদের চোখের আড়ালেও যেতে দেওয়া যায় না। ইউনুস উঠে পড়ে যেতে লাগল ওদের পিছু পিছু।

পার্কের রেলিংয়ের কাছে গিয়ে লোকটি ফিরে দাঁড়াল। ইউনুস মুহূর্তের মধ্যে ভেবে নিল, খুব সম্ভবত লোকটির কাছে কোনো অস্ত্র নেই, কিন্তু মেয়েটির কাছে থাকা খুবই সম্ভব। সেই জন্য সে শুক্রগ্রহের লোকটিকে কিছু না বলে, তীরের মতন ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল মেয়েটিকে। সেই কালো মেয়েটি তার হাতের ব্যাগ খোলার সময়ই পেল না।

শুক্রগ্রহের লোকটি টেনে ছাড়াবার চেষ্টা করল ইউনুসকে। কিন্তু ইউনুস প্রাণপণ শক্তিতে জড়িয়ে ধরে আছে মেয়েটিকে। শুক্রগ্রহের লোকটি এবার দারুণ জোরে দুটি ঘুঁষি মারল ইউনুসের চোয়ালে। তার মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল, তবু ইউনুস ছাড়ল না। লোকটি ইউনুসকে মেরেই চলল।

পার্কের পাশেই রাস্তা। কিছু লোক থমকে গেল এই দৃশ্য দেখে। একটা লোক একটা মেয়েকে চেপে ধরে আছে, আর একটা লোক তাকে মারছে, এই দৃশ্য দেখে লোকে তো অবাক হবেই। ঝটিকা বাহিনীর দু-জন সৈনিকও চলে এল সেখানে।

মেয়েটি এবার কেঁদে-কেঁদে বলল, "দেখুন, আমি পার্কে আমার বন্ধুর সঙ্গে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ এই লোকটা আমায় আক্রমণ করেছে।"

শুক্রগ্রহের ছদ্মবেশী লোকটি বলল, "এই লোকটি হয় কোনো পাগল অথবা গুণ্ডা!"

ঝটিকা বাহিনীর একজন সৈনিক ইউনুসের দিকে এল এম জি উঁচিয়ে বলল, "কী ব্যাপার? এক্ষুনি মেয়েটিকে ছেড়ে দাও!"

ইউনুস মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছল।

সৈনিকটি জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে? কোন রকেটে এসেছ?"

সে-কথার উত্তর দেবার উপায় নেই ইউনুসের। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে এমন ভান করল যেন দৌড়ে পালাবে। তারপর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে শুক্রগ্রহের লোকটির মাথা থেকে টুপিটা ছিনিয়ে নিল। অমনি বেরিয়ে পড়ল তার হলদে চুল।

সৈনিক দু-জন অবাকভাবে তাকিয়ে রইল লোকটির চুলের দিকে। সেই সুযোগে লোকটি ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিনিয়ে নিল ওদের একজনের হাতের এল এম জি। তারপর সেটা দিয়েই খুব জোরে মারল অন্য সৈনিকটির মাথায়। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

শুক্রগ্রহের লোকটি এবার কড়া গলায় বলল, "যে আমার সামনে আসবে, তাকে ঝাঁঝরা করে দেব!"

সবাই ভয় পেয়ে দূরে সরে দাঁড়াল। এমন কাণ্ড এই আর্মস্ট্রং স্টেশনে আগে কখনো হয়নি।

লোকটি এল এম জি উঁচিয়ে রেখে বলল, "এবার চলো রকেট স্টেশনে!"

ঝটিকা বাহিনীর যে সৈনিকটির হাত থেকে এল এম জি-টা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সে এবার হেসে উঠল হা-হা করে। তারপর বলল, "এখান থেকে পালানো অত সহজ! চালাও দেখি গুলি!"

ইউনুসও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। সে শুক্রগ্রহের লোকটিকে অগ্রাহ্য করে আবার মেয়েটির কাছে এসে চেপে ধরল তার হাতব্যাগটা।

লোকটি হিংস্র গলায় বলল, "তবে তুমি মরো!"

এল এম জিটা তুলে সে ট্রিগার টিপল। গুলি বেরুবার বদলে তার থেকে বেরুলো খানিকটা ধোঁয়া। ইউনুস আর কালো মেয়েটি সঙ্গে-সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে ধপ করে পড়ে গেল মাটিতে।

এখানে মানুষ মারার কোনো অস্ত্রই ব্যবহার করা হয় না। এই এল এম জিগুলো আগেকার দিনের মতন দেখতে হলেও এর মধ্যে গুলি থাকে না। এতে ভরা থাকে ঘুম-পাড়ানি ধোঁয়া।

ততক্ষণে অজ্ঞান সৈনিকটির এল এম জি-টা অন্য সৈনিকটি তুলে নিয়েছে। শুক্রগ্রহের লোকটি তার দিকে ফিরতেই দু-জনেই একসঙ্গে ট্রিগার টিপল। দু-জনেই একসঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল। রাস্তার লোকেরা এবার হাসতে লাগল সবাই। অদ্ভুত যুদ্ধ। কেউ মরেনি, পাঁচ জন অজ্ঞান।

হাসপাতালের কর্মীরা এসে স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে গেল পাঁচজনকেই। তখন জানা গেল, এর আগে হাসপাতালে একজন ডাক্তার আর একজন নার্সকে গলা টিপে অজ্ঞান করে, তাদের হাত-পা বেঁধে রেখে পালিয়ে এসেছে শুক্রগ্রহের লোকটি।

জেনারেল লী পো এই ঘটনার কথা শুনে দারুণ রেগে গেলেন। পুরো একদিন ওরা অজ্ঞান হয়ে থাকবে, এর মধ্যে আর শুক্রগ্রহের লোকটিকে জেরা করা যাবে না। দেখা যাচ্ছে এ লোকটি সাংঘাতিক নিষ্ঠুর, মানুষ খুন করতে ওর একটুও দ্বিধা নেই। ইউনুসকে মেরে ফেলার জন্যই তো ও ট্রিগার টিপেছিল।

জেনারাল লী পো হুকুম দিলেন, জ্ঞান ফেরার পর ঐ লোকটিকে এক ঘণ্টা জেরা করা হবে, তাতেও ও যদি ওদের আস্তানার কথা না জানায়, তা হলে অপারেশন করা হবে ওর মস্তিষ্কে। এমন সাংঘাতিক লোককে আর বিশ্বাস করা যায় না। মস্তিষ্কের একটা অংশ অপারেশন করে বদলে দিলেই ও ভাল হয়ে যাবে। তখন মানুষ খুন তো দূরের কথা, একটা সামান্য পোকা-মাকড় মারতেও ওর কষ্ট হবে।

ইউনুস রইল হাসপাতালে, ঝিলম ফিরে এল হোটেলে। নী আর রা জেগে উঠেছে এর মধ্যে। নীচের তলার রেস্তোরাঁয় গিয়ে ওরা তিনজনে মিলে অনেকদিন পর পৃথিবীর খাবার খেল পেট ভরে। দেরাদুনের চালের সুগন্ধ ভাত, ঘি, মুগের ডাল, বেগুন ভাজা, পালং শাক, চিংড়ি মাছের মালাইকারি, শর্ষে-বাটা দিয়ে ইলিশ আর ভাপা দই।

নী বলল, "ট্যাবলেট আর শুকনো স্যান্ডউইচ খেতে-খেতে মুখ একেবারে পচে গিয়েছিল!"

রা বলল, "ইস, ইউনুসটা নেই, ও এসব খেতে পেল না!"

খাওয়ার পর ওরা গেল একটা সিনেমা দেখতে। ঝিলম খুব গম্ভীর, তার মুখে চিন্তার ছাপ। সে সিনেমায় মন দিতে পারছে না।

সিনেমা ভাঙার পর রা বলল, "চলো, এখন বাষ্প-স্নানঘরে যাওয়া যাক। অনেক দিন স্নান করিনি!"

নী বলল, "হ্যাঁ, তাই চলো রা-দি! তুমি বলেছিলে এখানকার বাষ্পঘর চাঁপাফুলের গন্ধে ভরা থাকে?"

রা বলল, "হ্যাঁ রে, ভারী সুন্দর!"

ঝিলম বলল, "তোমরা যাও, আমার কাজ আছে। একবার জেনারাল লী পো-র সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

ঠিক হল বাষ্প-স্নান সেরে নী আর রা ফিরে যাবে হোটেলে। ঝিলমও সেখানে এক ঘণ্টা বাদে ফিরবে।

জেনারাল লী পো-র কাছে গিয়ে ঝিলম আর-একটা দুঃসংবাদ শুনল। এলোইস নামের একটি নক্ষত্রে আরও কুড়ি জন মানুষকে পাওয়া গেছে, তাদেরও চোখ আর কানের পর্দা নেই। ঝটিকা বাহিনীর একটা অনুসন্ধান দল এক-এক করে গ্রহ-নক্ষত্র খুঁজে খুঁজে দেখছে। এ রকম আরও কোথাও আরও কত মানুষ পড়ে আছে কে জানে!

চেয়ার ছেড়ে ঘরের মধ্যে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে করতে জেনারাল লী পো বললেন, "খুনে, গুন্ডার দল! সমস্ত মহাকাশ জুড়ে ওরা চোখ আর কান ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে! জীবন্ত মানুষের চোখ তুলে নেবে, কান ছিঁড়ে নেবে, এ কি কল্পনা করা যায়?"

ঝিলম জিজ্ঞেস করল, "আপনি শুক্রগ্রহের সরকারকে জানাননি?"

লী পো বললেন, "জানিয়েছি তো বটেই! তাঁরা কোনো দায়িত্ব নিতে চান না। তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করে বলছেন, শুক্রগ্রহ থেকে একটা দল সূর্যমণ্ডলের বাইরে বেরিয়ে গেছে, সেই দলটার ওপর শুক্রগ্রহ সরকারের কোনো কর্তৃত্ব নেই!"

ঝিলম থাকতে থাকতেই আরও দুটো খবর এল।

আবার আর একটা গ্রহে পাওয়া গেছে ঐ রকম চোখ-কান-খোবলানো বারোজন মানুষ। সেখানেও চারটি রকেট পড়ে আছে এমনি এমনি। এই ডাকাতরা আর কিছু নেয় না। নেয় শুধু চোখ আর কানের পর্দা।

আর একটা খবর হচ্ছে, শুক্রগ্রহের লোকদের একটি রকেট মহাশূন্যে ঝটিকা বাহিনীর একটি রকেট দেখেই আক্রমণ করে। সেখানে একটুক্ষণের মধ্যেই আরও দুটি ঝটিকা বাহিনীর রকেট এসে পড়েছিল হঠাৎ। তখন শুক্রগ্রহের লোকদের রকেটটি পালাবার চেষ্টা করলেও সেটিকে ঘায়েল করা হয়েছে শেষ পর্যন্ত। শুক্রগ্রহের দু-জন লোককে বন্দী করা হয়েছে। তাদের নিয়ে এখানে এসে পৌঁছতে দু-দিন সময় লাগবে।

ঝিলম হঠাৎ বলল, "জেনারাল, আমি একটা অনুরোধ জানাব?"

"কী, বলো?"

"আমি রকেট নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়তে চাই। আমাদের সবচেয়ে আগে দরকার, শুক্রগ্রহের এই দলটির মূল ঘাঁটিটা খুঁজে বার করা। ঝটিকা বাহিনী যেমন অনুসন্ধান চালাচ্ছে চালাক। আমি নিজেও একবার চেষ্টা করে দেখি।"

"তুমি একলা কী করবে? এখন তো দেখা যাচ্ছে এদিকে আকাশপথে চলাচল করাই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে! কখন ওরা কাকে আক্রমণ করবে ঠিক নেই।"

"ওরা আমাদের ধরতে পারবে না। দেখলেন তো একবার নী আর রা-কে ধরবার চেষ্টা করেও পারেনি।"

"তুমি যদি দুঃসাহস দেখাতে চাও, তাহলে আর আমার কী বলবার আছে? তুমি রকেট নিয়ে বেরিয়ে পড়তে চাইলে তো আমার অনুমতির দরকার নেই?"

"আমি আপনার আশীর্বাদ চাই। তাছাড়াও আমার একটি প্রার্থনা আছে। শুক্রগ্রহের যে লোকটিকে আমরা বন্দী করে এনেছি তাকেও আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।"

"সে কী!"

"ওর কাছ থেকেই খবর বার করবার চেষ্টা করব।"

"আমরা এত চেষ্টা করেও পারিনি—"

"ওকে আমি হো-সানের কাছে নিয়ে যাব। তিনি নিশ্চয়ই ওর মনের কথা বুঝতে পারবেন।"

"হো-সান! তিনি মনের কথা পড়তে পারেন, এমন তো কখনো শুনিনি। তাছাড়া তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়েছেন।"

"তিনি সব পারেন। তাঁর ওপরে আমার অগাধ শ্রদ্ধা।"

"ঠিক আছে। তা হলে নিয়ে যাও ওকে। আর দু-জনকে তো বন্দী করে আনছেই। তবে দেখো, খুব সাবধান! ঐ লোকটি সাপের থেকেও বেশি বিষাক্ত!"

সব ব্যবস্থা করার জন্য ঝিলম তখুনি উঠে পড়ল।

ঝিলম ভেবেছিল, নী আর রা-কে এখানেই রেখে যাবে। কিন্তু ওরা কিছুতেই রাজি নয়। এমন রোমাঞ্চকর অভিযানের সুযোগ ওরা কিছুতেই ছাড়বে না। ঝিলম একটু বোঝাবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল। রা-কে বিপদের ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই।

তাহলে ইউনুসকেই বা ফেলে যাওয়া যায় কী করে? ইউনুসের ঘুম ভাঙবে কাল সকালে। শুক্রগ্রহের লোকটিও জাগবে সেই সময়। তাহলে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হয়।

রাত্তিরটা ওরা আরাম করে ঘুমিয়ে নিল নরম বিছানায়।

॥ ৮ ॥

এই প্রথম ওরা রকেটে সবাই একসঙ্গে জেগে আছে। শুক্রগ্রহের লোকটির অবশ্য হাত আর পা বেঁধে রাখা হয়েছে। কন্ট্রোলে বসেছে ঝিলম। ইউনুস বসে আছে শুক্রগ্রহের লোকটির মুখোমুখি। ঝিলম তাকে লিখে জানিয়েছে, সে যেন চেষ্টা চালিয়ে যায় যতদূর সম্ভব ঐ লোকটির মনের কথা জানবার।

ঝিলম প্রথমেই চলেছে হো-সানের কাছে।

হো-সান কখন কোথায় থাকেন তার কোনো ঠিক নেই। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, ভোরে উঠেই ঝিলম অনেকগুলো জায়গায় খবর নিয়ে জেনেছে যে, এখন হো-সান খুব কাছেই আছেন।

নী জিজ্ঞেস করল, "রা-দি, এই হো-সান কে?"

রা বলল, "তিনি এমনিতে একজন বৈজ্ঞানিক, আসলে তিনি একজন মহাপুরুষ। আমি ওঁর মতন মানুষ আর একজনও দেখিনি। ওঁকে দেখলেই শ্রদ্ধা হয়।"

নী বলল, "বৈজ্ঞানিক? যিনি প্রথম এনার্জিকে ম্যাটারে পরিণত করার উপায় আবিষ্কার করেছিলেন?

"হ্যাঁ।"

"তিনি এখনো বেঁচে আছেন? সে তো কবেকার কথা! ঐ জিনিসটা তো আবিষ্কার হয়েছিল দু-হাজার দশ সালে। আমরা ইস্কুলের বইতে পড়েছি, ঢাকার সায়েন্স-কংগ্রেসে একজন বৈজ্ঞানিক একটা কাচের বাক্সের মধ্যে ঢুকে একটা দেশলাই-কাঠি জ্বালালেন। ফস করে আগুন জ্বলে উঠে বারুদটা পুড়ে গেল। তারপর তিনি যখন কাচের বাক্স থেকে বেরিয়ে এলেন, সবাই দেখল কাঠিটা আগের মতনই আছে। আবার সেটা জ্বালানো

র। সবাই ভাবল, ওটা বুঝি ম্যাজিক। কিন্তু সেই বৈজ্ঞানিক বোঝালেন যে, বারুদ থেকে যদি আগুন হয়, তাহলে সেই আগুন থেকে আবার বারুদ হবে না কেন? সেই তিনিই তো?"

"হ্যাঁ। উনি আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন। এমন-কী সেদিন লালগোলাপে নেমে যে ট্যাবলেট খেলাম, যার জন্য কেউ আমাদের ছুঁতে পারল না, সেই ট্যাবলেটও ওঁর আবিষ্কার। ওঁর এখন কত বয়েস তা কেউ জানে না। তুই এসপারান্টো ভাষায় হো-সান মানে জানিস তো?"

"নিঃসঙ্গ।"

"উনি এখন সত্যিই নিঃসঙ্গ। এই নিঃসীম মহাশূন্যে ইচ্ছে করে হারিয়ে গেছেন। একদম একলা থাকেন।"

ঝিলম মুখ ফিরিয়ে বলল, "রা, আমাদের বিয়ের খবর পেয়ে উনি যে একটা উপহার পাঠিয়েছিলেন, তা বললে না?"

নী বলল, "কী উপহার, রা-দি?"

রা বলল, "একটা ছোট্ট কালো রঙের চকচকে পাথর, তাতে দারুণ সুন্দর গন্ধ। পাথরের যে এমন চমৎকার গন্ধ থাকতে পারে, তা আগে আমার ধারণাই ছিল না। সব সময় কাছে রাখলে গন্ধটা পুরনো হয়ে যাবে বলে সেটা আমি সঙ্গে রাখিনি। আমার বাবা ওঁর লেবরেটরিতে কাজ করতেন এক সময়, সেই জন্য উনি আমায় খুব স্নেহ করেন।"

নী জিজ্ঞেস করল, "উনি যে একদম একা থাকেন, ওঁর কষ্ট হয় না?"

রা বলল, "উনি বলেন বিজ্ঞানের চর্চাই ওঁর তপস্যা। শেষ বয়েসে উনি একা-একাই ঐ তপস্যা করতে চান! উনি তো এখনো একটা দারুণ অস্ত্র নিয়ে গবেষণা করছেন।"

"অস্ত্র?"

শুক্রগ্রহের লোকটিও এইসব কথা শুনছিল। ঝিলম তার দিকে ইঙ্গিত করে রা-কে বলল, "ওকথা থাক, রা।"

রা একটু চুপ করে গেল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, "আমারও বিশ্বাস, হো-সান এই লোকটিকে দেখলেই এর মনের কথা বলে দিতে পারবেন।"

নী বলল, "আচ্ছা রা-দি, আমি সেদিন যখন নীল মেঘটায় নেমে স্নান করছিলাম, তখন আলো-রশ্মি দিয়ে কারা আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিল? এরাই?"

রা বলল, "আমার তো তাই মনে হচ্ছে। শুক্রগ্রহের এই মানুষগুলো ছাড়া মহাশূন্যে আর কারা চুরি-ডাকাতি করবে?"

ঝিলম বলল, "আমার মনে হয়, ঐ চুম্বক-আলো দিয়েই ওরা অনেক রকেটও টেনে নামিয়েছে। আমাদের এই সাত-দুই-নয়-শূন্য রকেটটাকে অবশ্য ঐভাবে নামানো খুবই শক্ত ব্যাপার। তবে অন্য দু-একটি দেশের কমজোরি রকেটগুলো টানতে পারে।"

নী কক্‌পিটের সামনের কাচের দিকে তাকিয়ে বলল, "ইশ, এখন আর একটাও মেঘ দেখা যাচ্ছে না।"

রা বলল, "মেঘ থাকলেও তোমাকে আর নামতে দেওয়া হত না।"

ইউনুস একেবারে স্থিরভাবে শুক্রগ্রহের লোকটির দিকে চেয়ে বসে আছে। সে বেচারির তো এদের সঙ্গে কথাবার্তায় যোগ দেবার উপায় নেই।

হো-সান যেখানে থাকেন, সেই জিনিসটার নাম 'শান্তি'। সেটা উপগ্রহ কিংবা নক্ষত্র কিংবা রকেটও নয়। সেটা সাবানের ফেনার বুদ্বুদের মতন একটা গোল, স্বচ্ছ জিনিস। সেটাকে চালাতে হয় না, সেটা আপনি-আপনি ভেসে বেড়ায়। বৃদ্ধ হো-সান এই বুদ্বুদটার মধ্যে ইচ্ছে করে নির্বাসন নিয়েছেন।

দূর থেকে ছোট্ট একটা বুদ্বুদের মতন দেখালেও সেটা অবশ্য সূক্ষ্মতম যন্ত্রপাতিতে ভরা। সবই হো-সানের নিজের হাতে তৈরি। কোনো রকেট ইচ্ছে করলেও এটাকে ধাক্কা দিয়ে চলে যেত পারবে না। কারণ এর চারপাশ ঘিরে প্রচণ্ড শক্তিশালী বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বইছে। হো-সান নিজে কারুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে না চাইলেও সমস্ত স্পেস-স্টেশন ঐ শান্তি নামের বুদ্বুদটির খোঁজ-খবর রাখে। মাঝে মাঝে বিশেষ-বিশেষ কেউ দেখা করতে যায় ওঁর সঙ্গে।

শান্তির কাছাকাছি এসে ঝিলম সিগন্যাল দিতে লাগল।

কম্পিউটার জিউস বলল, "মেশিন বন্ধ করে দাও, ঝিলম। হো-সান একেবারে শব্দ সহ্য করতে পারেন না, মনে নেই? শান্তির দরজা খুললেই আমাদের রকেটের প্রচন্ড শব্দ ভেতরে ঢুকবে।"

ঝিলম বলল "ধন্যবাদ, জিউস। আমরা শান্তি থেকে কতটা দূরে আছি?"

"মাত্র পনেরো হাজার কিলোমিটার।"

"এবার আমরা ওর নীচের দিকে যাব তো?"

"হ্যাঁ। গতিপথ ঠিক করে দিয়েছি আমি, তুমি মেশিন বন্ধ করে দিলই ঠিক চলে যাব—।"

শান্তির ভেতর অনেকখানি জায়গা থাকলেও রকেটসুদ্ধু তার মধ্যে ঢোকা যায় না। রকেটটা ওর নীচে নিয়ে গেলেই একটা দরজা খুলে যায়, তখন রকেট থেকে বেরুলেই ওপরে টেনে নেয়। মনে হয় যেন একটা ঝড় এসে ঠেলে নিয়ে যায় ভেতরে।

ঝিলম বলল, "জিউস, তোমার ওপর রকেটের ভার দিয়ে গেলাম।"

জিউস বলল, "ঠিক আছে। মহাত্মা হো-সানের কাছ থেকে আমার জন্য আশীর্বাদ চেয়ে এনো।"

"নিশ্চয়ই!"

এর পর ঝিলম চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করল ইউনুসকে। ইউনুস আর ঝিলম দু'দিক থেকে ধরল বন্দীটিকে। সে বিশেষ বাধা দেবার চেষ্টা করল না। হো-সানকে দেখবার জন্য তারও কৌতূহল হয়েছে বোধহয়।

ওরা রকেটের ওপর এসে দাঁড়াতেই বুদ্বুদের মতন গোলকটির খানিকটা অংশ খুলে গেল আর সঙ্গে-সঙ্গেই ওরা হুশ করে ঢুকে গেল ভেতরে। সেই অংশটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। ভেতরে গিয়ে ওরা খানিকটা হাওয়ার মধ্যে ভাসতে-ভাসতে তারপর আস্তে-আস্তে নেমে পড়ল নীচে।

ঠিক যেন সবুজ ঘাস আর গাছপালা ভরা একটি মাঠ আর তার মাঝখান দিয়ে একটা সুরকি-বিছানো পথ। আসলে অবশ্য সবই আলোর কারসাজি। সুরকির বদলে ঐ রঙের কাগজকুচি ছড়ানো আছে পথটায়। সেই পথের শেষে একটা সাদা রঙের দোতলা বাড়ি।

ওরা একটুখানি এগুতেই সেই বাড়িটির দরজা খুলে গেল। সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ। ছোট্টখাট্টো চেহারা, সাদা পাজামার ওপরে একটা সাদা ফতুয়া, পায়ে চটি। সেই বৃদ্ধের যে কত বয়েস তা বোঝবার উপায় নেই। তাঁর মাথার চুল ধপধপে সাদা, মুখে পাতলা-পাতলা দাড়ি সাদা, গোঁফ সাদা, ভুরু সাদা, এমন কী চোখের পল্লব আর গায়ের লোমও সব সাদা। তিনি সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে পা টেনে-টেনে হাঁটেন। ইনিই মহাকাশের নিঃসঙ্গ মানুষ হো-সান।

বন্দীর হাত ছেড়ে দিয়ে ঝিলম আর ইউনুস এগিয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করল তাঁকে। নী আর রা প্রণাম করল পায়ে হাত দিয়ে।

ঝিলম বলল, "হে গুরুদেব, আপনার জীবন আনন্দময় নিশ্চয়ই?"

হো সান বললেন, "আমার দিন ফুরিয়ে আসছে, তবু জীবন বড় সুন্দর, বড় মধুময়। তোমাদের জীবন আরও বিচিত্র, আরও

সুন্দর হোক।"

রা-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেমন আছ, রাভী মামণি? তোমাকে সেই কত ছোট্ট দেখেছিলাম! এই মেয়েটি কে?"

রা বলল, "এর নাম নীলাঞ্জনা। আমার আত্মীয় হয়।"

"বাঃ, বেশ নামটি তো!"

ঝিলম বলল "আমার বন্ধু ইউনুসকে চিনতে পারছেন তো? একবার মাত্র দেখেছেন আগে।"

"হ্যাঁ, চিনেছি। ও বুঝি নিঃশব্দ-বড়ি খেয়েছে? এসো, তোমরা সবাই ভেতরে এসো। এই শুক্রগ্রহের লোকটিকে পেলে কোথায়?"

ঝিলম বলল, "সে অনেক ব্যাপার আছে। এই জন্যেই আপনার কাছ থেকে পরামর্শ চাইতে এসেছি।"

দরজা দিয়ে ঢুকেই ভেতরে একটি বসবার ঘর। সোফা কৌচ দিয়ে সাজানো, এক পাশে একটা টি ভি, দেয়ালে নানা রকম ফুলের বাঁধানো ছবি। ঠিক যেন পৃথিবীর যে-কোনো শহরের একটা বাড়ি। এখানে ঢুকলে বোঝাই যায় না যে, ওরা এখন অসীম মহাশূন্যের একটা ভাসমান বুদ্বুদের মধ্যে রয়েছে।

শুক্রগ্রহের বন্দীটিকে ইউনুস আর ঝিলম বসিয়ে দিল একটি সোফায়।

এবার সে কথা বলে উঠল। সে হো-সানের দিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে বলল, "আপনি হো-সান। আপনার নাম আমরাও শুনেছি। এরা আমায় ধরে এনেছে, আপনি নাকি আমার মনের সব কথা বার করে দেবেন। দেখি, কেমন আপনার শক্তি!"

হো-সান দু-দিকে মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন "না, না, আমার সে-রকম কোনো শক্তি নেই! এরা বাড়িয়ে বলে। একেবারে তিনকেলে বুড়ো হয়ে গেছি, চোখেও ভাল দেখতে পাই না। আমি কি আর ওসব পারি? আগে একটু-আধটু পারতাম।"

তারপর তিনি নী-র দিকে ফিরে হাসি-মুখে বললেন, "নীলাঞ্জনা, তুমি ধাঁধার উত্তর দিতে পারো? একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করছি, বলো তো? কালোর মধ্যে আলো, কালো নিভলেও কালো। কী?"

নী প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল, "চোখ! চোখের মণি কালো, তাই দিয়ে সব আলো দেখা যায়। আবার চোখ বুজলেই সব কিছু কালো হয়ে যায়।"

হো-সান বললেন, "বাপ রে। এই মেয়ের কী বুদ্ধি! একটু চিন্তাও করতে হল না।"

নী বলল, "অবশ্য অনেকের চোখের মণি নীল কিংবা খয়েরিও হয়।"

হো-সান বললেন, "তোমার চোখ কালো, রাভীর চোখ কালো, ঝিলম আর ইউনুসের চোখও তো কালোই দেখছি। আচ্ছা, আর একটা বলো তো? আকাশ থেকে আশ মেটাও, যেথায় [illegible] যাও, একটা ছেড়ে আরেকটায় তিনের অর্ধেক নাও!"

এবার নী-কে একটু ভাবতে হল। মন দিয়ে কিছু চিন্তা করার সময় নী একটু ট্যারা হয়ে যায়। তবু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে বলে উঠল, "ও, বুঝেছি। কান! আকাশ থেকে আশ মেটাও, অর্থাৎ আশ বাদ দিলে থাকে কা, আর তিনের অর্ধেক করলে হয় তি আর ন, এর মধ্যে একটা ছেড়ে আরেকটায়, অর্থাৎ ন!"

হো-সান বললেন, "এটাও ধরতে পেরেছ? বাঃ!"

ঝিলম আর রা অবাক হয়ে চোখাচোখি করল একবার।

হো-সান এবার বললেন, "রাভী আর নীলাঞ্জনা, তোমরা একটু বাইরে বেরিয়ে ঘুরে ফিরে দ্যাখো জায়গাটা। আমি ঝিলমের সঙ্গে কথা বলি।"

মেয়ে দুটি বেরিয়ে যাবার পর ঝিলম শুক্রগ্রহের লোকদের ডাকাতির ঘটনাটা সংক্ষেপে শোনাল হো-সানকে।

সব শুনে তিনি খুব দুঃখিতভাবে শুক্রগ্রহের বন্দীটিকে বললেন, "ছিঃ আপনারা এ রকম করছেন কেন? আপনি ডাক্তার, আপনার কাজ হচ্ছে মানুষের প্রাণ বাঁচানো। সব মানুষের প্রাণের দাম সমান। আপনি একজন মানুষের চোখ আর কান তুলে নিয়ে অন্য একজনকে সুস্থ করে তুলেছেন? আপনার বিবেকে লাগছে না?"

শুক্রগ্রহের বন্দীটি অবহেলার সঙ্গে বলল, "সব মানুষের প্রাণের দাম মোটেই সমান নয়! মানুষের মধ্যে যাদের বুদ্ধি বেশি, শক্তি বেশি, তাদেরই বেঁচে থাকবার অধিকার বেশি!"

হো-সান বললেন, "এ তো আপনি বলছেন জন্তু জানোয়ারদের কথা। মানুষই তো দুর্বলের সেবা করে, অন্যদের স্নেহ করে, ভালবাসে। একটি অসুস্থ শিশুকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য আমরা ব্যস্ত হই কেন? সেই শিশুটির তুলনায় তো আমাদের বুদ্ধিও বেশি, গায়ের জোরও বেশি! যাই হোক শুনুন! আপনারা শুক্রগ্রহ ছেড়ে অজানার অভিযানে বেরিয়ে পড়েছেন, খুব ভাল কথা। কিন্তু মন থেকে অকারণ হিংসা আর লোভ মুছে ফেলুন! আপনাদের দলের কিছু লোকের যদি চোখ অন্ধ আর কানের পর্দা ফেটে গিয়ে থাকে, তাহলে তাদের সবাইকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন। আমরা সানন্দে তাদের চোখ আর কান ঠিক আগের মতন করে দেব।"

বন্দীটি বলল, "আমরা আপনাদের কোনো সাহায্য চাই না!"

"সাহায্য না চেয়ে, এ রকম মহাকাশে ডাকাতি করবেন ভেবেছেন?"

ঝিলম বলল, "বোঝাই যাচ্ছে, ওরা কোনো একটা অজানা গ্রহে কিংবা নক্ষত্রে এমন একটা কিছু আবিষ্কার করেছে, যার কথা আমাদের জানাতে চায় না কিছুতেই।"

হো-সান হেসে বললেন, "কতদিন গোপন রাখবে? বেশি-দিন গোপন রাখা কি সম্ভব? তোমার মতন কত অভিযাত্রী মহাকাশে ঘুরছে, তাদের কেউ-না-কেউ একদিন-না-একদিন খুঁজে পাবেই!"

ঝিলম বলল, "সেই কথাটাই তো এরা বুঝছে না।"

ইউনুস বন্দীটির দিকে চেয়ে স্থির হয়ে বসে আছে।

ঝিলম হো-সানকে বলল, "এই লোকটি এখানে থাক, ইউনুস পাহারা দেবে। গুরুদেব, আমি আপনার লেবরেটরিটা একবার দেখতে চাই।"

বাড়িটার পিছন দিকে বিরাট লেবরেটরি। হো-সান ছাড়া আর একজনও লোক নেই, এটা ভাবলেই কেমন যেন গা ছমছম করে। একেবারে সম্পূর্ণ একা কোনো মানুষ থাকতে পারে? বৃদ্ধ হো-সান যদি হঠাৎ এখানে কোনোদিন মরেও যান, কেউ জানতেও পাবে না।

লেবরেটরিতে এসে ঝিলম জিজ্ঞেস করল, "গুরুদেব, সেই অস্ত্রটার কতদূর কী হল?"

হো-সান বললেন, "দিন ফুরিয়ে এসেছে আমার। বোধহয় আর শেষ করে যেতে পারব না। অনেকখানি এগিয়েছিলাম, কিন্তু আরও অনেক পরীক্ষা করতে হবে! কাজে লাগিয়ে দেখতে হবে!"

ঝিলম উত্তেজিতভাবে বলল, "অনেকখানি এগিয়েছেন? তা-হলে আমার ওপরে পরীক্ষা করুন!"

"তোমার ওপরে, তা কি হয়? এখনো অনেক বিপদের ঝুঁকি আছে!"

"আপনি জানেন, কোনো বিপদকে আমি ভয় করি না। যদি আপনার পরীক্ষার কাজে লাগতে পারি—"

"আমি ভয় করি, ঝিলম, আমি ভয় পাই! একেবারে নিশ্চিন্ত না হয়ে কি পরীক্ষা করা যায়!"

হো-সান তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে একটা প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করার ব্রত নিয়েছেন। তিনি যেটা আবিষ্কার করতে চলেছেন, সেটা আসলে কোনো অস্ত্র নয়, একটা শক্তি। এতকাল ধরে মানুষ শুধু মানুষ মারার জন্য কত রকম অস্ত্র আবিষ্কার করেছে। হো-সান আবিষ্কার করতে চান এমন এক প্রতিরোধ-শক্তি, যে-শক্তি পেলে কোনো অস্ত্রই সেই মানুষকে ধ্বংস করতে পারবে না।

এরপর হো-সানের সঙ্গে ঝিলমের কিছুক্ষণ ধরে অনেক গোপন কথাবার্তা হল। তারপর হো-সান রা আর নীকে ডেকে আনলেন সেখানে। রা-র কাঁধে হাত রেখে তিনি বললেন, "রাভী মামণি, আমি একটা প্রতিরোধ-শক্তি আবিষ্কার করেছি, যেটা এখনো পরীক্ষা করে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া যায়নি। এখনো বিপদের ঝুঁকি আছে। ঝিলম সেটা ব্যবহার করতে চাইছে। ওকে দেওয়া কি ঠিক হবে? ঝিলম যে আমার খুব স্নেহের, বড় আদরের, ওর যদি কোনো বিপদ হয়..."

রা বলল, "ওকে দেবেন না। আপনি আমার ওপর দিয়ে সেটা পরীক্ষা করুন!"

"ওরে দুষ্টু মেয়ে। তোমার কোনো বিপদ হলে বুঝি আমার কম কষ্ট হবে?"

নী বলল, "আমায় দিয়ে সেটা পরীক্ষা করা যায় না?"

রা বলল, "তুই চুপ কর তো! তুই বাচ্চা মেয়ে!"

ঝিলম বলল, "আমি কিন্তু আগে বলেছি, আমার দাবি প্রথম।"

হো-সান বললেন, "এখনো আমার মন মানতে চাইছে না। চিন্নাস্বামীকে চেনো তো? আমার সহকারী ছিল এক সময়, তাকে খবর পাঠিয়েছি, সে এলে তাকে সব দিয়ে দেব। সে পৃথিবীতে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করবে!"

ঝিলম বলল, "আমি কিন্তু আপনার কাছে এই জন্যই এসেছি।"

"চলো, ব্যাপারটা তোমাকে বুঝিয়ে বলি!"

রা আর নী-কে বাইরে রেখে হো-সান ঝিলমকে নিয়ে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ঝিলম বেরিয়ে এল প্রায় তিন ঘণ্টা পরে। নী আর রা তখন বাড়ির ছাদে প্রচণ্ড শক্তিশালী টেলিস্কোপে অনেক দূরের-দূরের তারা দেখছিল। ঝিলম তাদের ডেকে বলল, "চলো, এবার যেতে হবে!"

বিদায় দেবার সময় হো-সান মিষ্টিমুখ করাবার জন্য প্রত্যেকের হাতে একটি করে মিছরির দানার মতন জিনিস দিলেন। ঝিলম জানে, ঐটুকু জিনিস খেলেই তাদের আর চব্বিশ ঘণ্টা খিদে পাবে না। হো-সান আজকাল প্রায় কিছুই খান না। এই গোলকে তাঁর জন্য প্রায় পঞ্চাশ বছরের খাবার মজুত আছে।"

হো-সান শুক্রগ্রহের বন্দীটিকেও এক টুকরো মিষ্টি দিয়েছিলেন। লোকটি এত অভদ্র যে, সেটা না খেয়ে ফেলে দিল।

তাতেও রাগ করলেন না হো-সান। নরম গলায় বললেন, "আপনি এত গোপনীয়তার বোঝা আর কতদিন বয়ে বেড়াবেন? এই রকম হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দিনের পর দিন ওদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে আপনার ভাল লাগবে? আমরা তো আপনাদের সাহায্য করতেই চাই!"

লোকটা রুক্ষভাবে উত্তর দিল, "আমার যা হয় হোক, তার জন্য আমি আমার দলের কোনো ক্ষতি করতে চাই না!"

ঝিলম বলল, "দেখা যাক। চলুক তবে ধৈর্যের পরীক্ষা!"

গোলকের একটা অংশ খুলে যেতেই ওরা বেরিয়ে এল বাইরে। রকেটের ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে ওরা শেষবারের মতন হাত নেড়ে বিদায় জানাল হো-সানকে। সেই ছোট্টখাট্টো চেহারার

বৃদ্ধ ওদের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আস্তে-আস্তে হাত নাড়ছেন।

ভেতরে ঢুকে রকেটটা চালু করা মাত্র চোখের নিমেষে সেটা এত দূরে চলে গেল যে, হো-সানকে আর দেখা গেল না।

ঝিলম বলল, "ধন্যবাদ জিউস! হো-সান তোমায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন!"

জিউস বলল, "হো-সান দীর্ঘজীবী হোন!"

নী বলল, "কী চমৎকার মানুষ!"

রা বলল, "আমার খুব মনটা খারাপ লাগছে। ওঁকে আর কোনোদিন দেখতে পাব তো? যতবার দেখি, ততবারই ভয় হয় এরকম একা একা থাকেন!"

বন্দীটিকে একটা চেয়ারে বসিয়ে ইউনুস গিয়ে আবার বসেছে তার মুখোমুখি চেয়ারে।

ঝিলম দু-হাত উঁচু করে আড়মোড়া ভাঙল। তারপর বলল, "আমার কী রকম শরীরটা খারাপ লাগছে!"

রা বলল, "শরীর খারাপ লাগছে, কই দেখি?"

ঝিলমের কপালে হাত রেখে সে আবার বলল, "তোমার তো জ্বর হয়েছে মনে হচ্ছে! তুমি বরং হাসপাতাল-ঘরে গিয়ে একবার দেখিয়ে নাও!"

নী বলল, "ঝিলমদা সেই যে জেনারাল লী পো'র সঙ্গে সঙ্গে অভিযানে বেরিয়েছিলেন, তারপর তো আর ঘুমোননি।"

রা বলল, "তাই তো, খুব অন্যায় করেছ ঝিলম! তোমার অন্তত কুড়ি দিন আয়ু খরচ হয়ে গেছে। চলো, হাসপাতাল ঘরে চলো।"

ঝিলম বলল, "তার দরকার নেই। ঘুমোলেই ঠিক হয়ে যাবে। আমি আট দিনের জন্য ঘুমের বড়ি খাচ্ছি। ততদিন তুমি আর ইউনুস চালাও। তারপর আমি জাগলে তোমরা ঘুমোতে যাবে। তবে সাবধান, ঐ লোকটার দিকে চোখ রেখো, ও যেন কোনো গণ্ডগোল না করে আবার! চলো, নী!"

নী অবাক হয়ে বলল "আমি?"

"হ্যাঁ, তুমি শুধু-শুধু জেগে থেকে আয়ু খরচ করবে কেন? তুমিও আমার সঙ্গে ঘুমোবে চলো।"

ইউনুস তার কথা বুঝতে পারবে না বলে একটা কাগজে লিখে ঝিলম সেই কাগজটা দিল ইউনুসের হাতে।

তখন জিউস বলে উঠল, "ঝিলম, তুমি ঘুমোতে যাচ্ছ, কিন্তু রকেটটা এখন কোন দিকে যাবে সেটা বলে দিলে না?"

ঝিলম বলল, "ও হ্যাঁ, আপাতত টিউলিপ নক্ষত্রের দিকে চলুক। ততদিনে যদি আমার ঘুম না ভাঙে, তাহলে মহাকাশ স্পেস স্টেশন ২ নম্বরের দিকে এগিও। পথে সন্দেহজনক কিছু দেখলেও থামবে না। আমি জেগে উঠলে আবার সেখানে ফিরে আসব।"

জিউস বলল, "ঠিক আছে। তোমাদের সুনিদ্রা হোক।"

ঝিলম ইউনুসের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় বিদায় নিয়ে একবার রা-র কাঁধে হাত রেখে বলল, "সাবধানে থেকো!"

তারপর নী-কে নিয়ে সে চলে গেল ঘুম-ঘরে।

আগেকার পোশাক বদলে দু-জনেই খুব হালকা পোশাক পরে নিল। নী-কে আগে কাচের বাক্সে শুইয়ে তারপর নিজের বাক্সটায় গেল ঝিলম। সাধারণ বিছানার বদলে এই কাচের বাক্সে শুতে হয়, তার কারণ হঠাৎ রকেটের ভেতরটা বেশি ঠাণ্ডা বা গরম হয়ে গেলে সেটা ওরা টের পাবে না। এই ট্যাবলেট-খাওয়া ঘুম মাঝখানে একবার ভেঙে গেলে খুব ক্ষতি হয়।

হাত বাড়িয়ে নী-কে ঘুমের ট্যাবলেট দিয়ে বাক্সের ডা[illegible] বন্ধ করবার আগে ঝিলম বলল, "একটা কবিতা শোনাও তো, নী অনেকদিন তোমার কবিতা শুনিনি।"

নী বলল:

জলে ভেজা রোদে ভাজা
বরফ-দেশে কাঁপন
আমার আমি তোমার তুমি
সবার চেয়ে আপন
কেউ বা দুখে কেউ বা সুখে
করছে জীবন যাপন
আমার আমি তোমার তুমি
সবার চেয়ে আপন
নদীর পাশে... নদীর পাশে...
নদীর পাশে...........

আর শেষ করতে পারল না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল নী-র।

॥ ৯ ॥

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে একঘেয়ে লাগল রা-র। ইউনুসের সঙ্গে তো কথা বলার উপায় নেই! কিছুক্ষণ সুইচ টিপে গান শুনল।

শুক্রগ্রহের বন্দীটি বসে বসে ঢুলছে। সেদিকে একবার তাকিয়ে রা-র একটা কথা মনে হল। এই লোকটার তো আয়ুক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে কিছুদিন ঘুরলেই তো লোকটা বুড়ো হয়ে যাবে।

সে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা জিউস, এই লোকটাকে মাঝে-মাঝে ঘুম পাড়িয়ে রাখা উচিত নয়? শুধু-শুধু ওর আয়ু খরচ করে লাভ কী?"

জিউস বলল, "ঝিলম তো কিছু বলেনি! ঝিলম জেগে উঠুক, তারপর দেখা যাবে!"

"ও ঘুমিয়ে থাকলে তো আমরাও নিশ্চিন্ত! এত পাহারা দিতে হয় না!"

"ও ঘুমোলে ইউনুস ওর মনের কথা পড়বার চেষ্টা করবে কী করে?"

"তা ঠিক!"

একবার রা উঠে গেল কফি বানাতে। তিনটে কাগজের গেলাসে কফি এনে একটা দিল ইউনুসকে। আর একটা গেলাস বন্দীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এই যে, ডাক্তারবাবু, একটু কফি খান।"

লোকটি চোখ মেলে তাকাল।

ওর হাত বাঁধা, নিজে কফি খেতে পারবে না বলে রা গেলাসটা ধরল ওর মুখের কাছে।

লোকটি মুখের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল গেলাসটা!

রা বলল, "ইশ, দিলে নষ্ট করে? শুক্রগ্রহের মানুষগুলো এত অসভ্য আর গোঁয়ার কেন?"

রা নিজের কফি নিয়ে এসে আবার বসল কন্ট্রোল বোর্ডের সামনে। দূরে আবার একটা ধূমকেতু দেখা যাচ্ছে। নী জেগে থাকলে খুব আনন্দ পেত।

কফি শেষ করে ইউনুস একবার উঠে গেল। বাথরুমে গেলাসটা ফেলে সে এল ঘুম-ঘরে। নী আর ঝিলম অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সেখানে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে রকেটের নানান ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তারপর একসময় ইউনুস এসে দাঁড়াল কন্ট্রোল রুমে রা-র পাশে। রা মুখ তুলে তাকাতেই ইউনুস রা-র হাত-ব্যাগটা তুলে নিল এক হাতে।

রা জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার, ইউনুস? তুমি কিছু চাইছ?"

ইউনুস হঠাৎ কথা বলে উঠল।

সে গম্ভীরভাবে বলল, "এবার আমি এই রকেটটার দখল নিচ্ছি! তুমি উঠে এসো, রা—।"

রা বলল, "তুমি কন্ট্রোল বোর্ডে বসবে? আমার পাশে এসে বোসো না!"

ইউনুসের এক হাতে ছোট্ট একটা রিভলভার। সেটা উঁচু করে সে আবার বলল, "আমার কথা শুনতে পাওনি? উঠে এসো! কোনো রকম বাধা দেবার চেষ্টা করলেই মরবে!"

রা খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসতে-হাসতেই বলল, "বাবা রে বাবা, অদ্ভুত তোমার ঠাট্টা! এতদিন পর কথা বলতে শুরু করেই তুমি এমন ভয় পাইয়ে দিলে—"

ইউনুস খপ করে রা-র চুলের মুঠি চেপে ধরে কর্কশ গলায় বলল, "ঠাট্টা! আমি অনেক দিন সহ্য করেছি! তোমরা আমার সঙ্গে চাকরের মতন ব্যবহার করে...!"

রা এবার ধমক দিয়ে বলল, "কী হচ্ছে, ইউনুস? এরকম ইয়ার্কি আমি পছন্দ করি না! চুল ছেড়ে দাও!"

ইউনুস এবার প্রচন্ড জোরে রা-র মুখে একটা চড় কষাল! দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "ফের আমার সঙ্গে ঐ রকম সুরে কথা বলছ? আমি তোমাদের চাকর? ঝিলম মনে করে চিরকাল আমি ওর সহকারী থেকে যাব? প্রাণে বাঁচতে চাও তো উঠে এসো, এই রকেট এখন আমার!"

চড় খেয়ে রা হতবাক হয়ে চেয়ে রইল ইউনুসের মুখের দিকে। এত জোরে কেউ তাকে কখনো মারেনি। ইউনুসের মুখখানা হিংস্র হয়ে গেছে, সে কটমট করে চেয়ে আছে রা-র দিকে।

রা এবার বলে উঠল, "জিউস, কী ব্যাপার? ইউনুস কি হঠাৎ পাগল হয়ে গেল?"

জিউস কোনো উত্তর দিল না।

ইউনুস বলল, "জিউসকে আমি আগেই ঠান্ডা করে রেখেছি। ওর কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাবে না। আমি পাগল! আমাকে তোমরাই জোর করে নিঃশব্দ-বড়ি খাইয়ে চুপ করিয়ে রেখেছিলে। যাতে আমি কোনো কথা বলতে না পারি, শুধু তোমাদের হুকুম মেনে চলব! ঘুম থেকে জেগে ওঠার আগেই ঝিলমকে আমি খুন করব!"

"ইউনুস, কী বলছ?"

"একটু পরেই দেখতে পাবে, আমি কী করি!"

শুক্রগ্রহের বন্দীটি প্রায় হাঁ করে তাকিয়ে ওদের কথা শুনছে। তার দিকে ফিরে ইউনুস বলল, "আমি তোমার মনের কথা সব জেনে গেছি। তোমরা নটিলাস নামে একটি রকেটে চেপে সৌরমন্ডলের বাইরে ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ একটা মৃত নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছ। সেই নক্ষত্রটিতে দুটি বিরাট সোনার পাহাড় আছে, সে এত সোনা যে, পৃথিবীর মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। নিজেদের চেনাশুনো আড়াইশো লোক নিয়ে তোমরা আস্তে-আস্তে সেই নক্ষত্রে একটা আস্তানা তৈরি করেছ। সেই সোনা নিয়ে গিয়ে এর পর তোমাদের দলটাই পুরো শুক্রগ্রহের মালিক হতে চাও, তাই না?"

লোকটি বলল, "সোনার পাহাড়, হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! তা আবার হয় নাকি?"

"তোমরা সেই গ্রহটার নাম দিয়েছ মিডাস। প্রথমবার সোনা তুলতে গিয়ে সেখানে এক প্রচন্ড বিস্ফোরণ হয়। সেখানে যে হিলিয়াম গ্যাস ছিল, তোমরা জানতে না। সেই বিস্ফোরণে তোমাদের দলের প্রায় দেড়শোজন লোকের চোখ অন্ধ আর কান কালা হয়ে গেছে। তারাই তোমাদের প্রথম সারির বিশিষ্ট লোক। আমার কাছে আর লুকোবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই।"

"ধরো যদি তোমার কথা সত্যিও হয়, তাতেই বা কী হবে?"

"এখন তোমার জীবন নির্ভর করছে আমার হাতে। তোমাকে আমি এই মুহূর্তে রকেট থেকে ফেলে দিতে পারি। আবার তোমাকে বাঁচাতে পারি একটি শর্তে। মহাশূন্য স্টেশন আর্মস্ট্রং-এ তুমি কালো নার্স-মেয়েটিকে তার দেহের ওজনের সমান সোনা দিতে চেয়েছিলে তোমার মুক্তির বিনিময়ে। তুমি যদি আমার দেহের ওজনের সমান সোনা দাও আমাকে, তা হলে আমিও তোমাকে মুক্তি দেব।"

"মুক্তি দেবে মানে?"

"তোমাকে ঐ মিডাস নক্ষত্রে পৌঁছে দিয়ে আসব। সেখান থেকে তুমি আমায় সোনাটাও দিয়ে দেবে। তোমাদের ঐ নক্ষত্রের কথা আর কারুকে জানাব না। সে-প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারি।"

"তোমার কথায় বিশ্বাস কী?"

"আমার মুখের কথাই বিশ্বাস করতে হবে। আসলে মহাশূন্যে ওড়াউড়ি করতে আমার আর ভাল লাগে না। ঐ সোনাটা পেলে আমি নিজের দেশে ফিরে গিয়ে আরামে জীবন কাটাতে চাই।"

"ঠিক আছে, রাজি!"

রা বলে উঠল, "খবর্দার ইউনুস, ওকে তুমি বিশ্বাস কোরো না! তুমি কী ছেলেমানুষি করছ, ইউনুস? ওদের নক্ষত্রে একবার গেলেই ও আমাদের সবাইকে বন্দী করবে। তোমাকেও ছাড়বে না। ঝিলম এখন জেগে নেই—"

ইউনুস গর্জন করে বলল, "তুমি চুপ করো! ঝিলম জেগে

নেই! ঝিলমই যেন সবকিছু পারে! আমার কোনো বুদ্ধি নেই?"

ইউনুস এগিয়ে গিয়ে শুক্রগ্রহের মানুষটির হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল!

রা চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে হাত চাপা দিল নিজের মুখে। কী বোকামি করছে ইউনুস! ঐ হিংস্র লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় কখনো?

ইউনুস লোকটিকে বলল, "এই সুতো দিয়ে এবার ঐ মেয়েটির হাত-পা বেঁধে ফেল। তারপর তোমার সঙ্গে আমার আলোচনা হবে।"

লোকটি এসে রা-র হাত-পা বেঁধে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে। রা কোনো বাধা দেবার চেষ্টা করল না। কারণ, কোনো লাভ নেই। ইউনুস আগেই তার হাত-ব্যাগটা কেড়ে নিয়েছে। কোনো অস্ত্র নেই তার কাছে এখন। লোকটা তাকে টানতে-টানতে নিজের চেয়ারটায় বসিয়ে দিল।

ইউনুস বলল, "এবার তুমি আমার কাছে এসে বোসো—"

ইউনুসের হাতে তখনও সেই রিভলভার। সে সেটা দেখিয়ে বলল, "এবার এটা পকেটে ভরে রাখতে পারি? রিভলবার উঁচিয়ে কোনো সন্ধির কথা আলোচনা করা যায় না। তুমি হঠাৎ আমায় আক্রমণ করার চেষ্টা করবে না আশা করি। কারণ তাতে কোনো লাভ নেই। এই রকেটটা এমন ভাবে তৈরি যে, এটা আমি, ঐ মেয়েটি আর ঝিলম ছাড়া আর কেউ চালাতে পারবে না। তুমি যদি এখন হঠাৎ আমায় মেরে ফেলো, তা হলে তোমাকে অনন্তকাল মহাশূন্যে ঘুরতে হবে।"

লোকটি বলল, "বুঝলুম। তোমাকে মারব কেন, তোমার প্রস্তাবে তো আমি রাজিই হয়েছি! তুমি যা চাইলে, তার দ্বিগুণ সোনা দিতে রাজি আছি, যদি তুমি আমাদের আরও কিছু দাও!"

"কী?"

"এই দুটি মেয়ে আর অন্য লোকটিকেও আমাদের মিডাসে নামিয়ে দেবে! ওদের চোখ আর কানের পর্দাগুলো আমাদের চাই!"

"বেশ তো! ওদের আমি এমনিই ফেলে দিতাম। অন্ত যখন ফিরে যাব, তখন বলব, ওরা শুক্রগ্রহের লোকদের হাতে ধরা পড়েছে। কেউ আমার কথা অবিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমার চোখ আর কানের পর্দার ওপরেও তোমাদের লোভ নেই তো? আমাকে আটকে রাখবার চেষ্টা করবে না?"

"না, না!"

এই সময় রা হঠাৎ ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ইউনুস দারুণ বিরক্ত ভাবে বলল, "আঃ! এইজন্যই মেয়েগুলোকে আমি সহ্য করতে পারি না। একটু বিপদের গন্ধ পেতে-না-পেতেই ছিঁচকাঁদুনের মতন ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে কাঁদতে শুরু করে। কেঁদে আর কোনো লাভ নেই। বুঝলে রা! আমি বেশি রেগে গেলে এখুনি তোমার চোখ উপড়ে নিতে বলব এই ডাক্তারকে।"

রা কান্না থামিয়ে মুখ তুলে বলল, "বিপদের ভয়ে আমি কাঁদিনি, ইউনুস। আমি আর ঝিলম তোমাকে কত ভালবাসি! তুমি আমাদের কত দিনের বন্ধু, দুঃখ-সুখে কতদিন আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি, সেই তুমি সামান্য সোনার লোভে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে? ভালবাসা, স্নেহ, প্রীতি, দয়া, মায়া, এসবই তুচ্ছ হয়ে গেল সোনার জন্য?"

ইউনুস বলল, "আমরা এখন কাজের কথা বলছি। তোমার বক্তৃতা থামাও! ভেবো না, তোমার ঐ প্যানপ্যানানি শুনে আমি গলে যাব! লোকে চাকর-বাকরকে যেমন ছিটেফোঁটা ভালবাসে তোমরা সেইরকম ভালবাসতে আমাকে!"

শুক্রগ্রহের লোকটির দিকে তাকিয়ে ইউনুস বলল, "এক কাজ করলে হয় না? রা-কেও ঘুম-ঘরে নিয়ে গিয়ে যদি বন্ধ করে দিই? তারপর ও-ঘরের বাতাস কমিয়ে দিলেই ওরা মারা যাবে। তাই করা যাক বরং। ঝিলম হঠাৎ জেগে উঠলে বিপদ হতে পারে। সে-ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই। মরা মানুষের চোখও তো কাজে লাগে!"

শুক্রগ্রহের লোকটি বলল, "কোনো কারণে দেরি হয়ে গেলে আর কাজে লাগে না। এক্ষুনি মেরে ফেলার দরকার নেই। ঐ ঝিলম তো আট দিনের জন্য ঘুমের বড়ি খেয়েছে, অর্থাৎ এই রকেটের ভেলোসিটি অনুযায়ী আট ঘন্টা, তার অনেক আগেই আমরা মিডাসে পৌঁছে যাব।"

ইউনুস বলল, "তা হলে শোনো, আমি কী ব্যবস্থা নিতে চাই। প্রথমে মিডাসে পৌঁছে আমি ওদের তিনজনকে সেখানে ফেলে দেব ওপর থেকে। আমার রকেট সেখানে নামবে না। তুমি তখনও ছাড়া পাবে না। তুমি খবর পাঠাবে সোনাটা কাছাকাছি কোনো গ্রহে কিংবা নক্ষত্রে পৌঁছে দিতে। মিডাসের সবচেয়ে কাছে কোন্ গ্রহ বা নক্ষত্র আছে?"

লোকটি বলল, "একদিকে সেন্ট মেরি নক্ষত্র আর একদিকে পীর জালাল নক্ষত্র। দুটোই সমান দূরত্বে প্রায়!"

রা অস্ফুট গলায় বলল, "সেন্ট মেরি!"

ইউনুস রা-র দিকে ফিরে কঠোরভাবে বলল, "ফের যদি আমাদের কথার মাঝখানে একটাও কথা বলো, তা হলে তোমায় ঘুম-ঘরে আটকে রাখতে বাধ্য হব!"

শুক্রগ্রহের লোকটি রা-কে বলল, "ওহে মেয়ে, বুঝতেই তো পারছ, আর তোমাদের মুক্তি পাবার আশা নেই! তুমি যদি আমার কথা শোনো, তা হলে তোমার চোখ দুটো তুলে নেব না! মিডাসে আমাদের দলে মেয়ের সংখ্যা খুব কম। তোমার

...ন একটি সুন্দরী মেয়েকে আমরা দলে নিতে রাজি আছি। তুমি সেখানে রানীর মতন থাকবে!"

রা জ্বলন্ত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাদের মিডাসে নামবার আগেই আমার মৃত্যু হবে। তোমরা কিছুতেই জীবন্ত অবস্থায় আমার চোখ নিতে পারবে না। আমি ইচ্ছে করলেই যখন খুশি মরে যেতে পারি!"

ইউনুস বলল, "যাক, ও-সব বাজে কথা বলে লাভ নেই ওর সঙ্গে। এসো, আমরা কাজের কথা সেরে নিই! সেন্ট মেরি নক্ষত্রটা মহাকাশ-ম্যাপে আছে। সুতরাং সেখান থেকে রাস্তা চিনে ফিরতে আমার কোনো অসুবিধে হবে না। তোমাদের মিডাসের ওপরে গিয়ে প্রথমে আমরা ওদের তিনজনকে নীচে নামিয়ে দেব। তুমি খবর পাঠাবে সোনাটা সেন্ট মেরিতে পৌঁছে দিতে। সেখানে সোনা রেখে তোমাদের লোকজন চলে গেলে তারপর আমি সেখানে টাচ-ডাউন করব। সোনা নিয়ে সেখানে আমি রেখে আসব তোমাকে। তারপর যথাসময়ে তোমাদের রকেট আবার তোমায় নিয়ে যাবে। এই ব্যবস্থা ঠিক আছে?"

লোকটি বলল, "তুমি দেখছি, এখনো আমাকে অবিশ্বাস করছ!"

"বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। দু' দিক থেকেই বন্দোবস্তটা পাকা করে রাখা দরকার। নিজের চোখ দুটোর ওপর আমার মায়া আছে। সব কিছু হয়ে যাবার পর হঠাৎ তোমাদের দলের অন্য লোকেরা যদি আমার চোখ দুটোও লোভ করে নিয়ে নিতে চায়, তখন আমি বাধা দেব কী করে? সেইজন্যই তোমাদের মিডাসে আমি নামতেই চাই না। আমার রকেটের তিনজন লোককে প্রথমেই আমি নামিয়ে দিচ্ছি। সুতরাং আমাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই তোমাদের!"

"তোমার বন্ধু ঐ ঝিলমের চেয়ে যে তোমার বুদ্ধি অনেক বেশি, তা আমি স্বীকার করতে বাধ্য!"

"তা হলে এই যুক্তিই ঠিক রইল? এসো, হাতে হাত মেলাও!"

দু'জনে দু'জনের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল আন্তরিকভাবে। রকেটের মুখ ঘুরে গেল। শুক্রগ্রহের লোকটি নির্দেশ দিয়ে দিল গতিপথের। তারপর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, "অনেকদিন বাদে আমি মিডাসে নিজের লোকজনদের মুখ দেখব! ধন্যবাদ তোমাকে। এবার আমি একটু কফি খেতে চাই!"

ইউনুস বাঁ হাত তুলে দেখিয়ে দিয়ে বলল, "ঐ তো পাশেই রান্নাঘর। তুমি নিজেই বানিয়ে নিয়ে এসো না!"

লোকটি উঠে গিয়ে রান্নাঘরে ঢোকার আগে একবার ঘুমঘরে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে এল ঘুমন্ত নী আর ঝিলমকে। তারপর রান্নাঘরে এসে কফি বানাতে-বানাতে গপ্-গপ্ করে খেয়ে নিল কয়েকটা বিস্কুট আর স্যান্ডউইচ। ধরা পড়ার পর থেকে সে কিছুই খায়নি।

লোকটি চলে যেতেই রা ফিসফিস করে বলল, "ইউনুস, ইউনুস, এখনো ভেবে দ্যাখো, তুমি কী সর্বনাশ করছ। সোনার লোভে মানুষের কত সর্বনাশ হয়েছে, তুমি জানো না? তুমি যদি দেশে ফিরে গিয়ে আরামে থাকতে চাও, এই রকেটটা বিক্রি করে সব টাকা আমরা তোমাকে দিয়ে দিতে পারি!"

ইউনুস উঠে গিয়ে রা-র মুখের সামনে দাঁড়িয়ে হিংস্র গলায় বলল, "ফের একটা কথা বললে লাথি মেরে আমি তোমার মুখ ভেঙে দেব! তোমাকে দেখলেই রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে! রকেট বিক্রি করে সেই টাকা আমাকে দেবে, আমি কি ভিখিরি? এই রকেটটা তো এখন আমারই!"

দু' গেলাস কফি হাতে নিয়ে শুক্রগ্রহের লোকটি সেই অবস্থায় ইউনুসকে দেখে বলল, "আহা-হা, মিঃ ইউনুস, ওকে মেরো না! ওর চোখে যদি হঠাৎ আঘাত লাগে, আমাদের খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। ওরকম ভাল চোখ সহজে পাওয়া যায় না।"

রা শান্ত গলায় বলল, "থেমে গেলে কেন ইউনুস? তুমি আমায় লাথি মারো। একজন বন্ধুর কাছ থেকে কতটা নির্দয় ব্যবহার পাওয়া সম্ভব, আমি তা দেখতে চাই!"

শুক্রগ্রহের লোকটি হাত ধরে টেনে নিয়ে এল ইউনুসকে। সে তখনও রাগে ফুঁসছে। কন্ট্রোল বোর্ডের সামনে দুটি আসনে দু'জনে বসল আবার। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কফি পান করল।

সেন্ট মেরি নক্ষত্রটি মহাকাশ-মানচিত্রে আছে। খুব সাধারণ একটি ছোট আকারের নক্ষত্র, জল নেই, হাওয়া নেই, মূল্যবান কিছুই নেই, তাই ওটাতে কেউ নামে না। তার কাছেই যে মৃত নক্ষত্রটির নাম শুক্রগ্রহের এই অভিযাত্রী দল রেখেছে মিডাস, সেটাকে এতদিন কেউ লক্ষ করেনি, কারণ সেটা ধোঁয়ায় ঢাকা। একটা মৃত নক্ষত্র নিয়ে কেই বা মাথা ঘামায়, এমন লক্ষ লক্ষ কোটি-কোটি নক্ষত্র ছড়িয়ে আছে মহাকাশে। তা ছাড়া দূর থেকে ওটাকে দেখায় একটা ধূমকেতুর খসে-পড়া লেজের মতন।

সেখানে পৌঁছে সেই ধোঁয়ার আস্তরণে ঢোকার পর আবছা ভাবে দেখা গেল নক্ষত্রটিকে।

শুক্রগ্রহের লোকটি দারুণ উত্তেজনার সঙ্গে বলল, "এই যে এসে গেছি! ভাবতেই পারিনি, আর কোনোদিন এখানে বেঁচে ফিরে আসতে পারব!"

ইউনুস বলল, "দাঁড়াও, আগে ভাল করে দেখে নিই!"

একটা জুম টেলিস্কোপে চোখ লাগাতেই দৃশ্যটা অনেক কাছে চলে এল! তারপরই সে বলে উঠল, "আশ্চর্য! আশ্চর্য! এরকম কখনো জীবনে দেখিনি!"

একটা নীল রঙের হ্রদের পাশে দুটি টিবির মতন গোল পাহাড়। সোনার রং ঠিকরে বেরুচ্ছে সেই পাহাড় দুটি থেকে। নীল হ্রদটির পাশে পাশে অনেকগুলো তাঁবু। সোনার পাহাড় দুটির চূড়া থেকে উঠে আসছে পিচকিরির রঙের মতন নীল আলো। ঠিক যেন স্বপ্নের মতন এক অপরূপ ছবি।

শুক্রগ্রহের লোকটি বলল, "এবার বুঝলে, কেন এই জায়গাটার কথা আমরা গোপন রাখতে চাই?"

টেলিস্কোপ থেকে চোখ তুলে এনে ইউনুস বলল, "এবার কাজ শুরু করতে হবে।"

সঙ্গে-সঙ্গে দরজার কাছ থেকে আর-একজন বলল, "হ্যাঁ, এবার কাজ শুরু করতে হবে!"

শুক্রগ্রহের লোকটি আর ইউনুস মুখ ফিরিয়ে দেখল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ঝিলম। তার হাতে একটি ছোট্ট রিভলবারের মতন অস্ত্র।

॥ ১০ ॥

ইউনুসও তক্ষুনি পকেট থেকে তার ছোট্ট রিভলভারটা বার করে শুক্রগ্রহের লোকটির বুকে ঠেকিয়ে বলল, "হাত তুলে দাঁড়াও! কোনো রকম এদিক-ওদিক করলেই তোমায় গুঁড়িয়ে দেব! আমাদের এই অস্ত্র দিয়ে গুলি বেরোয় না। কোনো শব্দ হয় না, কিন্তু চোখের নিমেষে তোমায় ধুলো করে দিতে পারি!"

শুক্রগ্রহের লোকটি এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছে না! এত কাছে এসে এরকম পরাজয়! সে প্রায় তোতলাতে-তোতলাতে বলল, "তু...তুমি...আ...আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে?"

ইউনুস হেসে উঠে বলল, "ডাকাতের সঙ্গে আবার বিশ্বাসঘাতকতা কী? তুমি না বলেছিলে, তোমাদের এই জায়গাটার কথা আমরা কোনোদিন জানতে পারব না?"

রা-ও এত অবাক হয়ে গেছে যে, সে-ও কোনো কথা বলতে পারছে না।

ঝিলম এসে রা-র বন্ধন খুলে দিল। রা উঠে দাঁড়িয়ে ঝিলমের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাগলের মতন তাকে কিল মারতে মারতে বলল, "তোমরা দু'জনে আগে থেকে সব ঠিক করে রেখেছিলে, আমাকে বলোনি কেন? কেন? কেন?"

ঝিলম হাসতে-হাসতে বলল, "ওরে বাবা, লাগছে, লাগছে! এখনও অনেক কাজ বাকি আছে রা! তোমাকে আগে বলিনি, তা হলে তুমি এমন নিখুঁত অভিনয় করতে পারতে না।"

ইউনুস বলল, "ওরকম ভাবে কাঁদতে প্যরতে, রা? তোমার কান্না দেখেই লোকটা আরও বিশ্বাস করেছিল আমার কথা! তোমার চুলের মুঠি ধরেছি, চড় মেরেছি, লাথি মারার জন্য পা তুলেছি, এগুলো সব আমার পাওনা রইল। তুমি একসময় শোধ দিয়ে দিও!"

শুক্রগ্রহের লোকটি ইউনুসের হাতে ওরকম ভয়ঙ্কর অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। ঝিলম বিদ্যুতের মতন লাফিয়ে এসে নিজের হাতের অস্ত্রটা দিয়ে খুব জোরে মারল লোকটির মাথায়। সেই এক আঘাতেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল লোকটি। তার হাত পা বেঁধে ফেলা হল, তাতেও নিশ্চিন্ত না হয়ে ঝিলম তার হাতে একটা ইঞ্জেকশান ফুঁড়ে দিল. এর পর বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে আর কিছুতেই ওর ঘুম ভাঙবে না।

ইউনুসের পিঠে হাত দিয়ে ঝিলম বলল, "তুই অদ্ভুতভাবে লোকটাকে বিশ্বাস করিয়েছিস, এত সহজে যে কাজ হবে আমি ভাবতেই পারিনি! আমি এত ভাল অভিনয় করতে পারতুম না।"

জিউস এবার বলে উঠল, "রকেটটা আরও উঁচুতে তুলে নাও ঝিলম, ওরা মিজাইল ছুঁড়তে পারে।"

রা বলল, "জিউস তা হলে ঠান্ডা হয়নি! জিউসও জানত?"

ঝিলম বলল, "জিউসও ভাল অভিনয় করেছে। ধন্যবাদ জিউস!"

রা প্রচন্ড অভিমানের সঙ্গে বলল, "সবাই জানত, শুধু আমায় জানাওনি। নী-ও জানে নিশ্চয়ই।"

ঝিলম বলল, "না। নী-কে সত্যিই ঘুমের বড়ি খাইয়ে দিয়েছি। আমি নিজে খাইনি।"

ইউনুস বলল, "কাজ শুরু করে দাও, রা। এই জায়গাটার সঠিক অবস্থান হিসেব করো। ও-কাজটা তুমি ভাল পারো আমাদের চেয়ে!"

ঝিলম বলল, "ব্যস্ততার কিছু নেই। সেজন্য অনেক সময় আছে তোমাদের হাতে।"

ইউনুস বলল, "তার মানে? আমাদের এক্ষুনি ফিরে যাওয়া উচিত না? রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঝটিকা-বাহিনীকে খবর দিলে তারা এসে যা করার করবে!"

ঝিলম বলল, "হ্যাঁ, ঝটিকা-বাহিনীকে খবর দিতে হবে ঠিকই। কিন্তু তার আগে আমার আর একটা কাজ বাকি আছে।"

"তোর কাজ? তার মানে?"

"রাষ্ট্রসঙ্ঘের জন্য যা দরকার, তা আমরা করেছি ঠিকই। এবার হো-সানের কাজ বাকি আছে। তিনি যে প্রতিরোধ শক্তি আবিষ্কার করেছেন, সেটা পরীক্ষা করার এটাই তো সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা?"

"তুই কী বলতে চাইছিস, ঝিলম?"

"আমি এখন একা ঐ মিডাসের লোকজনের মধ্যে নামব। যদি ওরা আমায় মেরে ফেলতে না পারে, তাহলেই বোঝা যাবে হো-সানের আবিষ্কার সার্থক!"

"তুই ওখানে একা নামবি?"

ঝিলম বলল, "তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন? হো-সান কখনো ব্যর্থ হতে পারেন না। আমি তাঁর কাছ থেকে ফর্মুলা নিয়ে এসেছি। সেটা আমি পরীক্ষা করে দেখবই। যদি আমি ব্যর্থ হই তোমরা তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে হো-সানকে খবর দেবে। তিনি বেঁচে থাকতে-থাকতেই যাতে আবার গবেষণা করে জিনিসটা একেবারে পারফেক্ট করে তুলতে পারেন।"

রা কাতর গলায় বলল, "এখন এই পরীক্ষাটা থাক্, ঝিলম। এই ক'দিনে আমাদের ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। আর সহ্য করতে পারছি না। এবার ফিরে চলো, পরে অন্য কোনো সময় পরীক্ষা করো তুমি!"

রা-র পিঠে হাত রেখে ঝিলম খুব নরম গলায় বলল, "তুমি তো আমায় জানো রা! আমি একবার কোনো কিছু ঠিক করলে আর ফিরি না। আমার মতন গোঁয়ার-গোবিন্দকে বাধা দিয়ে কোনো লাভ আছে?"

ইউনুস বলল, "আমরা তোকে কিছুতেই এভাবে একা যেতে দিতে পারি না, ঝিলম! ওরা সাঙ্ঘাতিক লোক!"

রা বলল, "হো-সান নিজেই বলেছেন, তাঁর এই প্রতিরোধ-শক্তি পুরোপুরি সফল কিনা তিনি নিজেও জানেন না।"

ঝিলম বলল, "হো-সানের গবেষণার তুলনায় আমার জীবনের দাম অতি সামান্য। শুধু-শুধু আর দেরি করে লাভ নেই। যেতে আমাকে হবেই। আমি এখান থেকে নামব প্যারাসুটে। তোমাদের সঙ্গে আমার রেডিও যোগাযোগ থাকবে। ঠিক এক ঘণ্টা পর তোমরা একটা মনো-ইউনিট নামিয়ে দেবে নীচে। সেটাতে যদি আমি না ফিরি কিংবা তোমাদের সঙ্গে যদি আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে আর দেরি না করে তক্ষুনি ফিরে যাবে তোমরা। প্রথমে খবর দেবে ঝটিকা-বাহিনীকে। তারপর হো-সানের কাছে খবর পাঠাবে।"

প্যারাসুট পরে নিয়ে ঝিলম ঝাঁপ দেবার জন্য তৈরি হল। কোনোরকম বিশেষ পোশাক-পরিচ্ছদ নেই তার। সাদা প্যান্ট, সাদা জুতো আর একটা সাদা ঝোলা কোট, তাতে অনেকগুলি পকেট।

ঝিলম রকেটের দরজা খুলতেই ইউনুস তার হাত ছুঁয়ে বলল, "সাবধান, ঝিলম।"

ঝিলম বলল, "চিন্তা করিস না, ইউনুস।"

রা আর কোনো কথা বলতে পারছে না। ঝিলম তার একটা হাত কোলে নিয়ে মুঠোয় চেপে ধরে বললে, "রা, মনে নেই, বিয়ের সময় আমরা বলেছিলুম, আমরা দু'জনেই কেউ কখনো মৃত্যুকে ভয় পাব না!"

তারপর ইউনুসের দিকে ফিরে বলল, "ইউনুস, তোর ওপর সব ভার রইল। আমি যদি আর না ফিরি...তুই ওদের দেখিস।"

সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ঝিলম।

এখানকার আবহমন্ডলে বাতাস নেই। ঝিলম অক্সিজেন বড়ি খেয়ে নিয়েছে আগেই। এই প্যারাসুটও যে-কোনো পরিবেশে নামার মতন করে তৈরি। তার ঐ কোটের প্রত্যেকটি বোতামই একটা করে যন্ত্র, তার মধ্যে একটি বোতাম রকেটের সঙ্গে রেডিও-যোগাযোগ রাখছে।

দুলতে-দুলতে নামতে লাগল ঝিলম। এই প্যারাসুটে ইচ্ছে মতন দিক বদলানো যায়। নীচের নীল জলের হ্রদে গিয়ে যাতে না পড়ে, সেই ভাবে ঝিলম সরে-সরে যেতে লাগল। সোনার পাহাড় দুটোর দিকে সে তাকাতে পারছে না, চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে সোনা মিশে থাকে পাথরের মধ্যে, অনেক কষ্ট করে বার করতে হয়। এরকম খাঁটি সোনার পাহাড় যে কোথাও থাকা সম্ভব, সে আগে কল্পনাও করেনি। এখানকার খুঁটিনাটি সবকিছু হো-সান বলে দিয়েছেন তাকে। ইউনুস ঐ শুক্রগ্রহের লোকটিকে মনের কথা সবটা জানাতে পারেনি। হো-সান এক নজর দেখা মাত্র সব জেনে গিয়েছিলেন। সব কথা ঝিলম একটা কাগজে লিখে ইউনুসকে দিয়েছিল।

মিডাস উপনিবেশের বহু লোক তাঁবু ছেড়ে চলে এসেছে

দিকে। তারাও অবাক হয়ে চেয়ে আছে ওপরের দিকে। একা এক-জন মানুষ প্যারাসুটে নামছে, তারা এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না যেন!

ঝিলম এসে নামল হ্রদটার পাশে। প্যারাসুটের বাঁধন থেকে বেরিয়ে এসে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। একদল লোক একটু দূরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। তাদের সকলেরই হলদে চুল। তাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক লোক অন্ধ।

ঝিলম হাত তুলে বলল, "আমি পৃথিবীর মানুষের দূত হয়ে এসেছি আপনাদের কাছে। আপনারা মহাকাশে অশান্তির সৃষ্টি করেছেন। জীবন্ত মানুষের চোখ ও কানের পর্দা তুলে আনছেন ডাকাতি করে। আপনারা আত্মসমর্পণ করুন। আপনাদের পৃথিবীতে নিয়ে গিয়ে চোখ ও কানের চিকিৎসা করে সুস্থ করে দেব।"

ভিড়ের মধ্য থেকে এগিয়ে এল একজন মধ্যবয়স্ক লোক। এর এক চোখ কানা, সারা মুখে পোড়া-পোড়া দাগ। শুক্রগ্রহের সাদা ভালুকের চামড়ায় তৈরি পোশাক পরা। লোকটি বলল, "পৃথিবীর লোক! হ্যাঁ, কালো চুল দেখছি। একটা শিকার তা হলে নিজে থেকে এসে ধরা দিয়েছে। একে বাঁধো!"

ঝিলম বলল, "আমাকে বন্দী করার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই।"

তিনজন লোক মোটা শিকল হাতে নিয়ে এগিয়ে এল ঝিলমের দিকে। শিকলটা সোনার তৈরি।

ঝিলম হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে বলল, "আমায় ধরুন না হলে!"

সঙ্গে-সঙ্গে ঝিলমের গা থেকে একরকম জ্যোতি বেরুতে লাগল। সেই জ্যোতি ঘিরে রইল তার সারা দেহ। আগেকার দিনের গল্পের বইয়ের ছবিতে যে-রকম দেবতাদের আঁকা হত, ঝিলমকে দেখাতে লাগল সেই দেবতাদের মতন।

শিকল ঝনঝনিয়ে তিনটি লোক ঝিলমের তিন হাত দূরে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর তারা এগুতে পারছে না। লোক-গুলো যেন চুম্বকে আটকে গেছে।

ঝিলম হাহা করে হেসে উঠে বলল, "বললাম না, আমাকে আপনারা বন্দী করতে পারবেন না! ওহে শুক্রগ্রহের মানুষ, সোনার লোভে আপনাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? আমি কি আপনাদের সঙ্গে কোনো অন্যায় কথা বলেছি যে আমায় বাঁধতে চাইছেন?"

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন মোটামতন লোক বেরিয়ে এসে হুংকার দিয়ে বলল, "এই লোকটা আমাদের ম্যাজিক দেখাচ্ছে। ওসব ম্যাজিক আমি গ্রাহ্য করি না। ওকে আমি ঝাঁঝরা করে দিচ্ছি।"

লোকটার হাতে একটা সাব মেশিনগান। র‍্যাট-ট্যাট-ট্যাট করে লোকটা এক ঝাঁক গুলি চালিয়ে দিল। অত গুলিতে অন্তত পঞ্চাশজন মানুষের মরে যাবার কথা, কিন্তু ঝিলমের শরীরে একটাও লাগল না। ঠিক যেন কোনো অদৃশ্য নিরেট দেয়ালে বাধা পেয়ে গুলিগুলো উঠে গেল শূন্যে।

ঝিলম আবার হেসে বলল, "ঐ সব পুরনো অস্ত্র দিয়েই যদি আমায় মারা যেত, তা হলে আর আমি এখানে এসেছি কেন?"

এবার কিছু লোক হাতের কাছে যা পেল তাই ছুঁড়ে মারতে লাগল, সবই ফিরে যেতে লাগল তাদের দিকে।

একচোখ-কানা লোকটি বলল, "দাঁড়াও! ওকে কী করে শেষ করতে হয় আমি দেখাচ্ছি। ডিনামাইট স্টিক নিয়ে এসো!"

ঝিলম হাসিমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সোনার পাহাড় কাটবার জন্য ওদের কাছে অনেক ডিনামাইট স্টিক মজুত আছে। ঝিলমকে ঘিরে গোল করে সাজাল অনেক-গুলো ডিনামাইট স্টিক। তারপর সবাই অনেক দূরে সরে যাবার

পর একজন চার্জ করল ডিনামাইট। প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ হল একটা, সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হল পাহাড়ে-পাহাড়ে। ঝিলম লেলিহান আগুনের মধ্যে ঢাকা পড়ে গেল।

বেশ খানিক্ষণ বাদে আগুন সরে গেলে দেখা গেল ঝিলম একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়। তার সাদা পোশাকে একটা কালো দাগ পর্যন্ত লাগেনি।

ঝিলম বলল, "আর কোনো অস্ত্র নেই?"

সবাই পালিয়ে যাচ্ছে দেখে ঝিলম এগিয়ে এল তাদের দিকে। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, "একটা জিনিস লক্ষ করেননি যে, আমি কোনো প্রতি-আক্রমণ করার চেষ্টা করছি না! আমার কোনো অস্ত্র দিয়ে আপনাদের মেরে ফেলছি না! আমি কোনো অন্যায় কথা বলছি না বলেই আপনারা আমাকে মারতে পারছেন না। এখনো বলুন, আপনারা আত্মসমর্পণ করতে চান কি না!"

কেউ একটা কথাও উচ্চারণ করল না।

ঝিলম বলল, "এখন আমি আপনাদের রকেট স্টেশনের দিকে যাচ্ছি। যদি সাধ্য থাকে তো আমাকে আটকান।"

হ্রদটা ঘুরে একটা স্বর্ণ-পাহাড়ের দিকে এগোতে লাগল ঝিলম। ওপর থেকে নামবার সময়ই সে দেখে নিয়েছে, এখানে কোথায় কী আছে। মিডাস নক্ষত্রটি খুবই ছোট। এই হ্রদ ও সোনার পাহাড় দুটি ছাড়া বাকি সবটাই এবড়ো-খেবড়ো ভূমি। প্রায় তিনশো তাঁবু খাটিয়ে শুক্রগ্রহের অভিযাত্রীরা এখানে উপনিবেশ গড়েছে। বোঝাই যায়, এখানে তারা বেশিদিন আসেনি। আসার পরই একটি দুর্ঘটনায় অর্ধেকের বেশি লোক অন্ধ হয়ে গেছে আর কানে শোনার ক্ষমতা হারিয়েছে। সুতরাং ভাল করে এখানকার কাজই শুরু হয়নি বলা যায়।

ওপর থেকে নামবার সময়ই সে দেখে নিয়েছে, এখানে কোথায় কী আছে। মিডাস নক্ষত্রটি খুবই ছোট। এই হ্রদ ও সোনার পাহাড় দুটি ছাড়া বাকি সবটাই এবড়ো-খেবড়ো ভূমি। প্রায় তিনশো তাঁবু খাটিয়ে শুক্রগ্রহের অভিযাত্রীরা এখানে উপনিবেশ গড়েছে। বোঝাই যায়, এখানে তারা বেশিদিন আসেনি। আসার পরই একটি দুর্ঘটনায় অর্ধেকের বেশি লোক অন্ধ হয়ে গেছে আর কানে শোনার ক্ষমতা হারিয়েছে। সুতরাং ভাল করে এখানকার কাজই শুরু হয়নি বলা যায়।

একটি সোনার পাহাড়ের পিছনে রকেট স্টেশন। ঝিলম সেদিকে যাবার আগেই একদল লোক একটা মোটা পাইপ এনে আগুনের হল্কা ছুঁড়তে লাগল তার দিকে। সোনার পাহাড় দুটির ওপরের গর্ত দিয়ে অনবরত নীল রঙের আগুন বেরিয়ে আসছে। ওরা ঐ পাইপটার একটা মুখ জুড়ে দিয়েছে পাহাড়ের সেই আগুনের শিখার সঙ্গে।

সেই আগুনের ধাক্কায় ঝিলম পুড়ে গেল না বটে, কিন্তু ছিটকে গিয়ে পড়ল হ্রদের জলে। আর পড়া মাত্র ডুবে গেল সে। শুক্রগ্রহের লোকগুলি এবার আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

ঝিলম চলে গেল একেবারে তলায়। এই হ্রদে কোনো প্রাণী নেই। এখানে এই জল কবে থেকে জমে আছে কে জানে! ঝিলম দেখল হ্রদের তলাটাতেও রয়েছে কোনো চকচকে ধাতু। এই ছোট্ট মৃত নক্ষত্রটি সত্যিই খুব দামি।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে হুস্ করে ঝিলম ভেসে উঠল অনেক দূরে। হ্রদের অন্য পারে উঠে সে বলল, "ঐ আগুনটা আর একবার নিয়ে আসুন, আমার জামা-কাপড় শুকোনো দরকার!"

অবশ্য ঝিলমের পোশাক একটুও ভেজেনি। কোনো একটা অদৃশ্য তেজ তার চারপাশ ঘিরে রেখেছে। সে এগিয়ে যেতে লাগল সেই সোনার পাহাড়টির দিকে, যার পেছনে রকেট স্টেশন। শুক্রগ্রহের লোকগুলো ভয়ে-ভয়ে দূর থেকে অনুসরণ করতে লাগল তাকে।

সেই সোনার পাহাড়টির গায়ে একটি প্রকাণ্ড বড় খাদ। এখানেই প্রথম বিস্ফোরণ ঘটেছিল। তখন ওরা জানত না এখানে বিষাক্ত গ্যাস আছে। বিস্ফোরণ যে অত প্রচণ্ড হবে, সেইজন্যই তা ওরা বুঝতে পারেনি।

খাদের ধারে পাথরের টুকরো মতন সোনার টুকরো পড়ে আছে। একটা টুকরো তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল ঝিলম। দেখে চব্বিশ ক্যারাট সোনাই মনে হয় বটে। টুকরোটা আবার ছুঁড়ে ফেলে দিল ঝিলম। তারপর পাহাড়টা ঘুরে রকেট-স্টেশনে এসে দাঁড়াল।

মাত্র বারোটি রকেট সেখানে সাজানো রয়েছে পরপর। এত কম রকেট কেন? মহাকাশে ডাকাতি করে ওরা চোখ আর কানের পর্দা নিয়ে আসছে। কিন্তু পৃথিবীর সেইসব মানুষদের রকেটগুলো এরা আনে না। খুব সম্ভবত এখানে রকেট চালাবার মতন লোক বেশির ভাগই অসুস্থ। অথবা পৃথিবীর মানুষদের উন্নততর রকেট এরা চালাতে জানে না।

শুক্রগ্রহের লোকগুলো এখনো হাল ছাড়েনি। যে-চৌকো বাক্সের মতন অস্ত্রে ওরা যে-কোনো জিনিস টেনে নিতে পারে, সে-রকম অনেকগুলি বাক্স এনে ঝিলমকে আছড়ে ফেলার চেষ্টা করল। কোনোটাতেই কাজ হল না।

ঝিলম বলল, ''এবার দেখুন আমি কী করি!''

কোটের পকেট থেকে তার ছোট্ট অস্ত্রটি বার করে সে তাক করল রকেটগুলোর দিকে। একটার-পর-একটা রকেট ঝুরঝুরে গুঁড়ো হয়ে যেতে লাগল।

শুক্রগ্রহের লোকেরা হায়-হায় করতে লাগল। ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল তাদের মধ্যেকার কয়েকটি মেয়ে।

সবকটা রকেট শেষ করে দিয়ে ঝিলম বলল, ''রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঝটিকা-বাহিনী আপনাদের কী শাস্তি দেবে বা কী ব্যবস্থা নেবে তা আমি জানি না। তার আগে, আপনাদের আমি এই শাস্তি দিলাম। আপনারা আত্মসমর্পণ করেননি, সেইজন্য আপনাদের আমি দিয়ে গেলাম এখানে নির্বাসন। যতদিন ঝটিকা-বাহিনী না আসে, ততদিনের জন্যে আপনাদের আর এখান থেকে পালাবার উপায় রইল না। ততদিন আপনারা এই সোনা নিয়ে থাকুন। ততদিনের মতন খাবার-দাবার আপনাদের আছে আশা করি? নইলে আপনাদের থাকতে হবে এই সোনা খেয়ে। ঝটিকা-বাহিনী যদি আর কোনোদিনই না আসে তা হলে এই হ্রদের তীরে আপনাদের চাষবাস শুরু করবেন, আবার ফিরে যাবেন আদিম জীবনে!''

একদল লোক এবার চেঁচিয়ে উঠল, ''আমরা ক্ষমা চাইছি। আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যান। দয়া করে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যান।''

ঝিলম বলল, ''আর উপায় নেই!''

কট্ কট্ কট্ কট্ করে একটা শব্দ হল ওপরের আকাশে। একটা মনো-ইউনিট নেমে আসছে। ঠিক সময়ে ওটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে রা আর ইউনুস। স্বয়ংক্রিয় মনো-ইউনিট এসে থামল ঝিলমের কাছেই। আপনা-আপনি একটা দরজা খুলে গেল।

ঝিলম সেদিকে পা বাড়াতেই একজন মহিলা ছুটে এল তার দিকে। মহিলাটির কোলে একটি এক বছরের শিশু।

মহিলাটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, ''হে দেবদূত—''

ঝিলম বলল, ''আমি দেবদূত নই, আমি পৃথিবীর মানুষ।''

মহিলাটি বলল, ''আমার স্বামী এখানে বিস্ফোরণে মারা গেছেন। আমার এই ছেলেটির জন্ম হয়েছে এখানেই। এই নক্ষত্রে আর একটিও শিশু নেই। আমার যা হয় হোক, আপনি একে বাঁচান। আপনি দয়া করে একে নিয়ে যান পৃথিবীতে, যাতে ও মানুষের মতন মানুষ হয়ে বাঁচতে পারে।''

ঝিলম বলল, ''শিশুদের কোনো অপরাধ হয় না। আমার এই গাড়িটাতে একজনের বেশি জায়গা নেই। কোনোক্রমে এই শিশুটিকে নেওয়া যেতে পারে। ওকে মাটিতে নামিয়ে রাখুন। সোনা কী জিনিস তা ও এখনো চেনে না। আশা করি ও নির্লোভ মানুষ হয়ে বাঁচতে পারবে।''

মহিলাটি শিশুটিকে মাটিতে নামিয়ে রেখে এক পা এক পা করে পিছু হটে গেল। ঝিলম শিশুটিকে বুকে তুলে নিল। সে ঘুমিয়ে আছে, সে কিছুই টের পাচ্ছে না।

ছেলেটিকে নিয়ে ঝিলম মনো-ইউনিটে উঠতেই দরজা বন্ধ হল সঙ্গে-সঙ্গে। তারপর সেটা আবার উড়ে গেল মহাকাশে। একটু পরেই অসীম নীলের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

পিছনের জানলা

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

আচমকা বদলির হুকুম এল কলকাতা থেকে গয়া। মোটঘাট বেঁধে গয়া পৌঁছে দেখি প্লাটফর্মে সুখলাল দাঁড়িয়ে।

সুখলাল অফিসের কাজে অনেকবার কলকাতা এসেছে। এক অফিসেরই লোক। সেই সূত্রেই আলাপ।

সুখলাল বলল, "আপনার জন্য একটা বাসার যোগাড় করে রেখেছি। শহরের একটু বাইরে। বেশ নিরিবিলি জায়গা। আপনার ভালই লাগবে।"

শহর থেকে মাইল দুয়েক দূর। বাড়িটা এক নজরে ভালই লাগল। একতলা। চারদিকে বাগান, মানে একসময় বাগান ছিল, এখন আগাছার জন্য কিছুটা জঙ্গলের চেহারা নিয়েছে। দুখানা ঘর, একটা বসবার, আর একটা শোবার, এছাড়া ছোট একটা রান্নাঘর।

সুখলাল বাড়ির মধ্যে ঢুকে দুদিকের জানলাগুলো খুলে দিল। শীতের অল্প ঠাণ্ডা বাতাস ভালই লাগল। চারপাশে বাড়ি না থাকায় অনেকদূর পর্যন্ত দেখা গেল। উঁচু-নিচু মাঠ। গাছ-পালা ঝোপঝাড়।

রান্নাঘরে ঢুকে সুখলাল বলল, "পিছনের এ জানলা খুলবেন না।"

জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?"

"এদিক দিয়ে তো আর বাতাস আসবে না। কী দরকার খুলে।"

আর কিছু বললাম না। জিনিসপত্র গোছাতে আরম্ভ করলাম।

সুখলালই দুলারির মাকে যোগাড় করে দিল। রান্নাবান্না থেকে ঝাঁট দেওয়া, কাপড় কাচা, সব কিছুই করবে।

দিন তিনেক পর দুলারির মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "সুখলালবাবু রান্নাঘরের জানলাটা খুলতে বারণ করেছে কেন বলো তো?"

দুলারির মা অনেকক্ষণ ধরে আমার দিকে চেয়ে রইল। দৃষ্টিতে কৌতূহল আর বিস্ময়। তারপর বলল, "ও জানলাটা নাই খুললেন বাবু।"

"কিন্তু কেন?"

"রান্নাঘরের জানলা তো। খাবার জিনিস থাকে। যদি ধুলো-বালি পড়ে, কিংবা কুকুর বেড়াল ঢুকে পড়ে।"

অবশ্য জানলার কোনো গরাদ নেই। ছোটখাট জন্তু-জানোয়ার ঢুকে পড়া মোটেই বিচিত্র নয়। তবু আমার মনে হল, আসল কথাটা দুলারির মা যেন চেপে যাচ্ছে।

কী হতে পারে রান্নাঘরের জানলাটা খুললে।

ছুটির দিন। অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোলাম। ঘুম থেকে উঠে দেখলাম, দুলারির মা টেবিলের ওপর চায়ের কাপ রেখে গেছে। রোজকার মতন।

চা খাওয়া হতেই দুলারির মা এসে দাঁড়াল। "বাবু, দরজাটা বন্ধ করে দিন। বাজারে যাব।"

দরজাটা বন্ধ করে মুখ-হাত ধুয়ে রান্নাঘরের চৌকাঠে গিয়ে দাঁড়ালাম। আর দাঁড়াবার সঙ্গে-সঙ্গেই চোখ গিয়ে পড়ল পিছনের জানলার ওপর।

বাইরে এলোমেলো শীতের হাওয়া বইছে। বন্ধ জানলাটা সেই হাওয়ায় থরথর করে কাঁপছে। ঠিক মনে হল যেন বলছে, আমাকে খুলে দাও। আমাকে খুলে দাও।

খুলতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়লাম। সব্বাই যখন বারণ করছে, তখন কী দরকার জানলাটা খুলে।

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেমানুষি ভয়টা দূর করে সজোরে জানলায় ধাক্কা দিলাম। জানলা খুলল না। অনেকদিন না খোলার জন্য জানলাটা এঁটে গিয়েছে।

আমারও জেদ চেপে গেল। প্রাণপণ শক্তিতে জানলাটা খোলবার চেষ্টা করতে লাগলাম। বার চারেক ধাক্কা দেবার পরে জানলাটা খুব শব্দ করে খুলে গেল। খোলার সঙ্গেই আশ্চর্য এক কাণ্ড। বাইরে থেকে গরম একটা হাওয়ার ঝলক ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল।

কেন, এমন হল? অন্য জানলা দিয়ে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া

আসছে। শীতের স্বাভাবিক হাওয়া।

তবে কি অনেকদিন বন্ধ থাকার জন্য হাওয়াটা এরকম গরম? ঠিক বুঝতে পারলাম না।

এগিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কী আছে বাইরে, যার জন্য এ জানলাটা খোলা নিষেধ ছিল।

এদিক ওদিক দেখতে দেখতেই নজরে পড়ল।

কাছেই একটা ঝাঁকড়া গাছের নীচে একটা কবর। কবরের সাইজ দেখে মনে হল ছোট বয়সের কেউ শুয়ে আছে। কবরের মাথার কাছে একটা সাদা রঙের ক্রস।

এই ব্যাপার! এরই জন্য এত কাণ্ড। সুখলাল আর দুলারির মা কি মনে করেছিল, কবর দেখে আমি ভয় পাব, তাই জানলাটা খুলতে মানা করেছিল?

তা ছাড়া আর কী হতে পারে। আর তো কিছু চোখে পড়ছে না।

সদর দরজায় খুট-খাট শব্দ হতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দিলাম। দুলারির মা বাজার নিয়ে ফিরেছে।

আমাকে দেখে বলল, "বাবু বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন? অনেকক্ষণ ধরে দরজা ঠেলছি।"

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে শোবার ঘরে চলে এলাম।

একটু পরেই রান্নাঘর থেকে দুলারির মায়ের চিৎকার কানে এল। "এ কী, এ জানলা কে খুলল। সর্বনাশ, কে এমন কাজ করলে?"

রান্নাঘরে গিয়েই অবাক হয়ে গেলাম। বাজারের জিনিস চারদিকে ছড়ানো। দুলারির মায়ের এলোমেলো বেশ। খোলা চুল। লাল দুটি চোখ। চিৎকার করে চলেছে। "কী হল? সরো, আমি জানলা বন্ধ করে দিচ্ছি।"

এগিয়ে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করার চেষ্টা করলাম। প্রথমে এক হাত দিয়ে, তারপর দু হাতে, কিন্তু কিছুতেই বন্ধ করতে পারলাম না।

মনে হল জানলার পাল্লাটা যেন কাঠের নয়, নিরেট পাথরের তৈরি। একচুল সরানো গেল না। "ও, আর বন্ধ হবে না। আমি ঠিক জানি বাবু, সর্বনাশ একটা হবে।"

দুলারির মা হাঁউমাঁউ করে চেঁচিয়ে উঠল।

সজোরে তাকে একটা ধমক দিলাম, "আঃ, কী হচ্ছে কী? চুপ করো। জানলার কব্জাটা শক্ত হয়ে গিয়েছে। কাল মিস্ত্রি ডেকে ঠিক করে নিলেই হবে।"

সেই রাত্রেই।

আমার খাবার ঢাকা দিয়ে দুলারির মা রোজকার মতন চলে গিয়েছে। আমি বাইরের ঘরে বসে অফিসের কাজ করছিলাম, ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই উঠে পড়লাম। খাবার সময় হয়েছে।

রান্নাঘরের কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

খাবারের ঢাকা খোলা। থালার কাছে বছর ছয়েকের এক শিশু। ধবধবে গায়ের রঙ। এক মাথা কোঁকড়ানো সোনালি চুল। নীল দুটি চোখ। শিশুটি দাঁড়িয়ে নেই। অনবরত থালাটার চারপাশে ঘুরছে।

হাত দিয়ে চোখদুটো রগড়ে নিলাম। ভুল দেখছি না তো? ঘরের মধ্যে শিশু আসবে কী করে?

না, সেই এক দৃশ্য। শিশুটি ঘুরপাক খাচ্ছে। খুব ধীর পায়ে।

একটু পরেই শিশুটি থেমে গেল। মুখ তুলে দেখল আমার দিকে। নীল দুটি চোখের অদ্ভুত দৃষ্টি। আমার সারা দেহ যেন হিমের স্পর্শে অসাড় হয়ে গেল।

শিশুটি পিছন ফিরে রান্নাঘরের দিকে চলতে শুরু করল।

আমি সাহস করে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। কিছুটা গিয়ে আর যেতে পারলাম না। ঠিক জানলার কাছে যেতেই অসহ্য গরম হাওয়া। বাড়িতে আগুন লাগলে যেমন গরম লাগে, অবিকল সেই রকম।

একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলি। তারপর শিশুটিকে দেখতে পেলাম না।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সন্দেহ হল। সবই হয়তো আমার মনের ভ্রম। ছোট একটা কবর দেখে শিশুটিকে কল্পনা করেছি, সেই কল্পনার রূপই দেখেছি চোখের সামনে।

খেতে বসতে গিয়েই থেমে গেলাম।

থালার চারপাশ ঘিরে ছোট ছোট পায়ের চিহ্ন। দুপুরের দিকে বৃষ্টি হয়েছিল। বাইরে মাঠে জল জমেছে। শিশুটি বোধ হয় সেই জল পার হয়ে এসেছে।

খাবারে হাত দিতে পারলাম না। উঠে এলাম। তাহলে এ তো আমার মনের ভুল নয়। শিশুটি সত্যিই এসেছিল।

এই প্রথম মনে হল, পিছনের জানলাটা না খুললেই ভাল করতাম। কাল মিস্ত্রি ডেকে জানলাটা আগে বন্ধ করতে হবে।

অনেকক্ষণ শোবার ঘরে পায়চারি করলাম। মাথাটা গরম হয়ে রয়েছে। এখন শুলেও ঘুম আসবে না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার রান্নাঘরে গেলাম। ভাল করে দেখলাম কোথাও কোনো পায়ের চিহ্ন নেই। অবশ্য জলের দাগ এতক্ষণ থাকবার কথা নয়।

তবু খাবার কোনো ইচ্ছা করল না। এক সময়ে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। সহজে ঘুম এল না। এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগলাম।

রাত তখন কটা জানি না। গলায় খুব ঠাণ্ডা একটা স্পর্শ পেয়ে চমকে জেগে উঠলাম।

জানলার কাচের মধ্য দিয়ে চাঁদের আলো এসে বিছানার ওপর পড়েছে। কোথাও কোনো অস্পষ্টতা নেই।

সেই শিশুটি এক হাত দিয়ে আমার গলা আঁকড়ে ধরে পাশে শুয়ে রয়েছে।

সবলে শিশুকে সরিয়ে দিতে চাইলাম, পারলাম না। এইটুকু শিশুর কী অসীম শক্তি। হঠাৎ দেখতে-দেখতে আশ্চর্য রূপান্তর ঘটল।

শিশুর দেহের মাংস আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। পরিবর্তে একটা কঙ্কাল বিছানায় শুয়ে। একভাবে হাত দিয়ে আমার গলা বেষ্টন করে রয়েছে। হাড়ের দৃঢ় বাঁধন।

চিৎকার করে উঠলাম। প্রাণপণ শক্তিতে হাতটা সরাবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না।

আবার সেই আগুনের হলকা। মনে হল, সেই তাপে আমার মাংসও বুঝি গলে-গলে পড়বে। আমিও কঙ্কালে পরিণত হব।

তারপর কী হল আমার জানা নেই। অনেকগুলো লোকের ক্ষীণ কণ্ঠ, তাদের পায়ের আওয়াজ।

জ্ঞান হতে দেখলাম, বিছানায় শুয়ে আছি।

পাশে সুখলাল, আর একজন ডাক্তার। একটু দূরে দুলারির মা দাঁড়িয়ে।

শুনলাম, পরের দিন সকালে বাড়ির মধ্যে না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে দুলারির মা আমায় পিছনের মাঠে পেয়েছে। সেই ছোট কবরটার পাশে শুয়ে ছিলাম।

কখন, কী ভাবে সেখানে গিয়েছি, জানি না।

ছবি সুনীল শীল

চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে

প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
(পি, কে)

ভেবেছিলাম, ফেডারেশন কাপের উত্তেজনার পরে দার্জিলিং-য়ের মনোরম আবহাওয়ায় বিশ্রাম নিয়ে আসব কিছুদিন। বেড়াতে যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা। এমন সময় এশীয় চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গী হবার ডাক এল। চ্যাম্পিয়নদের সবাই বিদেশী। তবে খেলোয়াড়ের তো কোনো জাত নেই, দেশও নেই, তাই এশীয় চ্যাম্পিয়ন চীনা টেবিল-টেনিস খেলোয়াড়দের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মিশে যেতে পেরেছিলাম।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত এশীয় টেবল টেনিসে প্রায় সব ট্রফি তুড়ি মেরে জিতে নেবার পরে চীনা খেলোয়াড়রা দিল্লি দেখে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রেলওয়ে বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসে, চীনা খেলোয়াড়দের বিনা খরচে ট্রেনে দিল্লি নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।। টেবিল-টেনিস ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়া দুটি প্রদর্শনী ম্যাচের বিনিময়ে ও'দের দিল্লিতে থাকা-খাওয়া এবং বেড়ানোর খরচ বহন করতে রাজি হল। রেলওয়ে স্পোর্টস কন্ট্রোল-বোর্ডের শ্রীফাল্গুনী মতিলাল চীনা খেলোয়াড়দের দিল্লি নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দিলেন আমার ওপর।

তোমরা যারা আমার স্বভাব জান, তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, নতুন ধরনের এই দায়িত্ব আমার মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ জাগিয়েছিল। ১৯ মে রাত্রে, দিল্লিগামী কালকা মেলের সঙ্গে একটা এয়ার-কন্ডিশন্ড কোচ জুড়ে দেওয়া হল। ট্রেনে মালপত্র তোলার সময় সাহায্য করতে গেলাম। কিন্তু খেলোয়াড়দের কেউই আমাকে হাত লাগাতে দিলেন না। মনে হল, চীনা খেলোয়াড়রা একটু দূরত্ব বজায় রাখতে চান। রেলওয়ের ডেপুটি কমার্শিয়াল সুপারিনটেনডেন্টের নেতৃত্বে রেলকর্মীরা অবশ্য উষ্ণ বিদায়-অভিনন্দন জানিয়ে দূরত্ব কমানোর চেষ্টা করলেন।

ট্রেন ছাড়ার পরে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের হাতে চন্দনকাঠের ছোট-ছোট উপহার তুলে দিলাম। দলনেতা লি ফুয়াং বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপে তিনবার রানার্স আপ হয়েছেন। চন্দনকাঠের একটা কলম নাকের কাছে ধরে জানতে চাইলেন, কীভাবে কাঠকে সুগন্ধি করা হয়েছে। বললাম, কিছুই করতে হয়নি, চন্দনকাঠের গন্ধ এইরকমই।

খাওয়া-দাওয়ার বেশ ভাল ব্যবস্থা হয়েছিল। রেলের দুজন সেরা রাঁধুনি এবং কয়েকজন পাকা পরিবেশনকারী সঙ্গে গিয়েছিল। চাইনিজ এবং ইয়োরোপীয়ান—দুরকম খাবারেরই ব্যবস্থা ছিল। যত্ন করে খাওয়ালাম, ও'রা খেলেনও খুব তৃপ্তির সঙ্গে। কিন্তু দূরত্বটা ঘুচল বলে মনে হল না।

বরফ গলতে শুরু করল রাত এগারোটা নাগাদ। চীনা খেলোয়াড়রা লক্ষ করলেন, আমি এবং দু-একজন সহকর্মী জায়গার অভাবে কোনোরকমে বসে রয়েছি। শোয়া বা ঘুমোনোর কোনো প্রশ্নই নেই। এশীয় চ্যাম্পিয়ন শি জিহাও এবং নাম খেলোয়াড় গুয়োউয়েহুয়া নিজেদের মালপত্র সরিয়ে আমাদের শোবার জায়গা করে দিলেন।

ভোরবেলা মোগলসরাইয়ে নানারকম টাটকা ফল কেনা হল। ততক্ষণে চীনা খেলোয়াড়রা খোলস ছেড়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসেছেন। দোভাষী ভদ্রমহিলা বেশ আলাপী। একে-একে সকলের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। আমার পরিচয় জানার পর এশীয় মহিলা-চ্যাম্পিয়ন কাই বাওজিয়ং হাসতে-হাসতে বললেন, "আপনি আমাকে ফুটবল শেখান, তাহলে আমি আপনাকে টেবিল-টেনিস শেখাব!"

আগের রাত্রে মনে হয়েছিল, চীনা ছাড়া আর-কোনো ভাষা বোধহয় খেলোয়াড়দের কেউ জানেন না। কিন্তু সকালে জানলাম, চার-পাঁচজন বেশ ভালই ইংরেজি জানেন। লি ফুয়াং-এর মুখে একটা খবর শুনে মাথা প্রায় ঘুরে গেল। তিনি বললেন, এশীয় মানের প্রায় একহাজার টেবিল-টেনিস খেলোয়াড় চীনে আছেন। অর্থাৎ, যাঁরা এসেছেন তাঁদের প্রায় সমকক্ষ বেশ কিছু খেলোয়াড় এদেশে আসার সুযোগ পাননি।

চীনা দলের অনেকেরই খ্যাতি পৃথিবীজোড়া, কিন্তু কেউই কণামাত্র অহঙ্কারী নন। হাসিখুশি গুয়োউয়েহুয়াকে দেখে কে বুঝবে যে, তিনি পৃথিবীর দু'নম্বর টেবিল-টেনিস খেলোয়াড়!

জনাচারেক খেলোয়াড় এক কোণে তাস খেলছিলেন। কিন্তু খেলাটা যে কী, কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। অদ্ভুত খেলা। আরও অদ্ভুত খেলার পরের ব্যাপারটা। যে হারছে, তার থুতনি ধরে অন্য সকলে নেড়ে দিচ্ছেন। মনে হল, এটাই বোধহয় বিরাট শাস্তি এবং অপমানের ব্যাপার! উঠতি তারকা জাই সাইকে এইভাবে একবার শি জিহাওয়ের থুতনি নেড়ে দিতেই এশীয় চাম্পিয়নের সে কী রাগ! মিনিট-পাঁচেক পরেই সেই রাগটা জাই সাইকে'র মুখে উঠল। এবার তিনি হেরেছেন।

দিল্লি পৌঁছে গেলাম। প্রথম দিনের খেলার পরে দিল্লির ব্যবস্থাপকরা চীনা দলের দায়িত্ব নিলেন। আমার কাজ শেষ। বিদায় নিতে যাবার সময় ভাবলাম, চীনা খেলোয়াড়রা নিশ্চয়ই মাপমতো সৌজন্য দেখাবেন। কিন্তু যা ঘটল তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। গোটা চীনা দলটাই হোটেলের লাউঞ্জে এসে আমার হাত ধরে বিদায়-অভিনন্দন জানালেন। কিছু চমৎকার উপহারও তুলে দেওয়া হল আমার হাতে। যে-মেয়ের টপ স্পিনের জোর পুরুষদেরও চমকে দেয়, সেই টং লিং বললেন, "দু বছর পরে দিল্লি এশিয়ান গেমসে আমরা আসব, তখন নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে দেখা হবে।"

দল-নেতা লি ফুয়াং দলের খেলোয়াড়দের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দিল্লি এশিয়ানে আমাদের লোকাল ম্যানেজার হবেন পি কে ব্যানার্জি!"

কলকাতা ফেরার সময় আবার মনে হচ্ছিল, খেলোয়াড়ের সত্যিই কোনও জাত বা দেশ নেই। না হলে, সুদূর চীনের বিশ্বজয়ী খেলোয়াড়রা কেন বাংলার পি কে ব্যানার্জিকে অত অল্প সময়ের মধ্যে অত কাছে টেনে নেবেন!

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

মোহনবাগান যেন ঠিক করেছে যে, কিছুতেই অন্য দলকে কোনো কিছু নিতে দেবে না। কয়েক বছর আগে ইস্টবেঙ্গলও এমন করত। পপনের ভয় আছে, আবার শুরু করতে পারে। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল খেলার পর কিন্তু মজা করা যায়নি কারণ যেই খেলা শেষ হল আর পপন সবে ডিকচা লিচা বলে নাচতে শুরু করেছে, অমনি ব্যাম্বি ভ্যাঁ করে কেঁদে দিল। এখন ব্যাম্বি ক্লাস সিক্সে পড়ে, কথা শুনলে মনে হয় কথা নয়, বোল-চাল। সে এরকম কেঁদে ফেলতে পপন নাচ বন্ধ করে দিল। ফুলদা ঘোষণা করেছে যে, এত বছর ধরে হারা ওর পোষাবে না, তাই ও ফুটবল বলে খেলার কথাটা ভুলে যাবে। আসলে এখন ভারতের ক্রিকেট উঠতি, তাই নিয়ে ও মশগুল থাকবে। খেলার পরে পপন গিয়ে যদি হামলা করে, তার ফল ভাল হবে না। ব্যাম্বির কান্না দেখে পপনের মনটা খারাপ হয়ে গেল। কই, আমরাও তো বছরের পর বছর হেরেছি, তাই বলে ভ্যাঁ করে কেঁদেছি? কারুর চোখের জল দেখলেই পপনের মনে হয়, সূর্যটা মরে গেছে, দেশে মহামারী, মোটের ওপর যাচ্ছেতাই কান্ড। ব্যাম্বিকে মা থামাবার চেষ্টা করছে। সুন্দরমামা খেলা দেখতে এসেছিলেন, বাবা তাকে বোঝাচ্ছেন, ''বুঝেছেন সুনদা, আপনি খুব পয়মন্ত, মোহনবাগানের খেলা থাকলে দয়া করে আসবেন।'' সুন্দরমামা ঘোর ইস্টবেঙ্গল। বলছেন, ''হ, আমি জানি আমি তোমার পয়া, কিন্তু তুমি তো আমার অপয়া, তবু যে জাইন্যা-শুইন্যা ক্যান আইলাম এইখানে! পুটুর ওইখানেই যাওন উচিত ছিল।'' ব্যাম্বির তবু কান্না থামছে না। টুম্পা এ-বছর ঘোর মোহনবাগান, সে ব্যাম্বির কান্না দেখে দুয়ো দিচ্ছে। কিন্তু বাবা বেশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, আর বলছেন, আর তোরা ওকে খেপাস না।

পপন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। ফুলদা যাই বলুক, এই মুহূর্তে ফুলদাকে একবার দেখা উচিত। কত আর চেঁচাবে? ফুলদার বাড়ি গিয়ে দেখল ফুলদা বাড়ি নেই। নীচে চিনে একমনে একটা-একটা করে চকোলেট বোমা ফাটিয়ে যাচ্ছিল। ফুলদা যে আসলে পপনের কাকা, চিনে তা খুব ভাল জানে। ও নারকোল-দড়িতে ফুঁ দিতে দিতে বলল, ''তোমার ফুলদাকে পাওয়া যাচ্ছে না, বাবাকে বলো লালবাজারে খবর দিতে।'' বলে পরপর দুটো চকোলেট-বোমা ফাটাল, এই সময় বাবলা এসে বলল, ''ভানুদাকে পাবি না, ও আর বেঁটেদা বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে ক্যানিংয়ের ট্রেনে উঠল দেখলাম।'' বেঁটেদা কিন্তু মোটেও বেঁটে নয়, ছ ফুটের ওপর লম্বা, তবে ফুলদাদের বন্ধুদের ধারাই ওই। সব উল্টোপাল্টা।

পপন ব্যাম্বি আর ফুলদার এবম্বিধ ব্যবহারে যারপরনাই বিরক্ত হয়ে একটা মিনিবাস ধরে একদম বড়পিপির বাড়ি হাজির হল। বড়পিপি শত্রুপক্ষের মধ্যে বাস করে। পিসেমশায় নোয়াখালি, ছোট্ট বুড়িটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়, টুকটুকিও তাই, বাপন ইস্টবেঙ্গল, তাছাড়া ওদের বাড়ি যারা মাংস দিতে আসে, ডিম বিক্রি করতে আসে, তারাও সবাই ইস্টবেঙ্গল। বড়পিসের অন্য দলের কারুর কাছ থেকে কিছু কেনে না। পিপির ধারণা খুব সুন্দরী বলেই পিসেমশায় পিপিকে বিয়ে করেছিল, নইলে ও বাড়ির অন্য সব বউ ইস্টবেঙ্গল। পপন গিয়ে হাজির হলেই পিপি ছুটে আসবে পাঁচ মাইল দূর থেকে, শোনা যায় এমন হাসি হাসতে-হাসতে পপনকে জড়িয়ে ধরবে, এই ভেবেছিল পপন।

গিয়ে দেখল মিঠুকাকা সেখানে বসে। বাপন, বুড়ি টুকটুকি, বড়পিপি, পাশের বাড়ির তিনটে ছেলে (পপন ওদের চেনে, লাল হলুদ পতাকা নিয়ে মাঠে যায়), সবাই মিঠুকাকাকে ঘিরে বসে আছে। পপনকে দেখে বাপন বলল, ''পাঁচ গোল ভুলিস্ না।'' পপন একটা মুখের মতন জবাব দিতে যাচ্ছিল মিঠুকাকা একগাল হেসে বলল, ''বিজয় মার্চেণ্ট আজ কেমন খেলল বল? আমি বরাবরই জানি, ছোকরার ড্রিবলিং খুব ভাল।''

মিঠুকাকার ধারাই ওই। খেলা সম্বন্ধে কোনো খবর রাখে না, বাড়িতে বাপি রিলে শোনে, তার দু-চারটে কথা মনে করে রেখে দিয়ে যা-তা বলে। খেলার দিকে আলোচনাটা চলে যায়, শ্রীমান বাপনের ইচ্ছাটা একদম তা নয়। সুতরাং ও তাড়াতাড়ি বলল, ''ছোটমামা, তুমি থামলে কেন? এইরকম জায়গায় এসে থেমে যায় কেউ?''

গল্পের মাঝখানে এসে পড়েছে। গল্পটা যে কী বোঝা গেল না, তবে মনে হল সেই যেবার মিঠুকাকা চম্বলের ডাকাতদের পাল্লায় পড়েছিল সেই গল্প হচ্ছে। গল্পটা পপনের শোনা। মিঠুকাকা সেবার দিল্লিতে গুল্লু চোপরার বাড়িতে যখন খেতে গিয়েছিল, তখন নাকি একদল লোক (যারা নিশ্চয় চম্বলের ডাকাত) নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল, এবং কটমট করে তাকিয়ে ছিল মিঠুকাকার দিকে। মিঠুকাকার পুরুষ্টু গোঁফ দেখে ওকে মাধো সিং ভেবেছিল। কাকিমা বলেন, যত্তো সব গাঁজাখুরি গল্প।

পপন গল্পটা জানে, তাছাড়া কাকিমা গল্প শোনার পর কী কী সব অপমানজনক কথা বলেছিল তাও জানে। তাই মিঠুকাকা ঠিক গল্পটা চালিয়ে যেতে ভরসা পাচ্ছিল না। এমন সময় বড় পিসে উৎফুল্ল হয়ে ঢুকলেন। মিঠুকাকাকে দেখে বললেন, "জানো হাচ্চু, শালতোড়ার কাছে আমার যে জঙ্গুলে জমিটা ছিল, তার ভাল খদ্দের পেয়ে গেছি, ওখানে ওরা একটা কারখানা বসাবে।''

শুনেই মিঠুকাকা বলল, ''চন্দন, খবরদার, ও কাজও কোরো না। জঙ্গুলে জমিতে জঙ্গল থাকতে দাও। নাহলে হুংকরি দেবী আমায় এবার মেরেই ফেলবে। আমি নাকে কানে খত দিয়ে হুংকরি দেবীর কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি জঙ্গল কাটা আমার দ্বারা যতটা সম্ভব হবে, ততটা বন্ধ করব।''

হুংকরি দেবী নাম শুনেই সবাই হেসে উঠল। বড়পিপি বলল, ''ছোড়দা, আবার তুই বানাতে শুরু করলি?''

মিঠুকাকা কিন্তু একদমই দমল না। বলল, ''তোদের তো হুংকরি দেবীর খাঁড়ার তলায় দাঁড়াতে হয়নি, তোরা জানবি কী করে!''

পপন বলল, "মিঠুকাকা, তোমার সঙ্গে হুংকরি দেবীর কোথায় দেখা হয়েছিল?''

মিঠুকাকা বলল, ''কেন, পানপোষ থেকে পাঁচ কিলো-মিটার দূরে। আমি তো আবার যাচ্ছি। তোদের বিশ্বাস না হয় দেখিয়ে দিই চল।'' তারপর বলল, ''তোদের বড্ড প্রশ্ন করা স্বভাব। আগে প্রথম থেকে শোন্।''

পপন বলল, ''মিঠুকাকার গল্প শুরু হবার আগে ভাল মুড়মুড়ে চিঁড়েভাজা, ওপরে ডিমের গুঁড়ো ছড়ানো, সাপ্লাই করো বড়পিপি।''

মিঠুকাকু একটু দুঃখু-দুঃখু হাসি হেসে বলল, ''তোরা খুব মজার ব্যাপার মনে করছিস্। চিঁড়েভাজা খেতে খেতে মজিয়ে শুনবি, তারপর বাবা-মা যখন বলবে, ছোড়দা কী বানাতেই পারে, তখন তাল দিবি। অথচ সেদিন রুরকেলা-সম্বলপুর রাস্তায় আমি প্রায় মারা যেতে বসেছিলাম। সকালবেলা যখন রুরকেলা থেকে বেরিয়েছিলাম, রুরকেলা থেকে সুন্দরগড় হয়ে রাস্তাটা খুব সুন্দর লেগেছিল। ব্রাহ্মী নদী পেরিয়ে রাজগাংপুর আসবার আগেই একটা জিনিস লক্ষ করেছিলাম। জঙ্গলের পাতার রঙ কীরকম ছাই রঙের। আমি সিংভূমের জঙ্গলে বহু নাম-না-জানা গাছ আর ফুল দেখেছি। একটা কী সুন্দর ফুল চাইবাসায় দেখেছি। নাম সীতাহার। সত্যি ফুলগুলি দিয়ে বিনি সুতোর মালা দারুণ গাঁথা যায়। ওখানকার মেয়েরা পরে বেড়ায়, দেখতে খুব ভাল লাগে। আমিও তাই ভেবেছিলাম এটা বোধহয় নতুন কোনো গাছ। তারপর ভাল করে লক্ষ করে দেখলাম, তা নয়, শাল কেঁদ মহুয়া পলাশ সব গাছেরই রঙ ছাই। তারপর দেখলাম যে, কুঁড়ে ঘরের ছাইরঙ, কুমড়োলতা কুঁড়ে ঘরের চালে উঠেছে, তাও ছাইরঙ। একজন লোককে দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করলাম, গাছের এই দশা কেন, শুনলাম কাছে একটা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি আছে, তার থেকে চুনা-পাথরের গুঁড়ো বেরিয়ে সব এই দশা করেছে। প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তার দু ধারে এই দৃশ্য দেখতে-দেখতে গেলাম। রাস্তাটা কিন্তু খুব সুন্দর। এখন পেট্রোলের দাম বেশি হওয়ার দরুন রাস্তায় বেশি গাড়ি থাকে না। আমার ছোট্ট ফিয়াট গাড়িটা এগিয়ে যেতে লাগল। সম্বলপুরে দুপুরের মধ্যে পেঁছে গেলাম। ঝাড়সাগুড়ায় দারুণ গাজরের হালুয়া খেয়েছিলাম, সুতরাং কাজকম্ম করতে লেগে গেলাম। আমাকে সম্বলপুরের বন্ধুরা বলেছিল, রাতটা এখানেই থেকে যাও। পতিতপাবন প্রধান দারুণ ভাল লোক। ওর বউ দীপ্তি দারুণ মাংসের বড়া করে, তবু ঠিক করলাম রুরকেলা ফিরবই। আর কোনো কারণ নেই, শুধু দীপাবৌদি। ওদের বাড়ি উঠেছিলাম কিনা। দীপা-বৌদি দারুণ কাঁকড়ার ঝোল রাঁধে। ঝাল-ঝাল। ভাতে মাখলে ভাত লাল হয়ে যায়। টাকরায় দিলে টাকরা জ্বলে যায়। কিন্তু স্বাদ কী! দীপাবৌদি আজ রাতে রান্না করে রাখবে বলেছে।

''কিন্তু তাড়াতাড়ি বেরোব বললেই কি বেরিয়ে পড়া যায়? সম্বলপুরে গিয়ে জ্যোতিবিহারের পদ্মবন না দেখে কি ফিরে আসা যায়? তাই বেরোতে-বেরোতে প্রায় ছটা হয়ে গেল। গাড়ি চালাতে খুব আনন্দ লাগছিল। আমি একটা পাহাড়ি নদীর সামনে গাড়িটা থামিয়ে চাঁদ ওঠা দেখলাম। চাঁদটাকে কলকাতায় যেন এত বড় লাগে না। একদম সোনা দিয়ে তৈরি।

''জমাদার পল্লীতে একটা ছোট উড়োজাহাজ নামার জায়গা আছে। সেই মোড়ের আগে আমার গাড়ির সামনে একটা জীপ এসে গেল। বোধ হল, ওই এয়ারস্ট্রিপের রাস্তা থেকেই বেরিয়েছে। কিন্তু কখন যে বেরিয়েছিল, তা লক্ষ করিনি। আসলে চাঁদিনি রাতে বনজঙ্গল ভারী সুন্দর লাগে। চেনা জায়গাকেও অচেনা মনে হয়। তাই আমি রাস্তা দেখতে-দেখতেই চলেছিলাম। সামনের গাড়িটা কিন্তু অদ্ভুত। আমার সামনে-সামনে চলেছে। আমি গাড়ির স্পীড বাড়ালে ওটারও স্পীড বেড়ে যাচ্ছে। ফলে আমাদের মধ্যে ব্যবধান কখনো বাড়ছে না, আবার কমছেও না। এছাড়া আমার চোখের ভুলের জন্য মনে হচ্ছিল, গাড়িটা কখনো-কখনো যেন মন্দিরের মতো হয়ে যাচ্ছিল। গাড়ি খুব সুন্দর গতিতে চলছিল। আমরা রাজগাংপুর পেরোলাম। সেই গাছ-গুলোকে দেখলাম ভূতের মতো লাগছে। বড়গাঁও পেরিয়ে গেলাম। আমি বীরমিত্র গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। মন্দিরা ড্যামের গেট বাঁ দিকে রয়ে গেল। একটু পরেই বেদব্যাসের আশ্রম। লোকে বিশ্বাস করে, এখানেই ব্যাসদেব বাস করতেন। জায়গাটা খুব

সুন্দর, শঙ্খ, ব্রাহ্মণী আর কোয়েল নদী এসে মিশেছে। পাশের কিলোমিটার পোস্টে দেখলাম পানপোষ পাঁচ কিলোমিটার দূরে। তার মানে প্রায় রুরকেলায় পেঁছে গেছি। পানপোষ থেকে দীপা বৌদির বাড়ি গাড়িতে মাত্র পনেরো মিনিট। তারপরই তোফা গরম-গরম কাঁকড়ার ঝোল।

''হঠাৎ খটকা লাগল 'পানপোষ পাঁচ কিলোমিটার' এটা যেন কিছুক্ষণ আগেও দেখেছিলাম। পরক্ষণেই মনে হল আমার দৃষ্টি-ভ্রম। অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিলাম। এখন আমার গাড়ি ঘণ্টায় সত্তর কি মি ছুটছে। আবার কিলোমিটার পোস্ট আসছে। না, চোখের ভুল নয়, 'পানপোষ পাঁচ কি মি' লেখা আছে তাতে। তখন আমি পাগল হয়ে গেছি। সেই জীপটা তখন সত্যি মন্দিরের মতো দেখাচ্ছে। আমি আশি কিলোমিটারে স্পীড তুলেছি কিন্তু বারবার সেই 'পানপোষ পাঁচ কিলোমিটার' রয়েই যাচ্ছে। আমি গাড়িতে ব্রেক কষলাম। গাড়িটা থামল। সামনের গাড়ি, না না, মন্দিরটাও থামল। মন্দিরের দরজা খুলে এক মহিলা নেমে এলেন। হলদে শাড়ি পরা। হাতে একটা পেল্লায় খাঁড়া। তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরাও নামল। আধা মানুষের মতো দেখতে। কানগুলো কারও গোল, কারও ছুঁচোলো। মহিলা নেমেই একটা হাসির হুঙ্কার দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। কানের মধ্যে শুধু বাজতে লাগল হা হা হা হাসির ধ্বনি।

''সাঙ্গোপাঙ্গরা এসে আমায় টেনে নিয়ে গেল মহিলার কাছে। একজন বলল, 'হুংকরি দেবীকে গড় কর।' আমি সেই মহিলাকে গড় করলাম। হুংকরি দেবী তখন আমায় বললেন, 'আজ তোমার মুন্ডু কেটে আমরা আনন্দ করব। কিন্তু কেন কাটব সেটা আগে তোমায় জানানো দরকার। তুমি জানো আমি কে?'

''আমার গলা তখন শুকিয়ে গেছে। মাথা ভোঁভোঁ করছে। জিবটা উল্টে গলার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। আমি চুপ করে আছি দেখে একটা ছুঁচোলো-কান আমায় ঠাস করে জোরে একটা থাপ্পড় মারল, তারপর বলল, 'উত্তর দে।''

''আমি বললাম, আপনি হুংকরি দেবী?''

''ঠিক বলেছিস। আমি হুংকরি দেবী। আমি গাছ-বন জঙ্গল পাহাড় পর্বতের দেবতা। আজ আমরা মানুষ খুঁজছিলাম। কারণ গয়ায় কাছে প্রেতশিলার পাশে যে ছোট্ট পাহাড়টা ছিল,

সেটা আজ একদম উবে গেল পৃথিবী থেকে। পাথরের টুকরোর খোঁজে তোমরা সেটাকে ধ্বংস করলে। আজ আমিও তোমায় ধ্বংস করব।'

"আমি বললাম,'দেবী, আমি কখনো গয়া যাইনি আমি সামান্য চাকরি-বাকরি করি, পাহাড় ভাঙি না।'

"শুনে দেবী বললেন, 'মানুষ ভাঙে, তুমিও মানুষ, সুতরাং এই খাঁড়ায় তোমায় শেষ হতেই হবে। বেশ, তুমি নাহয় গয়া যাওনি। কিন্তু রাজগাংপুর তো পেরিয়ে এলে, ওখানকার জঙ্গল নষ্ট করছে কে? মানুষ না অন্য কেউ? মানুষকে রাজ-গাংপুরের ওই ধুলো থেকে বাঁচবার জন্য রোজ ২০০ গ্রাম করে গুড় খেতে দেওয়া হয়। আমার জঙ্গলের জন্য কী দাও? জরাইকেলায় রোজ জঙ্গল নষ্ট করছে কারা? এ সব জায়গায় কত জীবজন্তু ছিল, তারা সব কোথায় গেল? তোমরা হরিণ, বাঘ, গন্ডার আর হাতি সব ধ্বংস করতে চলেছ। নিজেদের সর্বনাশ করছ। তোমাদের তেল নেই বলে গাড়ি চলে না, কেরোসিন নেই বলে উনুন ধরে না, অথচ তোমরা খবর রাখো না, শুধু মাটির নীচেই তেল থাকে না, গাছেও থাকে।'

"আমি এত অবাক হয়ে গেলাম যে, ভয় পেতেও ভুলে গেলাম। গাছে তেল মানে পেট্রোল?

"দেবী বললেন,'না পেট্রোল নয়, তবে বিশুদ্ধ ডিজেল। কোপি ইবা গাছের নাম শুনেছ? ব্রাজিলে এই গাছ মানুষ আবিষ্কার করেছে। বহুদিন ধরে পৃথিবীর নানা জায়গায় এই গাছ আছে। সেই গাছ থেকে ডিজেল নিয়ে গাড়ি চলে, বিদ্যুৎ তৈরি হয়। জানো? এই পাহাড়ের বিভিন্ন গাছের মধ্যে কোপি ইবা নেই কে বলল তোমায়? খুঁজে দেখেছ? দিনের পর দিন তোমরা পাহাড় ধ্বংস করছ নদীতে বাঁধ বেঁধে নদীর ধারা বন্ধ করে দিচ্ছ। নদীতে যা-তা জিনিস ফেলে নদীর জল নষ্ট করছ, যাতে মাছ মরে যাচ্ছে। তোমাদের বড় শাস্তি তোলা রয়েছে, কিন্তু তার আগে তোমায় মরতে হবে।'

"এই শুনে সাঙ্গোপাঙ্গরা সবাই ঘুরে-ঘুরে নাচতে লাগল হাততালি দিয়ে। একটা গোল-কানের লোক এসে আমায় একটা পাতার মালা পরিয়ে দিল, আর সবাই আমাকে ঘিরে নাচতে লাগল। আর গান গাইতে লাগল—এবার মানুষ তোমায় ধর —হুবহু রামপ্রসাদী সুরে।

"আমায় বাঁচিয়ে দিল কতকগুলো লরি। তোমরা জানো দূরপাল্লার রাস্তায় লরিগুলো অতি ভয়াবহ জিনিস। দৈত্যের মতো ছোটে। সবসময় ভয় হয় কখন দিল খতম করে। সেদিন ওদের দেবদূত মনে হয়েছিল। যেই ভঁকভঁক করে লরিগুলো এসে গেল, হুংকরি দেবী আর সাঙ্গোপাঙ্গরা অমনি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। যাবার আগে হুংকরি দেবী বলে গেলেন, খুব বেঁচে গেলে এবার, তবে তুমি যদি গাছগাছড়া নষ্ট করো তবে তোমাকে আমি ধরবই। বলে কপালে একটা টোকা দিয়ে গেলেন। সেই থেকে আবার কপালে ছোট আবটা আছে। তোদের আজ বললাম কেন এটা হয়েছে।

"সর্দারজি লরি থেকে নেমে রাস্তায় গাড়ি রাখার জন্য প্রচুর গালিগালাজ করল। আমি ক্ষমা চেয়ে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দিলাম।"

গল্পটা মিঠুকাকার, সুতরাং নিশ্চয় পুরো সত্য নয়। মোহনবাগান তো আর ইস্টবেঙ্গলকে নাকানি-চোবানি বেশি খাওয়াতে পারে না, এবার পেরেছিল। ব্যাম্বি আর মিঠুকাকা মিলে পপনের আনন্দ করাটা মাটি করে দিল।

তবু তারপর থেকে পপন কোথাও গাছ কাটা হচ্ছে দেখলে শিউরে ওঠে।

ছবি রতন সেন

জানি না

অলোক ধর

নারদ মুনির দাড়ি ছিল কি না?
আমি তা জানি না!
জেনে হবেটা কী?

ঝোলা-গোঁফসহ আকবর শাহ
তস্য পিতার প্রিয় খাদ্য কী?
জ্বালিয়ে খেলে তো!

দশরথ রাজা? র‍্যামের ফাদার।
কটা রথ ছিল?
আই ডু নট নো।

ফের মুখ খোলে! দেব দুই চাঁটি।
আকাশটা দেখ্,
কত প্রজাপতি!

ছবি দেবাশিস দেব

রাত-দুপুরে

সরল দে

এই তো ছিল বেড়ালছানা,
কিন্তু কাঁহা? ভাগলবা?
পাগল বলে, মরতে পারি,
হতেও পারি পাগল বা।
অমঙ্গলের গন্ধ পেয়ে
ডাকছে কা-কা কাক রাতে,
উঠছে পাগল পড়ছে পাগল
বেড়ালছানা পাকড়াতে।

আছড়ে পড়ে ঝাঁকড়াগাছের
গোড়ায় বলে, বন্ধু রে,
বলতে পারিস, একলা বাছা
কোথায় আছে, কোন্ দূরে?
বেভুল হয়ে কাবুল গেল
কাবুলে-ছানা মাঝরাতে?
বুকটা ভেঙে যাচ্ছে আমার
করছে ব্যথা পাঁজরাতে।

একটা কথা কইল না গাছ,
রইল খানিক চুপ করে,
নড়ল পাতা পড়ল ঝরে
কান্না-শিশির টুপ করে!

ছবি দেবাশিস দেব

গুগুনোগুম্বারের দেশে

বুদ্ধদেব গুহ

আমরা। পথ। হারিয়েছি।

কথা তিনটি কেটে কেটে, ওজন করে করে, থেমে থেমে, যেন নিজের মনেই বলল ঋজুদা।

আমরা একটা কোপির উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। কোপি হল এক ধরনের পাহাড়। তখন ভর-দুপুর। সামনে দূরদিগন্তে কতগুলো ইয়ালো-ফিভার অ্যাকাসিয়া গাছের জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া আর কোনো বড় গাছ বা পাহাড় বা অন্য কিছুই নেই। একটি বিরাট দলে জেব্রারা চরে বেড়াচ্ছে বাঁ দিকে। ডান দিকে একদল থমসনস গ্যাজেল। হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ভুষুণ্ডা আর টেডি মহম্মদ মাথা নিচু করে ল্যাব্রাডার গান-ডগের মতো মাটি শুঁকে-শুঁকে পথের গন্ধ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে হাজার-হাজার মাইল সাভানা ঘাসের রাজ্যে। নীচে আমাদের ছাইরঙা ল্যাণ্ড-রোভার গাড়িটা ট্রেলারের মধ্যে তাঁবু এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম সমেত স্তব্ধ হয়ে রয়েছে কোপির ছায়ায়।

আমি ঋজুদার মুখের দিকে চাইলাম।

খাকি, গোর্খা টুপিটা খুলে ফেলেছে ঋজুদা। মাথার চুলগুলো হাওয়ায় এলোমেলো হচ্ছে। দাঁতে-ধরা পাইপ থেকে পোড়া তামাকের মিষ্টি গন্ধভরা ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে পেছনে। কপালের রেখাগুলো গভীর হয়ে ফুটে উঠেছে।

 ছবি অলোক ধর
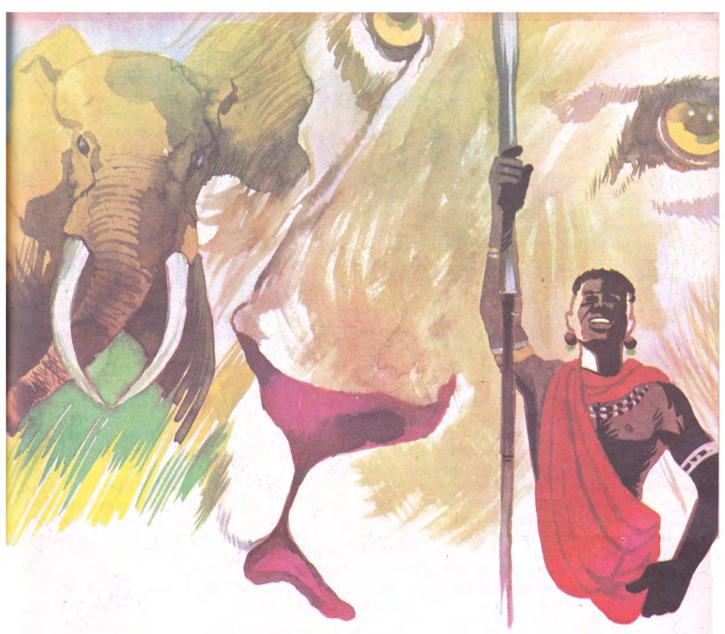
আমি মনে-মনে একটু-আগে-শোনা ঋজুদার কথা ক'টি আবৃত্তি করলাম।

আমরা। পথ। হারিয়েছি।

এবং করেই, ঐ সামান্য তিনটি কথার ভয়াবহতা প্রথমবার বুঝতে পারলাম।

ঋজুদা আফ্রিকাতে আমাকে আনতে চায়নি। মা-বাবারও প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। সব আমারই দোষ। আমিই নাছোড়বান্দা হয়ে ঋজুদার হাতে-পায়ে ধরে এসেছি।

ভুষুণ্ডা আর টেডি আস্তে - আস্তে ফিরে আসছে আবার গাড়ির দিকে। ঋজুদা ওদের ফিরে আসতে দেখে কোপি থেকে নীচে নামতে লাগল। আমিও পিছন-পিছন নামলাম। আমরা যখন ল্যাণ্ড-রোভারের কাছে গিয়ে পৌঁছেছি তখন ওরাও ফিরে এল। ওদের মুখ শুকনো। মুখে ওরা কিছুই বলল না।

ঋজুদা গাড়ির পকেট থেকে ম্যাপটা বের করে, বনেটের উপর বিছিয়ে দিয়ে ঝুঁকে পড়ল তার উপর। পড়েই, আমাকে বলল, "দ্যাখ তো রুদ্র, ট্রেলারের এবং জীপের পেছনে সবসুদ্ধু ক'টা জেরিক্যান আছে আমাদের। আর ইঞ্জিনের সুইচ টিপে দ্যাখ গাড়ির ট্যাঙ্কে আর কত পেট্রল আছে।"

আমি পেট্রলের হিসেব করতে লাগলাম। ঋজুদা ম্যাপ দেখতে লাগল। তেলের অবস্থা দেখে, জেরিক্যান গুনে, হিসেব করে বললাম, "হাজার কিমি যাওয়ার মতো তেল আছে আর।"

ঋজুদা বলল, ''বলিস কী রে? তাহলে তো অনেকই তেল আছে!"

তারপরই, ঐ অবস্থাতেও আমার দিকে ফিরে বলল, "আর তোর তেল? ফুরোয়নি তো এখনও?"

আমি ফ্যাকাসে মুখে স্মার্ট হবার চেষ্টা করে বললাম "মোটেই না। আমার তেল অত সহজে ফুরোয় না।"

আমি বুঝলাম, ঋজুদা আমাকে সাহস দিচ্ছে। আসলে আমি জানি যে, আফ্রিকার এই তেরো হাজার বর্গকিমির সাভানা ঘাস-বনে পথ-হারানো আমাদের পক্ষে মোটে হাজার মাইল যাওয়ার মতো তেল থাকা মোটেই ভরসার কথা নয়।

ঋজুদার গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। ভুষুণ্ডা মাটিতে বসে দাঁত দিয়ে ঘাস কাটছিল। টেডি পেছনের গাড়ির মাডগার্ডে হেলান দিয়ে উদাস চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

ঋজুদা বলল, "লেটস্ গো।"

আমি বললাম, "কোন দিকে?"

ঋজুদা বলল, "ডিউ নর্থ।"

তারপর গাড়ির বাঁ দিকের দরজা খুলে উঠতে-উঠতে বলল, "তুই-ই চালা। আমি একটু পাইপ খেয়ে বুদ্ধির গোড়ায়

ধোঁয়া দিয়ে নিই।"

ভুষুণ্ডা আর টেডি পেছনে বসল।

সুইচ টিপে গীয়ারে দিলাম গাড়ি। তারপর একটু লাফাতে লাফাতে হলুদ সোনালি হাঁটু সমান ঘাসের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল আমাদের ল্যান্ড-রোভার।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি ঋজুদাকে একটি কাজের ভার দিয়েছিলেন। সেরেঙ্গেটির ঘাসবন ও গোরোংগোরো আগ্নেয়গিরির উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে যেসব চোরা-শিকারিরা আছে তাদের সম্বন্ধে একটি পেপার সাবমিট করতে হবে ঋজুদাকে এই অভিযানের সব খরচ জুগিয়েছেন সোসাইটি। পূর্ব আফ্রিকার তানজানিয়ান সরকার ঋজুদাকে সবরকম স্বাধীনতা দিয়েছেন। নিজেদের প্রয়োজনে এবং প্রাণরক্ষার জন্যে আমরা যে-কোনো জানোয়ার শিকার করতে পারব। চোরা-শিকারিদের মোকাবিলা করতে গিয়ে যদি আমাদের প্রাণসংশয় হয় তবে আমরা তাদের উপর গুলিও চালাতে পারি। তার জন্যে কাউকে কোনো কৈফিয়ত দিতে হবে না।

কিন্তু এর মধ্যে কথা একটাই। সমুদ্রে যেমন একা নৌকো, এই ঘাসের সমুদ্রেও তেমনই একা আমরা, একেবারেই একা।

বোম্বে থেকে প্লেনে ডার-এস-সালামে এসেছিলাম, সেশেলস্ আইল্যান্ডস্ হয়ে। তারপর ডার-এস-সালাম থেকে কিলিম্যানজারো এয়ারপোর্টে। মাউন্ট কিলিম্যানজারোর কাছের সেই এয়ারপোর্ট থেকে ছোট্ট প্লেনে করে এসে পৌঁছেছিলাম সেরেনারাতে। সেখানেই আমাদের জন্যে এই ল্যান্ড-রোভার, মালপত্র এবং ভুষুণ্ডা ও টেডি অপেক্ষা করছিল। তিনমাস আগে আরুশাতে এসে ঋজুদা ভুষুণ্ডা ও টেডিকে ইন্টারভ্যু করে মালপত্রের লিস্ট বানিয়ে ওখানে দিয়ে এসেছিল। ওরা দুজনই ল্যান্ড-রোভারটা চালিয়ে নিয়ে এসেছে আরুশা থেকে লেক মনিয়ারা এবং গোরোংগোরো হয়ে, সেরোনারাতে।

মোটে দশদিন বয়স হয়েছে আমাদের এই অভিযানের। গোলমালটা ভুষুণ্ডাই করেছে। ওরই ভুল নির্দেশে গত কদিনে আমরা ক্রমাগত আড়াই হাজার মাইল গাড়ি চালিয়েছি। এখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা একটি বৃত্তেই ঘুরে বেড়িয়েছি। চোরা-শিকারিদের সঙ্গে একবারও মোলাকাত হয়নি, কিন্তু একটি হাতির দল আমাদের খুবই বিপদে ফেলেছিল। যা পেট্রল ছিল তাতে আমাদের গোরোংগোরোতে পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল সহজেই—অভিযানের প্রথম পর্ব শেষ করে। ওখানে পেট্রল স্টেশান আছে। যে-পথ ধরে ট্যুরিস্টরা যান, স্বাভাবিক কারণেই সেই পথে আমরা যাইনি। কারণ চোরা-শিকারিরা ঐ পথের ধারেকাছেও থাকে না; বা আসে না। ট্যুরিস্টরা যে-পথে যান সেও সেই রকমই! ধু-ধু, হাজার হাজার মাইল ঘাসবনে একটি সরু ছাইরঙা ফিতের মতো পথ চলে গেছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে। আমরা তাতেও না গিয়ে ঘাসবনের মধ্যে দিয়ে ম্যাপ দেখে এবং ভুষুণ্ডা ও টেডির সাহায্যে গাড়ি চালাচ্ছি।

ভুষুণ্ডা চিরদিন এই সাভানা রাজ্যেই শিকারিদের কুলির কাজ করেছে। পায়ে হেঁটে, মাসের পর মাস এই ঘাসবনে কাটিয়েছে প্রতি বছর। এইসব অঞ্চল নিজের হাতের রেখার মতোই জানা ওর। অথচ আশ্চর্য! ভুষুণ্ডাই এ-রকম ভুল করল!

কম্পাসের কাঁটাতে চোখ রেখে স্টীয়ারিং সোজা করে শক্ত হাতে ধরে অ্যাকসিলারেটরে সমান চাপ রেখে চালাচ্ছি আমি। তিরিশ মাইলের বেশি গতি নেই। বেশি জোরে চালানোতে বিপদ আছে। হঠাৎ ওয়ার্ট-হগদের গর্তে পড়ে গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এই ওয়ার্ট-হগগুলো অদ্ভুত জানোয়ার। অনেকটা আমাদের দেশের শুয়োরের মতো দেখতে। কিন্তু অন্যরকম। ওরা যখন দৌড়োয়, ওদের লেজগুলো তখন উঁচু হয়ে থাকে আর লেজের ডগার কালো চুলগুলো পতাকার মতো ওড়ে। ওরা মাটিতে দাঁত দিয়ে বড়-বড় গর্ত করে এবং তার মধ্যেই থাকে—ঐ গর্তে শেয়াল ও হায়নারাও আস্তানা গাড়ে মাঝে মাঝে। ঘাসের মধ্যে কোথায় যে ও-রকম গর্ত আছে আগে থাকতে বোঝা যায় না—তাই খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে হয়।

কেউ কোনো কথা বলছে না। গাড়ি চলছে, পিছনে ধুলোর হালকা মেঘ উড়িয়ে। এখানের ধুলো আমাদের দেশের ধুলোর মতো মিহি নয়। আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত নানারকম ধাতব পদার্থ মিশে আছে মনে হয় এইসব জায়গার ধুলোয়। ধুলোর রঙও কেমন লালচে-কালচে সিমেন্টের মতো। ভীষণ ভারী। নাকে কানে ঢুকলে জ্বালা করতে থাকে।

গাড়ির দুদিকেই নানারকম জানোয়ার ও পাখি দেখা যাচ্ছে। ডাইনে বাঁয়ে। কত যে জানোয়ার তার হিসেব করতে বসলে হাজার পেরিয়ে লক্ষে পৌঁছনো কঠিন নয়। দলে দলে থমসনস গ্যাজেল, গ্রান্টস গ্যাজেল, টোপী, এলান্ড, জেব্রা, ওয়াইল্ড-বীস্ট। চুপি-চুপি শেয়াল। রাতের বেলায় বুক-হিম-করা-হাসির হায়না। কোথাও বা একলা সেক্রেটারি বার্ড মাথার ঝাঁকড়া পালকের টুপি নাড়িয়ে বিজ্ঞের মতো একা একা হেঁটে বেড়াচ্ছে। কোথাও ম্যারাবু সারস। কোথাও একা বা দোকা উটপাখি বাঁই-বাঁই করে লম্বা-লম্বা ন্যাড়া পায়ে দৌড়ে যাচ্ছে। জিরাফগুলো এমন করে দৌড়য় যে, দেখলে হাসি পায়। মনে হয় ওদের পাগুলো বুঝি হাঁটু থেকে খুলে বেরিয়ে যাবে যখন-তখন।

প্রথম দু-তিন দিন অত-সব জানোয়ার দেখে আমার উত্তেজনার শেষ ছিল না। এখন মনে হচ্ছে যে, যেন চিরদিন আমি আফ্রিকাতেই ছিলাম। জানোয়ার দেখে-দেখে ঘেন্না ধরে গেল। সিংহও দেখেছি পাঁচবার এই ক'দিনে দিনের বেলা। উদলা মাঠে। তারাও একা নয়; সপরিবারে। আমাদের দিকে অবাক চোখে দূর থেকে চেয়ে থেকেছে।

ঋজুদা বলল, "কত কিলোমিটার এলি রে?"

আমি গাড়ির মিটার দেখে বললাম, "সত্তর কিলোমিটার।"

ঋজুদা ঘড়ি দেখে বলল, "দু ঘণ্টায়!" তারপর নিজের মনেই বলল, ''নট ব্যাড।''

এদিকে সূর্য আস্তে-আস্তে পশ্চিমে হেলছে। এখানে গাছগাছালি নেই, তাই ছায়া দেখে বেলা বোঝা যায় না।

দূরদিগন্তে হঠাৎ একটি নীল পাহাড়ের রেখা ফুটে উঠল।

টেডি বিড়বিড় করে বলল, "মারিয়াবো। মারিয়াবো"

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, "পোলে পোলে: পোলে সানা।"

ঋজুদা বলল, "পোলে পোলে কেন? কী হল টেডি?"

সোয়াহিলি ভাষায় 'পোলে পোলের' বাংলা মানে হচ্ছে আস্তে আস্তে।

টেডি বলল, "মাসাইরা থাকে ঐ পাহাড়ের নীচে। ওদিকে যেতে সাবধান। ওয়ান্ডারাবোরাও চলে আসে মাঝে মাঝে।"

ভুষুণ্ডার চোয়াল শক্ত। ও কথা বলছিল না কোনো।

ওদের দুজনের মধ্যে ভুষুণ্ডা অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে, কম কথা বলে; টেডির চেয়ে ভাল ইংরিজিতে বাতচিত্ চালায় আমাদের সঙ্গে। টেডির চেয়ে অনেক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও। টেডির স্বভাবটা ছেলেমানুষের মতো, কিন্তু সে সাড়ে ছ'ফিট লম্বা। ওর হাতের আঙুলগুলো কলার কাঁদির মতো। আর ভুষুণ্ডা বেঁটেখাটো, কার্পেটের মতো ঘন ঠাসবুনুনির কোঁকড়া চুল

মাথায়। পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর জিনের প্যান্টের পকেট থেকে বের করে সিগারেট খায়। টেডি সিগারেট খায় না; নস্যি নেয়। ওর সেই নস্যি আবার মাঝে-মাঝে হাওয়াতে উড়ে এসে আমাদের নাকে আচমকা পড়ে দারুণ হাঁচায়।

পরশু দিন একটা থমসনস গ্যাজেলের বাচ্চাকে শেয়ালের মুখ থেকে বাঁচিয়েছিলাম আমরা। তাকে হ্যাভারস্যাকের মধ্যে রেখেছি। শুধু মুখটা বের করে সে চকচকে চোখে চেয়ে থাকে। হরিণ-ছানাটার নাম রেখেছি আমি কারিব্যু। সোয়াহিলি ভাষার কারিব্যু মানে স্বাগতম্। সেই ছোট্ট হরিণটা বেদম হাঁচতে শুরু করে দিলে হঠাৎ।

ঋজুদা পিছন ফিরে টেডিকে বলল, "টেডি, তোমার নস্যি ওর নাকে গেছে। হাঁচতে - হাঁচতে মরার চেয়ে হায়নার হাতে মরা কারিব্যুর পক্ষে অনেক সুখের ছিল।"

টেডি ঋজুদার কথায় হেসে উঠে বাচ্চাটাকে আদর করে বলল, "নুজরি, নুজরি।"

মানে, ভালই আছে, ভালই আছে; কিছুই হয়নি ওর।

তারপরই বলে উঠল, "কোনো মরাই সুখের নয় বানা। সে হেঁচেই মরো, আর নেচেই মরো। এই যেমন আমাদের এখানের ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে মরা।"

ওর কথা শুনে ঋজুদা হেসে উঠল। আফ্রিকার এই ঘাসের সমুদ্রে পথ হারিয়ে যাওয়ার পরও এত হাসি আসছে কী করে ঋজুদার তা ঋজুদাই জানে। তাছাড়া, এই ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে মরা ব্যাপারটা হাসির নয় মোটেই।

সেরেঙ্গেটিতে খুব সেৎসি মাছি। বড় বড় কালো কালো মাছি। আমাকে পরশু একটা কামড়েছিল। অসহ্য লাগে কামড়ালে। কলকাতার একশোটা মশা একবারে কামড়ালেও বোধহয় অমন লাগত না।

এই সেৎসি মাছির কামড়ে এক রকমের অসুখ হয় আফ্রিকাতে। তাকে ওরা সোয়াহিলিতে বলে নাগানা। ইংরিজিতে বলে ইয়ালো-ফিভার। রুগির খুব জ্বর হয়, শরীর হলুদ হয়ে যায়, মাথার গোলমাল দেখা দেয়, আর রুগি পড়ে-পড়ে শুধুই ঘুমোয়। তাই এই অসুখের আরেক নাম স্লিপিং-সিকনেস। অনেকরকম সেৎসি মাছি আছে এখানে। সব মাছি কামড়ালেই যে এই অসুখ হবে এমন নয়, কিন্তু কামড়াবার আগে তাদের ক্যারেকটার সার্টিফিকেট দেখানোর কথা বলা তো আর যায় না মাছিদের!

এই ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে মরার অসুখকে টেডিরা যমের মতো ভয় পায়।

ঋজুদা আর আমিও আফ্রিকাতে আসবার আগে খিদিরপুরে গিয়ে ইয়ালো-ফিভারের প্রতিষেধক ইনজেকশান নিয়ে এসেছিলুম। ভীষণ লেগেছিল তখন। কিন্তু সেৎসি মাছি যখন সত্যি-সত্যি কামড়াল, তখন মনে হয়েছিল যে, ইনজেকশানের ব্যথা কিছুই নয়।

উচ্চারণ সেৎসি যদিও, কিন্তু বানানটা গোলমেলে। ইংরিজি বানান হচ্ছে Tsetse।

আসলে, এখানে এসে অবধি দেখছি বানান নিয়ে বড়ই গণ্ডগোল। গোরোংগোরো বলছে উচ্চারণের সময়, কিন্তু বানান লিখছে NGORONGORO। সোয়াহিলি শব্দের উচ্চারণে প্রথম অক্ষর যেখানে-সেখানে লোপাট হয়ে যাচ্ছে; যেন তারা বেওয়ারিশ।

এইসব ভাবতে-ভাবতে গাড়ি চালাচ্ছিলাম, হঠাৎ ঋজুদা আমার স্টীয়ারিং ধরা হাতের ওপরে হাত ছোঁয়াল। ব্রেকে পা দিলাম। ঐ মারিয়াবো পাহাড়শ্রেণীর সামনে এক জায়গা থেকে ধোঁয়া উঠছে। মানুষ আছে? ঘাসবনে আগুনও লাগতে পারে। কিন্তু বনে আগুন লাগার ধোঁয়া অন্যরকম হয়। জায়গাটা মাইল-দশেক দূরে।

ঋজুদা বলল, "গাড়ি থামা।"

বললাম, "এগোব না আর?"

ঋজুদা বলল, "গাধা!"

ভাগ্যিস ভুষুণ্ডা আর টেডি বাংলা জানে না।

আমি বললাম, "এগোবে না কেন?"

ঋজুদা বলল, "পাহাড়ের কাছ থেকে আমাদের গাড়ি সহজেই দেখতে পাবে ওরা। এই সেরেঙ্গেটিতে আইনত কোনো মানুষের থাকার কথা নয়। যারা ওখানে উনুন ধরিয়েছে বা অন্য কিছুর জন্যে আগুন জ্বেলেছে তারা নিশ্চয়ই আইন মানে না। আমরা ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধের অন্ধকারও নেমে আসবে। আজ এখানেই ক্যাম্প করা যাক। আসন্ন রাতে এগোনো ঠিক হবে না।"

নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার দিকে ফিরে বলল, "তুই কী বলিস রুদ্র?"

আমি বললাম, "ওরা আমাদের দেখেই যদি থাকে, তাহলেও তো রাতের বেলা আক্রমণ করতে পারে।"

ঋজুদা আমার দিকে ফিরে বলল, "রুদ্রবাবু একটু ভয় পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে যেন!"

আমি বললাম, "ভয় নয়, সাবধানতার কথা বলছি।"

ঋজুদা বলল, "দেখে থাকতেও পারে, না-ও দেখে থাকতে পারে। তবে যদি দেখে থাকে, তাহলে আক্রমণও করতে পারে। এবং সেই জন্যে রাতে আমাদের সজাগ থাকতে হবে; পালা করে পাহারা দিতে হবে। আক্রমণ করতে গেলে তাদেরও তো এই দশ মাইল ফাঁকা জায়গা পেরিয়েই আসতে হবে। তাই পাহাড় থেকে এই দূরেই তাঁবু ফেলতে চাই। এলে তাদের দূর থেকে দেখা যাবে।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে।"

তারপর ঋজুদা আর টেডি নীচের ঘাস পরিষ্কার করে তাঁবু খাটাতে লেগে গেল।

আমি আর ভুষুণ্ডা চায়ের জল বসিয়ে দিলাম স্টোভে। এখানে খুব সাবধানে আগুন-টাগুন জ্বালতে হয়। যখন-তখন ঘাসে আগুন লেগে যেতে পারে।

তাঁবু খাটাতে-খাটাতে ঋজুদা বলল, "চা-ই কর রুদ্র। রাতে বরং কফি খাওয়া যাবে।"

তারপর বলল, "তুই প্রথম রাতে জাগবি, না শেষ রাতে?"

আমি বললাম, "একবার ঘুমিয়ে পড়লে ঠাণ্ডাতে মাঝরাতে ঘুম ছাড়ে না চোখ। আমি প্রথম রাতে জাগি; তুমি শেষ রাতে।"

তারপর শুধোলাম, "কটা অবধি জাগব আমি?"

ঋজুদা বলল, "বারোটা অবধি জাগিস। খেয়েদেয়ে আমরা তো নটার মধ্যেই শুয়ে পড়ব সব শেষ করে। নটা থেকে বারোটা, তিন ঘণ্টা ঘুমুলেই বাকি রাত জাগতে পারব আমি। রুদ্রবাবু বলে ব্যাপার। তাকে কি বেশি কষ্ট দেওয়া যায়! অনার্ড গেস্ট। ক্যালকেশিয়ান মাখনবাবু!"

আমি বললাম, "ঋজুদা! অনেক বছর আগেও আমাকে যা বলতে, এখনও তাইই বলবে এটা কিন্তু ঠিক নয়।"

ঋজুদা বলল, "আলবত বলব, আজীবন বলব; তোর যখন আশি বছর বয়স হবে তখনও বলব, অবশ্য যদি তখন আমি বেঁচে থাকি!"

হঠাৎ-হঠাৎ এই সব কথায় আমার মন বড় খারাপ হয়ে যায়। ঋজুদার সঙ্গে গত কয়েক বছর বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে এমনই দশা হয়েছে আমার যে, ভাবলেও দম বন্ধ হয়ে আসে। ঋজুদা না থাকলে আমার কী হবে?
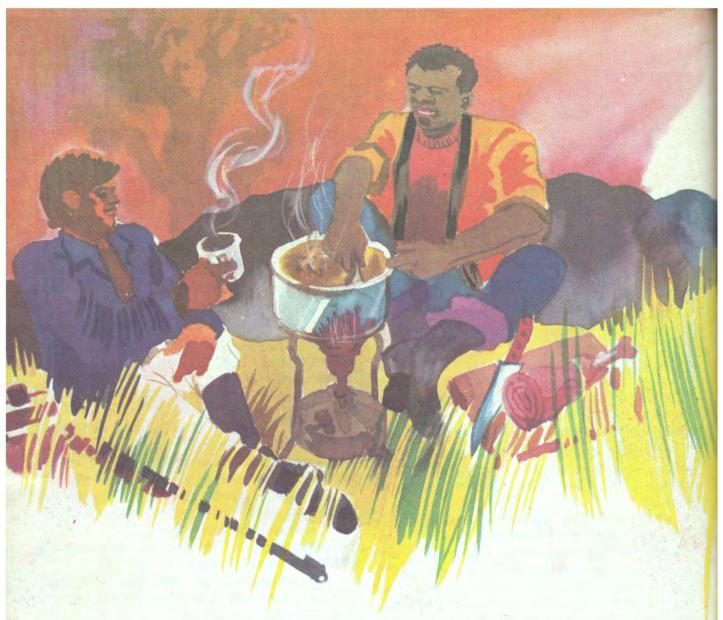
কলকাতায় আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সেখানে যে আকাশ দেখা যায় না। তারা, চাঁদ, সূর্য কিছুই দেখা যায় না। সেখানে কখন ভোর হয় কেউই খোঁজ রাখে না তার। সন্ধে, চুপিসারে দিগন্তে দিগন্তে আলোছায়ার কত দারুণ দারুণ ছবি এঁকে রোজ কেমন করে নিত্যনতুন হয়ে আসে, অথবা চলে-যাওয়া দিনের সঙ্গে ফিরে-আসা রাতের কোন্ আঙিনাতে কেমন করে দেখা হয় রোজ - রোজ, তার খবরও কেউই নেয় না। হাওয়ায় সেখানে ডিজেল আর কয়লার ধোঁয়া, সেখানে গাছ থেকে একটি পাতা খসে পড়ার যে সুস্পষ্ট আওয়াজ তা কেউই শোনে না, শুনতে পায় না ; পায় না জানতে শিশিরের পায়ের শব্দ, দুপুরের একলা ভীরু পাখির চিকনগলার ডাক, অথবা ভোরের পাখিদের গানও শোনে না সেখানে কেউ। ফুলের গন্ধ পায় না নাকে। তাদের নাক, কান, চোখ সব অকেজো, অব্যবহৃত যন্ত্রের মতোই তারা মিছিমিছি বয়ে বেড়ায়। তাদের মন আটকে থাকে পাশের বাড়িতে, গলির মোড়ে, অফিসের ঘর অথবা রাস্তার ভিড়ে। দিগন্তরেখা কাকে বলে, বিস্তৃতি বা ব্যাপ্তি কী, উদারতা কোথায় অনুভব করা যায়—এসব কিছুরই খবর জানে না শহরের মানুষ। অথচ আমাদের সকলেরই হাতের কত কাছে এই সবই ছিল এবং আজও আছে তা ঋজুদা যদি এমন করে আমাকে হাতে ধরে না চেনাত, না বোঝাত, তাহলে বুঝতাম বা চিনতাম কি কখনও? ঋজুদাই তো হাত ধরে নিয়ে এসে এই আশ্চর্য আনন্দের, অনাবিল, সুন্দর, সুগন্ধি বনের কাকলিমুখর জগতে, প্রকৃতিমায়ের কোলে এনে বসিয়ে আমাকে আসল মজার উৎস, আসল আনন্দের ফোয়ারার খোঁজ দিয়েছে।

আমি যে ঋজুদার কাছ থেকে কী পেয়েছি তা আমার ক্লাসের কোনো বন্ধুই জানবে না। ভাবতেও পারে না ওরা। সেই কারণেই শুধু আমিই জানি, ঋজুদা কখনও "থাকব না" বললে কেন আমার এত পাগল-পাগল লাগে।

এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। পশ্চিমাকাশে আস্তে আস্তে নিচু হয়ে সূর্যটা একটা বিরাট কমলা-রঙা বলের মতো ঘাসের হলুদ দিগন্তকে কমলা আলোর বন্যায় ভাসিয়ে মিলিয়ে গেল। কিন্তু তারপরও বহুক্ষণ গাঢ় ও ফিকে গোলাপির আভা লেগে রইল আকাশময়।

ঘাস পরিষ্কার করে নিয়ে আগুন জ্বালানো হয়েছে। তারই চারপাশে বসেছি আমরা চারজনে। ভুষুণ্ডা আমাদের পথ-প্রদর্শক, অন্য কাজ করতে বললে বিরক্ত ও অপমানিত বোধ করে। আমরা বলিও না। টেডি রান্না চাপিয়েছে। আমি থম্‌সন্‌স গ্যাজেলের বাচ্চাটাকে কোলে করে বসে আছি। ওর গলার কাছের শেয়ালের কামড়ের ঘা এখনও শুকোয়নি। খুব ভাল করে লাল মার্কিউরিওক্রোম লাগিয়ে দিয়েছিল টেডি।

ঋজুদা যখন আরুশাতে এসেছিল তখন ওর একজন আফ্রিকান বন্ধু একটা মীরশ্যাম্ পাইপ উপহার দিয়েছিলেন।

আরুশাতে একটি কোম্পানি আছে, তারা মীরশ্যাম্ কাদা দিয়ে পাইপ, অ্যাশট্রে, ফুলদানি ইত্যাদি বানায়। মীরশ্যাম্ আসলে সমুদ্রের এক বিশেষ রকমের কাদা। এ দিয়ে তৈরি পাইপের রঙ বদলাতে থাকে খাওয়ার সময়, আগুনের তাপের সঙ্গে সঙ্গে। অর্গানন ব্ল্যাকউড্-এর লেখা শিকারের বইয়ে প্রথম এই মীরশ্যাম্ পাইপের কথা পড়ি আমি।

টেডি সকলের জন্যে একটিই পদ রান্না করেছে। খিচুড়ির মতো। কিন্তু ঠিক আমাদের খিচুড়ির মতো নয়। ওরা সোয়াহিলি ভাষায় বলে, উগালি। ভুট্টার দানার মধ্যে গ্রান্টস্ গাজেলের মাংস দিয়ে সেই উগালি রান্না হচ্ছে। দারুণ গন্ধ ছেড়েছে। খিদেও পেয়েছে ভীষণ। একটি গ্রান্টস গ্যাজেল্ ও একটি থম্সন্স গ্যাজেল শিকার করে আমরা তাদের মাংস স্মোকড্ করে নিয়েছি। ট্রেলারের মধ্যে বস্তা করে রাখা আছে সে-মাংস।

পাইপের তামাকের মিষ্টি গন্ধ ভাসছে হাওয়ায় আর আমি মীরশ্যাম্ পাইপের রঙ-বদলানো দেখছি। ভুষুণ্ডা ম্যাপটা খুলে ঋজুদার সঙ্গে কথা বলছে। মাঝে-মাঝে সোয়াহিলিতেও বলছে। এখানে আসার আগেই ঋজুদা সোয়াহিলি শিখে নিয়েছে মোটামুটি। আমাকেও একটা বই দিয়েছিল, কিন্তু কয়েকটা শব্দ ছাড়া বেশি শিখিনি আমি। বড় খটমট শব্দগুলো। জাম্বো মানে হ্যালো, সিম্বা মানে সিংহ, টেম্বো মানে হাতি, চুই মানে লেপার্ড। কারো সঙ্গে দেখা হলে ইংরিজিতে যেমন আমরা বলি হ্যালো বা আমেরিকান-ইংরিজিতে হাই! সোয়াহিলিতে সেই সম্বোধনকে বলে জাম্বো! আমি যদি কাউকে বলি জাম্বো, সে উত্তরে বলবে সিজাম্বো।

শীত বেশ বেশি। যদিও এখন জুলাই মাস, কিন্তু আফ্রিকাতে এখন শীতকাল। হাজার-হাজার মাইল ঘাসবনের উপর দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া বয়ে আসছে হুহু করে। আমার উইন্ড-চিটারের কলারের কোনাটা পত্পত্ করে উড়ছে। ঋজুদার জার্কিনের বুকপকেট থেকে টোবাকোর পাউচটা উঁকি মারছে আর ডানদিকের নীচের পকেটের মধ্যে পয়েন্ট থ্রি টু কোল্ট পিস্তলটা পোঁটলা হয়ে আছে।

কথাবার্তা শুনে মনে হল, ভুষুণ্ডার আপত্তি আছে ভীষণ মারিয়াবো পাহাড়ের দিকে যেতে। ও বলছে, ওদিকে চোরা-শিকারিদের এত বড় আস্তানা আছে এবং ওদের কাছে এতরকম অস্ত্র-শস্ত্র আছে যে, আমাদের ওরা গুলিতে ভেজে নিয়ে খেয়ে ফেলবে বেমালুম।

ঋজুদা জেদ করছে, আজ রাতে কোনো ঘটনা না ঘটলে কাল সকালে আমরা ওদিকেই যাব।

ঋজুদার সিদ্ধান্তে ভুষুণ্ডা বেশ অসন্তুষ্ট হল। যে-লোক গাইডের কথা না শুনে নিজের মতেই চলে, তার গাইডের দরকার কী? এই কথা বলল ভুষুণ্ডা বেশ জোর গলায়।

তার উত্তরে ঋজুদা বলল, "যে গাইড সেরেঙ্গেটির মধ্যে রাস্তা ও দিক হারিয়ে ফেলে তেমন গাইড থাকা-না-থাকা সমান।"

ঋজুদা কখনও এমন করে কথা বলে না কাউকে। তাই অবাক হলাম। তারপর আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে ঋজুদা ভুষুণ্ডাকে বলল, "ইচ্ছে করলে, যে-কোনো জায়গাতে, যে-কোনোদিন তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে পারো।"

এই কথা শুনে আমি ভয়ও পেলাম, চমকেও উঠলাম।

ভুষুণ্ডা ঠাণ্ডা চোখে ঋজুদার দিকে চাইল।
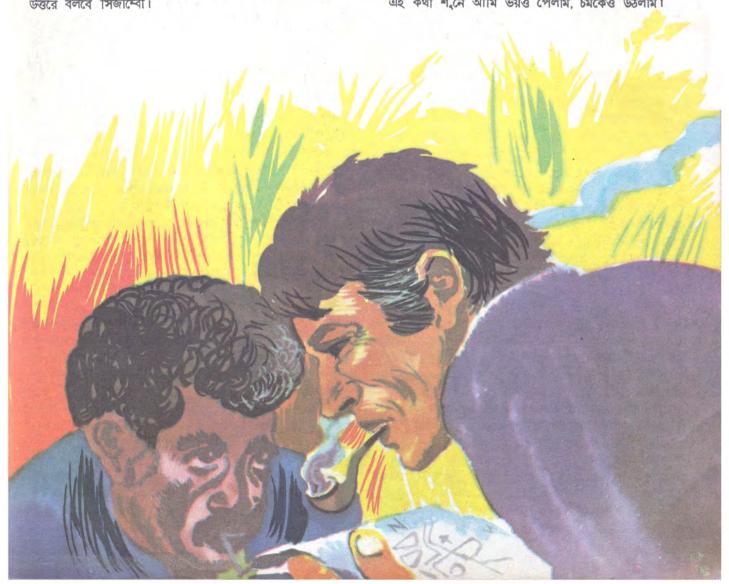
ঋজুদা ভুষুণ্ডার চোখের উপর থেকে চোখ না সরিয়ে, ভুষুণ্ডার চোখে নিজের চোখ দিয়ে এক বালতি বরফ জল ঢেলে দিল।

ব্যাপার বেশ গোলমেলে মনে হচ্ছে। একে বিদেশ-বিভুঁই, হাজার-হাজার মাইল জনমানবহীন হিংস্র জানোয়ারে, নানারকম দুর্দান্ত উপজাতিতে এবং সাংঘাতিক সব চোরা-শিকারিতে ভরা আফ্রিকার বন-জঙ্গলে স্থানীয় গাইড ছাড়া আমরা কী করে চলব তা ভাবতেই আমার গলা শুকিয়ে আসছিল। গাইড থাকতেও পথ হারালাম। আর গাইড না থাকলে যে কী হবে! এদিকে তেলও বেশি নেই সঙ্গে। তেল ফুরোলে তো গাড়ি ফেলে রেখে পায়ে হেঁটে যেতে হবে। কিন্তু কোন্‌দিকে যাব? হাজার-হাজার মাইল তো আর পায়ে হেঁটে যেতে পারব না! খাওয়ার জলের অভাবে তো এমনিতেই মরে যাব, খাবারের অভাবে যদি না-ও মরি।

ঋজুদাকে বললাম, "ঋজুদা, তুমি রেগে গেছ, কিন্তু কাজটা কি ভাল হচ্ছে? ভেবে দ্যাখো।"

ঋজুদা বলল, "খুব ভাল হচ্ছে। তুই পাকামি না করে রান্নার কতদূর দ্যাখ্। দরকার হলে টেডিকে সাহায্য কর একটু।"

আমি চুপ করে গেলাম। ভাবলাম, সাহায্য আর কী করব? রাঁধছে তো শুধু উগালি। তাও প্রায় হয়ে এসেছে।

আমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল। ভুষুণ্ডা গাড়িতেই শোয়। টেডি ভীষণ লম্বা বলে গাড়িতে শুতে পারে না। ছোট তাঁবুটাতে শোয় ও। আমি আর ঋজুদা শুই বড় তাঁবুটাতে। আজ আমি শোব না এখন। পাহারা দিতে হবে। তাই রাইফেলে গুলি ভরে, টুপি পরে আমি তাঁবুর বাইরে আগুনের পাশে ক্যাম্প-চেয়ারে বসলাম। বাইরে যদি শীত বেশি লাগে, তবে মাঝে-মাঝে ল্যাণ্ড-রোভারের সামনের সীটেও গিয়ে বসব।

ঋজুদা বলল, "কিছু দেখতে পেলে আমাকে ডাকিস। আর ঠিক রাত বারোটাতে তুলে দিস আমাকে।"

বললাম, "আচ্ছা।"

ঋজুদা পরদা ঠেলে তাঁবুর মধ্যে গিয়ে ঢুকল। আমি ক্যাম্প-চেয়ারে বসে জুতোসুদ্ধু পা-দুটো লম্বা করে আগুনের দিকে ছড়িয়ে দিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টেডি মহম্মদের নাক-ডাকার আওয়াজ সেই প্রায়-নিস্তব্ধ রাতের ঘাসবনে বিকট হয়ে উঠল। সেই ডাকের কী আরোহণ অবরোহণ, কত গমক আর গিটকিরি। টেপ-রেকর্ডার আছে সঙ্গে, কিন্তু তাতে টেডির নাক-ডাকার আওয়াজ টেপ করলে ঋজুদা মার লাগাবে। তাঁবুর মধ্যে, পিস্তলের গুলি খুলে আবার পিস্তল কক্ করার শব্দ শুনলাম। রি-লোড করে পিস্তল কক্ করল ঋজুদা, তার শব্দ শুনলাম। রোজ শোবার সময় মাথার বালিশের নীচে পিস্তলটাকে রাখে ঋজুদা। আর সারাদিন জার্কিনের কোটের পকেটে।

গাড়ির মধ্যে ভুষুণ্ডা ঘুমুচ্ছে। কোনো শব্দ নেই। মাঝে মাঝে নড়াচড়ার উসখুস আওয়াজ।

আধ ঘন্টা পর শুধু টেডির নাকডাকার আওয়াজ ছাড়া অন্য আর কোনো আওয়াজই রইল না।

একটু পরে আগুনটাও ফিসফিস করে কী যেন বলে নিভে গেল। কাঠের আগুন না যে, অনেকক্ষণ জ্বলবে। কটন ওয়েস্ট-এর সঙ্গে পোড়া মবিল মিশিয়ে তার সঙ্গে টুকিটাকি ও ঘাস-টাস ফেলে আগুন করা হয়েছিল। কাল থেকে আগুন জ্বালারও কিছু রইল না। সঙ্গে কেরোসিনের স্টোভ আছে অবশ্য, তাতেই রান্না হবে।

উপরে তারাভরা আকাশ। এখন একটু চাঁদও উঠেছে। হাওয়াটা আরও জোর হয়েছে। হঠাৎ পিছন দিক থেকে হাঃ হাঃ হাঃ করে বুকের ভিতরে চমক তুলে হায়না ডেকে উঠল। তারপর ঘাসের মধ্যে খসখস করে তাদের এদিকে এগিয়ে আসবার শব্দ পেলাম।

কারিবুর ঘা-টা এখনও পুরো শুকোয়নি। হয়তো রক্তের গন্ধ পেয়ে থাকবে হায়নাগুলো। পাঁচ ব্যাটারির টর্চটা ওদের দিকে ফেললুম। ওরা কিছুক্ষণ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

হঠাৎ কী একটা জন্তু উড়তে উড়তে, লাফাতে - লাফাতে এদিকে আসতে লাগল। জানোয়ারটা ছোট। কী জন্তু যে, তা বুঝতে পারলাম না। সামনে থেকে টর্চ ফেললাম। দেখলাম লেজওয়ালা একটা জানোয়ার—আমাদের দেশের বড় হিমালয়ান কাঠবিড়ালির মতো অনেকটা—গায়ের রঙ যদিও অন্যরকম। আর যেই সেই জানোয়ারটা আমাদের তাঁবুকে পাশে রেখে, তাঁবু দেখে ঘাবড়ে গিয়ে উড়ে সরে যেতে গেল তখন পাশ থেকে আলো ফেলতেই চোখ জ্বলে উঠল জ্বলজ্বল করে। কিন্তু একটা চোখ। অথচ যখন সামনাসামনি আলো ফেলেছিলাম তখন একবারও জ্বলেনি চোখ দুটো। কী জন্তু কে জানে? কাল জিজ্ঞেস করতে হবে ঋজুদাকে। এমন কিছু আমাদের দেশের জঙ্গলে দেখিনি, আফ্রিকাতে আছে বলে পড়িওনি।

উড়ে-যাওয়া জন্তুটা যে-দিকে মিলিয়ে গেল সেই দিকে চেয়ে ছিলাম, এমন সময় দূর থেকে বার-বার সিংহের গর্জন ভেসে আসতে লাগল। কিছুক্ষণ পরই পায়ে-পায়ে জোর খুরের শব্দ তুলে ওয়াইল্ড বীস্টদের বিরাট একটি দল তাঁবুর দুশো গজের মধ্যে দিয়ে শিশির-ভেজা মাটির গন্ধ উড়িয়ে দৌড়ে চলে গেল। সিংহের দল বোধহয় তাড়া করেছে ওদের।

ঠাণ্ডা লাগছিল বেশ। গিয়ে ল্যাণ্ড-রোভারের সামনের দরজা খুলে বসলাম। ভুষুণ্ডা গাঢ় ঘুমে আছে মনে হল। কোনো সাড়াশব্দই নেই।

মারিয়াবো পাহাড়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে-থাকতে বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। হঠাৎই ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখতে যাব কটা বাজে, এমন সময় মনে হল, মারিয়াবো পাহাড়ের দিক থেকে কী একটা জানোয়ার আসছে এদিকে। একলা জানোয়ারটা বেশ কাছে এসে গেছে। তাড়াতাড়ি করে দরজা খুলে নেমে গাড়ির পাশেই দাঁড়িয়ে খুব ভাল করে তাকালাম ওদিকে।

আশ্চর্য! জানোয়ার তো নয়! মনে হচ্ছে মানুষ। দুবার চোখ কচলে নিলাম। পৃথিবীর মানুষ এ-রকম হয়? কী লম্বা! প্রায় সাত ফিটের মতো হবে। চলে আসছে সোজা আমাদের তাঁবুর দিকে। অদ্ভুত পোশাক তার। হাতে একটা বিরাট লম্বা লাঠি।

টর্চ ফেলব কি-না ভাবলাম একবার। তারপর ভাবলাম, ঋজুদাকে ডাকি। আরেকবার ভাবলাম, ঘড়িটা দেখি, কটা বেজেছে; কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। কে যেন আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দিল। আমার সারা শরীর অসাড় হয়ে গেল। এই কি তবে টেডির উনকুলুকুলু? সেদিন রাতে টেডি আমাকে এই গল্প বলেছিল।

লোকটি যখন আরো কাছে এসে গেছে তখন কানের কাছে হঠাৎ কে যেন ফিসফিস করে বলল, "মাসাই চীফ্। গ্রেট ট্রাবল্। শুট্ হিম্। কিল হিম্।"

এক পলকে মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম, ভুষুণ্ডা গাড়ির ভিতরে সোজা শক্ত হয়ে বসে উইণ্ডস্ক্রীন দিয়ে ঐদিকেই তাকিয়ে আছে।

রাইফেলটা কাঁধে তুললাম। কাঁধে তুলতে অনেকক্ষণ সময় লাগল। তারপরে রাইফেল স্টেডি পজিশানে ধরে ট্রিগারের দিকে

হাত বাড়ালাম। ঠিক সেই অবস্থাতে আমার হঠাৎ মনে হল যে, মানুষটা অন্য মহাদেশের অজানা ভাষা-বলা কোনো অদ্ভুত মানুষ বটে, বিকট দেখতে বটে, কিন্তু সে তো আমার কোনো ক্ষতি করেনি। সে চোরা-শিকারি কি না, তাও জানি না। ঠাণ্ডা মাথায় একজন মানুষকে গুলি করে মারতে পারব কি আমি? আমার হাত কাঁপবে না?

ভুষুণ্ডা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "য়্যু ডোন্ট কিল, হি কিল য়্যু!"

আমি ট্রিগারে হাত ছোঁওয়ালাম।

ততক্ষণে মানুষটা প্রায় এসে গেছে। সে সোজা আমারই দিকে আসছে।

কী সাহস! এই রাতে, এইরকম হিংস্র-জানোয়ারে-ভরা রাতে একা-একা শুধু একটা লাঠি হাতে দূর থেকে হেঁটে আসার কথা ভেবেই আমার শরীর খারাপ লাগতে লাগল। লোকটা দেখতে পেয়েছে যে, তার বুক লক্ষ করে আমি রাইফেল তুলেছি। তবু তার ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। পৃথিবীর কোনো মানুষ তার ক্ষতি করতে পারে এমন কথা বোধহয় তার ভাবনারও বাইরে।

তবে? লোকটা কি পৃথিবীর মানুষ নয়? উনকুলুকুলু?

এ কী! লোকটা যে এসে গেল! লালচে-কালো ভারী মোটা কাপড়ের পোশাক, লুঙ্গির মতো অনেকটা; বুকের কাছে গিঁট দিয়ে বাঁধা। আরেক খণ্ড ঐরকম কাপড় চাদরের মতো জড়ানো বুকে কাঁধে। ডান হাতে ওটা লাঠি নয়, একটা বর্শা, তার সাত ফিট মাথা ছাড়িয়ে আরো উঁচু হয়ে আছে। কোমরে বাঁধা আছে একটা প্রকাণ্ড দা। গলায়, কানে, অদ্ভুত সব বড় বড় রঙিন পাথরের আর হাড়ের গয়না। চাঁদের ফিকে আলোতেও তার মুখ আর কপালের রঙিন আঁকিবুকি অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

রাইফেল ধরেই আছি, লোকটাও এগিয়েই আসছে, আসছে; এসে গেল।

ভুষুণ্ডা গাড়ির ভিতর থেকে আবার চাপা গলায় বলল, "কিল হিম, য়্যু ফুলিশ বয়!"

আমাকে বয় বলতেই রেগে গিয়ে যেন হুঁশ ফিরে পেলাম। আর হুঁশ ফিরে পেয়েই, যেই ট্রিগার টানতে যাব, তার আগেই লোকটা আমার রাইফেলটাকে ঠিক মাঝখানে তার দারুণ লম্বা মিশকালো হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে ফেলে ডান দিকে ঠেলে তুলে সরিয়ে দিল। আর সেই অবস্থাতেই, নলের মুখ থেকে আগুনের ঝলকের সঙ্গে গুলিটাও বেরিয়ে গেল আধো-অন্ধকারে। রাইফেলের গুলির সেই আওয়াজ শূন্য প্রান্তরে ছড়িয়ে গেল হু-হু হাওয়ার সঙ্গে হাঃ হাঃ হাঃ করে, যেন আমাকেই ঠাট্টা করে।

লোকটা রাইফেলের নলটা ধরেই ছিল। নলটা ঐ অবস্থাতেই ধরে থেকে আমার চোখে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে এল। কী ভয়াবহ জ্বলন্ত দৃষ্টি। কী-রকম খোদাই করা কালো মুখ!

তারপরই, এক ঝটকায় রাইফেলটা কেড়ে নিয়ে সে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এমন সময় ঋজুদা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা ডান কাঁধের সামনে তুলে বলল, "জাম্বো!"

লোকটাও বলল, "জাম্বো!"

বলেই পিচিক করে, প্রায় আমার মুখের উপরেই, একগাদা থুতু ফেলল।

তারপর কাটা-কাটা সংক্ষিপ্ত গম্ভীর স্বরে ছোট্ট ছোট্ট শব্দে ঋজুদার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। সেই ভাষা সোয়াহিলি নয়। হয়তো মাসাইদের ভাষা।

ঋজুদা তাকে ক্যাম্প-চেয়ার পেতে বসাল। তারপর তাঁবুর

ভিতরে গিয়ে এক টিন কনডেন্সড্ মিল্ক আর একটা আয়না এনে মাসাই চীফ্‌কে উপহার দিল। কাউকে উপহার দেবে বলে, নতুন চকচকে আয়না যে ঋজুদা সঙ্গে করে আনতে পারে আফ্রিকার বনেও, তা আমার জানার কথা ছিল না।

এমন সময় মারিয়াবো পাহাড় যেদিকে, সেই দিক থেকে বহু লোকের গলার চিৎকার এবং দ্রিদিম, দ্রিদিম, দ্রিদিম গম্ভীর, গায়ে-

কাঁটা দেওয়া মাদলের শব্দ ভেসে আসতে লাগল। লোকগুলো মাঝে মাঝে একসঙ্গে বুক-কাঁপানো চিৎকার করে উঠছিল।

ঋজুদা এসে আমাকে বলল, "তুই একটা ইডিয়ট। আমাকে ডাকলি না কেন? কে তোকে গুলি করতে বলল? দ্যাখ্ তো এখন কী কান্ড বাধালি!"

তারপরই বলল, "এক্ষুনি ক্ষমা চা তুই মাসাই-সর্দারের কাছে। ওরা আমাদের বন্ধু; শত্রু নয়।"

হাত-পা সব ঠান্ডা হয়ে গেছিল। আমরা এই কজন আর ওরা কত লোক। ওরা বর্শা দিয়েই সিংহ শিকার করে শুনেছি, তার উপর বিষাক্ত তীরও আছে ওদের। আমার তলপেট গুড়গুড় করছিল ভয়ে। দূরের মাদলের শব্দে আর চিৎকারে। হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ে, হাত-জোড় করে ক্ষমা চাইলাম আমি।

ঋজুদা কী যেন বলল, মাসাই-সর্দারকে। শুধু দুটো শব্দ উচ্চারণ করল। এবং সর্দার সঙ্গে-সঙ্গে আরেকবার পিচিক করে থুতু ফেলে একটু থুতু নিজের ডান হাতের তেলোতে নিয়ে দু হাতের পাতা ভাল করে ভিজিয়ে আমার মুখটাকে দু হাত দিয়ে ধরল। আমার মনে হল, সিংহের মুখে নেংটি ইঁদুর পড়েছে। আমার মুখটা দু হাতে ধরা অবস্থাতেই সর্দার আমার মাথার ঠিক মধ্যিখানে আবার সশব্দে থুতু ফেলল। কী দুর্গন্ধ! গা গুলিয়ে উঠল আমার। এর চেয়ে এদের তীর খেয়ে মরাও ভাল ছিল।

ঋজুদার উপর ভীষণই রাগ হতে লাগল। একে তো হাঁটু-গেড়ে বসিয়ে ক্ষমা চাওয়াল, তারপর থুতু খাওয়াল। এখন থুতু দিয়ে চান করাল।

ততক্ষণে ভুষুণ্ডা এবং টেডি মহম্মদও চলে এসেছে। কিন্তু অন্ধকার দিগন্তে অসংখ্য মশাল জেবলে রংবেরংএর ঢাল আর পালক-লাগানো বল্লম হাতে শয়ে শয়ে মাসাইরা এগিয়ে আসছে আমাদের তাঁবুর দিকে।

ওদের আসতে দেখেই ঋজুদার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে সর্দার ল্যান্ড-রোভারের বনেটের উপরে উঠে দাঁড়াল সাবধানে। টর্চ দিয়ে আকাশে আলো ফেলে-ফেলে সেই আগন্তুক লোক-দের যেন কী ইশারা করল। তারপর ডান হাত তুলে বলল, "মারিয়াবো, সিরিঙ্গেটি, মিগুংগা ; নীয়ারাবোরো।"

বলেই, পিচিক করে আরেকবার থুতু ফেলে এক লাফ দিয়ে গাড়ির বনেট থেকে নামল। সঙ্গে সঙ্গেই আগন্তুক লোক-গুলো দূর থেকেই হৈ-চৈ করতে করতে ফিরে যেতে লাগল, যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে। কী সব বলতে বলতে।

ঋজুদা আমাকে বলল, "রুদ্র, এখানে তো স্নানের জল নেই। আমার হ্যাভারস্যাকে বড় এক শিশি ওডিকোলন আছে। বুকে মাথায় মেখে শুয়ে পড় গিয়ে। তোর আর থাকতে হবে না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়েছে।"

মুখ নিচু করে রাইফেলটা যেখানে পড়ে ছিল, সেখানে গিয়ে সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে তাঁবুর মধ্যে গিয়ে ওডিকোলনের শিশি উপুড় করেও কিছুই সুরাহা হল না। সেই দুর্গন্ধ আরো বেড়েই গেল।

শুনেছিলাম, মাসাইরা নাকি শুধু রক্ত আর দুধ খেয়ে থাকে। তাই বোধহয় ওদের থুতুতে এ-রকম দুর্গন্ধ।

উত্তেজনায় ও দুর্গন্ধে ঘুম আসছিল না, তবুও ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ঋজুদা কোনোদিনও আমাকে ইডিয়ট বলেনি। আজই প্রথম বলল। কিন্তু এতই ভয় পেয়েছিলাম আর উত্তেজিত হয়েছিলাম যে, এত বড় অপমানটাও সর্দারের থুতুর সঙ্গে হজম করে ফেললাম।

শুয়ে শুয়ে সর্দারের মুখটা মনে করছিলাম। ঋজুদা বলে-ছিল, মাসাই চীফ-এর নাম নাইরোবি সর্দার।

সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি ঋজুদা নিজেই ব্রেকফাস্ট বানিয়ে ফেলেছে। কণ্ডেন্সড মিল্ক জলে গুলে, গরম করে নাইরোবি সর্দারকে আদর করে খেতে দিল। সঙ্গে ওয়াইল্ড্‌বীস্টের রোস্ট।

সর্দার শুধুই দুধ খেল, কিন্তু মুখ দেখে মনে হল ঐ টিনের দুধ তার মোটেই ভাল ঠেকল না।

সর্দার বলল, "আমরা কাঁচা দুধ খাই, আর রক্ত খাই টাটকা। তোমরা যখন যাচ্ছই আমাদের ওখানে, তখন তোমাদেরও খাওয়াব।"

বলে কী রে? কাল থুতু মেখেছি মুখে-মাথায়, আজ আবার কাঁচা রক্ত খেতে হবে! ঋজুদার সঙ্গে আফ্রিকাতে না এলেই ভাল হত!

ভুষুণ্ডা, দেখলাম, একটু দূরে-দূরেই থাকছে। কথাবার্তা বিশেষ বলছে না। যদিও ও এই অঞ্চলের সব ভাষা ভালই জানে। ঋজুদা যে ওর সাহায্য ছাড়াই মাসাই-সর্দারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারবে সে-কথা ও বোধহয় আগে বুঝতে পারেনি। সে কথা বুঝে খুব খুশি হয়েছে বলে মনে হল না ভুষুণ্ডা। ঋজুদাকে এখনও বলাই হয়নি যে, আমাকে "ফুলিশ বয়" বলে, কাল ভুষুণ্ডাই গুলি করতে বলেছিল। নইলে আমি সর্দারের দিকে রাইফেল তুলতামই না।

টেডি খুব কাজ-কর্ম করছে। নাইরোবি সর্দার দয়া করে টেডিকে একটু নস্যি দিল। আমাদের কাছে একটু, কিন্তু টেডি আর সর্দারের নাক যত বড় তাদের নাকের ফুটোটাও তত বড়। একশো গ্রাম করে নস্যি দিব্যি ঢুকে গেল এক-এক নাকে। যেটুকু উড়ে এল হাওয়ায় তাতেই হাঁচতে লাগল ঋজুদা। আমিও।

খাওয়া-দাওয়া হতেই তাঁবু-টাবু সব হাতে-হাতে উঠিয়ে ফেললাম আমরা। মালপত্র গুছিয়ে গাড়িতে তুলে দিলাম।

ঋজুদা বলল, "চল, আমরা এখন নাইরোবি সর্দারের গ্রামে যাব। ওর সঙ্গে দেখা না-হলে আমরা জলের অভাবে নিশ্চয়ই মারা যেতাম। পথও খুঁজে পেতাম না। আমাদের যিনি গাইড, ভু-বাবু, তার ভূগোলের জ্ঞান মনে হচ্ছে তোরই মতো। কী করে গাইড হল কে জানে?"

আমি বললাম, "জানো তো, কাল রাতে ভুষুণ্ডাই আমাকে গুলি করে মেরে ফেলতে বলেছিল সর্দারকে।

ঋজুদা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কী ভাবল, তারপর বলল, "হয়তো ভয় পেয়েছিল। ভুল করেছিল ভুষুন্ডা।"

তারপর বলল, "এখন ও নিয়ে আর আলোচনা করিস না। ভুষুণ্ডা শুনতে পাবে।"

আমি বললাম, "শুনতে পেলেই বা কী? এখানে বাংলাই তো সকলের কাছে হিব্রু-ল্যাটিন। বাংলাতে আমরা যা খুশি তাই বলতে পারি।"

ঋজুদা বলল, "কারেক্ট।"

তারপর বলল, "তবে পুরোপুরিই বাংলা বলিস—আর্ধেক ইংরিজি, আর্ধেক বাংলার খিচুড়ি নয়। ইংরিজি বুঝে যাবে ও।"

বললাম, "আচ্ছা।"

সবাই গাড়িতে উঠলাম। নাইরোবি সর্দার বনেটের উপরই বসল, দু'হাত দিয়ে দুদিক ধরে। সে এতই লম্বা-চওড়া যে, ভিতরে আঁটল না। সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ঋজুদা,

উইন্ডস্ক্রীন ভরে আছে লাল পোশাকের, নস্যি-কালো, নাইরোবি সর্দার।

কী করে যে গাড়ি চালাবে ঋজুদা জানি না। অবশ্য এখানে পথ দেখার কিছু নেই। দেখলাম, ঋজুদা ডান দিকের জানালা দিয়ে মুখ বের করে গাড়ি স্টার্ট করল।

গাড়িতে আমরা সকলেই চুপচাপ। উইন্ডস্ক্রীনটা একটু উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল হাওয়া আসার জন্যে। বনেটের উপর সর্দার বসে থাকায় খুবই আস্তে গাড়ি চালাতে হচ্ছিল—জোরে চালালে আমাদের গাড়ির তলাতেই পড়ে মারা যাবে সর্দার, তখন আর দেখতে হবে না—কাল রাতের মতো দ্রিদিম দ্রিদিম হুলা হুলা সব দৌড়ে আসবে।

আমি বললাম, "আমরা যে রাস্তা ভুলে গেছি, আমাদের ঠিক রাস্তা বাতলে দেবে কে? সর্দার?"

ঋজুদা বলল, "হ্যাঁ। তা নয়তো আর যাচ্ছি কেন? তাছাড়া, তেলের সঙ্গে জলও কমে এসেছে আমাদের। পাহাড়ের ঝর্না থেকে জল ভরে নেব। আবারও যে রাস্তা ভুল হবে না বা অন্য কোনো বিপদ হবে না তা কে বলতে পারে?''

ঋজুদাকে শুধোলাম, "নাইরোবি তো একটা শহরের নাম। কেনিয়াতে না শহরটা? শুনেছি, খুব সুন্দর শহর। তাই না? তবে সেই শহরের নামে এই সর্দারের নাম হল কী করে?"

ঋজুদা বলল, "মাসাই ভাষাতে, নাইরোবি কথাটার মানে হচ্ছে 'খুব ঠান্ডা'। নাইরোবি শহরটা আমাদের দার্জিলিঙের মতো। খুব ঠান্ডা, পাহাড়ি শহর। একসময় ওখানে মাসাইরাই থাকত। জার্মান আর ইংরেজদের দেশের মতো আবহাওয়া বলে সেই সাদা চামড়ার বিদেশীরা ওদের ওখান থেকে তাড়িয়ে দিল। কিন্তু নামটা এখনও নাইরোবিই রয়ে গেছে।"

"তা তো হল। কিন্তু সর্দারের নাম নাইরোবি কেন?" আমি বললাম।

"কী জানি? হয়তো মেজাজ খুব ঠান্ডা বলে। নইলে, তুই গুলি চালিয়ে দেওয়ার পরও আমাদের ক্ষমা করার কথা ছিল না।" ঋজুদা বলল।

তারপরই বলল, "আচ্ছা, অত কাছ থেকে তুই মিস্ করলি কী করে? তোর হাত তো মোটামুটি ভালই। অবশ্য ভাগ্যিস মিস্ করেছিলি, নইলে আর কাউকে বেঁচে ফিরতে হত না।"

আমি বললাম, ''সত্যিই মানুষটা সর্দার। ভয় কাকে বলে জানে না। মাথাও দারুণ ঠান্ডা। রাইফেল ওর বুকের দিকে এইম্ করে ধরেছিলাম, তবুও ডোন্টকেয়ার করে সোজা হেঁটে এল আমারই দিকে—যেন আমার রাইফেলটা খেলনা রাইফেল, তারপর রাইফেলের নলটাকে ধরে ঘুরিয়ে দিল। ঘাবড়ে গিয়েই আমি ট্রিগার টিপে ফেলেছিলাম।"

ঋজুদা বলল, "চমৎকার! দারুণ লোককেই পাহারাদার রেখেছিলাম আমি।"

আমি বললাম, "তোমার ভু-বাবু যে ক্রমাগত আমাকে বলে যাচ্ছিলেন, মারো, মারো, ওকে মেরে ফেলো। ওকে না মারলে আমরা সকলে মরব।"

ঋজুদা চুপ করে থাকল। কোনো কথা বলল না।

এদিকে সর্দার আরেকবার নস্যি নিল বনেটে বসা অবস্থাতেই। আর উইন্ডস্ক্রীন যে তুলে রাখা হয়েছিল তার ফাঁক দিয়ে নস্যি উড়ে এল হাওয়ার সঙ্গে। কী বিকট গন্ধ আর কী কড়া নস্যি রে বাবা! হাঁচতে হাঁচতে আমার চোখে জল এসে গেল।

ঋজুদা আর টেডি হাসতে লাগল আমার অবস্থা দেখে।

দূর থেকে মাসাই গ্রামটা দেখা যাচ্ছিল মারিয়াবো পাহাড়ের নীচে। গোল-গোল বিরাট সব খড়ের ঘর। খড়ে ছাওয়া বিরাট গোয়াল। এখন ফাঁকা। মেয়েরাও দারুণ লম্বা। সকলেই নানারকম পাথর ও হাড়ের গয়না পরেছে। ওদের গায়ের রঙ গাঢ় বাদামি, পোশাক সকলেরই হাতে-বোনা লাল গরম কাপড়ের, প্রায় কম্বলের মতো। কাঠের তৈরি বালতি ও নানারকম পাত্র দিয়ে ওরা কাজ-কর্ম করছে। অল্প ক'জন পুরুষ আমাদের দেখে এগিয়ে এল।

ঋজুদা বলল, "ঐ যে গোল ঘরগুলো দেখছিস, ওগুলোকে বলে বোমা।"

"বোমা!" আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

ঋজুদা বলল, ''হ্যাঁ। আর ঐ গোয়ালঘরগুলোর নাম, ক্রাল।''

ল্যান্ড-রোভার থামতেই জলের পাত্রগুলো নামিয়ে দেওয়া হল। টেডি গ্রামের মাসাইদের সঙ্গে চলে গেল ঝর্নার দিকে।

আমরা নামতেই আমাদের বিরাট-বিরাট পেঁপে আর কলা খেতে দিল ওরা। তারপর একটা কালো বাছুরকে ধরে নিয়ে এল। তার গলার শিরাতে দড়ি পরিয়ে দিয়ে একটুকরো কাঠ দিয়ে টার্নিকেট করে একটা শিরাকে একজন ফুলিয়ে দিল। তখন অন্যজন একটা ছোট তীর মারল কাছ থেকে—অমনি ফিনকি দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল ফোয়ারার মতো। আরেকজন একটা কাঠের জামবাটিতে সেই রক্ত ধরতে লাগল। বাটিটা ভরে গেল, একজন গিয়ে মাটি থেকে একমুঠো ধুলো তুলে থুতু দিয়ে সেই ধুলো তীরের সূক্ষ্ম ফুটোতে ঘষে দিল। তারপর ঠেলে ঢুকিয়ে দিল শিরাটাকে ভিতরে। চামড়াতে ঢেকে গেল সঙ্গে সঙ্গে শিরাটা, রক্তও বন্ধ হয়ে গেল। বাছুরটা লাফাতে লাফাতে খোঁয়াড়ে চলে গেল। প্রাণে না মেরেও দারুণ কায়দায় ওর রক্ত বের করে নিল এরা।

কিন্তু আমি বোধহয় আর প্রাণে বাঁচলাম না। সেই কাঠের বাটিতে ফেনা-ওঠা তাজা রক্ত এনে একটা লোক সামনেই দাঁড়াল। আমি বয়সে সবচেয়ে ছোট বলে আদর করে আমাকেই সবচেয়ে আগে খেতে দিল। অন্য একজন লোক দু হাতের পাতায় থুতু ফেলে ভাল করে ঘষে সেই পাত্রটিকে সসম্মানে হাতে নিয়ে এসে ইঙ্গিতে চুমুক দিতে বলল।

আমি ইতস্তত করছিলাম। ভুষুন্ডা বলল, "না খেলে এরা অপমানিত হবে এবং দাওয়ের এক কোপে তোমার মুন্ডু শরীর থেকে আলাদা হয়ে যাবে।"

ঋজুদাও ভুষুন্ডার কথায় মাথা নাড়ল।

আর কথা না-বাড়িয়ে আমি বাটিতে চুমুক দিলাম। ফেনা-ওঠা টাটকা বাছুরের রক্ত। এক চুমুকে খেয়ে দেখলাম যে, তখনও বেঁচে আছি। মনে হল আমিও যেন ওদেরই মতো লম্বা হয়ে গেলাম, গায়ে জোর বেড়ে গেল অনেক। কিন্তু, ভীষণ বমি পাচ্ছিল।

আমার পর ঋজুদা, আর ভুষুন্ডাও খেল। টেডি জল নিয়ে আসেনি এখনও। সময় লাগবে। তাই ওকে খেতে হল না। বেঁচে গেল!

নাইরোবি সর্দার উবু হয়ে মাটিতে বসে মাটির উপরেই একটা তীর দিয়ে এঁকে এঁকে ঋজুদাকে রাস্তা বোঝাতে লাগল। ভুষুন্ডা একটু দূরে দাঁড়িয়ে তার জিনের ট্রাউজারের দু পকেটে দু হাত ঢুকিয়ে মনোযোগের সঙ্গে দেখতে লাগল। ঋজুদা কম্পাস বের করে একটা সাদা কাগজে বলপয়েন্ট পেন দিয়ে কী-সব লিখতে লাগল।

যে লোকটি আমাকে রক্ত খাওয়াল তার সঙ্গে একটু ভাব করার ইচ্ছে হল। ভুষুন্ডাকে বললাম, আমাকে সাহায্য করতে। ভুষুন্ডা ভাঙা-ভাঙা মাসাইতে ওকে নাম জিজ্ঞেস করল।

লোকটা পিচিক করে থুতু ফেলে কয়েকটা শব্দ করল পরপর।

ভুষুন্ডা হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটাও।

বললাম, "হাসির কী হল?"

ভুষুণ্ডা বলল, "ও এখন পুরনো নামটা বদলে ফেলেছে, কিন্তু নতুন নাম এখনও রাখেনি। কাল রাখবে। নতুন নাম কী হবে ঠিক করেনি। আজ ভেবে ঠিক করবে।"

আমি বললাম, "কী ঠাট্টা করছ ভুষুণ্ডা। নাম আবার নতুন-পুরনো হয় নাকি?"

ভুষুণ্ডা বলল, "ঠাট্টা? না, না, ঠাট্টা নয়। তুমি বানাকে জিজ্ঞেস করো, বানা জানে।" বলে, ঋজুদাকে দেখাল।

তারপর বলল, "মাসাইরা ইচ্ছেমতো নিজেদের নাম বদলায়. জামাকাপড় পাল্টাবার মতো। একটা নাম পুরনো হয়ে গেলেই সেটা বাতিল করে মনোমতো নতুন নামে ডাকে নিজেকে।"

আমি বললাম, "ওরা তো সাপের মতো। খোলস বদলায়।"

ভুষুণ্ডা কোমর দুলিয়ে ওর হাঁটুর নীচে নেমে আসা দুটি লম্বা-লম্বা হাত দুলিয়ে কুলার মতো চওড়া চোয়ালের ধবধবে সাদা বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হিক-হিক করে হেসে উঠল। বলল, "জব্বর বলেছ, জব্বর বলেছ!"

মাসাইরা সাপের মতোই, খোলস বদলায়, নাম বদলায়।

আমাদের ক্লাসের এক বন্ধুর নাম নিয়ে বড় দুঃখ। ওর দাদু নাম দিয়েছিলেন ব্যোম্‌শংকর। তা ওর একেবারেই পছন্দ নয়। ও মাসাই হলে কেমন সহজে নামটা পাল্টে ফেলতে পারত!

দূর থেকে টেডিকে আসতে দেখা গেল। ওরা চার-পাঁচজন জল বয়ে নিয়ে আসছে ড্রামে এবং চামড়ার ছাগলে। পেছনে পেছনে একপাল ছেলেমেয়ে এবং কয়েকটা ছাগল।

ছাগল দেখে আমার কারিবুর কথা মনে হল। কারিবুকে একটু দুধ খাইয়ে নেওয়া যায়। টেডির সঙ্গে যারা এসেছিল তাদের একজনকে বলে ভুষুণ্ডা একটা ছাগলকে ধরে কারিবুকে তার দুধ খাওয়াতে গেল। কারিবুর আপত্তি তো ছিলই, তার উপরে সেই পাজি ছাগলিটা পাগলির মতো এক লাথি মেরে দিল কারিবুর গায়ে।

ঋজুদা বলল, "তুই-ই বাচ্চাটাকে মেরেই ফেলবি দেখছি। আমরা যেভাবে দিন কাটাচ্ছি তাতে ওকে বাঁচানো এমনিতেই মুশকিল হবে। তার চেয়ে তুই সর্দারকে প্রেজেন্ট করে যা, ওদের ক্রালে থাকবে। অন্যান্য গোরু-বাছুরের সঙ্গে দিব্যি বড় হয়ে উঠবে কারিবু।"

আমি বললাম, "ছাগলের দুধ খাচ্ছে না যে ও!"

ঋজুদা বলল, "সকালে তুই পলতে করে অত কন্ডেন্সড মিল্ক খাওয়ালি, তাই পেট ভরা। খিদে পেলে খুবই খাবে।"

আমি আর টেডি মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলাম। তারপর নাইরোবি সর্দারের হাতে দিলাম কারিবুকে। ওর পিঠের ঘা-টা তখনও লাল হয়ে ছিল। ভাল হয়ে উঠলেও ওর পিঠে গভীর দাগ থেকে যাবে। থম্‌সনস গ্যাজেলদের গায়ের রঙ ভারী সুন্দর—হালকা বাদামি—তার উপর কালো ডোরা, তলপেটটা সাদা। ওর পিঠের ঐ দাগ বিচ্ছিরি দেখাবে ও বড় হলে।

নাইরোবি সর্দারের কথায় কোথা থেকে একজন দৌড়ে এসে কী-সব পাতা-টাতা বেটে এনে কারিবুর ঘায়ে লাগিয়ে দিল। সর্দার বলল, "কারিবু এখন থেকে আমাদের গোরু-বাছুরের সঙ্গেই চরে বেড়াবে।"

ঋজুদা বলল, "এবার আমরা উঠব।"

সর্দার বলল, "দাঁড়াও।" বলে, ঋজুদার হাতে একটা গোল হলুদ পাথর দিল। বলল, "কখনও প্রয়োজন হলে কোনো মাসাইকে এই পাথরটি দেখালে সে তোমাকে সবরকম সাহায্য করবে। এটাকে সাবধানে রেখো।"

সর্দার এবং অন্যান্যরা সার বেঁধে দাঁড়াল। আমরা সকলে হাত তুলে ওদের ধন্যবাদ জানালাম। বাচ্চারা ভিড় করে গাড়িটা দেখছিল। মনে হল, ওরা কখনও গাড়ি দেখেনি আগে। রওয়ানা হবার আগে, দু হাতে আমার মুখটা আদর করে ধরে পিচিক করে আমার মাথায় থুতু দিল সর্দার।

আমি গদগদ ভাব দেখিয়ে হাসলাম।

ঋজুদা বিড় বিড় করে বলল, "তোকে যা পছন্দ করেছে সর্দার, হয়তো জামাই-ই করবে। রাজি না হলেই মুন্ডু কাটা যাবে কিন্তু।"

ভয়ে আমি কুঁকড়ে গেলাম।

স্টীয়ারিং-এ আমিই বসলাম এবারে। ঋজুদা পাশে বসে ম্যাপটা হাঁটুতে ছড়িয়ে। ভুষুণ্ডা ঋজুদার পিছনে বসে ঋজুদার কাঁধের উপর দিয়ে ম্যাপটা দেখছিল। বুঝতে পেরে ঋজুদা বলল, "ম্যাপটা ভাল করে বুঝে নাও ভুষুণ্ডা। এর পরেও রাস্তা ভুল হলে কিন্তু তোমার নামে সেরোনারাতে আমি রিপোর্ট করতে বাধ্য হব।" বলে, ম্যাপটাকে ভুষুণ্ডার হাতে তুলে দিল।

ভুষুণ্ডা কথা না বলে, ওর পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে গম্ভীর মুখে ধরিয়ে, ম্যাপটাকে হাতে নিল।

ট্রেলারে জলের ড্রামের সঙ্গে পেট্রলের জেরিক্যানের ঠোকা-ঠুকি লেগে টংটং শব্দ হচ্ছিল। ঋজুদা গাড়ি থামাতে বলে নিজে নামল। নেমে টেডিকে বকল। ওরকম করে রেখেছে বলে। তারপর আমিও নেমে ঋজুদা ও টেডির সঙ্গে হাত লাগিয়ে, সব ঠিকঠাক করে রেখে আবার বেঁধে-ছেঁদে নিলাম। ভুষুণ্ডা ম্যাপ দেখছিল। নামল না।

ঋজুদার কথামতো কম্পাসের কাঁটা দেখে চালিয়ে মাইল দশেক আসার পর যেন একটা পায়ে-চলা পথের মতো দেখা গেল ঘাসের মধ্যে মধ্যে। সবসময় যে ব্যবহার করা হয় এমন নয়। তবে ঘাসের চেহারা, রঙ আর আশেপাশের চিহ্ন দেখে মনে হয় এইখান দিয়ে মাঝে-মাঝে মানুষ পায়ে হেঁটে যাওয়া-আসা করে।

ঋজুদা বলল, ঐ পথের চিহ্নকে দু'চাকার মধ্যে রেখে গাড়ি চালাতে।

সেইমতোই চালাতে লাগলাম।

একটু আগে একদল বুনো কুকুরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তারা প্রথমে গাড়ির দিকে দৌড়ে এসেছিল। পরে, কী ভেবে আবার ফিরে গেল। আফ্রিকার জঙ্গলে এমন হিংস্র জানোয়ার আর নেই। আমাদের দেশেও নেই।

আজ অন্য কোনো জানোয়ারই দেখলাম না মারিয়াবে থেকে রওনা হবার পর। বুনো কুকুর যে অঞ্চলে থাকে সেখান থেকে অন্য সব জানোয়ার পালিয়ে যায় শুনেছিলাম। মনে হল, সেই কারণেই বোধহয় কোনো জানোয়ারের টিকি দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ বুঁউউউ আওয়াজ করে একটা সেৎসী মাছি উড়ে এল জানালার ফাঁক দিয়ে। ভুষুণ্ডা সেৎসীকে দারুণ ভয় পায়। ভয় টেডিও পায়, তবে ভুষুণ্ডার মতো নয়।

ওরা দুজনেই দাঁড়িয়ে উঠে মাছিটাকে যার যার টুপি দিয়ে ধরার এবং মারার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু পারল না। মাছিটা ঠক করে এসে উইন্ডস্ক্রীনে পড়ে, ডানা দুটো নাড়তে লাগল। সেৎসী মাছি যে কী জোরে ডানা নাড়ে এবং একটা ডানার উপর দিয়ে অন্য ডানাটা কীভাবে ঘুরোয় তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

ঋজুদা গোর্খা টুপি দিয়ে এক বাড়ি মারতেই মাছিটা নীচে পড়ল।

আমি বললাম, "এবারে তোমরা শান্ত হয়ে বোসো। সেৎসী মরেছে।"

"মরেছে? সেৎসী, অত সহজে?"

বলেই. টেডি হেসে উঠল। বলল, "সেৎসী মাছির দশটা জীবন। একটা নয়।" বলেই, আমার আর ঋজুদার মধ্যে দিয়ে

ঝুঁকে আমাদের পায়ের কাছে পড়ে থাকা মাছিটাকে তুলে নিয়ে তার ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা করল টেনে। তারপর বলল, "এইবার বলা চলে যে, বাবু মরেছেন। এর এক সেকেন্ড আগেও বলা যেত না যে মরেছেন। এঁরা সহজ জিনিস নন।"

ঋজুদা আর আমি হাসলাম। মুণ্ডু-ছেঁড়া সেৎসী-হাতে টেডির বক্তৃতা শুনে।

ঋজুদা বলল, "আজ রাত থেকে কিন্তু আমরা খুবই বিপজ্জনক এলাকাতে থাকব। এখানে ওয়াণ্ডারাবো শিকারিরা থাকে। সামনে একটা ছোট্ট লেক আছে। ম্যাপে এই লেকের হদিস নেই। খুব ছোট্ট সোডা লেক। তার চারপাশে লেরাই জঙ্গল। ওয়াণ্ডারাবো শিকারিরা ঐ জঙ্গলের গভীরে লুকিয়ে থাকে এবং শিকার করে। প্রতি শীতে ওরা হাতি গন্ডার এবং অন্যান্য জানোয়ার মারতে আসে। নাইরোবি সর্দার ওদের কথা বলেছে আমাকে।"

আমি বললাম, "ওয়াণ্ডারাবোরা কী দিয়ে হাতি মারে? হেভি রাইফেলস্ ওরা পায় কোথায়?"

ঋজুদা বলল, "রাইফেল দিয়ে তো মারে না, মারে ছোট্ট-ছোট্ট বিষ-মাখানো তীর দিয়ে।"

"ঐ বিষ কোথায় পায় ওরা?"

ঋজুদা বলল, "তুই কখনও জলপাই গাছ দেখেছিস?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ আমার মামা-বাড়ির বাগানেই তো ছিল।"

"জঙ্গলের মধ্যে জলপাইয়ের মতো একরকমের গাছ হয়। এই জাতের সব গাছই যে বিষাক্ত হয় এমন নয়। কিছু-কিছু গাছের এই বিষ থাকে। গাছগুলোকে দেখতে শুকিয়ে-যাওয়া জলপাই গাছের মতো। এদের বটানিকাল নাম অ্যাপোকানথেরা ফ্রিস্টিওরাম। জংলি ওয়ান্ডারাবোরা ঐ গাছের নীচে পিঁপড়ে, কি ইঁদুর বা কাঠবেড়ালিকে মরে পড়ে থাকতে দেখে বুঝতে পারে যে, বিষ আছে। তারপর সেই গাছের ডাল আর শেকড়-গুলো সেদ্ধ করে কাথ বানিয়ে, ঘন করে তাই বিক্রি করে দেয় ওরা চোরা-শিকারিদের কাছে। এই গাছে লাল গোল - গোল ফল হয়। তা দিয়ে খুব ভাল জ্যামও তৈরি হয়। জানিস? জ্যাম তো তোর প্রিয়।"

হঠাৎ ঋজুদা চেঁচিয়ে উঠল, "সাবধান, সাবধান!"

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, একটা বিরাট দুখড়্গা গণ্ডার জোরে ছুটে আসছে ডান দিক থেকে আমাদের গাড়ি লক্ষ্য করে। গাড়ির পেছনে ট্রেলার থাকায় খুব একটা জোরে গাড়ি চালানো যায় না। গণ্ডারের হাত থেকে বাঁচার মতো জোরে তো নয়ই। গণ্ডারটার কী হল, কে জানে। কোথা থেকে যে হঠাৎ উদয় হল তাও আশ্চর্য! ঘাসের মধ্যে কি শুয়ে ছিল?

ঋজুদাকে রীতিমত চিন্তিত দেখাল। আবার বলল, "সাবধান রুদ্র, খুউব সাবধান!"

গন্ডারটা তখনও পাঁচশো গজ দূরে ছিল।

ঋজুদা তাড়াতাড়ি নেমে রাইফেলটা তুলে, ভয় দেখাবার জন্যেই চার-পা-তুলে-ছুটে-আসা গণ্ডারটার পায়ের সামনে মাটিতে একটা গুলি করল। ধুলোঘাস সব ছিটকে উঠল, কিন্তু গণ্ডার ভয় পেল না।

ঋজুদা তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বলল, "গাড়ির মুখটা ওর দিকে ঘোরা তো! শিগগিরি।"

আমি স্টীয়ারিং ঘুরিয়ে, খুব জোরে এঞ্জিনকে রেস্ করালাম আর যত জোরে পারি ডাবল-হর্ন একসঙ্গে বাজিয়ে দিয়ে ওর দিকেই এগিয়ে চললাম। এত দিনের মধ্যে এই প্রথম হর্ন বাজালাম গাড়ির। গণ্ডারটা তো জোরে দৌড়ে আসছিলই, আমিও ঐদিকে জোরে গাড়ি চালিয়ে দিলাম। মুহূর্তের মধ্যে গাড়িটা আর গণ্ডারটা একেবারে মুখোমুখি এসে গেল। উইন্ডস্ক্রীন তুলে, তার ফাঁক দিয়ে রাইফেল বের করে ঋজুদা তৈরি হয়ে ছিল। নিজেদের বাঁচাতে হলেই একান্ত গুলি করবে, নইলে নয়।

আমিও যেমন ধুলো উড়িয়ে হঠাৎ ব্রেক করে গাড়িটাকে দাঁড় করালাম, গন্ডারটাও তার গাব্দাগোব্দা খুরের পায়ের ব্রেক কষিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। কান দুটো খাড়া, নাকের উপর পর-পর দুটো খড়্গ, গায়ের চামড়া দেখে মনে হয় যেন কোনো স্থপতি কালচে-লালচে পাথর খোদাই করে থাকে-থাকে তৈরি করেছেন তাকে। তার চোখ দুটো তাকিয়ে আছে আমার চোখের দিকে। আগে হর্ন বাজিয়েছিলাম, এঞ্জিন রেস্ করেছিলাম, এখন শুধু অ্যাকসিলারেটরে পা ছুঁইয়ে এঞ্জিন স্টার্টে রাখলাম।

ঋজুদা রাইফেলের ফ্রন্টসাইট আর ব্যাকসাইটের মধ্যে চোখ লাগিয়ে রাইফেলটা ধরে আছে গণ্ডারটার কপাল তাক করে। সকলে চুপ, স্তব্ধ; কী হয় কী হয় ভাব।

ঠিক সেই সময় টেডি হঠাৎ বলে উঠল, "একটু নস্যি দিয়ে দেব ওর নাকে? নস্যি নাকে গেলেই সঙ্গে-সঙ্গে পালাবে ব্যাটা।" বলেই বাঁ হাতের তেলোতে তার চ্যাপ্টা কৌটো থেকে নস্যি ঢেলে, আমার আর ঋজুদার মধ্যের ফাঁক দিয়ে গলে উইণ্ডস্ক্রীনের মধ্যে দিয়ে, শরীরের অর্ধেকটা সড়াত করে বের করে গন্ডারের নাক লক্ষ্য করে হাতের তেলোতে ফুঁ দিতে গেল।

কিন্তু ওর কোমরের বেল্ট ধরে, এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে ঋজুদা বলল, "টেডি!"

টেডি টানের চোটে পিছিয়ে এল।

ঋজুদা গম্ভীর গলায় বলল, "ঐ দ্যাখো।"

বলতেই, গণ্ডারটা আস্তে-আস্তে ঘুরে আমাদের দিকে পিছন ফিরল। পিছন ফিরতেই দেখি লেজটা তুলে আছে গণ্ডারটা, আর তার ঠিক লেজের নীচে একটা এক-ফুটের মতো লম্বা তীর গাঁথা।

গণ্ডারটা আমাদের সকলের চোখের সামনে কয়েক পা হেঁটে গেল উল্টোদিকে। তারপর কয়েক পা হেঁটে গিয়েই ধপ্ করে পড়ে গেল মুখ থুবড়ে।

আমরা গাড়ি ছেড়ে সকলেই নামলাম। টেডি নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল, "ওয়াণ্ডারাবো। ওয়াণ্ডারাবো।"

অতবড় একটা জানোয়ার, কত তার গায়ে জোর, তাকে ওয়াণ্ডা-রাবো শিকারি তার শরীরের সবচেয়ে নরম জায়গাতে বিষ-তীর মেরে ঘায়েল করেছে।"

টেডি গিয়ে গণ্ডারটার সামনে দাঁড়াতেই, সে একবার ওঠবার শেষ চেষ্টা করল। কিন্তু তারপরই শেষবারের মতো শুয়ে পড়ল ধুলো উড়িয়ে।

গণ্ডারটার ওজন আমাদের ল্যান্ড-রোভারটার চেয়েও বেশি হবে। তার খড়্গ কেটে বিক্রি করলে, সেই খড়্গ গুঁড়ো করে কারা কোন্ ওষুধ বানাবে—তাই তাকে মরতে হল এক-আকাশ রোদ আর হাওয়ার মধ্যে।

তারপর অনেকক্ষণ আমরা সকলে চুপ করে থাকলাম। হয়তো না-জেনেই, মরে-যাওয়া গণ্ডারটাকে সম্মান জানাবার জন্যে।

টেডি বলল, "ওয়াণ্ডারবোরা কাছেই আছে। এই তীর বেশি-ক্ষণ আগে ছোঁড়েনি।" বলেই, উঠে গিয়ে গন্ডারটার চারপাশে ঘুরে ভাল করে বুঝে নিয়ে, বাঁ হাতে গন্ডারের লেজটা তুলে, ডান হাত দিয়ে একটানে তীরটা বের করে নিয়ে এল।

ঋজুদা সেটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে একটা টেস্ট-টিউবে তীরের গায়ে লাগা বিষমেশা রক্ত রেখে, টিউবটাকে তুলোয় জড়িয়ে একটা বাক্সে রাখল সেটাকে।

গণ্ডারটা ওখানেই পড়ে রইল। ওয়াণ্ডারাবো শিকারিরা ওকে

খ্ঁজে পাবে হয়তো। না-পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাছাড়া, খ্ঁজে পেলেও তারা গাড়ির চাকার দাগ দেখে ভয় পেয়ে এদিকে হয়তো না-ও আসতে পারে। ওরা না এলে, শকুনরা আসবে। প্রথমে, চোখ দুটো ঠুকরে খাবে। তারপর রোদে, হাওয়ায় গণ্ডারের ঐ শক্ত চামড়াও গলে যাবে একদিন। দিনে রাতে শকুনের শেয়ালের আর হায়নার ভোজ হবে এখানে।

আমাদের সকলেরই মন খারাপ হয়ে গেল ভীষণ। ভুষুণ্ডা বলল, "এখানেই কাছাকাছি আমরা আজ ক্যাম্প করে থাকলে ওয়াণ্ডারাবোদের সঙ্গে দেখা হতে পারে। গণ্ডার যখন মেরেইছে, তখন তার খড়্গ না-কেটে তারা ফিরে যাবে না নিশ্চয়ই। তারা পায়ের দাগ দেখে-দেখে এখানে এসে পৌঁছবেই।"

ঋজুদা কী একটু ভাবল। তারপর বলল, "নাঃ থাক। আমরা এগিয়ে যাব।"

টেডি এক-নাক নস্যি নিল গণ্ডারটার পিঠের উপর থেবড়ে বসে।

ঋজুদা পাইপ ধরিয়ে বলল, "রুদ্র, ওই রাইফেলটা গণ্ডারের গায়ে শুইয়ে রেখে পোজ দিয়ে দাঁড়া, আমি একটা ছবি তুলি তোর। ছবির নীচে লিখে দেব ঃ মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার। কী বলিস?"

আমি বললাম, "মোটেই না।"

ঋজুদা বলল, "এখনও ভেবে দ্যাখ, একটা দারুণ চান্স ছিল কিন্তু কলকাতায় ফিরে বন্ধুদের গুল মারবার। ছবি থাকলে তো আর তাদের বিশ্বাস না-করে উপায় নেই?"

আমি বললাম, "ছবি তুলে দাও, তবে খালি হাতে। এই বেচারি গণ্ডারটার একটা ছবি থাকুক আমার কাছে।"

ভুষুণ্ডা সিগারেটে টান লাগিয়ে ঋজুদাকে বলল, "এইখানেই ক্যাম্প করার কথাটা আরেকবার ভেবে দেখলে পারতেন!"

ঋজুদা বলল, "দেখেছি ভেবে। চলো, এগিয়েই যাই।"

ভুষুণ্ডা গররাজি গলায় বলল, "আপনি যা বলবেন।"

গণ্ডারটাকে ওখানে ফেলে রেখেই আবার রওনা হলাম।

গাড়ি চালাতে চালাতে আমি ভেবেছিলাম, অজানা কোনো কারণে ঋজুদা আর ভুষুন্ডার মধ্যে কেমন যেন বনিবনার অভাব হচ্ছে। ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগছে না আমার।

ঘণ্টা-দেড়েক গাড়ি চালাবার পর দূরে লেরাই জঙ্গলের আভাস ফুটে উঠল। এদিকে সেৎসী মাছি বেশি। কিন্তু লেরাই জঙ্গল দেখতে খুব ভাল। এই অ্যাকাসিয়া গাছগুলোর গা আর ডালপালা একটা মিষ্টি হলদে-সবুজ রঙের হয়। মনে হয়, শ্যাওলা পড়েছে। কিন্তু তা নয়, গাছের রঙই ও-রকম। সোয়াহিলিতে বড় বড় হাত-ছড়ানো অ্যাকাসিয়া গাছগুলোকে বলে মিগুংগা। আর হলুদ মিগুংগা হলে বলে লেরাই। লেরাই-জঙ্গল জলের কাছাকাছি হয়। তাই যেখানেই লেরাই-জংগল থাকে, তার আশেপাশে অন্যান্য নানারকম জঙ্গলও থাকে। জন্তু-জানোয়ারের ভিড়ও থাকে। অ্যাকাসিয়া অনেকরকমের হয়। ঋজুদা বলছিল। ছাতার মতো অ্যাকাসিয়াগুলোকে বলে আম্ব্রেলা অ্যাকাসিয়া। তাছাড়া আছে অ্যাকাসিয়া টরটিলিস। গাম্মিফ্লোরা। অ্যাকাসিয়া অ্যাবিসিনিকা। অ্যালবিজিয়া বলে একরকমের গাছ আছে, পাঁচ-দিন আগে দেখেছিলাম, সেগুলোর পাতাগুলোই কাঁটার মতো। ওয়েট-আ-বিট থর্ন নামেও একরকমের কাঁটাগাছ হয় এখানে।

দুপুরের খাওয়ার জন্যে কোথাও থামিনি আমরা।

বিকেল চারটে নাগাদ লেরাই-জঙ্গলের কোলে পোঁছে গেলাম। ঋজুদা গাছ-গাছালির ফাঁকে ফাঁকে দূরের লেকটাকে দেখল। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম সেদিকে। এ-রকম কোনো কিছুই দেখিনি এর আগে। লেকটার আশপাশের ডাঙা অদ্ভুত নীলচে ও ছাই-রঙা। জল নেই বেশি, কিন্তু জল যেখানে আছে সেই দিকেও তাকানো যায় না, জলের ঠিক কাছাকাছি এমন উজ্জ্বল চকচকে কাচের মতো কোনো জিনিসের আস্তরণ পড়ে রয়েছে যে, চোখ চাওয়া যায় না। চোখে ধাঁধা লাগে। মনে হয়, বরফ পড়েছে বুঝি।

তাঁবু খাটিয়ে টেডি রান্নার বন্দোবস্ত করতে লাগল। আমি আর ঋজুদা জায়গাটা ভাল করে দেখার জন্যে বেরোলাম।

ঋজুদা বলল, "রাইফেলটা সঙ্গে নিয়ে নে।"

ভুষুন্ডা বলল, "আমি কি সঙ্গে যাব?"

ঋজুদা বলল, "না! তুমি তার চেয়ে বরং টেডির কাছেই থাকো। বন্দুক রেখো হাতের কাছে।"

তাঁবু থেকে এখন আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি।

হঠাৎ সামনে পথের বাঁকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে চমৎকার কারু-কাজ-করা শিংওয়ালা খয়েরি-রঙা একদল হরিণ দেখলাম। এই হরিণ কখনও দেখিনি আফ্রিকাতে আসার পর। দিনের শেষ রোদ পশ্চিম থেকে গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে এসে পড়েছে হরিণগুলোর গায়ে। কী চমৎকার যে দেখাচ্ছে!

আমাদের দেখতে পেয়েই হরিণগুলোর চমক ভাঙল। ছত্রভঙ্গ হয়ে ওরা লাফাতে-লাফাতে চলে গেল পুবের অন্ধকারে। ওরা যখন তাড়াতাড়ি দৌড়ে যাচ্ছিল, তখন মনে হচ্ছিল, ওরা যেন উড়ে যাচ্ছে।

ঋজুদা বলল, "এদের নাম ইম্পালা।"

এই ইম্পালা! কত পড়েছি এদের কথা!

গতকাল রাতে যে ছোট জানোয়ারটা উড়ে-লাফিয়ে চলছিল, যার চোখ জ্বলেনি সামনে থেকে, কিন্তু পাশ থেকে একটা চোখ টর্চের আলোয় জ্বলেছিল, সেই জানোয়ারটা কী জানোয়ার তা ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করলাম।

ভাল করে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ঋজুদা তার বিবরণ জানল আমার কাছ থেকে। তারপর হেসে বলল, "বুঝেছি, বুঝেছি। ওগুলো হচ্ছে লাফানো-খরগোশ। আসলে কিন্তু ওড়ে না, এমন করে লাফায়, যেমন এই ইম্পালারাও লাফায়, যেন মনে হয় উড়েই যাচ্ছে। আমাদের দেশে ফ্লাইং-স্কুইরেল আছে, কিন্তু সে-কাঠবিড়ালি সত্যিই ওড়ে। লাফানি-খরগোশ শুধু লাফায়ই। আর ঐ আরেকটা মজা। ওদের চোখে এমন কোনো ব্যাপার আছে যে, সামনে থেকে অন্ধকারে আলো ফেললে একটা চোখও জ্বলে না। অথচ পাশ থেকে ফেললে সেই পাশের চোখটা জ্বলে ওঠে। এইরকম খরগোশ শুধু এখানেই দেখা যায়।"

আমরা যখন হাঁটছিলাম, তখন এদিকে-ওদিকে, মাটিতে, ভাল করে নজর করে যাচ্ছিলাম। শুধু জংলি জানোয়ার নয়, তাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি হিংস্র ওয়ান্ডারাবো শিকারিরা এ জঙ্গলে আছে। আড়াল থেকে একটি বিষ-মাখানো তীর ছুঁড়ে দেবে, ব্যস্-স্—টলে পড়ে যেতে হবে। গন্ডারটার প্রচন্ড প্রাণশক্তি, তাই বেঁচে ছিল অনেকক্ষণ। মানুষদের মারলে সঙ্গে সঙ্গেই শেষ।

একটা ঝাঁকড়া ওয়েট-আ-বিটথর্ন গাছের নীচে ছোট্ট একটি বাদামি হরিণছানা দাঁড়িয়ে ছিল। ঋজুদা দেখতে পায়নি। আমি ঋজুদার হাতে হাত দিয়ে ঐদিকে দেখালাম। ফিসফিস করে বললাম, "দ্যাখো দ্যাখো, কী সুন্দর হরিণছানাটা।"

ঋজুদা ভাল করে দেখে বলল, "এটা হরিণছানা নয় রে, এ এক জাতের হরিণ। ওরা বড় হয়েও ঐটুকুই থাকে। ওড়িশার জঙ্গলে কতবার তো মাউস-ডিয়ার দেখেছিস। এগুলো ঐরকমই। এদের নাম ডিক্-ডিক্। এই জাতের হরিণ কেবল আফ্রিকাতেই পাওয়া যায়।

মনে-মনে উচ্চারণ করলাম দুবার। ডিক্-ডিক্। কী সুন্দর নামটা।

আলো পড়ে আসছিল। ঋজুদা বলল, "এখন আর দেরি না-করাই ভাল। তাঁবু থেকে মাইল খানেক চলে এসেছি। চল, এখন ফিরে যাই। কাল আমরা চান করব লেকে এসে, কী বল?"

আমি বললাম, "দারুণ হবে।" শেষ চান করেছিলাম সেরোনারাতে। কত্ত দিন আগে।

আমরা ফেরবার সময় অন্য রাস্তায় এলাম। এ-রাস্তাটাও লেকের পাশ দিয়েই গেছে, তবে আরো গভীরে গভীরে। সামনেই একটা বাঁক। বাঁকের মুখটাতে আসতেই আমার মনে হল একটা লোক যেন পথ থেকে জঙ্গলে সরে গেল। ঋজুদা পশ্চিমে তাকিয়ে দারুণ আফ্রিকান সূর্যাস্ত দেখছিল, অ্যাকাসিয়া গাছের পটভূমিতে লাল-হওয়া আকাশে।

হঠাৎ ঋজুদা মুখ ঘুরিয়ে বলল, "কোনো মানুষ জঙ্গলের মধ্যে দৌড়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। তুই শব্দ পাচ্ছিস?"

আমি কান খাড়া করে শুনবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুই শুনতে পেলাম না।

ঋজুদা রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে হাতে নিল।

যেখান থেকে লোকটাকে সরে যেতে দেখেছিলাম, সেইখানে এসে পৌঁছতেই নরম মাটিতে তার পায়ের দাগ দেখা গেল। প্রকান্ড দুটি পায়ের ছাপ। ছাপের গভীরতা দেখে মনে হচ্ছে লোকটা অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পথের বাঁ দিকে কোনো জিনিসকে লক্ষ করছিল।

বাঁ দিকে মুখ তুলতে যাচ্ছিলাম। ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, "লোকটা যেদিকে গেছে সেই দিকে তুই রাইফেল তুলে রেডি হয়ে খুব সাবধানে দ্যাখ। কিছু দেখতে পেলেই আমাকে বলিস।"

আমি ঐদিকটা দেখছি।

একটু পর ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, "দ্যাখ রুদ্র, এদিকে দ্যাখ।"

ঋজুদার কথামতো ঐদিকে তাকিয়ে দেখলাম, পথ থেকে হাত-দশেক উপরে একটা মিগুংগা গাছের দুটো ডালের মাঝখানে রক্তাক্ত ইম্পালা হরিণের আধখানা শরীর ঝুলছে। আর সেই গাছের উপরেই, অন্য দুটি ডাল যেখানে মিলেছে সেইখানে পথের দিকে পিছন ফিরে বসে একটি প্রকান্ড চিতাবাঘ, তার মুখে সেই হরিণের মাংস। চিতাটার পিঠে একটা তীর গেঁথে আছে।

আমরা আর-একটু এগিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখলাম। চিতাটা ততক্ষণে মরে গেছে। কিন্তু মরে গেলেও গাছ থেকে পড়ে যাচ্ছে না। এমনভাবে দুটি ডালের মাঝখানে তার শরীর আটকে আছে যে, পড়ে যাবেও না।

আমি বললাম, "লোকটা যদি আমাদের দেখে থাকে?"

ঋজুদা বলল, "তুই তো দেখেছিস এক ঝলক। কেমন দেখতে বল তো?"

আমি বললাম, "দারুণ লম্বা, সবুজ আর লাল ছোপ-ছোপ কাঙ্গার মতো লুঙ্গি পরা, গায়ে সবুজ চাদর, হাতে তীর-ধনুক।"

ঋজুদা উত্তেজিত হয়ে গেছিল, বলল, "তোকে দেখেছিল?"

বললাম, "মনে হয় না। ও বোধহয় এমনিতেই দৌড়ে চলে যাচ্ছিল।"

ঋজুদা বলল, "ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি আয়। আর কথা-বার্তা বলিস না।"

আমরা যখন তাঁবুর কাছে এলাম তখন অন্ধকার প্রায় নেমে এসেছে। তার সঙ্গে শীতটাও। টেডি খুব বড় করে আগুন জেলেছে। এখানে শুকনো কাঠকুটোর অভাব নেই কোনো। আগুনের আভায় চারদিক লাল হয়ে উঠেছে।

আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন টেডির কফি তৈরি। বিস্কুট আর কফি দিল ও আমাদের। রান্নাও চড়িয়ে দিয়েছে। আজও উগালি।

ভুষুন্ডাকে কিন্তু দেখা গেল না কোথাও। ঋজুদা জিজ্ঞেস করাতে টেডি বলল, "সে তো আপনাদের পিছনে-পিছনেই গেল। কেন, দেখা হয়নি?"

কিছুক্ষণ পর একটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল। এবং তারও কিছুক্ষণ পর দুটি বড় বড় ফেজেন্ট হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে এল ভুষুন্ডা। এসে বলল, "ওয়াইল্ডবীস্ট আর গ্রান্টস গ্যাজেল খেয়ে খেয়ে মুখে অরুচি ধরে গেছিল। তাই আনলাম। এক্ষুনি ছাড়িয়ে দিচ্ছি, রোস্ট করবে টেডি।"

ঋজুদা বলল, "ভুষুন্ডা, তুমি ভালভাবেই জানো যে, এখানে চোরা-শিকারিরা আছে, তবুও তুমি গুলি করলে কেন আমাকে

জিজ্ঞেস না করে? এটা কি শিকার করার সময়, না জায়গা? গুলির শব্দ শুনলেই তো ওরা সব সরে যাবে, সাবধান হয়ে যাবে। তাতে তো আমাদেরই বিপদ। এ-কথা কি তোমাকে শেখাতে হবে? তুমি এসব জানো না তা তো নয়।"

ভুষুন্ডা লজ্জিত হয়ে বলল, "সরি। আমি অতটা ভাবিনি। আপনাদের খাওয়ার যাতে কষ্ট না হয় সেই ভেবেই মেরেছিলাম।"

ঋজুদা বলল, "আফ্রিকার বন-বাদাড়ে এত কষ্ট করে আমরা খাওয়ার সুখ করতে আসিনি। আমাদের দেশে আমরা ভাল-মন্দ খেতে পাই। সেরোনারাতে, গোরোংগোরোতে অথবা ডার-এস-সালাম বা আরুশাতে গেলেও খেতে পাব। ভবিষ্যতে তুমি এসব কোরো না। তাছাড়া তুমি আমাদের সঙ্গে এসেছ বিশেষ কারণে। আমাদের খাওয়ার কষ্ট নিয়ে তোমার চিন্তা না-করলেও চলবে।"

তারপরই কথা ঘুরিয়ে ঋজুদা বলল, "এসো তো দেখি, এই জঙ্গলের আর লেকের একটা ম্যাপ বানিয়ে ফেলি দুজনে আগুনের পাশে বসে।"

ভুষুন্ডা ছুরি হাতে করে উবু হয়ে বসে ফেজেন্ট দুটোর পালক ছাড়াতে-ছাড়াতে বলল, "কী হবে ম্যাপ দিয়ে? এই জঙ্গল আমার মুখস্থ। কাল আমি চোরা-শিকারিদের ডেরায় নিয়ে যাব আপনাদের। একেবারে হাতে-নাতে ধরিয়ে দেব। তাহলেই তো হল। তবে খুব সাবধানে যাবেন। তীর মারতে ওদের সময় লাগে না।"

ঋজুদা একাই ম্যাপ বানাতে বসে গেল, কফি খেতে খেতে।

তারপর ভুষুন্ডার দিকে চেয়ে বলল, "ওয়ান্ডারাবোদের ভয় আমাকে দেখিও না। কোনো-কিছুর ভয়ই দেখিও না।"

ভুষুন্ডা যেন একটু অবাক হল। তারপর ঋজুদাকে বলল, "আপনার সাহস সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই কোনো। আপনার মতো সাহসী লোক কমই আছে।"

ঋজুদা চুপ করে গেল।

ভুষুন্ডার কথাটাতে, মনে হল, একটু ঠাট্টা মেশানো ছিল।

কফিটা শেষ করেই ঋজুদা বলল, "কাল পায়ে হেঁটে জঙ্গলে ঢুকব।"

ভুষুন্ডা মুখ না-ঘুরিয়েই বলল, "তাই-ই হবে। কাল ওয়ান্ডারাবোদের সঙ্গে মোলাকাত হবে আপনার।"

ঋজুদা বলল, "ক্যাম্পে থাকবে টেডি। লাঞ্চ বানিয়ে রাখবে সকলের জন্যে।"

টেডি বলল, "সে কী? আমিও সঙ্গে যাব। আমিও যাব।"

ঋজুদা মুখ নিচু করে কম্পাস আর কাগজ-পেনসিল নিয়ে কাজ করতে করতে বলল, "আমি যেমন বলেছি, তেমনই করবে। আমার কথা অমান্য করবে না কেউ। বুঝেছ?"

টেডি মুখ নিচু করে বলল, "বুঝেছি।"

ভুষুন্ডা টেডির দিকে মুখটা একটু ফেরাল। আগুনের আভায় মনে হল, ভুষুন্ডার মুখে এক অদ্ভুত হাসি লেগে আছে।

আমার, কেন জানি না, বড়ই অস্বস্তি লাগছে। কিছু একটা ঘটবে।

কিছুতেই ঘুম আসছিল না।

তীর-খাওয়া গন্ডারটা আর বড় চিতাবাঘটার কথা বার-বার মনে পড়ছিল আমার। আমার গায়ে তীর লাগলে কী হবে তাই-ই ভাবছিলাম। মানুষদের তীর মারলে কোথায় মারে ওয়ান্ডারাবোরা? যে-কোনো জায়গাতে মারলেই হল। রক্তের সঙ্গে তীরের ফলার যোগাযোগ ঘটলেই কাজ শেষ। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তে হবে। ওদের তীরগুলো কিন্তু ছোট ছোট। ছ' ইঞ্চি থেকে এক ফুট।

একবার মনে হল, কেন যে বাহাদুরি করতে এলাম এই আফ্রিকাতে! না এলেই ভাল হত!

টেডি আজ আগুনের পাশে বসে ফেজেন্টের রোস্ট বানাতে-বানাতে পিগমিদের গল্প বলছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট্ট মানুষ ওরা। গভীর জঙ্গলে পাতার কুঁড়েতে থাকে। আফ্রিকার কঙ্গো নদীর অববাহিকার জঙ্গলে পিগমিদের সঙ্গে টেডি ছিল অনেকদিন এক জার্মান সাহেবের সঙ্গে শিকারে গিয়ে। পিগমিদের সবচেয়ে বড় দেবতা খনভাম-এর কথা বলছিল ও।

তাঁবুর বাইরে লেকের দিক থেকে ও জঙ্গলের গভীর থেকে নানা অচেনা জন্তু-জানোয়ার এবং রাত-চরা পাখিদের ডাক ভেসে আসছিল। তারা আমার অচেনা বলেই ভয় করছিল। আমাদের দেশ হলে এইরকম ভয় করত না। কাছেই লেক আছে বলে এখানে ঠান্ডাও অনেক বেশি। কম্বলটা ভাল করে গুঁজে নিলাম পিঠের নীচে।

টেডি বলছিল প্রতিদিন যখন সূর্য মরে যায়, তখন খনভাম একটা বিরাট থলের মধ্যে তারাদের টুকরো-টাকরাগুলো সব ভরে নেন, তারপর সেই তারাদের টুকরোগুলো নিভে যাওয়া সূর্যের মধ্যে ছুঁড়ে দেন, যাতে সূর্য পরদিন ভোরে আবার জ্বলে ওঠে তার নিজের সমস্ত স্বাভাবিক উত্তাপের সঙ্গে।

খনভাম আসলে একজন শিকারি। শিকারি পরিচয়টাই তাঁর আসল পরিচয়। বিরাট দুটো সাপকে বেঁধে তাঁর ধনুক তৈরি করেছিলেন তিনি। বৃষ্টি-শেষে যখন আকাশে রামধনু দেখি আমরা —আসলে সেটা রামধনু নয়, খনভামের ধনুক। পৃথিবীর মানুষদের কাছে খনভাম কোনো ছোট জানোয়ারের রূপ ধরে দেখা দেন, নয়তো হাতি হয়ে। আকাশে যে বাজের শব্দ শুনি আমরা, সেটাও আসলে বাজ নয়। খনভাম কথা বললে ঐরকম আওয়াজ হয়। খনভামের গলার স্বরই বাজপড়ার শব্দ।

দারুণ লাগছিল আমার। কিন্তু আগুনের পাশে বসে টেডির গল্প শুনতে-শুনতে আমার গা-ছমছমও করছিল। কঙ্গো উপত্যকার অন্ধকার গভীর জঙ্গল, যেখানে গোরিলারা থাকে, খনভামও থাকেন, সেখানেই যেন চলে গেছিলাম।

খনভামের চেলা আছেন অনেক। তাঁরা সব নানা দৈত্য-দানো। সন্ধ্যের পর পিগমিদের পাতার কুঁড়ের সামনে আগুন জ্বালিয়ে বসে আজকের রাতের মতোই এইসব দৈত্য-দানোর গল্প করত পিগমিদের সঙ্গে টেডি, তার সাহেবের জন্যে রান্না করতে করতে। এখন যেমন আমাদের জন্যে করছে।

একরকমের দানো আছেন, তাঁর নাম গুগুনোগুম্বার। তিনি কেবল আস্ত-আস্ত গিলে খান ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের। আরেকজন বামন-দানো আছেন, তাঁর নাম ওগরিগাওয়া বিবিকাওয়া। তিনি সাপের বা অন্য কোনো সরীসৃপের মূর্তি ধরে দেখা দেন।

তাঁবুর মধ্যে ক্যাম্পখাটে শুয়ে শুয়ে এসব ভাবছি। বাইরে আগুনটা পটপাট করে জ্বলছে। একরকমের পোকা উড়ছে অন্ধকারে আশ্চর্য একটানা মৃদু ঝরঝর শব্দ করে। মনে হচ্ছে, যেন দূরে ঝর্না বইছে কোনো। আকাশে একটু চাঁদ উঠেছে। ফিকে চাঁদের আলো তাঁবুর দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে এসে পড়েছে। দরজাটা দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে। ঋজুদা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমার চোখে ঘুম নেই। টেডি একা শুয়েছে অন্য তাঁবুতে। ভুষুন্ডা গাড়ির মধ্যে কাচটাচ বন্ধ করে। যেমন রোজ শোয়।

হঠাৎ খুবই কাছ থেকে একটা সিংহ ডেকে উঠল দড়াম

করে। তারপরই শুরু হল সাংঘাতিক কান্ড। চারদিক থেকে প্রায় গোটা আটেক সিংহ তাঁবু দুটোকে ঘিরে প্রচন্ড হুমহাম শুরু করে দিল। ট্রেলারের উপরে ত্রিপল-ঢাকা গ্রান্টস গ্যাজেল আর ওয়াইল্ডবীস্ট-এর স্মোক করা মাংস ছিল। সেগুলোর গন্ধ পেয়ে ওরা ট্রেলারের উপর চড়ে বসল। ওদের থাবাতে চচ্চড় শব্দ করে ট্রেলারের উপরের ত্রিপল ছিঁড়ে গেল শুনতে পেলাম। চতুর্দিকে সিংহ ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রচন্ড গর্জন করতে-করতে, আমাদের আর তাদের মধ্যে তাঁবুর পাতলা পর্দা শুধু। বেচারি টেডি কি বেঁচে আছে? না সিংহরা তাকে খেয়েই ফেলল! কিন্তু টেডির কাছে তো বন্দুক আছে, সে গুলি করছে না কেন?

চেঁচামেচিতে ঋজুদার ঘুম চটে গেল। সত্যি! কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোয় ঋজুদা।

আমি ভাবলাম, ঋজুদা উঠে আমাকেও উঠিয়ে নিয়ে সিংহ মারবে এবং তাড়াবে। এবং এই ফাঁকে কম্বলের তলায় শুয়ে শুয়ে আমার জীবনের প্রথম সিংহ-শিকার হয়ে যাবে। কিন্তু ঋজুদা উঠে বোতল থেকে একটু জল খেল, তারপর আবার কম্বলের মধ্যে ঢুকতে-ঢুকতে বলল, "ব্যাটারা বড় জ্বালাচ্ছে তো।" বলেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি হাঁ করে একবার ঋজুদার দিকে তাকিয়ে তারপর ক্যাম্প-কটে সোজা হয়ে উঠে বসে, আবার হাঁ করে তাঁবুর ফাঁক-করা দরজা দিয়ে সজাগ চোখে চেয়ে রইলাম।

একটা প্রকান্ড সিংহের মাথা তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম। এ কী? সে যে তাঁবুর ভিতরে কী আছে তা ঠাহর করে দেখছে ভিতরে উঁকি মেরে। মানুষের গন্ধ পেয়েছে নিশ্চয়ই। তাড়াতাড়ি রাইফেল বাগিয়ে ধরে আমি সেইদিকেই চেয়ে রইলাম। কিন্তু সিংহটা সরছেই না। থাবা গেড়ে গ্যাঁট হয়ে বসে হেঁড়ে মাথাটা তাঁবুর দরজায় লাগিয়ে রেখে দেখছে আমাকে।

সেই চাউনি আর সহ্য করতে না পেরে আমি পাঁচ ব্যাটারির বড় টর্চটা জ্বেলে তার মুখে ফেললাম। আগুনের ভাঁটার মতো চোখ দুটো জ্বলতে লাগল আলো পড়ে। আর ঠিক সেই সময় 'মর, হতভাগা' বলে, ঋজুদা তার এক পাটি চটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে সোজা সিংহটার নাক লক্ষ করে ছুঁড়ে দিল।

নাকের উপর সোজা গিয়ে লাগল চটিটা। আমার হৃৎপিন্ড থেমে গেল। রাইফেল-ধরা হাত ঘেমে উঠল। কিন্তু সিংহরাজ ফোঁয়াও করে একটা ছোট্ট হঠাৎ-আওয়াজ করেই পরক্ষণেই ক্রমাগত হুঁয়াও হুঁয়াও করে ডাকতে ডাকতে সরে গেল।

কতক্ষণ যে ওরা ছিল জানি না। শেষকালে সিংহের ডাকের মধ্যেই, মানে ডাক শুনতে শুনতেই, ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। আমার চারপাশে পাঁচ-দশ হাতের মধ্যে এক ডজন সিংহকে ঘুরে বেড়াতে দিয়ে আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গলে যে কেউ তাঁবুর মধ্যে নির্বিকারে ঘুমোতে পারবে একথা আগে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। ধন্য ঋজুদা।

ঘুম ভাঙল শুয়ে-শুয়ে স্টার্লিং পাখিদের কিচিরমিচিরে। লেকের পশ্চিমদিক থেকে ফ্লেমিংগোদের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ফ্লেমিংগো ছাড়া লেকে আর-কোনো পাখি ছিল না। কাল বিকেলেই লক্ষ করেছিলাম।

এই স্টার্লিং পাখিগুলো ভারী সুন্দর দেখতে। উজ্জ্বল নীল, গাঢ় কমলা আর সাদায় মেশা ছোট-ছোট মুঠি-ভরা পাখি। ওরা যেখানেই থাকে, সেখানটাই সরগরম করে রাখে। আমাদের দেশের ময়নার মতো ওরাও খুব নকলবাজ। অন্য যে-কোনো পাখির এবং মানুষের গলার স্বর হুবহু নকল করে ওরা। তাই আফ্রিকাতে অনেকেই বাড়িতে পোষেন এই সুন্দর পাখি।

টেডি বলল, "গুটেন মর্গেন।"

এদিকে জার্মানদের দাপট বেশি ছিল বলে এরা সকলেই ভাঙা-ভাঙা ইংরিজির মতো জার্মানও জানে। গুটেন্ মর্গেন হচ্ছে জার্মান গুড মর্নিং।

আমি বললাম, "গুটেন্ মর্গেন্, তুমি বেঁচে আছো?"

টেডি হেসে বলল, "প্রায় মরে যাবারই অবস্থা হয়েছিল কাল সিম্বাদের জন্যে। রাইফেলধারীরা তো দিব্যি ঘুমোলে। আমার কাছে একটা শটগান। তা দিয়ে ক'টা সিম্বা মারব? আমার পুরো নস্যির কৌটোটা কাল শেষই হয়ে গেছে। হাতের তেলোতে নস্যি রেখে তাঁবুর দরজাজানলা দিয়ে ফুঁ দিয়ে ফুঁ দিয়ে সব নস্যিই শেষ। এখন কী যে করব জানি না।"

ঋজুদা বলল, "কোনো চিন্তা নেই। আমার পাইপের টোব্যাকো গুঁড়ো করে এই লেকের সোডা ক্রিস্টাল নিয়ে গুঁড়ো করে মিশিয়ে নাও, দারুণ নস্যি হয়ে যাবে। তুমি জানো তো, সব-চেয়ে ভাল নস্যি বানাতে এইসব সোডা লেকের কদর কতখানি?"

তারপরই আমাকে তাড়া দিয়ে বলল, "পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা বেরোচ্ছি রুদ্র। এখন গল্প করার সময় নেই। ভুষুন্ডা, তৈরি হয়ে নাও।"

ভুষুন্ডা তার টুপির ব্যান্ডে কতগুলো নীলচে জংলি ফুল লাগাচ্ছিল। বলল, "আমি তৈরিই আছি।"

দেখতে-দেখতে টেডি আমাদের ব্রেকফাস্ট বানিয়ে দিল। ক্রীমক্র্যাকার বিস্কুটের উপর কালকের ভুষুন্ডার মারা ফেজেন্টের লিভার সাজিয়ে সঙ্গে নাইরোবি-সর্দারের-দেওয়া মারিয়াবো-পাহাড়ের ইয়া-ইয়া মোটা কলা। তারপর কফি।

ঘড়িতে তখন ঠিক আটটা বাজে। আমরা সারাদিনের মতো তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ডাইরি, নোট-বই, ক্যামেরা, টেলি-ফোটো লেন্স, রাইফেল, জলের বোতল, দূরবিন—এইসব চাপাল ঋজুদা আমার ঘাড়ে। নিজের ঘাড়েও অবশ্য কম জিনিস উঠল না। হেভি ফোর-ফিফটি ফোর হান্ড্রেড রাইফেলটা টেডির হেপাজতে রেখে দিল ঋজুদা। লাইট থার্টি ও সিক্স ম্যানলিকার শুনার রাইফেলটা পিঠের স্লিং-এ ঝুলিয়ে নিয়েছে। আমার হাতে দিয়েছে শটগান। ভুষুন্ডাকে দিয়েছে খাওয়ার হ্যাভারস্যাক্ আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস।

আমরা রওনা হলাম। সিংগল ফর্মেশানে। টেডি হাত নেড়ে টা-টা করল।

যেতে যেতে ঋজুদাকে ঠাট্টা করে বললাম, "প্রেজেন্টস-প্রেজেন্টস নিয়েছ তো? দেবে না ওদের?"

ঋজুদা ঠাট্টা না-করে বলল, "ওদের সঙ্গে দেখা হলে নিশ্চয়ই দেব। প্রথম দেখা হবে, আর উপহার দেব না? এ কি একটা কথা হল?"

আমি বললাম, "তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু যাদের সঙ্গে প্রথম দেখা নয়, অনেক পুরনো দেখা, তাদের জন্যেও তো কিছু প্রেজেন্ট আনতে পারতে।"

ঋজুদা বলল, "তারা কারা?"

বললাম, "এই যেমন আমি!"

ঋজুদা গম্ভীর মুখে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দারুণ একটা চকোলেট দিল আমাকে।

আমি বললাম, "এটা কী? পেলে কোথায়? এরকম তো কলকাতায় কখনও দেখিনি!"

ঋজুদা বলল, "দেখবার তো কথা নয়। এটা সুইটজারল্যান্ডে তৈরি। তোরই জন্যে ডার-এস-সালামে কিনেছিলাম। ছেলে-মানুষ!"

"ঋজুদা!"

ঋজুদা বলল, "আহা! রাগ করিস কেন? পুরোটা না-হয় না-ই খেলি। অর্ধেকটা আমায় দে।"

আমি চকোলেটটাকে তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজে রেখে, আর দু ভাগ ঋজুদা আর ভুষুণ্ডাকে দিলাম। ঋজুদা নিজের ভাগটা একবারেই মুখে পুরে দিল। কিন্তু ভুষুণ্ডা বলল, ও খাবে না। ফেরত দিল আমাকে।

অসভ্য! আমার খুব রাগ হল। আমিও মাসাই হলে ওর ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দিতাম এতক্ষণে! বেঁচে গেল জোর।

আমরা তখনো একটু ফাঁকায় ফাঁকায় চলেছি। ঋজুদাকে বললাম, "তুমি তো উপহার নিয়ে যাচ্ছ ওদের জন্যে। নাইরোবি সর্দারকে ও তো উপহার দিলে। কিন্তু ওয়াণ্ডারাবোরা যদি তোমাকে বিষের তীর উপহার দেয়?"

ঋজুদা হাসল। বলল, "আমরা গান্ধী-চৈতন্যের দেশের লোক। ওরা তীর মারলেও, আমরা ভালবাসবই।"

আমি হেসে বললাম, "তোমাকে কিছুই বিশ্বাস নেই। সারা-রাত ভয়ে আমার ঘুম হল না, চারদিকে সিংহরা হুড়ুম-দাড়ুম করে বেড়াল, আর তারই মধ্যে তুমি কী করে যে বেমালুম ঘুমোলে তা তুমিই জানো। তার উপর অতবড় একটা সিংহকে কেউ যে রাবারের চটি ছুঁড়ে মারতে পারে তা কোনো লোকে বিশ্বাস করবে?"

ঋজুদা বলল, "রুদ্র, তুই বড্ড কথা বলছিস। একদম চুপচাপ। সারা রাস্তাতে আর একটাও কথা বললে বিপদ হবে। এত বকবক করিস কেন?"

ভুষুণ্ডা, মনে হল, মুখ টিপে হাসল।

আমার রাগ হল। কিন্তু চুপ করে গেলাম। বাইরের লোকের সামনে ঋজুদা এমন করে প্রেস্টিজ পাংচার করে দেয় যখন-তখন যে, বলার নয়। ভীষণ খারাপ।

আমাকে কথা বলার জন্যে বকেই, নিজেই সঙ্গে সঙ্গে বলল, "আঃ, সামনে চেয়ে দ্যাখ, কী সুন্দর দৃশ্য।"

আমি দেখলাম। কিন্তু কোনো উচ্চবাচ্য করলাম না। কথা বলব না আর।

ভুষুণ্ডা আগে-আগে চলেছে। লেকটাকে পাশে রেখে, কোনা-কুনি তার পাড় বয়ে পেরিয়ে এলাম আমরা। এই সব লেক পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম আর সোডিয়ামের জন্যে বিখ্যাত। ঋজুদা বলছিল, সোড়ার সোয়াহিল। নাম হচ্ছে মাগাডি। মাগাডি নামেই কেনিয়াতে খুব বড় একটা সোডা লেক আছে। সেরোনারার কাছে একটা ছোট লেক আছে এরকম। তার নাম লেক লাগাজা।

আমরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। একদল বেবুন আমাদের দেখে দাঁতমুখ বের করে, বিশ্রী মুখভঙ্গি করে, চেঁচামেচি শুরু করে দিল। চারতলা বাড়ির সমান উঁচু একটা জিরাফ লেরাই গাছের পাশে দাঁড়িয়ে মগডালের পাতা খাচ্ছিল, আমাদের দেখতে পেয়েই ছুট লাগাল ল্যাগব্যাগ করতে - করতে। একটু পরই একটা ডিকডিক দৌড়ে গেল জঙ্গলের গভীরে। কালকের ডিকডিকটাও হতে পারে। ডিকডিক নাকি খুব বেশি দেখা যায় না। ঋজুদা কালকে বলছিল।

ভুষুণ্ডা বড়-বড় পা ফেলে মুখ নিচু করে আগে - আগে চলেছে। ভুষুণ্ডার পিছনে ঋজুদা। তার পিছনে আমি।

ঋজুদা অর্ডার দিয়েছে, মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে পিছনটা ভাল করে দেখতে। কিন্তু ঘাড়ের উপর এত মালপত্র যে, ঘাড় ঘোরাতেই পারছি না। মনে হচ্ছে, স্পণ্ডিলাইটিস হয়েছে। এক-দিক দিয়ে অবশ্য ভালই হয়েছে। আমার পুরো পিছন দিকটাই মালপত্র ঢাকা। পায়ে অ্যাঙ্কল বুট। হাঁটুর ঠিক পিছনে না মারলে তীর কোথাওই আমার লাগবে না। ঋজুদা জেনেশুনেই আমাকে এই বর্ম পরিয়ে পিছনে দিয়েছে কি না, কে জানে?

একটা ঢালু জায়গা পেরোতেই আমরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লাম। এবারে সত্যিই ভয় করছে। আধঘণ্টাখানেক চলেছি আমরা, এমন সময় সামনের জঙ্গলের মধ্যে থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখলাম।

ঋজুদা আমার দিকে তাকাল। আমি ঋজুদার দিকে।

তারপর বন্দুকে গুলি ভরে নিলাম। ঋজুদা রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে হাতে নিল।

ভুষুণ্ডা ধোঁয়া দেখে কিছু বলবে বলে ভেবেছিল ঋজুদা। কিন্তু ভুষুণ্ডা কিছুই না বলে সেই ধোঁয়ার দিকেই এগিয়ে চলল এঁকেবেঁকে। ভুষুণ্ডার হাতে কোনো অস্ত্র নেই। ওর সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। একেই বলে সাহস! হাতে বন্দুক রাইফেল থাকলে তো অনেক বীরত্বই দেখানো যায়।

ভুষুণ্ডা সত্যিই যে কত ভাল গাইড তা এবারে বোঝা যাচ্ছে। কী সহজে ও চলেছে। দোমড়ানো ঘাস, ভাঙা গাছের ডাল, ছেঁড়া পাতা—এই সবের চিহ্ন দেখে ও লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে এঁকে-বেঁকে। মাঝে-মাঝে পিছিয়ে এসে ডাইনে-বাঁয়ে গিয়ে নতুন পথ ধরছে। আমরা ওকে অন্ধের মতো অনুসরণ করছি। এবারে জঙ্গল আরও গভীর। বড়-বড় লতা। ফুল ধরেছে তাতে।

হঠাৎ ভুষুণ্ডা দুহাত দুদিকে কাঁধের সমান্তরালে ছড়িয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, "পোলে, পোলে।"

ঋজুদা বাঁ হাতটা উপরে তুলে পিছনে-আসা আমার উদ্দেশে বলল, "পোলে, পোলে।"

আমি চলার গতি আস্তে করলাম।

এই পরিবেশে ঋজুদাও যেন ইংরেজি বাংলা সব ভুলে গেছে। নইলে ভুষুণ্ডার মতো নিজেও 'পোলে পোলে' বলত না।

ভুষুণ্ডা আর ঋজুদা আমার থেকে হাত-দশেক সামনে ছিল। ওরা দুজন ফিসফিস করে কী বলাবলি করল। তারপর ইশারাতে আমাকে ডাকল।

এগিয়ে যেতেই ভুষুণ্ডা আবার এগিয়ে গিয়েই একটা উৎরাইতে নামতে লাগল। একটু নামতেই নাকে পচাগন্ধ এল আর সেই গন্ধ আসার সঙ্গে-সঙ্গে দেখলাম সামনেই ধোঁয়া উড়ছে গাছপালার আড়ালে।

তারপরই যা দেখলাম, তার জন্যে একেবারেই তৈরি ছিলাম না। সে-রকম কিছু যেন কখনও কাউকে দেখতে না হয়।

কতকগুলো পাশাপাশি কুঁড়েঘর, খড়ের। তার সামনে একটা বড় আগুন তখনও জ্বলছে। তিরতির করে একটা নদী বয়ে চলেছে সেই ঘরগুলোর পাশ দিয়ে। ঘরগুলোর সামনে বড় বড় কাঠের খোঁটার সঙ্গে বাঁধা দড়িতে প্রায় কয়েকশো জানোয়ারের রক্তমাংস লেগে-থাকা চামড়া ঝুলছে। তার মধ্যে জেব্রা, ওয়াইল্ড-বীস্ট, ইম্পালা, গ্রান্টস ও থমসনস গ্যাজেল, এলাণ্ড, টোপি, বুশ-বাক, ওয়াটার বাক, বুনো মোষ—সবকিছুর চামড়াই আছে। সমস্ত জায়গাটা রক্ত-মাংসে, বমি-ওঠা দুর্গন্ধে যেন নরক হয়ে আছে একেবারে।

আমরা অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলাম গাছ-গাছা-লির আড়াল থেকে। আগুনটা নিশ্চয়ই কাল রাতের। এখন নিভে এসেছে। একজনকেও দেখা গেল না ওখানে। ওরা সারারাত কাজ করে এখন বোধহয় ঘুমোচ্ছে।

রাইফেলটা তাক করে ঋজুদা এবারে আগে গেল। তার পর ভুষুণ্ডা। ভুষুণ্ডার পেছনে আমি।

ঋজুদা আমাকে ডেকে বলল "তুই বন্দুক তৈরি রেখে বাঁ দিকে যা, আমি ডান দিকে যাচ্ছি। আমরা জায়গামতো গিয়ে দাঁড়ালে ভুষুণ্ডা তুমি এইখান থেকে জোরে-জোরে কথা বলবে।"

ওয়াণ্ডারাবোদের ডেরায় এসে খালি হাতে দাঁড়িয়ে কথা বলা আর আত্মহত্যা করা একই ব্যাপার। কিন্তু ভুষুণ্ডা একটুও ভয় পেল না। আমার মনে হল ঋজুদা যেন চাইছে ভুষুণ্ডার বিপদ ঘটুক!

আমরা সরে দাঁড়াতেই ভুষুণ্ডা অজানা ভাষায় জোরে জোরে কথা বলতে লাগল। আমার মনে হল মেশিনগান থেকে গুলি ছুটছে ট্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা-ট্যা-র‍্যা করে। কী অদ্ভুত ভাষা রে বাবা!

কিন্তু তবুও ঐ কুঁড়েঘর থেকে কেউই বেরোল না। যখন একজনও বেরোল না, তখন ঋজুদা হাত দিয়ে ইশারা করল আমাকে। আমরা দুজনে রাইফেল ও বন্দুক তৈরি রেখে আস্তে আস্তে কুঁড়েঘরগুলোর দিকে দুদিক থেকে এগিয়ে গেলাম। ভুষুণ্ডা আমাদের আগে-আগে ডোন্ট-কেয়ারভাবে খালি হাতে এগিয়ে গিয়ে ওর কাঁধের মালপত্র সব আগুনের পাশে নামিয়ে রেখে নিভু-নিভু আগুনের মধ্যে একটা কাঠি ঢুকিয়ে আগুনে জেবলে সিগারেট ধরাল। তারপর আগুনের পাশেই ফেলে-রাখা একটা বিরাট তালগাছের গুঁড়িতে বসে আরামে সিগারেট টানতে টানতে কুঁড়েঘরগুলোর দিকে পিছন ফিরে আমাদের দেখতে লাগল।

তখনও যখন কাউকে দেখা গেল না, তখন আমরা সাবধানে সামনের কুঁড়ের মধ্যে ঢুকলাম। কুঁড়ের মধ্যে বস্তা-বস্তা নুন, ফটকিরি, নানা রকম ছুরি ও বড় বড় অনেক লোহার তারের গোলা দেখতে পেলাম।

ঋজুদা বলল, "লাইন। এগুলোকে স্নেয়ার বলে। তারের ফাঁদ। এই তার বেঁধে রাখে জানোয়ারদের যাতায়াতের পথে জালের মতো। একসঙ্গে অনেক জানোয়ারকে ধরতে পারে এবং মারতে পারে এরা এমন করে।"

আমি ফিসফিস করে বললাম, "তা তো বুঝলাম, কিন্তু ওরা সব গেল কোথায়?"

"সব পালিয়েছে। কাল রাতে ভু-বাবুর বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনেই বোধ হয় ওরা বুঝেছিল।"

আমি বললাম, "পালিয়ে যাবে কোথায়? চলো, আমরা ফিরে গিয়ে গাড়ি নিয়ে ওদের ধাওয়া করি। এই জঙ্গল পেরিয়ে তো ওদের ফাঁকা জায়গা দিয়ে অনেকটাই যেতে হবে। তারপরে না-হয় আবার জঙ্গল পাবে।"

ঋজুদা বলল, "তা ঠিক। কিন্তু আমরা তো ওদের সঙ্গে লড়াই করতে আসিনি। ওদের ধরতেও আসিনি। এসেছি ওদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে। এই কুঁড়েঘরগুলো ভাল করে খুঁজলে ওদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যাবে। কয়েকদিন ভুষুন্ডা না হয় গাড়ির কাছেই তাঁবুতে থাকবে। টেডিকে এখানে ডেকে আনব। তারপর দিন-কয়েক এখানে ওদের থাকার রকম-সকম দেখব। তাতে ওরা কোন পথ দিয়ে আসে যায়, কী কী জানোয়ার বেশি মারে, কেমন করে মারে, কেমন করে চামড়া শুকোয়, কী খায় ওরা, কেমন ভাবে থাকে, কীভাবে টন-টন স্মোকড-করা মাংস পাচারই বা করে বিক্রির জন্যে—এসব জানতে পারব।

ভুষুন্ডা সিগারেট খেতে খেতে বলল, "পাখিরা উড়ে গেছে।"

ঋজুদা বলল, "তাই তো দেখছি।"

বাঁ দিকের কোনায় একটা বড় ঘর ছিল। তার মধ্যে ঢুকে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। দেখি, বিরাট - বিরাট হাতির দাঁত শোয়ানো আছে মাটিতে। হাতির লেজের চুল কেটে গোছ করে রাখা হয়েছে। অনেকগুলো হাতির পা হাঁটুর নীচ থেকে কেটে মাংস কুরে বের করে তার মধ্যে ঘাস পুরে রেখেছে।

আমি বললাম, "ঈসস!"

ঋজুদা বলল, "হাতির লেজের চুল দিয়ে সুন্দর বালা তৈরি হয়। আর পা দিয়ে হয় মোড়া বা টেবিল। দাঁত দিয়ে তো অনেক কিছুই হয়। বল তো ঐ দাঁতটার দাম কত হবে আন্দাজ?"

আমি বললাম, "দশ হাজার টাকা?"

ঋজুদা বলল, "কম করে দু লাখ টাকা।"

"দু লাখ! বলো কী?"

"হ্যাঁ। কম করে।" তারপরেই বলল, "কী বুঝলি? বুঝলি কিছু?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। দু লাখ।"

ঋজুদা বলল, "তা নয়। এতগুলো দাঁত ওরা এভাবে ছেড়ে যাবে না। ওরা আসলে চলে যায়নি। আশেপাশেই আছে হয়তো। আমাদের দেখছে আড়াল থেকে। এখানে কম করে দশ-বারো লাখ টাকার হাতির দাঁতই আছে শুধু। অন্য চামড়া-টামড়ার কথা ছেড়ে দে। ওরা নিশ্চয়ই যায়নি। খুব হুঁশিয়ার রুদ্র। এক মিনিটও অসাবধান হবি না। তাছাড়া, এই ভুষুন্ডাকে আমার কেমন যেন লাগছে। প্রথম দিন থেকেই। কী যে ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না।"

আমি আর ঋজুদা ঐ বড় কুঁড়েটা থেকে মাথা নিচু করে বেরোব, ঠিক সেই সময় খট করে কী একটা জিনিস এসে লাগল ঘরের খুঁটিতে।

তাকিয়ে দেখি, একটা লম্বা তীর। আর তার পিছনের পালকের কাছে এক টুকরো শুকনো সাদাটে তালপাতা বাঁধা। ঋজুদা তাড়াতাড়ি তালপাতাটা একটানে খুলে নিয়ে পড়ল। পড়েই, আমার হাতে দিয়েই, আমার হাত ধরে ঘরটার ভিতর দিকে সরে এল।

দেখলাম, তালপাতার টুকরোটার উপরে কোনো গাছের ডাল বা আঙুল রক্তে ভিজিয়ে কেউ বিচ্ছিরি হাতের লেখাতে এবড়ো-খেবড়ো করে ইংরেজিতে লিখেছে : SURRENDER OR DIE

আমি বললাম, "বেরোব এখান থেকে?"

ঋজুদা বলল, "একদম নয়।"

আমার বুকের মধ্যে ঢিবঢিব করছিল। বললাম, "দু হাত উপরে তুলে বেরোব? সারেণ্ডার করবে?"

ঋজুদা পাইপের ছাই ঝেড়ে নিল একটু, তারপর বলল, "তোর লজ্জা করল না ওকথা বলতে?"

তারপরই বলল, "ভুষুন্ডাকে দেখতে পাচ্ছিস? নিচু হয়ে দ্যাখ তো।"

নিচু হয়ে দেখলাম। ভুষুন্ডা যেখানে বসে ছিল, সেখানে নেই তো। বললাম, "না। দেখতে তো পাচ্ছি না।"

"হুম্‌ম্‌!" ঋজুদা বলল।

ঘরটার মুখের ডান দিক থেকে—যাতে আমাদের রাইফেল বন্দুকের সামনে না পড়তে হয়, এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন লোক জোরে-জোরে চারটে উদ্ভট শব্দ উচ্চারণ করল।

ঋজুদা তার উত্তরে ঐরকমই উদ্ভট শব্দ উচ্চারণ করেই, যেদিক থেকে শব্দটা এসেছিল, সেইদিকে রাইফেলের ব্যারেল ঘুরিয়ে খড়ের দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে গুলি চালিয়ে দিল। দিয়েই আমাকে বলল, "তুই ডাইনে, বাঁয়ে ও পিছনেও গুলি কর থেমে-থেমে খড়ের দেওয়ালের এপাশ থেকে।"

বলেই, পাইপের আগুনটা ঢেলে দিল খড়ের দেওয়ালের উপর। দেখতে-দেখতে ঘরটাতে আগুন ধরে গেল।

আমি বললাম, "ঋজুদা, কী করছ? আমরা যে পুড়ে মরব।"

ঋজুদা বলল, "দারুণ ধোঁয়া হবে এতে চারদিকে। এই ঘরগুলো রেড-ওট ঘাসের। চারদিক ধোঁয়াতে ঢেকে গেলেই আমরা বাঁচতে পারব ওদের বিষের তীরের হাত থেকে। নইলে আর বেঁচে ফিরতে হবে না।" এইটুকু বলেই, ঋজুদাও ঘরের মধ্যে ঘুরে - ঘুরে রাইফেল দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে লাগল বাইরের দিক লক্ষ করে। গুলির তোড়ে খোলা দরজার সামনে এসে যে কেউ আমাদের তীর মারবে সে-উপায় ছিল না ওদের।

এদিকে এমনই ধোঁয়া হয়ে গেছে ভিতরে যে, নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। চালেও আগুন লাগো-লাগো। চালে আগুন লাগলে

আলাপ করো, এ হল বেতাল— চলমান অশরীরী!

এসো, আলাপ করো! এ হল মিস্টার ওয়াকার! জঙ্গলের লোকেরা ডাকে, "বেতাল, চলমান অশরীরী আর অমর মানুষ"! অন্যায়, নিষ্ঠুরতা আর জল-স্থল-বাতাসের দস্যু দমন করার উদ্দেশ্যে পূর্বপুরুষেরা যে শপথ নিয়েছিলেন, সে ঐতিহ্যে জীবন উৎসর্গ করে বেতাল সারা বিশ্বে দুষ্টের দমন করে চলেছে। বেতালের বাসস্থান খুলিগুহা। বেতালের 'খুলিচিহ্ন' সর্বত্র আতঙ্কের সৃষ্টি করে, সুরক্ষার প্রতীক 'শুভ চিহ্ন' শান্তিতে মন ভরে!

ইন্দ্রজাল কমিক্স, বেতালের কীর্তিকলাপ প্রকাশ করে এমন ভাষায় যা সবাই বুঝতে পারে, এমন ঢঙে—যা তোমাদের সাধ্যে কুলোয়। নতুন নির্ভীক ইন্দ্রজাল কমিক্স যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনি তথ্যপূর্ণ! তোমাদের মনোরঞ্জনের জন্যে প্রত্যেক পনেরো দিন অন্তর আরো তিনজন নায়কের কীর্তিকলাপও প্রকাশ করে। যাদুকর ম্যানড্রেক, শয়তানদের ফাঁদে ফেলে এক অভিনব পদ্ধতিতে! বাহাদুর, গণ নিরাপত্তা বাহিনীর সাহায্যে ডাকাতি আর হিংস্রতা মুছে ফেলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! ফ্ল্যাশ গর্ডন, রোমাঞ্চকর নতুন কিছু আবিষ্কারের নেশায় তছনছ করে ফেলছে মহাকাশ—এমন সব কাহিনী, যেন মনোরঞ্জনে ভরা জ্ঞানের খনি!

এত কিছু সত্ত্বেও প্রতি কপির দাম মাত্র ১.৫০ টাকা। সরাসরি গ্রাহক হলে অনেক টাকা বাঁচাতে পারবে। ১৪টি সংখ্যার চাঁদা মাত্র ৩১ - টাকা, ৪৮টি সংখ্যার চাঁদা ৬২/- টাকা আর ৭২টি সংখ্যার চাঁদা ৯২/- টাকা। আজই ইন্দ্রজাল কমিক্সের গ্রাহক হয়ে যাও।

টাইম্স অফ ইণ্ডিয়া প্রকাশন

ইন্দ্রজাল কমিক্স

যে কাহিনী তোমার বাড়ন্ত বয়েসের সাথী

চাঁদার কুপন

নাম ________________

ঠিকানা ________________

স্টেশন ________ পিন কোড ________

চাঁদার হার:

☐ ২৪টি সংখ্যা ৩২/- টাকা ☐ ৪৮টি সংখ্যা ৬২/- টাকা

☐ ৭২টি সংখ্যা ৯২/- টাকা (পছন্দমত দাগ দিয়ে দাও)

কুপনটি ভরে তোমার চাঁদার টাকার মনিঅর্ডার/চেক/ড্রাফ্ট পাঠাও এই ঠিকানায়:
দি সার্কুলেশন ম্যানেজার, ইন্দ্রজাল কমিক্স,
ডাঃ ডি. এন. রোড, বম্বে - ৪০০ ০০১

ARMS-BC/IC-47-A-150-BN

আগুন চাপা পড়েই মরতে হবে। আর উপায় নেই।

আমি ভেবেছিলাম, ঋজুদা পেছন দিয়ে খড়ের দেওয়াল ফাঁক করে পালাবে। কিন্তু তা না করে এই ঘরের লাগোয়া যে ঘর আছে সেই দিকের দেওয়ালের খড়ে রাইফেলের ব্যারেল দিয়ে ফুটো করল। আমিও টেনে-টেনে খড় সরালাম। আগুনে চড়চড় করে খড় পোড়ার শব্দ হু হু হাওয়ায় শোনা যাচ্ছিল। সামনে থেকে কারা যেন খুব চেঁচিয়ে কথা বলছে। চারদিকে এত তাপ আর ধোঁয়া যে আমরাই কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বাইরের লোকেরাও নিশ্চয়ই পাচ্ছে না।

দেওয়ালটা ফুটো হতেই ঋজুদা ফুটো দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে পড়ল। আমিও পিছন-পিছন। ঐ ঘরেও তখন আগুন লেগে গেছিল। ঋজুদা দৌড়ে গিয়ে আবার সেই ঘরের দেওয়াল অমনি করে ফুটো করতে-করতে আমাকে লাইটারটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "এই ঘরের চারদিকের দেওয়ালে আগুন লাগিয়ে দে।" আমরা যখন সেই ঘর পেরিয়ে তার পাশের ঘরে ঢুকলাম তখন দু নম্বর ঘরটাও দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। এমনি করে যখন আমরা পাঁচ নম্বর ঘর পেরিয়ে বাইরে বেরোলাম ততক্ষণে সমস্ত জায়গাটা জতুগৃহের মতো জ্বলছে। আগুনে-পোড়া নানা মাংস ও চামড়ার উৎকট গন্ধে মনে হচ্ছে যেন একটা বিরাট শ্মশানে এসে পড়েছি।

বাইরে বেরিয়ে ঐ শেষ ঘরের আড়ালে দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিল ঋজুদা। ধোঁয়াতে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছিল আমাদের! কাসিও পাচ্ছিল ভীষণ। ভয়ে কাসতে পারছিলাম না। কোন দিকে যাব আমরা ভাবছি, ঠিক সেই সময় দুটো লোক তীর-ধনুক হাতে নিয়ে আমাদের পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল প্রথম কুঁড়েটার দিকে, যেখানে হাতির দাঁত ছিল। তারপর কী মনে করে ওরা আবার দৌড়ে ফিরে এল, বোধহয় ভেবেছিল, আমরা ঐ প্রথম কুঁড়েটার পিছন দিকেই বেরোব। অথবা আগুনে ঝলসে গেছি। এবারও লোকগুলো আমাদের দেখতে পায়নি—আমরা দেওয়ালের সঙ্গে পিঠ লাগিয়ে ছিলাম—তাছাড়া ওখানে যে থাকতে পারি আমরা তা ওদের ধারণারও বাইরে ছিল। কিন্তু দুটো লোকের মধ্যে পিছনের লোকটা পাশ দিয়ে চলে যেতে যেতেও থমকে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই, বাঁ দিকে তাকাল আমাদের মুখে। কুচকুচে কালো, মোটা - মোটা ঠোঁটে, গুঁড়িগুঁড়ি চুলে লোকটাকে ভয়াবহ দেখাচ্ছিল।

মুহূর্তের মধ্যে ও ধনুকটা আমাদের দিকে ঘোরাল, আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার বন্দুক থেকে, যেন আমার অজান্তেই গুলি বেরিয়ে গেল। বোধহয় এল-জি ভরা ছিল। গুলি আর দেখা-দেখির সময় ছিল না। যে গুলি পাচ্ছিলাম তাই-ই ভরছিলাম অনেকক্ষণ থেকে। চার হাত দূর থেকে বুকে অ্যালফাম্যাক্স-এর এল-জি খেয়ে লোকটা ঘুরে পড়ে গেল। হাতের ধনুক-তীর হাতেই রইল।

আমি গুলি করতে-না-করতেই ঋজুদা বাঁ দিকে ঝুঁকে পড়ে অন্য লোকটাকে গুলি করল রাইফেল দিয়ে। সে ততক্ষণে ফিরে দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়ে দিয়েছিল। কিন্তু তীরটা গিয়ে লাগল ঋজুদার গায়ে নয়, আমার গুলি-খেয়ে-পড়ে-যাওয়া লোকটারই গায়ে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। লোকটার বুক রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এল; ঠোঁটটা নড়ল, কপালে ঘাম ভরে এল। আমি খুনী! মানুষ মারলাম আমি! এক্ষুনি একজন মানুষকে মেরে ফেললাম!

ঋজুদা আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়েই বলল, "দৌড়ো। ওরা গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছে হয়তো।"

দৌড়তে-দৌড়তে ভাবছিলাম যে, হয়তো শুনতে পায়নি ওরা—আগুনের জন্যে যা শব্দ হচ্ছে চতুর্দিকে, আর যা ধোঁয়া। ওরা নিশ্চয়ই কিছু দেখতেও পায়নি।

আমরা দৌড়তে - দৌড়তে এসে লেকের পাশে পৌঁছলাম, কিন্তু ফাঁকা জায়গায় না বেরিয়ে লেরাই জঙ্গলের নীচের ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে বসে রইলাম। লেকটা পেরিয়ে একটু গিয়েই আমাদের তাঁবু। টেডি নিশ্চয়ই আমাদের জন্যে উৎকণ্ঠার সঙ্গে একা-একা অপেক্ষা করছে সেখানে দুপুরের খাওয়ার বন্দোবস্ত করে। আজও উগালি? দুস্‌সে।

আমি ফিসফিস করে ঋজুদাকে বললাম, "ভুষুণ্ডাকে খালি হাতে আনা আমাদের উচিত হয়নি। ওরা বোধহয় ভুষুণ্ডাকে মেরে ফেলেছে এতক্ষণে।"

ঋজুদা বলল, "বোধহয় না। দেখাই যাক।" তারপর আমার পিঠে হাত দিয়ে বলল, "খুব সময়মতো গুলিটা করেছিলি তুই। লোকটা ধনুকের ছিলাতে টান দিয়েছিল, আর এক সেকেন্ড দেরি হলে ওয়েল-ডান্!"

আমি বললাম, "ঈস্‌স্, মানুষ মারলাম!"

ঋজুদা বলল, "শখ করে তো আর মারিসনি। তাছাড়া ওরা জঘন্য অপরাধ করছে। আমাদের মেরেও তো ফেলত একটু হলে। না মারলে, আমরা নিজেরাই মরতাম! করার তো কিছু ছিল না।"

ওখানে বসে-বসেই দেখতে পাচ্ছিলাম আমাদের পিছনে বহুদূরে জঙ্গলের মাথা ছাড়িয়ে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী আর ভস্মীভূত রেড-ওট্ ঘাস উড়ছে আকাশে। ফ্লেমিংগোগুলো তাদের শরীরের গোলাপি ছায়া ফেলে জলে, অদ্ভুত উদাস স্বরে ডাকছে। জলের উপরে তাদের গলার স্বর ভেসে যাচ্ছে অনেক দূর অবধি।

আমি বললাম, "ওরা যেই জানবে যে আমরা ওদের দুজনকে মেরে পালিয়ে গেছি তখন প্রতিশোধ নিতে তাঁবুতে যাবে না তো! আমাদের মেরে তবে নিশ্চিত হবে হয়তো ওরা।"

ঋজুদা বলল, "অত সাহস হবে না। এ যাত্রা ওরা হয়তো পালিয়েই যাবে। যারা নিজেরা অন্যায় করে এবং জানে যে, তারা অন্যায় করছে, তাদের মেরুদণ্ডে জোর থাকে না। সাহসের অভাব হয় ওদের। যে কারণে বড়-বড় যুদ্ধেও দেখা যায় যে, অনেক বেশি বলশালী হয়েও যে-দেশ অন্যায় করে তারা হেরে যায় যাদের উপর অন্যায় করা হয়েছে সেই দেশের সৈন্যদের মনের জোরের কাছে। অন্যায় যারা করে, তারা একটা জায়গায়, একটা সময়ে পৌঁছে ভীরু হয়ে যায়ই। মানুষ অন্য সকলকেই ঠকাতে পারে, পারে না কেবল নিজের বিবেককে। যদি সে মানুষ হয়।"

আমরা ওখানে প্রায় দু ঘণ্টা চুপ করে বসে রইলাম। লেকের অন্য পাশে যে পথটা তাঁবুর দিকে গেছে তা দিয়ে একদল এলাণ্ড আর টোপি এণ্টেলোপ চলে গেল। এই টোপিগুলো বেশ বড় হয়। আমাদের দেশের শম্বরের মতো, তবে শিং বড় হয় না। শরীরের সঙ্গে যেখানে পা মিলেছে সেখানটা কেমন নীল রঙের হয়—আর শরীরটা খয়েরি। এলাণ্ড-ও বেশ বড় হয়।

তারা চলে যাবার পর একটা মস্তবড় বেবুন-পরিবার চলে গেল কির্‌খির্ করে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে। কিন্তু কোনো মানুষকেই দেখা গেল না। এদিকে বেলা অনেক হয়েছে। কী করে যে এত সময় কেটে গেল, বোঝাই গেল না। এতক্ষণ ঋজুদা পাইপও খায়নি, পাছে ওয়াণ্ডারাবোরা ধোঁয়া দেখতে পায়।

আমরা এবার উঠে সাবধানে এগোলাম। আস্তে-আস্তে সমস্ত পথটা পেরোলাম লেকটা পেরিয়ে এলাম আবার লেরাই জঙ্গল, তারপর দূর থেকে তাঁবুটা দেখা গেল। এবারে পুরো তাঁবুটাই দেখা যাচ্ছে। তাঁবুর বাইরে আগুনের উপর রান্নার

বাসন ছড়ানো আছে। কিন্তু আগুন নিভে গেছে। টেডি বোধহয় খাবার গরম করবে আমরা ফিরলে।

হঠাৎ ঋজুদা বলল, "ল্যান্ড-রোভার?"

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কোথায় গেল? আমাদের ট্রেলারসুদ্ধু ল্যান্ড-রোভার?

ঋজুদার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, "যা ভেবেছিলাম!" তারপরই বলল, "চাবিটা তুই নিজের কাছে রাখিসনি? কাল তো তুই-ই গাড়ি চালিয়ে এসেছিলি!"

আমি বললাম, "আমার কাছেই তো ছিল। কাল সন্ধেবেলায় ভুষুণ্ডা চেয়ে নিয়েছিল। ড্রাইভিং সীট-এর দরজা বাইরে থেকে লক্ করে শোবে বলে—যাতে সিংহ-টিংহ এলে ভয় না থাকে। সিংহ ত এসেওছিল রাতে।"

ঋজুদা এবারে দৌড়তে লাগল তাঁবুর দিকে। আমিও পিছনে পিছনে।

আমি ডাকলাম, "টেডি, টেডি!"

টেডিও কি ভুষুণ্ডার মতো বিশ্বাসঘাতকতা করল আমাদের সঙ্গে? কত ভাল টেডি! কত সুন্দর গল্প বলবে বলেছিল আমাকে ও আজ রাতে!

টেডি বাইরে কোথাওই নেই। তাঁবুর ভিতরেও নেই। আমাদের তাঁবুর ভিতরে ঢুকে দেখলাম, কারা যেন সব লণ্ডভণ্ড করেছে। ঋজুদার কাগজপত্র, অন্যান্য জিনিস, আমাদের বন্দুক-রাইফেলের গুলি যা তাঁবুতে ছিল সবই নিয়ে গেছে তারা। ঋজুদার ফোর-ফিফটি ফোর-হান্ড্রেড রাইফেলটা পর্যন্ত। আমাদের খাবার-দাবার, বন্দুক, রাইফেলের গুলির বাক্স, পেট্রল আরও সমস্ত জিনিসপত্র যা ট্রেলারের ভিতরে বাঁধা ছিল সবই গেছে ট্রেলারের সঙ্গে।

ঋজুদা বলল, "রাইফেল নিয়েছে বটে, কিন্তু লকটা আমার কাছে। ও দিয়ে গুলি ছুঁড়তে পারবে না।"

কিন্তু টেডি? টেডি কোথায় গেল? টেডিও কি আমাদের শত্রুপক্ষ? ঋজুদা এত বোকা! যখন ওদের ইন্টারভ্যু করে আরুশাতে এসে তিন মাস আগে সিলেক্ট করে তখন ওদের সম্বন্ধে ভাল করে খোঁজখবরও নেয়নি?

আমাদের তাঁবু থেকে বেরিয়ে তাঁবুর পিছনে যেতেই, আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে উঠে এল। টেডি হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। যেন তার কিছুই হয়নি। যেন ও ঘুমোচ্ছে। শুধু একটা ছোট্ট তীর গেঁথে রয়েছে ওর গলাতে।

ঋজুদা এসে আমার পাশে দাঁড়াল। বলল, "ভুষুণ্ডা!"

বলেই, তাঁবুর সামনে এসে নিচু হয়ে ধুলোর মধ্যে কী যেন খুঁজতে লাগল। নিজের মনেই বলল, "ঠিক।"

আমি বললাম, "কী?"

ঋজুদা বলল, "ভুষুণ্ডা টেডিকে মেরে ফেলার পর ওয়ান্ডারাবোরা ওর সংকেতে এখানে আসে। তারপর ল্যান্ড-রোভার ও ট্রেলারে চড়ে ভুষুণ্ডার সঙ্গে পালিয়ে যায়। কয়েকজনকে রেখে যায় হয়তো আমাদের শেষ করে মালপত্র নিয়ে হাঁটা-পথে যাওয়ার জন্যে।

"কী সাংঘাতিক। এখন আমরা কী করব ঋজুদা?" আমি একেবারে ভেঙে পড়ে বললাম!

ঋজুদা বলল, "দাঁড়া! দাঁড়া। ভয় পাস না। কিন্তু আগে টেডিকে কবর দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। নইলে রাতে হায়না আর শেয়ালে বেচারাকে ছিঁড়ে খাবে। কিন্তু এখানের মাটি যে খুব শক্ত!"

আমি আর ঋজুদা টেডিকে বয়ে নিয়ে গেলাম লেকের কাছে। তাঁবুর খোঁটা গাড়বার শাবল দিয়ে আমরা দুজনে মিলে কয়েক-ঘণ্টা ধরে একটা বড় গর্ত করলাম। তারপর টেডিকে তার মধ্যে শুইয়ে, জঙ্গল থেকে অনেক ফুল তুলে এনে উপরে ছড়িয়ে দিলাম। আমরা যখন টেডিকে কবর দিচ্ছিলাম তখন ওয়ান্ডারাবোদের আর কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না।

পশ্চিমাকাশে একটা দারুণ গোলাপি রঙ ছড়িয়ে গেছিল। রঙটা কাল খুব খুশির মনে হয়েছিল। আজ মনে হল বড় দুঃখের।

একটা সাদা কাগজে বড় বড় করে ঋজুদা লিখল, টেডি মহম্মদ, আমাদের বিশ্বস্ত, আমুদে, সাহসী বন্ধু, এইখানে শুয়ে আছে। তার নীচে লিখল, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি —অপারেশন ঃ ওয়ান্ডারাবো ওয়ান। তারও নীচে তারিখ দিয়ে লিখে দিল, ঋজু বোস অ্যান্ড রুদ্র রায়চৌধুরী।

আমি ভাবছিলাম, আমাদের বন্ধু টেডি এখানেই শুয়ে থাকবে। শীতের শিশির পড়বে ওর কবরের উপর। স্টার্লিং পাখিরা কিচিরমিচির করে গান গাইবে কানের কাছে। নরম পায়ে ডিক-ডিক হরিণ হেঁটে যাবে। বর্ষাকালে ফিসফিস করে বৃষ্টি আলতো করে হাত ছোঁয়াবে ওর গায়ে। রামধনু-হাতে থনভাম্ এসে দেখে যাবেন টেডিকে। বাজপড়ার শব্দ হয়ে কথা বলবেন টেডির সঙ্গে। হয়তো কোনো গাঢ় অন্ধকার রাতে গুগুনোগুম্বার

অথবা ওগ্‌রিগাওয়া বিবিকাওয়া চুপিসারে কোনো কুচকুচে কালো লোমশ জানোয়ারের মূর্তি ধরে এসে টেডির কবরের কাছে থাবা গেড়ে বসে ওকে পাহারা দেবেন।

পশ্চিমে অল্প ক'টি অ্যাকাসিয়া গাছের পাহারায়, ধু-ধু দিগন্তের উপরে সূর্য হারিয়ে গেল আজ। টেডিও হারিয়ে গেল। চিরদিনের মতো।

আমার চোখ জলে ভরে এল।

কাল রাতে আমাদের ঘুম হয়নি। ঘুমোবার সাহসও হয়নি। ঋজুদা ম্যাপ নিয়ে আঁকিবুকি করেছিল তাঁবুর সামনে বসে, আর বই পড়েছিল। আমাকে তাঁবুর মধ্যে ঘুমুতে বলেছিল বটে, কিন্তু একটু করে শুয়েছি আর ঋজুদার কাছে এসে বসেছি বারবার আগুনের সামনে।

কাল রাতেও সিংহগুলো এসে হাজির হয়েছিল। কিন্তু দূর দিয়ে চলে গেছিল। ওরা বোধহয় কোনো বড় জানোয়ার, মোষ অথবা টোপি মেরে থাকবে। বেশ শান্ত-সভ্য ছিল সে-রাতে। আমাদের কাল কিছুই খাওয়া হয়নি। খাওয়ার মতো মনের অবস্থাও ছিল না। আজ সকালে জিনিসপত্র হাতড়ে একটা বিস্কুটের টিন বেরুল। সেই বিস্কুট আর কফি খেলাম আমরা।

আমি বললাম, "কী হবে ঋজুদা! চলো আমরা মারিয়াবো পাহাড়ের দিকে যাই নাইরোবি সর্দারের গ্রামে। তাও তো এখান থেকে ষাট-সত্তর মাইল কম করে। জলও তো সব ট্রেলারেই ছিল। এই জায়গাতে না-হয় ঝর্না আছে। এই জায়গা ছেড়ে গেলে আমরা জল পাব কী করে? তার চেয়ে চলো ফিরে যাই।"

ঋজুদা আমার চোখে চোখ রেখে বলল, "এখানে আমরা কেন এসেছিলাম?"

আমি ঋজুদার চোখে তাকিয়ে লজ্জা পেলাম। মুখ নিচু করে বললাম, "তা ঠিক।"

ঋজুদা বলল, "ভুলে যাস্ না রুদ্র যে, তুই মানুষ! মানুষ মনের জোরে কী না পারে, কী না করতে পারে? একা একা পালতোলা নৌকোতে মানুষ সমুদ্র পেরোয়নি? মরুভূমি পেরোয়নি পায়ে হেঁটে? এইসব জায়গায় যখন প্রথম ইংরেজ ও জার্মান পর্যটকেরা আসেন, শিকারিরা আসেন, বিজ্ঞানীরা আসেন, তাঁরা কি গাড়ি করে এসেছিলেন? এই অঞ্চলেই একজন জার্মান প্রজাপতি-সংগ্রাহক একা-একা প্রজাপতি খুঁজতে এসে রিফট্‌ভ্যালিতে মানুষের হাড় কুড়িয়ে পেয়ে ফিরে গিয়ে বার্লিন মিউজিয়ামে জমা করেন। তার থেকে আবিষ্কার হয় ওল্‌ডুভাই গর্জ-এর। ডঃ লিকি সস্ত্রীক এসে বছরের পর বছর এইরকমই জায়গায়, তাঁবু খাটিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি চালান সেখানে। আবিষ্কৃত হয় কত নতুন তথ্য, কত কী জানতে পারেন।"

একটু চুপ করে থেকে ঋজুদা বলল, "রুদ্র, তুই না অ্যাডভেঞ্চারের লোভে প্রায় জোর করেই আমার সঙ্গে এসেছিলি আফ্রিকায়? এরই মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারের শখ মিটে গেল! তোর বয়সি গুজরাটি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি ছেলেরা বিদেশ-বিভুঁইতে একা একা ব্যবসা করতে চলে আসে। দেখলি তো দার-এস্-সালাম-এ, আরুশাতে কত ভারতীয় ব্যবসা করছে। তার মধ্যে বাঙালি দেখলি একজনও?"

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, "তুই তাহলে আমার সঙ্গে এলি কেন? আমি তো এখানে ছেলেখেলা করতে আসিনি। জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেই এসেছি।"

ঋজুদার হাঁটুতে হাত দিলাম। বললাম, "আমাকে ক্ষমা করো। বলো, আমরা এখন কী করব?"

ঋজুদা আমার হাতে হাত রেখে বলল, "আমরা এখন জীপের চাকার দাগ ধরে এগোব। প্রথমত ওরা কোথায় যায় তা দেখতে চাই আমি। আমি যে কাজে এসেছি তার জন্যে ওদের চলাচলের পথ জানা দরকার। দ্বিতীয়ত, ওরা ট্রেলারটা কিছুদূর গিয়েই ছেড়ে দেবে। কারণ ট্রেলার নিয়ে জোরে গাড়ি চালাতে পারবে না। ট্রেলারটা পেলে আমরা মালপত্র পেয়ে যাব। ঐসব মাল ওরা ভয়ে নেবে না—পাছে চোরাই মাল সন্দেহে পুলিস ওদের ধরে।"

আমি বললাম, "তুমি কি পায়ে হেঁটে ওদের গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে?"

ঋজুদা বলল, "তা পারব, যদিও সময় লাগবে। তাছাড়া ভুষুণ্ডার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে। আসলে ও তো কর্মচারী। এই যে সব লোক দেখছিস, এই সব নানা চোরা-শিকারির দল, ভুষুণ্ডার মতো অর্ধশিক্ষিত লোকেরা, সব এক বিরাট দলের মধ্যে আছে। এই সব দলকে চালায় খুব ধনী ব্যবসায়ীরা। তাদের অন্য ব্যবসার আড়ালে এটাও তাদের একটা লাভের ব্যবসা। আমি যে কাজে এসেছি, তা সফল হলে, অনেক রাঘববোয়ালের মাথা ধরে টান পড়বে। তাই তারা আগেভাগেই বুদ্ধি করে ভুষুণ্ডাকে আমার দলে ভিড়িয়ে দিয়েছিল। সর্ষের মধ্যেই ভূত ঢুকিয়ে দিয়েছিল, ভূত আর ঝাড়বে কী করে বল্ ওঝা? ভুষুণ্ডা একা-লোক নয়। ও এক বিরাট চক্রের একটি যন্ত্র মাত্র। ও তো সামান্য চাকর। আমার দরকার ভুষুণ্ডার মালিকদের। ফয়সালা তাদেরই সঙ্গে। তবে ভুষুণ্ডার সঙ্গেও বোঝাপড়া করতে হবে টেডির কারণে। টেডির মৃত্যুর প্রতিশোধ এই আফ্রিকার জঙ্গলেই আমি নেব।"

আমি বললাম, "চলো তাহলে, আর দেরি কেন?"

ঋজুদা উঠল। দুজনের হ্যাভারস্যাকে যা-যা অবশ্য-প্রয়োজনীয় জিনিস নেওয়া যায় তা ভরে নিয়ে, দুজনের কাঁধে দুটি জলের ছাগল উঠিয়ে ভাল করে বেঁধে নিয়ে আমরা রওনা হলাম নিরুদ্দেশ যাত্রায়। পিছনে পড়ে রইল তাঁবু দুটো—আমাদের ক্যাম্প-কট, বিছানা, জুতো জামা, অনেক কিছু জিনিস, যা বইবার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর পড়ে রইল টেডি। চিরদিনের জন্যেই পড়ে রইল।

ল্যান্ড-রোভার আর ট্রেলারের চাকার দাগ দেখে আমরা হাঁটা শুরু করলাম। মাইল দুয়েক আসার পর পিছনের সব-কিছু ধু-ধু মাঠের রোদের তাপে আর হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এখন আমরা আবার ঘাসের সমুদ্রে এসে পড়লাম। কম্পাসই সম্বল এখন। আর সূর্য। এই সাভানা! পৃথিবীর এক ভৌগোলিক আশ্চর্য!

সারাদিনে হেঁটে আমরা কত মাইল এলাম বলা মুশকিল, কিন্তু আমরা এখনও ল্যান্ড-রোভারের চাকার দাগ হারাইনি। মাঝে একবার গোলমাল হয়ে গেছিল দুপুরের দিকে। তারপর ঋজুদা আবার খুঁজে পেয়েছিল। যেদিকে চোখ যায় শুধু ধু-ধু হলুদ ঘাসের প্রান্তর। একটাও গাছ নেই, ঘর নেই, বাড়ি নেই, মানুষ নেই—শুধু জানোয়ারের মেলা। সেৎসী মাছির জন্যে এখানে মাসাইরাও বিশেষ গরু চরাতে পারে না। বসবাস করতে পারে না রাইফেল-বন্দুকধারী মানুষও। এমনই সাংঘাতিক এই মৃত্যুবাহী মাছিরা!

সন্ধের আগে-আগে আমরা কিছুটা ঘাস পরিষ্কার করে জিনিসপত্র নামিয়ে বসলাম। এক টিন ককটেল সসেজ বেরোল। কফি এখনও আছে। কফি আর সসেজ খেয়ে, হ্যাভারস্যাকে মাথা দিয়ে রাইফেল পাশে রেখে কম্বল মুড়ে শুয়ে পড়লাম দুজনে। পাশাপাশি! রাতে ভাল ঠাণ্ডা পড়বে।

আস্তে-আস্তে তারারা ফুটে উঠল। কাল থেকে আজ চাঁদের

সঞ্চয় করা যে এত
সহজ আমি
জানতামই না...
পি এন বিতে একটা রেকারিং ডিপো-
জিট অ্যাকাউন্ট খুলেই তা জানলাম।
বিনা কষ্টে সঞ্চয়। অনেকেই সঞ্চয় করতে চায়, কিন্তু পারে না। পি এন বি'র রেকারিং ডিপোজিট প্রকল্প সঞ্চয় করার পথ খুবই সহজ করে দিয়েছে। ন্যূনতম মাসিক পাঁচ টাকা বা এর গুণিতক দিয়ে টাকা জমাতে আরম্ভ করতে পারেন।
63 মাস ধরে, প্রতি মাসে 50 টাকা জমা ক'রে গেলে, মেয়াদশেষে আপনি পাবেন 4,145.50 টাকা।
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
(ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠান)
...ভরসা করার মতো নামে ভরসা রাখুন।
INTERADS

জোর বেশি। দিনভর হেঁটে দুজনেই খুব ক্লান্ত ছিলাম। ঋজুদা তো কাল রাতে একটুও ঘুমোয়নি। তাই দুজনেই শুতে না শুতেই ঘুমোলাম।

মাঝরাতে কী যেন একটা শব্দে আমি চমকে উঠলাম। মনে হল ভূমিকম্প হচ্ছে বুঝি! হঠাৎ হাজার-হাজার খুরের জোর শব্দে ঘুমচোখে উঠে বসে দেখি, ঋজুদা আমাদের দুজনেরই পাঁচ ব্যাটারির টর্চ দুটো জ্বালিয়ে রেখেছে সামনে। আর সেই আলোতে দূরে দেখা যাচ্ছে হাজার-হাজার জানোয়ার জোরে ছুটে যাচ্ছে পশ্চিম থেকে পূবে প্রচণ্ড শব্দে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে।

আমি ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করতে গেলাম, কী ব্যাপার?

কিন্তু আমার গলার স্বর গলার মধ্যেই মরে গেল। এত আওয়াজ!

অনেকক্ষণ, কতক্ষণ ধরে যে ওরা দৌড়ে গেল তার হিসেব করতে পারলাম না। শব্দ থামলে দেখা গেল, ধুলোর মেঘে আকাশের চাঁদ-তারা সব ঢেকে যাওয়ার যোগাড়।

ঋজুদা বলল, "আশ্চর্য! এই সময় তো মাইগ্রেশানের সময় নয়! ওরা এমন করে দৌড়ে গেল কেন? কোনো আগ্নেয়গিরি কি জেগে উঠল? নিশ্চয়ই কোনো প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ঘটবে। নইলে এ-রকম হত না!"

কত হাজার জানোয়ার যে ছিল বলতে পারব না। লক্ষও হতে পারে। জেব্রা, ওয়াইল্ডবীস্ট আর গ্যাজেলস্।

ঋজুদা বলল, "আমরা এতক্ষণে কিমা হয়ে মিশে যেতাম ওদের পায়ে-পায়ে। দূর থেকে শব্দ শুনে উঠে পড়ে ভাগ্যিস দুটো টর্চ একসঙ্গে জ্বালিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাতে লেগেছিলাম। তাতেই সামনে যারা আসছিল তারা দয়া করে পথ একটু পালটাল। নইলে পুরো দলটাই আমাদের উপর দিয়ে চলে যেত।

আমি বললাম, "ঋজুদা! ল্যান্ড-রোভারের চাকার দাগ তো আর দেখা যাবে না। ওরা বোধহয় কয়েক মাইল জায়গা একেবারে সাদা করে দিয়ে গেছে পায়ে-পায়ে। তাই না?"

ঋজুদা বলল, "ঠিক বলেছিস তো! আমার তো খেয়ালই হয়নি।"

বললাম, "এখন কী করবে তবে?"

ঋজুদা বলল, "ঘুমুব। নে, শুয়ে পড়। আর মনে কর, তোদের বাড়ির দক্ষিণের ঘরে, গ্রিল-দেওয়া জানালার পাশে ডানলোপিলোর বিছানায় ধবধবে সাদা চাদরে ঘুমিয়ে আছিস। ঠিক ছ'টার সময় জনার্দন ট্রেতে করে ফলের রস এনে বলবে, ওঠো গো দাদাবাবু! আর কত ঘুমোবে?"

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, "তুমিও সেইরকম ভাবো।"

বলে, দুজনেই শুয়ে পড়লাম।

ভোর হল শকুনের চিৎকারে। আমাদের চারধারে বড় বড় বিশ্রী দেখতে লাল-মাথা প্রায় একশো শকুন উড়ছে, বসছে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অদ্ভুতভাবে হাঁটছে। আমরা কি মরে গেছি? নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখলাম, না তো! দিব্যি নিশ্বাস পড়ছে। ঋজুদা দেখলাম ছবি তুলছে শকুনগুলোর।

আমি উঠে বসতেই ঋজুদা বলল, "আশ্চর্য! এরা কি আমাদের মড়া ভাবল! ব্যাপারটা কী বল তো?"

আমার মনে পড়ল টেডি বলেছিল একটা প্রবাদের কথা। শকুন যদি কোনো জীবন্ত মানুষের তিন দিকে ঘিরে থাকে তাহলে সে মানুষ তিন দিনের মধ্যে মরে যায়। শকুনগুলো আমাদের চারদিক ঘিরে রয়েছে।

ঋজুদাকে এই কথা বলতেই সে বলল, "তোর লেখাপড়া শেখা বৃথা হয়েছে।"

বলেই, গুলিভরা শটগানটা তুলে নিয়ে দুমদুম করে দুদিকে দুটো গুলি করে দিল। দুটো শকুন উল্টে পড়ল। অন্য শকুনগুলো সঙ্গে-সঙ্গে বিচ্ছিরি চিৎকার করে উড়ে গেল।

ঋজুদা বলল, "চল্ তো এই ভাগাড় থেকে পালাই।" বলে মালপত্র উঠিয়ে নিয়ে অন্যদিকে চলল। পিছন-পিছন আমিও।

আমরা একটা দূরে গিয়ে, ঘাস পরিষ্কার করে, খাবার-দাবারের বন্দোবস্ত করছি, এমন সময় দেখি অন্য শকুনগুলো ঐ দুটো মরা শকুনকে খেতে লেগেছে।

ঋজুদা সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে গম্ভীরভাবে বলল, "এদের দেখে আমার মানুষদের কথা মনে পড়ছে। সংসারে কিছু-কিছু মানুষ আছে, যারা এই শকুনগুলোর মতো।"

আমি বিস্কুটের টিন বের করলাম। নাইরোবি সর্দারের দেওয়া দুটো কলা ছিল। মুখ ধোওয়া, দাঁত মাজা, সব ভুলে গেছি। জল কোথায়? খাওয়ার জলই যেটুকু আছে তাতে ক'দিন চলবে ঠিক নেই। ঋজুদাকে কলা ও বিস্কুট এগিয়ে দিয়ে কফির জল চড়ালাম, কফির খালি টিনে।

ঋজুদা বাইনাকুলারটাকে তুলে নিয়ে চোখে লাগিয়ে এদিকে-ওদিকে দেখতে লাগল। আমি খেতে-খেতে ফুটন্ত জলের দিকে লক্ষ রাখলাম।

হঠাৎ ঋজুদা বাইনাকুলারটা আমার হাতে দিয়ে বলল, "ভাল করে দ্যাখ্ তো, রুদ্র। কিছু দেখতে পাস কি না?"

ফোকাসিং নবটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ভাল করে দেখে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম! জাইস্-এর বাইনাকুলার। খুবই পাওয়ার-ফুল। তাতে দেখলাম দূরদিগন্তের একটি জায়গায় একটু সবুজ-সবুজ ভাব—যেন জঙ্গল আছে, আর তার ঠিক সামনে একটা ল্যান্ড-রোভার ট্রেলার সুদ্ধু!

বাইনাকুলারটা নামিয়ে খালি চোখে কিছুই দেখতে পেলাম না।

ঋজুদা বলল "কী দেখলি?"

আমি বললাম, "দেখলাম।"

ঋজুদা বলল, "তবে এবার খেয়েদেয়ে চল্। যাওয়া যাক।"

খাওয়া শেষ করে আমরা আবার মালপত্র কাঁধে নিয়ে রওনা হলাম।

ট্রেলারটা ভুষুণ্ডা ছেড়ে যাবে ভেবেছিলাম। ঋজুদা তেমনই বলেছিল। কিন্তু জীপটাও যখন ট্রেলারের সঙ্গে আছে তখন ব্যাপারটা কী বোঝা যাচ্ছে না মোটেই। ওরা কি তবে ওখানেই আছে? গাড়ির কাছে? নাকি গাড়ি এবং ট্রেলার হজম করতে পারবে না বলে পথেই ফেলে গেছে।

একটু যেতেই হঠাৎ গুড়-গুড়-গুড় একটা শব্দ শুনতে পেলাম। চারধারে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না আমি। ঋজুদা আকাশে তাকাতে বলল। তাকিয়ে দেখি, এক-এঞ্জিনের একটা সাদা আর হলুদ রঙের মোনোপ্লেন উত্তর থেকে দক্ষিণে যাচ্ছে।

ঋজুদা তাড়াতাড়ি মালপত্র নামিয়ে রেখে তার জামার কলারের নীচে ভাঁজ করে রাখা লাল সিল্কের রুমালটা জোরে জোরে নাড়তে লাগল। আমিও ক্যামেরা-মোড়া হলুদ কাপড়ের টুকরোটাকে পতাকার মতো ওড়াতে লাগলাম হাওয়াতে। কিন্তু প্লেনটা আমাদের দেখতে পেল বলে মনে হল না। যেমন যাচ্ছিল, তেমনই উড়ে চলল। দেখতে-দেখতে একটি ছোট্ট হলুদ সাদা পাখির মতো দিগন্তে হারিয়ে গেল প্লেনটা।

আমরা আবার মালপত্র তুলে নিয়ে এগোলাম।

কিছুদূর যাওয়ার পর খালি চোখেই গাড়িটাকে দেখা গেল দিগন্তে একটা গুবরে পোকার মতো। আমরা এগিয়ে চললাম ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর গাড়িটার কাছাকাছি এসে ঋজুদা বলল, "এবারে একসঙ্গে নয়। তুই বাঁ দিকে চলে যা, আমি ডান দিকে যাচ্ছি। গুলি ভরে নে তোর শটগানে। কোনো লোক দেখলেই গুলি চালাবি। ওদের তীর যতখানি দূরে পৌঁছতে পারে সেই

দূরত্বে পৌঁছনোর অনেক আগেই গুলি চালাবি। আর কোনো খাতির নেই। কোনো রিস্ক্ নিবি না। খুব সাবধান। ওরা গাড়ির মধ্যেও লুকিয়ে থাকতে পারে। তাহলে একেবারে কাছে না-যাওয়া অবধি কিন্তু বুঝতেই পারবি না।"

সুতরাং খু-উ-ব সাবধান!

আমরা ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে ঋজুদা আরেকবার বাইনাকুলার দিয়ে ভাল করে দেখে নিল গাড়িটা এবং তার চার পাশ।

তারপর বলল, "গুড লাক্, রুদ্র।"

আমরা দুজনে দুদিকে ছড়িয়ে যেতে লাগলাম। ক্রমশ দুজনের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যেতে লাগল। যখন আমি গাড়িটা থেকে দুশো গজ দূরে তখন আমার দিকে লক্ষ করে গাড়ির দিক থেকে কেউ গুলি ছুঁড়ল। আমি কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। গাদা-বন্দুকের গুলি। আমার সামনে পড়ল গুলিটা। ধুলো উড়ে গেল। আমি গুলি করার আগেই ঋজুদার রাইফেলের গুলির আওয়াজ হল। আমি দৌড়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম এবার। আমার শট্‌গান-এর এফেক্টিভ রেঞ্জ একশো গজ। তার চেয়ে বেশি দূরে থেকে গুলি করে লাভ নেই। আরও একবার গুলি হল। এবার দেখতে পেলাম, দুজন লোক একজন লোককে বয়ে নিয়ে জঙ্গলের দিকে যাবার চেষ্টা করছে। ঐ লোকটার গায়ে নিশ্চয়ই ঋজুদার গুলি লেগেছে। আমি এবারে গুলি করলাম এল-জি দিয়ে। দুটো লোকের মধ্যে একটা লোক পড়ে গেল। তখন বাকি লোকটা তাকে ও অন্য লোকটিকে ফেলে খুব জোরে দৌড়ে পালাল। লোকটার দৌড়নোর ধরন ও জামাকাপড় দেখে মনে হল যে, সে ভুষুণ্ডা। আমার ভুলও হতে পারে। অল্পক্ষণের মধ্যেই যে লোকটি দৌড়চ্ছিল সে পিছনের নিবিড় জঙ্গলে পৌঁছে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

আমি আর ঋজুদা প্রায় এক সঙ্গেই দৌড়ে গিয়ে গাড়ির কাছে পৌঁছলাম।

ঋজুদা ট্রেলারের উপর উঠে গাড়ির ভিতরটা ভাল করে দেখে নিল। তারপর মাটিতে শুয়ে থাকা লোক দুটোর দিকে এগিয়ে এল। আমি ঐ দিকেই যাচ্ছিলাম। এমন সময় সাঁ করে একটা তীর ছুটে এল আমার দিকে। যে-লোকটা গুলিতে ধরাশায়ী হয়েছিল সে-ই তীরটা ছুঁড়েছিল। কিন্তু শুয়ে-শুয়ে ছোঁড়ার জন্যেই হোক. বা যে কারণেই হোক, তীরটা আমার মাথার অনেক উপর দিয়ে চলে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঋজুদার রাইফেলের গুলি লোকটাকে স্তব্ধ করে দিল। লোকটা একটু নড়ে উঠে পা দুটো টান-টান করে ছড়িয়ে দিল। তীরধনুক-ধরা হাত দুটো দুদিকে আছড়ে পড়ল ঘাসের উপর।

আমরা গিয়ে লোক দুটোর কাছে দাঁড়ালাম। প্রথম লোকটি, যাকে বাকি দুজন টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, ততক্ষণে মরে গেছে। ঋজুদার রাইফেলের গুলি তার বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে। দ্বিতীয় লোকটিও মারা যাবে এক্ষুনি। আমরা কাছে যেতেই বিড়বিড় করে কী বলল।

ঋজুদা ওয়াটার-বটল খুলে তার মুখে জল ঢেলে দিল। এক ঢোক খেল সে। তারপরই মুখটা বন্ধ হয়ে গেল, কষ বেয়ে জল গড়িয়ে গেল, মাথাটা একপাশে এলিয়ে গেল। দুটি খোলা চোখ স্থির হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইল।

আমার গা বমি-বমি লাগছিল। মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।

ঋজুদা বলল, "বেচারিরা! ওরা কেউ নয়। যারা ওদের আড়ালে থাকে চিরদিন, তাদের মারতে পারলে তবেই হত।"

তাড়াতাড়ি ট্রেলারের উপরের দড়ি কেটে কয়েক টিন খাবার বের করে নিল ঋজুদা। পাইপের টোব্যাকো. দেশলাই এবং রাইফেল ও বন্দুকের গুলিও। তারপর বলল, "আর নষ্ট করার মতো সময় নেই। চল্ রুদ্র।"

আমরা দৌড়ে চললাম যেদিকে ঐ লোকটা দৌড়ে গেছিল সেদিকে।

দৌড়তে-দৌড়তে আমি ঋজুদাকে শুধোলাম, "ভুষুণ্ডা?"

ঋজুদা ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ। মুখে কোনো কথা বলল না।

জঙ্গলের কিনারাতে দৌড়ে যেতেই পরিষ্কার দেখা গেল একটা পায়ে-চলা পথ। আমরা সেই পথের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক সেইসময় কে যেন আবার গুলি করল অনেক দূর থেকে গাদা-বন্দুক দিয়ে। সিসের গুলিটা ঠক্ করে আমাদের একেবারে সামনে একটা বড় গাছের গুঁড়িতে এসে আটকে না গেলে কী হত বলা যায় না।

আমরা শব্দ লক্ষ করে দৌড়লাম। পথ ছেড়ে।

কিন্তু শব্দটা যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকে দৌড়ে গিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। এমন-কী কারো পায়ের চিহ্নও নয়। তবে কি গাছ থেকে কেউ গুলি ছুঁড়ল? ভুষুণ্ডা কি এই জঙ্গলে একা, না সঙ্গে আরো লোক আছে? কিছুটা এগিয়ে যাবার পরই সামনে একটু দোলা-মতো জায়গা দেখলাম। সেখানে চাপ চাপ ঘাস হয়েছে সবুজ। বর্ষাকালে নিশ্চয়ই জলে ভরা থাকে জায়গাটা। সেই জায়গাটাতে নেমে গেল ঋজুদা, তারপর আমাকেও ইশারাতে ডেকে নামতে বলল। সেই দোলার মধ্যে থেকে একটা প্রকাণ্ড বড় গাছ উঠেছে। ফিকাস্ গাছ। ঋজুদা আমাকে আগে উঠতে ইশারা করল, আমার পেছনে-পেছনে নিজে উঠল। আমরা কুড়ি ফুট মতো উঠে দুটি বড় ডাল দেখে পাশা-পাশি বসলাম। ঐ মালপত্র নিয়ে গাছে ওঠা সহজ কথা নয়। কিন্তু আমাদের তো সবই গেছে—এখন এই সবেধন নীলমণি যা আছে তা খোয়ালে বাঁচাই মুশকিল হবে। তাই এগুলোকে কাঁধ-ছাড়া করা যাচ্ছে না এক মুহূর্তও।

কারো মুখে কথা নেই কোনো। আমরা দুজনে দুদিকে দেখছি। হঠাৎ নীচের সবুজ দোলা থেকে প্রচণ্ড জোরে কে যেন শিস দিল। এত জোরে হল শব্দটা যে, মনে হল কোনো গাড়ির টায়ার পাংচার হল বুঝি।

ঋজুদা চমকে উঠল। মনে হল, একটু ভয়ও পেল। ভয় পেতে তাকে বড় একটা দেখিনি। পরমুহূর্তেই বলল, "তোর কাছে এক নম্বর কি দু নম্বর শট্‌স আছে?"

আমি হ্যাভারস্যাকে হাত ঢুকিয়ে বের করলাম একটা দু নম্বর গুলি।

ঋজুদা বলল, "তোর বন্দুকের ডান ব্যারেলে ভরে রাখ। এক্ষুনি।"

ডান ব্যারেল থেকে এল-জি বের করে শটস ভরে নিলাম। ঠিক সেই সময় আবার শব্দটা হল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না।

কিছুক্ষণ পর সেই শব্দটা আরো দূরে, জঙ্গলের গভীরে শুনলাম। আমরা যেদিক থেকে এলাম সেদিকে।

ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, "গুলি আবার বদলে নিয়ে বোস।"

ঐ গাছে বসেই লক্ষ করলাম যে, আমাদের বাঁ দিকে, জঙ্গলের প্রায় গায়ে একটা প্রকাণ্ড কোপি আছে। বিরাট-বিরাট বড়-বড় কালো পাথর আর গুহায় ভরা টিলার মতো। এমন অদ্ভুত টিলা আমাদের দেশে দেখা যায় না।

আমি ঋজুদাকে ইশারাতে দেখালাম। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ঐদিকে, তারপর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ঋজুদার।

কী একটা ছোট কাঠবিড়ালির মতো জানোয়ার সামনের একটা গাছে উঠছিল নামছিল। ছাই আর সবুজ-সাদা রঙ, ন্যাড়া মুখটা।

ঋজুদাকে দেখালাম ঐ দিকে। ঋজুদা বলল, "ওটা কাঠ-বিড়ালি নয়। একটা পাখি। ওদের নাম 'গো এওয়ে'। ওদের ডাক

শুনলে মনে হয় বলছে, 'গো-এওয়ে, গো-এওয়ে'।

আমি বললাম, "ও তো তাহলে আমাদের চলে যেতে বলছে?"

ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, "আপাতত এখানেই শুয়ে ঘুমো। এত মোটা-মোটা ডাল। খাটের চেয়েও চওড়া। তবে দেখিস, নাক ডাকাস না যেন।"

দুপুরেও কোনো আওয়াজ পেলাম না কারও। গাছের ডালে বসেই ক্যান্‌ড্‌ স্যামন খেলাম আমরা। আর জল।

আমার অধৈর্য লাগছিল। গাছের ডালে ঘন্টার পর ঘন্টা বাঁদরের মতো বসে থেকে কী লাভ?

এদিকে ভুষুণ্ডা হয়তো কত মাইল ভিতরে চলে গেছে এতক্ষণে। ঋজুদা কী যে করে, কেন যে করে, সে-সব আমার বোঝা ভার। মাঝে-মাঝে বিরক্তি লাগে। মুখে বলেও না কিছু যে, মতলবটা কী তার!

বিকেলে যখন আলো পড়ে এল তখন আস্তে-আস্তে আমরা গাছ থেকে নামলাম। ঋজুদা বলল, "একদম শব্দ করবি না। আর আলোও জ্বালাবি না।"

বাইরের বিস্তীর্ণ মাঠে যদিও তখন অনেক আলো, বনের ভিতরে ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। নানা জাতের হরিণ, পাখি ও বেবুনের ডাকে জঙ্গল সরগরম। সেৎসী মাছির পাখার গুঞ্জরন শোনা যাচ্ছে বনাঞ্চা প্লেনের এঞ্জিনের শব্দের মতো।

ঋজুদা আস্তে-আস্তে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে গাড়ির দিকে। কিন্তু যে-পথ দিয়ে এসেছিলাম তা থেকে প্রায় তিন-চারশো গজ বাঁ দিক দিয়ে একেবারে গভীর জঙ্গলের ভিতরে-ভিতরে চলেছি আমরা। সামনেই একটা নদী আছে। জলের কুলকুল শব্দ আসছে। আর-একটু এগোতেই খুব জোর হাপুস-হুপুস শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হল, হাতির দল বোধহয় নদীতে নেমেছে। জলের কাছাকাছি এসে সামান্য আলোয় দেখলাম জলের মধ্যে এক-দেড় হাত লম্বা-মতো কী কতগুলো লালচে-লালচে ফোলা-ফোলা জিনিস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ভাসছে আর মাঝে-মাঝে তাদের গা থেকে ফোয়ারার মতো জল ছিটকে উঠছে।

এমন জিনিস আমাদের দেশে কখনও দেখিনি আমি। অবাক হয়ে জলের পাড়ে দাঁড়িয়ে বোঝবার চেষ্টা করছিলাম, ওগুলো কী জানোয়ার।

এমন সময় ঋজুদা আমার কাঁধে জোর চাপ দিয়ে বলল, "এগিয়ে চল্‌। দাঁড়াস না।"

আমি ফিসফিস করে একেবারে ঋজুদার কানের সঙ্গে কান লাগিয়ে বললাম, "কী? কুমির?"

ঋজুদা বলল, "হিপোপটেমাস্‌। জলহস্তী! পালিয়ে চল্‌।"

আমি তাড়াতাড়ি পা চালাতে চালাতে ভাবলাম, কত বড় জানোয়ার—অথচ সমস্ত শরীরটা জলে ডুবিয়ে শুধু নাকটা বের করে রয়েছে, যেমন কুমিরেরা করে। জলহস্তী উভচর জানোয়ার। তবে জল বেশি ভালবাসে।

আমরা জঙ্গল আর রেড্‌-ওট্‌ ঘাসের বনের সীমানাতে এসে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে বসে পড়লাম। ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, "অন্ধকার হয়ে গেলে আমি একা গাড়ির কাছে যাব। চাবিটা গাড়িতেই লাগানো আছে দেখেছিলাম। তারপর হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে সোজা চলে যাব আস্তে আস্তে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভুষুণ্ডা পথের আশেপাশে কোনো গাছে বা ঝোপঝাড়ের আড়ালে অপেক্ষা করছে। ও জানে যে, আমরা গাড়ির লোভ ছাড়তে পারব না। সারা দিন ওকে খুঁজে না-পেয়ে আমরা ঠিকই ফিরে যাব গাড়িতে। এবং হয়তো গাড়িতেই থাকব রাতে। অথবা গাড়ি নিয়েই চলে যাব একেবারে। যা পেট্রল আছে আমাদের, তাতে গোরোংগোরো আগ্নেয়গিরির কাছে মাসাইদের বস্তিতেও চলে যেতে পারব। একবার যদি বড় রাস্তায় উঠতে পারি, তাহলে অন্য গাড়ির দেখা পাবই। আর পেলে, সেরোনারাতে খবর চলে যাবে। তখন কোনো অসুবিধা হবে না আর। যে কারণে আমি যাচ্ছি তোকে এখানে একা রেখে, সেই কারণটা হচ্ছে এই যে, ভুষুণ্ডা গাড়ির কাছেও গিয়ে পৌঁছে থাকতে পারে দিনে-দিনেই। ও হয়তো গাড়ির মধ্যেই অপেক্ষা করছে। কারণ ও জানে যে, ও যা করেছে এতদিন, এবং টেডিকে অকারণে খুন করেছে—সেই সবের শাস্তি ওকে পেতেই হবে যদি আমার অথবা তোর দুজনের মধ্যে একজনও বেঁচে ফিরি। তাই ও আমাদের ছেড়ে কোথাও পালাতে পারবে না। আমরা বেঁচে-ফেরা মানে ওর সর্বনাশ। ওদের পুরো দলেরই সর্বনাশ! ও বোধহয় ভেবেছিল, টেডি ছাড়া, গাড়ি ছাড়া আমরা সিংহ আর সেৎসীদের হাতে সেরেঙ্গেটিতেই মরে যাব। আমরা যে পায়ে হেঁটে ওর পিছু নেব এমন কথা ও ভাবতেও পারিনি। ও এখন নানা কারণে মরিয়া হয়ে আছে। ও যদি গাড়িতেই গিয়ে থাকে, আমি নিজেই যেতে চাই। তোকে পাঠানো ঠিক হবে না।"

ঠিক এমন সময় আমাদের অনেক ডান দিকে তিন-চারজন লোকের উত্তেজিত গলা শুনলাম। তাদের মধ্যে কী নিয়ে যেন তর্ক লেগেছে। ওদের মধ্যেই কেউ বকা দেওয়াতে ওরা সব চুপ করে গেল

ঋজুদা যেন কী ভাবল। তারপর বলল, "নাঃ। ওরা অনেকে আছে। তুইই যা রুদ্র। খুব সাবধানে অনেকখানি বাঁ দিকে গিয়ে আস্তে-আস্তে গাড়িতে পৌঁছবি। গাড়িতে যদি কাউকে দেখতে পাস তবে সঙ্গে-সঙ্গে গুলি চালাবি। আর কাউকে দেখতে না পেলে গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে, গাড়ি ঘুরিয়ে সোজা গাড়ি চালাবি। এক সেকেন্ডও দেরি করবি না। তারপর গাড়ি চালিয়ে চলে যাবি। একেবারে মাইল দশেক গিয়ে গাড়ি থামিয়ে, গাড়ির কাচ-টাচ সব বন্ধ করে, খাওয়া-দাওয়া করে গাড়িতেই বসে থাকবি। গাড়ির মুখটা এদিকে ঘুরিয়ে রাখিস। যদি এরা আমাকে ঘায়েল করতে পারে, তবেই তোর কথা ভাববে।

আমি বললাম, "ঋজুদা, খুব সাবধান। তোমাকে একা ফেলে যেতে ইচ্ছে করছে না আমার।"

ঋজুদা বলল, "যে কম্যান্ডার তার কথা শুনতে হয়। গুড লাক্‌। বী আ ব্রেভ ম্যান। উ্য আর নো মোর আ বয়।"

আমি আস্তে আস্তে ভুতুড়ে চাঁদের আলোতে ভুতুড়ে ছায়ার মতো জঙ্গলের আড়াল ছেড়ে ঘাসবনে উঠে গেলাম। তারপর বাঁ দিকে আরও কিছুদূর চলে গিয়ে খুব আস্তে-আস্তে গাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম।

সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় মেঘে ঢেকে গেল আকাশ। এত মেঘ যে কোন্‌ দিগন্তে লুকিয়ে ছিল কে জানে? হয়তো খনভাম ভুষুণ্ডা আর তার সঙ্গীদের মিছিমিছি এত জানোয়ার মারার কারণে দারুণ চটে গিয়ে চাঁদকে ঢেকে দিলেন মেঘে যাতে আমাকে ওরা দেখতে না পায়। কিন্তু অন্ধকার হয়ে গেলে ঋজুদাও ওদের আর দেখতে পাবে না। মহা মুশকিলে পড়া গেল। ঠাণ্ডা-ভিজে হাওয়া বইতে লাগল আর মেঘের মধ্যে গুড়গুড় করে বাজের ডাক শোনা যেতে লাগল। খনভাম্‌ কথা বলছেন। এখন খনভামের গলার স্বর, টেডি, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? আমরা তোমার মৃত্যুর বদলা নিতে এসেছি।

আহা! টেডি মানুষটা বড় সরল আর ধার্মিক ছিল।

কতক্ষণ পর আমি আন্দাজে গাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছলাম তা নিজেই জানি না। অন্ধকারে যতটুকু দেখা যায় তাতে ভাল করে দেখে নিলাম দূর থেকে। কান খাড়া করে শুনলাম কোনো আওয়াজ পাই কি না। হায়নার দল এসে সেই মরা লোক দুটোকে খাচ্ছে। দূর থেকে আমাকে দেখতে পেয়েই তারা হাঃ হাঃ হাঃ করে বুক-কাঁপানো হাসি হেসে উঠল।

কিন্তু নাঃ। হায়নার আওয়াজ ছাড়া কোনোই আওয়াজ নেই।

আফ্রিকার হায়নারা যে শুধু মরা মানুষ বা পশুর মাংসই খায়, তাই নয়; তারা দল বেঁধে বুনো কুকুরদের মতো শিকারও করে। যদিও শিকারের কায়দাটা অন্যরকম। তাই আফ্রিকান হায়নারা সিংহর চেয়ে কম ভয়াবহ নয়। খুব সাবধানে বন্দুকের ট্রিগার-গার্ডে আঙুল ছুঁইয়ে আস্তে-আস্তে গাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম।

গাড়ির দরজাটা আস্তে করে খুলে, দরজাটা বন্ধ না-করে লাগিয়ে রাখলাম। যাতে, শব্দ না হয় কোনো। তারপর অন্ধকারেই সুইচটার সঙ্গে চাবি আছে কি না হাত দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে দেখলাম।

একবার খুব জোরে বিদ্যুৎ চমকাল। ড্যাশবোর্ডের আলো জ্বালিয়ে তেল দেখলাম। আমার গলা শুকিয়ে গেল। তেল একেবারেই নেই। পিছনের হ্যারিকেনে হয়তো আছে, যদি-না ওরা তা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে; কিন্তু এখন তো তেল থাকলেও ঢালা যাবে না। ড্যাশবোর্ডের আলো জ্বালাবার পরই আমার খেয়াল হল যে, ওই আলোর সঙ্গে সাইড লাইটও নিশ্চয়ই জ্বলে উঠেছিল বাইরে। ওরা তাহলে জেনে গেছে যে, গাড়িতে কেউ ঢুকেছে।

আরেকবার বিদ্যুৎ চমকাল। আমি মাথা নামিয়ে নিলাম। ঠিক এমনি সময়ে গাড়ির নীচ থেকেই যেন সেই দুপুরে শোনা শব্দটা আবার শুনলাম, হিস্-স্-সস। যেন গাড়ির টায়ার পাংচার হল। আমি চমকে উঠলাম। বন্দুকটা শক্ত করে ধরলাম। জানোয়ারটা যে কী তা ঋজুদা একবারও বলেনি। দৈত্য-দানো নয় তো! গুগুনোগুম্বার বা ওগুরিকাওয়া বিবিকাওয়া কোনো আশ্চর্য জানোয়ারের রূপ ধরে আসেনি তো এই দুর্যোগের রাতে?

এখন গাড়ি চালিয়ে চলে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। জেরিক্যান থেকে তেল ঢাললেও শব্দ হবে অনেক। কী করব বুঝতে না পেরে আমি সামনের উইণ্ডস্ক্রীনের নবটা ঘুরিয়ে যাতে বন্দুকের নল বের করা যায় ততটুকু তুলে, চুপ করে বসে রইলাম। এবারে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছিল। একবার খুব জোর বিদ্যুৎ চমকাল। আর আমি মাথা নামানোর আগেই দেখলাম, চারজন লোক গাড়ির বেশ কাছে চলে এসেছে। ওরা দৌড়ে আসছে। নিঃশব্দে।

বন্দুকের নলটা বাইরে বের করে বাঁ হাতের তেলোর উপরে রাখলাম; যাতে শব্দ না হয়। ট্রিগার-গার্ডেও হাত ছুঁইয়ে রইলাম। বিদ্যুতের আলোতে দেখেছিলাম যে, ওদের তিনজনের হাতে তীর-ধনুক ও একজনের হাতে বন্দুক আছে। ওদের দেখে হায়নাগুলো আবার ডেকে উঠল। কিন্তু ভোজ ছেড়ে নড়ল না।

ওরা আরও একটু কাছে আসুক, একেবারে সিওর রেঞ্জের মধ্যে, আমি ব্যারেল ঘুরিয়ে একসঙ্গে দুটি ব্যারেলই ফায়ার করব।

সাঁত করে হঠাৎ একটা শব্দ শুনলাম। একটা হায়না সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বুঝলাম, বিষের তীর ছুঁড়ছে ওয়ান্ডারাবোরো। সঙ্গে-সঙ্গে অন্যান্য হায়নাগুলো পড়ি-কি-মরি করে পালাল। লোকগুলো প্রায় এসে গেছে, ঠিক সেই সময় হিস্-স্-স্-স্ শব্দটা আবার শুনলাম গাড়ির তলা থেকে। তারপরই কিছু বোঝার আগেই লোকগুলো চোঁ-চা দৌড় লাগাল যে দিক থেকে এসেছিল সেই দিকে। আর গাড়ির তলা থেকে একটা কিছু যেন ব্যালিস্টিক মিসাইলের মতো গতি আর শব্দে লোকগুলোর দিকে ধেয়ে গেল।

কী যে হল, কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি।

লোকগুলো ভয় পেয়ে শোরগোল করে উঠল। এবং অন্ধকারের মধ্যেও শব্দ শুনে মনে হল, যেন ওদের মধ্যে একজন ধুপ্ করে পড়ে গেল মাটিতে। অন্যরা কিন্তু দৌড়েই চলে যেতে লাগল এদিকে আর এলই না। মিনিট দশেক পরেই গভীর বৃষ্টিভেজা অন্ধকারে জঙ্গলের দিক থেকে একটা রাইফেলের আওয়াজ পেলাম। এবং তার একটু পরই একটা গাদা-বন্দুকের আওয়াজ। তারপরই সব চুপচাপ।

ঋজুদার কি কিছু হল?

আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা কাটল। ওদিক থেকে আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। এমনি সময় হঠাৎ গাড়ির পিছন দিক থেকে হাতির ডাক শুনতে পেলাম, প্যাঁ-এ-এ-এ-করে।

আমি মুখ ফিরিয়ে পিছন ফিরে দেখি আমার পেছনে স্লেট-কালো ভেজা আকাশের পটভূমিতে একটা ঘন কালো চলমান পাহাড়শ্রেণী এগিয়ে আসছে। ওদিকে গুলির শব্দের পর ঋজুদারও কোনো খবর নেই। এদিকে আমার এই অবস্থা! গাড়িটা যদি দুমড়ে মুচড়ে খেলনার মতো ভেঙে দিয়ে যায় তাতেও কিছু করার নেই। আমি ভয়ে আর পিছনে তাকালামই না। সামনে তাকিয়ে কাঠ হয়ে বসে রইলাম। এই শট্‌গান দিয়ে হাতিদের সামনে কিছুই করার নেই। আমার সামনে গুলি খেয়ে মরা দু-দুটো মানুষ পড়ে আছে। তাদের ফুলে-ওঠা মৃতদেহ হায়নারা খেয়ে গেছে খুবলে খুবলে। আরেকটা মানুষ পড়ে গেছে আরো সামনে। সে কেন পড়ল, বেঁচে আছে কি না তাও জানি না। কী জিনিস যে গাড়ির তলা থেকে ছুটে গেল তাও অজানা। যে হিস্-স্-স্ শব্দ করেছিল, সেই কি? জানোয়ারটা কী? তাদেরই মধ্যে পড়ে আছে বিষ-তীর-খাওয়া একটা হায়না। আর পিছনে ছুটে আসছে হাতির দল।

আশ্চর্য! হাতিগুলো গাড়িটাকে মধ্যে রেখে দুপাশ দিয়ে আমার সামনে এল। সমস্ত দিক গাঢ় অন্ধকার হয়ে গেল। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। উইণ্ডস্ক্রীনের সামনেই যে হাতিটা দাঁড়িয়ে ছিল সেটা একটা দাঁতাল। তার দাঁতটা এত বড় যে, গাড়ির ছাদটা সেই দাঁতের মাঝামাঝি পড়ছিল। নীচে প্রায় মাটিতে লুটোচ্ছিল সেই দাঁত। আমার মনে হল, ঐ হাতিটা যে-কোনো চকমিলানো দোতলা বাড়ির সমান।

হাতির দল নানারকম শব্দ করছিল শুঁড় দিয়ে—ফোঁস ফাঁস, ফোঁ ফাঁ করে। শুঁড় হেলাচ্ছিল, দোলাচ্ছিল। গাড়ির বনেট আর উইণ্ডস্ক্রীন আর ট্রেলারের উপরে শুঁড় বোলাচ্ছিল। মিনিট দশেক তারা গাড়িটাকে এরকম করতে থাকল। ভাগ্যিস নাইরবি সর্দারের কলা আর পেঁপে শেষ হয়ে গেছিল, নইলে মুশকিল ছিল আমার। ভুষুন্ডা আর টেডির উগালির ভুট্টা ও আমাদের চালডালও সব তাঁবুতেই পড়ে আছে। ওসব খাবার যদি ট্রেলারে থাকত, তবে খুবই বিপদ হত।

এর পরই একটা সাংঘাতিক কাণ্ড হল। হাতিগুলো ঐ লোকগুলোর মৃতদেহ দুটি শুঁড়ে তুলে নিয়ে লোফালুফি করতে লাগল। করতে করতে ক্রমশই সামনের জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। যত দূরে যেতে লাগল গাড়ি থেকে, ততই তাদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। বৃষ্টির মধ্যে তাদের জল-ভেজা যুদ্ধ-জাহাজের মত শরীরগুলো বিদ্যুতের আলোয় চকচক করে উঠছিল।

ঘটনার পর ঘটনাতে স্তম্ভিত মন্ত্রমুগ্ধ আমি ভাবছিলাম, এ সবই হয়তো থনভামের কীর্তি। নইলে কেন হাতিগুলো আমার কোনো ক্ষতি করল না। তার বদলে, যে-বীভৎস দৃশ্য আমার পক্ষে দেখা সম্ভব হচ্ছিল না, তারা সেই দৃশ্যও আমার চোখের সামনে থেকে শুঁড়ে-শুঁড়ে সরিয়ে নিয়ে গেল কেন?

গাড়ির মধ্যে বসে-বসে ঘুম পেয়ে গেল। এত বেশি উত্তেজিত ও ক্লান্ত ছিলাম যে, খিদের কথা মনেও এল না। ওয়াটার বট্‌ল থেকে একটু জল খেলাম, তারপর নিজের জীবনের, ঋজুদার জীবনের সব দায়িত্ব খনভাম-এর উপর চাপিয়ে দিয়ে পা-ছড়িয়ে, বন্দুকটার নল বাইরে করে বসে রইলাম, টুপিটা চেপে মাথায় বসিয়ে। গাড়ির ভিতরটাই এত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে যে মনে হচ্ছে, ফ্রিজ-এর মধ্যে বসে আছি। বাইরে না জানি আজ কী ঠাণ্ডা! ঋজুদা এখন কী করছে, বেঁচে আছে কি না কে জানে? ঋজুদা যদি কাল সকালবেলাতে ফিরে না আসে, তাহলে আমি কী করব, কী কী করা উচিত—ভাবতে পারছিলাম না। কিন্তু ভাবতে হচ্ছিল।

এবারে পর-পর যেসব ঘটনা ঘটল, চোখের সামনে যত মৃত্যু ঘটতে দেখলাম, এবং আশ্চর্য—নিজেও ঘটালাম, এর পর ঋজুদা অথবা আমি মরে গেলেও অবাক হবার কিছু নেই।

দেখতে-দেখতে চোখের সামনে ভোর হয়ে এল। বনে-জঙ্গলে, নদীতে-পাহাড়ে সূর্য-আসা আর সূর্য-যাওয়া প্রতিদিনের যে কত বড় দুটি ঘটনা তা যাঁদের চোখ-কান আছে তাঁরাই জানেন। কত আশ্চর্য রঙের হোরি-খেলা, কত রাগ-রাগিনীর আলাপ, কত শিল্পীর তুলির আঁচড়, কত শান্ত, নরম, আলতো গন্ধ—সব মিলিয়ে-মিশিয়ে যিনি সব গায়কের গায়ক, সব শিল্পীর শিল্পী, সব সুগন্ধের গন্ধরাজ, তিনিই এই পৃথিবী-ঘরের বাতি নেভান, বাতি জ্বালান। ঘরের বাইরে এলেই, দেশে এবং এই বিদেশেও তাঁকেই দেখি, দেখতে পাই। ঋজুদা যেমন আমাকে শিখিয়েছে, তেমনই আমি আকাশ বাতাস জল স্থল পাখি হরিণ মানুষ ফড়িং—এই সবের মধ্যেই তাঁকে দেখি।

ভোর হয়েছে কিন্তু সূর্য এখনও মেঘে ঢাকা। অন্ধকার কেটেছে প্রায় পনেরো মিনিট। ঋজাদা তবু এল না। এবার যা করার নিজেকেই বুদ্ধি করে করতে হবে। কম্যাণ্ডারের আজ্ঞা অমান্য করতে হবে, কারণ কম্যাণ্ডারের এতক্ষণে ফিরে আসা উচিত ছিল।

গাড়ির দরজা খুলে চাবিটা পকেটে নিলাম। এই চাবি হাতছাড়া করাতেই ভুষুণ্ডা এমন একটা লং-রোপ্ পেয়ে গেছিল। লোডেড বন্দুক কাঁধে আবার জঙ্গলের দিকে চলতে লাগলাম। কাল যেখান দিয়ে বেরিয়েছিলাম সেই দিকে। সাবধানে জঙ্গলের কিনারা, কিনারার আশেপাশের গাছ ইত্যাদি দেখতে দেখতে এগোচ্ছি। হঠাৎ চোখে পড়ল কতগুলো শকুন উড়ছে বসছে, কামড়া-কামড়ি করছে রেড-ওট ঘাসের বন যেখানে ঢালু হয়ে জঙ্গলে নেমেছে সেইখানে।

আমার বুকটা ধক্ করে উঠল। কী দেখব কে জানে?

আর একটু এগোতেই দেখি, কালকে হাতিরা সেই মৃতদেহগুলিকে এখানে এনে ফেলেছে আর শকুনরা ভোজে লেগেছে, হায়নাদের পর।

তাড়াতাড়ি সরে এলাম। সরে আসার সময় লক্ষ করলাম যে, কালকে যে কোপিটা দেখেছিলাম তার উপরেও দুটো শকুন উড়ছে চক্রাকারে। ঐদিকে চেয়ে আমার মন যেন কেমন করে উঠল। এমনই করে। যাঁরা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরেন, তাঁরা জানেন একেই বলে সিক্সথ্ সেন্স। এর কোনো ব্যাখ্যা নেই; ব্যাখ্যা হয় না।

আমি আস্তে-আস্তে কোপির দিকেই চলতে লাগলাম। সামনের বনে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা। মনে হচ্ছে, মৃত্যু হাত বুলিয়ে গেছে এর উপর। কতগুলো বেবুন চিৎকার করছে আর একদল ব্যাব্‌লার ও থ্রাশার সরগরম করে রেখেছে জঙ্গল, বৃষ্টি ধরে যাওয়ার আনন্দে।

কোপির নীচে পৌঁছেই আমি চমকে উঠলাম। চাপ-চাপ

রক্ত পড়ে, জমে রয়েছে পাথরের উপর। তারপর রক্তের ছড়া চলে গেছে ভিতরে। বৃষ্টিতে যা ধুয়ে গেছে তা গেছে খোলা জায়গায়। যা ধোয়নি তা জমে আছে।

রক্তের দাগ দেখে উপরে উঠতে লাগলাম। একটু গিয়েই, যে সার্ডিনের টিন খুলে আমরা কাল দুপুরে গাছের উপর বসে খেয়েছিলাম, সেই খালি টিনটা উলটে পড়ে আছে দেখলাম। শকুনগুলো ঘুরে-ঘুরে উড়ছিল উপরে।

আমি বন্দুকটা সামনে ধরে, একটা বড় পাথরের আড়ালে শরীরটা লুকিয়ে ডাকলাম, "ঋজুদা! ঋজুদা!"

কোনো উত্তর পেলাম না। কিন্তু ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেল। ঋজুদা কি...? নাকি ভুষুন্ডাদের ডেরায় এসে পড়েছি আমি?

এমন সময় কারা যেন নেমে আসছে উপর থেকে শুনলাম। জুতো পায়েও নয়, খালি পায়েও নয়; যেন নূপুর পায়ে কারা নেমে আসছে। আরও ভয় পেয়ে গেলাম আমি। এ কী ব্যাপার। বন্দুকটা ওদের আসার পথে ধরে আমি তৈরি হয়ে রইলাম। ঠিক সেই সময় পাঁচটা আফ্রিকান স্ট্রাইপড জ্যাকেল একসঙ্গে হুড়োহুড়ি করে নেমে এল উপর থেকে। ওদের পায়ের নখের শব্দ পাথরের উপর ঐরকম শোনাচ্ছিল।

"নিখুঁত পরিষ্কার"

আমি সাবান চাইতেই
দোকানদার দিল হুইল—
বলল, "এর দাম সাবানের
চেয়ে বেশী নয়।"

কাপড়ের ময়লা এমন
চমৎকারভাবে ধুয়ে বেরোয়
দেখে আমি তো অবাক!
চোখে দেখেও বিশ্বাস
হয় না—হুইল-এ, কী দারুণ
ফেনা হয়!

হুইল, সাবানের চেয়ে কত
বেশী কাপড় ধোয়...
তাও নিখুঁত পরিষ্কার ক'রে।
সাবান তো শুধু
পুরোনপন্থীদের জন্যেই...।

দারুন ধোলাই শক্তি- চড়া দাম থেকে মুক্তি!

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-WL.10-203 BG

আমাকে দেখতে পেয়েই দুটো শেয়াল দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে এল। পাছে গুলি করলে শব্দ হয়, তাই ট্রিগার গার্ডে হাত রেখে ব্যারেল দিয়ে গুঁতো দিলাম ওদের। তাতেও কাজ না হলে গুলি করতে বাধ্য হতাম।

গ-র্-র্—গররররর্ করতে করতে ওরা নেমে গিয়ে পাথরের আড়ালে যেখানে রক্ত জমে ছিল, সেইখানে হুড়োমুড়ি করে চাটতে লাগল।

আমি আরও এক ধাপ উঠে গিয়ে ডাকলাম, "ঋজুদা! তুমি হলে সাড়া দাও। ঋজুদা!"

এমন সময় মনে হল কেউ বলল, "আমি। আয়।"

এত ক্ষীণ যে, ভাল করে শুনতে পেলাম না। মনে হল ভুল শুনলাম না তো!

আবারও যেন শুনলাম, "আয়—"

একপাশে ঘেঁষে, বন্দুক রেডি করেই, পাথরটা টপকে বাঁক নিলাম। নিয়েই...

ঋজুদার বাঁ পায়ে উরুর কাছে গুলি লেগেছে। গাদা বন্দুকের গুলি। বড় সীসার একটা তাল। পায়ের হাড় ভেঙে গেছে কি না কে জানে! রক্তে সারা জায়গাটা থকথক করছে। ঋজুদার ঠোঁট ফ্যাকাসে নীলচে। আমাকে দেখে আমার দিকে হাত তুলল। আমি হাতটা হাতে নিয়ে খুব করে ঘষে দিলাম। তারপর বললাম, "ভুষুন্ডা?"

ঋজুদা ডান হাতটা তুলে হাতের পাতাটা নাড়ল।

ফার্স্ট-এইড বাক্সটা হ্যাভারস্যাক থেকে বের করে ডেটল আর মারকিওক্রোমের শিশি আর তুলো বের করতে-করতে বললাম, "ডেড?"

ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, "পালিয়ে গেছে। আমি মিস্ করেছিলাম। এত অন্ধকার হয়ে গেল! মিস করলাম।"

"ভুষুণ্ডা কোথায়?" আমি শুধোলাম।

ঋজুদা বলল, "বোধহয় চলে গেছে। চলে না গেলে ও আমাকে শেষ করে যেত। ওর গুলিতে আমি যে পড়ে গেছি, তা ও দেখেছে।"

আমি যখন ঋজুদার ট্রাউজারটা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলে ঋজুদাকে ড্রেস করছিলাম, তখন ঋজুদা আমার এল-জি ভরা বন্দুকটা দু হাতে ধরে পাথরের পথের দিকে চোখ রাখছিল।

আমি বললাম, "শেয়ালরা তোমাকে কিছু করেনি তো!"

"নাঃ। তুই না এলে করত হয়তো। শকুনরাও করত। ওরা ঠিক টের পায়।"

পা-টা একেবারে থেঁতলে গেছে গুলিতে। কত যে টিস্যু আর লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে তা ভগবানই জানেন। আধ-ঘন্টা লাগল ঋজুদাকে ড্রেস করতে। তারপর দুটো কোডোপাই-রিন খাইয়ে বললাম, "ঋজুদা, তুমি এখানে থাকো। আমি গাড়িতে জেরিক্যান থেকে তেল ভরে, গাড়িটা কোপির যত কাছে আনতে পারি তত কাছে এনে তোমাকে তুলে নেব।"

ঋজুদা বলল, "ভুষুণ্ডা যদি চলে না গিয়ে থাকে তবে তো গাড়ির আওয়াজ শুনেই এসে তোকে মারবে।"

আমি বললাম, "এখন তো আর রাত নয় দিন। আমি তোমার থার্টি-ও-সিক্স রাইফেলটা নিয়ে যাচ্ছি। এখানে শর্ট রেঞ্জে বন্দুক অনেক বেশি এফেকটিভ। দু-ব্যারেলে এল-জি পোরা থাকল। তুমি এটা বুকের উপর নিয়ে শুয়ে থাকো।"

ঋজুদার হ্যাভারস্যাকটাকে ঠিকঠাক করে বালিশের মতো করে দিলাম। তাতে একটু আরাম হল। তারপর রাইফেলের ম্যাগাজিন ভর্তি করে চেম্বারেও একটা গুলি ঠেলে দিয়ে সেফ্টি ক্যাচে হাত রেখে আমি নেমে গেলাম।

নিজেরই অজান্তে আমার চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে এল। চোখ দুটো জ্বালা করতে লাগল। না-ঘুমোনোর জন্যে নয় প্রতিহিংসায়। তারপরই চোখ দুটি ভিজে এল আমার। ঋজুদার সামনে পারিনি। ঋজুদা কষ্ট পেত।

এখন পরিষ্কার দিনের আলো। আজ সকালে ভুষুণ্ডা যদি পাঁচশো গজের মধ্যেও তার চেহারা একবার আমাকে দেখায় তাহলে অস্ট্রিয়ায় তৈরি এই ম্যানলিকার শুনার রাইফেলের সফ্ট-নোজড্ গুলি তার বুকের পাঁজর চুরমার করে দেবে। ঋজুদার কাছে রাইফেল চালানো কতটুকু শিখেছি তার পরীক্ষা হবে আজ।

কোপি থেকে নামতে-নামতে দাঁতে দাঁত চেপে আমি বললাম, "ভুষুণ্ডা! তোমার আজ শেষ দিন।"

ফাঁকায় বেরিয়ে আমি হরিণের মতো দৌড়ে যেতে লাগলাম গাড়ির দিকে। হরিণ যেমন কিছুটা দৌড়ে যায়, তারপর থেমে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে, আমিও সেরকম করছিলাম। অবশ্য শিকারি ঠিক ঐ থমকে দাঁড়ানোর মুহূর্তেই হরিণকে গুলি করে। ভাবছিলাম, ভুষুণ্ডা যদি এখনও থেকে থাকে তাহলে গুলি করে আমাকে আবার হরিণ না বানিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যখন বন্দুকের ও তীরের পাল্লার বাইরে চলে গেলাম, তখন হেঁটে যেতে লাগলাম পেছনে তাকাতে তাকাতে।

রাইফেলটাকে গাড়ির বনেটের উপর শুইয়ে রেখে পিছনে গিয়ে দুটি জেরিক্যান থেকে তেল ঢাললাম ট্যাঙ্কে। মাঝে-মাঝেই ঐদিকে দেখছিলাম। নাঃ। কোনো লোকজনই নেই।

রাইফেলটা ভিতরে তুলে নিয়ে, সুইচ টিপতেই গাড়ি কথা বলল। বড় মিষ্টি লাগল সেই কথা! তারপর গীয়ারে ফেলে এগিয়ে চললাম কোপিটার দিকে। কাছে গিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে রাখলাম। ট্রেলার থাকলে গাড়ি ব্যাক করতে ভারী অসুবিধা হয়।

ভাল করে চারপাশ দেখে নিয়ে রাইফেল হাতে দৌড়ে উঠে গেলাম উপরে। গিয়ে দেখি, ঋজুদা নিজেই ওঠবার চেষ্টা করছে, কিন্তু চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে গেল। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল মুখ।

আমি বললাম, "কী করছ? চলো আমার কাঁধের নীচে তোমার পিঠটা লাগাও।" বলে, ঋজুদাকে কাঁধের ওপর নিয়ে খুব সাবধানে নামতে লাগলাম। ঐ অবস্থাতেও ঋজুদা শট্-গানটা দুহাতে ধরে ব্যারেলটা সামনে করে রাখল।

কোপির নীচে এসে দেখলাম নাঃ, কেউ কোথাও নেই।

ঋজুদাকে গাড়ি অবধি নিয়ে বাঁ দিকের দরজা খুললাম। কিন্তু ঋজুদা বলল, "আমি তো বসতে পারব না ঐভাবে!"

"তবে? কোথায় বসলে সুবিধে হবে তোমার?"

ঋজুদা বলল, "আমি তো এখন একটা বোঝা। যার নিজের হাত-পায়ে জোর নেই, সে বোঝা ছাড়া কী? আমাকে ট্রেলারের উপর উঠিয়ে দে। ট্রেলারে শুয়ে গেলেই যেতে পারব।"

আমি বললাম, "সে কী? ধুলো লাগবে, ঝাঁকুনি লাগবে। ঝাঁকুনিতে আরও রক্ত বেরোবে।"

ঋজুদা হাসবার চেষ্টা করল। বলল, "উপায় কী বল? নইলে তো আমাকে এখানে রেখে তোর একাই চলে যেতে হয়। এই ভাল, রোদ পোয়াতে-পোয়াতে, ঘুমোতে-ঘুমোতে দিব্যি যাব।"

আমি পিছনের সীট খুলে তার গদি দুটো এনে ট্রেলারের মালপত্রের উপরে পেতে দিলাম। তারপর ঋজুদাকে যতখানি আরাম দেওয়া যায় দিয়ে গুলিভরা শটগান, জলের বোতল ব্রান্ডির বোতল, হ্যাভারস্যাক সব হাতের কাছে রেখে, রাইফেলটা নিয়ে আমি ড্রাইভিং সীটে উঠে বসলাম।

গাড়ি স্টার্ট করে, একটু পরই টপ-গীয়ারে ফেলে দিলাম, যাতে তেল কম পোড়ে। কিন্তু ঋজুদার যাতে কম ঝাঁকুনি লাগে সেই জন্যে খুব সাবধানে আস্তেই চালাতে লাগলাম।

সামনে যতদূর চোখ যায় ঘাসবন। এখন মেঘ কেটে গেছে। পনেরো ডিগ্রী ইস্ট এবং ডিউ সাউথ-এর বেয়ারিং নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছি। মাঝে-মাঝে কম্পাস ও ম্যাপ দেখছি।

জঙ্গলে এসে ল্যান্ডরোভার বা জীপে বা গাড়িতে সামনের সীটে আমি একা এই প্রথম। হয় ঋজুদা চালায়, আমি পাশে বসি, নয় আমি চালাই, ঋজুদা পাশে বসে। আজ ঋজুদা ট্রেলারে শুয়ে আছে। খুব তাড়াতাড়ি কোনো ভাল হাসপাতালে ঋজুদাকে দেখাতে না পারলে গ্যাংগ্রিন সেট করে যাবে। পা-টা হয়তো কেটে বাদই দিতে হবে। কে জানে? ঋজুদা, লাঠি হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে, ভাবাই যায় না। ঋজুদাকে বাঁচানো যাবে না আর?

আমি আর ভাবতে পারছিলাম না।

মাঝে একবার গাড়ি থামিয়ে ঋজুদার পা আবার ড্রেসিং করে দিলাম। ট্রেলারের ঝাঁকুনিতে বেশ রক্ত বের হচ্ছে। মুখে কিছু বলছে না ঋজুদা, কিন্তু মুখের চেহারা দেখেই বুঝছি যে, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। গায়ে হু-হু করছে জ্বর। চোখ দুটো জবা-ফুলের মতো লাল। ট্রেলারের উপর সবুজ কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে তবুও আমার সঙ্গে দু-একটা রসিকতা করতে ছাড়ছে না।

ম্যাপটা একবার দেখিয়ে নিলাম ভাল করে। যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে তবে কে আমাকে গাইড করবে!

ঋজুদা বলল, "ঠিকই যাচ্ছিস। আমরা তো আর তাঁবুগুলো কালেক্ট করতে আগের জায়গায় যাব না—সোজাই চলে যাব। যাতে গোরোংগোরো-সেরোনারার মেইন রাস্তাতে পড়তে পারি।"

তারপর বলল, "তাঁবুগুলো তুলতে মোট দশ মাইল মতো ঘোরা হত, কিন্তু ওখানে আমার অবস্থার কারণ ছাড়াও অন্য কারণেও যাওয়া ঠিক নয়। ওয়াণ্ডারাবোরো যে আবার ওখানে ফিরে এসে ম্যাসাকার শুরু করেনি তা আমরা জানছি কী করে?"

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম ও ঋজুদার পরিচর্যার জন্য থামলাম আর-একবার। ঋজুদার গায়ে জ্বর, তবু আমি চীজ দিয়ে চারটে বিস্কুট, মালটি-ভিটামিন ট্যাবলেট আর ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিলাম ওঁকে।

ট্রেলারের তলায় হেলান দিয়ে উদাস চোখে দূরে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

হঠাৎ ঋজুদা গায়ে হাত দিয়ে বলল, "কী ভাবছিস? আমি মরে যাব? দূর বোকা! আমি যখন মরব, তখন আমার সুন্দর দেশেই মরব। বিদেশে মরতে যাব কোন দুঃখে। তাছাড়া, এখন মরলে তো চলবে না আমার রুদ্র। ভুষুন্ডার অ্যাকাউন্ট সেট্‌ল করতে আমাকে আবার আফ্রিকাতে আসতেই হবে। হয়তো এখানে নয়, অন্য কোনোখানে। সেবার একেবারে একা-একা শুধু ভুষুণ্ডার সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই আসতে হবে। আফ্রিকার যে-প্রান্তেই সে থাক না কেন, খুঁজে বের করতেই হবে। তা যদি নাই পারি, তাহলে হেরে গিয়ে হেরে থেকে বেঁচে লাভ কী? সে বাঁচা কি বাঁচা?"

আমি বললাম, "সেবার আমাকে সঙ্গে আনবে তো?"

ঋজুদা হাসল। বলল, "পরের কথা পরে। এখন ভাল করে খেয়ে নিয়ে গাড়িটা স্টার্ট কর। পা-টা যদি কেটে বাদই দিয়ে দেয়, তাহলে তো তোর উপর নির্ভর করতেই হবে। আর সেই জন্যেই কি মতলব করছিস যে, সাধের পা-টা আমার বাদই যাক?"

আমি ঋজুদার পাইপটা ভাল করে পরিষ্কার করে ভরে লাইটারটা হাতের কাছে দিয়ে সামনে যেতে-যেতে বললাম, "আচ্ছা ঋজুদা, আমরা যখন কাল দুপুরে ঐ দোলামতো জায়গাটাতে বসেছিলাম তখন হিস্‌স্‌স্‌স্ করে খুব জোরে কী একটা জানোয়ার ডেকেছিল? তুমি আমাকে গুলি বদলাতে বলেছিলে, মনে আছে?"

ঋজুদা পাইপে আগুন জ্বালাতে-জ্বালাতে বলল, "আছে। ঐ আওয়াজের মতো ভয়ের জিনিস আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে খুব কমই আছে। এক ধরনের সাপ। প্রকান্ড বড়, আর বিষধর। নাম গাবুন ভাইপার। আমাদের দেশের শঙ্খচূড়ের চেয়েও মারাত্মক। যদি কাউকে কামড়াবে বলে ঠিক করে, তাহলে দু মাইল যেতেও পিছপা হয় না। অনেকখানি উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে ছোবল মারে।"

আমার গা শিরশির করছিল, যখন মনে পড়েছিল যে, ঐ সাপকেই গাড়ির নীচে নিয়ে আমি কাল রাতে অতক্ষণ ছিলাম। ঋজুদাকে বললাম, কী করে সাপটা আমাকে বাঁচিয়েছিল আক্রমণ-কারীদের হাত থেকে।

ঋজুদা সব শুনে খুবই অবাক হল।

আমি স্টীয়ারিং-এ গিয়ে বসলাম।

এখন দু পাশে আবার অনেক জানোয়ার দেখা যাচ্ছে। শ'য়ে শ'য়ে থমসনস্ ও গ্রান্টস গ্যাজেল, টোপি, ওয়াইল্ডবীস্ট, ওয়ার্ট-হগস, জেব্রা। জিরাফ আর উটপাখি কম।

খুব বড় একদল মোষের সঙ্গেও দেখা হল। আফ্রিকাতে বলে 'ওয়াটার বাফেলো'। জলে-কাদায় ওয়ালোয়িং করে ওরা। সব দেশের মোষই করে। বিরাট দেখতে মোষগুলো—গায়ের রঙ বাদামি কালো। মোটা মোটা ঘন লোম। তবে শিংগুলো আমাদের দেশের জংলি মোষের মতো অত ছড়ানো নয়।

মাঝে-মাঝে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখছি। ঋজুদা ঠিক আছে কি না। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বাঁ হাতটা চোখের উপরে রেখে চোখ আড়াল করে ডান হাতে বন্দুকটার স্মল অব দ্যা বাট্ ধরে শুয়ে আছে ঋজুদা। খাওয়ার সময় জ্বরটা বেশ বেশি দেখেছিলাম। যে-চরিত্রের লোক ঋজুদা, যতক্ষণ না অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ নিজে মুখে একবারও বলবে না যে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে। জ্বর আরো বেড়েছে।

বড় অসহায় লাগছে আমার। আজ সন্ধে অবধি গাড়ি চালানোর পর কাল কতখানি তেল অবশিষ্ট থাকবে জানি না। আর জেরিক্যান নেই। কী হল তা ভুষুন্ডাই বলতে পারে। যে বেয়ারিং-এ যাচ্ছি তাতে গোরোংগোরো আগ্নেয়গিরি আর সেরোনারার মধ্যের পথটার কাছাকাছি আমাদের পৌঁছে যাওয়ার কথা। এখন কী হবে, কে জানে? ঋজুদাকে তাড়াতাড়ি কোনো হাসপাতালে না নিয়ে যেতে পারলে বাঁচানোই যাবে না। আর কিছুক্ষণ পর থেকেই গ্যাংগ্রিন সেট করবে।

স্টীয়ারিং ধরে সোজা বসে আছি। চোখ বন্ধ হয়ে আসছে ঘুমে। কাল রাতে ঘুম হয়নি—সামান্য তন্দ্রা এসেছিল শুধু শেষ রাতে। মারাত্মক ভুল। সেই তন্দ্রাকেই চিরঘুম করে দিতে পারত ভুষুণ্ডা। কী পাজি লোকটা। কে ভেবেছিল ও অমন চরিত্রের মানুষ? কেবলই ভুষুণ্ডার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠছিল আমার। আর টেডি? হ্যাঁ, টেডির মুখটাও। ওর মুখের উপর এখন অনেক মাটি!

ঘণ্টাদুয়েক চলার পর একবার দাঁড়িয়ে পড়ে ঋজুদাকে দেখে নিলাম। চুপ করে শুয়ে আছে। চোখ বন্ধ। কাছে গিয়ে বললাম, "কেমন আছ ঋজুদা?"

ঋজুদা চোখে খুলে হাসল একটু। বলল, "ফাইন।"

তারপরই বলল, "চল রুদ্র। জোরে চল। থামলি কেন?"

আমি দুটো ঘুমের বড়ি খাইয়ে দিলাম ঋজুদাকে। তারপর আবার স্টীয়ারিং-এ বসলাম। ভয়ে আমার তলপেট গুড়গুড় করতে লাগল। ঋজুদা একেবারেই ভাল নেই। নইলে আমাকে জোরে চলার কথা বলত না। পা-টার দিকে আর তাকানো যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ চলার পর ঠক্ করে একটা আওয়াজ শুনলাম উইণ্ডস্ক্রীনের বাইরে। তার পরই ভিতরে। দুটো সেৎসী মাছি

ঢুকে পড়েছে। গাড়িটা দাঁড় করিয়ে আমার টুপি দিয়ে ও দুটোকে মারতে যাব ঠিক এমন সময় পিছন থেকে ঋজুদার গলা শুনলাম যেন। যেন আমাকে ডাকছে।

তাড়াতাড়ি গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলে দৌড়ে যেতেই ঋজুদা বলল, "রুদ্র, রুদ্র, তাড়াতাড়ি আয়—" বলেই উঠে বসার চেষ্টা করে পড়ে গেল।

আমি পাগলের মতো হয়ে গেলাম। জানোয়ারের সঙ্গে বন্দুক-রাইফেল নিয়ে মোকাবিলা করা যায়। কিন্তু এদের সঙ্গে আমি কী করে লড়ব? রক্তপিশাচ মাছিগুলো থিকথিক করছে ঋজুদার পায়ে। আর শুঁড় ঢুকিয়ে রক্ত টানছে।

আমাকে একটাই কামড়েছিল ঐ মাছি। যখন হুলটা ঢোকায়, তখন সাংঘাতিক লাগে, তারপর মনে হয়, কেউ সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে রক্ত টানছে। কামড়াবার অনেক্ষণ পর অবধি জায়গাটা জ্বালা করতে থাকে অসম্ভব। একটা মাছি! আর এখানে অগুনতি।

আমি পাগলের মতো করতে লাগলাম। হাত দিয়ে, টুপি দিয়ে, যা পারি, তাই দিয়ে। কিন্তু ওরা ঠিকই বলেছিল, সেৎসী-দের দশটা জীবন। আমাকেও কামড়াতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে আমিও অজ্ঞান হয়ে যাব। আর ঋজুদার যে কী হচ্ছে তা সে নিজেও হয়তো জানে না।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। গাড়ির পিছনের সীটে টেডির বিরাট মাপের ডিসপোজালের ওভারকোটটা পড়ে ছিল। দৌড়ে গিয়ে ওটা নিয়ে এলাম। তারপর কোমরের বেল্ট থেকে ছুরি বের করে রক্তের উপরে বসা থিকথিকে মাছিগুলোকে ছুরি দিয়ে চেঁছে ফেলে, টুপি দিয়ে হাওয়া করতে-করতে ঋজুদাকে ওভারকোটটা দিয়ে ঢেকে দিলাম পুরো। ঢাকবার সময় লক্ষ করলাম, ঋজুদার চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে।

বললাম, "ঋজুদা, কেমন আছ?"

ঋজুদা প্রথমে উত্তর দিল না। তারপর অনেক্ষণ পর, যেন অনেকদূর থেকে বলল, "ফাইন।"

তাড়াতাড়ি দু হাত এলোপাতাড়ি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমি স্টীয়ারিংয়ে বসে যত জোরে গাড়ি যেতে পারে তত জোরে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলাম। ভয় ছিল, ঝাঁকুনিতে ঋজুদা ট্রেলার থেকে পড়ে না যায়। কী ভাবে যে গাড়ি চালাচ্ছি তা আমিই জানি। এত মাছি ঢুকে গেছে! কিন্তু ঐ মাছির এলাকা না পেরোলে আমরা এদের হাতেই মারা পড়ব।

প্রায় আধ ঘণ্টা জোর গাড়ি চালিয়ে গিয়ে থামলাম। প্রথমে গাড়ির মধ্যে যে ক'টা মাছি ঢুকে আমাকে আক্রমণ করেছিল তাদের মারলাম। শুধু মারলামই না। এদের কামড়ে এতই যন্ত্রণা হয় যে, সত্যিই এদের মেরে ধড় থেকে মুণ্ডুটা টেনে আলাদা না করলে, মনে হয়, প্রতিহিংসা ঠিকমতো নেওয়া হল না। এখন বুঝতে পারছি, কেন এই হাজার-হাজার মাইল ঘাস-বন এমন জনমানবশূন্য। এখানকার জংলি জানোয়ারেরা আদিম কাল থেকে এখানে থাকতে থাকতে এই মাছিদের কামড়ে ইমিউন্ হয়ে গেছে। প্রকৃতিই ওদের এমন করে দিয়েছে, নইলে এখানে ওরা থাকত কী করে?

দরজা খুলে নেমে আবার ঋজুদার কাছে গেলাম। বোধহয় জ্ঞান নেই। গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। বার-বার ডাকলাম। অনেক্ষণ পর যেন আমার নাম ধরে সাড়া দিল একবার।

আমি কী করব? এদিকে সন্ধে হয়ে আসছে। এত জ্বরে ঋজুদা বাইরের ঠাণ্ডায় কী করে শোবে?

সেদিনকার মতো ঐখানেই থাকব ঠিক করলাম। এখন যা-কিছু করার, সিদ্ধান্ত নেবার, সব আমাকেই করতে হবে।

ঋজুদার গা থেকে টেডির ওভারকোট সরিয়ে দিলাম। চারটে মাছি তখনও তার নীচে ছিল। রক্ত খেয়ে ফুলে বোলতার মতো হয়ে গেছে প্রায়। সেই চারটেকে মারা কঠিন হল না। নড়বার ক্ষমতা ছিল না ওদের। আমি জ্যান্ত অবস্থাতেই ওদের ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করলাম।

তারপর হাত ধুয়ে এসে ঋজুদার জন্যে খাবার বানাতে বসলাম। শক্ত কিছু খাওয়ার মতো অবস্থা ছিল না। এদিকে গরম কিছু দেব তারও উপায় নেই। না আছে সঙ্গে স্টোভ, না কোনো জ্বালানি। ট্রেলারের কোণ থেকে একটা প্যাকিং বাক্স বের করে সেটাকে ভেঙে ,ঘাস পরিষ্কার করে একটু আগুন করলাম। কফির জল চাপিয়ে, তার মধ্যে ক্রীমক্র্যাকার বিস্কুট দিয়ে দিলাম গোটা ছয়েক। সেগুলো গলে গেলে তার মধ্যে এক চামচ কফি দিলাম। দুধ ছিল না। আমার হ্যাভারস্যাকে যে ওষুধ-ব্র্যান্ডি ছিল তার চার চামচ ঢেলে দিলাম সেই মগে। তার-পর ভাল করে নেড়ে ঋজুদার কাছে গিয়ে তার মাথাটা কোলে নিলাম। ঋজুদা অনেক কষ্টে চোখ খুলল। বললাম, "মাছিরা আর নেই। এবারে খেয়ে নাও।"

ঋজুদা হাত নেড়ে অনিচ্ছা জানাল।

আমি ছাড়লাম না। বললাম, "খেতেই হবে।" জোর করে মগটাকে ঠোঁটের কাছে ধরলাম।

একটু-একটু করে চুমুক দিতে-দিতে ঋজুদা পুরোটা চোখ খুলল। খাওয়া শেষ হলে আমি তুলে বসালাম ঋজুদাকে। বললাম, "পাইপ খাবে না? তুমি কতক্ষণ পাইপ খাওনি, ঐ জন্যেই তো এত খারাপ লাগছে তোমার। যার যা অভ্যেস। আমি ভরে দেব?"

ঋজুদা একটু হাসল। তারপর মাথা নাড়ল।

হ্যাভারস্যাকের পকেট থেকে পাইপটা বের করে নতুন তামাকে ভরে দিলাম।

কয়েক টান দিয়েই ঋজুদাকে অনেক স্বাভাবিক দেখাল। হ্যাভারস্যাকে হেলান দিয়ে বসে বলল, "পা-টা একটু তুলে দে তো রুদ্র।"

তুলে দিলাম। ঋজুদা আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "জানিস, আমার বন্ধুরা বিয়ে করিনি বলে কত ভয় দেখিয়েছে। বলেছে—"

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল ঋজুদার। তবু টেনে টেনে বলল, "বলেছে যে, আমাকে দেখার কেউ নেই। থাকবে না।"

তারপর একটু পর বলল, "ওরা ভুল। একেবারে ভুল।"

দম নিয়ে পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে ঋজুদা বলল, "রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে, আত্মীয়তা দু'রকমের হয়। রক্তসূত্রের আর ব্যবহারিক সূত্রের। প্রথম আত্মীয়তার বাঁধনে কোনো বাহাদুরি নেই, চমক নেই। কেউ রাজার ছেলে, কেউ ভিখিরির মেয়ে। কিন্তু তোর-আমার আত্মীয়তার গর্ব আছে। তুই আমার জঙ্গলের বন্ধু। তুই আমার সেভিয়ার।"

একটু দম নিয়ে বলল, "বড় ভাল ছেলে রে তুই।" বলে, আমার চুল এলোমেলো করে দিল বাঁ হাত দিয়ে।

আমার চোখ জলে ভরে এল। মুখ ঘুরিয়ে নিলাম আমি।

তারপর আমিও খেয়ে নিলাম ঐ কফি আর বিস্কুট। ঋজুদা কথা বলছিল দেখে আমার খুব ভাল লাগছিল। খাওয়ার পর টেডির বড় ওভারকোটটার কোনায় ট্রেলারের ত্রিপলের দড়ি বেঁধে তাঁবুর মতো ঋজুদার মাথার উপরে টাঙিয়ে দিলাম, যাতে ঠাণ্ডা না লাগে রাতে।

পশ্চিমাকাশে শেষ-সূর্যের গোলাপি মাখামাখি হয়ে ছিল। দুটি ম্যারাবু ও সারস উড়ে যাচ্ছিল ডানা মেলে। হলুদ-মাথা বড় বড় কতগুলো ফেজেণ্ট দৌড়ে যাচ্ছিল সিঙ্গল ফর্মেশানে দূরে দিয়ে। আমাদের ডান দিক থেকে সিংহের ডাক ভেসে এল কয়েকবার।

আজও রাত জাগতে হবে। ঋজুদার পাশে ট্রেলারের উপর মাঝে-মাঝে শুয়ে নেব। অন্য সময় গাড়ির চারপাশে পায়চারি

প্রতিদিনের সঞ্চয় পঞ্চাশটি পয়সা
ভবিষ্যতে মিটাবে আপনার আশা।
আপনার উপার্জিত অর্থ থেকে প্রত্যেকদিন পঞ্চাশ পয়সা ক'রে সঞ্চয় করলে ২০ বৎসর পর আপনার একান্ত আকাঙ্ক্ষিত বাসনা অর্থাৎ কন্যার বিবাহ, সন্তানের উচ্চশিক্ষা, ছোট্ট একটি বাড়ী অথবা চাষের প্রয়োজনীয় মেসিন বাস্তবে রূপ পাবে। আজই ফেবারিটের মাধ্যমে সঞ্চয় সুরু করুন।
আমাদের বিনিয়োগ কেবলমাত্র সরকার ও সরকারী সংস্থায়
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান কর্মসচিব: শ্রী এন. দে
FAVOURITE SMALL INVESTMENT LIMITED
ফেবারিট স্মল ইনভেস্টমেণ্ট লিমিটেড
রেজি ঃ ও হেড অফিস ঃ ৮৩ পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১৬
ফোন ঃ ২৪৬৬৫৩, ২৪৭২৮১

রব। ঋজুদার পায়ের এই রক্তের গন্ধ হয়তো অনেক জানোয়ারকে ডকে আনবে। সকালবেলার শেয়ালগুলোর মতন। বোধহয় শুক্লা ষ্টমী কি নবমী, চাঁদটা ভালই উঠবে সন্ধের পরে।

সূর্য ডুবে যেতেই রাইফেল ও বন্দুককে গুলি ভরে হাতের কাছে ঠিকঠাক করে রেখে ঋজুদাকে কম্বল মুড়ে ভাল করে শুইয়ে দিলাম আরো দুটো ঘুমের বড়ি খাইয়ে। আর কিছু দেবার মতো নেই। তার আগে পা-টা আবার ডেটল দিয়ে ধুইয়ে, ওষুধ লাগিয়ে দিলাম।

ঋজুদার এখন যা অবস্থা তাতে প্রয়োজন হলেও বন্দুক রাইফেল কিছুই ছুঁড়তে পারবে না। তাছাড়া একটু আগেই বন্দুক লোড করার সময় প্রথম জানতে পারলাম যে, গুলিও ফুরিয়ে এসেছে। অনেক গুলি তাঁবু থেকে ভুষুণ্ডা এবং তার ওয়াণ্ডারাবো বন্ধুরা নিয়ে গেছিল। তাছাড়া আমরা তো আর শিকারে আসিনি। তাই খুব বেশি গুলি এবারে আনেওনি ঋজুদা।

বন্দুকের গুলি দু ব্যারেলে দুটো পোরার পর আর চারটে আছে। আমার উইণ্ডচিটারের পকেটে রেখেছি সে কটাকে। আর থার্টি ও সিক্স রাইফেলের ম্যাগাজিনে ও ব্যারেলের দুটো গুলি বাদ দিয়ে আর আছে তিনটে গুলি। ফোর ফিফটি ফোর হাণ্ড্রেড রাইফেলটাকে ভুষুণ্ডা তাঁবু থেকে নিয়ে গেছিল কিন্তু ঋজুদা ওটা তাঁবুতে রেখে যাবার আগে তার লক্‌টা খুলে নিয়ে নিজের হ্যাভারস্যাকে রেখেছিল। খালি স্টক্ আর ব্যারেল নিয়ে গেলে তো গুলি ছুঁড়তে পারবে না। আর সে-কারণেই ঋজুদা এখনও বেঁচে আছে। ভুষুণ্ডার হাতে গাদা-বন্দুক না থেকে যদি ঐ রাইফেল থাকত তবে গুলি লাগার সঙ্গে-সঙ্গে শকেই মরে যেত ঋজুদা।

অন্ধকার হয়ে আসতে-না-আসতেই চাঁদ উঠল। তারা ফুটল। সিংহগুলোর ডাক ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল! এখন আর ওরা ডাকছে না, আস্তে-আস্তে এগিয়ে আসছে এদিকে। সবসুদ্ধু গোটা সাতেক আছে। আরও কাছে আসতে দেখলাম দুটো সিংহ, দুটো সিংহী আর তিনটে বাচ্চা। একেবারে ছোট বাচ্চা নয়, মাস চারেকের হবে।

গুলি করলে আক্রমণ করতে পারে। তাছাড়া ওরা বিপদ না ঘটালে গুলি করবই বা কেন? আমি একা। গুলি নেই বেশি। তারপর রাত। তাই রাইফেল না তুলে আমি বড় টর্চ দুটো ওদের দিকে ফেললাম। বণ্ড-এর টর্চ। পাঁচ ব্যাটারির। খুব সুন্দর আলো হয়। সামনের সিংহী দুটো আলোতে থমকে দাঁড়াল। তারপর টর্চ দুটো নিয়ে আমি নাইরোবি সর্দার যেমন করেছিল গাড়ির বনেটের উপর দাঁড়িয়ে, তেমনি ট্রেলারের উপর দাঁড়িয়ে আলো নিয়ে মশালের মতো কাটাকুটি করতে লাগলাম উপরে-নীচে।

সিংহগুলো কিছুক্ষণ গরর্-গরর্ করে ফিরে গেল। আসলে ওরা ব্যাপারটা কী তাইই বোধহয় দেখতে এসেছিল। কেউ যদি ঘুম ভেঙে উঠে তার বাড়ির উঠোনে একটা মস্ত গাছ হয়েছে দেখতে পায়, তো অবাক হবে না? ওদেরও সেই অবস্থা। নিজেদের আদিগন্ত ঘাসবনে অদ্ভুত দেখতে এই নতুন চাকা লাগানো জন্তুটা কী তাই বোধ করি ভাল করে দেখতে এসেছিল।

পেঁচা ডাকতে-ডাকতে উড়ে গেল ধাস-ইঁদুরের খোঁজে। ঘাসের মধ্যে এদিক ওদিক সরসর, শিরশির আওয়াজ শুনতে লাগলাম। রাতের প্রাণীরা সব জেগেছে। সাপ, ইঁদুর, নানা-রকম পোকা, পেঁচা, খরগোশ। দূর দিয়ে একদল ওয়ার্ট-হগ মাটিতে ধপ-ধপ আওয়াজ করে দৌড়ে চলে গেল। চাঁদের আলো পরিষ্কার হলে দেখা গেল আমাদের সামনে অনেক দূরে মস্ত একটা ওয়াইল্ড বীস্টের দল চরে বেড়াচ্ছে।

বসে থাকতে-থাকতে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়ে থাকব। আচমকা ঘুম ভাঙতে, ঘড়িতে দেখি বারোটা বাজে। তার মানে বেশ ভালই ঘুমিয়েছিলাম, রাইফেল-বন্দুক পাশে রেখে। ভুষুণ্ডার লোকেরা এতদূরে পায়ে হেঁটে আমাদের কাছে আসতে পারবে না, কিন্তু জন্তু-জানোয়ার আসতে পারত। ঘুমোনো খুব অন্যায় হয়েছে। শিশির পড়েছে খুব। হলুদ ঘাসের সাভানা-সমুদ্রকে কুয়াশায় চাঁদের আলোয় শিশিরে মিলেমিশে মাঝ-রাতে কেমন নীলচে-নীলচে দেখাচ্ছে।

আমি ঋজুদার কপালে হাত দিলাম। জ্বর ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কাল যদি আমরা রাস্তায় পোঁছতে না পারি বা কোনো একটা উপায় না হয় তাহলে ঋজুদাকে এখানেই রেখে যেতে হবে। ঋজুদাকে রেখে গেলেও আমি যে যেতে পারব, তারও কোনো স্থিরতা নেই। এই প্রসন্ন অথচ নিষ্ঠুর, তেরো হাজার বর্গমাইল ঘাসের মরুভূমিতে জলের অভাবে খাবারের অভাবে তিল-তিল করে শুকিয়ে মরে যাব। ভুষুণ্ডা। ভুষুণ্ডাই এর জন্যে দায়ী। ওকে, ভুষুন্ডা! দেখা হবে!

আমি ট্রেলার থেকে নেমে আবার একটু আগুন করলাম। ঠাণ্ডায় আমার নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছে। কান দুটো আর নাকটা ঠাণ্ডায় এমন হয়ে গেছে যে, মনে হচ্ছে কেউ বুঝি কেটেই নিয়ে গেছে।

আবার কফি বানিয়ে দুটো বিস্কুট গুঁড়ো করে, তাতে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে ঋজুদাকে জাগিয়ে তুললাম।

ঋজুদা বলল, "কে? গদাধর? ভাল আছিস? চিঠি যা এসেছে, আমাকে দে।"

আমি চমকে উঠলাম। ঋজুদা ভুল বকছে নাকি? কলকাতায় তার বিশপ লেফ্রয় রোডের ফ্ল্যাট যে দেখাশোনা করে, সেই বহু-দিনের বিশ্বস্ত পুরনো লোক গদাধর। যার জন্যে আমরা বন-বিবির বনে গেছিলাম, সে।

আমি বললাম, "ঋজুদা! আমি! আমি রুদ্র।"

"ও। রুদ্র। সেই গানটা শোনাবি একটু।"

"কোন্ গান ঋজুদা?"

"সেই গানটা রে। 'ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা', তুই বড় ভাল গাস গানটা।"

আমি বললাম, "এইটা খেয়ে নাও ঋজুদা। অনেক ঘণ্টা হয়ে গেছে আগের বার খাওয়ার পরে।"

ঋজুদা প্রতিবাদ না-করে খেল। তারপর আমার পিঠে হাত দিয়ে বলল, "রুদ্র, তুই আমাকে এখানে ফেলে রেখে যাস না রে। মরেও যদি যাই, তাহলেও দেশে কিন্তু নিয়ে যাস আমাকে। আমাকে কবর দিতে বলিস আমাদের দেশের কোনো সুন্দর জঙ্গলে, আমারই প্রিয় কোনো জায়গায়। তুই তা সবই জানিস।"

আমি বললাম, "আঃ ঋজুদা! পাইপ খাও। খাবে?"

ঋজুদা মাথা নাড়ল। বলল, "না, ঘুমোব।"

আমি আর-একটা ঘুমের বড়ি দিলাম ঋজুদাকে। কম্বল ভাল করে গুঁজে দিলাম গলায় ঘাড়ে। নাড়াতে গিয়ে দেখি, ফুলে শক্ত হয়ে গেছে পা-টা। আমার ঘুমটুম সব উবে গেল। জল চড়ানোই ছিল, তাই কফি খেলাম একটু। গা-টা গরম হল।

তারপর অনেকক্ষণ পায়চারি করলাম রাইফেল কাঁধে গাড়ির চারদিকে। কিন্তু হঠাৎ মনে হল, এখন এনার্জি নষ্ট করা ঠিক নয়। কী যে লেখা আছে কপালে ভগবানই জানেন। হয়তো এনার্জির শেষ বিন্দুটুকুও প্রয়োজন হবে ভীষণভাবে।

ঋজুদার পাশে গিয়ে ট্রেলারে বসলাম। চারধারে নীলচে চাঁদের স্বপ্ন-স্বপ্ন আলো হলুদ ঘাসবনে ছড়িয়ে আছে। বসার আগে চারধার ভাল করে দেখে নিলাম। নাঃ, কিছুই নেই কোথাও।

নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দুঃস্বপ্নের মধ্যে জেগে উঠলাম। আঁ-আ-আ-আ করে এক সাংঘাতিক চিৎকারে। ধড়মড়

করে উঠে বসে দেখি আমার প্রায় গায়ের উপরে কটা বিদঘুটে জানোয়ার বসে আছে আর ঋজুদার পা কামড়ে ধরেছে আর একটা। আর ট্রেলারের তিন পাশে কম করে আরও আট-দশটা জানোয়ার দাঁত বের করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমার সম্বিৎ ফিরতেই বন্দুকটা তুলে নিয়ে, ব্যারেল দিয়ে, যে জানোয়ারটা ঋজুদার পা কামড়ে ধরেছে তাকে ঠেলা মারলাম—পাছে গুলি করলে গুলি ঋজুদারই গায়ে লাগে। ঠেলা মারতেই সে মাথা তুলল—সঙ্গে-সঙ্গে তার মাথার সঙ্গে প্রায় ব্যারেল ঠেকিয়ে গুলি করে দিলাম। হায়নাটা টাল সামলাতে না পেরে পিছন দিকে উলটে ট্রেলারের বাইরে পড়ে গেল। গুলির শব্দে আমার কাছেই যে হায়নাটা ছিল সে চমকে গিয়ে লাফ মারল নীচে। তাকেও গুলি করলাম অন্য ব্যারেলের গুলি দিয়ে। সে-ও পড়ে গেল। কিন্তু কী সাংঘাতিক এই আফ্রিকান হায়নাগুলো, প্রায় বুনো কুকুরেরই মতো, চারধার থেকে লাফিয়ে ট্রেলারে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল একের পর এক।

বন্দুকের দু ব্যারেলেই গুলি শেষ। এবার আমি থার্টি ও সিক্স রাইফেলটা তুলে নিয়ে ট্রেলারের উপর উঠে দাঁড়ালাম, যাতে তিন দিকেই ভাল করে দেখা যায়। ওরা না গেলে ঋজুদার পায়ের দিকে যেতে পারছি না। হায়নার চোয়ালের মতো শক্ত চোয়াল কম জানোয়ারেরই আছে। হাঙরের মতো তারা হাড় কেটে নিতে পারে কামড়ে। ঋজুদার গোড়ালির একটু উপরে কামড়ে ছিল হায়নাটা।

হায়নাগুলো লাফাচ্ছে আর ট্রেলারে ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে ধাক্কা মারছে ট্রেলারে। ট্রেলারটা কেঁপে উঠছে বারবার।

প্রথমে কয়েকবার গুলি বাঁচাবার জন্যে আমি ব্যারেল দিয়েই বাড়ি মারলাম ওদের মুখে মাথায়। কিন্তু সামলানো যাচ্ছে না। ওরা ক্রমাগত লাফাচ্ছে। ঋজুদার পায়ের রক্তের গন্ধ পেয়ে এসেছে ওরা। একটাকে ঠেকাই তো আর একটা উঠে পড়ে। যখন কিছুতেই ঠেকাতে পারছি না, তখন বাধ্য হয়ে গুলি করতে লাগলাম। থার্টি ও সিক্স-এর বোল্ট খুলি, আর গুলি করি। দেখতে দেখতে ম্যাগাজিন খালি হয়ে গেল। আমার মাথায় খুন চেপে গেছিল। মানুষের সহ্যশক্তির একটা সীমা থাকে। সেই সীমা এরা পার করিয়ে দিয়েছিল। তখনও আরো দুটো হায়না আস্ত ছিল, তাদের বিক্রম তখনও কমেনি। মৃত সঙ্গীদের শরীরের উপর দিয়ে লাফিয়ে উঠতে কী মনে করে, তারা থেমে গিয়ে টাটকা রক্তের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের সঙ্গীদেরই খেতে শুরু করল। ট্রেলারের চারধারে অনেকগুলো মরা হায়না, হাঁ করে পড়ে আছে। সে-দৃশ্য দেখা যায় না, ওদের গায়ের দুর্গন্ধে ওখানে টেঁকাও অসম্ভব। আমি এক লাফে ট্রেলার থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে এঞ্জিন স্টার্ট করে গাড়িটাকে আধ মাইলটাক দূরে নিয়ে গেলাম। তারপর দৌড়ে নেমে গেলাম ঋজুদার কাছে।

ঋজুদা, আশ্চর্য, পাইপ খাচ্ছিল।

আমি যেতেই বলল, "কানের কাছে যা কালীপুজোর আওয়াজ করলি, তাতে তো ওয়েস্টার্ন ছবির হীরোরাও শুনলে লজ্জা পেত।"

ঋজুদা কথা বলছে দেখে খুব খুশি হয়ে আমি বললাম, "ধুত।" তারপরই বললাম, "কতখানি কামড়েছে?"

ঋজুদা বলল, "মার্কুরিওক্রোম আর ডেটল লাগা। ব্যাটা মাংসই খুবলাতে গেছিল। ভাগ্যিস চেঁচিয়েছিলাম। বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। তুই না উঠলে আমাকে জ্যান্তই খেত।"

আমি বললাম, "দেখি পা-টা দাও।"

ঋজুদা বলল, "একে কম্বল, তার পরে ফ্লানেলের ট্রাউজার, তার নীচে মোজা ; ব্যাটা সুবিধা করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। টর্চ দিয়ে দ্যাখ তো রুদ্র।"

আমি টর্চ দিয়ে দেখে ওষুধ আর ডেটল লাগিয়ে বললাম, "কলকাতায় ফিরে তোমার ডান পায়ের জন্যে একটু পুজো দিও।"

ঋজুদা হাসল। তারপর আমাকে শুধোল, "গুলি কতগুলো আছে?"

বললাম, "রাইফেলের গুলি তিনটে, বন্দুকের দুটো।"

"হুঁ। আমার ডান পকেট থেকে পিস্তলটা বের করতো। এ-যাত্রায় আমার দ্বারা তোর আর কোনো সাহায্যই হবে না। পারলে আমি তো নিজেই গুলি করতে পারতাম হায়নাটাকে। আমি পারলাম না। পারি না..."

বলেই থেমে গেল।

আমার ভীষণ কষ্ট হল।

পিস্তলটা লোডেড ছিল। আটটা গুলি আছে এতে। কোমরের বেল্টের সঙ্গে বেঁধে নিলাম আমি। যে-কটা গুলি ছিল, বন্দুক এবং রাইফেলে লোড় করে সেফটি ঠিক করে রাখলাম।

বললাম, ''দেখো, আমি কিন্তু আর একটুও ঘুমোব না। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও এবারে সকাল অবধি।"

ঋজুদা ফিস ফিস করে বলল, "তুই তো কম ক্লান্ত নোস। ছেলেমানুষ।"

বলেই বলল, ''সরি, উ আর নট। আই অ্যাপলোজাইজ।''

আমি হাসলাম। কাঁধে হাত রেখে বললাম, ''ঘুমোও ঋজুদা।"

ভোর হল। বনে-জঙ্গলে ভোর মানেই দ্বিধা আর অনিশ্চয়তার অবসান।

আমি তাড়াতাড়ি ঋজুদার জন্যে শুধু একটু কফি করে দিলাম। খাবার সব শেষ।

ঋজুদা আমার দিকে একবার তাকাল কফির কাপটা হাতে নিয়ে। হ্যাভারস্যাকে হেলান দিয়ে উঠে বসতে গেল, কিন্তু পারল না। দেখলাম জ্বরটা আবার বেড়েছে। প্রায় বেহুঁশ।

আমিও একটু কফি খেয়ে গাড়ির এঞ্জিন স্টার্ট করে, কম্পাস দেখে, বিয়ারিং ঠিক করে নিয়ে চললাম গাড়ি চালিয়ে। কোথায় যাচ্ছি জানি না, এই চলার শেষে কী আছে তাও জানি না। জানি না, বড় রাস্তায় গিয়ে পড়তে পারব কিনা। কিন্তু এটা বুঝতে পারছিলাম যে, আজকের মধ্যেও যদি ঋজুদাকে হাসপাতালে নেওয়া না যায়, তাহলে বাঁচানোই যাবে না আর।

সকাল সাড়ে-আটটা নাগাদ চোঁ চোঁ আওয়াজ করে গাড়িটা বন্ধ হয়ে গেল। তেল শেষ হল বোধহয়। মিটার সেই কথাই বলছে। গাড়ি থামিয়ে ট্রেলারে গেলাম। জেরিক্যান ভাল করে পরীক্ষা করে দেখি জেরিক্যানের তলাটা ফুটো। কবে ফুটো হয়েছে, কেমন করে হয়েছে তা এখন জানার উপায় নেই। ভুষুণ্ডা ইচ্ছে করেই প্যাক করার সময় হয়তো খালি টিন ভরেছিল।

এখন আর কিছু করার নেই। গাড়ি আর চলবে না। ট্রেলারের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। জেরিক্যানটা নামিয়ে দেখি একটা খুব বড় আগামা গিরগিটি দৌড়ে গেল পায়ের সামনে দিয়ে। এই গিরগিটিগুলো দারুণ দেখতে। নীল শরীর, লাল গলা, আর মাথাটাও খুব সুন্দর। টেডি আমাকে চিনিয়েছিল।

গাড়িটা থেমে থাকায় ঋজুদা বলল, "কী হল রুদ্র?"

আমি বললাম, "তেল শেষ হয়ে গেল ঋজুদা।"

"ওঃ।" ঋজুদা বলল।

আমি বললাম, "তোমাকে একা রেখে আমি একটু দেখে আসব? দূরে যেন মনে হচ্ছে গরু চরছে।"

ঋজুদা বলল, "বাইনাকুলার দিয়ে ভাল করে দ্যাখ।"

বাইনাকুলার দিয়ে দেখে মনে হল, গরুই। আফ্রিকাতে তো নীল গাই নেই। দূর থেকে ভুলও হতে পারে। হয়তো কোনো হরিণ এখানকার বা বুনো মোষ। এখানের গরুদের রঙ লাল ও কালো। গায়ে লোমও অনেক।

ঋজুদা বলল, "সাবধানে যাবি। আমার জন্যে চিন্তা করিস না। জলের বোতলটা সঙ্গে নিয়ে যা।"

আমি কোমর থেকে পিস্তলটা খুলে ঋজুদাকে দিয়ে দিলাম। বললাম, "একা থাকবে, সঙ্গে রাখো।"

ঋজুদা আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর নিল।

কপালে হাত দিয়ে বললাম, "এখন কেমন আছ?"

ঋজুদা হাসল কষ্ট করে। তারপর বলল, "ফাইন।"

ফাইনই বটে, ভাবলাম আমি। রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে, জলের বোতলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

হাঁটছি তো হাঁটছিই, যতই হাঁটছি ততই যেন গরুগুলো দূরে-দূরে সরে যাচ্ছে। আশ্চর্য। তাছাড়া গরুদের কাছে কোনো রাখাল দেখব ভেবেছিলাম, কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না। গরুগুলো সত্যিই গরু না গুগুনোগুম্বার, বা ওগ্‌রিকাওয়াবিবিকা ওরা, তা বোঝা গেল না। সেই নির্জন, নিস্তব্ধ, হু হু হাওয়া, ঘাস-বনে ভর-দুপুরেও মনে নানান আজগুবি চিন্তা আসে। নিজেকে এত অসহায় লাগতে লাগল ঋজুদার কথা ভেবে যে, বলার নয়। বারোটা বাজে। আমাদের ল্যান্ড-রোভার আর ট্রেলর দেখাই যাচ্ছে না অনেকক্ষণ হল। সঙ্গে যদিও কম্পাস এনেছি তবু দিক হারাবার ভয় করছে। এ যে সমুদ্র। বেরিয়েছিলাম পৌনে ন'টায়, সোয়া তিন ঘণ্টা ক্রমাগত হেঁটেও গরুদের কাছে পৌঁছনো গেল না, কাউকে দেখাও গেল না। আশ্চর্য।

আমার গা ছমছম করতে লাগল। পিছু ফিরলাম আমি।

ক্লান্ত লাগছিল। তিন দিন হল বিশেষ কিছুই খাইনি। ঘুমও প্রায় নেই। শরীরে যেন জোর পাচ্ছি না আর। সবচেয়ে বড় কথা, মনটাও ধীরে-ধীরে দুর্বল হয়ে আসছে। তাহলে কি আমাকে আর ঋজুদাকে এইখানেই শকুন, শেয়াল আর হায়নার খাবার হয়ে থেকে যেতে হবে? পরে যদি কেউ এদিকে আসে তাহলে হয়তো আমাদের গাড়ি ল্যান্ডরোভার আর কঙ্কাল দেখতে পেয়ে, গাড়ির কাগজপত্র নেড়ে-চেড়ে আমাদের কথা জানতে পারে! অবশ্য যদি হাতি কি গণ্ডার কি বুনোমোষে ওগুলো অক্ষত রাখে।

আরও ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর দূর থেকে ট্রেলার সুদ্ধ ল্যান্ড-রোভারটাকে একটা ছোট্ট পোকার মতো মনে হচ্ছিল। আরও এগোবার পর দেখতে পেলাম কতগুলো পাখি গাড়িটার কাছে উড়ছে। ছোট-ছোট কালো পাখি।

আমি এবার বেশ জোরে যেতে লাগলাম। আরও ঘণ্টাখানেক লাগবে পৌঁছতে। পাখিগুলো আস্তে-আস্তে বড় হতে লাগল। আরও কিছুদূর যাওয়ার পরই বুঝতে পারলাম সেগুলো শকুন।

শকুন? কী করছে অতগুলো শকুন ঋজুদার কাছে? ঋজুদা কি...?

আমি যত জোরে পারি দৌড়তে লাগলাম। রাইফেলটা হাতে নিয়ে। আর-একটু এগিয়েই আমি রাইফেলটা উপরে তুলে একটা গুলি করলাম। ভাবলাম, শব্দে যদি উড়ে পালায়।

টেডি বলেছিল, যদি জীবন্ত কোনো লোককে শকুন তিন দিকে ঘিরে থাকে, তবে সে মারা যায়। আমাকে আর ঋজুদাকে

শকুনরা দুদিন আগে চারদিকে ঘিরেছিল।

শকুনগুলো উপরে উঠে ঘুরতে লাগল অনেকগুলো। তারপরই আবার নেমে এল নীচে। আর-একটু এগিয়েই আবার গুলি করলাম। কিন্তু এবারেও চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল না একটাও।

কাছে গিয়ে দেখি, গাড়ির ছাদে শকুন, ট্রেলারের উপর চার পাঁচটি শকুন এবং ট্রেলারের তিন পাশে অন্তত দশ-বারোটা বিরাট বড়-বড় তীক্ষ্ম ঠোঁট আর বিশ্রী গলার শকুন।

ওরা যেন ঝুঁকে পড়ে সকলে মিলে ঋজুদার নাড়ি দেখছে। নাড়ি থেমে গেলেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে ঋজুদার উপর।

আমার গায়ে কাঁটা দিল। শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠল।

আর সহ্য করতে না পেরে মাটিতে বসা একটা বড় শকুনের দিকে রাইফেল তুললাম। গুলিটা শকুনটাকে ছিটকে ফেলল কিছুটা দূরে। আমি দৌড়ে গিয়ে ওটাকে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিলাম। গাড়ি তো আর চলবে না। গাড়ির কাছে মরে পড়ে থাকলে আমাদেরই মুশকিল।

সঙ্গীর হাল এবং আমার রণমূর্তি দেখে বোধহয় একটু ভয় পেল ওরা। উড়ে গিয়ে সব জমায়েত হল মৃত সঙ্গীর কাছে।

কানের এত কাছে রাইফেলের আওয়াজেও উঠল না ঋজুদা। আমি দৌড়ে গিয়ে ডাকলাম, "ঋজুদা ঋজুদা।"

ঋজুদা কথা বলল না কোনো। মুখের উপর চাপা-দিয়ে রাখা টুপিটা সরিয়ে দেখলাম, চোখ বন্ধ। একেবারেই অজ্ঞান। গায়ে ভীষণ জ্বর।

রাইফেলের গুলি আর রইল না। এখন থাকার মধ্যে শটগানের দুটো গুলি মাত্র। প্রয়োজন হলেও ঋজুদাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারব না। আমি সত্যিই জানি না, এবার কী করব। আমার বড়ই ভয় করছে।

এদিকে বেলা পড়ে এসেছে। খিদে-তষ্টা সবই পেয়েছে, কিন্তু কোনো কিছুরই হুঁশ নেই যেন।

আমার একার জন্যেই একটু জল গরম করে কফি করলাম, আর কিছুই নেই। কফি খেয়ে, লম্বা রাতের জন্যে তৈরি হতে লাগলাম। ঋজুদার একেবারেই জ্ঞান নেই। কিন্তু নাড়ি আছে। খুব অস্পষ্ট ধুকপুক আওয়াজ হচ্ছে। কিছু খাওয়ানোই গেল না। ব্যাগ থেকে ব্র্যান্ডি-ওষুধটা নিয়ে একটু ঢেলে দিলাম জোর করে দাঁত ফাঁক করে। কিন্তু খেতে পারল না, কষ বেয়ে গড়িয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মুছে দিলাম।

অন্ধকার হয়ে এল। তারা ফুটলো একে একে। চাঁদও উঠেছে সূর্য যাবার আগেই। আমি বসে আছি ট্রেলারের উপর। ভাবছিলাম রাইফেলের গুলিগুলো শকুনদের উপর নষ্ট করলাম মিছিমিছি। আজ রাতে যদি হায়নারা আসে? অথবা আরও হিংস্র কোনো জানোয়ার?

কাল রাতের কথা মনে হতেই আমার বুক কেঁপে উঠল। আজ আর ঘুমোব না। ঘুমোলে হয়তো ঋজুদাকে টেনে নিয়েই চলে যাবে ওরা। যে করেই হোক আমাকে আজ সারা রাত জেগে থাকতে হবে।

রাত এগারটা বাজল। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রইলাম, মাথায় টুপি দিয়ে। বড় শীত বাইরে, ঋজুদার গায়ে ভাল করে কম্বল মুড়ে দিয়েছি। মাথার উপরে টেডির ওভারকোটের তাঁবুও খাটিয়ে দিয়েছি। রক্তে, ধুলোয়, শিশিরে কম্বলটার অবস্থা যাচ্ছেতাই হয়ে গেছিল। তাই আমার কম্বলটা দিয়েছি আজ।

আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, ঋজুদা আমাদের বাড়ি এসেছে কলকাতায়। মা ঋজুদার জন্যে পাটিসাপ্‌টা পিঠে করেছেন, আর কড়াইশুঁটির চপ। মায়ের কী একটা কথায় ঋজুদা খুব হাসছে। মা-ও খুব হাসছেন। আমিও। মায়ের শোবার ঘরের আলোগুলো জ্বলছে। মা সোফাতে বসে, আমি আর ঋজুদা খাটে। পায়জামা পাঞ্জাবি পরেছে ঋজুদা। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

ভীষণ ঘুমোচ্ছিলাম আমি। কে যেন আমার ঘুম ভাঙাল গায়ে হাত দিয়ে। তাড়াতাড়ি চমকে উঠে, হাতে-ধরা বন্দুকটা শক্ত করে ধরেই আমি চোখ খুললাম। দেখি, ট্রেলারের তিনপাশে পাঁচজন সাতফুট লম্বা মাসাই যোদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে, হাতে বল্লম ও কোমরে দা। ওদের বলে মোরান।

আমি ঘোর কাটিয়ে বললাম, "জাম্বো!"

ওদের মধ্যে একজন বোধহয় সোয়াহিলী জানে। সে বলল, "সিজাম্বো!"

বলেই, সকলেই প্রায় একই সঙ্গে পিচিক্ পিচিক্ করে থুতু ফেলল। বর্শার সঙ্গে পা জড়িয়ে অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি ঋজুদাকে দেখিয়ে বাংলায় বললাম, "এঁকে বাঁচাতে পারো ভাই?"

তারপর বোঝাবার জন্যে ঋজুদার পা-টা খুলে ওদের দেখালাম। পেটে হাত দিয়ে বললাম খাবারও নেই।

ওরা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। আবার পিচিক পিচিক্ করে থুতু ফেলল।

হঠাৎ আমার মনে হল, নাইরোবি সর্দারের দেওয়া হলুদ গোল পাথরটার কথা। ঋজুদা আমাকেই রাখতে দিয়েছিল সেটা। তাড়াতাড়ি আমি পকেট হাতড়ে সেটা বের করে ওদের দেখালাম। বললাম, "নাইরোবি সর্দার দিয়েছে। নাইরোবি। নাইরোবি।" দুবার বললাম।

ওরা পাথরটা হাতে নিয়ে, ভাল করে দেখে, সকলে একসঙ্গে কী সব বলে উঠল।

দুজন মাসাই দুটো হাত পাশে ঝুলিয়ে রেখেই সোজা উপরে লাফিয়ে উঠল তিন চার ফুট। তারপর হাতের মধ্যে থুতু ফেলে, দুহাতে থুতু ঘষে আমার মুখটা দুহাতে ধরল। বোধহয় আদর করে দিল।

প্রথম দিন নাইরোবি সর্দার এমন করাতে আমার বড় ঘেন্না হয়েছিল। ওডিকোলোন ঢেলে শুয়েছিলাম। আজ এই রাতে কিন্তু বড় ভাল লাগল। বড় ভালমানুষ ওরা, ভারী সহজ, সরল।

দেখতে-দেখতে দুটো বল্লমের মধ্যে একজনের লাল কম্বল কায়দা করে বেঁধে একটা স্ট্রেচার-মতো করে ফেলল ওরা। তারপর ঋজুদাকে তার উপর শুইয়ে, কম্বল দিয়ে ঢেকে, দুজনে কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে ইঙ্গিতে বলল, চলো।

ঋজুদার পিস্তলটা একজন আমার হাতে দিল। আমি কোমরে রাখলাম সেটা। বন্দুকটা হাতে নিলাম।

ওরা শনশন করে হাঁটতে লাগল।

ভিজে চাঁদের আলোর মধ্যে সেই ধু-ধু ঘাসের বনে সাত ফুট লম্বা লাল পোশাকের মাসাইদের গুগুনোগুম্বার বা ওগুরি-কাওয়া-বিবিকাওয়া বলে মনে হচ্ছিল আমার।

এরাও কি আমাদের সঙ্গে ভুষুণ্ডার মতো বিশ্বাসঘাতকতা করবে?

যারা ঋজুদাকে বইছিল তারা আগে-আগে প্রায় দৌড়ে চলল। মোরানদের মধ্যে যে সর্দার গোছের, সে আবার পিচিক্ করে থুতু ফেলে আমাকে কী যেন দুমদাম বলল। মানে বুঝলাম না।

যুদ্ধ করলেই আহত হয় কেউ-কেউ। ওরা যোদ্ধার জাত। জড়ি-বুটি, তুক-তাক এবং বনজ-ভেষজ দিয়ে আহতর চিকিৎসা ওরা নিশ্চয়ই জানে। জানে কি না আমি জানি না। এই মুহূর্তে আমি জানি যে, আমি ভীষণ খুশি। এত কিছুর পরে, এত ঘটনার পরে, এই মন-খারাপ-করা নির্জনতার মধ্যে মানুষের মুখ দেখে।

হাড়গোড় আর পাথরের গয়না-পরা, লাল হলুদ রঙে মুখে কপালে আঁকিবুঁকি কাটা, টাটকা-রক্ত-খাওয়া কতগুলো স্বাধীন, সাহসী, বড় মনের মানুষদের পিছনে-পিছনে ছোট্ট শহুরে মনের ছোট্ট ভীরু আমি ছোট-ছোট পা ফেলে চলতে লাগলাম।

দূর থেকে ওদের ড্রামের শব্দের মতো গুম্‌গুম্ করে সিংহ ডেকে উঠল। বারবার ডাকতে লাগল। আর একটা বড় পেঁচা আমাদের মাথার উপরে ঘুরে ঘুরে, উড়ে উড়ে, সঙ্গে-সঙ্গে চলতে লাগল। ডাকতে লাগল, কিঁচি কিঁচি কিঁচর...

গুগুনোগুম্বারের দেশের দুজন দৈত্যের মতো মানুষের কাঁধের উপর আমার ঋজুদার ঠান্ডা, নিথর, শরীরটা কাঁপতে কাঁপতে, দুলতে দুলতে যেন সেই নীলচে চাঁদের আলোয় ভেসে ভেসে উড়ে চলল এই আদিম আফ্রিকার কুয়াশা-ঘেরা রহস্যময় দিগন্তের দিকে।

মরিচকলি

নবনীতা দেবসেন

এক বনে দুই বুলবুল পাখি ছিল। তারা সারাদিন গান গাইত, আর নাচত, আনন্দে সারা বন ভরে রাখত। একদিন বুলবুল-বৌ বললে, "ওগো, আমার বড্ড কাঁচা লংকা খেতে ইচ্ছে করছে। কোথায় ভাল কাঁচা লঙ্কা পাওয়া যায় বলো তো?" (টিয়া, চন্দনা, বুলবুল এরা খুব লংকা খেতে ভালবাসে জানো বোধহয়? ওদের জিবে ঝাল লাগে না।) বুলবুল-বর তো তক্ষুনি উড়ে চলল কাঁচালঙ্কার খোঁজে। উড়তে, উড়তে, উড়তে—লংকা-বাগান আর খুঁজেই পায় না। সারা জংগলে একটা লংকাগাচ নেই। কাছাকাছি গাঁয়ে কেউই লঙ্কা-খেত করেনি, তারা মিষ্টি খেতে ভালবাসে। যদি বা কোথাও উটকো একটা লঙ্কাগাছ দেখতে পায়, হয় সব লঙ্কা পেকে লাল টুকটুক করছে, নয় মোটে ফলই ধরেনি ; ছোট সাদা-সাদা তারাফুল ধরেছে। শেষে ক্লান্ত হয়ে বুলবুল-বর একটা খুব উঁচু পাঁচিল দেখতে পেয়ে তার উপরে বসল। পাঁচিলের ভেতরে চেয়ে দেখে, আরে! কী সুন্দর বাগান! কত ফল, কত ফুল, কী সুন্দর পাহাড়, তাতে নীল ঝর্না বইছে আর ফুলের গন্ধে ম-ম করছে বাতাস। কিন্তু জনপ্রাণী নেই। পাখি ডাকছে না, প্রজাপতি উড়ছে না। মৌমাছি গুনগুন করছে না। এমন কী একটা পিঁপড়ের পর্যন্ত দেখা নেই। এ কী রকম বাগান রে বাবা? বুলবুল তো অবাক! এটা করেছেই বা কে? সেই মানুষজনরাই বা গেল কোথায়? ভাবছে, ভাবছে, এমন সময়ে হঠাৎ দেখে, বাগানের মধ্যিখানে, বাঃ কী চমৎকার একটা লংকা-চারা, ঝলমল করছে রোদে! কী সুন্দর পাতা তার। আর একটি মস্ত বড় কচি সবুজ কাঁচালঙ্কা বাতাসে দুলছে, সবচেয়ে ওপরের ডাল থেকে। তার গা-টি যেমন চকচকে তেমনি মোটাসোটা। তেমনি তাজা-টাটকা। কাঁচালংকাটি এমন নিখুঁত, কেউ যেন তাকে ধুয়ে-মুছে পালিশ করে সাজিয়ে রেখেছে। ওটা দেখেই বুল-বুলের সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। সে একমিনিটেই বৌয়ের কাছে পেঁছে গিয়ে বৌকে সংগে করে নিয়ে এল বাগানে। দুজনে মিলে পেট পুরে খেয়েও লংকাটি ফুরোল না। ওরা প্রায়ই উড়ে আসে, আর কাঁচালংকাটি একটু-একটু করে খেয়ে যায়। কেউ কিছু বলে না। খেয়ে-দেয়ে বুলবুল-বৌ খুব খুশি। গাছকে ধন্যবাদ জানাতে একটি অপূর্ব সবুজ পান্নার মতো দেখতে ডিম পেড়ে, লংকাগাছের নীচে রেখে দিয়ে দুই বুলবুল উড়ে ফিরে গেল নিজেদের বনে।

এদিকে হয়েছে কী, বাগানটা ছিল একজন জিন-এর। জিন-দের কথা জানো তো? দানো, আর কী। ঠিক ভূতও নয়, আবার ঠিক দৈত্যও নয়। মাঝামাঝি-মতন। এই জিন ঠিক বারো বছর ঘুমোয় আর বারো বছর জেগে থাকে। যখন জেগে থাকে তখন সে মন দিয়ে বাগান করে। কিন্তু কোনো জ্যান্ত প্রাণী ভয়ে তার বাগানে ঢোকে না। জিন তো জীব-জন্তু খায়? তাছাড়া জাদুর খেলা জানে, যদি কোনো ক্ষতি করে দেয়? বুলবুলরা না জেনে ঢুকেছিল। বুলবুলরা তো লংকা খেয়ে ডিম পেড়ে চলে গেছে, এমন সময়ে জিন-দানোর ঘুম ভেঙেছে। সে বিরাট হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে তার বাগানের খবরদারিতে বার হল। অত আহ্লাদের পোষা লংকাগাছের কাছে গিয়ে দ্যাখে লংকাফলটি ছিন্নভিন্ন, কে তাকে খেয়ে গেছে। জিনের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। কে খেল? কে খেল? কেউ তো নেই। কেউ তো আসে না? হঠাৎ দেখে গাছের তলায় ঠিক হিরে-পান্নার মতো একটা পাখির ডিম ঝলমল করছে। কী সুন্দর! জিন ডিমটা দেখে মুগ্ধ। তাড়াতাড়ি তুলে, যত্ন করে তুলোয় মুড়ে কুলুঙ্গিতে রাখল। ডিমটা পেয়ে সে তার লংকার দুঃখু ভুলে গেল। রোজ সে ডিম-টার দেখাশোনা করে।

একদিন সকালে দ্যাখে কী, ডিম ফেটে দুখানা হয়েছে, আর কুলুঙ্গির মধ্যে বসে আছে জগতের সবচেয়ে রূপসী ছোট্ট মেয়েটি। কী রূপ, কী রূপ। সারা গায়ে সবুজ পান্নার গয়না,

পরনে রেশমি সবুজ ঘাঘরা। সবুজ ওড়না, সবুজ চোখের তারা। আর তার গলায় একটি মস্ত পান্নার লকেট, ঠিক সেই কাঁচালঙ্কাটির মতন দেখতে। মানুষখেকো হলে হবে কী, জিন আসলে বাচ্চাদের খুব ভালবাসত। খুদে এই মেয়েটাকে দেখে তার আর আনন্দ ধরে না। সে তার নাম রাখল মরিচকলি। কাঁচালঙ্কার নামে তার নাম।

মরিচকলির যখন বারো বছর বয়েস হয়-হয়, জিনের মনে খুব ভাবনা হল, এবার তো সে ঘুমিয়ে পড়বে, তার আদরের মরিচকলিকে কে দেখবে? বারো বছর ধরে কী করে বাঁচবে সে।

এখন হয়েছে কী, ঠিক সেই দিনেই সে-দেশের রাজা আর মন্ত্রী-মশাই বনে এসেছেন মৃগয়া করতে। উঁচু-পাঁচিল-ঘেরা বাগান দেখে এত কৌতূহল হল তাঁদের যে, ঘোড়া বাইরে রেখে পাঁচিল ডিঙিয়ে তাঁরা ভিতরে ঢুকলেন। ঢুকেই দেখেন লঙ্কাগাছের পাশে মরিচকলি বসে-বসে মালা গাঁথছে।

রাজা বললেন, ''মন্ত্রী, একেই তো রানী করতে হবে।''

মন্ত্রী বললেন, ''বেশ, বেশ।''

মনের আনন্দে তখন মরিচকলিকে সেই কথা গিয়ে জানালেন তাঁরা। এদিকে মরিচকলি তো কখনো মানুষ দেখেনি। সেও রাজার রূপ দেখে মোহিত, মুগ্ধ। কিন্তু সে বলল, ''আমি তো কিছু বলতে পারব না, আমার বাবা জিন্ যাকে বলবেন আমি তাকেই বিয়ে করব।'' এমন সময়ে জিনের পায়ের ধুপধাপ শব্দ পেয়ে মরিচকলি তাড়াতাড়ি রাজামশাইদের ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে ফেলল। জিনমশাই এসেই বললেন, ''হাঁউমাঁউখাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ?''

মরিচকলি বললে, ''তাহলে আমাকেই খাও।''

জিন্ বললে, ''তা কখনো পারি মামণি? তোমাকে খেয়ে ফেললে তো চুকেই যেত আমার ভাবনা। এই যে আমি ঘুমিয়ে পড়ব, বারো বছর ধরে কে তোমাকে দেখবে?"

মরিচকলি বললে, ''এক কাজ করো না, বাবা, আমার বরং একটা বিয়ে দাও। তাহলে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা দেখবে।''

জিন্ বললে, ''দেব তো বিয়ে, কিন্তু পাত্র পাই কোথায়? তোমার যোগ্য পাত্র কি রাজবাড়িতে ছাড়া মিলবে?''

তখন মরিচকলি বললে, ''যদি তোমার কাছে রাজবাড়ির পাত্র এনে দিই, তুমি তার সঙ্গে ঠিক আমার বিয়ে দেবে তো? কথা দিচ্ছ?'' ঘটাং করে ঘাড় নেড়ে জিন্ কথা দিয়ে দিলে তক্ষুনি। মরিচকলি হেসে উঠে অমনি হাততালি দিল, আর ঝোপঝাড় থেকে রাজামশাই বেরিয়ে এলেন। মাথায় মুকুট, গলায় গজমোতির মালা, কোমরে তলোয়ার। সঙ্গে মন্ত্রী। জিন্ তো মনের মতো পাত্র দেখে মহা খুশি। তক্ষুনি হৈ হৈ করে সম্প্রদান করে ফেলল। আনন্দে সে কী তার হেঁড়ে গলায় গান! মেয়ের বিয়ে-টিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে জিন্ তার গাছতলায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। আ-হ্। বারোবছরের মতন এখন একটানা ঘুমোনোর কথা তার। কিন্তু হল কী? মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাচ্ছে, এই দুঃখে মানুষখেকো জিনেরও বুকের মধ্যেটা কেমন তোলপাড় করছে। জিন্ তো কই ঘুমোচ্ছে না? শুয়ে-শুয়ে কত কোটি কোটি ভেড়া, কত হাতি ভাল্লুক গণ্ডার গুনে ফেললে, তবু ঘুমই আসছে না চোখে। মেয়ের জন্যে ভেবে ভেবে মন এতই অস্থির হয়ে পড়ল যে, শেষটায় ''ধুত্তোর'' বলে জিন্ উঠেই পড়ল। আর থাকতে না পেরে, একটা সাদা পায়রা সেজে উড়েই গেল মেয়ের পিছনে-পিছনে। কেঁদে কেঁদে তখন তার চোখদুটি ফুলে লাল। অত উঁচু থেকে মেয়ের মুখখানি আর দেখতেই পায় না! দেখতেই পায় না! কী করে? তখন জিন্ বুদ্ধি করে পায়রা থেকে নিজেকে ঈগল পাখিতে বদলে নিলে। কেননা চিল, ঈগল, এদের চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ন, অনেক দূর থেকে দেখতে পায়। এবার সে দেখতে পেল, মেয়ে হেসে-হেসে রাজার সঙ্গে গল্প করতে-করতে ঘোড়ায় চড়ে মস্ত এক প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পাশে-পাশে মন্ত্রীমশাই। এবার সে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এসে বারো বছরের মতন ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে রাজার বাড়িতে একগাদা হিংসুটে বুড়ি থাকত। তারা মরিচকলিকে একদম পছন্দ করত না। কেমন করে ওকে তাড়ানো যায় তাই ভাবতে লাগল তারা। একদিন মরিচকলির কোলে খুব সুন্দর ফুটফুটে সাদা নোটন-পায়রার মতন একটি রাজপুত্র জন্মাল। তার রূপে রাজপুরীতে যেন হাজার-হাজার বাতি জ্বলে উঠল, রাজপুত্তুর এমনই রূপবান্। রাজামশাই খুব খুশি। মরিচকলিকে আরো আদরযত্ন করতে লাগলেন।

দেশসুদ্ধু লোক আনন্দ করছে—কেবল রাজবাড়ির হিংসুটে বুড়িরা ছাড়া। তারা মা-ছেলে দুজনকেই হিংসে করতে শুরু করে দিলে। হিংসে করলে হবে কী, মরিচকলির গলায় যে মরিচমানিক-রক্ষাকবচ ঝোলে? তারই জন্যে ওরা মরিচকলির কিছুতেই কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কাঁচালঙ্কার মতন দেখতে সেই যে ওর গলার পান্নার লকেট, সেইটেই হচ্ছে মরিচমানিক রক্ষা-কবচ। একদিন হল কী, মরিচকলি স্নান করতে গিয়ে গলার হারটা খুলে কলঘরে ফেলে এসেছে। হিংসুটে বুড়িরা তক্ষুনি সেটা চুরি করে নিয়ে নিল। তারপর গভীর রাত্তিরে মরিচকলির শোবার ঘরেব মধ্যে একটা মস্ত বঁটি হাতে করে পা টিপে টিপে ঢুকে পড়ল। ঢুকে দ্যাখে কী, সোনার প্রদীপে ঘিয়ের সলতেটি নিবু-নিবু, ছোট্ট-রাজপুত্তুরটিকে কোলের কাছে নিয়ে ছোট্ট মরিচকলি ঘুমিয়ে কাদা। কোনো আড় নেই, সাড় নেই। বুড়িরা তখন রাজপুত্তুরকে বঁটি দিয়ে কেটে কুচি কুচি করে, মরিচকলির কচি ঠোঁটে অনেকটা আলতা মাখিয়ে দিয়ে যেমন চুপি-চুপি এসেছিল, তেমনি চুপি-চুপি পালিয়ে গেল।

পরদিন সুয্যি ওঠার আগেই তারা গিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে রাজামশাইকে ঠেলে তুলল। —''ও রাজামশাই, উঠুন, উঠুন, সব্বোনাশ হয়েছে!'' হাঁউ-মাঁউ কান্না শুনে রাজা বললেন, ''কী হয়েছে? কী হয়েছে?''

"আর কী হয়েছে? দানো-জিনের মেয়ে কখনো মানুষ হয়? সেও জিন্-দানো। দেখুন গে যান নিজের চোখে। নিজের ছেলেকে নিজেই খেয়ে ফেলেছে—মাঝরাত্তিরে ঘুমের মধ্যে, কচমচিয়ে। ঠোঁটে রক্ত এখনো লেগে আছে।''

রাজা তো শুনেই দৌড়ে গেলেন। মরিচকলি তখনো অঘোরে ঘুমুচ্ছে। কাক ডাকেনি, আলো ফোটেনি। রাজা ঘরের দৃশ্য দেখেই মনের দুঃখে কেঁদে ফেললেন। একেই তো অমন সুন্দর রাজপুত্তুরের এই দশা। তার ওপরে অমন যে মিষ্টি মেয়ে মরিচকলি, আসলে তার এই রূপ? হায় ঈশ্বর! সোজা সভায় এসে রাজা বললেন, ''কোটাল, রানীকে এক্ষুনি বনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে কোতল করে ফ্যালো। কী সর্বনাশ! জিন্-দানো নিয়ে তো রাজ্য চলবে না! প্রজাদের ক্ষতি হবে।''

রাজা যতই বৌকে ভালবাসুন, সে তো মানুষ নয়। মানুষখেকো! কোটালমশাই আর কী করেন? ব্যাপারটা তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না, তবু রাজার আদেশ বলে কথা। চোখের জল চাপতে-চাপতে কোটালমশাই মরিচকলিকে শেকল পরিয়ে সেই বনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে কোতল করে ফেললেন। ছেলের দুঃখে মরিচকলি এতই কাঁদছিল যে, সে কিছুই বলল না। মরিচকলির কোনো কথা কেউ শুনল না। তার মরিচমানিক রক্ষাকবচটা তো বুড়িরা বিশ-বাঁও জলের তলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, কে আর তাকে রক্ষা করবে? মরিচকলিকে যেই না কোতল করা, অমনি আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটতে লাগল বনের মধ্যে। মরিচকলির ফর্সা শরীরটুকু একটা উঁচু শ্বেতপাথরের পাঁচিল হয়ে গেল, তার জলভরা সবুজ চোখদুটি হল টলমলে সরোবর, তার সবুজ ঘাঘরা হল সবুজ ঘাস, সবুজ ওড়না হল নরম লতাপাতা, তার লাল টুকটুকে ঠোঁট দুটি

হল গোলাপ ফুল, তার দাঁতগুলি ধবধবে জুঁই ফুল। এই অপূর্ব বাগানটিতে মরিচকলির প্রাণ একজোড়া বুলবুল-পাখি হয়ে বাসা বেঁধে রইল। এই বুলবুল পাখিরা সারাদিনই মরিচকলির দুঃখের কাহিনী গাইত, ছোট্ট রাজপুত্রের শোকে কাঁদত। আর রাজার নাম ধরে ডাকত।

রাজামশাই এদিকে মরিচকলিকে শাস্তি দিলেও, তারই শোকে পাগলের মতো হয়ে বনে-বনে ফেরেন। একদিন বনের মধ্যে এই উঁচু শ্বেতপাথরের দেওয়ালটা দেখতে পেলেন। তাঁর মনে পড়ল, এমনি একদিন এক পাঁচিল ডিঙিয়েই তিনি মরিচকলিকে পেয়েছিলেন। এটাও কী ভেবে ডিঙিয়ে তিনি বাগানের মধ্যে ঢুকলেন। না, এখানে কোনো লঙ্কাগাছ নেই। কিন্তু নরম সবুজ ঘাস, ঝলমলে লতাপাতা, রংচঙে গোলাপ, গন্ধভরা জুঁই, জলটলটলে সরোবরের ঠাণ্ডা বাতাস—রাজার শরীর মন সব জুড়িয়ে দিলে। বাগানের বাতাস যেন রাজারই নাম ধরে আদর করে ডাকছে। তারপর তিনি বুলবুল-পাখির গান শুনতে পেলেন। ছোট্ট রাজপুত্রের শোকে তার মা আকুল হয়ে কাঁদছে। শুনতে পেলেন একটি বুলবুল-পাখি বলছে, "রাজা কি অন্ধ? রাজা কি কালা? রাজার কি মন নেই? এ কেমন রাজা? হায় মরিচকলি, তোমার রাজা তোমাকে পেয়েও পেল না।" তার উত্তরে বুলবুল-বৌ বলছে, "রাজা যে খুব অন্যায় করে ফেলেছেন। এখন তিনি যদি বিশ-বাঁও জলের নীচে ডুব দিয়ে, মরিচমানিক উদ্ধার করে এনে আমাদের দুজনের বুকে ঠেকিয়ে দিতে পারেন, তাহলেই ছেলে-বৌ ফিরে পাবেন। হিংসুটে বুড়িরা ওর ছেলেকে মারবার আগে সেটা চুরি করে রাজবাড়ির দিঘিতে ছুঁড়ে ফেলেছিল।"

বুলবুলিদের কথা শুনে সব বুঝতে পারলেন রাজামশাই তাঁর দুঃখও দুগুণ বেড়ে গেল। তিনি তক্ষুনি ছুটে গিয়ে রাজবাড়ির দিঘিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে বিশ বাঁও জলের নীচে থেকে মরিচমানিকটি তুলে আনলেন। তারপরে ছুটতে-ছুটতে সেই বাগানে ফিরে গেলেন।

এবার রাজাকে দেখেই বুলবুল-পাখিরা উড়ে এসে তাঁর হাতে বসল। তাদের বুকে মরিচমানিক ঠেকিয়ে দিতেই রাজা দেখেন জ্যান্ত রাজপুত্তুর কোলে করে জ্যান্ত মরিচকলি কন্যে তাঁর সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। রূপ যেন ফেটে পড়ছে। সুখ যেন উপছে পড়ছে। বাগানের সব কুঁড়িগুলো ফুল হয়ে ফুটে উঠল, সব ডালপালা দুলে-দুলে হেসে উঠল খুশিতে।

রাজামশাই মরিচকলির পায়ে পড়ে বললেন, "মাপ করো রানি, না-বুঝে তোমাকে শাস্তি দিয়েছি।" মরিচকলি রাজাকে প্রণাম করে হাত ধরে তুলল, বলল, "এখন ওসব কথা থাক।"

এমন সময়ে জিন্-মশায়ের ঘুম ভাঙল। ঠিক বারোবছর কেটেছে। সে তক্ষুনি ঈগল-পাখি সেজে মেয়ের খোঁজে আকাশে ডানা মেলল। রাজবাড়ির কাছে এসে দেখে বনের মধ্যে নতুন একটি বাগিচা, তার মধ্যে রাজার কোলে মরিচকলি, মরিচকলির কোলে রাজপুত্তুর, তিনজনের মুখেই হাসি ধরে না। আর পাঁচিলের বাইরে একগাদা হিংসুটে বুড়ি জড়ো হয়ে গুজগুজ-ফুসফুস ষড়যন্ত্র করছে। অমনি "হাঁউ মাউ খাঁউ,—হিংসুটের গন্ধ পাঁউ" বলে জিন্ স্বমূর্তি ধরে সব কটা বুড়িকে কপ্ কপ্ করে পেঁয়াজি-ফুলুরির মতন খেয়ে ফেললে। তারপর বিরাট এক ঢেকুর তুলে, পাঁচিল টপকে বাগানে ঢুকল মেয়ে-জামাই-নাতিকে আশীর্বাদ করতে।

এতবড় ঘটনাটা যে ঘটে গেল, ছোট্ট রাজপুত্তুর কিন্তু কিছুই জানতে পারলে না। সে যেমনটি মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তেমনি মায়ের কোলে জেগে উঠেছে, এত কাণ্ড সে-বেচারি আর জানবে কেমন করে? (ভারতীয় উপকথা)

ছবি প্রণবেশ মাইতি

রিচার্ড ট্রিভিথকের স্টীম-এঞ্জিন

চাকার গল্প

পার্থসারথি চক্রবর্তী

মানুষ কবে প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছিল, তা কেউ জানে না। তবে যাঁর মাথায় প্রথম চাকা তৈরির আইডিয়া এসেছিল তিনি যে একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ—সে-বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই। এই আবিষ্কারকে দুনিয়ার সব যুগের মানুষ তারিফ করে এসেছে।

আসলে চাকা আবিষ্কারের ফলেই মানুষের সভ্যতা অনেকখানি এগিয়ে যেতে পেরেছে। বলা যেতে পারে, চাকা তৈরিই হচ্ছে মানুষের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং মহান আবিষ্কার। আজ যদি চাকা আবিষ্কার না হত তাহলে অবস্থাটা কীরকম দাঁড়াত সেটা একবার ভেবে দেখ। চাকা না থাকলে গরুর গাড়ি, ট্রাম, বাস, রেলগাড়ি, মোটর গাড়ি, এরোপ্লেন কিছুই চলত না। আর এই যে এখন আমরা হুস করে হিল্লি-দিল্লি চলে যাচ্ছি, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের সঙ্গে কত সহজেই যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি—সেটা তত সহজ হত না। সামান্য কার একটা চাকা কী ভাবে আমাদের সভ্যতাকে ঠেলা দিয়ে কতখানি এগিয়ে নিয়ে গেছে, তা ভাবলে সত্যি অবাক হয়ে যেতে হয়!

চাকা ঘুরতে পারে বলেই আজ আমাদের যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার এত সুবিধা হয়েছে। এছাড়া প্রাচীন কালের পাথর ও কাঠের চাকার সঙ্গে আধুনিক চাকার কোনও তুলনা হয় না। অন্যান্য বহু জিনিসের মতো চাকারও বিবর্তন হয়েছে।

প্রাচীন কালে মানুষ যখন পাথরের গায়ে খোদাই-করা-মূর্তি অথবা ঐ ধরনের বিশাল কোনো পাথরের টুকরো কোথাও সরাতে চাইত, তখন সেগুলো কাঠের রোলারের উপর চাপিয়ে ঠেলে নিয়ে যেত। এতে মানুষের কষ্ট হত খুব, কিন্তু কী আর করা যাবে, তখন তো আর চাকার আবিষ্কার হয়নি!

প্রাচীন যুগের সভ্য সুমেরীয়রা প্রথম কাঠের চাকা ব্যবহার করেছিলেন। তাঁরা রথ ব্যবহার করতে জানতেন। এই রথের চাকাও ছিল মোটামুটি গোলাকার। এটা খ্রীষ্টজন্মের প্রায় ৩,০০০ বছর আগের কথা। এই সময়ের যেসব ছবি পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে, তিনটে কাঠের টুকরো একসঙ্গে জুড়ে যতদূর সম্ভব সেটাকে গোলাকার করার চেষ্টা হয়েছে।

চাকার ব্যবহার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে হয়েছে।

আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়ার আগে সেখানে কোনও চাকার গাড়ি ছিল না। আবার এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে চাকার প্রচলন হয়েছে তাদের সভ্যতার সূচনাতেই।

এখন যেমন সাইকেলের চাকায় স্পোক থাকে সেইরকম স্পোকওয়ালা চাকা কবে এসেছে জানো? খ্রীষ্টজন্মের প্রায় ২,০০০ বছর আগে। অবশ্য এই স্পোকগুলো ছিল কাঠের তৈরি। মিশরের রাজারা ঘোড়ায়-টানা হালকা রথে চড়ে যুদ্ধ করতেন। কাঠের চাকায় যে চামড়ার বেড় (টায়ার) লাগানো থাকত তা জানা গিয়েছে তুতানখামেনের ৩,৩০০ বছর আগের সমাধি থেকে। স্পোকওয়ালা চাকার প্রবর্তন হয়েছিল মিশরেই সর্বপ্রথম।

মহাভারত ও গীতায় রাজপুত্রদের রথে চড়ে যুদ্ধ করার বর্ণনা রয়েছে। কর্ণের রথের চাকা যুদ্ধক্ষেত্রে মাটির নীচে বসে গিয়েছিল, সেই সুযোগে অর্জুন তাঁকে বধ করেছিলেন—এ-গল্প তো তোমরা সকলেই জানো।

মিশরীয়দের মতো গ্রীক যোদ্ধারাও তাঁদের রথে স্পোক-ওয়ালা লোহার-বেড়-দেওয়া কাঠের চাকা ব্যবহার করতেন। যে বিরাট কাঠের তৈরি ঘোড়া যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়ে অডিসেয়াস ও তাঁর সহকর্মীরা ট্রয়ের পতন ঘটালেন, তার চাকাও ছিল কাঠের তৈরি।

ব্রিটেনেও লৌহযুগ অর্থাৎ খ্রীষ্টজন্মের প্রায় পাঁচ শো বছর আগে চাকা ব্যবহারের কোনও হদিস মেলে না। বিদেশী আক্রমণকারী, যারা উত্তর দিক থেকে ফ্রান্সের ভেতর দিয়ে ওদেশে ঢুকেছিল, সম্ভবত তারাই ব্রিটেনে প্রথম চাকার প্রবর্তন করে। সেই সময় চাকাওয়ালা গাড়ি নিয়ে কেউ পথে বেরুলে সবাই হাঁ করে দেখত। এছাড়া সকলেই গাড়ির মালিককে অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক বলে মনে করে তাকে সমীহ করে চলত। শুধু তাই নয়, উত্তর ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের আদিবাসী-প্রধানের মৃত্যুর পর তাঁকে রথে সাজিয়ে নিয়ে শোভাযাত্রা করে কবর দেওয়ার রীতি ছিল।

আগেকার দিনে রথের চাকা সাধারণত ঘোড়াতেই টানত। যখন যুদ্ধের প্রয়োজন থাকত না, তখন অবশ্য বলদ দিয়ে রথ টানানো হত। এখনও পৃথিবীর নানা জায়গায় গরুর গাড়ির প্রচলন আছে।

তারপর আস্তে-আস্তে চাকার গাড়িকে মানুষ বুদ্ধি করে মাল বইবার কাজে লাগাল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মাল বইবার জন্য চাকার গাড়ির চাহিদা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, শুধুমাত্র লণ্ডনেই প্রায় ৬,০০০ গাড়িকে মাল নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে দেখা গিয়েছে।

তখনকার দিনের রাস্তা-ঘাটের অবস্থাও ছিল খুব খারাপ।

ব্রেথওয়েট এবং এরিক কসনের তৈরি 'নভেলটি' রেলগাড়ি

কাদায় ভর্তি অথবা এবড়ো-খেবড়ো মেঠো রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলত। ঘোড়ার গাড়িতে করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে সময় লেগে যেত অনেক। কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ যেতেই প্রায় একহপ্তা লেগে যেত।

ঘোড়ার গাড়ির পরে এল চাকার ঘোড়া। তোমরা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে ভাবছ—সেটা আবার কী জিনিস! আসলে চাকার ঘোড়া বলা চলে সাইকেলকে। সাইকেলের কথা প্রথম শোনা যায় প্যারিসে, ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে। একজন ফরাসী ভদ্রলোক, নাম কুমতে দে সিভরাক, প্রথম দু'চাকার সাইকেল তৈরি করেন। এই সাইকেল দেখলে এখন তোমাদের হাসি পাবে। এতে না ছিল গীয়ার, না ছিল প্যাডাল বা স্টীয়ারিং। মাটিতে পা দিয়ে ঠেলে এই সাইকেলকে চালাতে হত। কির্ক প্যাট্রিক ম্যাকমিলান নামে এক স্কটিশ কামার প্রথম প্যাডাল লাগিয়ে সাইকেলকে ঠেলার কথা ভাবেন। এরপর মেয়ার ও লউসন এক মজার সাইকেল তৈরি করলেন। চেন-লাগানো এই সাইকেলের সামনের চাকাটা পিছনের চাকার চাইতে বেশ বড় ছিল। ১৮৭০ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত এই সাইকেল ছিল খুবই জনপ্রিয়।

১৭৬৯ সালে জেমস ওয়াট প্রথম স্টীম এঞ্জিন তৈরি করেন। তারপর রিচার্ড ট্রিভিথিক আবিষ্কার করলেন উচ্চ-চাপ যুক্ত স্টীম এঞ্জিন। রিচার্ডের এঞ্জিন ওয়াটের এঞ্জিনের চেয়ে ছোট ছিল এবং রেল-লাইনের ওপর দিয়ে খুব সুন্দরভাবে এগিয়ে যেতে পারত। রিচার্ডের এই মজার এঞ্জিন—'কে আমায় ধরতে পারে' (ক্যাচ মি হু ক্যান) ঘণ্টায় ১২ মাইল বেগে ছুটে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল। এটার ওজন ছিল মাত্র আট টন।

রেলওয়ের উন্নতির জন্যে যে-ভদ্রলোক সব চাইতে বেশি ধন্যবাদ পাবেন তাঁর নাম জর্জ স্টিফেনসন। তিনি তাঁর প্রথম এঞ্জিন 'ব্লুচার' তৈরি করেছিলেন ১৮১৪ সালে। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর প্রথম যাত্রী ও কয়লাবাহী রেলগাড়ি ছুটল স্টকটন থেকে ডারলিংটন পর্যন্ত। এরপর স্টিফেনসন আর তাঁর ছেলে এঞ্জিন তৈরি করার জন্যে একটা কারখানা খুললেন। এই কারখানায় তৈরি 'রকেট' এঞ্জিন ঘণ্টায় ১৪ মাইল বেগে ছুটে সবাইকে চমকে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই 'রকেট' লিভারপুল ও ম্যাঞ্চেস্টার রেলওয়ে আয়োজিত এঞ্জিনের দৌড়-প্রতিযোগিতায় সবাইকে টেক্কা দিয়ে প্রথম স্থান দখল করে ৫০০ পাউন্ড জিতে নিল।

আমাদের বাংলাদেশে প্রথম রেলগাড়ি চলে ১৮৫৪ সালে। এই গাড়ি চলেছিল হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত। তখন দূর থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই গাড়ি দেখে নাচত আর বলত—

"ধায় গাড়ি ধুম ছাড়ি
ধায় শত পন্থ
ঝড়ে গতি জোর অতি
দুনিয়া কাঁপায়!
উঁকি মেরে ঝাত করে
সরে যায় সাত করে
দেখি ঘাড় কাত করে—নাই, আর নাই!
ধায় গাড়ি ছোটে—বাই বাই।"

চাকা আবিষ্কারের প্রায় ৫,০০০ বছর পরে বাতাস-ভরা টিউবের ব্যবহার শুরু হয়েছে। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জন বয়েড ডানলপ প্রথম ভিতর-ফাঁপা টায়ার ও বাতাস-ভরা টিউব আবিষ্কার করেন। একটা কাঠের গোল চাকায় বাতাস-ভরা টিউব আবিষ্কার লাগিয়ে দেখা গেল সেটা বেশি জোরে ছুটতে পারে। পরে ডানলপ তাঁর এই আবিষ্কার পেটেন্ট করেন।

চাকার উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে তার গতিবেগও বেড়ে চলল।

মোটরগাড়ির যুগ বেশ ভালভাবে আরম্ভ হয় দু'জন জার্মান এঞ্জিনিয়ার কার্ল বেন্‌জ এবং ডেইমলারের দক্ষতায়। ১৮৮৫ সালে বেন্‌জ পেট্রল- চালিত তিন-চাকার গাড়ি তৈরি করেন। আর ডেইমলার তৈরি করলেন মোটর-সাইকেল। এরপর অবশ্য বিলেতে মরিস, অস্টিন, রোলস রয়েস প্রভৃতি বহু নাম-করা গাড়ি তৈরি হয়েছে। ১৮৮৯ সালের মধ্যে ইউরোপে প্রায় চারশোরও বেশি রকমের মোটর গাড়ি চলেছিল। আমেরিকার ফোর্ড কোম্পানি ১৯০৮ থেকে ১৯২৭ সালের ভেতর প্রায় দেড় কোটি 'টিন লিজি' গাড়ি বিক্রি করেছে।

পাঁচ হাজার বছর আগেকার চাকার কেবলমাত্র বিবর্তনই হয়নি, এই চাকা চাঁদের বুকেও হেঁটে বেড়িয়েছে স্বচ্ছন্দে। কবে এই চাকা সৌরজগৎ ছাড়িয়ে নক্ষত্রলোকের দিকে পাড়ি জমাবে—তা কে জানে!

কালকেপুরের দুসিঁদ্দা

হিমানীশ গোস্বামী

হাটে চলেছি, মামাবাড়িতে এসে। পাংশারহাট। পাংশার নাম তোমরা শুনেছ বলে মনে হয় না—ভারতবর্ষ ভাগ হবার পর সেই পাংশা চলে গেছে এখন ভারতের বাইরে। প্রথমে ছিল পূর্ব-পাকিস্তানে, এখন রয়েছে বাংলাদেশে। চন্দনা নদীর ধারে মামাবাড়ি, গ্রামের নাম কালিকাপুর, আমরা বলতাম কালকেপুর। সবাই তাই বলত। তা সে পাংশারহাট কালকেপুর থেকে ছিল দেড় মাইল দূরে। শুনে মনে হয়, খুবই তো কাছে, দেড় মাইল কি একটা দূর নাকি? কিন্তু সবটা পথই যেতে হত হেঁটে। কেউ কেউ অবশ্য সাইকেলে যেত, কিন্তু তারও হ্যাঙ্গাম কম ছিল না। চন্দনা নদী পার হতে হত—জল বছরের প্রায় সব সময়েই কম থাকত, এক বর্ষার কয়েকটা মাস ছাড়া। তাই ঐ জলের ভেতর দিয়ে সাইকেল নিয়ে যাওয়া যেত—হাঁটতে হাঁটতে, সাইকেলে চড়া যেত না। তা ছাড়া ছিল বাঁশের সাঁকো। বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে মামাদের কেউ-কেউ চলে যেতেন সাইকেল এক হাতে উঁচু করে ধরে তরতর করে। কিন্তু সে সবাই পারত না। এক হাত দিয়ে একটা সাইকেল উঁচু করে ধরবার মতো জোর সে অঞ্চলে বেশি লোকের ছিল না। গ্রামের পাশ দিয়ে যেত রেল গাড়ি, কিন্তু স্টেশন ছিল দূরে।

যাই হোক, আজকের গল্প কিন্তু সবটা মামাদের নিয়ে নয়। আজ বলব দুসিন্দার কথা! দুসিন্দা নামটা খুব অদ্ভুত, তাই না? দুসিন্দা নাম শুনলে মনেই হবে না সেটা একটা লোকের নাম। আমার সত্যেনমামা আমার চাইতে কয়েক বছরের বড়—তাঁর সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে হাটে চলেছি, পাংশার হাট কেমন হয় দেখতে। আমার বয়স তখন বোধহয় দশ কি এগারো হবে। শীতের দুপুর কালকেপুর গ্রাম ছাড়িয়ে চন্দনা নদী পেরিয়ে রেল লাইনের ধার দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় দেখা গেল একজন মাথায় একটা বিরাট হাঁড়ি নিয়ে চলেছে—আর একটু-একটু হাঁফাচ্ছে। লোকটির বয়স হয়েছে—বোধহয় পঁয়তাল্লিশ কি চল্লিশ। চেহারা চমৎকার—কিন্তু গায়ের রঙ একেবারে কুচকুচে কালো, আর মনে আছে, শীতকালেও তার গায়ে জামা তো ছিলই না, এমনকী সেই সময় তার গা থেকে ঘাম ঝরছিল আর চিকচিক করছিল। সত্যেনমামা আমাকে আস্তে-আস্তে বললেন "ঐ দ্যাখ দুসিন্দা!"

এই সেই দুসিন্দা! এর সম্বন্ধে কত কথা শুনেছি—কত গল্প। দারুণ ডাকসাইটে চোর ছিল এই দুসিন্দা। কালকেপুর, হাটগ্রাম, পাংশা তো বটেই—আরও দূরের রতনদিয়া, কালুখালি এসব জায়গাতেও দুসিন্দা চুরি করত। তবে তার নাম তখন দুসিন্দা ছিল না। তার নাম ছিল সত্যচরণ। দুসিন্দা নাম হয়েছিল অনেক পরে, তবে ঐ সময় সে তো চুরি করাই ছেড়ে দিল। সত্যচরণ কেমন করে দুসিন্দা হল আজ সেই গল্পই করব।

সব গ্রামেই কিছু-না-কিছু চোর থাকত, সে গরিব গ্রামেও, কিংবা বড়লোক গ্রামেও। বড়লোকের বাড়ি থেকে চুরি যেত সোনার বা রুপোর গয়না, বাসনপত্র, সাইকেল। গরিবদের গ্রাম থেকে চুরি যেত নারকেল, চাল, বড়ি, এমনকী লবণ পর্যন্ত। একটা ইংরিজি কবিতা পড়েছিলাম ছেলেবেলায়, তার অর্থ ছিল, মাছির গায়ে বসে ছোট মাছি, আর সেই ছোট মাছির গায়ে বসে আরও ছোট মাছি, আর আরও ছোট মাছির গায়ে আরও ছোট মাছি—এইভাবে মাছির লাইন চলে অফুরন্ত ভাবে। আর বড় মাছি বসে আরও বড় মাছির গায়ে, আর আরও বড় মাছি বসে আরও বড় মাছির গায়ে। চোরও তাই—তারা কী যে চুরি করবে না সেটাই আশ্চর্য। অনেক চোর কেবল ছেঁড়া জুতো, গেঞ্জি পর্যন্ত চুরি করত। কী করবে তারা—যা পাবে তাই তো চুরি করবে। আর সেই দুর্ভাগা চোরের হয়তো ছেঁড়া গেঞ্জিও নেই। তাই ঐ মাছির কাহিনীর মতো বলা যায়—দরিদ্রতম মানুষের বাড়ি থেকেও চোর চুরি করবার কিছু-না-কিছু পেয়ে যায়। তোমরা কি ভাবতে পারবে, গরুকে খাওয়ানোর জন্য যে খড় রাখা হয় তার তিন আঁটি খড় কেউ চুরি করতে

পারে? আমরা ছেলেবেলায় ঐরকম চুরির কথাও শুনেছি। একবার আমাদের বাড়ি থেকে একটা পুরনো বঁটিই চুরি হয়ে গেল। সে মরচে-পড়া বঁটি দিয়ে কোনো কাজই হত না বলে বারান্দার এক কোণে ফেলে রাখা হয়েছিল, কিন্তু চুরি হয়ে গেল ঠিকই! আর একবার চুরি হল বারান্দায় রাখা ভাঙা ক্যারমবোর্ড একখানা. আর একটা ফুটো বালতি!

যাই হোক, সত্যচরণ চোর কিন্তু ছোটখাটো কোনো জিনিস চুরি করত না। তার নজর ছিল উঁচু। আর তার সিঁদ কাটবার হাতও ছিল অতি চমৎকার। সত্যচরণ এমন নিঃশব্দে সিঁদ কাটতে পারত যে, ঘরের মধ্যে লোক ঘুমিয়ে থাকলে তো টের পেতেই না, এমনকী জাগ্রত মানুষও বুঝতে পারত না সত্যচরণ সিঁদ কাটছে—এমন আশ্চর্য ছিল তার সিঁদশিল্প। তা সিঁদ-কাটাকে শিল্পকলা বলতে তোমরা মনে কোরো না সেটা ভুল। চুরিও এক ধরনের শিল্প, তবে ধরা পড়লে মুশকিল এই যা।

তা এই দুসিঁদ্দা একবার আমার মামাবাড়িতেও চুরি করতে এসেছিল—সেই তার শেষ চুরি। অবশ্য শেষ চুরি বলাটা ঠিক হবে না। চুরি করতে সে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু চুরি আর করতে পারেনি। আমার সাত মামার মধ্যে তৃতীয় মামার নাম ছিল সুদুমামা, তা সেই সুদুমামার কারসাজিতেই সত্যচরণ বিপদে পড়েছিল! সেই ঘটনাটাই এখন তোমাদের শোনাই।

আমি যে সময়কার কথা বলছি সে সময় আমার জন্মই হয়নি। সে সময় কালকেপুরে মামাবাড়ি ছিল খুব জমজমাট। সেখানে চলত নানারকম আনন্দ উৎসব। কখনো যাত্রা হত, কখনো হত থিয়েটার, কখনো ম্যাজিক। দু-একবার ছোটখাটো সার্কাসও কালকেপুর আনা হত। এ সবের মূলে ছিলেন, আমার দাদু। শীতকালে একবার গোয়ালন্দে একটা সার্কাস পার্টি এসেছিল। গোয়ালন্দ পাংশা থেকে মাইল-পনেরোর কিছু বেশী দূরে ছিল। দাদামশাই ছিলেন খুব খেয়ালি আর জেদি। তিনি বললেন, যদি গোয়ালন্দে সার্কাস হতে পারে তাহলে কালকেপুরেই বা হবে না কেন? ঠিক হল গোয়ালন্দ থেকে সার্কাস পার্টি কুষ্টিয়ায় যাওয়ার পথে কালকেপুরে দুদিন সার্কাস দেখিয়ে যাবে. আর তার জন্য যা খরচপত্র সব দাদামশাই দেবেন। এই সংবাদে গ্রামে এবং আশপাশের সর্বত্র হৈ-হৈ রৈ-রৈ পড়ে গেল, কেননা গোয়ালন্দে যে সার্কাস পার্টি এসেছিল সেটা খুব নামকরা ছিল, আর তাদের সঙ্গে ছিল এগারোটা বাঘ, আর ছটা হাতি! আর কালকেপুরে সার্কাস দেখানো হবে সম্পূর্ণ বিনা টিকিটে। সার্কাসের প্রথম দিন হাজার হাজার লোক বিকেল হবার আগেই খেলার মাঠে বসে গেল। তাঁবুর ব্যবস্থা রইল না, ঘেরার ব্যবস্থাও না। মাঝখানে কেবল খানিকটা জায়গা তৈরি করে নেওয়া হল আর খুঁটি পুঁতে তার সঙ্গে দড়ি বেঁধে জায়গাটা আলাদা করা হল। সেই ঘেরাও করা জায়গার মধ্যে হাতিরা রইল এক কোণে, অন্য কোণে খাঁচার মধ্যে বাঘ। পাংশা স্টেশন থেকে তাদের নামিয়ে আনতে হলে নানারকম অসুবিধে হবে মনে করে রেল কোম্পানিকে বলে ট্রেনটাকে কালকেপুরেই থামানো হল। প্রায় আধঘন্টা ট্রেনটাকে থামিয়ে সার্কাসের জন্তু-জানোয়ার, মানুষ-জন, তাঁবু ইত্যাদি সব নামানো হল। কিন্তু সেই সময় একটা দুর্ঘটনাও ঘটে গেল। বাঘের একটা খাঁচা নামানোর সময় খাঁচাটা হঠাৎ রেললাইন থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল, আর তার ভেতরকার বাঘ এমন হঠাৎ-গড়ানোর ফলে খুব গর্জন করতে লাগল। এইভাবে গড়াতে-গড়াতে একটা গাছের সঙ্গে খাঁচাটা লেগে খাঁচার একটা শিক খুলে গেল, আর ভেতরের বাঘটা তড়াক করে লাফিয়ে পাশের জঙ্গলে চলে গেল। জঙ্গলটা এমন নিবিড় আর ঝোপঝাড়ে ভরা যে, তার মধ্যে কারুর পক্ষেই যাওয়া সম্ভব নয়। পূর্ববঙ্গের বেত, গাব, বাঁশ, ভাঁটি ইত্যাদি গাছে ভরা জঙ্গল যে কী অন্ধকারপূর্ণ আর ঘন হতে পারে তা না দেখলে কেবল শুনলে মনে হবে বাজে কথা!

সার্কাসওলা এ-ব্যাপারে খুবই মুষড়ে পড়লেন, আর দাদা-মশাই সার্কাসওলাকে বেশ কিছু টাকা দিয়ে তাঁর মন ভাল করলেন, কিন্তু গ্রামে আতঙ্কের ছায়া নেমে এল। যারা দূরে থেকে সার্কাস দেখতে এসেছিল তারা রাত্তিরবেলা সার্কাস দেখার পর সেখানেই রইল—কিছুতেই তারা নিজেদের গ্রামে গেল না।

তারপর সকাল হলে সকলে বাড়ি গেল। পরদিন কিন্তু সার্কাসে একদম ভিড় হল না। দূরের গ্রামের বিশেষ কেউ এল না, কিন্তু মামাবাড়ির সকলে সার্কাস দেখতে গেলেন, কেননা তাঁরা ভয় পেয়েছেন এমন কথা যেন কেউ বলতে না পারে। তা ছাড়া দাদামশাইয়ের বন্দুক ছিল, বন্দুক ছিল মেজোমামারও। মেজোমামার আবার দু-একটা বাঘ মারার অভিজ্ঞতাও ছিল, আর সুদুমামা ছাড়া বয়স্ক মামাদের প্রত্যেকেরই ছিল দুর্দান্ত সাহস। ওঁরা বাড়িতে হরিহর আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বাড়ি পাহারায় রেখে সার্কাস দেখতে গেলেন। হরিহর ছিল পালকি-বাহক—আগে মামাবাড়িতে দুটো পালকি ছিল, তার জন্য ছিল চারজন বাহক বা বেহারা। হরিহর, গদাধর, ভীম আর ছাতিম—এই চারজন আগের দিনই সার্কাস দেখেছে, সুতরাং দ্বিতীয় দিন তাদের বাড়িতে থাকার আদেশ দেওয়া হল। হরিহর এবং তার তিন সঙ্গীর এমন আদেশ শুনে ভালই লাগল, কেননা তারা ছিল প্রত্যেকে এক নম্বরের সিদ্ধিখোর। বাবুরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেই তারা সিদ্ধি নিয়ে বসে গেল।

ওদিকে সত্যচরণ সেদিন বুঝতে পেরেছে চুরি করার ওটাই উপযুক্ত রাত। সেও তার চাদরের মধ্যে সিঁধকাঠি নিয়ে এসেছে, আর কিছুক্ষণ সার্কাস দেখে একটু জোরে পা চালিয়ে দাদা-মশায়ের বাড়ির রান্নাঘরে সিঁধ কাটতে লেগেছে নিঃশব্দে। আস্তে আস্তে সিঁধ কাটা হলে সত্যচরণ রান্নাঘরে ঢুকে থালা বাটি গ্লাস ইত্যাদি কিছু নিয়ে পাশেই ভাঁড়ার ঘরে দেখতে গেছে সেখানে কী পাওয়া যায়। হয়তো রুপোর থালাবাটি ঐ ঘরেই রাখা থাকে বলে তার ধারণা হয়েছিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে সুদুমামার খুব খিদে পেয়ে গেছে। সুদুমামা দেখে গেছেন সেদিন বাড়িতে খুব চমৎকার মাংস রান্না করা হয়েছে, রাত দশটা নাগাদ সার্কাস ভাঙলে সকলে বাড়িতে এলে খাবে। আবার সুদুমামার লুকিয়ে একটু তামাক খাওয়ারও ইচ্ছে হচ্ছে। রাত আটটা নাগাদ সুদুমামা হাতে একটা দা নিয়ে কাউকে কিছু না বলে বাড়ির দিকে চললেন। বাড়িতে গিয়ে দেখেন বাইরের বারান্দায় বসে হরিহর, গদাধর, ভীম আর ছাতিম কষে সিদ্ধি টানছে। সুদুমামা তাদের দেখতে পেলেন কিন্তু তারা তাঁকে দেখতে পেল না. এমনই তাদের নেশা হয়েছিল। যাই হোক, তাতে সুদুমামার সুবিধেই হয়েছিল। সুদুমামা সোজা রান্নাঘরে গিয়ে তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন, আর উনুনের উপর অল্প আঁচে বসানো মাংসের হাঁড়ি থেকে হাতায় করে প্রায় সের খানেক মাংস একটা বড় বাটিতে তুলে নিয়ে খেতে যাবেন এমন সময় নজরে পড়ল ঘরে সিঁধের দিকে। পাশের ঘরটা ভাঁড়ার ঘর—সেটা দেখা গেল ভেতর থেকে বন্ধ। সুদুমামা বেশ বুঝতে পারলেন পাশের ঘরে কেউ ঢুকেছে। কোনো চোর হবে. কিন্তু চোরকে ধররার কোনো উপায় নেই, কেননা একটু আওয়াজ করলেই চোর ভাঁড়ার ঘরের দরজা খুলে পালিয়ে যাবে। আর একটা কাজ করা যায়— আস্তে-আস্তে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে ভাঁড়ার ঘরটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে আবার রান্নাঘরে ঢুকে পাহারায় বসে থাকা যায়—যতক্ষণ না সবাই সার্কাস দেখে ফিরে আসে, কিন্তু তা করতে গেলেই তো চোর পালিয়ে যাবে।

সুদুমামা নিজেই খুব ভয় পেয়েছেন। হাতে একটা দা রয়েছে, কিন্তু চোর মরিয়া হয়ে উঠলে সে কী করবে কে জানে? সুদুমামা দা দিয়ে বাধা দেবেন? অসম্ভব। তবে বাঘের কথা

আলাদা, বাঘ এলে, বা আক্রমণ করলে দা দিয়ে তাকে প্রতি-আক্রমণ করতে সুদুমামা নিশ্চয়ই পারবেন, চোরকে নয়। চোর তো মানুষ, আর তাই চোরের বুদ্ধি বাঘের চাইতে বেশি। সুদুমামা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর হাতের টর্চটা তখন নেভানো, আসবার সময়েই নিভে গেছে পথে পড়ে গিয়ে। তারপর অনেক সুইচ টেপাটেপিতেও সেটা আর জ্বলেনি। তবে জ্বলেনি বলেই একেবারে জ্বলবে না এমন হতে পারে না, জ্বলতেও তো পারে—সেজন্য তিনি টর্চটাকে হাতেই রেখেছেন। এদিকে সামনে, অন্ধকারে বাটিভর্তি গরম মাংসের কালিয়া—চমৎকার গন্ধ বেরুচ্ছে। কিন্তু হাত-পা যে ঠকঠক করে কাঁপছে—আর তা যে শীতে নয়, সে সুদুমামা বুঝতে পেরেও কিছু করতে পারছেন না।

এই সময় সুদুমামা এক অসাধারণ কাজ করলেন। তিনি নানারকম জন্তু-জানোয়ারের ডাক ডাকতে পারতেন, হঠাৎ একটা হাঁড়িতে মুখ দিয়ে ভয়ঙ্করভাবে বাঘের ডাক ডেকে উঠলেন। একবার নয়, তিনবার! সে কী প্রচণ্ড ডাক। শুনে সত্যচরণের তো একেবারে দফারফা। এতক্ষণ সত্যচরণ ভাবছিল পাশের ঘরে কেউ এসেছে—আর এও ভাবছিল পাশের ঘরের লোকটি চলে গেলে সেও নিশ্চিন্ত হয়ে বেরুবে। সেই মনে করে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু পাশের ঘর থেকে প্রচণ্ড বাঘের ডাক সে মোটেই আশা করেনি। সে তো পাশের ঘরে বাঘ রয়েছে মনে করে দু ঘরের মাঝখানের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু বেরুবার উপায় নেই, কেননা ঘরটির দরজা বাইরে থেকে তালা লাগানো। জানালাও আছে, তবে ছোট, আর বেশ মোটা শিক দেওয়া। তখন সত্যচরণ কী আর করে, তাড়াতাড়ি করে আর একটা সিঁধ কাটতে লাগল। একবার সে সিঁধ কেটে ঢুকেছিল, কিন্তু এবার সে সিঁধ কাটতে লাগল বেরুনোর জন্য। বড়বিদ্যের ইতিহাসে

এ-রকম ঘটনা আর কখনও ঘটেছে কিনা আমার জানা নেই। যাই হোক, সত্যচরণ সিঁধ কাটে আর ভয়ে কাঁপে। পাশের ঘরে সুদুমামা ভয়ে কাঁপেন আর বাঘের ডাক ডাকেন। এই বাঘের ডাক অবশ্য হরিহর, গদাধর, ভীম আর ছাতিমের কানেও গিয়েছে। ঐ ডাকেই তাদের নেশা গিয়েছে ছুটে। ভীম বলল, "বাঘ এসেছে রে!" হরিহর বলল, "ওরে বাবা—আমাদের খেয়ে ফেলবে রে!" ছাতিম ভয়ে মড়ার মতো শুয়ে রইল বারান্দায়। তার ধারণা, মড়ার মতো পড়ে থাকলে বাঘে ছোঁবে না। সে একটা গল্প শুনেছিল বুনো জন্তুরা মৃতদেহ খায় না। খায় না, কিন্তু যদি চেখে দেখে? এই ভেবে ছাতিম ককিয়ে কেঁদে উঠে বলল, "যদি চেখে দেখে?" এক গদাধরই প্রচণ্ড সাহস দেখিয়ে অতি দ্রুত পালাতে গেল দৌড়ে, কিন্তু নেশার ঘোরে বুঝতে না পেরে সে বারান্দা থেকে পড়ে গেল ঘাসের উপর। সে ভেবেছিল পুরোটাই বোধহয় সমতল—তারা যে বারান্দায় বসে ছিল, এ খেয়ালটা তার ছিল না। সে ঘাসের উপর পড়তেই তার কোমর মচকে গেল, আর সে চিৎকার করে বলতে লাগল, "বাঁচাও, বাঁচাও!"

এদিকে বাঘের মুহুর্মুহু ডাক আর 'বাঁচাও, বাঁচাও' চিৎকার—তার মধ্যে আবার ছাতিমের 'যদি চেখে দেখে?' বলে আর্তনাদ। এসব শুনতে পেয়ে দাদামশায় এবং আরও জনা-পঞ্চাশেক লোক হাতের কাছে যা পেলেন তাই হাতে নিয়ে বাড়িতে এলেন। প্রথমে বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা। নেশাখোরদের কাছ থেকে যা জানলেন আর তার সঙ্গে বাঘের ডাক শুনে দাদামশায় বললেন, "সকলে মশাল নিয়ে এসে রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ঘর ঘেরাও করো!" আর কী, দু মিনিটে দাঁড়িয়ে গেল সেখানে পঞ্চাশটা লোক, আবার নতুন নতুন লোকও আসতে লাগল, কেউ বা ভয়ে, কেউ বা কৌতূহলে, কেউ বা হুজুগে পড়ে। কেউ ভয়ে এল কেমন কথা? আসলে এত লোক চলে আসছিল যে, তারা কিছুক্ষণের মধ্যে একলা হয়ে পড়ার ভয় পাচ্ছিল।

দাদামশাই বললেন, "মনে হচ্ছে এটা সার্কাসের বাঘটাই, তাহলে ওটাকে জ্যান্ত ধরতে হবে।" কিন্তু মেজোমামা বললেন, "ওসব কিছু দরকার নেই, এক গুলিতে ব্যাটার মাথা গুঁড়িয়ে দিয়ে চামড়াটা ট্যাক্সিডারমিসটের কাছে দিয়ে ঠিক করে নিলে সায়েবরা ঐ চামড়াই কিনে নেবে অন্তত একশো টাকায়।" এই বলে ঘর থেকে তাঁর ডবল ব্যারেল বন্দুক নিয়ে দুটো নলেই টোটা পুরলেন। এবারে বাঘের গলা থেকে অন্য আওয়াজ বেরুল, "আমি সুদু। আমাকে মেরো না—পাশের ঘরে চোর।"

সে এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল তখন। হঠাৎ ভাঁড়ার ঘরের দ্বিতীয় সিঁধ দিয়ে একটি মূর্তি বেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল—দুজন লোক তাকে বাধা দিতে গিয়ে দুজনেই দারুণ দারুণ দুখানা চড় খেয়ে মাথা ঘুরে পড়ল। সত্যচরণ তখন পাঁই-পাঁই ছুটছে—কিন্তু অতগুলি লোকের তাড়া খেয়ে তার মাথার ঠিক ছিল না, সে গিয়ে পড়ল গ্রামের শেষের একটা পানাভর্তি ডোবায়। সেখানে থেকে তাকে কাদা-মাখা অপরূপ অবস্থায় ধরে আনা হল। তখন তাকে হঠাৎ চেনা গেল না। বড়মামা তাই এক বালতি পরিষ্কার জল দিলেন তার মাথায় ঢেলে। এবারে মুখের আর মাথার কাদা ধুয়ে গেলে চেনা গেল—সত্যচরণ।

সত্যচরণই বোধহয় একমাত্র চোর, যে একটা সিঁধ কেটে ঢুকেছিল, কিন্তু বেরিয়েছিল অন্য সিঁধ কেটে। দাদামশাই অবশ্য তাকে আর চুরি করতে দেননি। তিনি তাকে গুড়ের ব্যবসায় নামিয়েছিলেন, আর সেজন্য টাকাও দিয়েছিলেন সত্যচরণকে। সত্যচরণ আপন বুদ্ধির জোরে মোটামুটি সচ্ছল হতে পেরেছিল। কিন্তু তার নাম হয়ে গিয়েছিল দুসিঁধে। ছোটরা তাকে ডাকত দুসিন্দা, অর্থাৎ দু-সিঁধদা।

ছবি: অনুপ রায়

হনুমানের চড়

তারাপদ রায়

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে পরমেশ প্রথমে বুঝতেই পারেনি। কিন্তু দু-একবার বিছানায় এদিক-ওদিক করে যখন আড়মোড়া ভেঙে খাট থেকে নামতে গেছে, হঠাৎ আর্ত চিৎকার করে উঠল পরমেশ। ডান কানের নীচ থেকে গলা বেয়ে ঘাড় পর্যন্ত তীব্র যন্ত্রণা, কোথায় একটা শিরায় টান লেগেছে। মাথার উপরে ছাদ ভেঙে পড়লেও কিংবা বিষাক্ত বিছেয় কামড়ালেও বোধহয় এমন আকস্মিক তীব্র যন্ত্রণা হত না। পুরো ডানদিকের ঘাড়টা বাঁদিকে বেঁকে গেল, পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত ঝিমঝিম করতে লাগল পরমেশের।

পরমেশের মা বারান্দায় তরকারি কুটছিলেন, পরমেশের ছোট বোন মানু পাশের ঘরে চেঁচিয়ে হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষার জন্যে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ মুখস্থ করছিল, পরমেশদের পোষা কুকুরটা উঠোনে ঘুরপাক খেয়ে নিজের লেজ নিজের মুখে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। পরমেশের সাংঘাতিক চিৎকারে সবাই দৌড়ে পরমেশের ঘরে এল। এমন-কী জানলার পাল্লার উপরে বসে একটা ধূর্ত কাক পরমেশকে অনেকক্ষণ ধরে ভেংচি কাটছিল, এখন হঠাৎ তার আর্তনাদ শুনে কাকটা নিজেও খুব চেঁচামেচি জুড়ে দিয়ে আরও দশ-পনেরোটা গোলমেলে কাক সংগ্রহ করে ফেলল, সবাই মিলে কা-কা করে হৈহৈ জুড়ে দিল।

একটা বেগুন কুটতে কুটতে পরমেশের মা উঠে এসেছিলেন, বোঁটাসুদ্ধ বেগুনের অর্ধেকটা তখনো তাঁর হাতে, তিনি শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হয়েছে? এমন ককিয়ে চেঁচিয়ে উঠলে কেন?"

সামান্য নড়াচড়াতেও এমন ব্যথা হচ্ছে যে, পরমেশের ভয় হল, হয়তো কথা বলতে গেলেও ঘাড়ে টান পড়বে, সে আঙুল দিয়ে ডান কাঁধের দিকটা দেখাল। পরমেশের মা একমুহূর্তে বুঝতে পারলেন, ব্যাপারটা কী। কারণ এই ঘাড়ের ব্যথা মানে শিরায় টান ধরা, যাকে এককথায় বলে ফিক্ ব্যথা, সেটা পরমেশের নতুন কিছু নয়। আজকের টানটা হয়তো একটু বেশি তীব্র, বেশি বেদনাদায়ক, কিন্তু ছ'মাস-বছরে পরমেশের এরকম মাঝেমধ্যেই হয়। সুতরাং পরমেশের মা মুহূর্তেই বুঝতে পারলেন কী হয়েছে, এবং বেশ রেগেই গেলেন। "এর জন্যে এত সাংঘাতিক চেঁচানোর দরকার ছিল না, এরকম ফিক্ ব্যথা অনেকেরই হয়। আটটা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে আছ, লজ্জা করে না?" পরমেশের মা গজ্‌গজ্ করতে করতে আবার বেগুন কুটতে ফিরে গেলেন। ছোট বোন মানু একবার ফিক করে হেসে মোগলদের ধ্বংসের কারণ কণ্ঠস্থ করতে পাশের ঘরে ফিরে গেল।

রাগে দুঃখে পরমেশের চোখে জল এল। এর মধ্যে আবার মার ধমক শোনা গেল, "যাও, উঠে পড়ো। লেখাপড়া নেই?"

কিছুক্ষণ পরে ধাতস্থ হয়ে বহু কষ্টে বিছানা থেকে নেমে এল পরমেশ। ঘাড়-গলাসুদ্ধ এখন পিঠ পর্যন্ত এই মারাত্মক ব্যথাটা নেমে এসেছে, হাত বাড়িয়ে তাকের উপর থেকে টুথব্রাশটা নিতে গিয়ে চাবুক খাওয়ার মতো চমকে গেল সে। কোনো রকমে দাঁত-টাঁত মেজে, মুখ ধুয়ে এক কাপ চা খেয়ে পড়ার টেবিলে গিয়ে বসল। কিন্তু পড়বে কী করে, ঘাড় সোজা করতে পারছে না, মাথা নিচু করতে পারছে না। তার অবস্থা দেখে উল্টো দিকের টেবিলে মানু আবার ফিক্‌ফিক্ করে হাসতে লাগল, ইতিহাসের বই দিয়ে মুখ আড়াল করে। ফিক্ ব্যথার লোকেরা ফিক-হাসি হাসতেও পারে না, সহ্য করতেও পারে না। সুতরাং পরমেশ মানুকে একটা চড় মারার জন্যে উদ্যত হল, তবে ঐ উদ্যত হওয়া পর্যন্তই, হাত তুলতে গিয়ে আরো জোরে টান লেগে সে প্রায় অজ্ঞানের মতো হয়ে গেল।

ফিক্ ব্যথা এমনই অসুখ যে, সবাই জানে এ-ব্যারামে লোক মারা যাবে না। ফলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি অন্যান্যদের সহানুভূতি খুব দেখা যায় না। অন্যদিকে সবচেয়ে দুঃখের কথা, এ-অসুখের কোনো চিকিৎসাই নেই; কিছুদিন কষ্ট পেতে হয়, তারপর একা-একাই সেরে যায়। তবে যে-কোনো কঠিন অসুখের চেয়ে এই ব্যথার কষ্ট কিছু কম নয়, হাসতে গেলে কষ্ট হয়, কাশতে গেলে লাগে, শুতে-বসতে, উঠতে-দাঁড়াতে, এমন-কী মনখুলে কাঁদতে গেলে পর্যন্ত শিরা টনটনিয়ে ওঠে, ব্যথা অসহ্য মনে হয়।

এর আগের বার যখন পরমেশের এরকম হয়েছিল, সেও প্রায় সাত-আট মাস আগের কথা, যন্ত্রণাটা এত তীব্র হয়নি। সেই সময় পরমেশের পিসেমশায় এসেছিলেন হাজারিবাগ থেকে, তিনি বলেছিলেন মাথার বালিশ রোদ্দুরে দিতে, তাহলে নাকি ফিক-

ব্যথার উপশম হয়। মাথার বালিশ ছাদে রোদ্দুরে ঠিকই দিয়েছিল পরমেশ, কিন্তু বিকেলে নামিয়ে আনতে ভুলে যায়। সেটা ছিল শীতের দিন, ফলে রাত দশটা নাগাদ যখন শুতে যাওয়ার সময় বালিশের কথা মনে পড়ে, তখন বালিশটা খোলা ছাদে ঠান্ডা হিমে জমে বরফ হয়ে গেছে, সেই বালিশ মাথায় দিয়ে শুয়ে সেবার ব্যথা দ্বিগুণ বেড়ে যায়, চোখ-কান সব ফুলে যায়।

অবশ্য সেই প্রথম নয়। এর আগেও নানা লোকের পরামর্শে ফিকব্যথা বিভিন্ন কলাকৌশলে কমিয়ে ফেলার চেষ্টা পরমেশ করেছে। বছর পাঁচেক আগে পরমেশ যখন ক্লাস সেভেনে পড়ে, তখনই সেই প্রথমবার তার শিরায় টান দিয়েছিল। এইরকমই প্রায় ঘাড়ে-গলায় তীব্র যন্ত্রণা, তবে এতটা বোধহয় নয়। সেই সময় তার এক সহপাঠী পরামর্শ দিয়েছিল যে, সিঁড়ি দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যদি দোতলা থেকে একতলায় নেমে যাওয়া যায় তবে সেই সঙ্গে ফিকব্যথাও নেমে যায়। একবারে বা একতলা হামাগুড়ি দিয়ে নেমে গেলে যদি উপশম না হয় তবে কয়েকতলা ঐভাবে নামতে হবে। পরমেশ সৎ বিশ্বাসে চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু একে ঘাড়ে-পিঠে ব্যথা, তার উপরে হামাগুড়ি দিয়ে মাথা নিচু করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়া, সে হঠাৎ তাল সামলাতে না পেরে চার-পাঁচ সিঁড়ি নামার পরেই সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে যায়।

সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। ইস্কুলের ছুটির পর ইস্কুলের সিঁড়িতে সে গোপনে এই কাজটি করছিল। তার আর্তনাদ শুনে ইস্কুলের দরোয়ানেরা ছুটে এসে সিঁড়ির নীচের ধাপ থেকে তাকে উদ্ধার করে, তারপর আহত পরমেশকে রিকশায় করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে পাঁচ টাকা বকশিশ নিয়ে ফিরে যায়। পরমেশের তখন হাঁটু ছড়ে গিয়েছে, দাঁতের গোড়া দিয়ে আর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। বাড়িতে হাহাকার পড়ে গেল, পরমেশের বাবাকে

টেলিফোন করে অফিসে এই দুর্ঘটনার কথা জানিয়ে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে বলা হল। সব শুনে তিনি তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি করে দুজন ডাক্তার নিয়ে চলে এলেন। ঐ সময়ে পরমেশ শূন্য বিদ্যালয়ে ফাঁকা সিঁড়ির উপর কী করছিল, হাজার জেরাতেও কেন যেন সে কথা ফাঁস করল না।

সেবার পরমেশের চোট ভাগ্যক্রমে খুব গুরুতর হয়নি। দিন পনেরো বিছনায় শয্যাশায়ী ছিল, যখন শরীর ভাল হল তখন কাটা-ফোলা, আঘাতজনিত সমস্ত যন্ত্রণা সেরে গেছে, সেই সঙ্গে ফিক্‌ব্যথাও।

সেই থেকে পরমেশ মনে-মনে বিশ্বাস করে, সিঁড়ি দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে নামলে ফিকব্যথা নেমে যাবে। কিন্তু প্রথমবারের ঐ মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার পরে সে আর সেটা করার সাহস পায় না।

তবে একজন বিখ্যাত লোকের পরামর্শে এর পরে অন্য একবার আরেক রকম টোটকা চেষ্টা করে দেখেছিল। দুঃখের বিষয় সে-অভিজ্ঞতাও খুব সুখকর হয়নি।

সেই বিখ্যাত ভদ্রলোকটি হলেন পরমেশের বাবার বন্ধু, একজন প্রাক্তন ফুটবলার, অতীতের দিক্‌পাল খেলোয়াড়। একদিন পরমেশ গেছে তাঁর কাছে একটা দুর্দান্ত খেলার টিকিটের জন্য, তিনি খেলার টিকিট দিলেন না, কিন্তু পরমেশকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ওরকম ঘাড় বাঁকা করে আছ কেন?" পরমেশের তখন আরেকটা ফিক্‌ব্যথার ধাক্কা চলছে, একে টিকিট পায়নি, তার উপরে এই প্রশ্ন, তার ইচ্ছে হল উত্তর দেয়, "আজ্ঞে, ঘাড়-ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে ঘাড় এই রকম কাত হয়ে গেছে।" কিন্তু পিতৃবন্ধুকে এমন কথা বলতে পারল না পরমেশ, তার বদলে একটু থেমে নিয়ে বলল, "আজ্ঞে, আমার এই ঘাড়ে-পিঠে একটা শিরায় হঠাৎ টান ধরেছে, আজ তিনদিন হয়ে গেল ব্যথাটা কিছুতেই কমছে না।" এই কথা শুনে ভদ্রলোকের মুখ-চোখ কেমন স্নেহশীল হয়ে গেল, পরমেশের কেমন যেন আশা হল, হয়তো টিকিটটা পেলেও পেতে পারে। ভদ্রলোক অবশ্য টিকিটের ধার-কাছ দিয়ে গেলেন না, কিন্তু পরমেশকে বিস্তর উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন যে, যখন তিনি ফুটবল খেলতেন তখন প্রায়ই তাঁর এরকম ফিক্‌-ব্যথা হত, তবে এর একটা অব্যর্থ ওষুধ আছে, আলুর খোসা গুড় দিয়ে বেটে ঐ ব্যথা-জায়গাতে লাগালে একরাতে ব্যথা সেরে যাবে।

এতদিনে একটা ওষুধ পাওয়া গেছে ফিক্‌ব্যথার, ফুটবল ম্যাচের টিকিট না পেয়েও পরমানন্দে বাড়ি ফিরে এল পরমেশ। কিন্তু বাড়িতে এসে তার মনে নানা সমস্যা দেখা দিল, সে শুনেছে সামান্য ভুল হলে এসব প্রাকৃতিক চিকিৎসায় অনেক সময় খুব বিপদ হয়। অতএব তাকে আরেকবার যেতে হল সেই খেলোয়াড় ভদ্রলোকের কাছে, কিন্তু তাঁকে কিছুতেই পাওয়া গেল না। টিকিটের উপদ্রবে তিনি বাড়ি থেকে পালিয়েছেন। তাই পরমেশের সমস্যা রয়ে গেল ; আলুর খোসা, কিন্তু কাঁচা আলুর খোসা না সেদ্ধ আলুর খোসা? গুড়ই বা কোনটা হবে, ঝোলা গুড় না ভেলি গুড় না পাটালি? আখের, নাকি খেজুরের, নাকি তালের গুড়?

এদিকে ফিক্‌ব্যথা আর কমে না। অবশেষে পরমেশ মন শক্ত করে একটু ভেবে চিন্তে একদিন রাতে শোয়ার আগে কাঁধে-পিঠে ব্যথার জায়গাগুলোতে ঝোলাগুড় দিয়ে সেদ্ধ আলুর খোসা বাটা বেশ ঘন করে প্রলেপের মতো করে লাগিয়ে দিল। পিঠটা কেমন আঠা-আঠা চটপট করতে লাগল তবু একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ল, তার আগে ভাবল কাল সকালেই তো ব্যথা সেরে যাচ্ছে, এটুকু অস্বস্তি সহ্য করা আর কঠিন কী, বিশেষ করে এই সামান্য সময়ের জন্যে।

রাত একটা নাগাদ কঠিন কামড়ের জ্বালায় পরমেশের ঘুম

ভাঙল। আলো জেবলে দেখে সারা পিঠে, বিছানায়, বালিশে এমন-কী মাথায় চুলের মধ্যে হাজার হাজার পিঁপড়ে, ছোট-বড়, লাল-কালো দলে দলে পিঁপড়ে তার শরীর ও শরীরের চারপাশে হন্যে হয়ে ছুটোছুটি করছে, যেন মহোৎসব পড়ে গেছে পিঁপড়ে-সমাজে।

পরমেশের লাফালাফিতে বাড়িসুদ্ধ লোকের ঘুম ভাঙল। পিঁপড়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে এক বোতল কেরোসিন তেল দিয়ে তার সর্বাঙ্গ চোবানো হল। তারপর পরমেশের বাপ, যিনি সাধারণত অতি শান্ত প্রকৃতির ভদ্রলোক, কাউকে কখনো কিছুই বলেন না, তিনিও পরমেশকে ধমকাতে লাগলেন, ''তোমার এই বদবুদ্ধি হল কী করে? তুমি কি গাধা হচ্ছ নাকি দিনে-দিনে? গায়ে গুড় মাখলে পিঁপড়ে ধরবে বুঝতে পারোনি?'' তখন পরমেশ অপমানে-ব্যথায়-জ্বালায় কাঁদতে কাঁদতে বলল, ''তোমার বন্ধুই তো আমাকে এই রকম করতে বলেছে।'' সমস্ত বিস্তারিত শুনে পরমেশের বাবা খুবই অবাক হলেন, বললেন, "আর লোক পেলে না, ওর পরামর্শ নিতে গেলে, ওর তো মাথায় কিছু নেই, ছোটবেলা থেকে হেড্ দিয়ে দিয়ে ব্রেন একদম শক্ত হয়ে গেছে।''

উত্তেজিত পরমেশ পরদিন সাত-সকালেই সেই পরামর্শদাতা ভদ্রলোকের বাসায় গিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়ার আগেই তাঁকে ধরে ফেলল। পরমেশের অভিযোগ শুনে তিনি রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন, "সে কী! আমি এইরকম বলেছিলাম নাকি? দ্যাখো, খেলার টিকিটের অত্যাচারে আমার সব কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। কাকে কী বলেছি, কেন বলেছি কিছু ঠিক নেই।" এরপরে আর কিছু করার থাকে না, পরমেশ গজগজ করতে করতে ফিরে এল।

এই রকম সব করুণ অভিজ্ঞতার পরে পরমেশ আজকাল আর ফিক্‌ব্যথা হলে বাইরের কাউকে কিছু বলে না, এদিকে বাড়ির লোকেরাও খুব একটা গুরুত্ব দেয় না, ফলে সে যথাসাধ্য চুপচাপ ব্যথা সহ্য করে যায়।

কিন্তু আজ সকালে যা হয়েছে বোধহয় শান্তভাবে, দাঁত কামড়ে পড়ে থেকে সহ্য করা যাবে না। শুয়ে থাকলে বেশি কষ্ট হবে না বসে থাকলেই বেশি কষ্ট হবে, এই নিয়ে পরমেশ মাথা ঘামাচ্ছিল, এমন সময় মানুর মাস্টারমশাই এলেন।

মানুর মাস্টারমশাই একসময়ে পরমেশেরও মাস্টারমশাই ছিলেন। তিনি মোটামুটি পরমেশের নাড়ি-নক্ষত্র ভালই জানেন। ঘরে ঢুকেই পরমেশকে দেখে তিনি বললেন, ''কী, আবার ফিকব্যথা হয়েছে?'' আজ সকাল থেকে এতটা কোমল বাক্য পরমেশ কারোর কাছে শোনেনি, এই কঠিন অসুখে একবিন্দু সহানুভূতি কারো কাছে পায়নি। মাস্টারমশায়ের সমবেদনামূলক প্রশ্নে সে খুব করুণ কন্ঠে বলল, "হ্যাঁ মাস্টারমশায়, খুব কষ্ট পাচ্ছি।''

মাস্টারমশায় বললেন, "দ্যাখো, তোমাকে একটা কথা বলি। তুমি তো ফিকব্যথার জন্যে এখন পর্যন্ত অনেক কিছুই করে দেখেছ, তাতে কিছুই হয়নি। তুমি বরং আরেকটা চেষ্টা করে দেখো, সেটা একেবারে অব্যর্থ।"

উদগ্রীব হয়ে পরমেশ বলল, "কী করতে হবে মাস্টারমশায়?"

মাস্টারমশায় বললেন, "আমার বড় শালা বাড়িসুদ্ধ গিয়েছিল আগ্রায় বেড়াতে। রেলগাড়িতে বাক্স-বিছানা টানাটানি করে, ভিড়ে হয়রান হয়ে তারপর ঘাড়ে-পিঠে ভীষণ ফিকব্যথা। যাই হোক, আগ্রায় গিয়ে ঘুরে ফিরে তাজমহল ফোর্ট সব দেখে শুনে টাঙ্গায় করে এসে রাস্তার ধারে একটা ফলবাগানের পাশে বসলেন। সেখানে ঝুড়ি থেকে খাবার টিফিন কেরিয়ার, জলের ফ্লাস্ক সব বার করে সবাই খাওয়া শুরু করবে এমন সময় হৈহৈ করে এক দঙ্গল হনুমান এসে গোলমাল শুরু করল। কেউ দাঁত খিঁচোয়, কেউ খাবারের বাক্স, ফলের ঝুড়ি ধরে টানে। বাধা দিতে গেলে তেড়ে আসে। পালের গোদা সবচেয়ে বড় হনুমানটা টিফিন কেরিয়ারের কৌটাটা নিয়ে দৌড় দেওয়ার চেষ্টা করল, আমার বড় শালা গেল সেটাকে ঠেকাতে, অমনি সেই হনুমান হঠাৎ ঘুরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মারল তার গালে একটা চড়।"

এই পর্যন্ত বলে মাস্টারমশায় থামলেন। এই অসম্পূর্ণ কাহিনীটি খুবই চমকপ্রদ, কিন্তু পরমেশের মনে খটকা লাগল এই গল্পের সঙ্গে ফিকব্যথার কী সম্পর্ক থাকতে পারে। তবু সে সরলভাবেই মাস্টারমশায়কে জিজ্ঞাসা করল, "তারপরে কী হল?"

"তারপর আর কী," মাস্টারমশাই একটা হাই তুলে বললেন, "পনেরো মিনিট ধরে হনুমানে আর মানুষে খাবার নিয়ে ধস্তাধস্তি ও লড়াই। সে-সব অন্য কথা, আসল কথা হল সেই হনুমানের চড় খেয়ে আমার বড়শালার ফিকব্যথা সম্পূর্ণ সেরে গেছে। এই ঘটনার পর প্রায় তিন চার মাস হয়ে গেছে, আগে তার তোমার মতোই ঘনঘন ফিকব্যথার টান ধরত, সেই চড় খাওয়ার পর থেকে আর তার কোনো ব্যথাই হয় না।"

পরমেশ সব শুনে অবাক হয়ে বলল, "কিন্তু হনুমানের চড় খেলে অন্যদেরও ফিকব্যথা সেরে যাবে, আর হবে না, এমন কি কোনো কথা আছে?"

মাস্টারমশায় সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, "আরে, না, না, তা নয়। আমার বড়শালা বহু লোককে এই ঘটনার কথা বলেছে। তারা অনেকেই তোমারই মতো কষ্ট পাচ্ছিল। হনুমানের চড় খেয়ে তারা অনেকেই তাদের ব্যথা একদম সারিয়ে ফেলেছে।"

পরমেশ বলল, "কিন্তু হনুমানের চড় কী করে খাওয়া যাবে?"

মাস্টারমশায় হেসে বললেন, "এ আর কঠিন কী? চিড়িয়াখানায় গিয়ে এক ঠোঙা চিনেবাদাম নিয়ে হনুমানের খাঁচার পাশে লোহার শিক ঘেঁষে একটু অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়াবে। দেখবে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিদ্যুৎগতিতে একটা হনুমান শিকের মধ্য দিয়ে হাত বাড়িয়ে তোমার গালে একটা চড় মেরে চিনেবাদামের ঠোঙাটা কেড়ে নেবে।"

পরমেশ এবার একটু ভেবে নিয়ে বলল, "চিড়িয়াখানায় হনুমানের জন্যে বাদাম নিয়ে যাওয়া বেআইনি হবে না?" মাস্টারমশায় বললেন, "সেটা ঠিকই বলেছ। তা হলে দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ধারে যেও, তবে সেখানে হনুমানদের জিলিপির উপরে খুব লোভ। জিলিপি হাতে করে যেও, সঙ্গে-সঙ্গে চড় দিয়ে কেড়ে নেবে।"

মানু এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল, অবাক হয়ে সব শুনছিল, সে এবার প্রশ্ন করল, "হনুমানের চড় গালে খুব লাগবে না?" মাস্টারমশায় বললেন, "তা হয়তো অল্প একটু লাগতে পারে। কিন্তু তাতে আর কী হবে? এই রকম দিনের পর দিন কঠিন কষ্ট পাওয়ার চেয়ে সে শতগুণে ভাল। আর তাছাড়া এ তো সবারই জানা কথা যে, চড় খাওয়ার সময় গালের পেশিগুলো একটু শক্ত, একটু টানটান করে রাখতে পারলে চড়টা খুব লাগে না।"

আজ বিকেলেই পরমেশ দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ধারে যাবে। যাওয়ার সময় মোড়ের মাথা থেকে এক ঠোঙা জিলিপি কিনে নেবে। কিন্তু হনুমানের দয়া হবে কিনা, হনুমান তার হাত থেকে সেই জিলিপি কেড়ে নিয়ে তার গালে চড় মারবে কি না, কে জানে।

আমরা প্রার্থনা করছি পরমেশের মঙ্গল হোক, হনুমান তার জিলিপি কেড়ে নিক, তার গালে চড় মারুক। আহা, ফিকব্যথায় পরমেশ বড়ই কষ্ট পাচ্ছে।

ছবি অনুপ রায়

বনপরী দেখেছি

তরুণ বাগচী

বদরুদ্দিন সাহেবকে দেখলে একেবারেই হাকিম-হাকিম মনে হত না। রঙ্গরসিকতা করছেন, নিজেই অট্টরোলে হাসছেন, মুঠো-মুঠো জর্দা সহযোগে পান খাচ্ছেন, পুচ-পুচ পিক ফেলছেন, টাকে হাত বোলাচ্ছেন আর আমাদের টফি-লজেন্স খাওয়াচ্ছেন। আমার বয়েস তখন কত? নয়-দশ হবে! হাকিম বলতেই যে গুরুগম্ভীর ছবিটা মনের আয়নায় ভাসে, তার সঙ্গে বদরুদ্দিন সাহেবের মুখচ্ছবির মিল খুঁজে পাওয়া শক্ত ছিল।

ওঁকে দেখলেই বরং আমার মনে হত ক্রিকেট খেলোয়াড় ওয়াজির আলির কথা। ছুটিতে আসাম থেকে কলকাতা গিয়ে ইডেনে প্রথম খেলা দেখেছিলাম : বাংলা বনাম দক্ষিণ পাঞ্জাব। বাবা সব চিনিয়ে-বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, ক্রিকেটের জ্ঞাতব্য যা। বাংলা প্রথম দফায় রান করে মোট দুশো বাইশ। আর দক্ষিণ পাঞ্জাব দলের অধিনায়ক ওয়াজির একাই করেন দুশো বাইশ নট আউট। মাঠে ওঁকে দেখেই আমি বললাম, "বাবা, দেখো, ঠিক আমাদের বদরু চাচা।" বাবা বললেন, "শুধু চাচা বললেই আমি বুঝতাম। নাম ধরে বলতে নেই। তবে হ্যাঁ, ঠিকই—দুজনের চেহারায় আশ্চর্য মিল।"

বদরুদ্দিন সাহেবের ছিল দারুণ শিকারের শখ। আমার কোনো না কোনো কাকার সঙ্গে জুড়ি বেঁধে চলে যেতেন মিরিহারাম, সাবরু সব পেরিয়ে রিজার্ভ ফরেস্ট ঢুঁড়তে। শীতকালে ব্রহ্মপুত্রের চড়ায় বুনো হাঁস মারতে। তেজো বা দিওমালির বনে বুনো মোষের মহড়া নিতে আর দোনলা বন্দুক, ছররা গুলি নিয়ে ডিহিং নদীর ধারে অথবা জড়াইগুড়ির জঙ্গলে গ্রীন পিজিয়ন বা হরিয়াল শিকার করতে।

হয়তো অল্প বয়সের ভুল—আমার কিন্তু মনে হত বুনোজন্তুর চেয়ে পাখি হাঁস শিকারেই আমোদ বেশি পেতেন বদরুদ্দিন হাকিম। আর ওই ব্যাপারেই ঘোর আপত্তি ছিল আমাদের চাচিজির। ফুরফুরে পাতলা পরীর মতো চেহারা। হাকিম মনে হত না কর্তাকে, তো গিন্নি ছিলেন তাঁর ভূমিকায় আরও বেমানান। হাকিম-গিন্নি হবেন মোটাসোটা, মেদে-মেজাজে ভরপুর, হাঁকডাকে সবাই সন্ত্রস্ত। তবে না! আর আমাদের চাচিজির সরু মিষ্টি গলা, কোনোদিন কেউ উচ্চগ্রামে শুনতে পায়নি। ঝি-চাকরকে বকুনি দিতে গিয়ে হেসে ফেলতেন। ক্রমাগত চুরি করায় উত্যক্ত হয়ে স্বামীর কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন এক বাবুর্চির বিরুদ্ধে। বারান্দায় বসে হাকিমসাহেব তৎক্ষণাৎ বিচার করে শাস্তি দিয়ে দিলেন। দুই গালে দুই চড়, একটি লাথিতে গেট পার এবং বরখাস্ত। ঘরে ঢুকে দেখেন ফরিয়াদি হু হু কেঁদে যাচ্ছেন আসামীর দুঃখে বিগলিত হয়ে। তখন এক হু বলা ছাড়া হাকিম সাহেবের আর করার কিছু ছিল না।

এক সন্ধ্যার মুখে, আমাদের শহরের বাড়ির গেটে এসে দাঁড়াল বদরুদ্দিন হাকিমের গাড়ি। আমরা জানতাম আসবে। ভোর রাতে উঠে সেজকাকাকে নিয়ে শিকারে গিয়েছিলেন তিনি রঙমালায়। কাজেই জিভ আমাদের জলভেজা হয়েই ছিল। বদরুদ্দিন বললেন আমাকে, "তুই একবার চল আমার সঙ্গে। তোর চাচিজির হুকুম। আর ইশাক, কয়েকটা পাখি নামিয়ে দে তো বাড়ির জন্য।"

শুধুই পাখি? হরিণ নেই শুনে মনটা দমে গিয়েছিল। হরিণ মানেই অনেক মাংস। চপ কাটলেট। কয়েকদিন ভোজ। পাখি তো একবেলার খোরাক। ইশাক হাত নেড়ে জানালে, "এই যে, আপনাদের জন্য আলাদা রাখা আছে। আমাদের গুলান তো সব জবো করা।" জবো, অর্থাৎ ইসলামি মতে আড়াই পোঁচ দিয়ে শুদ্ধ করে নেওয়া।

চাচাজির সঙ্গে তাঁর বাড়ি গেলাম মাস্টারমশায়ের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে। ভালমন্দ কপালে জুটবে তা জানতাম। তবে চাচিজি একবাটি পায়েস এগিয়ে দিতেই মনে পড়ে গেল আজ জন্মদিন। বললাম, "ছি ছি, আপনার শরীর খারাপ। কেন

এসব?" বলেই কিন্তু বাটিতে মুখ। আহা, কী ম-ম গন্ধ পায়েসের। আর সেই সঙ্গে স্নেহের মিষ্টতা? ওই বয়সেও তার দাম বুঝতাম। মা ছিলেন না। কাকিমাদের স্নেহে-যত্নে মানুষ। কোনও কৃপণতা তাঁদের ছিল না। কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। চাইলেও আলাদা করে কারও জন্যে কিছু করা সম্ভব ছিল না।

চাচাজি ঘরে ঢুকে বললেন, "বুঝলে, হরিণ মারতে পারিনি বলে ছেলেরা মনমরা। খুদে রাক্ষস এক-একটা!"

চাচি বললেন, "অমন সুন্দর প্রাণী, মারতে দিব্যি হাতও ওঠে তোমাদের। আর বাচ্চারা মাংস খেতে চাইলেই দোষ? কতদিন বলি, মেরো না, মেরো না। অমন চমৎকার সব জীব। গাছে বসে হরিয়াল গান গাইছে, ফল খাচ্ছে। আর তোমরা গিয়ে গুড়ুম-গুড়ুম গুলি। কী যে আনন্দ পাও!"

চাচা চটলেন না। খুক-খুক হাসলেন। বললেন, "এ না হলে মেয়ে-বুদ্ধি। মাঝে মাঝে ওদের না মারলে পশু-পাখিতে দেশ ছেয়ে যেত, তুমি জানো? মানুষ বাস করার জায়গা পেত না কোথাও।"

বিষণ্ণ হাসলেন চাচাজি। "এই আকাশ, এই পৃথিবী, শুধু মানুষের জন্য তৈরি হয়েছে এ-কথা তোমাকে কে বলল?"

অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর মেজকাকার চা-বাগানে গেছি ছুটি কাটাতে। বদরুদ্দিন এলেন পাখিশিকারে। দুটো দোনলা বন্দুক আর এক বাক্স ভর্তি গুলি। নলে গুলি ভরে হাতে তুলে দেবে ইশাক। আর বন্দুক ছোঁড়া হয়ে গেলে অন্য বন্দুকটা তুলে নেবেন শিকারি। এই হল সাধারণ ব্যবস্থা।

মেজকাকা জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছেন ভাবী?" আগের চেয়ে ভাল তো?"

মাথা নেড়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন চাচাজি। "ওকে নিয়ে ভাবছি কলকাতা যাব দেখাতে। শরীরটা সারছে না কিছুতে। মনটনও ভাল নেই। দেখুন না, এই শিকারে আসাতে বিষম আপত্তি। অনেক হাঁস পাখি হরিণ মুর্গি মেরেছি। আর নয়। যত বলি, বদলি হয়ে যাচ্ছি গৌহাটি। সেখানে কোথায় এত শিকার মিলবে? দু-চারদিন হাতের সুখ করে নিই। এই টিংরাই নদীর পাবদা আর আপনাদের জড়াইগুড়ির হরিয়াল—এমন সুস্বাদু ভোজ কোথায় মিলবে বলুন তো। বড্ড অবুঝ হয়ে গেছে।"

সেদিন জড়াইগুড়ির জঙ্গলে এক বিচিত্র কাণ্ড ঘটল। আসামের চলিত গল্প হল, বনদেবী মন্ত্র পড়ে মাঝে মাঝে শিকারিকে অবশ করে দেন। হাতে তীরধনুক নিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে সে। আর তার নাকের ডগায় খেলা করে বেড়ায় বুনো হাঁস আর দইকল, মুর্গি এবং দরিক। নিশ্চিন্তে জলকমা নদীর ছিলছিলে বুকে জমা কাঁচ শেওলা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে চলে চিত্রা হরিণের ঝাঁক। মস্ত লম্বা ঠোঁট দিয়ে পিঠ চুলকোয় ধনেশ। উঁচু শিমুলডগা থেকে নীচের ডালে ফূর্তিতে নেমে আসে পরঘুমা আর হরিয়াল। তারপর যখন সব পশুপক্ষী চলে গেছে, জঙ্গল শুনশান, তখন মুচকি হেসে উড়ে যান বনদেবী। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে শিকারি দেখে রোদে ঝলমল মখমল-নরম ভারী সুন্দর হাসিমাখা একটা অরণ্য পড়ে আছে। কিন্তু কী শিকার সে করবে? প্রজাপতি হলুদবরণ?

দূর থেকে মিষ্টি শিস শুনছিলাম। উঁড়িআম গাছটার তলায় পৌঁছে দেখা গেল সব চুপচাপ। কোথায় গান, কোথায় গ্রীন পিজিয়ন? হাওয়ায় শুধু গাছের পাতা নড়ছে। তীক্ষ্ণ-চোখে তাকিয়ে থেকে-থেকে বদরুদ্দিন ইঙ্গিত করলেন। ইশাক নিঃশব্দে তাঁর হাতে বন্দুক তুলে দিল।

চাচা তাগ করবার আগেই আমিও দেখে ফেলেছি। বেশ অনেকখানি উঁচুতে আড়া-আড়ি দুটো ডালের ফাঁকে পাতা নড়ছে। দেখলে মনে হবে পাতা, কিন্তু দুটো হরিয়ালের ঈষৎ চঞ্চল মাথা আর চোখদুটোও তার মাঝখানে দেখা যাচ্ছে। ওই-টুকুই যথেষ্ট। বদরুদ্দিনের নিশানা অব্যর্থ।

গুড়ুম। চারদিকের জঙ্গল হঠাৎ শব্দে ভরে গেল। আর আমাদের বিস্মিত করে ওই গাছটা থেকে, তার আশপাশের গাছ থেকে দলে-দলে হরিয়াল উড়ে ছিটিয়ে গেল চতুর্দিক। দুটো পাখি মাত্র আমি দেখেছিলাম। এখন মনে হল গাছের সব কটা পাতা যেন সবুজ হরিয়াল হয়ে উড়ে পালিয়ে গেল।

উড়ে যাওয়া পাখির ঝাঁকের দিকে বন্দুক ফিরিয়ে আর একবার ফায়ার করলেন চাচাজি। সেই চড়া আওয়াজটা সব কিছু কাঁপিয়ে দিয়ে আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেল। শান্ত হয়ে এল জড়াইগুড়ির জঙ্গল। একটা ফড়িং ঘাসের উপর রাখা চাচাজির সোলাহ্যাটের ডগায় বসে তিরতির পাখা নাড়তে লাগল।

চাচাজির মিস? অবাক হবার মতো ব্যাপারটা। ভাবলাম চাচিজির স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে বন্দুকের মাছির দিকে নজর দিতে পারেননি তিনি।

একটুক্ষণ বোকা-বোকা মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলেন বদরুদ্দিন চাচা। তারপর বন্দুক আধখোলা রেখে নলের ভেতর থেকে গুলির খোলটা বের করলেন। মুখ তাঁর কঠিন দেখাল। চাপা গলায় বললেন, "ইশাক; শয়তান কোথাকার। বন্দুকে ব্ল্যাংক ভরেছিস কেন?" জবাব না দিয়ে ইশাক মাথা নিচু করে রইল।

চাচা বললেন, "দেখি; গুলির বাক্সটা দেখি। হুঁ, যা ভেবেছি তাই। দুটো মাত্র বুলেট। আর সব ব্ল্যাংক। একটাও ছররা নেই। তোরা ভেবেছিস কী? অ্যাঁ?"

ব্ল্যাংকটা আমিও বুঝলাম। অর্থাৎ গুলির খোলে বারুদ-পোরা, কিন্তু লোহার বল বা ছররা নেই। ফায়ার করলে আওয়াজ হবে, কিন্তু মৃত্যুবাণ ছুটে যাবে না, কেউ চোট পাবে না। হাকিম সাহেবের বাড়িতে ওই ব্ল্যাংক কারট্রিজ বা গুলি মজুত রাখতে হয়। লোককে ভয় দেখানোর জন্য।

আর বন্দুক ছুঁড়লেন না চাচা। সারাদিন ডিহিং নদীর ধারে বসে রইলাম আমরা কজন। চাচাজি বই পড়লেন, চুপ করে জলের দিয়ে চেয়ে রইলেন। নাক ডাকিয়ে মাঝে-মাঝে দু চারবার ঝাপ্‌কাও মেরে নিলেন। আমরা, বাচ্চারা কেউ হেমেন্দ্রকুমার, কেউ সুকুমার রায় নিয়ে তন্ময়। মাঝে-মাঝে ইশাক ফ্লাসক থেকে চা ঢেলে দিল চাচাজিকে। আমরা পেটপুরে খেলাম স্যানডউইচ আর মিঠে কেক।

বিকেল গড়িয়ে আসতে মেজকাকা রাঙাকাকা এলেন। শিকারের থলি খালি দেখে দুজনেই অবাক। "সে কী! আজ তাহলে শিকারই করলেন না? না ছেলেপিলেরা চেঁচামেচি করে পাখি তাড়িয়ে দিয়েছে?" হেসে চুপ করে রইলেন চাচাজি। চাচির মুখ আমার মনে পড়ল। ইশাককে দিয়ে উনিই যে ব্ল্যাংক কারট্রিজ পাঠিয়েছেন, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র ছিল না। নইলে, ইশাকের অত সাহস হয়? নইলে, চাচাজি আজ ইশাককে খুন করে ফেলতেন না? যা হরিয়াল, যা, কোন বনপরী আজ তোদের বাঁচাল, তোরা তা কী জানবি!

ডিব্রুগড় ছেড়ে চলে যাবার আগে চাচাজি বললেন, "আমার ওখানে আসিস কিন্তু। ওখানেও ব্রহ্মপুত্র আছে, জানিস তো?"

গিয়েছিলাম। চাচিজির কবরে মাটি দিতে, ফুল ছড়াতে। তারপর দীর্ঘক্ষণ বসে ছিলাম নদীর ধারে। জলের শব্দ শুনলাম, মাছ দেখলাম, মাছধরা নৌকো দেখলাম। সূর্য লালচে হয়ে পশ্চিম দিকে বড় তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল। আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, চাচিজি। ডাকলাম, মামণি। ডাকটা কাঁপতে কাঁপতে নদীর উপর দিয়ে কোথায় চলে গেল।

ছবি রতন সেন

গর্দভের ঘোড়া সহিস

কণা বসু মিশ্র

ক্লাস সেভেনে বার কয়েক ফেল করার পর পল্টনের জেঠু ওকে শেষ পর্যন্ত নিজের চাকরির জায়গায় নিয়ে গেলেন। বাড়ির সবার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে নাকি লেজকাটা বাঁদর। এই কথা শুনে পল্টনের জেঠু বললেন, "কই বাত নেহি হ্যায়। আমার কাছে বাঘ সিধে হয়, আর ওই একটা চুনোপুঁটিকে সিধে করতে পারব না?"

মরুভূমি অঞ্চল। হাওয়ায় হাওয়ায় শুধু বালি। ফ্যাক্টরীর কোয়ার্টার্স ছাড়া তেমন আর কিছুই নেই। পল্টনের জেঠু বললেন, "শোনো পল্টন, এই গরমের লম্বা দুপুরগুলো নষ্ট করলে চলবে না।" উনি অ্যালজেব্রার কিছু অংশ আর গ্রামার দাগিয়ে দিয়ে খুব গম্ভীর গলায় বললেন, "এখানে লেখাপড়া করতে হবে।"

জেঠতুতো বোন পুপু সমস্ত সময় সঙ্গী হয়ে থাকে পল্টনের। জেঠু বেরিয়ে গেলেই পল্টন হামাগুড়ি দিয়ে সারা ঘরে ঘোড়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়। পুপু তার পিঠের ওপর।

জেঠি সেদিন ভয় দেখালেন, "শোনো পল্টন, তোমার এসব রিপোর্ট কিন্তু জেঠুর কাছে যাবে।" তারপর পুপুকে টেনে নিয়ে ঘুম পাড়ালেন জেঠি।

অ্যালজেব্রা জেব্রা হয়ে যায়। যতবারই মন দিতে চায় পল্টন, ততবারই সংখ্যাগুলো অবিকল এক-একটা জেব্রা হয়ে ওর চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়। এই জন্তুটির হাত থেকে কিছুতেই রেহাই পায় না পল্টন। কী মুশকিল!

হঠাৎ পল্টন শুনতে পায়, চুক চুক চুক। কোনো জন্তুর জল খাবার শব্দ। পল্টনের উড়ু-উড়ু মনটা চড়াই পাখির মতো ফুড়ুত করে উড়ে যায়।

বাইরে এসে পল্টন দেখে, বাছুরের মতো বড়সড় এক সম্বর চৌবাচ্চায় গলা নামিয়ে চুক চুক করে জল খাচ্ছে। কোমরে হাত রেখে পল্টন অবাক হয়ে দেখে, জল খাবার পর, হরিণটা ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়ে। তার চোখ দুটো করুণ। ঘুমে ঢুল-ঢুলু। পল্টন বুঝতে পারে, মরুভূমির ভেতর দিয়ে হরিণটা অনেক মাইল দৌড়ে এসেছে। পল্টনের মাথায় বিদ্যুতের মতো বুদ্ধি খেলে যায়। পল্টন কাপড়-টাঙানো নাইলনের দড়িটা দিয়ে সম্বরটার গলায় একটা ফাঁস পরিয়ে দেয়। তারপর দড়ির আর এক কোণ ধরে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে ওকে ভেতরের উঠোনে নিয়ে যায়। বারান্দায় থামের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখে।

ঘন্টাখানেক বাদে, ধস্তাধস্তির শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে যায় পল্টনের জেঠির। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেন, প্রকান্ড এক সম্বর বারান্দার থামের সঙ্গে শিং ঘষছে আর লাফালাফি করছে। সর্বনাশ! এ কান্ড করলে কে? ও'র অবশ্য বুঝতে বাকি থাকে না এই কান্ডের নায়ক কে। জেঠি অসহায়ভাবে বলেন, "পল্টন, তোর জেঠু এলে তোকে আস্ত রাখবেন না।"

পল্টন নিজেও এই ব্যাপারে কম চিন্তিত নয়। মাত্র এক ঘণ্টা বাদেই সম্বরটা যে এমন বাঘের মতো হিংস্র হয়ে উঠবে, এ কথা কি আগে জানত পল্টন! সম্বরটার চোখ দুটো এখন আর করুণ নয়। সাপের মতো জ্বলছে। ওর চিচিঙ্গার মতো বাঁকানো শিং দুটো যেন তেড়ে ছুটে আসতে চাইছে।

পুরনো চাকর রঘুকে ডেকে জেঠি বললেন, "রঘু, ওর গলার ফাঁসটা ছুরি দিয়ে কেটে ফেল তো।"

রঘু বলল, "ক্যায়সে কাটেগা মাইজি? উ হামকো মার ডালেগা।"

তাই তো! হরিণটা যদি কোনোরকমে ফাঁস খুলে বেরিয়ে আসে। তবে আর রক্ষে নেই। ওই শিং দিয়ে সবাইকে গুঁতিয়েই মারবে। জেঠি কাঁদো-কাঁদোভাবে বললেন, "পল্টন, তুই কী বিপদেই না ফেললি!"

ভাবনা চিন্তা পল্টনের মাথায় বেশিক্ষণ থাকে না। ও তখন গুলতি নিয়ে তাক করছে পাঁচিলের ওপরে বসা পাখিটাকে।

জেঠুর জীপের আওয়াজ পেয়েই তাড়াতাড়ি বীজগণিত খুলে বসে পল্টন। ততক্ষণে সম্বরের চিৎকারে বাড়ি মাথায় উঠেছে। ওই বন্য জন্তুটার দাপাদাপিতে জেঠুর বুকের মধ্যেও ভূমিকম্প শুরু হয়ে যায়। তারপরই গুড়ুম, গুড়ুম। জেঠুর হাতের রিভলভার গর্জে ওঠে। সম্বরটা লুটিয়ে পড়ে বারান্দার পাশে।

জেঠু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেই রক্তচোখে একবার দেখেন পল্টনকে। ওর কান ধরে টানতে টানতে ওকে নিয়ে যান বাইরের ঘরে। একটা টেবিল মাথায় করে, এক পা তুলে দাঁড় করিয়ে রাখেন উনি পল্টনকে। পর্দাটা তুলে দেন। "রাস্তার লোক দেখুক।" রাগে জেঠুর গলা ভেঙে যায়। একটা সাদা কাগজে 'শাস্তি' লিখে পল্টনের কপালে আঠা দিয়ে সেঁটে দেন জেঠু।

এসব শাস্তি বিচলিত করে না শ্রীমান পল্টনকে। জেঠুর আড়ংধোলাই বদলাতে পারে না তার স্বভাব। এই তো সেদিন জেঠি যখন ঘরের মেঝেতে জল ঢেলে, জানলায় খসখস ঝুলিয়ে পিচকিরি দিয়ে জলের স্প্রে করে, সবে ঘুমনোর আয়োজন করছেন, তখন দেখেন, পল্টন নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তার পেছন-পেছন পুপু। ছেলে-গুন্ডা অনেক দেখেছেন জেঠি। কিন্তু মেয়েগুন্ডাও দেখতে হয় ও'কে। পুপু শার্ট-প্যান্ট পরে, ডাঙগুলি খেলে বেড়ায়। সমস্ত সময় ও পল্টনের লেজে-লেজে থাকে। উনি সরু গলায় আপত্তি করেন, "এই গরমে তোমরা চললে কোথায়?"

"একটা জিনিস দেখতে।"

"এই বালির দেশে দুপুরবেলা এমন কী জিনিস?" পুপুর

চুলের মুঠি ধরে ওর মা দিলেন হ্যাঁচকা টান। "যাবে না, খবর্দার।" ভ্যাঁ করে কেঁদেই পুপু এক ছুট।

অনেকদিন থেকেই ধোপার বাড়ির গাধাটা মন টানছে পল্টনের। এই তো ভর-দুপুরে গাধাটা একলা বাঁধা থাকে গোয়ালে।

জেঠি বেশ দুশ্চিন্তায় পড়েন। "ছেলেমেয়ে দুটো গেল কোথায়? রঘু, রঘু।" তখন কুম্ভকর্ণের মতো নাক ডাকে রঘুর। রাগে ফেটে পড়েন জেঠি। রঘুর কি ঘুম ভাঙবে না?

ও'র গলার কাঁসর-ঘন্টার মতো শব্দে রঘুর ঘুম ভাঙে। তবে সে অবশ্য জেগেই দশ হাজার ছাগল খেতে চায় না। বড়-বড় চোখ করে রঘু বলে, "কেয়া বাত মাইজি?"

"যা তো, ওই বাঁদরগুলোকে ধরে আন।"

সদ্য ঘুমভাঙা চোখ দুটো কচলে রঘু বলে, "বান্দর?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাঁদর।"

গামছায় গায়ের ঘাম মুছে খইনি টিপতে-টিপতে বাঁদর খুঁজতে বেরোয় রঘু। দশাসই চেহারা তার। নড়তে-চড়তে আঠারো মাসে বছর। এই বিশাল শরীর নিয়ে কেমন করে ছুটবে রঘু? এই মুলুকে বাঁদরই বা কোথায়? বালির সমুদ্র ভেঙে বাঁদর খুঁজে বেড়ায় রঘু। চিড়িয়াখানায় রঘু বাঁদর দেখেছে বটে। বান্দর, হনুমান। হনুমানের লেজ খুব লম্বা। মুখ পোড়া। মাইজি তাকে গালাগাল দেয়, "মুখপোড়া বাঁদর।" চিড়িয়াখানায় বান্দরকে ছোলা দিয়েছিল রঘু। গা ভরা বাদামি লোম। লেজ নেড়ে মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে এসেছিল বাঁদরটা। হাতের তালুতে খইনি টিপতে-টিপতে অনেক দূরে চলে যায় রঘু। বান্দর না মিললে মাইজি তো আস্ত রাখবেন না তাকে। পাকা আমের খোসার মতো গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেবেন।

খানিক দূরে, একটা বিকট আওয়াজ শুনতে পায় রঘু। ও কান খাড়া করে শোনে, আওয়াজটা কিসের? ফাঁকা চড়াই ভেঙে একটা জন্তু ছুটে আসছে। "সীতারাম, সীতারাম।" রঘু সরে দাঁড়ায়। একটা গাধা প্রাণপণে ছুটছে। সেই গাধার পিঠের ওপর একটা ঘোড়ার বাচ্চার সামনের দু'পা। পেছনের পা দুটোয় ভর দিয়ে গাধার সঙ্গে সমানতালে ছুটছে ঘোড়াটা।

"ক্যায়সা চিড়িয়া।" বিকট শব্দে চেঁচাচ্ছে গাধা আর ঘোড়াটা। "ভূত হ্যায়, ভূত হ্যায়। সীতারাম সীতারাম।" হাতির মতো শরীরটা নিয়ে পালাতে গিয়েই পা মুচকে পড়ে যায় রঘু। রঘুর সামনে ঝড়ের মতো বালি ওড়ে। গাধার পা, আর ঘোড়ার খুরের শব্দ। যদিও ওদের গতি খুব দ্রুত নয়।

চোখ খুলে রঘু দেখে, গাধার পিঠের ওপর ঘোড়াটার সামনের দু'পা বাঁধা। "ভূত নেহি হ্যায়। সীতারাম সীতারাম।" পর-মুহূর্তেই ভাঙা পায়ের যন্ত্রণায় কাতর রঘু দেখে ক্যানেস্তারার টিন বাজিয়ে বাজিয়ে ছুটে আসছে পল্টনদাদা, পুপুদিদি। পল্টন ছুটে ছুটে ঘোড়াটার লেজ মুচড়ে দিচ্ছে। ভাঙা ক্যানেস্তারার টিনটা দিয়ে গাধার পিঠে মারছে চাপড়। পঙ্গপালের মতো ওদের পেছন-পেছন ধাওয়া করছে বস্তির একপাল কাচ্চাবাচ্চা।

হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না রঘু। মাইজি বলেছিল, "বাঁদরগুলোকে ধরে আন।" এই কি সেই বান্দর? পা ছেঁচড়ে-ছেঁচড়ে ওই বাঁদর দুটোর পেছন-পেছন ছোটে রঘু। তারপর একসময় খপ করে ধরে ফেলে পল্টন আর পুপুকে।

রঘুর বিশাল শরীরের মধ্যে ছটফট করে ওঠে পল্টন, পুপু। পায়ের ব্যথায় বিকৃত গলায় রঘু চেঁচিয়ে বলে, "মিল গিয়া মিল গিয়া।"

রঘুদার ভাঙা ঠ্যাঙে জোরসে একটা কুংফু মেরে ফেলে দেয় পল্টন। ডিগবাজি খেয়ে রঘু তবু চেঁচায়, "মাইজি, বান্দর মিল গিয়া।"

ছবি দেবাশিস দেব

ঝগড়া

দেবাশিস বসু

বিড়াল বলে ময়নাকে—
তুই তো শালিক রং-করা,
ছুঁই না আমি তাই তোকে

ময়না বলে ঃ মনগড়া
ভুল যত-সব খাস খুঁটে!
তোর মতো নই হিংসুটে,
বিচ্ছু, পাজি, দুধ-চোরা।

বিড়াল বলে ঃ চোপ্, ভারী
খাস তো ছাতুর তরকারি,
ক্ষীর ননি সর দুধ পায়স
ইলিশ-কাঁটার যোগ্য নোস,
তর্ক করিস কোন্ সাহস,
লোহার খাঁচা, জোর তারই?

ময়না বলে ঃ মিথ্যে তোর
অহংকারও — বাঘমাসি,
রাত পুইয়ে করবি ভোর?
যা, ভাগ্ এখন, কাল আসিস!

ছবি দেবাশিস দেব
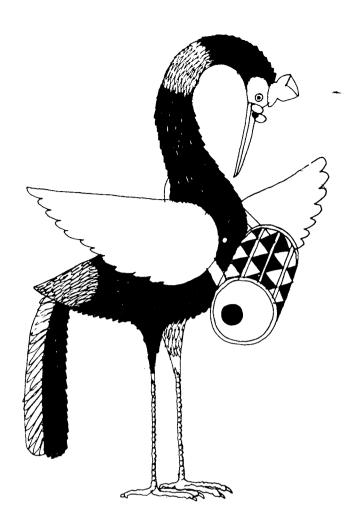
টাক্ ডুমা ডুম

বলরাম বসাক

একটা বক ছিল। তার একটা ঢোল ছিল। বনের একধারে একটা বুনো-আমলকী গাছ ছিল। কাঠফাটা রোদে তার ছায়াটা ছিল ভারী মিষ্টি। সেই ছায়ায় দাঁড়িয়ে বকমামা পায়ে ঘুঙুর পরত। তারপর পাঁচ পয়সা খরচা করে এক ঠোঙা চানাচুর কিনত। পাঁচ পয়সায় কতটুকুন হয় বলো দেখি। এইটুকুনি একটা চোঙা-মতন ঠোঙায় এত্তটুকুন চানাচুর, তাই কুড়মুড় করে খেয়ে, বকমামা ঠোঙাটা মাথায় টুপির মতন করে পরত। ব্যস্, তারপর ঢোল গলায় ঝুলিয়ে বাজাত, টাক্-ডুম-ডুম টাক্-ডুমা-ডুম।

নাচত ঝুম-ঝুমো-ঝুম, ঝুম-ঝুমো-ঝুম।

তখন পাড়া-পড়শি, সাদা ইঁদুর, খরগোশ, হুক্কাহুয়া, ঘেউ, হালুম, ময়না, টিয়া, ভোঁদড়বাবু, উটপিসি সব্বাই ছুটে আসত। সেই বুনো আমলকী গাছের ছায়ায় গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে বকমামার সেই ঢোল বাজানো আর নাচ। সবাই খুব চেঁচিয়ে বলত, "বাহ্-বাহ্, চমৎকার-চমৎকার।" তারপর তারাও বকমামার সঙ্গে পায়ে তাল ঠুকে অল্প-অল্প নাচত। আর হাসত খুউব। কোথা থেকে চলে আসত সাদা-চোখ বাবুনা পাখি। ওদের সঙ্গে মাথা নেড়ে গাইত, "টিরি-টিরি-টিরি না।"

গাছে-গাছে ফুটত লাল ফুল, নীল ফুল, হলদে, বেগুনি, কমলা ফুল। কোনো-কোনো গাছে লাল মেরুন কুলের মতো ফল ঝিকমিক করত। চারদিকে মৌমাছি উড়ত, গান গাইত গুন-গুন। আর নীচে হালুম, গরর, হুক্কাহুয়া, ভল্লুভায়ারা মাথা দুলিয়ে কোমর দুলিয়ে নাচতে-নাচতে, গাইতে-গাইতে মাঝে-মাঝে চেঁচিয়ে বলত "চমৎকার, মচৎকার।" এমনি করে বকমামার ঢোলের তালে তালে আনন্দে কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো বনের সক্কলের।

হঠাৎ একদিন কী হল, বকমামা সারা বন ঘুরে ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দিল, "এবার থেকে আমি, বকমামা, আর ঢোল বাজাব না। ডুম-ডুম-ডুম-ডুম। বাঁশতলার ধারে টুসু নদীর পারে শিব ঠাকুরের ধ্যান করব, ডুম-ডুম-ডুম-ডুম।" বলেই বকমামা ঢোলটা রাখল বুনো আমলকী গাছের তলায়। চলে গেল বাঁশ তলার নদীর পারে। জলকাদার ওপর এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে শুরু করে দিলে শিবঠাকুরের ধ্যান।

এদিকে বনে হৈ-হৈ রৈ-রৈ। হায়-হায়। গেল-গেল। ঢোল না বাজলে কী করে চলবে। কেউ বলল, "ঢোল না বাজলে ঘুম আসবে না।" কেউ বলল, "ঢোল না বাজলে খিদেই পাবে না।" ওরে বাবা, হালুম বলে কী, "ঢোল না বাজলে আমার মন-মেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। তখন আমি হালুম-হালুম করে সব্বাইকে খেয়ে ফেলব।" বলেই হালুম করলে কী, বাঁশবনে গিয়ে গাঁ-গাঁ করে চিৎকার শুরু করে দিল।

তাই তো, কী হবে? হাঁসমামা বলল, "ঠিক আছে, ঢোলটা আমিই বাজাচ্ছি। অমনি কাককাকু মুখ ভেংচে বলল, "ধ্যাত।" জিরাফদাদা বলল, "তাহলে আমিই বাজাই।" উটপিসি সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "দূর-দূর, তুই কী বাজাবি?" হুক্কাহুয়া বলল,

"আসলে লম্বামতন ঠোঁট কার আছে খুঁজে বার করো। বকের লম্বা ঠোঁট ছিল, তাই ও ঢোলটা বেশ বাজাত।"

খোঁজ, খোঁজ। লম্বামতন ঠোঁঠ কার আছে?

খুঁজতে-খুঁজতে পাওয়া গেল গগনবেড়কে। লম্বা ঠোঁটের নীচে জালের মতো লম্বা থলি ঝুলছে গগনবেড়ের। ঐ ঠোঁটে কি ঢোল বাজানো যাবে?

হুক্কাহুয়া বলল, "নাহ্।" হাতিদাদাও বলল, "নাহ্।"

আবার চলল, খোঁজ খোঁজ।

এরপর পাওয়া গেল ধনেশ পাখিকে। ওরেব্বাবা। অমন গরুর শিঙের মতো বিশাল ঠোঁট দেখে কেউ আর কাছেই ঘেঁষল না।

তারপর কাদাখোঁচা পাখি, পানকৌড়ি, মৌটুসি, মাছরাঙা হাড়গিলে, ফ্লেমিংগো, হুপোপাখি, সব দেখা হল। "নাহ্, চলে না, চলে না," হুক্কাহুয়া আর ভল্লুভায়া মাথা দুলিয়ে ঘাড় নাড়ল, "ঢোল বাজাবার মতো বেশ কাঠি-কাঠি ঠোঁট নয়কো।"

শেষে সবাই ঠিক করল, হ্যাঁ, অত খোঁজের দরকার কী. আমাদের কাঠঠোকরামেসোর ঠোঁটই যথেষ্ট চলনসই। বকমামার মতো অমন লম্বাটে না হলেও খুব খারাপ লম্বা নয়। আর বেশ কাঠি-কাঠি। তাছাড়া ঠোঁটে জোরও আছে মন্দ না। অতএব কাঠঠোকরামেসোই এবার থেকে ঐ ঢোলটা বাজাবে।

"সবাই এসো, সবাই এসো, সবাই এসো।
এবার থেকে ঢোল বাজাবে কাঠঠোকরামেসো।"

কাঠঠোকরামেসো তখন ঢোক গিলে, মাথা চুলকে, আজ নয় কাল থাক, পরশুদিন আসুক,—এইসব করে, শেষে তার সামান্য লম্বা, শক্ত, ছুঁচোল ঠোঁট দিয়ে যেই না ঢোলটা বাজাতে গেল, ওমনি ঢোল হয়ে গেল ফুটো। হায় হায়! এখন কী হবে? ফুটো ঢোল বাজবে কী করে? হুক্কাহুয়া বলল, "খুব ভুল হয়ে গেছে, কাঠঠোকরামেসো যে শুধু কাঠ-ফুটো করতেই জানে—।" ভল্লুভায়া চুকচুক করে ঘাড় নাড়ল, "ওকে ঢোল বাজাতে বলা ঠিক হয়নিকো।"

"যার কাঠ-ফুটো করার স্বভাব তাকে দিয়ে কি ঢোল বাজানো চলে?" বলেই উটপাখি ছ্যা-ছ্যা করতে লাগল। কাঠঠোকরা-মেসো লজ্জা পেয়ে, দুঃখ পেয়ে, উড়ে চলে গেল বুনোজামির গাছে, "হায় আমার কাঠ-ফুটো করার স্বভাব কারুর কাজেই লাগে না দেখছি।"

এদিকে বনের ভেতর গোল হয়ে বসে সবাই মিলে একটা দারুণ মিটিং করল। অনেক কথা-কাটাকাটি ঝগড়া-ঝাঁটি হল। তারপর ঠিক হল, ঢোলটা ঢোলপুর থেকে সারিয়ে আনা হবে। আর বকমামার ধ্যান ভেঙে তাকে বনে ডেকে আনা হবে। ঢোলটা বকমামাকেই বাজাতে হবে।

জিরাফদাদা ঢোল সারাতে ঢোলপুর চলে গেল। হালুমচাঁদ, গররনেকড়ে, হাতিদাদা, হুক্কাহুয়া সবাই গেল টুসু নদীর পারে, বাঁশতলার ধারে বকমামার ধ্যান ভাঙতে। এক ঠ্যাঙে একঠায় দাঁড়িয়ে চোখ দুটি বুজে বকমামা শিবঠাকুরের ধ্যান করছে।

হালুম ডাকল, গাঁ-গাঁ-গোঁ-গোঁ - হালুম-মালুম-খালুম খেয়ে-ফেলুম।"

গরর বলল, "অ্যাঁ-মি-নেকড়ে ব'লচি ঘরর-ঘরর, টুঁটি ছিঁড়ে খাঁব। হরর-হরর।"

দুজনে মিলে অনেক ভয় দেখাল বকমামাকে। কিছুই হল না। এ যে শিবঠাকুরের ধ্যান। এ ধ্যান ভাঙা শিবেরও অসাধ্যি। হাতিদাদা আটষট্টিবার হুঙ্কার ছেড়ে দেখল, কিছুই হল না বকমামার। হুক্কাহুয়া বলল, "এসো, আমরা সবাই একসাথে কোরাস গাই।"

হালুম, গরর, হাতিদাদা আর হুক্কাহুয়া যে যার ভাষায় প্রচণ্ড চিৎকার করে কোরাস গাইল:

"বকমামা বকমামা চোখ মেলে চাও।
হাসি-খুশি এনে দাও বনটা বাঁচাও।"

এতেও কিছু হল না। বকমামা এক ঠ্যাঙে একঠায় যেভাবে দাঁড়িয়েছিল, সেভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল। তাই ওরা আর কী করে, হাল ছেড়ে বনে ফিরে এল।

বনটা চুপচাপ হয়ে গেল। ঢোল বাজে না। নাচ হয় না। কোনো আনন্দ নেই। সবারই মুখ বিতিকিচ্ছিরিমতন হয়ে গেল। লালমন, হিরেমন, লালঝুঁটি কাকাতুয়া, নীলকন্ঠ সবাই বন ছেড়ে চলে যেতে লাগল। গাছের ফুল ফোটা বন্ধ হয়ে গেল। সবুজ পাতা সব হলদে হয়ে যেতে লাগল। প্রজাপতি মৌমাছিরা অন্য বনে চলে গেল।

"ঢোল বাজে না, আনন্দ নেই, বনে থেকে কী হবে?" খরগোশ বলল কাঠবেড়ালিকে। ওরা দুজন বন ছেড়ে চলে যাচ্ছে দেখে, কাঠঠোকরামেসো বুনোজামির গাছ থেকে বেরিয়ে এল। বলল, "তোমরা একটু সবুর করো। আমি বকমামাকে বনে ফিরিয়ে আনব।"

"কী করে আনবে?"

"আমার এই কাঠফুটো করার স্বভাবটা দেখা যাক এবার কোনো কাজে লাগে কি না।" এই না বলে হুস করে চলে গেল টুসু নদীর দিকে। নদীর কিনারে জেলেদের নৌকো জলকাদায় আটকে থাকে। নৌকোর ভেতর আর্ধেকটা ভর্তি জল। তাতে গিজ-গিজ করছে রুপোলি পুঁটি আর মৌরলা মাছ। কাঠঠোকরা-মেসো করলে কী, একটা নৌকোর কাঠের গা ঠোঁট দিয়ে ঠক-ঠক করে ঠুকল। ঠুকে ঠুকে বেশ কয়েকটা ফুটো করল। ফুটোগুলো দিয়ে জল আর মাছ একে একে পড়ল নদীতে।

এদিকে বকমামার ধ্যান হঠাৎ ভেঙে গেল। এ কী! এ কী! কে ধ্যান ভেঙে দিল? রুপোলি পুঁটি আর মৌরলা। বড্ড বিরক্ত করছে মাছগুলো। বকমামা তখন রেগে গিয়ে বলল, "কী, আমার ধ্যান ভেঙে দিলি, এই নে তার শাস্তি।" বলেই, কপ করে মাছগুলো ঠোঁটে তুলে গপ করে গিলতে লাগল। এভাবে মাছগুলোকে শাস্তি দিতে-দিতে বকমামার ভীষণ পেট খারাপ করল। পেট খারাপ করলে কি আর ধ্যান করা যায়? ডাক্তার দেখাতে হয়।

তাই বকমামাকে আবার বনে ফিরে আসতে হল। ঘুঘু ডাক্তারের কাছে পেটের চিকিৎসা করতে হল দুটি শর্তে। এক, কোনোদিন মাছের লোভে শিবঠাকুরের ধ্যান করবে না। দুই, বকমামা যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিনই বনে ঢোল বাজাতে হবে।

ঢোলপুর থেকে জিরাফদাদা ঢোলটা সারিয়ে এনেছে। আর বকমামাও সুস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি পায়ে ঘুঙুর পরল। মাথায় পরল পাঁচ পয়সা দামের চানাচুরের ঠোঙা। ঢোলটা গলায় ঝুলিয়ে এসে দাঁড়াল সেই বুনো-আমলকী গাছের মিষ্টি ছায়ায়। বাজাতে শুরু করল, "টাক-ডুমা-ডুম, টাক-ডুমা-ডুম।" সঙ্গে সঙ্গে নাচল, ঝুম-ঝুমা-ঝুম, ঝুম-ঝুমা-ঝুম।

সাদা ইঁদুর, খরগোশ, কাঠঠোকরামেসো, হুক্কাহুয়া, ঘেউ, সজারুকাকা, ভল্লুভায়া, হাতিদাদা, উটপাখি সব্বাই হাত ধরাধরি করে, তালে-তালে পা ফেলে নাচতে লেগে গেল। উড়ে এল একে-একে পাখিরা, মৌমাছিরা, দেখতে দেখতে গাছের পাতা আবার হয়ে উঠল সবুজ। ফুল আবার ফুটতে লাগল লাল-নীল। প্রজাপতিরা ছুটে আসতে লাগল। আবার নতুন নীল রঙ-করা আকাশের নীচে নতুন সবুজ রঙ ধরা বনের ভেতরে টাক-ডুমা-ডুম, টাক-ডুমা-ডুম বার-বার বেজে চলল, আর মাঝে-মাঝে উঠল আগের মতো আনন্দের রোল, "চমৎকার, মচৎকার।"

ছবি সমীর সরকার
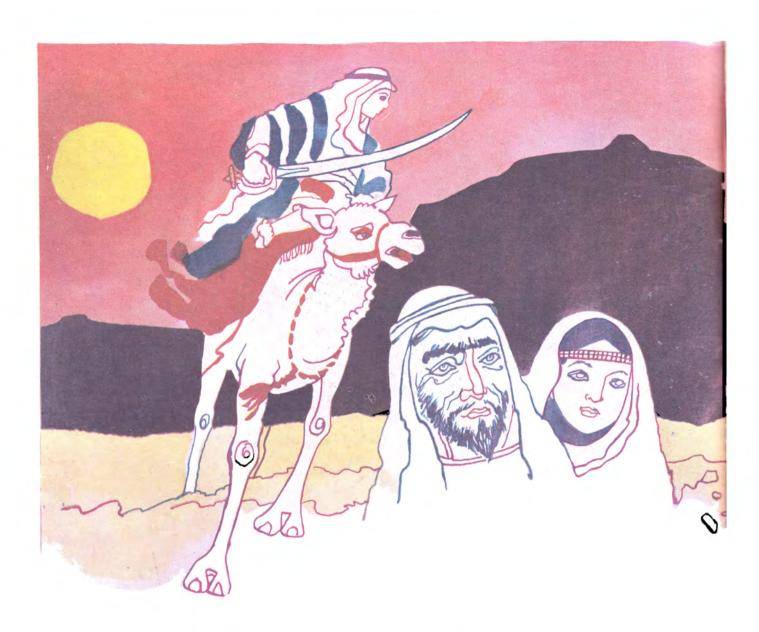
আবু ও দস্যু-সর্দার

শৈলেন ঘোষ

একদিন আমার মা আমার চিবুক ছুঁয়ে আদর করতে-করতে আমার বাবাকে বলছিল, "দ্যাখো, দ্যাখো, আবু আমার কত বড় হয়ে গেছে!"

বাবা আমার মুখের দিকে চেয়ে হো-হো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, "হ্যাঁ, তাই তো! দেখতে-দেখতে সত্যিই কত বড় হয়ে গেছে আবু। আর কদিন পরে পাশার পিঠে চেপে আবুও আমার মতো কাজে বেরুবে।"

সে-কথা শুনে, সত্যি বলছি, আমি আনন্দে শিউরে উঠেছিলুম। কেননা, আমি যে শুধু এই স্বপ্নই দেখি। স্বপ্ন দেখি দিনে-রাতে, ওই বালির সমুদ্র যেন বারবার আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এ-সমুদ্রের শেষ নেই। বালি, বালি, যেদিকে চাইবে, দেখবে শুধু বালি। ওই দূরে, অনেক দূরে, আকাশ যেখানে পৃথিবীর বুকে
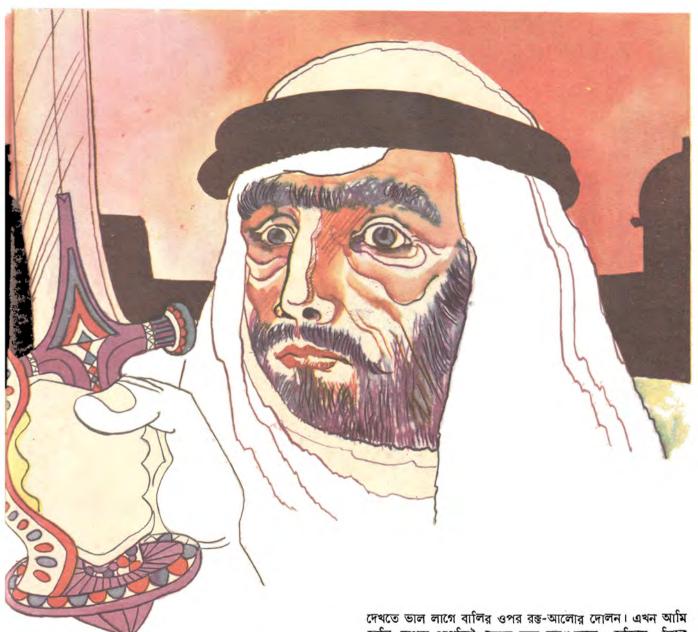
নেমে এসেছে, সেখানে যেন একটু-একটু করে এই সমুদ্রও হারিয়ে গেছে। সূর্যের কিরণে এ-সমুদ্র জ্বলন্ত আগুন। মন বলে, বারবার বলে, পাশার পিঠে চেপে আমিও হারিয়ে যাই ওই জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে।

হ্যাঁ, এখন আমি সত্যিই বড় হয়েছি। জানি না, তোমার চেয়ে বড় কি না। তবে এখন আমি জানি, এই যে রাশি-রাশি বালির রাজত্ব, এই যে ধু-ধু মরুভূমি, এইখানেই আমার দেশ। আমি জানি, ওই যে লম্বা-চওড়া রোদে-পোড়া মানুষগুলি, যারা দুঃখ আর কষ্টের সঙ্গে লড়াই করে প্রতিদিন উটের পিঠে চেপে নানান কাজে ওই সমুদ্রে পাড়ি দেয়, তারা আমার দেশের মানুষ। এই মানুষেরা কেউ আপন, কেউ পর। কেউ দূরের, কেউ কাছের।

তুমি হয়তো ভাবছ পাশা কে!

পাশা আমাদের উট।

আমি বড় হয়েছি বলে এখন আমি পাশার পিঠে চেপে রাশি-রাশি বালির ওপর দিয়ে খানিকটা বেড়িয়ে আসতে পারি। এখন পাশার পিঠে বসে, পড়ন্ত সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে আমার দেখতে ভাল লাগে বালির ওপর রক্ত-আলোর দোলন। এখন আমি জানি, মাথার পাগড়িটা কেমন করে মুখে-নাকে জড়িয়ে নিলে সূর্যের ঝলসানো আগুনে আমার কিচ্ছু হবে না। এই সূর্য, এই বালি, এই আকাশ, সব আমার চেনা। আমার আপনার। ওই যেখানে একটুখানি জায়গা ঘিরে খেজুর-গাছের ছায়ারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, ওই ছায়ার নীচে আমাদের ঘর। তুমি আমাদের ঘরটা যদি একটু দূর থেকে দ্যাখো, তোমার মনে হবে, যেন একটি চৌকো-মতো খেলনার বাক্স। এরকম ঘর পর-পর তোমার আরও নজরে পড়বে। তবে যারা বড়লোক, যাদের পাঁচ-দশটা উট আছে, তাদের ঘরগুলো সব ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি। ভারী সুন্দর দেখতে।

শুনি তোমরা খুব সুখে আছ। আমাদের মতো তোমাদের কোনো কষ্টই নেই। আমি শুনেছি, তোমাদের মাঠ ভর্তি সবুজ গাছ-গাছালি। শুনেছি, সে-গাছে ফুলে-ফলে ছড়াছড়ি। কত নদী-নালা। বর্ষার দিনে মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়। ঝমঝমিয়ে বিষ্টি নামে। মাঠ-ঘাট সব জলে-জলে থৈ-থৈ! অবাক হয়ে যাই একথা শুনে। কেননা, এখানে এসব কিচ্ছু নেই। তবে হ্যাঁ, আমি কি আর বলছি এখানে বিষ্টি হয় না! হয়। এখানে হঠাৎ যেমন আকাশ ভেঙে বিষ্টি নামে, তেমনি আবার হঠাৎ-ই থামে। হলে কী হবে। মরুর এই আগুনের রাজ্যে আকাশের ওই জলটুকু কিচ্ছু কাজে

লাগে না। রাক্ষুসে বালি যেন তেষ্টায় হাঁ করে ধুঁকছে! জল একবার পড়লে হয়। নিমেষের মধ্যে ঢক-ঢক করে গিলে খেয়ে ফেলবে! তাই দেখে ভাবি, মরুর তেষ্টা বুঝি কোনদিন মেটে না। মিটবেও না।

কিন্তু আমার সবচেয়ে অবাক লাগে পাশার কথা ভেবে। আমি দেখেছি, পাঁচ-পাঁচটা দিন এক ফোঁটা জল মুখে না দিয়েও দিব্যি আছে! পিঠে ভারী ভারী মাল-পত্তর নিয়ে, দিনের পর দিন ওই বালির ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। তবু তেষ্টা নেই! অথচ আমাদের? জল না হলে আর রক্ষে আছে! কী ছটফটানি!

রক্ষে, আমাদের ঘর থেকে দু পা এগোলেই জলের ইঁদারা। তোমাদের যেমন পাতকুয়ো, তেমনি। এখানে এই একটিই ইঁদারা। তারপর তুমি মাইলের পর মাইল খুঁজে বেড়াও, একটু জল পাবে না। আমি দেখি রোজ কত মানুষ এখানে আসে। কত দূর-দূরান্ত থেকে। সঙ্গে সারি-সারি উট। তাদের পিঠে কত কী জিনিসপত্তর। এই মরুর সীমানা পেরিয়ে বাণিজ্য করতে চলেছে। একটু জলের জন্যে ওরা এখানে থামবে। তাঁবু ফেলবে। বিশ্রাম নেবে। তারপর আবার চলো। চলো ওই মরুর জাহাজে চড়ে। জাহাজ? অবাক হলে? জানো না বুঝি আমরা ওদের বলি জাহাজ? ওই যে উট, দ্যাখো না কেমন চলেছে দলে-দলে সার বেঁধে দুলতে-দুলতে ওই বালির সমুদ্রের ওপর দিয়ে!

আমার বাবাও এই কাজ করে। পাশার পিঠে বেঁধে নিয়ে যায় কত দামি দামি সওদা। সার বেঁধে চলে বালির ওপর দিয়ে। মাথার ওপর সূর্য। কী অসহ্য তার তেজ। শরীর যেন জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যায়। তবু থামলে চলবে না। একটু ছায়ায় যে জিরিয়ে নেবে, সেই ছায়াই বা কই এই শূন্য মরুভূমিতে! যেদিকে চাইবে, খালি বালির ঢেউ আর ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা! ওই নিস্তব্ধতা ভেঙে শুধু চলেছে ওরাই, ওই বোবা উটের দল। বালির ওপর ওদের পায়ের শব্দ ভারী নরম, ভারী অস্পষ্ট!

আমার বাবার পোশাকটা দেখলে তোমার ভাল লাগবে কি না জানি না। একদম পায়ের নীচ অবধি একটা লম্বা জামা। সেই জামা কোনোটা নীল, কোনোটা সাদা। কোমরে আঁট-সাঁট বাঁধা একটা শক্ত কাপড়ের বেল্ট। সেই বেল্টে গোঁজা একটা ঝক-ঝকে ছোরা। কোমরের বাঁ পাশে তরোয়াল ঝোলানো। মাথায় পাগড়ি আর পায়ে চপ্পল।

আমার পোশাকও এমনি। তবে, আমার একটা এত সুন্দর নীল ডোরা-কাটা জামা আছে যে, দেখলেই তোমার ভাল লাগবে। তোমার ইচ্ছে হবে এখুনিই গায়ে দাও। আমি মনে-মনে ভাবি আমি যেদিন প্রথম বাবার মতো একা-একা পাশার পিঠে চেপে মরুতে পাড়ি দেব, সেইদিন ওই জামাটা গায়ে পরব।

আমি জানি তুমি ঠিক ভাবছ, আমার বাবার কোমরে কেনই-বা ছোরা আঁটা আর কেনই-বা তরোয়াল ঝোলানো। এই কথাটা তোমরা জিজ্ঞেস করতেই পারো। কারণ তোমরা তো মরুভূমির মানুষ নও। ধরো, তুমি চলেছ তোমার উটের পিঠে চেপে একা-একা ওই মরুভূমির ওপর দিয়ে নির্জন দুপুরে কিংবা গভীর রাত্রে। হয়তো তোমার সঙ্গে রয়েছে এমন কিছু মূল্যবান ধনরত্ন যেগুলি কালই তোমাকে এই মরুভূমি পেরিয়ে শহরে পৌঁছে দিতে হবে। তুমি চলেছ, তোমার উটের গলায় ছোট্ট একটি ঘণ্টা বেজে যায়, টিং-লিং, টিং-লিং। সেই শব্দ মরুভূমির নিস্তব্ধতা ভেঙে যতই চমকে উঠছে, ততই যেন ওই রাশি-রাশি বালির বুকেও শিহরন জাগছে।

ঠিক এমনই সময়ে তুমি যদি হঠাৎ দেখতে পাও, দূরে, তোমার চোখের সামনে বালির মেঘ উড়িয়ে একদল ঘোড়-সওয়ার ছুটে আসছে! যদি দ্যাখো তাদের চোখে-মুখে কালো কাপড় ঢাকা! তাদের হাতে ঝকঝকে তরোয়াল! তবে তোমার কি বুঝতে বাকি থাকবে যে ওরা এই মরুর দস্যু! ওরা তোমার এই ধনরত্ন লুঠ করবে! তখন বলো, তুমি কী করবে? ভিতুর মতো কাঁপতে কাঁপতে ওদের হাতে এই ধনরত্ন তুলে দিয়ে নিজে বাঁচবে? না, তোমার ওই কোমরে-বাঁধা চকচকে ছোরা হাতে নিয়ে মুখোমুখি রুখে দাঁড়াবে?

আমরা মরুর দেশে বাস করি। রুক্ষ মরুভূমি আমাদের সাহসী হতে শিখিয়েছে। শিখিয়েছে বিপদের মুখোমুখি কেমন করে দাঁড়াতে হয়। ওই সূর্যের ঝলসানো আগুন মাথায় নিয়ে আমরা বড় হয়েছি। আমরা জানি, কষ্টকে যে জয় করতে পারে সে-ই তো বীর।

সত্যি, তুমি আমার বাবাকে দেখলে, একথা বিশ্বাস না করে পারবে না। কী সাহস আমার বাবার। তুমি তরোয়াল নিয়ে লড়াই করতে বলো, বাবা পিছপা হবে না। তুমি তীর-ধনুক ছুঁড়তে বলো, চক্ষের নিমেষে দূরের লক্ষ্য ভেদ করে দেবে। বাবার কাছে কষ্ট-টষ্ট কিচ্ছু না। দিনের পর দিন ওই মরুভূমির ওপর দিয়ে চলেছে বাবা। কত ঝঞ্ঝা, কত বিপদ, কত কালো অন্ধকার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে। বুক পেতে সব সহ্য করেছে। ভয়? ভয় পেলে চলে! বিপদকে নিয়েই তো আমরা বেঁচে আছি! আর সত্যি বলছি, বিপদ না-থাকলে বাঁচার মজাই নেই!

কেমন করে তীর-ধনুক ছুড়তে হয়, আমিও শিখে ফেলেছি। আমি এখন জানি, কেমন করে তরোয়াল ঘোরালে শত্রু আমার ধারে কাছেও আসতে পারবে না। ওই সূর্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এখন আমি গান গাইতে পারি। আগুনের গান। আর এই গান, এই আনন্দ, এই হাসি, আর এই দুঃখ, সব নিয়ে মরুর মানুষ আমরা। এই পৃথিবীতে তোমাদেরই মতো আমরাও। আমি, আমার মা, আমার বাবা!

আজ ঘুম থেকে উঠে আমি তোমাদের আনন্দের কোনো খবর দিতে পারছি না। ভাল লাগার কোনো কথা আমার মুখে আজ শুনতে পাবে না তুমি। মনটা যেন আপনা থেকে থমকে গেছে। চমকে গেছি আমি এখনও বাবাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে। মা কেন বসে আছে বাবার মাথার কাছে? আমি দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "কী হয়েছে মা?"

বাবা ভারী কষ্টে হাতটি নেড়ে আমায় কাছে ডাকল।

আমি ছুটে গেলুম, "কী হয়েছে বাবা?" বাবার কপালে আমার হাত রাখলুম। ইশ! বাবার জ্বর! গা যে পুড়ে যাচ্ছে। আমি তো কক্ষনো বাবার জ্বর হতে দেখিনি। হঠাৎ কেন হল!

হঠাৎ-ই। কারণ কালও বাবা সারাদিন ধরে সাত-পাঁচ কত কাজ করেছে। করতেই হয়েছে। কেননা, আজ বাদে কাল বাবাকে শহরে যেতে হবে। শহরে যেতে হবে উট-পাখির পালক নিয়ে। শহর মানে সে কোথায়! এই মরুর বালি ভাঙতে-ভাঙতে সেই শেষ প্রান্তে। যেতে দশদিন, আসতে ততদিন। আমি জানি এই পালক যদি ঠিক দিনে না পৌঁছয়, মুখ দেখাতে পারবে না বাবা। কেননা, বাবা যে কথা দিয়েছে পালকের ব্যবসাদারকে! এখন কী হবে?

যা হোক হবে। আগে তো মানুষের শরীর। তারপরে কাজ!

কিন্তু সে-কথা শোনার মানুষ নয় আমার বাবা। আমি দেখছি কষ্ট হচ্ছে, তবু বাবা হাসছে আমায় দেখে। আমি জিজ্ঞেস করছি, "বাবা তোমার কষ্ট হচ্ছে?"

বাবা ঘাড় নাড়ছে। ঘাড় নেড়ে বলছে, "আমার কিচ্ছু হয়নি। কাল সকালে শহরে যাব আমি।"

আমি বললুম, "কাল না-ই বা গেলে। দুদিন পরে একটু ভাল হয়ে তারপরে যাবে।"

বাবা আমার চোখের দিকে চাইল। ধীরে-ধীরে হাতটি আমার মুখের কাছে তুলে, আমার গালের ওপর হাতটি রেখে বলল, "আমি যে কথা দিয়েছি আবু।"

"কিন্তু তোমার কষ্ট হবে বাবা। তুমি পারবে না।"

"পারব।" বাবার গলায় কঠিন স্বর।

আমি জানি, আমরা পারব না বাবাকে রাজি করাতে। কিন্তু যে মানুষটার অসুখ, তাকে আমরাই বা ছাড়ি কোন সাহসে! কে জানে কোন্ দিক দিয়ে কোন্ বিপদ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাই আজ আমি সারাদিন বাবার কাছছাড়া হইনি। বাবার বিছানার পাশটিতে বসে সারাদিন আমি বাবার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছি। আর নয়তো কপালে হাত রেখে বলেছি, "বাবা, পালকগুলো অন্য কাউকে দিয়ে পৌঁছে দিলে হয় না?"

আমার মুখের কথা শেষ হবার আগেই বাবার ঠোঁট দুটি ভারী কষ্টে কেঁপে উঠল। তারপর বলল, "যার কাজ তাকেই যে করতে হয় বাবা। আমার বোঝা অন্যের কাঁধে চাপালে আমি যে শান্তি পাব না।"

আমি আর কিছু বলিনি। এরপর আমার বলারই বা কী আছে! হ্যাঁ, আমি বলতে পারতুম যদি আমি আরও একটু বড় হতুম। তখন আমি পাশার পিঠে পালকের বোঝা চাপিয়ে নিজেই পাড়ি দিতুম ওই বালির ওপর। বাবা বিছানায় শুয়ে-শুয়ে শুনত পাশার গলার ঘণ্টা বাজছে, আর নয়তো ঘরের ওই জানলাটায় মুখ ঠেকিয়ে দেখত, তার ছেলে বাণিজ্যে চলেছে। দূর থেকে দূরে পাশা হেঁটে চলেছে। তার মস্ত উঁচু মাথাটা দুলছে খুশিতে। আমি তার পিঠে বসে দুলতে-দুলতে হারিয়ে যাচ্ছি বালির রাজ্যে। আহা! সত্যি যদি এমন হত! সত্যি-সত্যি যদি আমি ওই আগুনের সমুদ্রে হারিয়ে যেতুম। যদি আমি সত্যি-সত্যি পারতুম ওই উট-পাখির পালক পাশার পিঠে বেঁধে শহরে পৌঁছে দিতে।

কে বলেছে আমি পারি না! কে বলেছে ওই আগুনের সমুদ্রে হারিয়ে যেতে আমার ভয় করে। না, আমি ভয় পাই না। আমি যদি চিৎকার করে বলে উঠি, হ্যাঁ, আমি পারি! যদি বলি, ওই পালকের বোঝা পাশার পিঠে বেঁধে আমি পৌঁছে দিতে পারি শহরে, সে-কথা কি শুনবে কেউ? শুনবে আমার মা? আমার বাবা? জানি না। শুধু জানি, আমি তাদের একমাত্র ছেলে। এই একমাত্র ছেলেকে নিয়ে তাদের মনে হয়তো কত স্বপ্ন। সে-স্বপ্নের মণিমুক্তাগুলি হয়তো আমার গলায় ঝিকমিকিয়ে উঠছে। হয়তো তাদের স্বপ্নের রাজপুত্তুর হয়ে উঠছি আমি!

না, রাজপুত্তুর হবার ইচ্ছা আমার নেই। আমি চাই না, আমাদের এই চৌকো ঘরখানা আজ এখনই রাজপ্রাসাদ হয়ে গড়ে উঠুক। আমি যেন আমার মা আর বাবাকে বলতে পারি, "আমি যা আছি সেই তো ভাল। তোমাদের ওই হাসি, ওই আদর, এই ভাল, এই মন্দ নিয়ে আমাকে তোমাদের কাছে কাছে রাখো। মা আর বাবার চেয়ে আমার কাছে কী-ই বা সুন্দর! কে-ই বা বড়!"

হ্যাঁ, বাবার কষ্ট দেখে তাই আজ সারাদিন আমি ছটফট করেছি। তবু পারিনি আমার মনের কথা বলতে! পারিনি বলতে, "বাবা, এই দ্যাখো, তোমার আবু বড় হয়েছে। তোমার আবু পারবে, ঠিক পারবে ওই উটপাখির পালক শহরে পৌঁছে দিতে। তোমার জ্বর হয়েছে বাবা! তুমি কদিন এই ছোট্ট ঘরের ছায়ায় শুয়ে বিশ্রাম নিলে, তোমার ছেলে কি তোমায় দেখবে না? নাকি, সে পারবে না তোমার বোঝা বইতে?"

কিন্তু একথা আমি বাবাকে বলতে পারিনি। কারণ, একথা শুনলে বাবা যে আমায় খুশি হয়ে বুকে জড়িয়ে ধরবে না, তা আমি জানি। আমি ঠিক জানি, একথা শুনলে বাবা তখনই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়বে। যত কষ্টই হোক পাশার সামনে গিয়ে ওর পিঠের ওপর পালকের বস্তা ঝুলিয়ে হাসতে-হাসতে বলবে, "আমি ভাল হয়ে গেছি। আমি চললুম শহরে।" তখন শত চেষ্টা করেও যে কেউ বাবাকে রুখতে পারবে না!

এই ভয়েই বোবা হয়ে ছিলুম সারাদিন। ভীষণ কষ্টে মনটা আমার বারবার শিউরে উঠছিল, তবু কাউকে বলতে পারছি না আমার মনের কথা। শেষে, কিছুতেই থাকতে না পেরে আমি ছুটে গেছি পাশার কাছে। বসে ছিল পাশা। ওর পিঠের ওপর লুটিয়ে পড়লুম। আমার দু হাত দিয়ে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরলুম। তারপর জিজ্ঞেস করলুম, "পারবি না পাশা, পারবি না আমায় শহরে নিয়ে যেতে? পারবি না ওই পালকের বোঝা শহরে পৌঁছে দিতে?"

পাশা আমার কথা শুনল। কী বুঝল জানি না। ঘাড় হেলিয়ে আমার দিকে চাইল। তারপর ভীষণ জোরে মাথাটা নাড়তে-নাড়তে আমাকে পিঠে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর হাঁটা দিল। কঁপা দূরে খেজুর গাছটার সামনে দাঁড়িয়ে সে মুখ বাড়াল। এক থোকা পাকা খেজুর মুখে ছিঁড়ে এনে আমার দিকে ঘাড় ফেরাল। যেন সে বলতে চাইল, "খাও!" আমি আনন্দে চিৎকার করে লুফে নিলুম সে খেজুর। মুখে দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে পাশা হাঁটল। ফিরল সে ঘরের দিকে। আমার মায়ের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল পাশা। মা জিজ্ঞেস করলে, "কী রে?"

বসে পড়ল পাশা। পাশার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে মায়ের কাছে ছুটে গেলুম। মাকে জড়িয়ে ধরলুম। মায়ের গলার চাদরে আমার মুখখানা হারিয়ে গেল।

মা অবাক হল। মা আমার মুখখানা চাদরের আড়াল থেকে সরিয়ে এনে জিজ্ঞেস করলে, "কী বলছিস?"

আমি বললুম, "মা, তুমি তো বলেছ আমি এখন বড় হয়ে গেছি!"

মা বললে, "হ্যাঁ, তুমি তো আমার সেই সেদিনের ছোট্ট আবু। এখন কত বড়!"

"তুমি তো জানো মা, এখন আমি তীর ছুঁড়তে পারি। তরোয়াল ঘোরাতে পারি।"

"হ্যাঁ। আবু যে আমার বীর ছেলে।"

"তুমি তো দেখেছ মা, একটু-একটু করে এখন কত দূর অবধি পাশার পিঠে চেপে আমি বালির ওপর হাঁটতে পারি!"

মা বললে, "এরপর আবু আমার বালি পেরিয়ে শহরে যাবে। শহরে গিয়ে আমার জন্যে রেশমি সুতোর কামিজ আনবে।"

আমি লাফিয়ে উঠলুম। মায়ের হাত দুটি আরও জোরে চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলুম, "আনব, আনব মা, তুমি যা চাইবে তাই-ই আনব। তবে মা শহরে আমায় এখনই যেতে দাও," বলে মাকে আবদার করে জড়িয়ে ধরলুম।

মা চমকে উঠল। আমায় আরও কাছে টেনে নিয়ে বললে, "এ কী সব্বনেশে কথা!" ভয়ে মায়ের গলা কেঁপে উঠল।

আমি বললুম, "না মা, সব্বনাশ নয়! বাবার অসুখ। তুমি বলো বাবার কি এখন ওই বালি ভেঙে শহরে যাওয়া ঠিক হবে। আমি যাব। আমি পারব। আমি ওই উটপাখির পালক শহরে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

আমার কথা শুনে মায়ের বুকটা কেঁপে উঠছিল কি না আমি জানি না। কিন্তু মায়ের হাত দুটি আমার মাথা ছুঁয়ে অস্থির হয়ে শিউরে উঠছিল। মা কেমন অদ্ভুত চোখে চাইল আমার মুখের দিকে। তারপর মায়ের চোখ দুটি নিমেষে সামনের ওই খেজুর গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে, দূরে ওই সোনা-রঙ বালির রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ল। মা কথা বলল না।

আমি মায়ের চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে খুব নরম সুরে জিজ্ঞেস করেছিলুম, "যাব না মা?"

মা আমায় টেনে নিয়েছিল তার কাছে, আরও কাছে। তার-পর অস্ফুট স্বরে বলেছিল, "যাবি।"

ইচ্ছে হল আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠি। কিন্তু পারিনি। হঠাৎ আমার নজর পড়ল মায়ের চোখ দুটি যেন ছল-ছলিয়ে উঠেছে। চোখ দুটিকে লুকিয়ে নিয়ে মা ছুটে গেছল বাবার কাছে। আমি অবাক হয়ে গেলুম! ভাবলুম, মা আমার কাঁদছে কেন। মা কি আমার কথায় দুঃখ পেল!

না, হয়তো ছেলের কথা শুনে মায়ের বুকখানা গর্বে ভরে উঠেছিল। হয়তো মা ভেবেছিল, যাদের এমন ছেলে ঘর আলো করে, তাদের বুঝি দুঃখ থাকে না কোনোদিন।

আমি তো জানি, মা আমার কথা বাবাকে বলবে। বাবা শুনলে, যদি রাজি না হয়! এই কথা ভাবতে-ভাবতে সারাদিন আমি ছটফট করেছি। সারাদিন আমার চোখ দুটি মায়ের পিছু-পিছু এ-ঘর ও-ঘর করেছে। আমি ভেবেছি কখন মা আমার কথা বাবাকে বলবে! কখন?

বলেছিল মা। বলেছিল, যখন দিনের আলো ছিল না। রাতের অন্ধকারটা তখন নিঃসাড়ে গুটি-গুটি নেমে এসেছিল। নেমে এসেছিল ওই বালির ওপর, ওই খেজুর গাছের ছায়ায়, আমাদের এই ছোট্ট ঘরে। রাত কত গভীর আমি জানি না। শুধু জানি, চোখে আমার ঘুম আজ আর ছুঁই-ছুঁই করছে না। এই যে ঘরের ভেতর ছোট্ট ঘরটা দেখছ, এটা আমার। ঘরের দেওয়ালে ওই যে আঁকাবাঁকা লাইনটানা ছবিটা দেখছ, ওটা আমি এঁকেছি। ছবির আকাশে এক ফালি চাঁদ। কটা তারা। নীচে বালির পাহাড়। এক পাশে তাঁবু। পাশে দুটো উট। ছবিটা কবে এঁকেছি, একটুও আবছা হয়ে যায়নি। তবে, আমার আঁকা এই ছবিটা দেখলে যে তোমরা না-হেসে থাকতে পারবে না, তা আমি জানি। কিন্তু জানো, এখন, এই রাত্রে চুপটি করে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওই ছবিটাই আমার দেখতে এত ভাল লাগছিল। দেখতে-দেখতে আমার মনে হচ্ছিল, সত্যি যেন ওই ছবির চাঁদ আলোয় ভরিয়ে দিয়েছে আমার এই ছোট্ট ঘরখানা। মনে হচ্ছিল, ওই ছবির তারারা বুঝি এমন স্পষ্ট হয়ে কোনোদিনই ঝলমলিয়ে ওঠেনি এই ছবির দেওয়ালে। ভাল লাগছে, হয়তো এই কারণে যে, আজ আমি বলতে পেরেছি, বাবার কাজ আমি মাথা পেতে নিতে পারি। বাবার বয়েস বাড়ছে, এবার বাবা আয়েস করুক। আমি ছেলে। ছেলে যদি বাপ-মাকে না দেখে, কে দেখবে?

কিন্তু জানো, এই মুহূর্তে আমার সমস্ত স্বপ্ন যেন এক ঝটকায় ভেঙে গুঁড়িয়ে তছনছ করে দিল কে! সে-কথা বলতে আমার বুকের পাঁজরগুলো দুমড়ে-মুচড়ে উঠছে, সে-কথা আমি তোমাদের কেমন করে বলি! শোনো না, ওই তো বাবাকে আমার কথা বলছে মা। শুনতে পাচ্ছ আমার মায়ের গলা? আমি পাচ্ছি। শোনো শোনো, ওই তো মা বলছে, "আবু বলছে তোমার অসুখ। এই জ্বর নিয়ে শহরে যাওয়া তোমার ঠিক হবে না। কাজটা যখন খুব দরকারি, উটপাখির পালকগুলো যখন তাড়াতাড়ি পৌঁছে না-দিলেই নয়, ও বলছিল, তুমি যদি বলো, তবে আবুও পারবে তোমার এই কাজটা করে দিতে।"

মায়ের মুখে ওই কথা শুনে বাবা থমকে গেছল কিনা জানি না। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্যে সারা ঘরখানা কেমন যেন থমথম করে কাঁপছিল। প্রচণ্ড উত্তেজনায় আমি কান পেতে আছি। কিন্তু কথা নেই, কিছু নেই। তবে কি বাবা এ-কথার কোন উত্তর দেবে না? নাকি এ-কথা শুনে বাবার শরীর আরও মুষড়ে পড়ল।

না, বাবা কথা বলেছিল। হঠাৎ নিস্তব্ধ ঘরে বাবার গলা কেঁপে উঠেছিল। কাঁপতে-কাঁপতে সেই স্বর মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "তুমি কী বলছ? এ যে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার আবু তোমাকে এ-কথা বলেছে! গর্বে যে আমার বুকখানা ফুলে উঠছে। আমার যে চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি আমার আবুকে আমার মতো করে গড়ে তুলতে পেরেছি। হ্যাঁ, আবু আমারই ছেলে।" বলে বাবা থামল। একটুখানি চুপ। তারপর বাবার গলার স্বর যেন অনেক, অ-নে-ক দিন আগের কোনো এক হারানো দিনে ফিরে গেছে। বাবা জিজ্ঞেস করলে মাকে, "তোমার সেদিনের কথা মনে আছে?"

মা বললে, "সে-কথা কি ভোলার কথা। আমার বোনের বিয়েতে তুমি আর আমি গেছি শহরে, আমাদের বাড়িতে। বিয়ের পর ফিরে আসছি। তখনও মাঝ-বরাবর পথে আমরা। রোদ ঝাঁ-ঝাঁ দুপুর। বালির ওপর বালি। হাওয়া নেই। শুধু গরম হলকা বইছে মরুর ওপর দিয়ে। মাথার পাগড়িটা খুলে ফেলে তুমি মুখে-চোখে জড়িয়ে ফেলেছ। আমি তোমার পেছনে পাশার পিঠে বসে আছি। তোমার পিঠের ছায়ায় আমার মুখখানা আড়াল করেছি। আড়াল থেকে দেখছি, আর কত দূর? কোথায় গেলে একটু জল পাব! আর যে পারছি না!"

মায়ের মুখের কথা যেন কেড়ে নিয়ে বাবা বলে উঠল, "হ্যাঁ, এমন সময়, ঠিক এমনি সময়ে শুনতে পেলুম কান্না।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, কান্না! কে যেন কাঁদছে!" মা বলে উঠল।

বাবা বললে, "এ যে নিতান্ত নরম কচি একটি শিশুর কান্না! আমি নিমেষে পাশার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়লুম। লাফিয়ে ছুটলুম। বালির ওপর ছুটতে-ছুটতে কখনও আমি হুমড়ি খাই। কখনও আমি থমকে দাঁড়াই। চিৎকার করি, কে কাঁদে? কার ছেলে কাঁদে? কাউকে দেখতে পেলুম না। তারপর হঠাৎ আমার নজরে পড়ল, সামনে রক্ত-মাখা একটা তরোয়াল! তারপর দেখলুম বালির ওপর এদিক-ওদিক ছড়ানো-ছেটানো জুতো, জামা, পাগড়ি! তারই পাশে ওই তো শুয়ে-শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদছে একটি শিশু! একেবারে এইটুকু। আমি ছুটে গিয়ে তাকে বুকে তুলে নিলুম। তপ্ত বালির ঝাপটা লেগে তার মোমের মতো নরম গায়ে ফোসকা পড়ে গেছে। আমি ছুটে এসে তোমার কোলে তাকে তুলে দিলুম।"

বলতে-বলতে বাবা থামল। বাবার কথার রেশ টেনে মা এবার বললে, "হ্যাঁ, তাকে আমি বুকে তুলে নিলুম। আহা রে। তার সারা গায়ে চোখে-মুখে বালি। চোখ দুটি চাইতে তার যেন কত কষ্ট হচ্ছে! যেন এতক্ষণ বালিতে ডুবে-ডুবে সে হাবুডুবু খাচ্ছিল। আমি আমার ওড়না দিয়ে ভারী আলতো করে ওকে জড়িয়ে নিলুম। তখনও কাঁদছে! তুমি ছুটলে ওর মাকে খুঁজতে!"

বাবার গলায় এবার ক্লান্ত স্বর। বাবা বললে, "ওর মাকে আমি খুঁজলুম। সেই শূন্য মরুভূমির এ-প্রান্ত ও-প্রান্তে আমি দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটেছি। ওর মাকে আমি দেখতে পাইনি। দেখতে পেয়েছিলুম সেই রক্তমাখা তরোয়ালটা। তুলে এনেছিলুম সেটা। ভারী ক্লান্ত তখন আমি। তোমার কাছে যখন ফিরে এসেছিলুম, তখন তোমার কোলে ও ঘুমিয়ে পড়েছে। যেন সূর্যের আলোয় নিস্তেজ একটি ফুলের মতো তার মুখখানি। আঃ! তোমার কোলে যেন ছড়িয়ে আছে সেই ফুলের রঙ-ছোঁয়া পাপড়িগুলি। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'এখন কী করবে?' তুমি বলেছিলে, 'এখানে তো করার কিছু নেই। এ যে নির্জন মরুভূমি। চলো ফিরে যাই।' আমরা ফিরে এসেছিলুম। কিন্তু কেউ ফিরিয়ে নিতে এল না আমাদের কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেকে। তাকে আমরা বুকে নিয়ে বড় করেছি। তাকে রোদের সঙ্গে রোদ হয়ে, বালির সঙ্গে বালি হয়ে লড়াই করতে শিখিয়েছি। দেহটাকে তার লোহার মতো শক্ত করেছি। তাকে শিখিয়েছি কেমন করে ভালবাসতে হয় বন্ধুকে। কেমন করে রুখে দাঁড়াতে হয় শত্রুর বিরুদ্ধে।"

আমি শুনতে পেলুম মা কাঁদছে। কান্নার ফোঁটাগুলি মায়ের কথা হয়ে যেন বেজে-বেজে ঝরে পড়ছে। মা বলছে, "তাই সে আজ শিখেছে কেমন করে মা-বাবার দুঃখ ঘোচাতে হয়। তাই বুঝি তোমার দুঃখ ঘোচাতে সে এগিয়ে এসেছে তোমার কাজের বোঝা কাঁধে নিতে!"

বাবা বুঝি আর থাকতে পারল না। আমি শুনতে পেলুম, বাবা চিৎকার করে উঠেছে, "শাবাশ! শাবাশ আবু! এই তো

চাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবু যাবে। উটপাখির পালক নিয়ে ও শহরে যাবে। আমি জানি ও পারবে! আমার ছেলে কখনও হারবে না। হারতে পারে না।" বলেই বাবা, ভীষণ জোরে হাঁক দিল, "আবু-উ-উ!"

আমি চমকে উঠলুম। এতক্ষণ মা আর বাবার কথা শুনতে শুনতে আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলুম। বাবার ডাক শুনে সামলে নিলুম নিজেকে। তাড়াতাড়ি দরজা পেরিয়ে বাবার ঘরে ঢুকলুম। বাবার মুখের দিকে চেয়ে দেখি, চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। আমি শান্ত হয়ে দাঁড়ালুম বাবার সামনে। অনেক কষ্টে নিজের চোখের জল সামলে নিলুম। কিন্তু কথা বলতে গিয়ে গলা আমার কথা বলতে পারে না। ধরা গলায় আলতো স্বরে জিজ্ঞেস করলুম, "ডাকলে বাবা?"

বাবা বিছানায় শুয়ে-শুয়েই হাত দুটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। বললে, "হ্যাঁ, আমার কাছে আয়!"

আমি এগিয়ে গেলুম।

বাবা জড়িয়ে ধরল আমায়। জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। কাঁদতে-কাঁদতে বলল, "তুই আমার সাত রাজার ধন এক মানিক। তুই আমার ছেলের মতো ছেলে।"

আমিও বাবার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ডুকরে-ডুকরে কেঁদে উঠলুম। কোনো কথাই বলতে পারলুম না।

তুমি শুনলে হয়তো অবাকই হবে, আমার জীবনে আমি আজই প্রথম বাবাকে কাঁদতে দেখলুম। আর সে-কান্না দেখে আমারও যে বুকের কান্না চোখের জলে আজই প্রথম উপচে পড়েছিল।

আজ আমি সারারাত ঘুমোইনি। ঘুমোতে পারিনি। তুমি কি বিশ্বাস করবে, আজ সারা রাত আমি কেঁদেছি একা-একা। কাঁদব না? এতদিন আমি যাদের মা আর বাবা বলে জেনেছি, তাদের যে আমি কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে! আমি এদের পর। এদের দয়ায় আমি বেঁচেছি। তাহলে কে আমার সত্যিকারের বাবা? কে আমার মা? এই কথা ভাবতে-ভাবতে আমি ছটফট করেছি আর ভেবেছি সেদিন যারা এই বালির সমুদ্রে আমায় ফেলে গেছল, তারাই বুঝি আমার মা? আমার বাবা?

শুনতে পাচ্ছ, আর কোনো শব্দ? না, এখন রাত গভীর। ছেলে তার বাপের বোঝা কাঁধে নিতে চেয়েছে, এ ভেবে বাবা ভারী শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে! না, এখন বুঝি আর কোনো ভাবনা নেই তার। তাই কষ্টও নেই। আমি একা। একা আমি অন্ধকারে। অন্ধকারের সঙ্গেই এখন আমি লড়াই করছি। কেন না, এই অন্ধকারেই যে আমি হারিয়ে গেছি। হারিয়ে গিয়ে ভাবছি শুধু আমি কে? কে আমি? কে উত্তর দেবে? এই বোবা অন্ধকারটা?

ঘুম না পেলে রাত তো আর তোমার জন্যে ঘুমের কাজল হাতে নিয়ে বসে থাকবে না। সে সময় হলেই পগার পার। তার পেছনে ছুটতে-ছুটতে ভোরের আলো যখন পেঁছে যাবে মাটিতে, তখন কোথায় ঘুম আর কোথায় রাত!

চোখে ঘুম ছিল না বলেই আজ খুব সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলুম। খুব সকালে বাবার ঘরে উঁকি মেরে দেখেছিলুম, তখনও ঘুমুচ্ছে বাবা। ঘুমোক। মা তো অনেক আগেই উঠেছে। মায়ের মুখখানা ঘুমের আমেজে তখনও ফুলে আছে। কে জানে কেন, মাকে দেখে আজ আমি খুশিতে হাসতে পারলুম না। আমি বুঝি হারিয়ে ফেলেছি আমার হাসি, আমার কথা, আমার আনন্দ! আমি কি বোবা হয়ে গেলুম?

মায়ের চোখকে আমি ফাঁকি দিতে পারিনি। হয়তো আমার মুখে হাসি না দেখেই মা আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিল, "আবু, মন খারাপ করছে?"

আমি বললুম, "মন? কেন খারাপ করবে?"

মা বললে, "তবে কথা বলছিস না?"

আমি ও-কথায় আর কথা না বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "বাবা কেমন আছে মা?"

"ঘুমোচ্ছে।"

"আমি তবে শহরে যাবার জন্যে তৈরি হই মা?"

মা কথা বলল না। ঘাড় নাড়ল।

আমি সেজে নিলুম। আমার সাদা পায়জামার ওপর সেই নীল ডোরা-কাটা জামাটা গায়ে দিতে-দিতে আমি ভাবছিলুম কবে থেকে ভেবে রেখেছি, যেদিন প্রথম মরুতে পাড়ি দেব, সেই-দিন এই জামাটা পরব। আজ সেইদিন এসেছে। নীল পাগড়িটা এখন মাথায় দিয়েছি বটে, কিন্তু খানিক পরে সে কি আর মাথায় থাকবে। নাকে, মুখে নেমে আসবে। উটপাখির পালক-গুলো দুটো টুকরিতে সাজিয়ে, আলতো করে বেঁধে পাশার পিঠের দু পাশ দিয়ে ঝুলিয়ে দিলুম। তারপর খেতে দিলুম পাশাকে, খানিকটা শুকনো কাঁটা ঘাস। অনেকটা খেজুর পাতা। আর বেশ খানিকটা জল। কারণ কদিন উপোস করে থাকতে হবে কে জানে! তোমরা শুনলে অবাক হবে, পাশা দিনের পর দিন না খেয়েও থাকতে পারে! পিঠের ওপর ওই যে কুঁজটা দেখছ দ্যাখো এখন কত মোটাসোটা! চর্বিতে ভর্তি। মরুভূমির গভীরে চলে গেলে, কদিন পরে দেখবে কুঁজটা শুকিয়ে একেবারে চিপসে গেছে। কেন বলো তো? কুঁজের ভেতর যে পাশা খাবার ভরে রাখে। বিশ্বাস হচ্ছে না তো? তা হলে বলছি শোনো। পাশা খাবার খায় তো মুখ দিয়ে। যতই খায় ততই চর্বি জমে ওই কুঁজের মধ্যে। তারপর যখন খাবার জোটে না, জল পায় না, যেখানে কিচ্ছু নেই সেখানে কী হবে? তখন ওই কুঁজের চর্বি গলে গলে পেটের খিদে মেটায়, তেষ্টা মেটায়। কী মজা বলো তো?

হ্যাঁ, একথা শুনতে তোমাদের মজাই লাগবে। কিন্তু আমার? অন্যদিন এই সকালে এই বাড়ি আমার। একেবারে আমার। আমায় রাজত্ব। এখানে আমি হাসব, খুশিতে নাচব। নয়তো খেলব, গান গাইব। কিছু না পারি, মায়ের গলা জড়িয়ে দোল খাব।

কিন্তু আজ? দেখবে এসো না একবার আমাকে? আমি আজ অন্য মানুষ। একেবারে অন্য। এ-মানুষটার কে জানে কী পরিচয়। আজ আমি শীতের রাতের মতো কুঁচকে গেছি। কেন? ভয়ে? না, আমি বলতে পারছি না। আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না, যাদের আমি এতদিন মা আর বাবা বলে জেনেছি তারা আমার কেউ না, কেউ না!

"আবু-উ-উ!" বাবার ঘুম ভেঙেছে। ডাকল আমায়। এমনিতেই বাবার গলাটা খুব গভীর। তার মানে এই নয় সেই গলার আওয়াজ শুনলে তুমি ভয় পাবে। ভারী আদর-মাখানো সেই ডাক। ওই ডাক শুনলে আমার মতো তুমিও হয়তো ভাববে, তোমার খুব কাছের মানুষ, এক আপনজন ডাকছে। সে-ডাকে সাড়া না দিয়ে তুমি থাকতে পারবে না। সেই ডাক শুনে তুমি নিশ্চয়ই ছুটবে। ছুটতে ছুটতে সাড়া দেবে, "যাই-ই-ই।"

আমিও তাই করি।

কিন্তু আজ? না পারলুম না ছুটতে। আমার পা দুটি আজ আনন্দে লাফিয়ে উঠল না। ধীরে-ধীরে বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। বাবা বিছানায় বসে আছে। বাবার মুখের দিকে তাকালুম। বাবার ঠোঁট দুটিতে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। আজ বোধ হয় বাবা ভাল আছে। কিন্তু মুখখানি বড্ড শুকিয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলুম, "ভাল আছ বাবা?"

বাবা হেসে উঠল হো-হো করে। হাসতে হাসতে বলল, "হ্যাঁ, ভাল আছি, খুউব ভাল!"

আমি আবার তেমনি শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলুম, "আমায়

ডাকলে, কিছু বলবে?"

"হ্যাঁ বলব।" বলে বাবা একটু চুপ করে রইল। যেন কিছু ভাবল। তারপর ভাবনায় ডুবে থাকা চোখ দুটি আমার দিকে ফিরিয়ে বললে, "আবু, তোমার মতো বয়সে আমিও আমার বাবার কাজ মাথায় নিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিলুম। আমার বাবা আমায় শিখিয়েছিল কেমন করে বিপদ মাথায় নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। আজ আমিও তোমায় সেই কথাই বলতে ডেকেছি আবু।"

"আমি তোমার কথা শুনব বাবা।" খুব আলতো গলায় উত্তর দিলুম আমি।

বাবার মুখখানি খুশিতে উছলে পড়ল। বলল, "তা আমি জানি।" বলে আমায় কাছে ডাকল বাবা। আমার পিঠে হাত রাখল। তারপর আবার বলল, "আমি আর তোমার মা তোমাকে বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছি। আমাদের কষ্টের দিন এসেছে, তোমাকে সে কষ্ট ছুঁতে দিইনি। আমাদের দুঃখ এসেছে, সে-দুঃখ তোমাকে বুঝতে দিইনি। তোমাকে আমরা সব সাধ্য দিয়ে গড়ে তুলেছি আবু।"

আমি তেমনি নরম সুরে জিজ্ঞেস করলুম, "কেন একথা বলছ বাবা, আমি কি তোমাদের কোনোদিন দুঃখ দিয়েছি?"

হঠাৎ মায়ের মুখখানি আমি দেখে ফেলেছি। ছলছল করছে। চোখের কান্না সামলে নিয়ে মা বললে, "না বাবা, দুঃখ কেন দেবে! যে-ছেলে দুঃখ দেয়, তুমি তো সে-ছেলে নও।"

বাবা আবার বললে, "তুমি তো জানো আবু এই মরুর সঙ্গে যুদ্ধ করে আমাদের বেঁচে থাকতে হয়। মরুর তপ্ত আগুনে আমরা ছুটি, কখনও বসি, কখনও ঘুমোই। এর নিশ্বাসে নিশ্বাসে বিপদ। আজ প্রথম মরুর বুকে তুমি পাড়ি দিচ্ছ। ভয় পেও না বাবা। বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে তার সামনে। যে বীর তাকে দেখলে শয়তানেরও যে বুক কাঁপে!"

আমি বললুম, "বাবা, তুমি আমাকে তোমার বীর ছেলের মতো গড়েছ। তুমি আমাকে সাহসী হতে শিখিয়েছ। অন্যায়ের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে শিখিয়েছ। যতই বিপদ আসুক, সে-বিপদ আমি জয় করবই। যত কষ্টই আসুক আমি বুক পেতে দেব।"

বাবা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, "শাবাশ! শাবাশ!"

আমি বললুম, "এবার বিদায় নিই বাবা।"

বাবা বললে, "আবু, যাবার আগে তোমাকে আমার কুড়িয়ে পাওয়া একটি অস্ত্র দিয়ে সাজিয়ে দেব।" বলে বাবা মাকে বললে, "সিন্দুক থেকে সেই তরোয়ালটা এনে দাও তো আমায়!"

আমি বুঝতে পেরেছি, এই সেই তরোয়াল। সেই রক্তমাখা তরোয়াল। সেই যেদিন আমায় কুড়িয়ে পেল বাবা, সেইদিনই তো এই তরোয়ালটাও কুড়িয়ে আনে। অবিশ্যি এখনও কি আর রক্ত লেগে আছে! না, না।

মা তরোয়ালটা বার করে নিয়ে এল। খাপে ঢাকা। বাবা তরোয়ালটা হাতে নিয়ে, খাপ থেকে সেটা বার করতেই আমার চোখ ঝলসে গেল। তরোয়ালের ঝকমকি জৌলুস ঠিকরে পড়ছে চারদিকে।

বাবা তরোয়ালটা হাতে নিয়েই বললে, "আবু, তুমি যখন খুব ছোট, তখন এই তরোয়ালটা আমি কুড়িয়ে পাই। এতদিন যত্ন করে তুলে রেখেছিলুম। মনে মনে ভেবে রেখেছিলুম, যেদিন তুমি বড় হবে, যেদিন তুমি একা একা ওই মরুর পথে পাড়ি দেবে, সেদিন তোমার হাতে তুলে দেব এই তরোয়াল। আজ আমার সেই স্বপ্নের দিন এসেছে, আবু। নাও।"

আমি বাবার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দু হাত তুলে সেই তরোয়াল হাতে নিয়ে মাথা হেঁট করলুম। বললুম, "এবার তবে যাই বাবা?"

বাবা আমার চিবুকে হাত দিল। আমার কপালে চুমু খেয়ে বললে, "এসো।"

আমি মায়ের কাছে গেলুম। মায়ের বুকের ওপর মাথা রেখে এবার আমি কেঁদে ফেললুম। কাঁদতে-কাঁদতে বলে ফেললুম, "মা, বিদায়!"

মা আমার মুখখানি নিজের মুখের কাছে টেনে নিয়ে বললে, "বিদায়।" বলে মাও আমার কপালে চুমু খেলে। তার-পর কেঁদে ফেললে।

আমি তরোয়ালটা খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে, কোমরে বেঁধে, অনেকটা কাঁদতে-কাঁদতে, খানিকটা ভাবতে-ভাবতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম। তারপর পাশার পিঠে চেপে কোন না-দেখা জগতের দিকে এগিয়ে চললুম।

তুমি হয়তো ভাবছ, আমি বুঝি একাই চলেছি। বুঝি একাই পাশাকে নিয়ে মরুতে পাড়ি দেব! না, না, তা কেন হবে। আরও অন্তত তিরিশটা উটের পিঠে মাল বোঝাই করে, আরও তিরিশ জন চলেছে শহরে। চলেছে মাল কেনাবেচা করতে। এমনি করে দল বেঁধেই তো যেতে হয়। এমনি করে দল বেঁধে যেতে যেতে মরুর ওপর কেটে-যায় দিনের পর দিন। দল বেঁধে না গেলে, কে বলতে পারে কার কখন কী বিপদ আসে। ওই শোনো উটের গলায় ঘণ্টা বাজছে, টিং-লিং, টিং-লিং! সার বেঁধেছে ওরা। সারে-সারে আকাশে ঘাড় উঁচিয়ে, পা ফেলছে। দেখলে তুমি চোখ ফেরাতে পারবে না। এত ভাল লাগবে! মনে হবে উটের পিঠে চেপে তুমিও মরুতে পাড়ি দাও!

আমি চলেছি। আমি এখনও দেখতে পাচ্ছি, মা আমার অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে আমার দিকে চোখ মেলে। দেখতে পাচ্ছি, বাবাও বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে। একটি হাত ওপরে তুলে বাবা আমায় বিদায় জানাচ্ছে। আমি এতদূরে চলে এসেছি যে, ঠিক দেখতে পাচ্ছি না, যে-হাতটি তুলে আমায় বিদায় জানাচ্ছে, সে-হাতটি বাবার কাঁপছে কি না। তবু যতক্ষণ পারলুম, আমিও হাত তুলে রইলুম। তারপর দুজনেরই চোখের দৃষ্টি থেকে দুটি হাত হারিয়ে গেল। আমার চোখের ওপর ভেসে উঠল বালি আর বালি। আমাদের মাথার ওপর খোলা আকাশ, নীল। আগুনের গোলার মতো সূর্যের তেজ। এই সময় তুমি এখানে থাকলে তোমার মন বলত, আকাশটা যদি শুধুই আকাশ হত! আকাশের গায়ে যদি ওই জ্বলন্ত সূর্যটা না থাকত!

কতদূর চলে এসেছি! ক-ত দূর! পাশার পিঠে দুলতে-দুলতে কাল রাতের না-ছোঁয়া ঘুমটা এখন বার-বার আমার চোখে নেমে আসছে। পারছে না। কেন না, যতবারই সে আমার চোখের পাতায় বসি-বসি করছে, ততবারই যেন আমার বুকটা চমকে-চমকে উঠছে। মন বলছে, কেমন করে মনে করি, এই পৃথিবীতে আমার কেউ নেই!

আমরা বোধহয় কয়েক ঘণ্টা হেঁটেছি। আকাশের সূর্য এখন ঠিক আমাদের মাথার ওপর। ওই দ্যাখো, দূরে দেখা যাচ্ছে মরূদ্যান! ওখানে ইঁদারা আছে। ওখানে আমরা থামব। যার সঙ্গে তাঁবু আছে, সে তাঁবু খাটাবে। ইঁদারার জল চোখে-মুখে দিয়ে কিছু খেয়ে নেব আমরা। মা আমার জন্যে কত খাবার যে দিয়েছে, একা খেয়ে শেষ করতে পারব না। খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম নেব। তারপর সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে মাথা হেলাবে, আমরা আবার চলব।

এমনি চলতে চলতে দুদিন কেটে গেল আমাদের। দুদিনে আমরা কতখানি পথ চলে এসেছি। কত অজানা মানুষের সঙ্গে আমার কত পরিচয় হল। ওরা গল্প বলে। কত না-জানা কথা শোনায়। কত নিশ্চিন্ত আমি। ভাবলুম বুঝি এমনি করেই পৌঁছে যাব শহরে।

কিন্তু হল না। তিনদিনের দিন পথ হাঁটলুম আবার আমরা। শুরুতে কি জানতাম এক ভয়ংকর বিপদ আমাদের মাথার ওপর ওত পেতে আছে। আমরা অনেকটা এসেছি। এতক্ষণ পর্যন্ত দেখেছি ঝরঝরে আকাশ। হঠাৎ দেখি কোথাও কিছু নেই, আকাশ মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে। উটের পিঠের মানুষরা আতঙ্কে চুপসে গেল! ওরা চেঁচিয়ে উঠল, "থামো, থামো, ঝড় উঠবে!"

সে চিৎকার শুনে ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল আমার। ঝড় উঠবে! কী হবে তা হলে! তোমরা তো জানো না মরুর বুকে ঝড় ওঠা মানে সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার! আমাদের মাথার ওপর ঝড়ের মেঘ! এখন মরুভূমির এই শূন্য ভূমিতে কোথাও আশ্রয় নেই যে সেখানে ছুটে যাবে।

হ্যাঁ, সত্যি-সত্যি ঝড় উঠল। ওই দ্যাখো রাশি-রাশি অসহ্য গরম বালি ঝড়ের ঝাপটায় উড়ে আসছে! নিমেষের মধ্যে বেগুনি নীল অন্ধকারে ঢেকে গেল সারা দিগন্ত। মনে হচ্ছে, ওই রাশি-রাশি বালি যেন এক-একটা আগুনের ফুলকি! ঝাঁকে-ঝাঁকে গায়ে-মুখে ছিটকে আসছে। ওঃ! জ্বলে যাচ্ছে শরীর! যন্ত্রণায় ছটফট করতে-করতে আর সবার মতো আমিও সারা মুখ ঢেকে ফেললুম! তপ্ত হাওয়ায় যেন ফুটন্ত লোহার ছোঁয়া! কোথায় পালাব! একটু যদি আশ্রয় পাই! আশ্রয় কোথা এখানে! আমি লাফিয়ে পড়লুম পাশার পিঠ থেকে। নিজেকে ওই ঝড়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে বালির ওপরই মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লুম। তবু নিস্তার নেই। চেয়ে দেখি, ভয়ে কুঁচকে সবাই শুয়ে পড়েছে ওই বালির ওপর। যত মানুষ, যত উট, সব। আমার মতো সবাই কাতরাচ্ছে বালির ওপর। হঠাৎ ঝড়ের প্রচণ্ড শোঁ-শোঁ শব্দ! আচমকা চোখ মেলে চেয়ে দেখি, বালির এক বিরাট জাল যেন শূন্যে উড়তে-উড়তে আসছে! আমি চিৎকার করে উঠলুম! আমি দেখতে পাচ্ছি ওই জাল কাঁপতে-কাঁপতে ধেয়ে আসছে আমার দিকে! আমি ঝড়ের সঙ্গে ঝড় হয়ে ছোটা দিলুম! কোনদিকে ছুটব! আর কেমন করেই বা ছুটব! পা যেন ছুটতে পারছে না! আমার সমস্ত শক্তি ওই আগুনের তেজে যেন নিস্তেজ হয়ে গেছে! তবু সব শক্তি দিয়ে পালাচ্ছি আমি। কিন্তু না। পারলুম না আমি। চক্ষের নিমেষে ওই বালির জাল আমার ঘাড়ের ওপর ছিটকে পড়ল। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠতে গেলুম, "বাঁচাও, বাঁচাও।" কিন্তু স্বর বেরুল না আমার। আমি বালির মধ্যে চাপা পড়ে গেলুম। মনে হল, কে যেন আমায় আগুনের গহ্বরে ঠেলে ফেলে দিলে। আমি তারপরে আর জানতেও পারলুম না, সেই গহ্বরে তখনও আমি বেঁচে আছি কি না! কেননা, আমি বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি!

অনেকক্ষণ পর, কতক্ষণ পর বলতে পারি না, আমার নিজেরই নিশ্বাসের শব্দটা আমার কানে ভেসে এসেছিল। আমি তখনও বুঝতে পারিনি, আমি বালির নীচে মুখ থুবড়ে পড়ে আছি। আমার সারা দেহ বালির নীচে চাপা পড়েছে। রক্ষে এই, মুখখানা কেমন করে যেন বেঁচে গেছে! যদি মুখখানাও বালিতে চাপা পড়ত, তখন আমিও শেষ হয়ে যেতুম! তখন এই গল্প কি আর তোমাদের বলতে পারতুম আমি! মরুর শেয়াল হয়তো বালি খুঁড়ে বেরিয়ে এসে আমার দেহটা নিয়ে ভোজ বসাত!

আমি বাঁচলুম। অনেক কষ্টে ওই বালির গহ্বর থেকে বেরিয়ে এলুম। কিন্তু আমার চোখে যে সব ঝাপসা ঠেকছে! এখনও হামাগুড়ি দিচ্ছি। দাঁড়াতে পারব কি না বুঝতে পারছি না। নিশ্বাস নিতে ভারী কষ্ট হচ্ছে আমার। দম আটকে আসছে। বালির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে, ওই বালির ওপরই আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে পারতুম যদি!

হঠাৎ আমার খেয়াল হল, আরে! দলের আর কারও গলা শুনছি না কেন! তাই তো! এত নিস্তব্ধ কেন চারদিক! ওই

তো ঝড় থেমেছে! ওই তো আবার রোদ উঠেছে! তবে কি সবাই আমার মতো বালির ভেতর চাপা পড়েছে!

আতঙ্কে শিউরে উঠলুম আমি। আমার শোয়া আর হল না। তাড়াতাড়ি উঠে বসলুম। ঝাপসা চোখেই চেয়ে দেখলুম এদিক-ওদিক, চারদিক। কই, কেউ তো নেই! দেখি চারদিকে শুধু উঁচু-উঁচু বালির পাহাড় খাড়া হয়ে আছে। এতক্ষণ যে জায়গাটা খোলামেলা ছিল এখন সেখানে শুধু বালির পাহাড়। কী শক্তি ওই মরুর ঝঞ্ঝার! চক্ষের নিমেষে স্তূপ-স্তূপ বালি উড়িয়ে এনে পাহাড় তৈরি করে ফেলেছে! কিন্তু পাশা! পাশা কোথা? দেখতে পাচ্ছি না তো! যেন বিদ্যুৎ চমকে গেল আমার শরীরে। আমি প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি! খুব জোরে চিৎকার করে হাঁক পাড়লুম, "পাশা-আ-আ!"

কোনো সাড়া নেই। শুনতে পেলুম না আমি পাশার গলার সেই ঘণ্টার চেনা শব্দ! কী ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি! বুকের ভেতর ঢিপ্-ঢিপ্ করে কেঁপে উঠল! নিমেষের মধ্যে আমার কষ্ট-টষ্ট যেন হাওয়ায় উবে গেল। আমি বালির ওপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যেন দিশেহারা হয়ে ছোটাছুটি লাগিয়ে দিলুম। আকাশ ঝকঝকে নীল। সূর্য আবার তেমনি ভয়ঙ্কর! মরু আবার আগুনে ঝলসাচ্ছে! কিন্তু যে-কষ্টে এতক্ষণ আমি নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলুম, যে-কষ্ট এতক্ষণ আমায় দগ্ধে মারছিল এখন যেন সে কষ্ট আর কষ্টই নয় আমার কাছে। কেননা, পাশাকে যে আমি দেখতে পাচ্ছি না। তবে কি পাশাও ডুবে গেছে বালির তলায়।

আমার ভীষণ ধাঁধা লেগে গেল! আমি বাবাকে যে কথা দিয়েছি। কথা দিয়েছি, যেমন করে হোক ওই উটপাখির পালক আমি শহরে পৌঁছে দেব। কিন্তু এখন কী হবে!

আমি স্তূপ স্তূপ বালির পাহাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লুম। দুহাত দিয়ে খামচাতে লাগলুম ওই বালি। খামচে-খামচে খুঁজতে লাগলুম পাশাকে। আমি এ-পাহাড় থেকে ও-পাহাড়ে যাই। এদিক থেকে ওদিক। কিন্তু কই, পাশা তো নেই! ভয়ে আমার হাত-পা যেন সিঁটিয়ে গেল! কী করি আমি! কোনদিকে যাই! আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। আমি ক্লান্ত! উঃ! কী ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছে! একটু জল দাও! তোমরা আমায় একটু জল দাও! আমি যে আর পারছি না। কিন্তু কে দেবে জল! এখানে যে কেউ নেই। চিৎকার করে মরে গেলেও কেউ আমার কথা শুনবে না। শূন্য! চারিদিক শূন্য! খাঁ-খাঁ! কই, আকাশে একটা কাক-পক্ষীও যে দেখা যায় না।

তেষ্টার জ্বালায় এখন আমি ওই মুঠো-মুঠো বালিগুলোকেই চেপে ধরেছি! নিঙড়ে নিঙড়ে এক ফোঁটা যদি জল বার করতে পারি! ভুলে গেলুম আমি এগুলো শুধুই বালি! রোদে পোড়া ঝলসানো পাথরের গুঁড়ো! এর বুকে জল নেই, জল নেই!

হঠাৎ চোখের ওপর ভেসে উঠল, জলের ঢেউ! চিকচিক করছে। তখন আমি বুঝতে পারলুম না এ মরীচিকা! এ আমার চোখের ভুল! মরীচিকা আমি কত দেখেছি! মরীচিকা দেখে আমি কত হেসেছি! আমি জানি, বালির ওপর রোদের এ ঝিলিমিলি হেঁয়ালি! কিন্তু আজ আমার মনে হল, এ সত্যি! এ তেষ্টার জল! এক ফোঁটা জলের জন্যে যখন মানুষের বুকের ভেতরটা ছটফটিয়ে ওঠে, তখন বুঝি মরীচিকা মানুষকে বোকা বানায়! তার বুদ্ধি কেড়ে নিয়ে তাকে ছোটায় তারই দিকে।

আমিও ছুটলুম, দু হাত বাড়িয়ে ছুটলুম। আমি ছুটলে বুঝি ওর নাগাল পাব! ওই জলের!

না, আমি হাঁপাচ্ছি। ছুটতে-ছুটতে হাঁপাচ্ছি। কিন্তু নাগাল আমি পেলুম না। আমার প্রাণ বুঝি বেরিয়ে যায়! গলায় আমার কথা নেই। হারিয়ে গেছে! পা আমার চলছে না! টলছে যেন! আমার চোখের পাতা বুজে এল। পড়ে গেলুম।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আমার যেন মনে হল, কাদের গলার শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি। মনে হল কারা যেন অনেকদূর থেকে এদিকেই আসছে। আমি খুব সম্ভব অসহ্য যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল, এখনই আমার নিশ্বাস বুঝি ফুরিয়ে যাবে।

হ্যাঁ, স্পষ্ট শুনছি ওরা ছুটে আসছে বালির ওপর দিয়ে, ঘোড়ায় চেপে। কজন ওরা আমি দেখিনি। ওরা আমায় দেখতে পেয়েছিল। থামল ওরা। ওদের কাছে জল ছিল। আমায় কাতরাতে দেখে তাড়াতাড়ি আমার মুখে জল দিল। আঃ! যেন প্রাণ ফিরে পেলুম। আমি চোখ চাইলুম। হাত বাড়ালুম। ওরা আমায় তুলে ধরল। বসতে পারলুম আমি। তারপর ওদের অস্পষ্ট গলায় বললুম, ''আমায় বাঁচান।''

আমি অবাক হয়ে গেলুম ওদের কেউ-ই আমার সঙ্গে কোনো কথাই বলল না। এমন কী নিজেদের মধ্যেও আর কোনো কথা নেই। ওরা আমায় ধরাধরি করে দাঁড় করাল। আমি হাঁটতে পারলুম। ওরা আমায় ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে আমাকে নিয়ে ছুটল। বসেছি আমি একজনের পেছনে, তাকে জড়িয়ে ধরে। হয়তো তখন আমি বিশ্বাস করতে পারছিলুম, আমি বেঁচে আছি। কে জানে এরপর আমার কী হবে! যতবারই ভাবছি সে-কথা, ততবারই যেন শিউরে উঠছিলুম।

আর? শিউরে উঠছিলুম এই ঘোড়সওয়ারদের দেখে। হ্যাঁ, দেখছি ওরা দলে আটজন। দেখছি আটটা কালো ঘোড়ার পিঠে চেপে ওরা ছুটছে। কোমরে তলোয়ার। ছোরা আঁটা। পোশাকগুলোও কালো। এদের কালো পোশাকের আড়ালে কী কথা লুকনো আছে আমি জানি না। তবু আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল। মন বলল, এরা মরুর দস্যু নয় তো! এ কথা মনে হতেই আমার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। কেন না, আমি জানি এরা নির্দয়, এরা ভয়ংকর হিংস্র! বাবার মুখে এদের কত গল্প আমি শুনেছি। শুনেছি অতর্কিতে এরা মরুযাত্রীদের আক্রমণ করে তাদের সর্বস্ব লুঠ করে নেয়। তবে কি এরাও তাই। এরাও কি তবে লুঠ করে ফিরছে! সামনে ওই যে লোকটা চলেছে, ওর কোলে বাঁধা ওই পুঁটলিটাতে কী আছে! তবে কি কারো লুঠের মাল! হবেও বা! কিন্তু তাহলে আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এরা! এরা তো মানুষকে খুন করে! তবে কি আমাকেও খুন করবে!

করুক খুন। আমি কত ভিতু! আমার কোমরেও তরোয়াল আছে। আমাকে মারার আগে ওদেরও ছেড়ে দেব না আমি! কাপুরুষের মতো ওদের তরোয়ালের সামনে মাথা পেতে দেব, তেমন ছেলে আমি নই। আমিও জানি দুশমনকে কেমন করে শায়েস্তা করতে হয়!

কিন্তু ছিঃ ছিঃ, আমি এ-কথা আগেই কেন ভাবছি। ওরা যদি অতই নিষ্ঠুর হয় তবে আমায় বাঁচাবে কেন! ওই বালির ওপর একটু জলের জন্যে আমি ধুঁকতে-ধুঁকতে মরি তাতে দস্যুর কী! ওদের মনে দয়া কেন হবে!

হ্যাঁ, আমি তো মরেই গেছলুম! আর একটু দেরি করে এই ঘোড়সওয়ারের দল এখানে যদি আসত! ওরা যদি আমায় দেখতে না পেত! অবিশ্যি আমি মরলেই বা কী! এখন তো আমি জানি এই মরুভূমিতে আমি, কুড়িয়ে পাওয়া এক অনাথ ছেলে! আমি জানি না নিজের বাবা-মা কেমন হয়। কিন্তু এরা? যাদের আমি এতদিন মা বলে ডেকেছি বাবা বলে জেনেছি, তারা? কোনোদিনই তো জানতে পারিনি এরা আমার কেউ নয়! কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলেকে যারা আপন করে নিতে পারে, তারা কি শুধুই মানুষ না আর কিছু!

হঠাৎ মায়ের মুখখানি আমার চোখের সামনে কেমন ভেসে উঠল! আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মাকে! দেখতে পাচ্ছি মা আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসছে। আমি ওই মুখখানি জড়িয়ে

ধরে কতদিন যে খেলা করেছি। মায়ের গলায় দু হাত রেখে দুলতে-দুলতে মাকে কত আদর করেছি। না এ হতে পারে না। মা আমার পর না। কক্ষনো না। আমার মা আমারই। আমার আপনার!

"এ খোকা, এখানে কোত্থেকে এসেছিস?" হঠাৎ আমি যার ঘোড়ার পিঠে বসেছিলুম সে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলে।

আমি প্রথমটা থতমত খেয়ে গেছলুম। তারপর ভয়ে ভয়েই উত্তর দিলুম, "আমি এখানে আসতে চাইনি। আমার সঙ্গে আমার উট ছিল। আমি উটপাখির পালক নিয়ে শহরে যাচ্ছিলুম। ঝড় উঠে আমি হারিয়ে গেছি।"

"কোথা থাকিস?"

"জানাজি।" আমি বললুম। অবিশ্যি তোমাদেরও বলতে ভুলে গেছি, আমরা যেখানে থাকি, সে-জায়গাটার নাম জানাজি।

সে জিজ্ঞেস করলে, "বাড়ি যাবি?"

আমি বললুম, "আমার বাবাকে বলে এসেছি, শহরে উট-পাখির পালক পৌঁছে দিয়ে ফিরব।"

"পালক পাবি কোথায়?"

"আমার উটের পিঠে বাঁধা আছে।"

আমার কথা শুনে লোকটা কোনো কথা বলল না। বিচ্ছিরি সুর করে হেসে উঠল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, "হাসলেন কেন?"

সে বললে, "আজ প্রথম বেরিয়েছিস?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ।"

"একা একা?"

"আমার বাবার যে অসুখ করেছে।"

"তোর বাবার আক্কেল নেই।"

এ-কথা শুনেই আমার যেন গায়ের রক্ত গরম হয়ে উঠল। আমি প্রতিবাদ করে উঠলুম, "এ-কথা কেন বলছেন? তিনি তো আপনার কোনো ক্ষতি করেননি।"

আমার এই কথায় যে লোকটা অমন হুট করে চটে উঠবে, আমি বুঝতে পারিনি। হঠাৎ ঘোড়ার লাগাম ধরে সে ঝপ করে থেমে দাঁড়াল। ঘোড়ার পিঠের ওপর বসে বসেই আমার বুকের জামাটা খামচে ধরে টান মারল। চেঁচিয়ে উঠল, "কী বলছিস?"

আমি ভয়ে কুঁকড়ে গেলুম!

লোকটা আবার হাঁক পাড়লে, "কী বলছিস, আর একবার বল!" বলেই ঘোড়ার পিঠ থেকে আমায় নীচে ফেলে দিলে। আমি কী করি, কী বলি, ভাবতে - ভাবতেই লোকটা তার কোমরে ঝোলানো খাপ থেকে তরোয়ালটা বার করে ফেলেছে। সঙ্গে-সঙ্গে দেখি, তার আরও সাতজন সঙ্গী দাঁড়িয়ে পড়েছে! আমি কিছু বলার আগেই লোকটা আমাকে মারবার জন্য তরোয়াল তুললে। লোকটা যে এমন তুচ্ছ কথায় হঠাৎ চটে উঠে আমাকে একেবারে কেটে ফেলার জন্যে তরোয়াল তুলেছে, সত্যি বলছি, এটা আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি। আসলে আমি তো রেগে যাবার মতো অন্যায় কথা বলিনি। উলটে লোকটাই তো বলল, আমার বাবার আক্কেল নেই। তোমরাই বলো, বাবার নামে এমন কথা বললে কোন্ ছেলে সহ্য করে!

আমায় ঘিরে ফেললে ওরা। ওরা আটজনই একসঙ্গে তরো-য়াল বার করলে। কোথা থেকে যে কী হল, তখন আমার কোত্থেকে যে সাহস এল, বলতে পারব না। আমিও ঝটপট খাপ থেকে তরোয়াল বার করে ফেললুম। আমি মনে-মনে ভাবলুম, মরতে হয় মরব, তবু ভীরুর মতো কেন মরব! তাই যেই ওরা তরোয়াল চালিয়েছে, ওদের তরোয়ালের বুকে ঘা মেরে আমার তরোয়ালও ঝনঝনিয়ে উঠল। আমি আটজনের সঙ্গে একাই মুখোমুখি লড়াই শুরু করে দিলুম। তুমি যদি তখন আমায় দেখতে, হলপ করে বলতে পারি, তুমি অবাক হয়ে যেতে। আমি তখন আর সে আবু নই। এখন আমি যোদ্ধা। এই নিঃশব্দ, নিঝঝুম বালির সমুদ্রে আমি এখন একা-একা যুদ্ধ করছি আটজন দস্যুর সঙ্গে। জানি না, কে আমায় এত শক্তি দিল। একটু আগে যে-আমি মরতে-মরতে বেঁচেছি, সে-ই আমি এখন শত্রুর তরোয়ালের আঘাত আটকাবার জন্যে কখনও সামনে লাফাচ্ছি। পেছনে হটছি। ঘুরে দাঁড়াচ্ছি। প্রচন্ড শব্দে তরোয়াল বেজে উঠছে, ঝনাত, ঝনাত!

কিন্তু এ তো অসম্ভব ব্যাপার! একা আমি এতজনের সঙ্গে কতক্ষণ লড়ব? আমি জানি এক্ষুনি আমার হাতের মুঠির থেকে তরোয়াল ছিটকে পড়বে। আমি জানি আমার মরণ নিশ্চিত! এখনই আমার বুক দিয়ে রক্ত গড়াবে। তারপর হয়তো আমার ক্ষতবিক্ষত দেহটা এইখানে ফেলে রেখে ওরা দুরন্ত বেগে ছুটে পালাবে। তখন এই তপ্ত বালির ওপর আমার দেহটা পড়ে-পড়ে শুকিয়ে-শুকিয়ে শেষ হয়ে যাবে!

না, আমি আর পারছি না। আমার হাতটা অবশ হয়ে আসছে। আমি ঘুরন্ত চরকির মতো ছিটকে পড়ছি। নিমেষের মধ্যে আবার উঠে দাঁড়াচ্ছি। লাফাচ্ছি, কিন্তু টাল খাচ্ছি। বালির ওপর আমার পা স্থির রাখতে পারছি না। ঠিক এমন সময় হঠাৎ আটটা তরোয়ালই এক সঙ্গে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি শেষ বারের মতো লাফিয়ে উঠেছি। কী বলব, কোত্থেকে যে শক্তি পেলুম জানি না। চোখের পলকে আমি একজনের পেটে তরোয়াল চালিয়ে দিয়েছি। লোকটা চিৎকার করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখি, সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। একজন প্রাণের ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ভাগো, ভাগো, ওরা আসছে!"

আমিও চমকে গেলুম।

একেবারে চোখের পলক পড়তে না পড়তেই দেখি, লোকগুলো পিছু ফিরেছে। আমিও পিছু ফিরেছি। দেখি, দূরে বালির ধুলো উড়িয়ে আর-একদল লোক ঘোড়ার পিঠে ছুটে আসছে। আর দেখতে! ওরা সঙ্গে-সঙ্গে আহত লোকটাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে তীর-বেগে ছুট মারলে। আমি তো থ। কিছু ভেবে না পেয়ে, একবার এদের দিকে আর একবার ওদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম! আমার হাতে তরোয়াল রক্তমাখা। তাড়াতাড়ি সেটা খাপে পুরে ফেললুম। বলব কী, সঙ্গে সঙ্গে অন্তত পঞ্চাশটা ঘোড়সওয়ার আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি তাদের কিছু বলার আগেই একজন ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঝটপট আমার মুখখানা একটা কালো কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেললে। তারপর একটা শক্ত দড়ি দিয়ে আমার হাত দুটো আর কোমরটা আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধে ঘোড়ার পিঠে চাপল সে। কোমর থেকে দড়িটা লম্বা ওর হাতে। ঘোড়া ছুটল। আমার দড়িতে টান পড়ল। আমিও ছুটলুম বালির ওপর দিয়ে ঘোড়ার পিছু-পিছু। কিন্তু তোমরা তো জানো ঘোড়ার সঙ্গে আমার ছোটা সাধ্য নয়। যতই টান খাচ্ছি, ছুটতে ছুটতে উলটে পড়ছি। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি। কখনও পারছি, কখনও হারছি। শেষে লুটিয়ে পড়লুম বালির ওপর। ঘষটাতে ঘষটাতে গড়িয়ে চললুম। আমি বুঝতে পারছি আমার গা-হাত-পা ছড়ছে। আমি জ্বলে যাচ্ছি। রোদের জ্বালার চেয়ে এ যে আরও ভয়ঙ্কর! আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না লোকগুলো আমাকে এমনি করে বাঁধল কেন! এমন করে বেঁধে টানতে-টানতে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে! ওরা কি বালির ওপর ঘষতে-ঘষতে এমনি করে আমায় মেরে ফেলবে! আমি তো কোনো দোষ করিনি। আঃ! আমি যে আর পারছি না। একটার পর একটা বিপদ এসে কেন বারবার আমায় জড়িয়ে ধরছে! আমার এখন চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, "হে মরু, তুমি আমায় বাঁচাও! একদিন তোমার বুকে জানি না কারা আমায় ফেলে যায়! তুমি আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিলে বলেই না আমি পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলে দেখেছি, কী সুন্দর

এ পৃথিবী! দেখেছি তাদের, ওই যারা তোমার বুক থেকে তুলে এনে, তাদের বুকের ছায়ায় আমায় বড় করেছে। আমি জেনেছি এরাই আমার মা, আমার বাবা। এই সুন্দর পৃথিবীতে এরা যে আমার কাছে আরও সুন্দর। আরও আপন। হে মরু, যারা আমাকে প্রাণ দিল তাদের কথা ভেবে আমার প্রাণ তুমি কেড়ে নিও না! আমি যদি মরে যাই কে তাদের দেখবে! হে মরু, বলো তুমি, ছেলে যদি মা-বাবাকে না দেখে কে দেখবে?''

ঘোড়া ছুটতে-ছুটতে থামল। আমিও থামলুম। কিন্তু দাঁড়াতে পারলুম না। ওরা নেমে এল ঘোড়ার পিঠ থেকে। আমার মুখের কালো কাপড়ের ঢাকনাটা আর হাতের বাঁধনটা ওরা খুলে ফেলে দিল। আমার চোখে অন্ধকার! ওরা আমার ঘাড়টা ধরে টান মারলে। আমি উঠতে গিয়েও পড়ে গেলুম। কিন্তু ওরা ছাড়বে না। আমাকে দাঁড়াতেই হবে। অনেক কষ্টে কাঁপতে-কাঁপতে আমি দাঁড়ালুম। কী প্রচন্ড যন্ত্রণা আমার সারা দেহে। ওরা আমার কোমরের দড়ি ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল। কোথায় নিয়ে চলল, জানি না। শুধু জানি, আমার চোখের সেই কালো অন্ধকারটা ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে! আমি একটু-একটু করে চাইতে পারছি। মনে হচ্ছে হয়তো বা মরুভূমির বালির কোলে আর এক নতুন জায়গায় এসেছি আমি। কেননা, আমি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার সামনে একটা পুরনো বাড়ির ভাঙা ফটক। কেমন যেন রহস্য-ঘেরা! ওরা আমায় টানতে টানতে ফটকের মধ্যেই নিয়ে গেল। আমি একটা শান-বাঁধানো ঘরের মধ্যে ঢুকলুম। একটা সুন্দর পালংক। মখমলের গদির ওপর ভেলভেটের বালিশে হেলান দিয়ে যে লোকটা বসে আছে, তার মাথায় লম্বা চুল। দাড়ি আর গোঁফের সঙ্গে চুলে পাক ধরেছে। তবু তীক্ষ্ম তার চোখের দৃষ্টি। লম্বা আর শক্ত সমর্থ মানুষ। ওরা আমায় তার সামনে দাঁড় করাল। আমি বুঝলুম ইনিই বো হয় পালের গোদা! বিদ্যুৎ যেমন চমকে যায় তেমনি তার চোখ দুটো হঠাৎ ঝলসে উঠল আমার মুখের ওপর। তারপর স্থির আর গম্ভীর তার গলার স্বর কয়ে উঠল, ''এই বাচ্চাটাকে কোত্থেকে ধরে আনলে?''

আমায় যারা ধরে এনেছিল তাদের পান্ডা যে লোকটা, সে বললে, ''হুজুর ছেলেটা দলে ছিল।''

আবার সে বললে, ''এত কম বয়সে দস্যুগিরিতে নেমেছে! ছেলেটার কাছ থেকে লুঠের মাল কিছু উদ্ধার করতে পারলে?''

''আজ্ঞে না। ছেলেটাকে ফেলে রেখে ওরা মাল নিয়ে ভাগল!''

এবার রেগে যেন সে গর্জন করে উঠল, ''তোমরা এতগুলো লোক কী করছিলে? এতজনের চোখের ওপর দিয়ে ভাগে কেমন করে?''

এবার আর কথা বলল না সেই লোকটা। সেই দলের পান্ডাটা। মনে হল ভয় পেয়েছে।

সে আবার জিজ্ঞেস করলে, ''ছেলেটার কাছে কিছুই পাওয়া গেল না?''

''আজ্ঞে না।''

সে তখন আমার দিকে আবার ফিরে চাইল। ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, ''কোথায় তোদের আস্তানা?''

আমি অনেক কষ্টে কথা বলতে পারলুম, "জানি না।"

সে অমনি সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, "না বললে মরবি!"

আমি আবার বললুম, "আমি ওদের লোক নই। আমি জানি না।"

লোকটার তীক্ষ্ম চোখের চাউনি এবার কেমন ভয়ানক চক-চক করে জ্বলে উঠল। সে আরও চড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলে, "কোনখানে তোদের আস্তানা?"

আমি তেমনি শান্ত গলায় উত্তর দিলুম, "আমি দস্যুগিরি করি না।"

লোকটা এবার হো-হো করে হেসে উঠল। কী হিংসুটে সে হাসির শব্দ। হাসতে-হাসতে আচমকা থেমে পান্ডাকে বললে "চাবুক লাগাও!"

এ-কথা যদি আমার আপনজন কেউ বলত, তবে নিশ্চয়ই আমার দু চোখ বেয়ে জল গড়াত। কিন্তু এই লোকটার হুকুম শুনে মাথা তুলে, বুক ফুলিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলুম, "কেন তোমরা আমায় চাবুক মারবে? আমি মিথ্যে বলি না। খবরদার! আমার গায়ে হাত তুলবে না।"

লোকটা বোধহয় থতমত খেয়ে গেছল আমার কথা শুনে। শুধু এই লোকটা কেন, যে-লোকটাকে চাবুক মারতে বলেছিল সে-ও বোধহয়। কেননা, তার হাতের চাবুক হাতেই থমকে গেছল। কিন্তু নিমেষের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে চাবুক হাতে লোকটা আমাকে মারবে বলে যেই আবার চাবুক তুলেছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকটা পালঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "থামো!"
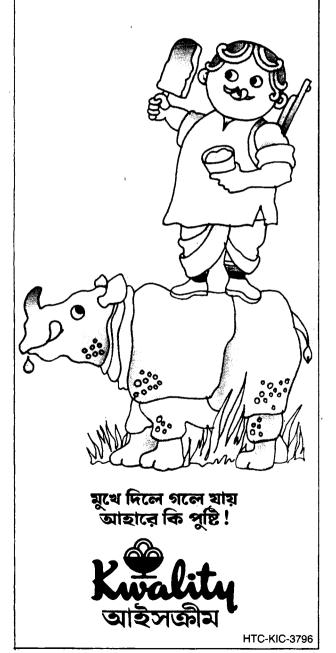
চাবুক আমার পিঠে না পড়ে, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এবার সে নিজেই চাবুকটা ছিনিয়ে নিয়ে, আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে প্রচণ্ড জোরে সেই চাবুক শূন্যে ঘোরালে। কিন্তু তার আগেই আমি আমার কোমরে বাঁধা তরোয়ালটা খাপ থেকে বার করে চাবুকের ওপর চালিয়ে দিয়েছি। চাবুকের দড়ি ছিঁড়ে ছিটকে পড়ল। আমার হাতের তরোয়াল খাপের মধ্যে ঢুকে গেল। লোকটা তার হাতের চাবুকের ভাঙা টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পাগলের মতো লাফিয়ে উঠে আমার গলাটা দু হাত দিয়ে চেপে ধরল। কিন্তু আশ্চর্য! আমার চোখের ওপর তার চোখ পড়তেই লোকটা যেন কেমন চমকে গেল। তাড়াতাড়ি আমায় ছেড়ে দিল। তারপর আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বেবাক হয়ে রইল। কেন যে লোকটা এমন করল, কেন যে আমায় মারতে-মারতেও ছেড়ে দিল, আমি বুঝতে পারলুম না। আমি কেন, ঘরসুদ্ধ অত লোক সবাই থ হয়ে গেল।

হঠাৎ লোকটা কেমন হাঁপাতে লাগল। হাঁপাতে-হাঁপাতে চেঁচিয়ে উঠে বিছানায় ছুটে গেল। মাথার বালিশটাকে খামচে ধরে হুকুম করলে, "ছেলেটার কোমর থেকে তরোয়ালটা কেড়ে নাও। ছেলেটাকে বন্দী করে রাখো। যাও, নিয়ে যাও ওকে আমার সামনে থেকে।"

ওরা আমায় টানতে-টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে চলে গেল। তারপর আমার কোমর থেকে তরোয়ালটা কেড়ে নিয়ে, আমাকে একটা গরাদ-আঁটা ঘরে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে, ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলে। আমি কয়েদ হয়ে রইলুম। আমি জানি না, আমার ভাগ্যে এখন কী আছে। তবে একথা ঠিক, এখন আমি ভয়ঙ্কর কিছুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবছি, তবে কি এবার এরা আমায় মেরে ফেলবে!

হ্যাঁ, এখন আমি কয়েদ হয়েই আছি। আমি ভয় পেয়েছি কি না জানি না। কিন্তু আমার মা আর বাবার মুখ দুটি বার-বার আমার চোখের ওপর ভেসে উঠছে। আর যখনই ভাবছি, হয়তো আমি আর তাদের দেখতে পাব না, তখনই আমার চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠছে। আমি জানি, আমার নিস্তার প্যাওয়ার আর কোনো রাস্তা নেই। হয়তো বেঁচে আছি কিছুক্ষণের জন্যে। কিন্তু সে কিছুক্ষণ যে কতক্ষণ, তা জানি না।

ঘরটা অন্ধকার। আমি যেন অন্ধকারে ডুবে আছি। ভাবছি, আমার মা আর বাবা এখন হয়তো ঘুমুচ্ছে। হয়তো ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে আমার স্বপ্ন দেখছে। কিংবা জেগে-জেগে ভাবছে, আজকের রাত কি কালকের চেয়েও বড়! তা না হলে, এ-রাত কাটে না কেন! শেষ হয় না অন্ধকার! এমন মানুষ কজন হয়। পথের ছেলেকে ঘরে তুলে এনে, নিজের ছেলে বলে বুকে তুলে নিতে পারে কজন! আমি তাদের কাছে যা চাইনি, তাই-ই পেয়েছি। যা চেয়েছি, তা যে তারা সব আদর দিয়ে আমার হাতে তুলে দিয়েছে। তাই আজ এই কয়েদখানার অন্ধকারে বসে-বসে মন আমার বার-বার কেঁদে-কেঁদে বলে উঠছে, আমি যদি কোনো দোষ করে থাকি তোমাদের কাছে, তোমাদের যদি কষ্ট দিয়ে থাকি, সে-দোষ তোমরা নিও না। আমায় ক্ষমা কোরো!

হয়তো এখন গভীর রাত্তির। মনে হচ্ছে, ঠাণ্ডা হাওয়ার আমেজ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে! আমার তরোয়ালটা এরা কেড়ে নিয়েছে। বাঁচোয়া, আমার গায়ের ছেঁড়া জামাটা আরও ছিঁড়ে দেয়নি। তুমি এখন এই অবস্থায় আমায় দেখলে ঠিক বলছি, "ছিঃ ছিঃ" করে উঠবে। কারণ রোদে আর বালিতে, ঝড় আর ঝঞ্ঝায় আমার যা অবস্থা হয়েছে! আমার গায়ে কত জায়গা যে কেটেছে, না দেখলে বুঝতে পারবে না। সঙ্গে-সঙ্গে পোশাকগুলোও ফর্দাফাঁই হয়ে ঝুলঝুলে করছে। এ তবু ভাল। ছিঁড়ুক। গায়ে তো আছে। কিন্তু মাথার পাগড়িটা যে কোথায় গেল, আমি খেয়ালই করতে পারছি না।

এরা আমায় খেতে দিল না। না-ই দিক। এখন কি আর খিদের কথা মনে আসে! আমার ভারী ক্লান্ত লাগছিল। তাই ঘুম পাচ্ছিল। চোখ দুটো যেন আপনা থেকে ঘুমে ঢুলে পড়ছিল। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানেই বসে পড়লুম। বসে-বসে আমার মুখখানা দুটো হাঁটুর মধ্যে চেপে ধরে ঢুলতে লাগলুম। তারপর যে কখন আমি আপনা-আপনি লুটিয়ে পড়েছিলুম ঘরের মেঝেয়, জানি না। এখন আমি বলতে পারব না, কখন আমার চোখ দুটি অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎই হয়তো ঘরের দরজাটা খুলে গেছল। হঠাৎই ঝনাত করে একটা আলতো শব্দ আমার কানে বেজে উঠেছিল। আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি চমকে চিৎকার করে উঠেছিলুম, "কে!"

আলো। কার হাতে যেন আলো জ্বলছে। আমি আলো দেখছি, কিন্তু যার হাতে আলো তাকে দেখছি না। আলো-ছায়ায় দেখছি, পা থেকে মাথা অবধি একটা কালো জোব্বায় সে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। আমার দিকে সে এগিয়ে আসছে! আমি ভাবলুম, আর ভয় পেয়ে, চিৎকার করে কিচ্ছু লাভ নেই। এবার বোধহয় আমায় এই লোকটার হাতেই মরতে হবে। তাই লোকটা আমার মুখের সামনে এসে দাঁড়াতেই, আমি তাকে আর অন্য কোনো কথা না জিজ্ঞেস করে বললুম, "তুমি বুঝি আমায় মারবে?"

সে তখনই কোনো কথা বলল না। হয়তো ওই কালো কাপড়ের আড়াল দিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছিল। ভয়ে যেন নিথর চারিদিক। শুধু নিজেদের বুকের নিশ্বাস ছাড়া কোন সাড়া নেই। আমি হাত বাড়ালুম তার দিকে। অস্ফুট স্বরে বললুম, "চলো। কোথায় নিয়ে যাবে আমায়।"

দেখলুম লোকটার হাত কাঁপছে। তার হাতের ওই আলোর শিখাটিও কাঁপতে-কাঁপতে নিভু-নিভু হয়ে আবার জ্বলে উঠছে। আমার কথা শুনে সে কথা বললে। খুব চাপা সে গলার স্বর। সে বলে উঠল, "তোকে আমি মরতে দেব না।" বলেই একটা হাত আমার মাথার ওপর রাখল। আমি অবাক হয়ে গেলুম। অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলুম, "কে তুমি?"

আমার মাথায় রাখা তার হাতটা যেন গড়িয়ে গড়িয়ে আমার গাল দুটির ওপর নেমে এল। তার হাতের পুরুষ্টু আঙুলগুলো আনন্দে আমার গালের ওপর নাচতে লাগল। আর তখনই আমি তার মুখখানি দেখার জন্যে ছটফটিয়ে উঠলুম। কিন্তু দেখতে পেলুম না।

সে আবার তেমনি চাপা স্বরে বললে, "আহা! তোর খুব লেগেছে, না?"

আমি বললুম, "কই, না!"

সে তখন আমার গাল থেকে হাতটি সরিয়ে এনে, প্রদীপের আলোয় আমার ক্ষত জায়গাগুলি হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে যেন আপন মনেই বলে ফেললে, "ভারী নিষ্ঠুর আমরা, ভারী নির্দয়!"

আমার আরও অবাক লাগছে। এই অন্ধকারে কোনো মানুষ যে আমায় আদর করতে পারে, এ আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। আমি তো এদের বন্দী। আমাকে নিশ্চয়ই আদর করার জন্যে এরা বন্দী করে রাখেনি। তাহলে এ লোকটা কে? আমায় আদর করছে! এমন অদ্ভুত কথা বলছে! আমি তাই আবার তাকে জিজ্ঞেস করলুম, "তুমি কে? অমন করে নিজেকে কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছ কেন? তোমার মুখখানা আমায় দেখতে দিচ্ছ না কেন?"

সে বললে, "না দেখিস না, দেখিস না এ-মুখ। আমি বড় পাপী! কিন্তু তুই বিশ্বাস কর, আমি পাপ করতে চাই না। আমি দস্যু হতে চাইনি। একদিন আমার সব ছিল। আমার ছেলে ছিল, আমার মেয়ে ছিল, আমার ঘর-সংসার সবই ছিল। একে-একে সব চলে গেছে। মানুষ বড় নিষ্ঠুর। বড় হিংস্র। তারাই আমার সব কেড়ে নিয়েছে। আজ তাদের জন্যেই আমি একজন খুনী দস্যু!"

আমি চুপ করে গেছি। মনে মনে ভাবছি, যে হাত দিয়ে মানুষ খুন করে, সেই হাত দিয়ে আবার আদরও করে! আর তাই আমি তাকে বললুম, "তুমি আমাকে এত কথা বলছ কেন?"

সঙ্গে-সঙ্গে সে আমার একটা হাত চেপে ধরল। চেপে ধরে বললে, "তুই আমাকে বাঁচা। আমি আর দস্যু হয়ে থাকতে চাই না। এদের কবল থেকে আমায় তুই মুক্ত করে নিয়ে যা। এদের জালে জড়িয়ে গেছি আমি। এরা আমায় ছাড়বে না।"

আমি বললুম, "তুমি তো ভারী আশ্চর্য কথা বলছ। আমি তো নিজেই বন্দী।"

হঠাৎ সে চুপ করে গেল। "ওই শোন, বাইরে কারা যেন ফিস-ফিস করে কথা বলছে।" তাড়াতাড়ি সে প্রদীপটা নিবিয়ে ফেলে আমার মুখখানা তার হাত দিয়ে চেপে ধরল। তারপর আমার হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে চলল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কোথায় যাব?"

সে বললে, "বাইরে।"

"কেন?"

"ওরা আসছে!"

"এলেই বা।"

সে জিজ্ঞেস করলে, "মরতে তোর ভয় করে না?"

আমি বললুম, "না।"

ততক্ষণে ওর হাত ধরে অনেকটা ছুটে এসেছি। ছুটতে ছুটতেই লোকটা আমার উত্তর শুনে বললে, "তুই মরে গেলে তোর বাপকে দেখবে কে?"

আমার বুকটা দুরু-দুরু করে কেঁপে উঠল। সত্যিই তো আমি মরে গেলে আমার বাবাকে দেখবে কে? কে দেখবে আমার মাকে। আর তখনই আমার মনের মধ্যে যেন কে চেঁচিয়ে উঠল, না, আমি মরব না, কিছুতেই না। আমাকে বাঁচতেই হবে আমার বাবার জন্যে, আমার মায়ের জন্যে। আর তখন আমি তার হাত ধরে আরও জোরে ছুট দিলুম। ছুটতে-ছুটতে জিজ্ঞেস করলুম, "কোন্ দিকে যাবে? আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

সে বললে, "তোকে দেখতে হবে না। আমি দেখছি। আমার হাতটা ভাল করে ধরে থাক। আমি তোকে বাইরে নিয়ে যাব।"

আমি তার কথামতো, তার হাতটা ভাল করে জাপটে ধরলুম। তারপর ছুটতে-ছুটতে ফটক পেরুতেই সে বললে, "এসে গেছি।"

"কোথায়?" আমি জিজ্ঞেস করলুম।

"বাইরে।" বলে হাঁপাতে-হাঁপাতে লোকটা আবার জিজ্ঞেস করলে, "আলো দেখতে পাচ্ছিস?"

আমি বললুম, "ঘরের চেয়ে এখানে কম অন্ধকার।"

সে জিজ্ঞেস করল, "এবার যেতে পারবি?"

আমি বললুম, "পারব।"

বলতে বলতেই আমি শুনতে পেলুম, কারা যেন চেঁচিয়ে উঠল, "ভাগ্‌ল, ভাগ্‌ল।"

সে যেন ভয় পেল। আমায় আড়াল করে সে বললে, "ওরা তোকে দেখতে পেয়েছে!"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কী করব?"

সে আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে তেমনি চাপা গলায় বললে, "লুকিয়ে পড়।" বলেই সে কোথায় গা ঢাকা দিলে। বোধহয় সেও লুকিয়েই পড়ল। কেননা, আমি তাকে আর দেখতেই পেলুম না। সে যে চট করে এইটুকু সময়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়বে, তা আমি ভাবতেই পারিনি। কিন্তু এখন আমি কী করব! কোথায় লুকোই! আর তো ভাববার সময়ই নেই। তাই

আমিও ঝট করে সামনের ফটকটার আড়ালেই ঢুকে পড়লুম। উঃ! কী ভাগ্য আমার! আর একটু হলেই ওরা দেখে ফেলত। আমার বুকটা কী প্রচণ্ড উত্তেজনায় ধক-ধক করছে। বুকটাকে দু হাত দিয়ে চেপে ধরে ফটকের আড়ালে পাথরের মতো চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

হঠাৎ আমি আঁতকে উঠেছি। আমার গায়ের ওপর কী যেন একটা ছিটকে পড়ল! বোধহয় একটা পোকা। সুড়সুড় করে উঠতেই আমি ঝটপট হাত দিয়ে সরিয়ে ফেলতে গেছি। তক্ষুনি আমার হাতে ঠক করে কী যেন একটা ঠেকল। চেপে ধরেছি। টান পড়তেই আমার মনে হল, আমার গলায় যেন কী একটা ঝোলানো। আশ্চর্য তো! কোত্থেকে এল। আমার গলায় তো কিছু ছিল না। আমি তো কিছুই পরিনি। তবে? তবে কি সেই লোকটা কিছু পরিয়ে দিল আমার গলায়?

আমি অন্ধকারেই সেটা পরখ করছিলুম। করতে-করতে ভাবছিলুম, এটা আমার গলায় রাখব, না ছুঁড়ে ফেলব! কিন্তু হঠাৎ আমার চোখ দুটো ঝলসে উঠল। চোখের ওপর এক ঝলক রুপোলি আলো ঠিকরে পড়ল আমার। নিমেষে চোখ বুজে ফেলেছি। আমি থ হয়ে গেছি! একটু পরে ভয়ে ভয়ে আবার চোখ খুলে ভাবছি, এ কি তবে এক টুকরো হিরে! আমার গলায় মালা হয়ে ঝুলছে! ঝুলতে-ঝুলতে অন্ধকারে ঝলমলাচ্ছে! আমি আবার আবার দেখলুম! বার বার দেখলুম। তারপর চমকে উঠলুম! কেননা আবার ওরা হল্লা করছে। হল্লা করতে-করতে ছুটে আসছে। পাছে আমার বুকের এই আলোটা ওরা দেখতে পায়, তাই চটপট আমি মালাটা আমার জামার ভেতর বুকের মধ্যে গলিয়ে ফেললুম। গলিয়ে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে রইলুম।

একটু পরে যখন আর ওদের গলার স্বর শোনা গেল না, যখন মনে হল, লোকগুলো বোকা বনে গেছে, তখন আমি এই ফটকটার আড়াল থেকে একবার উঁকি মেরেছিলুম। কাউকে দেখতে পেলুম না। আরও একটু নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে আর একবার উঁকি মেরেছি। না, সত্যিই কেউ নেই। আমি বেরিয়ে পড়েছি। ছুট দিয়ে পালাতে গেলে যদি নজরে পড়ে যাই, তাই না-ছুটে, ডিঙি মেরে পা ফেললুম। একটাই ভয়। সামনেটা সুনসান ফাঁকা। ঝট করে কারও নজরে পড়ে যেতে পারি! একবার দেখে ফেললে কী হতে পারে সে তো তোমরা বুঝতেই পারছ। তার ওপর আমার তরোয়ালটাও ওরা কেড়ে নিয়েছে। ধরতে এলে যুঝব কেমন করে। খালি হাতে কি লড়াই করা যায়! অগত্যা দু হাত তুলে ওদের হাতে আবার ধরা দিতে হবে!

এমনি করে ডিঙি মেরে দু-চার পা হেঁটেছি হয়তো। হয়তো থেমে-থেমে দু-একবার এ-পাশ ও-পাশ দেখেছি। হঠাৎ আমার গা-টা কেমন শির-শির করে উঠল। পেছনে শত্রু। এমনি করে হাঁটলে ধরা পড়তে কতক্ষণ! সুতরাং ছোটো! আর বলতে। আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করে দিলুম!

বালির ওপর ছুটতে গিয়ে আমার পা ফসকাচ্ছে! হোঁচট খাচ্ছি। গায়ের কাটা-ছেঁড়ার ব্যথাগুলো টনটন করে উঠছে। তবু ছুটছি। আমি জানি, এখন বাঁচতে গেলে ছুটতেই হবে।

অনেকটা ছুটে এসেছি। না, মনে হচ্ছে, আর দেখতে পাবে না। গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে আছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে দূর থেকে দূরে আমি যতই ছুটে যাচ্ছি, ততই যেন হারিয়ে যাচ্ছি। অবিশ্যি আকাশে যদি পূর্ণিমার চাঁদ থাকত, চাঁদের আলো যদি ছড়িয়ে পড়ত মরুভূমির ওপর, তখন যদি আমায় দেখতে, তবে তোমার নিজেরই এত ভাল লাগত! দেখতে আকাশের ওই আলোর ঝর্নায় ভাসতে-ভাসতে একটি ছোট্ট ছেলে হারিয়ে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে বিন্দু-বিন্দু করে।

কিন্তু ওরা কি দেখে ফেলেছে? শুনতে পাচ্ছি, ঘোড়ার পিঠে কারা যেন ছুটে আসছে। পিছু ফিরে দেখলুম। হ্যাঁ, সত্যিই তো! কী করি এবার! ওই তো সামনে বালির পাহাড়। উঁচু-নিচু পাহাড় থরে-থরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি জানি বাঁচার আর কোনো পথ নেই। তাই পড়ি-মরি বালির পাহাড়ের আড়ালেই আমি লুকিয়ে পড়লুম!

কিন্তু দস্যুর চোখকে তো আর ফাঁকি দেওয়া যায় না। তার ওপর একজন হলে কথা ছিল। অতজন! আমি যে কোথায় লুকিয়ে পড়লুম, তারা ঠিক দেখে ফেলেছে!

সুতরাং এই বালির পাহাড়ের সামনেই তাদের ঘোড়া থামল। ঘোড়ার পিঠ থেকে ঝটপট নেমেই আমায় খুঁজতে শুরু করে দিলে। সত্যি বলতে কী, এই আঁধার রাতে বালির পাহাড়ে তখন তাদের সঙ্গে আমার লুকোচুরি খেলা শুরু হয়ে গেল। ওরা বাঁয়ে গেলে, আমি সামনে পালাই। ওরা সামনে গেলে আমি ওপরে উঠি। মজা কী, আমি ওদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি যে কোথায় আছি, ওরা টেরই পাচ্ছে না। দেখতে না-পাওয়ার কারণও তো আছে! তোমাদের বললুম বটে বালির পাহাড়, কিন্তু তোমরা হয়তো বুঝতেই পারছ না, সে-পাহাড় কেমন পাহাড়। সে-পাহাড় মরুর ঝড়ে গড়ে ওঠে। একদিন নয়, দুদিন নয়, দিনের পর দিন ঝড়ের বালি জমে-জমে এই পাহাড় গড়ে উঠেছে। কোনোটার মাথা উঁচু, কোনোটা নিচু। কোনোটা বড়, কোনোটা ছোট। কোনোটা শক্ত, কোনোটা আবার বালির মতোই ঝুরঝুরে। সুতরাং আমার লুকিয়ে পড়তে কষ্ট নেই।

অনেকক্ষণ ধরে ওরা আমায় খুঁজল। আমিও অনেকক্ষণ ধরে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে লুকিয়ে বেড়ালুম। শেষমেশ আমাকে দেখতে না পেয়ে কী যে ভাবল তারা কে জানে! রণে ভঙ্গ দিল। আমি দেখতে পেলুম, ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে! যাক! এ-যাত্রায় বোধহয় রক্ষে পেলুম।

কিন্তু রক্ষে পেলেও, এখনই হুট করে এই আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়াটা ঠিক হবে না। তাই আরও কিছুক্ষণ এই আড়ালেই বসে রইলুম। বসে-বসে ভাবতে লাগলুম, সেই লোকটার কথা। যতই ভাবছি, অবাক হয়ে যাচ্ছি। কে লোকটা? কে আমার প্রাণ বাঁচাল অমন করে? আমার গলায় হিরের মালা পরিয়ে দিল!

হ্যাঁ, তাই তো! আমি ভুলেই গেছলুম। আমার জামার বুকে মালাটা তো এখনও লুকানো আছে! ভাগ্যিস! দস্যুগুলোর সঙ্গে ছুটোছুটি করতে গিয়ে হারিয়ে যায়নি! আমি হলপ করে বলতে পারি, তোমরা ভাবছ, আমি একবার বার করে দেখি মালাটা! কী, তোমাদেরও দেখতে ইচ্ছে করছে বুঝি?

তবে তাই ভাল। এসো আমার কাছে! আরও কাছে! এই দ্যাখো, আমি বার করছি। চুপ! একদম কথা বোলো না! এখানে কেউ না থাকলেও, কে বলতে পারে বালিরও কান নেই! ওই আকাশের দিকে চেয়ে দ্যাখো! দ্যাখো, তারাগুলো কেমন মিটমিট করে চাইছে! দেখুক! ওরা তো আর আকাশ থেকে নেমে এসে আমায় ছুঁতে পারছে না!

এই দ্যাখো, আমি বার করেছি! আরে, এ কী! হঠাৎ অন্ধকার যে কেটে যাচ্ছে! ভোরের আলো আকাশে যেন উঁকি মারছে! ওই তো দ্যাখো না, আকাশ থেকে তারার আলো একটি একটি করে নিবে যাচ্ছে। মরুর বুকের ওপর থেকে অন্ধকার রাত্তিরটা কেমন মুছে যাচ্ছে একটু-একটু। দ্যাখো, দ্যাখো, আমার বুকের ওপর আকাশের আলো কেমন ঝলমলিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আঃ! ঠিকরে পড়ছে হিরের রোশনাই! সে রোশনাই তোমার চোখে ছড়িয়ে পড়ছে না? দেখতে পাচ্ছ না, আমার গলার এই হিরের হারটি? আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি দেখতে-দেখতে। ভোরের আকাশ যখন লাল হল, আমার বুকের আলোও যে রঙিন হয়ে ছড়িয়ে গেল। যখন লাল আকাশে রোদ উঠল, আমার গলার হিরে রুপোর আলোয় উছলে উঠল। আমি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমাকে। দেখতে পাচ্ছি, এই বালির পাহাড়ের কোন্ চূড়োটা

সবচেয়ে উঁচু। কোনটা নিচু। ইচ্ছে করলে, আমি এখনই বালি ডিঙিয়ে ওই উঁচুতে উঠতে পারি। আবার নামতে-নামতে ছুটতে পারি। কিংবা এই স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকতে পারি, "পাশা, পাশা পাশা-আ-আ।"

আমি ডাকতেই যাচ্ছিলুম। থমকে গেলুম। অবাক হয়ে চেয়ে দেখলুম, আমার চোখের সামনে একটা উটপাখির পালক পড়ে। এ কি তবে সেই পালক! যে-পালক আমি পাশার পিঠে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিলুম! তবে কি পাশা এই বালির নীচে চাপা পড়েছে! আমি ছুটে গিয়ে হাত বাড়ালুম। হাতের মুঠোয় ধরতে গেলুম পালকটা। কিন্তু আশ্চর্য! পারলুম না। পালকটা আমার হাতের নাগাল থেকে ছিটকে হুশ-শ-শ করে উড়ে গেল! উড়ে গেল আরও উঁচুতে।

আমি উঁচুতেই উঠে গেলুম। আবার হাত বাড়ালুম। আবার সেই পালক চরকি খেয়ে আকাশে উড়ল। আমি হাঁ করে চেয়ে রইলুম সেইদিকে। ব্যাপার কী! আমি ধরতে গিয়েও ধরতে পারছি না কেন? ধরতে গেলেই আকাশে উড়ছে! এ কী আজব কাণ্ড! পালক তো আর পাখি নয়! তবে পাখির মতো উড়ছে কী করে!

আরে! আরে! দ্যাখো, দ্যাখো! একটা নয়, অন্তত আরও একশোটা পালক হঠাৎ কোত্থেকে উড়ে এসে শূন্যে ভাসতে শুরু করে দিয়েছে যে! শুধু ভাসছে না, ভাসতে-ভাসতে আমার গায়ে খোঁচা দিচ্ছে। আমি ভীষণ ঘাবড়ে গেছি। হাত-পা ছুঁড়ে পালক তাড়াতে শুরু করে দিয়েছি। আমি জানি এখানে এরকম একটা উদ্ভুট্টি ব্যাপার বেশিক্ষণ চললে, কারও-না-কারও নজরে পড়বেই। অত কী! যদি দস্যুদলের নজরে পড়ে যায়! তখন কী হবে! সেই ভেবে আমি নিজেই শিউরে উঠলুম। কিন্তু কী করব, ছুটে পালাব, না পালক তাড়াব, এই কথা ভাবতে-না-ভাবতেই দেখি পালকগুলো হঠাৎ যেন একটা গর্তের ভেতর সুড়ুত সুড়ুত করে ঢুকে পড়ছে। আমি ছুটলুম সেইদিকে। শুনলে অবাক হবে. ওই যে অত পালক, এই যে এতক্ষণ ধরে ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল আমার চোখ, এখন সেই পালকের একটিওকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। তাজ্জব ব্যাপার তো! তবে কি পালকগুলো সব বালির ভেতর লুকিয়ে পড়ল!

আমি এই অদ্ভুত কাণ্ডটা দেখার জন্যেই পালকগুলোকে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ কেমন থতমত খেয়ে গেলুম! আচমকা আমার নজরে পড়ল, উঁচু ওই বালির স্তূপের মধ্যে ডুবে-ডুবে যেন উঁকি মারছে, একটা ভাঙা গম্বুজ! আরও একটু ভাল করে দেখার জন্যে, আমি আরও ক-পা এগিয়ে গেলুম। হ্যাঁ, সত্যিই তো গম্বুজ! তবে কী বালির তলায় কোনো প্রাসাদ লুকিয়ে আছে! অথবা কোনো কেল্লা! আমি শুনেছি, মরুর বালি-ঝঞ্ঝার দুর্যোগে কোথাও কোথাও এমনি নাকি বড়-বড় প্রাসাদ, কিংবা যুদ্ধজয়ের কেল্লা ধ্বংস হয়ে বালির নীচে তলিয়ে গেছে! আমি এগিয়ে গেলুম। মাথা-ভাঙা গম্বুজের ভেতরটা দেখার জন্যে হেঁট হলুম। হতেই দেখি, গম্বুজ বেয়ে ওপর থেকে নীচের দিকে সিঁড়ি নেমে গেছে। সেদিকে চেয়ে আমি মনে-মনে যেই ভেবেছি, সিঁড়ি দিয়ে নেমে একবার ভেতরটা দেখলে হয়, অমনি এক অজানা ভয়ে আমার গা ছমছম করে উঠল। জানি না ভেতরে কী আছে! কী রহস্য উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে! ভয়ের রহস্য যেখানে উঁকি দেয়, সেখানেই যেন মন টানে বেশি। নিজেকে সামলে নিয়ে, বুকে সাহস আনলুম। ভাবলুম, আমি তো হারিয়েই গেছি! মরতে আমার ভয় কী! কে বলতে পারে, গম্বুজ বেয়ে নীচে নামলে অজানা কোনো গোপন রহস্যের সন্ধানও তো মিলে যেতে পারে! এই কথা ভেবেই আমি গম্বুজের ভেতরে ঢুকে পড়লুম। গম্বুজের সিঁড়ি ডিঙিয়ে নামতে শুরু করে দিলুম। প্রথমটা ভয় ছিল, সিঁড়িগুলো বুঝি ভাঙা, এবড়ো-খেবড়ো। কিন্তু নামতে-নামতে দেখি, একেবারে উলটো! আমি বলছি না যে, একেবারে নতুনের মতো তকতকে ঝকঝকে। তবে ভাঙা-বাড়ির সিঁড়ি যেমন ধসে যায়, তেমন নয়। সিঁড়িটা সাপের মতো পাক খেতে খেতে নেমে গেছে নীচের দিকে। অবিশ্যি অন্ধকার। গম্বুজের ভাঙা-চুড়াটার ফাঁক দিয়ে যেটুকু আলোর আবছা এসে পড়ছে, সেটুকুই দেখা যাচ্ছে। তা-ও আবার যতই নামছি, আলোও ততই হারিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আমার বুকের হিরেটা ঝলসে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি সেটাকে আবার বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেললুম। বলা যায় না, নীচে যদি কেউ থাকে! কেউ যদি দেখে ফেলে!

হ্যাঁ, নীচে জমাট অন্ধকার। মনে হচ্ছে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমি একটা মস্ত চত্বরে এসে থেমে গেছি। এখন কোন-দিকে যাই আমি! ওপর থেকে মনে হয়েছিল, ভেতরটা বুঝি শুধুই ধ্বংসস্তূপ! কিন্তু এখন তা মনে হচ্ছে না। কারণ আমার তো এদিক ওদিক পা ফেলতে কোনো কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে তো আর কোনো কিছুর হদিস করা যাবে না। তাই মনে হল, হিরের মালাটা বার করি। হিরের টুকরো-আলোয় যদি কিছু দেখতে পাই! তাই আমি আমার বুকে হাত দিলুম!

চুপ! চুপ! শুনতে পাচ্ছ, অন্ধকারে কে যেন কেঁদে উঠল! এ যে একটি মেয়ের কান্না! এই ভয়ঙ্কর নির্জনতা হঠাৎ যেন ভেঙে খান-খান হয়ে গেল! আমার বুকের ভেতরটা ধড়ফড়িয়ে লাফিয়ে উঠল! কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে আমি পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। হ্যাঁ, আমার কানে ভেসে আসছে সেই কান্না! খুব নরম সেই কান্নার শব্দ! একটি মেয়ের গলায় সেই কান্না যেন ঝিরি-ঝিরি বিষ্টির মতো ঝুর-ঝুর করে ঝরে পড়ছে। আমার চোখের দৃষ্টিকে খুব সাবধানে এ-পাশ ও-পাশ হেলাতে লাগলুম! অন্ধকারে থাকতে থাকতে আমার চোখ দুটো যেন এখন আর তেমন অন্ধ হয়ে নেই। দেখতে পাচ্ছি, আবছা-আবছা। দেখছি, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে বড়-বড় থামের ছায়া। মনে হচ্ছে, থামের গা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে একটা লম্বা বারান্দা সিধে ভেতরে চলে গেছে! আমি চট করে একটা থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়লুম। আগে যা মনে হয়েছিল, এখন দেখছি তা তো নয়! এটা তো বালির তলায় লুকিয়ে থাকা ভাঙা স্তূপের জঞ্জাল নয়। এখানে কান্না শুনি কার! নিশ্চয়ই কেউ আছে। নিশ্চয়ই আছে প্রাণ! ভেবে পাচ্ছি না, এখন কী করব আমি। ধরো, যে-মেয়েটি কাঁদছে, সে যদি কোনো বিপদে পড়ে থাকে! আমার কি উচিত নয় তাকে বাঁচানো?

এ কথা মনে হতে, আমি আর লুকিয়ে থাকতে পারলুম না। কিন্তু এই অচেনা জায়গায় তাড়াহুড়ো করে কিছু করে ফেলা ঠিক না। তাই হুট করে আড়াল থেকে বেরিয়ে না-পড়ে এই থাম থেকে ছুটে ওই থামে, তারপর ওই থাম থেকে আর-এক থামে লুকিয়ে পড়লুম। লুকিয়ে-লুকিয়ে সেই কান্নার খোঁজ করতে লাগলুম। আমার যেন কেমন সব এলোমেলো হয়ে গেল। কেননা, যখন আমি ভাবছি কান্নাটা সামনে থেকে আসছে, আর সেই ভেবে যেই সামনে যাচ্ছি, অমনি যেন সেই কান্না পিছন দিক থেকে ভেসে আসছে। পিছনে গেলে সেই কান্না পাশে শুনি। পাশ থেকে আরও ভেতরে আরও অন্ধকারে।

হঠাৎ দেখি, কোথাও কিছু নেই, কান্নার শব্দ ছাপিয়ে হাওয়ার শব্দ উঠল। হাওয়ার সঙ্গে ঝাঁক-ঝাঁক ধুলো উড়ে এসে আমার চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ছে! আমি তাড়াতাড়ি চোখ সামলে, মুখ নিচু করে বসে পড়লুম। ভাবলুম, একী অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড!

অনেকক্ষণ পর যখন মনে হয়েছিল, হাওয়ার দাপটটা কমেছে, হয়তো চোখের ভেতরে আর ধুলো-বালি পড়বে না, তখন খুব সাবধানে চোখ থেকে হাত সরালুম। উঠে দাঁড়ালুম। দাঁড়াতেই

আমার পা থেকে মাথা অবধি আঁতকে উঠল। আমি দেখি, এই দরদালানটা শেষ হয়েছে যেখানে, সেখানে একটা দরজা। দরজা দিয়ে সরু রুপোলি রেখার মতো এক টুকরো আলো ছিটকে এসে কার যেন মুখে ছড়িয়ে পড়েছে! আমি খুব ভাল করে দেখব বলে চোখ দুটো আলোর দিকে স্থির রাখলুম। রাখতেই আমার নজরে পড়ল, একটি ছোট্ট মেয়ের দিকে। আমি আর এই থামের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারলুম না। আমি বেরিয়ে এলুম। দেখলুম, দরজাটার দুপাশে দুটো বড়-বড় জানালা। খোলা। একদিকের একটি জানালার গরাদে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। আমার চেয়ে একটু বড়। ভারী স্থির। একেবারে নিশ্চল। মুখখানি কী মিষ্টি! কেঁদে কেঁদে ফুলে আছে। তার দুচোখ বেয়ে কান্নার ফোঁটাগুলি ঝরতে-ঝরতে যেন গালের ওপর মুক্তোর মতো দোল খাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলুম। যতই তাকে দেখছি, ততই যেন আমার মনে হচ্ছে তার চোখ দুটি আমাকে তার কাছে ডাকছে! আমায় বুঝি দেখে ফেলেছে সে! নইলে অমন করে চেয়ে আছে কেন! আমি পারলুম না। এদিক ওদিক দেখে যখন নিশ্চিন্ত হলুম আমার আশে-পাশে কেউ নেই, তখন খুব সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে গেলুম মেয়েটির দিকে। মেয়েটির কাছে। আরও একটু কাছে। কিন্তু আশ্চর্য, এখন তো ও আমায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, তবুও ছোট্ট পা দুটি তার ছুটে ছুটে লুকিয়ে তো পড়ল না। চোখ দুটি তার অবাক হয়ে চেয়ে তো দেখল না! ঠোঁট দুটি তার হেসে-হেসে কাঁপল না তো! আমি আরও এগিয়ে গেলুম। জানালার সামনে এসে দাঁড়ালুম, একেবারে তার মুখোমুখি। তবু সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মুখখানি তার গরাদে ঠেকিয়ে। আমি বুঝতে পারছি না, কী করব। তবু অজান্তেই যেন আমার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠে জিজ্ঞেস করল, "কে তুমি?"

সে উত্তর দিল না।

আমি একটু থামলুম। একটু দেখলুম। আবার জিজ্ঞেস করলুম, ''আমাকে তোমার ভয় করছে?''

তবু সে যেমন ছিল তেমনি স্থির।

আমি বললুম, "ভয় পেও না। আমাকে তোমার ভয় নেই। আমি যদি তোমাকে দিদি বলে ডাকি, তবে তুমি মনে করো আমি তোমার ভাই আবু। বলো, এখানে তুমি এমন করে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাঁদছ কেন? কিসের দুঃখ তোমার?"

সে বলল না কিছুই।

তখন আমি হাত বাড়ালুম ওই জানালার মধ্যে। আমার হাত ওর হাতটি ছুঁয়ে থমকে গেল। এ কী! এ যে পাথর। আমি খানিক অবাক হয়ে মেয়েটির মুখের দিকে তাকালুম। দু হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করলুম আরেকবার। অনেকবার। হ্যাঁ, ঠিক তাই। ঠিকই পাথর! কঠিন পাষাণ। তখন আমি সেই পাথরের চোখের পাতা দুটিতে আমার হাতটি ঠেকালুম। ঠিক তখুনি, হঠাৎ আচমকা আমার দু কানের দু পাশে বিচ্ছিরি আওয়াজ করে কে যেন শিস দিয়ে উঠল। কী তীক্ষ্ন সে আওয়াজ! শিস-স-স! একটানা। কান আমার ঝালাপালা হয়ে গেল। বুঝিবা কানের পর্দা আমার ফেটে যায়! আমার দু হাত দুই কানে চেপে ধরলুম আমি। কিন্তু কে কার কথা শুনছে! সেই শব্দ আমার কানের গর্তে ঢুকে তোলপাড় শুরু করে দিলে! উঃ! অসহ্য সেই শব্দ! আমার মাথা ঘুরে পড়ছে! আমি বোধহয় এক্ষুনি মুখ থুবড়ে পড়ব আবার। আমাকে পালাতে হবে। আমি ছুটলুম। কিন্তু কোন্‌দিকে ছুটব! কোন্‌দিকে সেই ভাঙা গম্বুজের সিঁড়ি! আমি জানি না। অন্ধকারে আমার সব এলোমেলো হয়ে গেছে। আমি যেন গোলকধাঁধায় চরকি খাচ্ছি। কিন্তু এ কী! অন্ধকারে আমার মাথার ওপর ওটা কী ঝুলছে! যেন একটা কাঁটার জাল! ওই শিসের ভয়ঙ্কর শব্দের তালে-তালে দুলতে-

দুলতে যেন আমার মাথার ওপর নেমে আসছে। এ-জাল বুঝি আমায় জড়িয়ে ধরবে! বুঝি, কাঁটাগুলো আমার সারা গায়ে বিঁধে বিঁধে রক্তে আমায় ভাসিয়ে দেবে! এবার বোধহয় সত্যি-সত্যি আমায় মরতে হবে! সুতরাং ভাবলুম, মরতেই যখন হবে, তখন শেষ চেষ্টা করতে বাধা কোথায়? এই অন্ধকারে কি লুকিয়ে পড়তে পারি না আমি? কিন্তু হায়! কিছুই দেখতে পাচ্ছি না সামনে, পেছনে। নিজেকে লুকিয়ে ফেলব যে কোথায়, ঠাওর করে উঠতে পারলুম না। অগত্যা আনিমানি ছুটছি আমি। ছুটছে মাথায় কাঁটার জাল। ঘুরছি আমি। পড়ছি আমি। আমি ঘেমে-নেয়ে হয়রান হয়ে গেলুম।

আমি আর কতক্ষণ পারব! এই দ্যাখো, আমার দম আটকে আসছে। মনে হল, কে যেন আমার গলাটা চেপে ধরেছে। আমার গলা শুকিয়ে আসছে। চিৎকার করতে গিয়েও আমার গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না। আমি বোধহয় এবার মরে যাচ্ছি! হঠাৎ যেন সেই তীব্র শব্দ থমকে থেমে গেল। কীরকম নিস্তব্ধ হয়ে গেল চারিদিক। আমার হাত-পা কেমন নিস্তেজ হয়ে লুটিয়ে পড়ল। আমি টলছি। টলতে-টলতে কিসে যেন ঠোক্কর খেলুম। পড়তে পড়তেও আমি যেন কী একটা ধরে ফেললুম! ধরে হাঁপাতে লাগলুম! হাঁপাতে হাঁপাতে ভাবছি, আমি কি এখনও বেঁচে আছি!

"ছেলেটা কি বেঁচে আছে?" এমন সময় কে যেন হঠাৎ কঠিন গলায় বলে উঠল।

সেই কথা শুনে আমার নিস্তেজ চোখের পাতা দুটি বুজেও বুজতে পারল না। এ কী! আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি! কার গলায় আমি হাত রেখেছি। ওরা কারা? দাঁড়িয়ে আছে! জীবন্ত মানুষ নাকি! না, না, এ যে পাথরের মূর্তি! নিশ্চল।

"ছেলেটা কী মরে গেল?" আবার সেই কঠিন গলা চিৎকার করে উঠল!

"না।" আমি যার গলা জড়িয়ে ছিলুম, সেই পাথরের মূর্তি চেঁচিয়ে উত্তর দিলে। বললে, "মরেনি, আমার গলা জড়িয়ে আছে।"

আমি অবিশ্যি যার গলা জড়িয়ে ছিলুম, সে কথা বলতেই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। আমি তখনই বুঝতে পারলুম, এই অন্ধকারে ওই পাথরের মূর্তিরাই কথা বলছে! আমি অবাক চোখে তাদের দিকে তাকাতে তাকাতে ভাবছি, একী সত্যি! পাথর কথা বলছে!

হ্যাঁ সত্যি! আমি আবার শুনতে পেলুম তাদের কথা কে যেন বলল, "মরু-দানবের খপ্পরে আমাদের মতো আর-একজন নতুন বন্দী ধরা পড়ল।"

আর একজন উত্তর দিল, "দুঃখের কথা বন্দীটি বয়সে নিতান্তই ছোট। আহা রে, কোন্ মা-বাবার বুকের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এল শয়তান মরু-দানব, কে জানে! একটু পরেই আমাদের মতো পাথর হয়ে যাবে।!"

সে-কথা শুনে আমার নিশ্বাস যেন আটকে এল। আমিও তবে পাথর হয়ে যাব! তবে কি মরু-দানবই আমায় কাঁটা জালে বাঁধতে চায়!

"ছেলেটির গলায় সোনার লকেটে-গাঁথা একটি হিরে কেমন অন্ধকারে জ্বলছে দ্যাখো!" একজন বলে উঠল।

আমি থতমত খেয়ে গেছি তার কথা শুনে। কেননা, হিরেটা তো আমি বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলুম। কখন বেরিয়ে পড়েছে সেটা! হয়তো ছোটাছুটি করতে গিয়ে অসাবধানে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে! আমি তাড়াতাড়ি সেটা আবার বুকের ভেতর লুকিয়ে ফেলতে [illegible] একজন মূর্তি বলে উঠল, "হয়তো মা পরিয়ে দিয়েছে [illegible]"

"মা!" দীর্ঘশ্বাস ফেলল একজন পাথরের মূর্তি, তারপর ডুকরে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমার মা, আমার বুড়ি-মা এখন কী করছে, তোমরা কেউ বলতে পারো? মা আমার হয়তো পাগলের মতো কেঁদে-কেঁদে পথে-পথে আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। জানতেও পারছে না, তার ছেলে মরু-দানবের মায়ায় পাথর হয়ে এখন এই ভাঙা-প্রাসাদের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে! জানো তোমরা জানো, আমি ছাড়া মায়ের আর কেউ নেই! মরুর পথে পা বাড়াবার আগে মা আমার কপালে চুমু খেয়ে আমাকে বলেছিল, 'তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস বাবা। সাবধানে যাস!' মা আমার জানে না, তার ছেলে আর কোনও দিনই ফিরবে না। না না, আমি আমার মাকে আর কোনও দিনই দেখতে পাব না!" বলে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

"আহা! কেঁদো না, কেঁদো না।" ওই কোণ থেকে আর একজন মূর্তি সান্ত্বনা দিলে। বললে, "কান্না আমারও পাচ্ছে,

কিন্তু আমি কি কাঁদছি! জানো আমি যখন পথে পা বাড়াচ্ছি তখন আমার ছোট ছেলেটা ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরল। আমি তাকে কোলে তুলে আদর করলুম। জিজ্ঞেস করলুম, 'কী হয়েছে বাবা? আমি শহর থেকে তোমার জন্যে ভাল দেখে একটা কাঠের ঘোড়া কিনে আনব। যাও, মায়ের কাছে যাও।' বলে যখন তাকে মায়ের কোলে তুলে দিতে গেছি, সে তখন আমার বুকের ওপর মাথা রাখলে। যেন সে আমায় যেতে দেবে না। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। একটা অজানা ভয়ে আমার বুকটা কেঁপে উঠল। আমি তার মুখখানি আমার মুখের কাছে টেনে আনলুম। তার চোখদুটি মুছিয়ে দিতে গিয়ে, আমারও চোখ ছলছলিয়ে উঠেছিল। তারপর তাকে আমি ফেলেই চলে এসেছি। তার মুখখানি আমার চোখে এখনও স্পষ্ট ভাসছে। আহা! সে এখন কী করছে? এখনও কি কাঁদছে?"

অমনি চারদিক থেকে চিৎকার ভেসে উঠল। পাথরের কঠিন স্বর তাদের গলা দিয়ে ছিটকে পড়ছে। তারা আর্তনাদ করছে ঃ

আমার মা কাঁদছে!
আমার বাবা কাঁদছে!
আমার ছেলে কোথায়!
আমার মেয়ে কোথায়!
আমার বোনকে এনে দাও!
আমার ভাইকে ডেকে দাও!
আমাদের বাঁচাও!
আমাদের বাঁচাও!
আমাদের বাঁচাও!

হঠাৎ একটি বৃদ্ধ পাথর গম্ভীর গলায় হাঁক দিলে, ''থামো, থামো!''

অমনি নিমেষের মধ্যে সবাই চুপ করে গেল!

বৃদ্ধ বললে, ''অমন করে চেঁচালেই কি আমরা বাঁচব। আমরা তো পাথর। আমরা তো মরেই গেছি! শুধু আমাদের মনটা মরেনি বলেই আমাদের সব মনে পড়ে যাচ্ছে! কিন্তু যা শেষ হয়ে গেছে, তাকে মনে এনে দুঃখ করে লাভ কী?''

হঠাৎ একটি মূর্তি বলে উঠল, ''তাহলে আমাদের বাঁচার আর পথ নেই?''

"না।"

''আমরা আর কাউকে দেখতে পাব না?''

"না, না, না। আমরা ভগ্ন-প্রাসাদের বালির নীচে বন্দী। এই বালির নীচে থাকতে থাকতে আমরা আরও নীচে নেমে যাব। নামতে নামতে চাপা পড়ব আরও বালির নীচে। তারপর গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে মরুর বালির সঙ্গে মিশে আমরাও মরুভূমি হয়ে যাব!''

একজন আর্তনাদ করে উঠল, ''না।"

সঙ্গে-সঙ্গে আর-সকলেও ভীষণ ভয়ে চিৎকার করে উঠল, "না, না, না।''

সবাই চুপ করে গেল হঠাৎ! হঠাৎ কানে এল আবার সেই কান্না, সেই মেয়েটির কান্না! হয়তো এখান থেকে একটু দূরে সে দাঁড়িয়ে আছে। তাই ভারী অস্পষ্ট হয়ে ভেসে আসছে সেই কান্নার শব্দ!

''শোনো, শোনো, সেই মেয়েটি আবার কাঁদছে।'' একটি পাথরের মূর্তি ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

সবাই চুপ করে থাকল খানিকক্ষণ। শুধু তার কান্নার শব্দটাই শুনছি। শুনছি যেন খাঁচার ভেতর বন্দী একটি ভয়-পাওয়া পাখি থমকে থমকে কেঁদে উঠছে।

''আহা! কদিন ধরে শুধুই কাঁদছে মেয়েটা!'' একজন বলল।

আর একজন উত্তর দিলে, ''ও বোধহয় ভাবছে, কাঁদলেই বুঝি বাঁচবে ও!''

''তুমি ওকে বাঁচাতে পারো না? ওই মেয়েটিকে?" বৃদ্ধ বলল।

আমি চমকে গেছি! কাকে বলছে বৃদ্ধ?

''তুমি, তুমি! তোমাকে বলছি। তুমি তো এখনও পাথর হয়ে যাওনি। তুমি ওর জন্যে একটু আলো আনতে পারো না?''

হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। বৃদ্ধ-পাথর আমাকেই বলছে। কিন্তু আমি তাকে উত্তর দেবার আগেই, "আলো, আলো'' বলে সবাই আর্তনাদ করে উঠল। আকুল হয়ে তারা চেঁচাতে লাগল, ''আমাদের জন্যে একটু আলো এনে দাও। একটু আলো।''

বৃদ্ধ আবার বললে, "চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? সময় বয়ে যাচ্ছে। খানিক পরে এই অন্ধকারটা তোমায় যখন জাপটে ধরবে, তখন আমাদের মতো তোমাকেও এখানে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। যদি পারো, তাড়াতাড়ি করো। পারবে না আমাদের জন্যে একটু আলো আনতে? এই অন্ধকারটা ভেঙে টুকরো করে দিতে পারো না তুমি?''

হঠাৎ আমার বুকের ভেতর থেকে আমার সাহস যেন চিৎকার উঠল, ''হ্যাঁ, আমি পারি। হ্যাঁ আমি পারব। আমি তোমাদের বাঁচাব। না পারি, তোমাদের মতো আমিও পাথর হয়ে, তোমাদের সঙ্গে এখানেই থাকব।"

হঠাৎ যেন সেই মেয়েটি ডাক দিল ''আবু-উ-উ!'' বাঁশির সুরের মতো তার গলার স্বর কান্নায় দোল খেতে-খেতে আমার কানে বেজে উঠল। আমি চমকে উঠেছি। তখনও ভাবছি আমি, সে কি ডাকল?

''আবু-উ-উ!''

হ্যাঁ, সত্যিই ডেকেছে। আমার চমক ভাঙল। আমিও সাড়া দিলুম, ''আমি আবু, এখানে!''

বৃদ্ধ-পাথর বললে, ''তোমায় ডাকছে মেয়েটি। সময় নষ্ট কোরো না। জীবন শেষ হবার আগে, সেটাকে কাজে লাগাও। নইলে বেঁচে থাকার মানে কী!''

হ্যাঁ, ঠিক বলেছে বৃদ্ধ। আমি আবার অন্ধকারে পা বাড়ালুম। আমি তার কান্নার ডাক শুনে তাকে আবার খুঁজে পেলুম। সে কাঁদছে। কাঁদতে-কাঁদতে আমায় দেখছে। আমিও তাকে দেখছি। শান্ত মুখখানি তার এখনও জানালার গরাদ ছুঁয়ে স্থির হয়ে আছে। ডাগর-ডাগর চোখ দুটি তার ভ্রমরের মতো উড়তে-উড়তে যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এত ভাল লাগছে! আমি তার কাছে এগিয়ে গেলুম। বললুম, ''এই তো আমি এসেছি। আমি, তোমার ভাই আবু। বলো, ডাকছ কেন? বলো, কেমন করে তোমার দুঃখ আমি ঘোচাব!''

আমার কথা শুনে, এবার সে কথা বলল। অস্থির হয়ে সে বললে, ''আবু, তুমি তো ছোট্ট। আমার দুঃখ তুমি কেমন করে ঘোচাবে। আমার একটি কথা শোনো তুমি। এখান থেকে এক্ষুনি চলে যাও। নইলে তুমিও পাথর হয়ে যাবে।''

আমি বললুম, "আমি যদি পাথর হই সে-ও ভাল। কিন্তু আমি জানতে চাই, কে তোমায় পাথর করল।''

সে বলল, ''সে-কথা তোমার শুনে কী লাভ! তুমি চলে যাও আবু।''

"আমি যাব। তুমি শুধু বলো, কে তোমায় এখানে নিয়ে এল! তাকে আমি দেখে যাব।"

''না, না, সে আমি বলতে পারব না।'' বলে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

''আমি আবু। মরুর বুকে আমার জন্ম। তোমার কান্না আমারও কান্না। তুমি যদি না বলো তবে জেনে রাখো, আবু এখানেই থাকবে, এই অন্ধকারে পাথর হয়ে। তবু তো কেউ বলতে পারবে না, দিদিকে এই বালির গহ্বরে একা ফেলে ভিতুর মতো

পালিয়েছে আব্দু। ভয় পেয়ে বাঁচতে আমি চাই না। যে তোমায় পাথর করল তাকে আমি দেখতে চাই। বলো, বলো আমাকে একটিবার বলো কে তোমায় পাথর করল!'' বলতে বলতে আমি তার হাতে হাত রাখলুম।

সে দ্বিগুণ জোরে কেঁদে উঠল। কাঁদতে-কাঁদতে বলল, ''কোন্ দেশের, কোন্ বিভুঁইয়ের আব্দু তুমি, আমি জানি না। কোথায় তোমার মা থাকেন, কোথায় তোমার বাবা আছেন, আমি তাও জানি না। তবু একবার যদি তোমার মাকে মা বলে ডাকতে পাই! যদি বলতে পারি, মাগো, তোমার বুকের ধন আব্দু আমার বীর ভাই। সে যে আমার আপন।'' বলতে বলতে তার কান্না থেমে এল। তার পাথরের ঠোঁট দুটি যেন কাঁপছে।

ধীরে ধীরে সে বলতে শুরু করলে তার নিজের কথা। সে বললে, ''আমার মা নেই। আমি জানি না কখন মা আমায় ছেড়ে চলে গেছেন। হয়তো তখন আমি খুব ছোট' আমার বাবাও আমাকে সে-কথা কোনও দিনই বলেননি। আমাদের বাড়িটা দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। খুব মস্ত। আর অনেক পুরনো। আমাদের অনেকগুলো ঘোড়া আছে। কটা উট আছে। কিছু না-চাইলেও বাবা আমায় কত কিছু দিয়েছে। কী সুন্দর একখানা ঘর আমার! কী সুন্দর সাজানো! কত পুতুল! কত রঙিন ছবি! কত পোশাক। বাবা সারাদিন ঘরে থাকে না। কী যে করে বাবা তাও আমার জানার কথা নয়। কারণ আমি তো ছোট। আমি একা-একা থাকি। ঘরের ছায়ায় বসে-বসে খেলা করি। নয়তো, গান গাই। আর যখন কিছুই ভাল লাগে না, জানালার ফাঁকে চোখ রেখে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকি। বাবা হঠাৎ আসে। হঠাৎ এসে আমাকে আদর করে। আমাকে গল্প শোনায়। তারপর সময় হলে আবার চলে যায়!

'এমনি করে দিন যায়।

''হঠাৎ একদিন বাবার আসতে দেরি হল। বাবার দেরি দেখে, ভারী ছটফট করছিল আমার মন। কখনও বার, কখনও দোর করছি আমি। কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও যখন বাবা এল না, বাবার পথের দিকে চেয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে রইলুম। দাঁড়িয়ে, দূরের দিকে চেয়ে রইলুম। কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও যখন বাবাকে আসতে দেখলুম না, তখন আমি বাইরে বেরিয়ে পড়লুম। হাঁটা দিলুম এই বালির ওপর। কেউ আমায় দেখতে পেল না। আমিও জানি না, হাঁটতে-হাঁটতে কোথায় চলেছি আমি। জানি না, কোন পথে গেলে বাবাকে খুঁজে পাব।

''হঠাৎ আমার চোখে জল এসে গেল। আমি কেঁদে ফেললুম। চিৎকার করে ডেকে উঠলুম, বাবা-আ-আ। কিন্তু কে শুনবে আমার ডাক!

''এমন সময় আচমকা আমার মনে হল, এই শূন্য মরুভূমির কোথাও কারা যেন নূপুর পরে নাচছে। রুনু-রুনু ঝিনি-ঝিনি নানান সুরে নূপুর বেজে যায়, আমি শুনতে শুনতে খুঁজি তাই। তারপর আমি ভুলে গেলুম আমাকে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই নূপুর শুনতে শুনতে আমি কোথায় চললুম, আমি নিজেও জানি না। কিন্তু আশ্চর্য, যতই খুঁজে পাচ্ছি না, ততই যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে সেই নূপুরের রিনি-ঝিনি! বেজে যায়, শুধু বেজে যায়। আমার মনও তত ভরে যায়।

''এক সময় হঠাৎ আমার মনে হল, বালির এই পাহাড়ের কাছে আমি চলে এসেছি। হঠাৎ মনে হল, বালির পাহাড়ের, ওপরে যেন সেই সুর ঘুরে ঘুরে নেচে বেড়াচ্ছে। আমি অন্ধের মতো পাহাড়র ওপর উঠে পড়লুম। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার নজরে পড়ল, একটা ভাঙা-গম্বুজের দিকে। মনে হল, এই গম্বুজের নীচেই যেন কারা নেচে নেচে গান গাইছে। আমি আনমনে গম্বুজের সিঁড়ি বেয়ে এই অন্ধকারেই নেমে এলুম। কিন্তু কাউকেই খুঁজে পেলুম না। কেউ-ই তো দেখা দিল না।

''কিন্তু তারপর হঠাৎ নূপুরের শব্দ থেমে গেল। হঠাৎ গানের সুর হারিয়ে গেল। তারপর আমার মনে হল, আমার চারপাশে কে যেন ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলছে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। চিৎকার করে উঠলুম, 'কে-এ-এ!'

''সঙ্গে সঙ্গে দেখি, আমার সামনে ভাঁটার মতো দুটো জ্বলন্ত চোখ নিবছে, জ্বলছে! জ্বলতে-জ্বলতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে! আমি ছুটে পালাতে গেলুম। পারলুম না। চারিদিকে অন্ধকার। ভীষণ জোরে হোঁচট খেয়েছি। টাল সামলাতে না-পেরে ছিটকে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্বলন্ত চোখ দুটো ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে আমায় তেড়ে এল। কী জানি তখন কী যে মনে হল আমার, কিছু না-পেয়ে সেই জ্বলন্ত চোখ দুটোকেই খামচে ধরেছি। সে আর্তনাদ করে উঠল। আমার হাত দুটোকে প্রচণ্ড শক্তিতে দুমড়ে দিলে! উঃ! কী ভীষণ যন্ত্রণা! মনে হল, বুঝিবা আমার হাত দুটো আমার শরীরে আর নেই। ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে! কিন্তু না, হাত আমার ভাঙেনি। কেননা, সে আবার এগিয়ে আসতেই, আমার এই হাত দিয়েই তাকে আমি রুখতে গেলুম। একটা বেদম জোরে ঘুঁষি মারলুম। কিন্তু তার যে কোন্ জায়গায় লাগল আমি বুঝতে পারলুম না। কিন্তু দেখলুম, সে আরও হিংস্র হয়ে উঠেছে। আমাকে খামচে ধরলে। আমাকে টেনে তুললে। তারপর আমার চুলের ঝুঁটি ধরে এমন হ্যাঁচকা মারলে যে মনে হল, আমার শরীরটা উড়ন্ত চাকির মতো উড়তে উড়তে গোঁত খাচ্ছে! আমি হুমড়ি খেয়ে একটা ঘরের মধ্যে যেন ছিটকে এলুম! হ্যাঁ, সত্যিই তাই! কেননা, তারপরেই দেখতে পেলুম, এই ঘরের দরজাটা দড়াম করে কে যেন বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলে! আমি চকিতে লাফিয়ে উঠে দরজায় ধাক্কা মেরে চেঁচালুম, 'দরজা খোলো, দরজা খোলো!' কিন্তু কেউ দরজাও খুলল না, সাড়াও দিল না। আমি কেঁদে ফেললুম।

''আমি জানি না, কতদিন এই বন্ধ ঘরে বন্দী হয়ে আছি আমি। জানি না, ঘরের এই খোলা জানালার গরাদ ধরে কাঁদতে-কাঁদতে কত দিন বয়ে গেছে। আমি জানি না, কেমন করে আমার পা দুটি নিশ্চল হয়ে গেল। আমার হাতের আঙুলগুলি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কবে যে কঠিন হয়ে গেল আমি টের পেলুম না। বুঝতে পারলুম না, কেমন করে দৃষ্টি আমার স্থির হয়ে গেছে! আমার বুকের ভেতরটা শক্ত কঠিন হয়ে থেমে আসছে' আমি যেন পাথর হয়ে যাচ্ছি! একটি কঠিন পাথরের মূর্তি!

''হ্যাঁ, সত্যিই আমি পাথর হয়ে গেলুম!

''তারপর হঠাৎ একদিন ওই দরজা খুলে গেল। আমি ছুটে দরজার কাছে যেতে পারলুম না। কেননা, আমার পা দুটি পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু অবাক কাণ্ড! আমি চিৎকার করতে পারলুম। আমার পাথরের গলার স্বর চিৎকার ক'রে বলে উঠল, 'কে-এ-এ।'

''আমি তখন বুঝতে পারলুম, আমার সামনে যা কিছু আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। দেখে দেখে মনের ভেতর কাঁদতে পারছি। আমি কথা বলতে পারছি। ভাবতে পারছি আমি পাথর। নিশ্চল।'' বলে সে আবার কেঁদে উঠল। কাঁদতে-কাঁদতে বললে, ''কে, কে আমায় এমন পাথর করে দিল!''

এবার আমি মেয়েটির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠলুম ''আমার নাম আব্দু। যে তোমায় পাথর করেছে, তাকে আমি শেষ করে তবে ছাড়ব। কে, কে সে শয়তান, যে তোমায় এমন করল?' বলে আমি চিৎকার করে উঠলুম। আমার চিৎকার ঘুরপাক খেতে-খেতে সেই অন্ধকারে মিশে গেল। অমনি সঙ্গে-সঙ্গে

শুনতে পেলুম কার গলার বিকট চিৎকার! আমার চিৎকারের চারগুণ জোরে কে যেন হেসে উঠল। আমিও তৈরি। বুক ফুলিয়ে, কোমরে হাত রেখে আমি হুকুম করলুম, "যদি তোর সাহস থাকে বেরিয়ে আয়! ভিতুর মতো লুকিয়ে লুকিয়ে যে হাসে, তাকে আমি বলি কাপুরুষ! মুরদ থাকে দেখা দে! বল, কে তুই?"

অমনি হাসি থেমে গেল। এবার যেন বাজ পড়ল তার গলায়। প্রচণ্ড জোরে হেঁকে উঠল, "এই দ্যাখ, এই আমি!"

বলতেই আমি চোখের পলকে ফিরে তাকিয়েছি। দেখি, আমার সামনে অন্ধকারে কী যেন একটা দোল খাচ্ছে। দেখি তালগোল পাকানো উদ্ভট চেহারার একটা জীব!

সেটা না ছোট, না বড়,
না বেঁটে, না ঢ্যাঙা,
না সাদা, না কালো।
দাঁতগুলো ভ্যাংচানো,
হাত দুটো চ্যাপটানো।
চোখ দুটো জ্বল-জ্বল,
নোলায় জল টলটল!

আমি তার সামনে এগিয়ে যেতেই সে গর্জন করে বলে উঠল, "আমি যদি ছোট হতুম, পিটিয়ে তোকে লম্বা করতুম। আমি যদি বেঁটে হতুম, ঠেঙিয়ে তোকে ঢ্যাঙা করতুম। আমি যদি সাদা হতুম, কিলিয়ে তোকে কালো করতুম। কিন্তু তা আর আমায় করতে হবে না। এক্ষুনি তোর ঠ্যাঙ দুটো বালির তলায় সেঁদিয়ে যাবে। এক্ষুনি তোর চোখ দুটো পাথর হয়ে ঠেক খাবে। তারপরে তুই অন্ধকারে গুমরে-গুমরে মরবি।"

"তবে রে, এত বড় কথা!" এই বলে চিৎকার করে আমি সেই তালগোল-পাকানো দানবটাকে ধরতে গেলুম। অমনি সে এমন জোরে ফুঁ দিল যে, আমি সাত হাত দূরে ছিটকে গেছি! আমি তাড়াতাড়ি উঠে যেই আবার তেড়ে গেছি, সে অমনি এমন ঠ্যাঙ ছুড়লে যে, আমি সাত দুগুনে চোদ্দ হাত দূরে পটকে গেলুম। তখন আমার মনে হল, একে তো সামনে থেকে শায়েস্তা করা যাবে না। তাই আমি তক্কে-তক্কে এক ফাঁকে পেছনে চলে গেছি। পেছনে গিয়েই তার পিঠের ওপর মেরেছি লাফ! কিন্তু আশ্চর্য, তাকে আমি ধরতে পারলুম না। কিন্তু কেমন যেন পিছলে তার পিঠ ফশকে আমি মাটিতে ডিগবাজি খেলুম। আমি ডিগবাজি খেতেই এমন হিংসুটে গলায় সে ফ্যা-ফ্যা করে হেসে উঠল যে, তাই শুনে আমার শরীর জ্বলে গেল। এতক্ষণ খেয়াল ছিল না, আমার গলায় হিরের মালা! মনে ছিল না, লড়াই করতে গেলে এ-মালা হারিয়ে যাবে। তাই আমি চটপট আমার গলার মালা খুলে ফেলে, ওই মেয়ের গলায় পরিয়ে দিয়ে বলে উঠলুম, "এই মালা তোমার কাছে রইল। যদি মরি তো মনে রেখো, তোমার ভাই তোমার গলায় পরিয়ে দিয়েছে।" বলে আমি আবার ঘুরে দাঁড়ালুম। কিন্তু আচমকা সে খপাত করে আমার একটা হাত ধরে ফেললে। হাত ধরে আমায় শূন্যে বাঁই-বাঁই করে ঘোরাতে লাগল। আমি হকচকিয়ে গেছি। চরকির মতো পাক খেতে-খেতে আমি হাত-পা ছুঁড়তে লাগলুম। ঘুরতে-ঘুরতে আমার মনে হল, এইবার হয়তো মুন্ডুটা আমার উপড়ে পড়বে। হাতটা আমার ছিঁড়ে যাবে। নয়তো পা দুটো লটকে গিয়ে ছিটকে পড়বে!

উঃ! খুব বেঁচে গেছি! মরতে-মরতে আমি হঠাৎ আমার পা দুটো দিয়ে সাঁড়াশির মতো তার গলাটা জাপটে ধরলুম! কেমন করে যে পারলুম, তা এখন কিছুতেই বলতে পারি না। গলায় চাপ পড়তেই সে কেঁদে ককিয়ে উঠল। ঝটপটিয়ে আমার হাতটা ছেড়ে দিলে। আমি পা দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ঝুলে পড়লুম। আমার পায়ের চাপে তার চোখ দুটো ঠিকরে বেরুচ্ছে। সে আমায় খামচে দিলে। আমিও তেড়ে-মেড়ে গলাটা আরও জোরে দু পা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরলুম। তখন সে এমন জোরে হাঁসফাঁস করতে লাগল, আমি ভাবলুম, এবার সে মরবে। কিন্তু মরল না। হঠাৎ মনে হল, তার মুখের ভেতর থেকে যেন একটা আগুনের গোলা বেরিয়ে এল। আমার গায়ের ওপর পড়ার আগেই আমি তার গলা ছেড়ে মেরেছি এক ডিগবাজি! তারপর মার লাফ! দে ছুট! কিন্তু আজব ব্যাপার! দেখি, তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়া আগুনের গোলাটা আমার পেছনেই ছুটে আসছে! যেন আমায় পুড়িয়ে সে শেষ করবে। আমি কী করি, কোনদিকে ছুটব? আমি জানি, এবার আমার নির্ঘাত মরণ! কেননা, বালি-চাপা এই প্রাসাদের ভেতর থেকে বেরিয়ে যাবার পথ আমার এখন আর জানা নেই। আগুনের তাড়া খেয়ে, আমায় ছুটতে দেখে, ঠিক সেই সময়ে, সেই দানবটাও এমন বিচ্ছিরি সুরে হেসে উঠল যে, আমার ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল! হাসতে-হাসতে সেও তেড়ে এল! রক্ষে এই যে, এখন আগুনের গোলায় এই অন্ধকারটা আলোয় ভরে গেছে। সুতরাং আমি এদিক-ওদিক দেখে-দেখে ছুটতে পারছি। কিন্তু জানি বাঁচার জন্যে আমার এ-ছোটা মিথ্যে! আমার পেছনে দানবের মুখ থেকে ছিটকে পড়া আগুনের গোলাটা এমন জোরে তেড়ে আসছে যে, আমায় মরতেই হবে। তবু যদি কোথাও লুকিয়ে পড়তে পারতুম! এদিকে দেওয়াল, ওদিকে ঘর। চারপাশে লম্বা-লম্বা থাম। কিন্তু আগুনকে আমি ফাঁকি দেব কেমন করে! আগুনের সঙ্গে আমি কতক্ষণ পারব! সামনেই একটা ঘর। এই তালে যদি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে দরজাটা বন্ধ করে দিতে পারি।

হয়তো বন্ধ করতে পারতুম। কিন্তু, ঘরে ঢুকতেই এমন একটা বিশ্রী গন্ধ আমার নাকে এল। যেন একটা বিষাক্ত গ্যাস!

আমার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। কী অসহ্য জ্বালা করে উঠল আমার চোখ দুটো। জ্বলে উঠল সারা শরীরটা, আমি হয়তো আর একটু হলেই জ্ঞান হারাতুম। কোনোরকমে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছি। আর ঠিক সেই সময় আগুনের গোলাটা ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে। আর সঙ্গে হয়তো সেই দানবটা। কেননা, সে তখনও চিৎকার করে হাসছে! সে জানে, আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে!

কিন্তু বলব কী, সেই আগুনের গোলাটা যেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, অমনি সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের মধ্যে দাউ-দাউ করে আগুন লেগে গেল। তারপর, "দুম্-ম্-ম্!" প্রচন্ড আওয়াজ। আমার মনে হল, আমি আর নেই। সেই শব্দের সঙ্গে আমিও বোধহয় শেষ হয়ে গেছি! আমি ছিটকে গেলুম। এক ঝলক জমাট ধোঁয়া আমায় ঢেকে ফেললে! রক্ষে, আমি ঘরের মধ্যে ছিলুম না। তা হলে এতক্ষণে আমি ছাই হয়ে যেতুম! কিন্তু আবার সেই বুক-কাঁপানো শব্দ দুম্-ম্-ম্! দুম্-ম্-ম্!

হঠাৎ দেখি সেই বালি-চাপা প্রাসাদের চারপাশের পাঁচিল জ্বলতে জ্বলতে ভেঙে পড়ছে। আমি উঠে পড়লুম। প্রাসাদের ছাতের পাথরগুলো আগুনে ফেটে ফেটে আকাশে ছিটকে যাচ্ছে। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আমি দূরে ছুটলুম! দূরে থেকে দেখতে পাচ্ছি, সেই আগুনের শিখা সামনে যা পায়, তাই গিলে খাবার জন্যে লক-লক করছে।

তারপর আবার দুম্-ম্-ম্! ইশ! দ্যাখো, দ্যাখো প্রাসাদের ছাতটা চৌচির হয়ে উড়ে যাচ্ছে! দ্যাখো, ছাতের চাঁই-চাঁই পাথরের সঙ্গে লটকাতে-লটকাতে সেই দানবটাও যে উড়ে যায়! শুনতে পাচ্ছ তার মরণ-কান্না! হ্যাঁ, শূন্যে ঝুলতে-ঝুলতে নিজের আগুনে সে নিজেই দাউদাউ করে জ্বলছে। কী ভয়ংকর তার চেহারা! কী বীভৎস সেই দৃশ্য!

আবার দুম্-ম্-ম্! প্রাসাদটা ভেঙে খান-খান হয়ে গেল। আমি দেখতে পেলুম, আকাশ ভেঙে মুঠো-মুঠো আলো নেমে এসেছে প্রাসাদের ভেতরে। আমি ছুটলুম। এমন সময় শুনতে পেলুম কে যেন ডাকল আমায়, "আবু-উ-উ!"

কে ডাকে?

"আবু-উ-উ!"

এ যেন সেই মেয়েটির গলা! সেই পাথর!

আমি সাড়া দিলুম, "আমি এখানে!"

সে আমার কাছে ছুটে এল। এ কী! সে কেমন করে ছুটে এল! সে তো পাথর! আমি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলুম। জিজ্ঞেস করলুম, "তুমি!"

সে উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। তার মুখে হাসি। সে বললে, "হ্যাঁ, আমি। অন্ধকারে দানব আমায় পাথর করে রেখেছিল। কিন্তু জানো আবু, আকাশের আলো আমার গায়ে পড়তেই, সে পাথর গলে গেল। আবু, এখন আমি তোমার মতো!" বলে সে আমার হাত দুটি জড়িয়ে ধরলে।

আর অমনি সঙ্গে-সঙ্গে আরও অসংখ্য মানুষের চিৎকার শুনতে পেলুম। সেই অসংখ্য মানুষেরাও আনন্দে চিৎকার করছে। আকাশের আলোয় তাদেরও পাথর গলে গেছে। তারা জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

উত্তেজনায় থর-থর করে কাঁপতে কাঁপতে সেই মেয়েটি তার গলায় পরিয়ে দেওয়া আমার হারটি হাতে ধরে বললে, "আবু, এ-হার তুমি কোথায় পেলে?"

আমি বললুম, "এ-হার যে আমায় দিয়েছে, সেই তো আমায় মরণের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। এখন তাকে আমায় বাঁচাতে হবে।"

শোনা গেল সেই জীবন্ত মানুষেরা আবুর নাম ধরে উল্লাস করছে। তারা খুঁজছে আবুকে।

সেই মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "আবু, আবু, যে তোমায় ওই হার দিয়েছে, তাকে কেমন দেখতে?"

আমি বললুম, "তাকে তো আমি দেখিনি। কালো কাপড়ের আড়ালে নিজেকে সে লুকিয়ে রেখেছিল।"

সেই জীবন্ত মানুষেরা এগিয়ে আসছে।

মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করলে, "সে কি বলল তার মেয়ে হারিয়ে গেছে?"

"কেন এ-কথা বলছ?" আমি জিজ্ঞেস করলুম।

সেই মানুষদের কন্ঠস্বর এখন কাছে এগিয়ে এসেছে।

সেই মেয়েটি আবার বললে, "জিজ্ঞেস করছি, কারণ, আবু, এ-হার আমার। আমার বাবার কাছে ছিল। আমার মনে হয় আবু, এ-হার তোমায় যে দিয়েছে, সে আমার বাবা।"

আমি কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। তারপর জিজ্ঞেস করলুম, "সত্যি?"

মেয়ে বলল, "সত্যি, সত্যি, সত্যি!"

"তবে এসো।" আমি তার হাত ধরে ডাক দিলুম।

ততক্ষণে সেই জীবন্ত মানুষেরা আনন্দে চিৎকার করতে করতে সেখানে পৌঁছে গেল। তারা আবুকে বুকে তুলে নিল। বুকে তুলে আত্মহারা হয়ে নাচতে লাগল।

তারপর তাদের বুক থেকে নামলুম আমি। বললুম, "শোনো বন্ধুগণ, মরু-দানবের জাদু-প্রাসাদ ভেঙেছে। মরু-দানব নিজের আগুনে নিজেই পুড়েছে। আমরা সবাই মুক্তি পেয়েছি। এবার আমাদের আর একজনকে মুক্ত করতে হবে। তোমরা কি সে-কাজে আমার সঙ্গী হবে?"

সবাই চেঁচিয়ে উঠে হাত তুলল, "যে আমাদের মুক্ত করেছে, তার জন্যে আমরা প্রাণ দেব।"

ওদেরই মধ্যে কেউ একজন চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলে, "সে একজন কে? কোথায় তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে?"

আমি বললুম, "জানি না সে কে!"

তখন সেই মেয়েটি বলে উঠল, "এ-মালা যদি আবু তার কাছ থেকে পেয়ে থাকে, তবে এ-মালা আমার। আর এ-মালা যদি আমার হয়, তবে সে আমার বাবা!"

তখন আবার সবাই চেঁচিয়ে বলে উঠল, "আমরা তাকে মুক্ত করব, আমরা তাকে মুক্ত করব!"

আমি বললুম, "তবে এসো আমার সঙ্গে।"

অমনি সবাই সেই ভাঙা প্রাসাদের জঞ্জাল ডিঙিয়ে আবার মরুর বালির ওপর উঠে এল। এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, চারিদিকে বিরাট উঁচু-উঁচু বালির স্তূপ। সেই স্তূপের চড়াই-উতরাই ভাঙতে-ভাঙতে আমরা চলেছি সেইখানে, সেই দস্যুদের আস্তানায়। আমার হাতটি ধরে আছে সেই মেয়েটি। আমরা এখন নতুন প্রাণ পেয়েছি, তাই মরুর অসহ্য উত্তাপ আমাদের বাধা দিতে পারল না। আমরা বাধা মানবও না।

আমরা অনেকখানি পথ ফেলে চলে এসেছি। এখান থেকে অনেকটা দূরে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বালির পাহাড়ের আড়ালে একটা বাড়ি উঁকি মারছে। আমি বুঝতে পারছি না, কাল আমি যেখানে বন্দী হয়েছিলুম, এই বাড়িটাই সেই বাড়ি কিনা! বোঝা তো সম্ভব নয়। কাল ছিল অন্ধকার রাত, আর আজ এখন স্পষ্ট দিন!

ও'রা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আবু, আমরা কি ওইখানে যাব?"

আমি বললুম, "আগে যা দেখা যায়, সেইখানেই আগে চলো।"

কিন্তু আমরা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি, ওই দূরে কোঠার অলিন্দ থেকে ওই বাড়ির বাসিন্দারা আমাদের দিকে সতর্ক নজর রেখেছে। আমরা জানবই বা কী করে! কেননা এখান
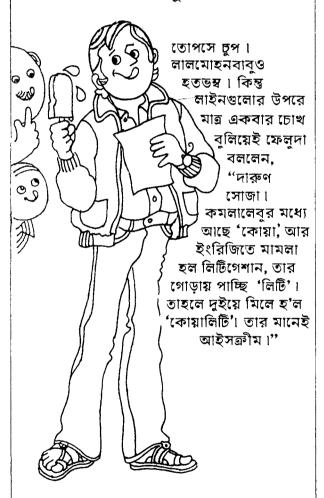
থেকে অত দূরে সেই নজরদারের দিকে আমাদের নজর যেতেই পারে না। কে জানে কোথায় চলেছি আমরা!

যতই কাছে এগোচ্ছি মনে হচ্ছে, ওই বাড়িটা যেন একটা সাদামাটা বাড়ি নয়। মনে হচ্ছে যেন একটা ভাঙা কেল্লা! বালির পাহাড়ের অনেকটা ওপর থেকে বেশ খানিকটা নীচে নেমে গেছে তার শক্ত পাঁচিল। চট করে নজর পড়বে না। পড়লেও মনে হবে, এখানে কি আর মানুষ বাস করতে পারে! কিন্তু এখানে এই কেল্লা এল কোথা থেকে? এখানে কি তবে আগে মরু ছিল না? সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তবে কি মরু-বালি এই কেল্লাটাকেও গিলে খেয়েছে! হবেও বা।

আমরা ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালুম। মেয়েটি বলল. "আব্বু, এখানে তো আমার বাবা থাকে না। এ তো আমার চেনা নয়!"

আমিও বুঝতে পারলুম না, এই ফটক, সেই ফটক কি না। বুঝতে পারলুম না, এরই আড়ালে কাল আমি লুকিয়েছিলুম কিনা! যাই হোক, আমরা ফটকের ভেতরে ঢুকে গেলুম। আমরা সবাই চিৎকার করে উঠলুম। কেল্লার চত্বরটা গমগম করে উঠল। কিন্তু কারো সাড়া পেলুম না। তবু চিৎকার থামল না। তবু আমরা আরও ভেতরে ঢুকে যাচ্ছি। বুঝতে পারছি না, আরও ভেতরে গেলে সেই মানুষটাকে আমরা উদ্ধার করতে পারব কি না! সেই মানুষটার কথাই আমার বার বার মনে পড়ছে। সে আমাকে বাঁচিয়েছিল। কথা ছিল তাকে আমি বাঁচাব। আমরা ছড়িয়ে পড়লুম চারিদিকে। আমাদের হাতে অস্ত্র নেই। এই খালি হাতেই আমরা কেল্লা দখলের লড়াইয়ে নেমেছি। জানি না বরাতে কী আছে।

আমরা এখনও কাউকে দেখতে পাইনি। আমরা এখনও বুঝতে পারিনি, যতই ভেতরে চলেছি বিপদ ততই গুটিগুটি আমাদের পেছনে হেঁটে আসছে! আমরা একটুও ধারণা করতে পারিনি, আমাদের ঘিরে ফেলে একদল দস্যু তরোয়াল উঁচিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে! আমরা অজান্তে তাদের হাতে ধরা দিতে চলেছি! আমি বলব না এটা আমাদের বোকামি। কেননা, অজানা এই কেল্লার গোপনে থাকার জায়গাগুলো তো আমাদের নজরে পড়ার কথা নয়! সুতরাং আমরা এগিয়ে চলেছি।

হঠাৎ থমকে গেলুম আমরা। দেখি, কোন্ গোপন পথ দিয়ে লুকিয়ে এসে দস্যুদল একেবারে আমাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। খাপ থেকে তরোয়াল খুলে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে তারা। আমাদের চিৎকার থেমে গেছে। আমরা জানি, এই এই শূন্য হাতে ওদের সঙ্গে আমরা লড়াই করতে পারব না! এবার দস্যুদের হাতে আমাদের মরতে হবে। তবু মরতেই যদি হয় তবে মাথা তুলেই মরব আমরা। তাই আমি চিৎকার করে বললুম, "ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো।"

"না-আ-আ!" সামনে ছুটে এসে এবার চিৎকার করে উঠল সেই মেয়েটি। বললে, "আব্বু, অনেক কষ্টে যখন আমরা জীবন ফিরে পেয়েছি, তখন এমন করে প্রাণ দেব? আব্বু, এসো আমরা ধরা দিই! আমরা যদি কোনো অন্যায় না করে থাকি, তবে আমাদের মিথ্যে-মিথ্যে মারবে কে! দেখি না ওরা কী বলে। মারতেই যদি চায় ওরা, মরার আগে শেষ রক্তটুকু দিয়ে তখন তো লড়াই করতে পারব।"

আমি ভাবলুম, ঠিক কথাই বলেছে মেয়েটি। আমরা এগোলুম না। আমরা বন্দী হলুম ওদের হাতে। ওরা আমাদের নিয়ে চলল কেল্লার ভেতর। আরও ভেতরে, একটা ঘরের সামনে।

হ্যাঁ, এই ঘরেই বোধ হয় ওদের সর্দার আছে। এই ঘরেই সেই সর্দারের সামনে হয়ত দাঁড় করাবে। আমাদের বিচার হবে।

"বাবা-আ-আ!" ঘরের দরজা ডিঙোতে আচমকা ডেকে

উঠল সেই মেয়েটি। আমরা তো সবাই থ। এমন কী, যারা আমাদের ধরে নিয়ে এসেছে, সেই দস্যুদল, তারাও থতমত খেয়ে চমকে উঠেছে! কী ব্যাপার! মেয়েটি বাবা বলে ডাকল কাকে!

নিমেষে ওদিক থেকে সাড়া এল, "রুবানা-আ!"

চেয়ে দেখে আমি বেবাক হয়ে গেছি। কেননা, যাকে বাবা বলে মেয়েটি ডাকল, তাকে আমি চিনি। এ সেই দস্যু-সর্দার! এই তো আমাকে বন্দী করে রেখেছিল অন্ধকার ঘরে এই লোকটাই তো আমার গলা টিপে মারতে উঠেছিল! সে হয়তো এখনও আমাকে ভাল করে দেখেনি। কিন্তু আমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, দু-হাত বাড়িয়ে সে আবার ডাক দিল, "রুবানা-আ!"

সেই মেয়েটি আবার খুশির সুরে চিৎকার করে উঠল, "বাবা-আ-আ!"

আমার বুঝতে বাকি রইল না, এতক্ষণ যার হাত ধরে এই পথ আমি হেঁটে এসেছি তার নাম রুবানা। আর সামনে ওই যে দাঁড়িয়ে আছে দস্যু-সর্দার, সে ওর বাবা!

ওর বাবা মেয়েকে অমন আচমকা দেখতে পেয়ে দু হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই সে ছুটল বাবার দিকে। কেউ তাকে বাধা দিল না। কেউ তাকে মানা করল না। কিন্তু আমি? হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম সেইখানে! দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, এই দস্যু-সর্দার ওর বাবা! আমার মনটা কেমন যেন মুষড়ে গেল।

ওরা আমাকে দাঁড়াতে দিল না। আমার গলায় ধাক্কা মারলে। আমি ঠোক্কর খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলুম আর একটু হলে। ঠিক সেই সময়ে সর্দারের নজর পড়ল আমার দিকে। তার চোখ দুটো স্থির হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল।

ভয় পেল হয়তো মেয়েটি। তাই সে তার বাবাকে শান্ত করার জন্যে বললে, "বাবা, এই হার তো তুমি ওকে দিয়েছ!"

এ-কথা শুনে আমি চমকে উঠলুম। চিৎকার করে বললুম, "না, এ-হার আমায় যে দিয়েছে সে-জন দস্যু নয়।"

দস্যু-সর্দার হারটা ছিনিয়ে নিল মেয়ের কাছ থেকে। তারপর ভয়ংকর হুংকার ছেড়ে বললে, "ধরে আনো ছেলেটাকে আমার কাছে!"

আমি বুক ফুলিয়ে চেঁচিয়ে বললুম, "ধরে নিয়ে যাবার কী দরকার। আমি নিজেই যেতে পারি। আমি দস্যুকে ভয় পাই না।" বলে, আমি নিজেই এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "কী বলতে চান আপনি?"

"এ-হার তুই কোথা পেলি?" ভারী গম্ভীর গলায় সর্দার জিজ্ঞেস করলে।

আমি উত্তর দিলুম, "জানি না।"

"মানে!" অবাক হল সর্দার।

"মানে, আমি যা জানি না তা আপনাকে বলব কেমন করে।"

সর্দার বললে, "তোকে আমি বন্দী করেছিলুম। তুই এই হার চুরি করে পালিয়েছিস!"

আমি বললুম, "মিথ্যে কথা। আমার বাবা আমায় চুরি করতে শেখায়নি। শিখিয়েছে চোরের মুখোমুখি বুক ফুলিয়ে কেমন করে দাঁড়াতে হয়!"

আমার এই উত্তর শুনে দস্যু-সর্দার হয়তো থতমত খেয়ে গেল। কেননা কেমন যেন অপ্রস্তুতের মতো ঘাড় দুলিয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে। আমার মুখ থেকে এমন উত্তর যে শুনবে এটা ভাবতেই পারেনি দস্যু-সর্দার। কিন্তু নিজেকে সামলাবার জন্যেই হয়তো আচমকা চিৎকার করে সে তার পাশেই রাখা তরোয়ালটা হাত দিয়ে উঁচিয়ে ধরল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "এ তরোয়াল কার?"

আমি প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি। কিন্তু একটু দেখেই চিনতে পেরেছি এ আমার সেই তরোয়ালটা। এরা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। তাই আমি উত্তর দিলুম, "আমার তরোয়াল। আপনারা কেড়ে নিয়েছেন!"

"এ-তরোয়াল তুই কোথা পেয়েছিস?"

"আমার বাবা দিয়েছে!"

"তবে তোর বাবাই সেই তস্কর, সেই শয়তান!"

দস্যু-সর্দারের সব কথা না-শুনে, শুধু এইটুকু শুনেই আমার সারা শরীর রাগে থরথর করে কেঁপে উঠল। আমিও তার গলার ওপর গলা চড়িয়ে বললুম, "এখন এই তরোয়াল আপনার হাতে না থেকে যদি আমার কাছে থাকত, তবে আপনাকে আমি বুঝিয়ে দিতুম তস্কর কে! আপনি, না আমার বাবা!"

আমার এই দুঃসাহসী কথা কোনো দস্যু কি আর সহ্য করতে পারে! তার ওপর সে দস্যু যদি হয় দলের সর্দার! সুতরাং দস্যু-সর্দার তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটে এল আমার কাছে। আমার বুকটা লক্ষ করে সে তরোয়াল চালাল। ভয় কী! মরতে হয় মরব। তবু আমার বাবাকে যে তস্কর বলেছে, তার কাছে মাথা নিচু করব না। আমি বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

কিন্তু সে পারল না। আমার বুকে তরোয়ালের আঘাত লাগার আগেই তার মেয়ে বাবার সামনে দু'হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। চিৎকার করে সে বললে, "না, তুমি আবুকে মারতে পারবে না। যার বুকে তুমি তরোয়াল তুলেছ বাবা, সে যে তোমার মেয়ের প্রাণ বাঁচিয়ে, তোমার কাছে ফিরিয়ে এনেছে। আমি ওকে ভাই বলে ডেকেছি। তুমি যদি আবুকে মারতে চাও, তবে আমাকেও মারো।"

দস্যু-সর্দারের তরোয়াল আমার বুক ছুঁতে পারল না। তরোয়াল হাতের মুঠো থেকে আবার খাপে ঢুকে গেল। আমি দেখতে পেলুম দস্যু-সর্দারের মুখখানা কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে থমকে গেছে। আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে দস্যু-সর্দার হঠাৎ হাঁক পাড়ল তার সাঙ্গোপাঙ্গদের। তারা ছুটে আসতেই হুকুম করলে, "আমি এই ছেলেটার বাবার কাছে যাব। তোমরাও চলো আমার সঙ্গে। ঘোড়া তৈরি করো। ছেলেটাকেও নিয়ে যেতে হবে। এক্ষুনি!"

হ্যাঁ, ঘোড়া তৈয়ার হল। আমাকেও একটা ঘোড়ার পিঠে বসালে ওরা। দাঁড়িয়ে ছিল রুবানা-বোন। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিল। আমাকে একা ঘোড়ার পিঠে দেখে, হঠাৎ সে ছুটে এসে, ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে ঘোড়ার লাগাম ধরে টান মারলে, "হ্যাট হ্যাট।" ঘোড়া তীব্র বেগে ছুটতে শুরু করে দিল। সে আমায় নিয়ে পালাল।

আচমকা এমন একটা কাণ্ড দেখে একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে সবাই! কী করবে, কী না-করবে ভাবতে না ভাবতেই, দস্যু-সর্দার চেঁচিয়ে উঠল, "রুবানা-আ-আ।"

ততক্ষণে আমাদের পিঠে নিয়ে ঘোড়া কোথায় চলে এসেছে! সঙ্গে-সঙ্গে সর্দারেরও ঘোড়া ছুটল। সর্দারের লোকেদের যেন এতক্ষণে চমক ভাঙল। তারাও ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে আমাদের পিছু নিলে। চেঁচিয়ে উঠলে, "ভাগল, ভাগল!' শুরু হয়ে গেল মরুর বুকে সে আর এক আজব ঘোড়-দৌড়! একটি ঘোড়ার পিঠে একটি ছোট্ট ছেলে আর একটি ছোট্ট মেয়ে ছুটে চলেছে ধু-ধু মরুর বুকের ওপর দিয়ে। আর তাদের ধরতে তাদের পেছনে ছুটে আসছে একদল মরু-দস্যু! ভয়ংকর হিংস্র তারা! নির্দয়, নিষ্ঠুর!

আমি এখন ঠিক ঠিক মনে করতে পারছি না, কেমন করে রুবানা-বোনের সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে চেপে দুরন্ত বেগে আমাদের সেই ছোট্ট ঘরে আমি আবার ফিরে এসেছিলুম। শুধু জানি দস্যু-সর্দারের সাঙ্গোপাঙ্গরা শত চেষ্টা করেও আমাদের ধরতে পারেনি। তাদের নাগালের অনেক-অ-নে-ক বাইরে ছুটে চলেছিল

আমাদের ঘোড়া। যখনই সুযোগ পেয়েছে, তখনই সে ছুটতে ছুটতে থেমেছে। যতক্ষণ না সে দেখতে পেয়েছে দূরে দস্যু-দলকে, ততক্ষণ সে আমাদের নিয়ে জিরিয়েছে। দম নিয়েছে তারপর আবার ছুটেছে। হ্যাঁ, ছুটতে-ছুটতে যখন সে আমাদের ঘরের কাছাকাছি পেঁছে গেছল, তখনই হঠাৎ দস্যু-সর্দারের ঘোড়া কোত্থেকে তীরের মতো ছুটে এসে আমাদের প্রায় ধরে ফেলেছিল। কিন্তু পারেনি। এখন বেশ মনে আছে, তার আগেই ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে আমি আর রুবানা-বোন ঘরের ভেতর ছুটে গেছলুম। আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলুম, "মা-আ-আ! বাবা-আ-আ!" তাদের চোখগুলি আমাকে খুঁজে-খুঁজে আর কেঁদে-কেঁদে ক্লান্ত হয়ে গেছে! হঠাৎ আমার ডাক শুনে তারা থমকে গেছল। তারা দুজনেই আমাদের দুজনকে বেবাক হয়ে দেখছিল। তারপর মা আমার ছুটে আমায় জড়িয়ে ধরতে এলেন। আমি তখন হাঁপাচ্ছি। বললুম, "মা, ওই দ্যাখো সামনে শত্রু!"

হ্যাঁ, সামনে শত্রু! ততক্ষণে দস্যু-সর্দার ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সামনে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে আমার সেই তরোয়াল। আমার মা আর বাবার দিকে এগিয়ে আসছে সে ধীর পায়ে। আমি আমার মা আর বাবাকে আড়াল করে দাঁড়ালুম। রুবানা-বোন ছুটে এসে তার বাবার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। বললে, "আমি যেমন তোমার মেয়ে, আমি তেমন এদেরও মেয়ে। তোমার হাতে এদের আমি মরতে দেব না।"

দস্যু-সর্দার কোনো কথা বলল না। আমার বাবার মুখোমুখি দাঁড়াল সে। বাবার চোখের ওপর চোখ রেখে নিজের হাতের তরোয়ালটা দোলাতে লাগল। বাবা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একবার সেই তরোয়ালের দিকে আর একবার দস্যু-সর্দারের মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎই দস্যু-সর্দার কথা বলল প্রথম, "এই তরোয়াল তোমার ছেলের কাছ থেকে আমি পেয়েছি। তোমার ছেলে বলেছে, এই তরোয়াল তুমি ওকে দিয়েছ। আমি জানতে পারি, এটা তুমি কোত্থেকে পেলে?"

"আমি মরু থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি।" বাবা উত্তর দিলে।

দস্যু-সর্দার বাবার উত্তর শুনে গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, "তুমি কুড়িয়ে পেয়েছ, না আজ থেকে অনেক বছর আগে মরুর বুকে দস্যুগিরি করে এই তরোয়াল তুমি লুঠ করেছ?"

বাবা বললে, "আমি কখনও দস্যু-গিরি করিনি।"

এবার যেন দস্যু-সর্দার ধমকে উঠল, "যে মিথ্যে বলে, তাকে আমি আস্ত রাখি না।"

বাবা এতক্ষণ শান্তস্বরে কথা বলছিলেন। এবার একটু কঠোরস্বরে বললেন, "তবে শুনুন। আপনি কে আমি জানি না। একটা তুচ্ছ তরোয়ালের জন্য আপনাকে মিথ্যে বলতে যাব কেন? আমি দস্যু নই! আমি আবার বলছি, অনেক দিন আগে এ তরোয়াল আমি কুড়িয়ে পেয়েছি!"

"তুমি কি জানো, এ তরোয়াল আমার?"

"হতে পারে!"

"এই দ্যাখো, তরোয়ালের হাতলের নীচে আমার নাম লেখা!" বলে দস্যু-সর্দার তরোয়ালের হাতলের নীচে গোপনে লেখা নিজের নামটা স্পষ্ট করে বাবার চোখের সামনে তুলে ধরলে।

বাবা দেখতে দেখতে বললে, "আপনার নাম যদি মনসুর হয়, তবে এ তরোয়াল আপনার।"

"হ্যাঁ, আমার নাম মনসুর। আর তুমি যদি এ তরোয়াল পেয়ে থাকো, তবে তুমিই সেই দস্যু-দলের একজন। তারা আমার বৌকে মেরেছে, আমার ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।"

বাবা যেন চমকে উঠল দস্যু-সর্দারের কথা শুনে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "আপনার ছেলে?"

বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে আমিও চমকে উঠলুম। সেদিনের সব কথা আমার মনে পড়ে গেল। সেই সেদিন, যেদিন আমি মরুতে পাড়ি দেব প্রথম, তার আগের রাত্রে বাবা আর মা যে এই কথাই বলছিল। সেদিনই যে আমি জেনেছিলুম, বাবা আমায় মরু থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে। এখন ভাবছি, তবে কি আমি এই দস্যু-সর্দারেরই ছেলে!

বাবা এবার ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা আপনার মনে আছে কতদিন আগে এ-ঘটনা ঘটেছিল?"

"দশ বছর আগে।" উত্তর দিল দস্যু-সর্দার। উত্তর দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন এ কথা বলছ তুমি?"

"কোনো কারণ নেই। এমনি জিজ্ঞেস করছি।" বলে বাবা চকিতে মায়ের মুখের দিকে চাইল। মায়ের মুখখানা কেমন যেন অজানা ভয়ে শিউরে উঠল। হয়তো এই কথা শুনে আমার মা আর বাবা ভুলে গেল আমার কথা। ভুলে গেল, তাদের ছেলে ঘরে ফিরেছে। এখন তাদের আনন্দ করার সময়। কিন্তু দস্যু-সর্দারকে বাবা আবার জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা, কেমন করে এ-ঘটনা ঘটেছিল আপনার মনে আছে?"

"কেন থাকবে না!"

"বলবেন সেই ঘটনার কথা?" জিজ্ঞেস করলে বাবা।

"বলতে আপত্তি নেই।" উত্তর দিলে দস্যু-সর্দার।

"তবে দয়া করে যদি বলেন!" জিজ্ঞেস করলে বাবা।

দস্যু-সর্দার তখন বলতে শুরু করলে। বললে, "আজ থেকে সেই দশ বছর আগে, একদিন আমার বউ আমার ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে শহর থেকে মেলা দেখে ফিরছিলুম মরুর পথ ধরে। তখন বেলা পড়ছে। আমরা দলে ছিলুম আরও অনেকে। কেউ বা যাচ্ছে ঘোড়ার পিঠে। কেউ বা উটে। আমার বউ আর ছেলে-মেয়েরা চলেছিল উটের পিঠে আর আমি চলেছি ঘোড়ায় চড়ে। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, অতর্কিতে মরু-দস্যু আমাদের

আক্রমণ করল। আমাদের ওই অতবড় দলটা নিমেষে ছত্রভঙ্গ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে পালাতে শুরু করলে দস্যু-দল লক্ষ করল আমাদের। ভেবেছিল আমাদের কাছে বুঝি অনেক সোনা-দানা আছে। তারা আমার বউকে আক্রমণ করল। আমার বউয়ের কোলে ছিল আমার ছোট্ট ছেলে। তখনও সে হাঁটতে জানে না। কথা জানে না। মায়ের কোলটি ছাড়া কিছু জানে না। দস্যুরা আমার ছেলেকে ছিনিয়ে নিল তার মায়ের কাছ থেকে। কিন্তু তার মায়ের কাছে লুকনো ছিল ধারালো একটা ছোরা। ছেলেকে কেড়ে নেবার আগে, সেই ছোরা দিয়ে সে আঘাত করতে ছাড়েনি সেই শয়তানটাকে! সেই শয়তান মরল কি না জানি না। কিন্তু আমার বউয়ের বুকে তারা তরোয়াল মারল। পড়ে গেল সে মাটির ওপর। আমার ছেলেটাকে তার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কী যে করল আমি দেখতে পেলুম না। কেননা, তখন তারা আমার ওপর চড়াও হয়েছে। হবেই তো! আমি যে তখন কোনো-রকমে আমার মেয়েকে ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি। নিয়ে ঘোড়ার পিঠে দৌড় দিচ্ছি। ওরা আমায় প্রথমে ঘিরে ফেললে। আমি তখন জানি আমার নিশ্চিত মৃত্যু। কিছু আর ভেবে না-পেয়ে এই তরোয়ালটা দিয়েই আমি ওদের সঙ্গে একা-একা লড়াই শুরু করে দিলুম। ভাবলুম, আমি মরি মরব, আমার মেয়েকে আমি বাঁচাবই! এক হাতে আমার মেয়ে, এক হাতে আমার তরোয়াল। আমি এই অবস্থায় ঘোড়ার পিঠে বসে বসে জীবন-মরণ লড়াই করছি। আমার তরোয়াল ওদের বুকে বিঁধছে। রক্ত ছুটছে। তারা কেউ মরছে, কেউ ভাগছে। কিন্তু হঠাৎ একজন দস্যু পিছন দিক থেকে আমাকে আক্রমণ করে বসল। আমার হাতের ওপর প্রচণ্ড জোরে সে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে আঘাত করলে। আমার হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে পড়ল। আমার কাছে আর কোনো অস্ত্র ছিল না। সুতরাং আমার মেয়েকে বুকে জড়িয়ে আমি ঘোড়া ছোটালুম। আমি পালালুম। ওরা আমার পিছু নিয়েও আমার নাগাল পেল না। পালালুম আমার মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে। না, আমি মরলেও আমার মেয়েকে আমি মরতে দেব না।

"হ্যাঁ, আমার মেয়েকে আমি মরতে দিইনি। কিন্তু আমার বউ আর ছেলের কথা ভেবে ভেবে বুকের ভেতরটা আমার প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠত। ভাবতুম, যারা আমার বউকে মেরেছে, যারা আমার ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, তাদের যতক্ষণ না মারছি, ততক্ষণ বুঝি আমার শান্তি নেই! কিন্তু কে তারা, আমি জানি না। তাই তাদের আমি খুঁজেও পেলুম না।

"কিন্তু তারপর হঠাৎ একদিন আমার মেয়েও হারিয়ে গেল! আমি ঘরে ছিলুম না। ফিরে দেখি, আমার মেয়ে নেই! আমি পাগলের মতো আমার মেয়ের খোঁজে ছুটে বেড়ালুম। কিন্তু কই আমার মেয়ে? তাকে আমি কোথাও খুঁজে পেলুম না। তখনই আমার মনে হল, এ বুঝি সেই মরু-দস্যুরই কাণ্ড। এ-কথা মনে হতেই প্রচণ্ড হিংস্র হয়ে উঠলুম আমি। প্রতিজ্ঞা করলুম, যদি মরতে হয় তবু ভাল, আমার মেয়েকে আমি যেমন করে হোক উদ্ধার করব। তাই আজ আমি দস্যু হয়েছি। আমি অস্ত্র ধরেছি। আমি বুঝেছি, দস্যুকে শায়েস্তা করতে হলে, আমাকে দস্যু হতেই হবে। আমি আজ এক শক্তিশালী দস্যু-দলের সর্দার। আমি যা পাই, তাই লুঠ করি। আমি যাকে পাই, তাকে খুন করি। আর তাই তোমার ছেলেও একদিন আমার দলের লোকের হাতে ধরা পড়ে। এক দস্যু-দলের সঙ্গে তোমার ছেলে ভাগছিল। আমার লোকেরা তোমার ছেলেকে ধরে নিয়ে এল আমার কাছে। এই তরোয়ালটা আমি ওর কাছ থেকে কেড়ে নিলুম। তখনও আমি জানতুম না, এই তরোয়ালই আমার সেই হারিয়ে যাওয়া তরোয়াল। আমি জানতুম না, এই তরোয়ালের গায়ে আমারই নাম খোদাই করা আছে। আমি তোমার ছেলেকে

শুধু ভেবেই তাকে আমি গলা টিপে মেরে ফেলতে গেছি। পারিনি।

"তোমার ছেলেকে মারতে গিয়ে আমারই ছেলের কথা মনে পড়ে গেছে! কেমন যেন অজানা ভয়ে আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল ওকে দেখে। কী জানি কেন, তোমার ছেলের মুখখানি দেখে, আমার চোখের জল আমি আটকে রাখতে পারিনি। বার-বার মনে করেছি আমি দস্যু। তরোয়ালের ঝন-ঝনানি শব্দ শুনে আমার ঘুম ভাঙে। শত্রুর রক্ত দেখে আমার মন ভরে। কান্না কি আমার সাজে! কিন্তু গোপনে গোপনে আমি কেঁদেছি। তোমার ছেলের জন্যে আমার মনটা ব্যথায় ডুকরে উঠেছিল বলেই গভীর রাতে ওর কাছে আমি গেছি। গেছি সেই ঘরে, যে-ঘরে ওকে আমি বন্দী করে রেখেছিলুম। আমি ওকে বুঝতে দিইনি, আমি সেই দস্যু-সর্দার। সারা গায়ে কালো কাপড়ের ঢাকায় নিজেকে লুকিয়ে রেখে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। ওকে গোপনে সেই বন্দী-ঘর থেকে বাইরে নিয়ে গেছি। ওর অজান্তে ওর গলায় একটি হার পরিয়ে দিয়েছি। এই হারটি ছিল আমারই মেয়ের। তারপর ওকে হাত ধরে গেটের বাইরে নিয়ে গিয়ে ওকে মুক্ত করে দিয়েছি। ওকে দেখে ঘৃণায় আমার মন বার-বার বলে উঠেছে, ছিঃ ছিঃ আমি কেন দস্যু! আমি কেন খুন করি! কেন আমি লুটেরা! আমি চাই না দস্যু

থাকতে! আমি এই জঘন্য জীবন থেকে মুক্তি চাই, আমি মুক্তি চাই, তাই আমি ওর হাত ধরে বলেছিলুম পারিস তো আমায় নিয়ে যাস এখান থেকে। আমায় মুক্ত করিস!'' বলতে বলতে দস্যু-সর্দার হাত দিয়ে নিজের চোখ ঢাকল। আমার চোখেও জল এসে গেল। ভাবলুম, তা হলে এই সর্দারই সেদিন আমায় মুক্ত করে দিয়েছিল! এই কথা ভাবতে ভাবতে আমি লুকিয়ে ফেলেছিলুম আমার চোখ দুটিকে। কেউ না দেখে ফেলে! কিন্তু দেখতে পেয়েছিল। দেখেছিল রুবানা-বোন। সে আমার কাছে এগিয়ে এসে আমায় চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করেছিল ''তুমি কাঁদছ, আবু?''

আমি উত্তর দিইনি। মুখ নিচু করে ভেবেছিলুম, আমিই কি তবে সেই কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে।

''কী ভাবছ, আবু?'' রুবানা-বোন খুব আলতো-স্বরে আবার জিজ্ঞেস করেছিল আমায়।

আমি বলেছিলুম, ''ভাবছি, তোমার বাবার কথা। ভারী দুঃখী!''

আমি এতক্ষণ যে-মানুষটাকে দেখলুম নিজের কথা বলতে বলতে দুঃখে ভেঙে পড়ছে, চোখে জল টলটল করছে, সেই মানুষটাই আবার দেখি হঠাৎ আর্তনাদ ক'রে উঠল। সেই জলে ভেজা চোখ দুটো রাগে লাল হয়ে উঠেছে তার। বাবাকে শাসিয়ে বললে, ''তুমি যদি সত্যি করে না-বলো এ-তলোয়ার তুমি কোথা থেকে পেলে, তবে সামনে চেয়ে দ্যাখো আমার লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে। হুকুম পেলেই ওরা তোমার ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেবে।''

হ্যাঁ, সত্যিই! সামনে চেয়ে দেখি, অন্তত পঁচিশটা ঘোড়ার ওপর আরও পঁচিশজন দস্যু অস্ত্র উঁচিয়ে আছে। বাবাও তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলে। তারপর দস্যু-সর্দারকে নরম গলায় বললে, ''আপনি আমার অতিথি। আপনাকে মিথ্যে আমি বলছি না। ওই তরোয়াল আমি মরুর বুক থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি।''

দস্যু-সর্দার এবার যেন ভয়ঙ্কর রেগে গেল। চিৎকার করে তার দলের লোকদের হুকুম করলে, ''আগুন লাগাও।''

''না-আ-আ।'' ওরা ছুটে আসার আগেই রুবানা-বোন দু হাত আড়াল করে ওদের পথ আটকাল।

সর্দার ধমকে উঠল, ''রুবানা!''

তবু রুবানা-বোন নিশ্চল।

দস্যুরা এগোতে পারল না। আমি এগিয়ে গেলুম দস্যু-সর্দারের কাছে। আমি বললুম, ''সর্দার, আপনারা দলে অনেক। আমাদের আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে আপনাদের কষ্ট করতে হবে না। কিন্তু সর্দার, দস্যু বলেই কি আপনি আমার বাবাকে বিশ্বাস করবেন না? দস্যুরা কি শুধু নির্দয়ই হবে? দস্যুরা কি শুধু মানুষের প্রাণই নেবে? তাদের ধন-সম্পত্তি লুঠ করবে? ঘরে আগুন দেবে? তবে শুনুন সর্দার, আমার বাবা মিথ্যে বলেন না। আমি জানি, ওই তরোয়াল বাবা কুড়িয়ে পেয়েছেন। সেই সঙ্গে আর একটা কথা শুনলে আপনি নিশ্চয়ই চমকে উঠবেন, ওই তরোয়ালের সঙ্গে বাবা আমাকেও ওই মরুর বুক থেকে কুড়িয়ে পেয়েছেন।''

বুঝতেই পারছ এ-কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মা, আমার বাবার মনের অবস্থা কী হয়েছিল। সে-কথা শুনে দস্যু-সর্দারের গলার স্বর নিমেষের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেছল! আর রুবানা-বোনের চোখ দুটি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে ছিল।

কিন্তু সেই নিস্তব্ধতা একটুক্ষণের জন্য। কেননা, হঠাৎ আমার মা ছুটে এসেছিল আমার কাছে। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, ''অমন কথা বলিস না আবু, অমন কথা বলিস না। তুই যে আমার বুকের মানিক!'' বলে মা কেঁদে উঠলে।

মাকে জড়িয়ে আমিও কেঁদে ফেললুম। কাঁদতে-কাঁদতে

বললুম, "জানি মা, জানি আমি তোমাদের বুকের মানিক। জানি মা, তুমি আর বাবা আমাকে মরুর বুক থেকে তুলে এনে আমায় প্রাণ দিয়েছ। তোমাদের সব আদর ঢেলে, তোমাদের সব ভালবাসা দিয়ে আমাকে বড় করে তুলেছ। মাগো, তোমরা আমাকে কোনোদিনই বুঝতে দাওনি, আমি তোমাদের পর। কোনোদিনই তোমরা মনে করোনি, আমি তোমাদের কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে। তাই আমি যখন কেঁদেছি, তোমরা আমায় কোলে তুলে নিয়েছ। আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছ। তোমাদের কাছে কিছু না চাইতেই তোমরা আমায় সব কিছু দিয়েছ। মাগো, তোমরা যদি আমায় কুড়িয়ে না-পেতে, তবে যে আমি কোনোদিনই তোমাকে মা বলে ডাকতে পারতুম না। কোনোদিনই যে বাবাকে আমি আপন বলে চিনতে পারতুম না। তোমাদের মতো এমন মানুষের ঘরে যে আগুন লাগাতে চায়, তাকে আমি কী বলে ডাকি! বলবে মা তাকে আমি কী বলে ডাকব?" বলে আমি ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলুম।

বাবা আমার এতক্ষণ বোবার মতো চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমার কথা শুনছিল। যেন পাথর। আমায় এমন করে কাঁদতে দেখে এবার আমার পাশে এসে দাঁড়াল বাবা! আমার মাথায় হাত রাখল। বললে, "কেঁদো না আবু। আজ তো আমার আনন্দের দিন। আজ তুমি তোমার আপনজনকে ফিরে পেয়েছ! আবু, আমরা তোমার পর। আমরা তোমাকে কুড়িয়ে পেয়ে শুধু বড় করেছি, এর বেশি আর কী!" বলতে বলতে আমি দেখলুম আমার বাবারও দু চোখ ছলছল করছে।

চোখের জল সামলে নিয়ে বাবা এগিয়ে গেল দস্যু-সর্দারের দিকে। তারপর বললে, "সর্দার, আবু যা বলেছে সব সত্যি! ও আমার কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে। কিন্তু বিশ্বাস করুন সর্দার আপনার ছেলেকে আমরা কোনোদিনই অযত্ন করিনি। নিজের ছেলের মতো গড়ে তুলেছি। সর্দার, ওকে আমরা কোনোদিনই বুঝতে দিইনি ও আমাদের কেউ না। ও জেনেছে, ও যাকে মা বলে ডেকেছে, সে তারই মা। আমি ওর বাবা। আমি ওকে সাহসী হতে শিখিয়েছি সর্দার। বিপদ মাথায় নিয়ে বাঁচতে শিখিয়েছি। শিখিয়েছি, দুঃখকে কেমন করে জয় করতে হয়। আর ওর মা তার মনের সব স্নেহ ঢেলে দিয়ে ওকে সুন্দর করেছে। সর্দার আবু আমাদের প্রাণ, আবু আমাদের আলো।" বাবার গলা যেন আর কথা বলতে পারল না। একটু থামল বাবা। তারপর আবার বললে, "সর্দার, আপনার ছেলেকে আপনি নিয়ে যাবেন এর চেয়ে আর আনন্দের কী হতে পারে! আবু যাবে বইকী তার আপনজনের কাছে। কিন্তু সর্দার, বিশ্বাস করুন, দস্যুগিরি করে আপনার ছেলেকে আমরা ছিনিয়ে আনিনি। সর্দার, আপনার ছেলেকে আমরা চুরি করিনি।"

আমি দেখলুম বাবার কথা শুনতে শুনতে সর্দার যেন বেবাক হয়ে গেছে। বাবা এবার আমার চিবুকটি হাতে রেখে বললে, "আবু, তোমার আপনজন তোমায় নিতে এসেছেন। আবু, তুমি ওঁর সঙ্গে ফিরে যাও! যেমন করে তুমি আমাদের ভালবেসেছ তেমন করে ওঁকে ভাল বাসবে। যেমন করে আমাদের কথা শুনেছ তুমি, তেমনি করে ওঁকে মান্য করবে। আবু, ফিরে যাও। তুমি তো এখন আর একা নও। ওই তোমার দিদি, তোমার বোন রুবানা। দিদির সঙ্গে আনন্দে, খুশিতে হেসে-খেলে তুমি সুখে থাকবে। এর বেশি আমরা আর কী চাই!" বাবার কথা আবার থেমে গেল। আমি বাবার বুকে মাথা রাখলুম।

এতক্ষণ যে-সর্দার স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এতক্ষণ যে-সর্দারের চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছিল, হাতের তরোয়াল সূর্যের পড়ন্ত আলোয় ঝলসে উঠছিল, এখন সেই দস্যু-সর্দারের মুখখানা আমাকে দেখতে দেখতে কেমন যেন থমথম করছে।

আমি বাবার বুকের থেকে মুখ তুলে মায়ের কাছে গেলুম। মায়ের চোখের জল মুছতে মুছতে বললুম, "মা দুঃখ কোরো না। আমি যাচ্ছি মা। আবু তার মাকে ভুলবে না কোনোদিন। কোনোদিনও না।"

মা আমার কপালে চুমু খেয়ে তবুও কাঁদলে।

এবার আমি এগিয়ে গেলুম দস্যু-সর্দারের কাছে। বললুম, "কোথায় যেতে হবে আমাকে? কোথায় নিয়ে যাবেন? চলুন।"

আমার কথা শেষ হল না। হঠাৎ সেই দস্যু-সর্দার যেন চাপা কান্নায় গুমরে উঠল। যেন কতদিনের জমাট মেঘের মতো সেই কান্না একসঙ্গে বুকের আকাশ ভেঙে অঝোরে ঝরে পড়তে চাইছে। সর্দার আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। আমি বুঝতে পারছি, প্রচন্ড উত্তেজনায় সর্দারের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠছে। আমাকে জড়িয়ে ধরে সর্দার যে কেমন করে তার বুকের সব ভালবাসা আমাকে উজাড় করে দেবে, বুঝি ভেবে পাচ্ছে না। মুখের কথা যেন মুখেই হারিয়ে গেছে সর্দারের। শুধু চোখের জল উপচে পড়ে, আমার কপাল ছুঁয়ে বার-বার যেন বলছে, "এতদিন তুই কোথা ছিলি, কোথা ছিলি আবু? তুই যে আমার বুকের ধন, তুই আমার স্বপ্নের রাজপুত্তুর। তোর জন্য এতদিন ধরে মনের ভেতর শুধুই যে কেঁদেছি আমি। বল, বল, আমাকে একবার বাবা বল। একটিবার আমায় বাবা বলে ডাক!"

সর্দারের সেই কান্না-ভেজা মুখখানা একদৃষ্টে অবাক হয়ে দেখছিলুম আমি। দেখতে-দেখতে আমারও চোখ ছলছলিয়ে উঠল। আমার মুখ দিয়ে আপনা-আপনি অস্ফুটস্বরে বেরিয়ে এল, "বাবা!"

কী বলব, সঙ্গে সঙ্গে কী জোর হেসে উঠল সর্দার। হাসির সঙ্গে আর চোখের জলের সঙ্গে সর্দারের সেই ভীষণ গম্ভীর মুখখানা কেমন যেন একটি ছোট্ট ছেলের মতো আনন্দে উছলে উঠল। আমায় দুহাত দিয়ে কোলে তুলে নিল সর্দার। তারপর প্রচন্ড জোরে চিৎকার করে হেঁকে উঠল, "আমার ছেলেকে আমি ফিরে পেয়েছি, আমার ছেলেকে আমি ফিরে পেয়েছি!" সর্দার যেন পাগল হয়ে গেল!

রুবানা-বোন এতক্ষণ বোবার মতো অবাক চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিল সব। এবার তার চোখেও জল গড়াল। শুধু কাঁদতে কাঁদতে থমকে গেছে আমার মা। রুবানা-বোন আমার মায়ের কাছে এগিয়ে গেল। বললে, "মন খারাপ কোরো না মা। আবু তোমায় মা বলে ডেকেছে। তুমি আমায় মেয়ে বলে ডেকো।"

বাবা এগিয়ে গেল সর্দারের কাছে। বললে, "সর্দার, আপনি আপনার ছেলেকে ফিরে পেয়েছেন। এর চেয়ে আনন্দের আর কী আছে! আপনি এবার ছেলেকে নিয়ে ঘরে যান। তাকে নিয়ে আপনার স্বপ্নের রাজত্ব গড়ে তুলুন। এবার আমাদের ছুটি।"

সর্দার আমাকে তার কোল থেকে নামাল। নামিয়ে বাবার হাত জড়িয়ে ধরে বললে, "বন্ধু, আমি তোমাদের চিনতে পারিনি। আমাকে তোমরা ক্ষমা কোরো। কে বলেছে, তোমাদের ছুটি। কে বলেছে, আবু আমার ছেলে। যারা তাকে মরুর বুক থেকে তুলে এনে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে, যারা তাকে তাদের বুকের রক্ত দিয়ে বড় করে তুলেছে, তারা তার আপন না আমি? আমি দস্যু! আমি হিংস্র! আমি নিষ্ঠুর। বন্ধু, ছুটি তোমাদের না, ছুটি আমার। আবু তোমাদের ছেলে। আবু তোমাদেরই থাকবে। আবুকে আমি নিয়ে যেতে আসিনি। আবুকে তোমাদের কাছে দিয়ে যেতে এসেছি।"

আমরা সবাই, সবাই কেমন থ হয়ে গেলুম সর্দারের এই কথা শুনে।

তারপর সর্দার আবার বললে, "আর একটি জিনিস তোমাদের কাছে আমি রেখে যেতে চাই, তোমরা কি তা রাখবে?"

আমরা অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম তার মুখের দিকে। ভাবলুম, কী জিনিসের কথা বলছে সর্দার!

সর্দার রুবানা-বোনের দিকে চাইল। তাকে ডাকল, ''রুবানা!'' সর্দারের এ-ডাকে সে-হুংকার আর নেই। ভারী মিষ্টি, ভারী নরম।

রুবানা-বোন এগিয়ে গেল সর্দারের দিকে। সর্দার তার মাথায় হাত রাখল। রুবানা মুখ তুলে চাইল বাবার দিকে। সর্দার বললে, "এই আমার মেয়ে। আমি কোনোদিনও পারিনি আমার মেয়ের মনটি আমার সব আদর দিয়ে ভরিয়ে দিতে। আমি পারিনি আমার বুকের যত্নে তাকে গড়ে তুলতে। আমি দস্যু। তোমরাই বলো, এই একটা হিংস্র দস্যুর আস্তানায় এমন একটি গোলাপ-কুঁড়ির মতো মেয়ে, সে কি ফুল হয়ে ফুটে উঠতে পারে?" বলতে বলতে চুপ করে গেল দস্যু-সর্দার। তারপর মেয়ের হাতটি ধরে আমার মায়ের কাছে গেল। মাকে বললে, ''বোন, আবুকে যেমন তোমরা বুকে-পিঠে করে গড়ে তুলেছ, আবুকে যেমন মনে করেছ তোমাদেরই ছেলে, তেমনি আমার মেয়েও আজ থেকে তোমাদেরই। তোমাদেরই হাতে আমার রুবানাকে তুলে দিয়ে গেলুম। তোমরা কি তাকে আপন করে নিতে পারবে না?'

মা সে-কথা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে রুবানা-বোনকে জড়িয়ে ধরল। রুবানা-বোন মাকে জড়িয়ে ডুকরে-ডুকরে কেঁদে উঠে ডাক দিল, "মা!"

মা-ও যেন বুকের সব আদর উজাড় করে ডেকে উঠল, "রুবানা!"

"আঃ!" দীর্ঘশ্বাস পড়ল সর্দারের। রুবানা-বোনের মা-ডাকার সঙ্গে-সঙ্গে তার যেন মনের সব বোঝা হালকা হয়ে গেল।

"আবু!" সর্দার এবার ডাকল আমায়। আমি এগিয়ে গেলুম। সর্দার তার খাপে ঢাকা সেই তরোয়ালটি বার করল। আমার হাতে তুলে দিলে। বললে, ''আবু, এই তরোয়াল তোমারই। আমি তোমায় ফিরিয়ে দিলুম। এ-তোমার বীরত্বের পুরস্কার। আমি জানি, এই তরোয়াল নিয়ে তুমিই পারবে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াতে, তাকে জয় করতে।" তারপর রুবানা-বোনের কাছে এগিয়ে গেল সর্দার। বললে, ''এই নাও তোমার সেই হার। এই হারই তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছে তোমার ভাইকে। রুবানা, আমি এবার যাব। যাবার আগে বলে যাব, তোমার ভাইকে নিয়ে তুমি আনন্দে থাকো। তোমার খুশি দিয়ে, তুমি এ-বাড়ি ভরিয়ে রাখো। রুবানা, তোমরা আরও সুন্দর হও।' তারপর বাবাকে বললে, "বন্ধু, এবার আমি যাই।" মাকে বললে "বোন, বিদায়!" বলতে বলতে দস্যু-সর্দার হাত তুলল। রুবানা-বোনের হাত ধরে আমি ছুটে গেলুম তার কাছে। আমরা দুজনে তার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে মাথা নোয়ালুম। আমাদের মাথায় হাত রাখল দস্যু-সর্দার, তারপর ছুটে ঘরের বাইরে চলে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে ঘোড়া। উঠে পড়ল তার পিঠে। ঘোড়া পা ফেলল। বাইরে অপেক্ষা করছিল পঁচিশটা ঘোড়ার পিঠে আরও পঁচিশজন দস্যু। তারাও চলল সর্দারের পেছনে-পেছনে।

দূরে পড়ন্ত সূর্যের লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে সোনালি বালির ওপর। সর্দারের ঘোড়া বালির গভীরে, আরও গভীরে হারিয়ে যায় একটু-একটু করে। আমরা দাঁড়িয়ে রইলুম। চেয়ে রইলুম সেই পথের দিকে। তারপর কেঁদে ফেললুম আমরা দু'জনে। আমি আর আমার বোন রুবানা।

সোমেন গুপ্ত বনাম পিংকাশ গুহ

রমানাথ রায়

আমার বাড়ির কাছেই একটা ফ্লাইং ক্লাব আছে। আমি প্রতিদিন সকালবেলা সেই ক্লাবে যাই। বিমান নিয়ে অনেক উঁচুতে উঠে পড়ি। তারপর ডিগবাজি খাওয়ার খেলা খেলতে থাকি। এই আমার নেশা। আজকেও যথারীতি একটা বিমান নিয়ে ওপরে উঠলাম। উঠতে উঠতে একসময় ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলাম। দিতেই বিমান মাধ্যাকর্ষণের টানে নীচে হু-হু করে নামতে লাগল। নামতে নামতে যখন দেখলাম বিমান অনেকখানি নীচে নেমে গেছে, তখন আবার ইঞ্জিন চালু করে দিলাম। বিমান আবার ওপরে উঠতে লাগল। আর ঠিক সেইসময় চোখে পড়ল বাজপাখির মতো একটা বিশাল মহাকাশযান আমার দিকে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসছে। আমি কেমন বিপদের গন্ধ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ডিগবাজি খাওয়ার খেলা বন্ধ করে নীচে নেমে আসার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুটা নামতে না নামতে ঐ বিশাল মহাকাশযান আমার কাছে নিমেষে চলে এল। এবং একটা অদ্ভুত কান্ড ঘটে গেল। দেখলাম ঐ বিশাল মহাকাশযান একটা বিশাল হাঁ করল। আর সেই বিশাল হাঁর মধ্যে আমার ছোট্ট বিমান প্রায় ফড়িংয়ের মতো ঢুকে গেল। তারপর আমি কিছু দেখতে পেলাম না। শুধু বুঝতে পারলাম একটা অন্ধকার গুহার মধ্যে যেন আটকে পড়েছি। আমার আর বেরুবার উপায় নেই। ঠিক এই অবস্থায় কতক্ষণ কাটল তা বলতে পারব না। একসময় শুধু একটা ঝাঁকুনি অনুভব করলাম। করার পরেই দেখলাম ঐ বিশাল মহাকাশযান আমাকে তার পেট থেকে বাইরে একটা খোলা জায়গায় উগরে দিল। আমি বাইরে বেরিয়ে এসে চারদিকে তাকালাম। দু'চারজন লোক চোখে পড়ল। আমি তাদের চিনি না। তাদের মধ্যে একজন আমাকে ইশারায় নেমে আসতে বলল। বিমানের ইঞ্জিন বন্ধ হয়েছিল। আমি তা ফের চালু করে উড়ে পালাবার বৃথা চেষ্টা করলাম না। না করে বাধ্য ছেলের মতো মাটিতে নেমে এলাম। সেই একজন আমার সঙ্গে করমর্দন করে পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি স্বদেশ রায়?"

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কে?'

লোকটি বলল, "আমার নাম পিংকাশ গুহ। আপনাকে বিশেষ প্রয়োজনে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।"

"কী প্রয়োজনে?"

"পরে বলছি। এখন চলুন একটু বিশ্রাম করবেন।" বলে পিংকাশ গুহ আমাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে লাগল। আমি তার সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে নানা কথা ভাবতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম, কে এই পিংকাশ গুহ? কী করে? আমার কাছে কী চায়? তবে একটা কথা আমার বারবার মনে হতে লাগল, লোকটা বোধহয় সুবিধেজনক নয়।

হাঁটতে-হাঁটতে পিংকাশ গুহ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আপনি কোথায় এসেছেন তা জানেন?"

আমি উত্তর দিলাম, "কী করে জানব?"

পিংকাশ গুহ হাসতে হাসতে বলল, "আপনি এসেছেন নিপুয়া গ্রহে।"

আমি রীতিমত চমকে উঠলাম, "নিপুয়া!"

"হ্যাঁ, নিপুয়া। আর যে জায়গায় এখন আছেন এটা নিপুয়ার একটা ছোট্ট দ্বীপ।" আমি থমকে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে পিংকাশ গুহর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করলাম। আমার সোমেন গুপ্তর কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল নিপুয়া কথার অর্থ হল রাক্ষস। এই গ্রহের লোকসংখ্যা হুহু করে বেড়ে যাওয়ায় এখানকার অধিবাসীরা পাপন গ্রহ দখল করতে চাইছে। সোমেন গুপ্ত এই নিপুয়ার হাত থেকে পাপনকে বাঁচানোর জন্যে কদিন হল পাপন গ্রহে চলে গেছেন। সেখানে এখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে সম্মেলন চলছে। তাঁরা সকলেই নিপুয়াকে শায়েস্তা করবার জন্যে ভয়ংকর সব মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা করছেন। আর আমি কিনা এখন সেই পাপনের শত্রু নিপুয়ায় এসে হাজির। আমি ভিতরে ভিতরে ভীষণ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম। তবে তা বেশিক্ষণের জন্যে নয়। একটু পরেই আমার কেমন ভয় হতে লাগল। পিংকাশ গুহ এই গ্রহে কেন এসেছে তা আমি বেশ অনুমান করতে পারলাম।

একটু পরে আমরা একটা ডাক-বাংলো ধরনের বাড়ির সামনে এসে হাজির হলাম। আমরা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলাম। পিংকাশ গুহ ডানদিকের একটা ঘরে ঢুকল। আমিও পিছন পিছন সেই ঘরে ঢুকলাম। গোটা ঘর সোফা দিয়ে সাজানো। পিংকাশ গুহ বলল, "বসুন।" আমি তার মুখোমুখি বসলাম।

বসেই পিংকাশ গুহ কোন ভণিতা না করেই বলল, "এবার কাজের কথায় আসা যাক।"

বললাম, "বলুন।"

পিংকাশ গুহ বলল, "আমরা জেনেছি আপনি সোমেন গুপ্তর বিশেষ পরিচিত।"
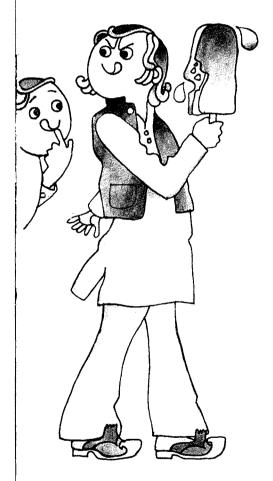
সঙ্গে সঙ্গে আমি বাধা দিলাম। বললাম, "বিশেষ পরিচিত নই। সোমেন গুপ্তর সঙ্গে আমার খুব সামান্য পরিচয়।"

পিংকাশ গুহ একটু থেমে কী যেন ভেবে নিয়ে বলল, "ওতেই চলবে। এখন যা বলছি তা মন দিয়ে শুনুন। আপনাকে আমাদের অর্থাৎ নিপুয়া গ্রহের হয়ে একটা সামান্য কাজ করতে হবে। সে কাজ যদি আপনি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে পারেন তাহলে আপনি পৃথিবীতে ফিরে অতুল ঐশ্বর্য লাভ করবেন। আর যদি বিশ্বাসঘাতকতা করেন তাহলে আপনাকে মহাশূন্যে নিক্ষেপ করা হবে।"

এই পর্যন্ত বলে পিংকাশ গুহ একটু থামল। থেমে আমার প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্যে আমার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

আমি যথাসম্ভব ভয় গোপন করে খুব সহজভাবে জিজ্ঞেস করলাম, "কী করতে হবে আমাকে?"

পিংকাশ গুহ বলতে শুরু করল, "আপনি হয়তো জানেন আমাদের কাছেই একটা গ্রহ আছে, তার নাম পাপন। এখন এই পাপনের সঙ্গে নিপুয়ার যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছে! কারণ, নিপুয়ায় যে হারে লোকসংখ্যা বাড়ছে তাতে আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে শোবার জায়গা দূরে থাক মানুষের দাঁড়ানোর জায়গা পর্যন্ত থাকবে না। তাই নিপুয়াকে বাঁচতে হলে পাপন দখল করতে হবে। কিন্তু দখল করতে চাইলেই কোনো জায়গা দখল করা যায় না। কেউই মুখ বুঁজে শান্ত ছেলের মতো নিজের জায়গা অপরকে ছেড়ে দেয় না। পাপনের অধিবাসীরাও দেবে না। তারা ইতিমধ্যে পৃথিবী থেকে সোমেন গুপ্ত এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে সম্মেলন শুরু করে দিয়েছে। আমরা খবর পেয়েছি তারা ভয়ংকর সব মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের কথা ভাবছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া দরকার যে, নিপুয়ার লোকেরাও পিছিয়ে নেই। তারাও পৃথিবী থেকে সোমেন গুপ্তর চিরশত্রু পিংকাশ গুহকে অর্থাৎ এই অধমকে এবং এই অধমের অনুগামীদের এখানে ডেকে নিয়ে এসেছে। আমার কাজ এখন সোমেন গুপ্তকে শায়েস্তা করা। না, আমরা তাঁকে হত্যা করতে চাই না। আমরা চাই সোমেন গুপ্তর প্রতিভাকে যেন পাপনের অধিবাসীরা কাজে লাগাতে না পারে। এই কাজটুকু করে দেওয়ার জন্যে এই ছোট্ট দ্বীপটি নিপুয়ার অধিবাসীরা আমাদের ছেড়ে দিয়েছে।"

আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম, "তা আপনারা সোমেন গুপ্তকে নিয়ে কী করবেন বলে ভেবেছেন?"

পিংকাশ গুহ বলল, "আমরা তাকে এই দ্বীপে বন্দী করে রাখতে চাই। আর আপনাকে সেই কাজটা করতে হবে।"

আমি চমকে উঠলাম। বললাম, "কী বলছেন আপনি? সোমেন গুপ্ত আমার পরিচিত। আমি কী করে তাঁকে বন্দী করব?"

পিংকাশ গুহ হেসে বলল, "আপনিই তাঁকে বন্দী করে আনবেন। আপনি তাঁর পরিচিত বলেই আপনার পক্ষে কাজটা করা খুব সহজ। কারণ, আপনি যা বলবেন তিনি তা বিশ্বাস করবেন। আমরা সেই সুযোগটুকু শুধু ব্যবহার করব। আপনি কোনো আপত্তি করবেন না। কারণ আপনাকে পৃথিবী থেকে এখানে আনা হয়েছে আপনার আপত্তি শোনার জন্য নয়। আমরা আপনাকে যা বলব আপনি সেইমতো কাজ করবেন। বুঝেছেন?"

আমি পরিস্থিতি বুঝতে পেরে বাধ্য হয়ে বললাম, "হ্যাঁ।" তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, সোমেন গুপ্ত কি জানেন যে আপনি এখন নিপুয়ার হয়ে পাপনের বিরুদ্ধে কাজ করছেন?"

"নিশ্চয়।"
"তাহলে তিনি তো সবসময় আপনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সতর্ক থাকবেন।"
"থাকবেন কেন? বলুন আছেন। তিনি খুবই সতর্ক হয়ে পাপনে আছেন। আমরা সমস্ত খবর পাচ্ছি।"
"কী করে পাচ্ছেন?"
"ওখানে আমাদের গুপ্তচর আছে, সে-ই সব খবর আমাদের পাঠাচ্ছে।"
আমি এই কথার উত্তরে আর কিছু না বলে চুপ করে রইলাম। একটু পরে শুধু জিজ্ঞেস করলাম, "আমাকে কি এখনি পাপনে গিয়ে সোমেন গুপ্তকে বন্দী করে আনতে হবে?"
পিংকাশ গুহ আমার এই প্রশ্নে সামান্য হেসে বলল, "না, এখন নয়, কাল সকালে।"
আমি এর মধ্যে রহস্য আছে অনুমান করে জিজ্ঞেস করলাম, "কেন? কাল সকালে কেন?"
"কারণ সকাল ছাড়া সোমেন গুপ্তর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। সারাদিন তিনি নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন। কারোর সঙ্গে তিনি তখন দেখা করেন না। একমাত্র সকালেই তাঁর দেখা পাওয়া যায়। তিনি প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে ছোট বিমানে করে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে আসেন। এবং বিশেষ একটি জায়গায় ঘন্টাখানেক চুপচাপ বসে থাকেন। তাঁর সঙ্গে সবসময় দুজন দেহরক্ষী থাকে। তবে এইসময় তারা তাঁর কাছে আসে না। আসার নিয়ম নেই। তারা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। কেবলমাত্র তাঁর নির্দেশ পেলেই তারা ছুটে আসে। এই সুযোগটাই আমরা ব্যবহার করতে চাই।"
"কী ভাবে ব্যবহার করবেন?"
ঠিক ঐ সময় আমরা আপনাকে সোমেন গুপ্তর কাছে পাঠাব। আপনি তাঁর সামনে হাজির হয়ে বলবেন, "পৃথিবী অন্য এক গ্রহের দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত। আপনি এখন শিগগির পৃথিবীতে চলুন। আপনি ছাড়া পৃথিবীকে বাঁচানোর কেউ নেই। এই বলে তাঁকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমাদের মহাকাশযানে কোনোরকমে ওঠাবেন। তারপর আপনার ছুটি। আপনাকে আর কিছু করতে হবে না। যা করবার আমরাই করব।"
"আমার কথা কি তিনি বিশ্বাস করবেন?"
"নিশ্চয় করবেন। আপনি তাঁর শুধু পরিচিত নন, আপনি তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন। আপনার কথা তিনি অবিশ্বাস করতে পারবেন না। পারবেন না বলেই আমরা আপনাকে দিয়েই এই কাজটা করাতে চাই।"
কথাটা শুনে আমি মনে মনে হাসলাম। মুখে বললাম, "বেশ, তাই হবে।"
"হ্যাঁ, তাই যেন হয়। মনে রাখবেন এর এদিক-ওদিক হলে আপনাকে রক্ষা করার কেউ থাকবে না।" বলে পিংকাশ গুহ উঠে দাঁড়াল। তারপর গলার স্বর কোমল করে বলল, "এখন স্নান করে খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করুন। বিকেলে আমি লোক পাঠাব। সে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। আপনার কোন অসুবিধে হবে না। হলে বলবেন।"
"আচ্ছা।"
"আমি চলি তাহলে। আপনার সঙ্গে আমার আজ আর দেখা হবে না। কাল পাপন থেকে ফিরে আসার পর আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে।" বলে পিংকাশ গুহ ঘরের বাইরে বেরিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল। বলল, "কাল আমি যেন আপনাকে একা না দেখি। সঙ্গে সোমেন গুপ্তকেও দেখি।"
"তা এখনি কী করে বলব!"
"না, না, ও কথা বলবেন না। সোমেন গুপ্তকে আমাদের সামনে যে করেই হোক এনে দিতেই হবে। মনে রাখবেন এর বিনিময়ে এমন ঐশ্বর্য লাভ করবেন যা চোদ্দ পুরুষ ধরে বসে খেলেও শেষ হবে না।"
আমি এর উত্তরে চুপ করে বসে রইলাম। পিংকাশ গুহও আর কিছু বলল না। চলে গেল। ফলে আমি কিছুক্ষণ একা রইলাম। নানা ভাবনা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। থেকে থেকে পৃথিবীর কথা ভেবে কষ্ট হতে লাগল। কিন্তু কষ্ট হলেও আমার আপাতত করার কিছু নেই।
একটু পরে আর একজন বাঙালি এল। বুঝলাম এখানে সবাই বাঙালি। সে আমাকে স্নানের ঘর, খাবার ঘর শোবার ঘর দেখিয়ে দিল। আমি স্নান করে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম আসতে দেরি হল না। ঘুম যখন ভাঙল তখন রোদ পড়ে গেছে। বিকেল হয়ে এসেছে।
একজন এইসময় ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, "চা খাবেন?"
"দাও।"
লোকটা চলে গেল। আমি চোখেমুখে জল দিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। ফিরে এসে বসতে না বসতেই চা চলে এল। তারপর চা শেষ করতে না করতেই একজন সুদর্শন যুবক ঘরে ঢুকল। ঢুকেই বলল, "পিংকাশ গুহ আমাকে পাঠিয়েছেন।"
"কেন?"
"আপনাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে।"
"ওহ্!" বলেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। তারপর তার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বেরিয়ে এসে হাঁটতে হাঁটতে আমরা সমুদ্রের ধারে এলাম। সেখানে বসলাম কিছুক্ষণ। নিপুয়া সম্পর্কে নানা কথা তাকে জিজ্ঞেস করলাম। সে বিশেষ কিছুই বলতে পারল না। কারণ এই দ্বীপের বাইরে সে কোথাও কোনদিন যায়নি।
দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে এল। আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। যুবকটির সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ গল্প করলাম। তারপর রাত বাড়তেই সে চলে গেল। আমিও খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লাম।
সকালবেলা একজন এসে আমার ঘুম ভাঙাল। সে বলল, "তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন।"
আমি হাতমুখ ধুয়ে চা খেয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম।
সে বলল, "এবার আসুন আমার সঙ্গে।"
আমি তার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আসতেই দেখি দূরে আমার জন্যে একটা ছোট মহাকাশযান দাঁড়িয়ে আছে। আমি হাঁটতে হাঁটতে তাতে গিয়ে উঠলাম। লোকটাও উঠল। তারপর মুহূর্তের মধ্যে মহাকাশযান মাটি ছেড়ে মহাশূন্যে ছুটতে লাগল।
প্রায় আধ ঘন্টা পরে মহাকাশযান একটা জায়গায় এসে নামল। আমার সঙ্গী বলল, "আপনি এখানে নেমে যান। একটু দূরেই সোমেন গুপ্ত বসে আছেন। আপনি তাঁকে এখানে ডেকে নিয়ে আসুন।"
আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি যাবেন না?"
"না। আমি এখানে থাকব।"
আমি আর কথা না বাড়িয়ে মহাকাশযান থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বেরিয়ে এসে সমুদ্র চোখে পড়ল। নানা গাছ-পালা চোখে পড়ল। জায়গাটা আমার বেশ ভাল লাগল। আমি আস্তে-আস্তে সামনের দিকে এগোতে লাগলাম। এগোতে এগোতে চোখে পড়ল দূরে কে একজন বালির ওপর চুপচাপ বসে আছে। আর একটু এগোতেই তাঁকে চিনতে পারলাম। হ্যাঁ, ইনিই সোমেন গুপ্ত।
আমি আস্তে আস্তে সোমেন গুপ্তর কাছে গিয়ে হাজির হলাম। সোমেন গুপ্ত আমাকে দেখেই চমকে উঠলেন, "তুমি!"
আমি তাঁর পাশে বসে আস্তে-আস্তে সব কথা খুলে

বললাম। তিনি মন দিয়ে সব শুনে বললেন, "পিংকাশের শয়তানি এখনো বন্ধ হয়নি দেখছি। ও এর আগেও কয়েকবার আমাকে এখান থেকে নিপুয়ায় তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কোনোবারেই সফল না হয়ে এখন তোমাকে ধরেছে।"

আমি বললাম, "আমার এখন কী করা উচিত বলুন।"

"আমি বলি, তুমি এখন পিংকাশের কাছে ফিরে যাও। গিয়ে বলো সোমেন গুপ্তকে বন্দী করলেও নিপুয়াকে বাঁচানো যাবে না। কারণ ইতিমধ্যে এমন একটি অস্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে যাতে নিপুয়া মহাশূন্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সুতরাং ও যেন তার আগে ভালয়-ভালয় দেশে ফিরে যায়, এখানে বসে সময় নষ্ট না করে।"

"কিন্তু আমার কী হবে? পিংকাশ শাসিয়েছে আপনাকে সঙ্গে করে নিপুয়ায় না নিয়ে যেতে পারলে, আমাকে মহাশূন্যে নিক্ষেপ করবে।"

সোমেন গুপ্ত আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "আমি থাকতে তোমার কোনো ভয় নেই। পিংকাশকে বোলো তোমার গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগলে তার ফল ভয়াবহ হবে।"

আমি এই আশ্বাস পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সোমেন গুপ্তও উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে বললেন, "এই সঙ্গে পিংকাশকে বোলো ও যেন এই মুহূর্তে তোমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়। যেন দেরি না করে।" তারপর একটু থেমে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। পিংকাশ আমাকে ভয় করে। আমি জীবিত থাকতে ও তোমার কোন ক্ষতি করতে সাহস পাবে না।"

আমি এবার প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করলাম, "কলকাতায় কবে ফিরবেন?"

"এখনো দেরি আছে।"

"কত দেরি আছে?"

"তা বলতে পারব না।"

আমি তখন একটু থেমে তাঁর কাছে থেকে বিদায় নিয়ে বললাম, "চলি তাহলে।"

সোমেন গুপ্ত বললেন, "এসো।"

আমি আবার হাঁটতে-হাঁটতে মহাকাশযানে গিয়ে উঠলাম। আমার সঙ্গী জিজ্ঞেস করল, "সোমেন গুপ্ত আসবেন না?"

"না।"

"সে কী! ওঁকে তো সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার কথা।"

"কিন্তু উনি না এলে আমি কী করব?"

"কী বললেন উনি?"

"উনি বললেন পৃথিবী এখন ধ্বংস হয়ে গেলেও ওঁর কিছু করার নেই। উনি এখন পাপন ছেড়ে কোথাও যেতে পারবেন না।"

কথাটা শুনে আমার সঙ্গী আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। না করে মহাকাশযান নিয়ে ওপরে উঠল। একটু পরেই আমরা নিপুয়ায় এসে নামলাম। পিংকাশ গুহ আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখেই কঠিন গলায় বলল, "আপনি কি নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবেন?"

আমি কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, "এ কথা বলছেন কেন?"

"জানতে চান?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে আসুন আমার সঙ্গে।" বলে পিংকাশ গুহ আমাকে সেই ডাক-বাংলোয় নিয়ে গেল। সেখানে একটা ঘর অন্ধকার করে বলল, "সামনের দিকে তাকান।" আমি সামনের দিকে তাকাতেই চমকে উঠলাম। হতবাক হয়ে দেখলাম একটা সাদা পর্দার ওপর আমার আর সোমেন গুপ্তর ছবি ফুটে উঠল। শুধু তাই নয়, আমাদের যেসব কথাবার্তা হয়েছে তাও শুনতে পেলাম। বুঝতে পারলাম বৈজ্ঞানিক হিসেবে পিংকাশ গুহও অত্যন্ত প্রতিভাবান।

ছবি দেখানো শেষ হলে পিংকাশ গুহ জিজ্ঞেস করল, "এখন কী হওয়া উচিত আপনার?"

আমি হাসতে-হাসতে উত্তর দিলাম, "পৃথিবীতে এই মুহূর্তে ফেরত পাঠানো।"

"বেশ তাই হবে। তবে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে গিয়ে হাজির হতে পারবেন কি না তা বলতে পারব না।" বলে পিংকাশ গুহ কাকে ডেকে কী যেন বলল। বলার সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে ডাক-বাংলোর বাইরে নিয়ে গেল। নিয়ে গিয়ে একটা বিরাট মহাকাশযানের ভিতর ঢুকিয়ে পিছন দিকে ঠেলে দিল। আমি একটা চৌকো খাঁচার মধ্যে আটকে পড়লাম বলে মনে হল। তারপর বিশেষ কিছুই জানতে পারলাম না। শুধু টের পেলাম আমি মাটি ছেড়ে ক্রমশ ওপরে উঠছি। উঠতে উঠতে একসময় হঠাৎ একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল আমার। মনে হল আমি যেন মহাশূন্যে থেকে হু-হু করে নীচে নেমে চলেছি। আমার সারা গায়ে কাঁটা দিল। তারপর আর কিছু মনে নেই।

একসময় আমি চোখ খুলে তাকালাম। তাকাতেই দেখলাম আমি একটা বিছানায় শুয়ে আছি। আমার বিছানার পাশে চেয়ারে বসে আছেন সোমেন গুপ্ত। তাঁকে দেখেই জিজ্ঞেস করলাম, "আমি এখন কোথায়?"

সোমেন গুপ্ত বললেন, "তুমি এখন আমার বাড়িতে।"

"এখানে কীভাবে এলাম?

এবার সোমেন গুপ্ত একটু থেমে বলতে লাগলেন, "তোমাকে নিপুয়ায় পাঠিয়ে দেবার পর মনে হল আমি মস্ত ভুল করেছি। মনে হল তোমাকে পিংকাশের কাছে ফেরত না পাঠালেই হত। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। তাই কেবলি ভাবতে লাগলাম এখন কী করা যায়। বাড়ি ফিরে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলাম। করতে করতে হঠাৎ আমার আকাশের দিকে চোখ গেল। দেখলাম একটা মহাকাশযান তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার কেমন সন্দেহ হল। মনে হল ওর মধ্যে তুমি হয়তো আছ। ওরা হয়তো তোমাকে মহাশূন্যে নিক্ষেপ করতে নিয়ে চলেছে।"

এই পর্যন্ত বলে সোমেন গুপ্ত একটু থামলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর?"

সোমেন গুপ্ত আবার শুরু করলেন, "আমি আর এক মুহূর্ত দেরি না করে একটা বিশাল মহাকাশযান নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এই মহাকাশযানগুলো মহাশূন্যে ধাবমান কোনো বস্তুকে অর্থাৎ ইচ্ছে করলে একটা বিমানকে পর্যন্ত পাখির মতো ছোঁ মেরে তার পেটের ভিতর ভরে নিতে পারে। যাই হোক আমি আমার মহাকাশযান নিয়ে ঐ মহাকাশযানের পিছনে ধাওয়া করলাম। ধাওয়া করার একটু পরেই দেখলাম ঐ মহাকাশ-যান থেকে কী একটা হঠাৎ খসে পড়ল। আমিও আর সময় নষ্ট না করে মহাকাশযানের গতি বাড়িয়ে ওটাকে মুখের মধ্যে ভরে নিলাম। তুমি ওর মধ্যেই ভরা ছিলে।"

"তারপর?"

"তারপর তোমাকে নিয়ে আর পাপনে ফিরে গেলাম না। সোজা পৃথিবীতে চলে এলাম।"

আমি সোমেন গুপ্তকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা খুঁজে পেলাম না। না পেয়ে তাঁর মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে রইলাম।

ছবি সুনীল শীল

কী করে নম্বর বাড়াতে হয়

বাংলার হেড এগজামিনার জানাচ্ছেন

আবার মনে করিয়ে দিই, শুধু ভাল ছেলেদের কথা ভেবে এ-সব কথা আমরা বলছি না। ভাল ছেলে হিসেবে যারা প্রচুর পড়াশোনা করে, অজস্র লেখে, বাড়ির বা স্কুলের মাস্টার মশাইদের দিয়ে শুদ্ধ করিয়ে নেয়, আবার লেখে, তারা তো জানেই তারা ভাল ছেলে, লোকে এবং বাবা-মা ভাই-বোন তাদের কাছে প্রত্যাশা নিয়ে থাকে; সেই প্রত্যাশার মাপে তাদের তৈরি হতে এবং সফল হতে হবে। সেজন্য তাদের ভাবনা এবং পরিশ্রমের শেষ নেই, লক্ষ্য তাদের কাছে খুবই স্পষ্ট। তারা নিজেরাই খেটেখুটে এক-একটা 'মেথড' তৈরি করে ফেলে এবং সেই অনুযায়ী প্রস্তুত হয়। তাদের নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা নেই।

দুশ্চিন্তা তোমাদেরই জন্য যারা নিজেদের 'ভাল' ছেলে (বা মেয়ে) বলে মনে করছ না। তারা কি এই দৈন্যবোধ নিয়ে বসে থাকবে, আরেকটু ভাল করার কোনো চেষ্টাই করবে না? আমরা এমন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না যে, এ-লেখা পড়ে তৈরি হলেই মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করবে সকলে, খবরের-কাগজে নাম বা ছবি ছাপা হবে। কিন্তু যদি সব কথা মানো, তাহলে এক-একটা পেপারে সাত-আটটা নম্বর বাড়ানো কিছুই না—এটা গ্যারান্টি। আর তখন সব-কটা পেপার মিলিয়ে বাড়তি নম্বর কত দাঁড়ায়?

আগেও বলেছি, বিষয় হিসেবে বাংলা এখন আর ফ্যালনা নয়—দু'পেপারে সব চেয়ে বেশি নম্বর বাংলায়। আগে বাংলা শুনলেই সেই সব 'অ-ভাল' ছেলে-মেয়েরা চোখ উলটে আকাশের দিকে দু-হাত তুলে দিত, কী হবে বাংলার পিছনে খেটে! বাংলায় নম্বর বাড়ানো কঠিন। এখন তো আর সে-অবস্থা নেই। এখন অবজেকটিভ কোশ্চেন হয়েছে, অনুবাদে বাঁকা-পিছু নম্বর দেওয়া হচ্ছে। এমন-কী রচনাতেও বিস্তারিত পয়েন্ট করে রাস্তা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে (ব্যাপারটা আমার নিজের পছন্দ নয় যদিও)। এক ভাবার্থ বা ভাবসম্প্রসারণে নিজের খানিকটা এলেম দরকার, কিন্তু কবিতার তো প্রায়ই 'কমন' আসে। রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র কিছু কবিতা ক্লাসেই তৈরি করা থাকে—তা থেকে এসেও যায় কখনো কখনো—যেমন এবার এসেছে।

কীভাবে তৈরি হবে/পাঠ্যবই না-পড়লেই নয়

পুরনো কথাই আবার মনে করিয়ে দিতে হয়, নম্বর বাড়ানোর জন্য পাঠ্যবইয়ের চাইতে বড় ওষুধ আর নেই। বিশ্বাস করো, তোমাদের বেশির ভাগ নম্বর কাটা যায় 'টু দা পয়েন্ট' উত্তর তোমরা লেখো না বলে। বেশির ভাগ অবজেকটিভ প্রশ্নে উদ্ধৃতি দিয়ে এই জিনিসগুলি চাওয়া হয়:

ক। লেখক কে?
খ। বক্তা কে? শ্রোতা বা উদ্দিষ্ট কে?
গ। কেন কী প্রসঙ্গে, কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?
ঘ। কোনো বিশেষ শব্দের বা শব্দগুচ্ছের অর্থ কী?
ঙ। গদ্যাংশ বা পদ্যাংশের নাম কী?
চ। এই সঙ্গে আর কী-কী বলা হয়েছিল?
ছ। এই কথা থেকে চরিত্রটির কী চেহারা পাই? যার সম্পর্কে বলা হল তার চরিত্রই বা কীরকম?
জ। এর উত্তরে কী বলা হল? ইত্যাদি।

সব প্রশ্নেই যে উপরের সব খবর জানতে চাওয়া হয় তা নয়, কিন্তু তোমাদের খুব উচিত হবে সবগুলিই সমান গুরুত্ব দিয়ে জেনে রাখা। লেখকের নামের গণ্ডগোলে নম্বরটি তো সুনিশ্চিত কাটা যাবে। এবার ছেলে-মেয়েরা 'হিমালয় ভ্রমণ'-এর লেখক বানিয়েছে রবীন্দ্রনাথকে, 'লুই পাস্তুর'-এর লেখকের নাম তাদের হাতে দাঁড়িয়েছে কখনো চারুচন্দ্র অধিকারী, কখনো চারু দাস। অন্তত এটুকু যারা জানবে না, পাস করার অধিকার তাদের কী করে জন্মাবে?

আবার লেখক আর বক্তাও তো সব সময় এক নয়। এটা গুলিয়ে ফেললেও বিপদ। 'সাগর সঙ্গমে নবকুমার' অংশে 'তুমি অধম বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন'—এটা লেখক অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য। বহু ছেলেমেয়ে লিখেছে এটা নবকুমারের উক্তি। কী করে নম্বর দিই তাদের?

ওদিকে 'লুই পাস্তুর' থেকে ১৮৮১ সালের একটি বিশেষ দিন 'স্মরণীয়' কেন, তা জানতে চাওয়া হয়েছে—অর্থাৎ 'স্মরণীয় দিন' কথাটির মূল অর্থ লিখতে বলা হয়েছে। উত্তর হবে এই যে, ঐ দিনে জলাতঙ্ক-প্রতিষেধক সিরামের সফল প্রয়োগ হল। কিন্তু দু-একজন ব্যতিক্রম ছাড়া সবাই জলাতঙ্ক রোগ কী ইত্যাদি লিখেছে সাতকাহন করে।

এইসব বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বলি, ক থেকে জ পর্যন্ত সমস্ত খবর নখদর্পণে রাখো, তন্নতন্ন করে পড়ো পাঠ্যবই।

উত্তরের ভাষা কেমন হবে

এর মধ্যে মাধ্যমিকে প্রথম-হওয়া ছেলেটির উত্তরের নমুনা হয়তো 'আনন্দমেলায়' দেখেছ। তার ভাষা খুব সুন্দর, তাতে কারিগরিও চমৎকার—কিন্তু আমি তোমাদের সকলের জন্য ঐ রকম ভাষা সুপারিশ করি না। সুললিত, কাব্যময় বা বুদ্ধিদীপ্ত কারুকার্যপূর্ণ ভাষা তৈরি করা সাধনার ব্যাপার—সেটা দু-পাঁচ মাসে হয় না। সে-রকম চেষ্টা করার বিপদও আছে—বেশি অলংকরণে আসল কথাটাই ভেস্তে যাবার ভয়। তোমরা সহজ কথায় বলার কথাটি বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করবে সকলের আগে।

এই সঙ্গে আবার মনে রাখবে, সাধু-চলিতের মধ্যে যেন গুলিয়ে না যায় ভাষা। দুঃখের সঙ্গে বলি, এবারেও শতকরা পঁচানব্বইজনের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। কেন এ-রকম হবে? উত্তর লিখে দেখিয়ে নাও না কাউকে দিয়ে। চলতি ভাষায় 'বলিয়া' 'হইবে' 'করিবে' যেমন চলবে না, তেমনই 'ইহা' 'উহা' 'তাঁহার'-ও অচল। মাস্টারমশায়ের কাছ থেকে ভাল করে জেনে নাও বিষয়টা।

অবান্তর কথা লিখবে না

আমি জানি, হলে বসে বানিয়ে রচনা বা ভাবসম্প্রসারণ লেখা খুব কঠিন কাজ। কিন্তু এটা তো লক্ষ করবে যা লিখছ তার অর্থ ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে কি না? অনেকে কথার তোড়ে আবোল-তাবোল লিখে যায়। যেমন 'সংবাদপত্র পাঠে আমাদের মন শক্ত হয়' 'বাংলার পল্লী তার বাসস্থান', 'সমাজ-জীবনে রেডিও আমাদের খুব উপকার করে'। হয়তো এর কোনো-কোনোটির খুব গভীর অর্থ আছে। কিন্তু আলোচনা থেকে

সে অর্থ বেরিয়ে আসেনি। একজন তো প্রদর্শনীর বিবরণ লিখতে গিয়ে 'প্রদর্শনী দেখা খুব ভাল' এই কথাটিকেই দেড় পাতা জুড়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে লিখেছে, যেমন, 'প্রদর্শনীতে আমাদের শিক্ষা হয়', 'উপকার হয়' 'অনেক অভিজ্ঞতা হয়'—এই রকম।

অন্যান্য জরুরি কথা

১। ব্যাকরণ এবার ভাল হয়নি, মানে প্যাটার্ন অনুযায়ী আসেনি। তবু প্রত্যয়, বিশেষত বাংলা প্রত্যয়, সমাস, বাচ্য-পরিবর্তন, এক কথায় প্রকাশ ইত্যাদি ভাল করে করো।

২। বানান ভুল সম্বন্ধে—হ্রস্ব-ই/দীর্ঘ-ঈ, হ্রস্ব-উ/দীর্ঘ-ঊ, দন্ত্য-ন/মূর্ধ্য-ণ, শ, স, ষ এগুলি সম্বন্ধে বিশেষ খেয়াল রাখো। মনে রাখবে বানান ভুল-পিছু ½ নম্বর কাটা যায়, বাক্য-রচনায় বানান ভুল হলে কাটবে ½ করে। মোট নম্বরের চার ভাগের এক ভাগই বানান ভুল খেয়ে নিতে পারে।

৩। উপরে, নীচে ও বাঁয়ে অনেকটা মার্জিন দিয়ে উত্তর লিখতে অভ্যাস করো। দুটো আলাদা প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে প্রচুর জায়গা রাখো। এতে কাগজ একটু বেশি খরচা হবে, কিন্তু পরীক্ষার খাতায় তোমাকে তার জন্য বেশি পয়সা দিতে হচ্ছে কি?

এতক্ষণ যা-যা বললাম তা যদি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করো, তবে বেশ কিছু বাড়তি নম্বর আটকায় কে!

ইংরেজির (দ্বিতীয় ভাষা) হেড এগজামিনার জানাচ্ছেন

নতুন পাঠক্রম অনুসারে পর-পর পাঁচ বছর পরীক্ষা হয়ে গেল। এই পাঁচ বছর ধরে ইংরেজির প্রশ্নগুলি দেখার ফলে প্রশ্নপত্রের ছক ও ধরন সম্পর্কে এখন আর তোমাদের মনে কোনোরকম অস্পষ্টতা বা ভীতি নেই নিশ্চয়। সুতরাং কী কৌশল অবলম্বন করলে নম্বর বাড়ানো যায়, সে-বিষয়েও নিশ্চিত ধারণা একটা গড়ে তুলেছ আশা করতে পারি। বলা বাহুল্য, ফাঁকি নয়, শ্রম ও নিষ্ঠার দ্বারাই যে এই কৌশল আয়ত্ত করা যায়, সে-কথা প্রতি বছরের বার্ষিক পরীক্ষার অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পেরেছ এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সেইভাবে প্রস্তুত হচ্ছ, ধরে নিতে পারি। তবু একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি যাতে এই পরীক্ষায় ভাল করার জন্য আরও একটু সচেষ্ট হতে পার।

প্রথমেই বলি: প্রশ্নপত্রের প্রারম্ভে যে কথাটি লেখা থাকে সেটি বিশেষভাবে খেয়াল করবে। উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ হলে 'special credit' পাবে। অর্থাৎ অনেক বেশি নম্বর পাবে। আবার হাতের লেখার অপরিচ্ছন্নতা ও বানানভুলের জন্য নম্বর কাটা যাবে। একদিকে যেমন বরাভয়, অন্যদিকে তেমনি সতর্কবাণী। পরীক্ষায় প্রস্তুতির জন্য কথাগুলি সযত্নে মনে রাখবে। কারণ এটা কথার কথা নয়। অক্ষরে-অক্ষরে সত্য।

ভাল ছাত্রছাত্রীদেরও দেখেছি উত্তর যথাযথ লেখার দিকে খেয়াল নেই। বেশি জানে, সুতরাং বেশি লিখবে। কিন্তু পরীক্ষক তো তা চান না। প্রশ্নে যা আছে তিনি সেইটুকুরই উত্তর চান। তার বেশি নয়, কমও নয়। পাঠ্যগ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন দ্বিতীয় ও চতুর্থ। এখানে প্রতিটি প্রশ্নের তিনটি অংশের উত্তর লেখার জন্য যে-রকম নির্দেশ থাকে, উত্তর তার মধ্যেই সীমায়িত রাখার চেষ্টা করতে হবে। ভাষার পরীক্ষায় শুধু বিষয়টি জানলেই হবে না, সেই জানাটুকু নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নির্ভুলভাবে প্রকাশের ক্ষমতা আছে কি না সেটাও পরীক্ষা করে দেখা হয়। সুতরাং টানা মুখস্থ-বিদ্যা এখানে অচল।

একটা কথা: পাঠ্যপুস্তক পুরনো ও নতুন দুরকম থাকায় প্রশ্নপত্র এখন দীর্ঘ হচ্ছে। কিন্তু তার জন্য তোমাদের সময় নষ্ট হবে না। পুরনো সিলেবাস (১৯৭৬-৭৭) ও নতুন সিলেবাস থেকে প্রশ্ন দুটি গ্রুপে (A ও B) পৃথকভাবে থাকে। তুমি নতুন সিলেবাসে পরীক্ষা দিলে শুধু সেই গ্রুপের প্রশ্নগুলি পড়ে উত্তর লিখতে শুরু করবে। পুরনো সিলেবাসের প্রশ্নগুলি পড়ার কোনো দরকারই নেই। তেমনি পুরনো সিলেবাসে যে পরীক্ষা দিচ্ছে, নতুন সিলেবাসের প্রশ্নগুলি সে পড়বে না। প্রথম চারটি প্রশ্নের ব্যাপারে এই গ্রুপ থাকছে। বাকি পাঁচ, ছয়, সাত নম্বরের প্রশ্নগুলি সব পরীক্ষার্থীর জন্য একই।

পাঠ্যপুস্তকের প্রথম প্রশ্ন (গদ্য থেকে) ও তৃতীয় প্রশ্ন (কবিতা থেকে) অবজেকটিভ টাইপের। এখানে উত্তর অনেক ক্ষেত্রেই একটি শব্দে। কিন্তু উত্তরটি পূর্ণ একটি বাক্যেই লিখবে। যেমন ধরো ১৯৮০ সনের প্রশ্ন: Group B: (a) শুধু 'foe' বা 'enemy' না লিখে The word 'foe' is opposite in meaning to 'friend' লিখতে হবে। ভাষার পরীক্ষায় Language Skill দেখা হয়। সুতরাং সব সময়েই সম্পূর্ণ বাক্যে উত্তর দিতে হয়। আর-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ঐ গ্রুপের 4 (a) (i) প্রশ্ন থেকে: Who is the speaker? উত্তরে কেউ লিখল: The widow is the speaker. অন্য একজন লিখল: The widow of a dead warrior in Tennyson's poem, "Home They Brought Her Warrior Dead", is the speaker. কোনটি ভাল উত্তর সহজেই বুঝতে পারছ, তাই না?

পাঠ্যগ্রন্থের চারটি প্রশ্নে মোট ৪০ নম্বর (গদ্যে ২৫ ও কবিতায় ১৫)। বাকি ৬০ নম্বর গ্রামার কম্পোজিশনে। পাঁচ নম্বর প্রশ্নে গ্রামার। পাঁচটি ভাগ। প্রতিটিতে ৩ নম্বর করে। ৫(ক) আর্টিকেল/প্রিপোজিশন দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ, (খ) পাংচুয়েশন: পংক্তিগুলি পাঠ্যপুস্তক থেকে উদ্ধৃত; সুতরাং পরিচিত, (গ) অর্থ অপরিবর্তিত রেখে বাক্যের রূপান্তর, (ঘ) ন্যারেশন চেঞ্জ, (ঙ) প্রদত্ত বাক্যে ফ্রেজ ইডিয়মের প্রয়োগ। গ্রামারে অঙ্কের মতো পুরো নম্বর সহজেই পেতে পারো। ছয় নম্বরের প্রশ্ন ট্রানস্লেশন। দুটি প্যাসেজ (৭+৮ নম্বর)। একটি কথ্য ভাষায় হলে অন্যটি সাধু ভাষায় থাকতে পারে। প্যাসেজ যাই থাক, ইংরেজি Syntax ও বাংলা পদবিন্যাসের পার্থক্য মনে রেখে ইংরেজি অনুবাদ যাতে যতদূর সম্ভব সাবলীল হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। সাত নম্বর প্রশ্নে প্যারাগ্রাফ, লেটার, সামারি ও কম্প্রিহেনশন টেস্ট (১০+৮+৭+৫ নম্বর)।

প্যারাগ্রাফ রাইটিং হচ্ছে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা। সাধারণত একশো কুড়িটি শব্দের মধ্যে লিখতে বলা হয়। কিন্তু এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায়ই মাত্রাজ্ঞান থাকে না। অনেক লেখে। একশো কুড়ির জায়গায় বড়জোর একশো পঁয়ত্রিশ চল্লিশটি শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। তার বেশি কিছুতেই নয়। কারণ তো আগেই বলেছি।

লেটারে অনেক সময়ে দেখা যায় ফর্ম সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সঠিক জ্ঞান নেই। হয়তো ভাই/বন্ধু/মা-বাবাকে কিংবা প্রধান শিক্ষক/খবরের-কাগজের সম্পাদক/মন্ত্রীকে চিঠি লিখতে বলা হয়েছে। সরকারি, আধা-সরকারি, ব্যক্তিগত ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের চিঠিতে ফর্ম কীরকম হবে সেগুলো ভালভাবে জেনে নিতে হবে। Dear Sir লিখতে গিয়ে Dear এক লাইনে এবং Sir আর-এক লাইনে কিংবা চিঠির শেষে Yours etc. লিখতে গিয়ে Your's লিখলে মারাত্মক ভুল হবে। ফর্ম ও কনটেন্ট দুই-এ মিলে পুরো ৮ নম্বর থাকে। চিঠির বিষয় যতগুলি শব্দের মধ্যে লেখার নির্দেশ থাকে, যথাসম্ভব সেটাই মেনে চলবে। সামারি

লেখার সময় প্রায়ই দেখা যায় মূল প্যাসেজের বাক্যগুলিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষার্থীরা লিখে থাকে। এতে নম্বর পাওয়া যায় না। প্যাসেজটি কয়েকবার ভাল করে পড়ে নিজের ইংরেজিতে (অবশ্যই ইংরেজি ভাষার নিয়ম অনুযায়ী) সংক্ষেপে মোটামুটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ভাবটি প্রকাশ করতে হবে। কম্প্রিহেনশন টেস্টে পুরো নম্বরই পাওয়া যায়। উত্তর তো দেওয়াই থাকে। প্যাসেজটির অর্থ ঠিকমত বুঝলে সঠিক উত্তর সহজেই বেছে নিতে পারবে।

সব শেষে আবার বলি, টেক্সট বুকের নির্দিষ্ট pieceগুলি খুব ভাল করে পড়তে হবে। শব্দগুলির অর্থ জানতে হবে। নইলে তার প্রতিশব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ, শব্দটি বিশেষ্য হলে বিশেষণে বা ক্রিয়াপদে তার প্রয়োগ কেমন হবে এ-সব জানা যাবে না। প্রশ্নে এ-সব তো থাকছে। বানান সম্পর্কে কিন্তু বিশেষ সাবধান। যে-সব বানান সম্পর্কে মনে খটকা লাগে, সেগুলো কয়েকবার করে লিখবে। একটি বেশ ভাল উত্তরপত্রের কথা বলি। চারটি বানান ভুল ছিল। অতি সাধারণ বানান। যেমন writer (দুটো 't' লিখেছিল), absence ('c' এর জায়গায় 's' লিখেছিল), roadside (rode লিখেছিল), disease (শেষের 'e'-টা দেয়নি)। বুঝতেই পারছ, এ-ভুলের মাশুল তাকে দিতে হয়েছে। তাই তো তোমাদের বারবার বলছি সাধারণ বানান-ভুল যেন না হয়।

শেষের পরে পুনশ্চঃ সময়মতো সব লেখা শেষ করে উত্তর-পত্রটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একবার ভাল করে রিভাইজ করবে। তাড়াতাড়িতে যে-সব ছোটখাট ভুলচুক হয়, সেগুলির সংশোধন তাহলে সহজেই হয়ে যাবে। নম্বরও ভাল উঠবে।

সংস্কৃতের হেড এগজামিনার জানাচ্ছেন

ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী ভাষা সংস্কৃত। তোমাদের মধ্যে এই ভাষার প্রতি ভীতিই পরীক্ষায় প্রচুর নম্বর তোলার পক্ষে বাধাস্বরূপ। অথচ এই ভাষা বিজ্ঞানসম্মত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে বিজ্ঞান আমাদের সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত। কিন্তু ভাবতেও অবাক লাগে যে, সেই সুপ্রাচীন যুগেও ভাষাকে বিজ্ঞানসম্মত রীতিতে পাণিনি প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন। সংস্কৃত নিয়মবদ্ধ ভাষা, শেখা খুবই সহজ, আর পরীক্ষায় নম্বরও বেশি তোলা যায়। ধরো, বাক্যটি যদি বলি, 'সে পুস্তক পড়িতেছে', বাক্যটির কর্তা 'সে'। কর্তার পুরুষ, বচন, বিভক্তি কী হবে? সংস্কৃতের নিয়মানুযায়ী—প্রথমপুরুষ, একবচন, প্রথমা বিভক্তি। সুতরাং সেই অনুযায়ী 'সে' অর্থাৎ 'তদ্'শব্দের রূপ হল সঃ। ক্রিয়া 'পড়িতেছে'। সংস্কৃতে কর্তৃবাচ্যে কর্তানুযায়ী ক্রিয়া—প্রথমপুরুষ, একবচন। কাল হল বর্তমান। অতএব পঠ্ ধাতুর রূপ হল—'পঠতি'। কী পড়িতেছে? পুস্তক। ব্যাকরণ অনুযায়ী পুস্তক হল কর্মকারক। সুতরাং পুস্তক শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে রূপ হল—পুস্তকম্। অতএব বাক্যটি অনূদিত হয়ে দাঁড়াল 'সঃ পুস্তকম্ পঠতি।' এইভাবে যদি ভাষার নিয়ম জানা থাকে তবে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করা সহজ। আর বাক্যটি ছোট ছোট বাক্যে পরিণত করে যদি নির্ভুল অনুবাদ করা যায় তবে নম্বর পুরো পেতে অসুবিধা হয় না।

দ্বিতীয় অনুবাদ হল সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করা। বাক্যটিকে প্রথমে সন্ধি ভেঙে কয়েকবার পড়লে কিছু অর্থ বোঝা যাবে। তারপর বাক্যটির সমাপিকা ক্রিয়া ও তার কর্তা নির্ধারণ করলে অর্থটি সহজেই পরিস্ফুট হবে। তখন বাক্যটি সাজিয়ে অনুবাদ করে স্বচ্ছন্দ ভাষায় প্রকাশ করলেই ভাল নম্বর উঠতে পারে।

অতঃপর ব্যাকরণগত প্রশ্ন—শব্দরূপ ও ধাতুরূপ। এগুলি বাড়িতে বারবার মুখস্থ করলে এরও বিজ্ঞানসম্মত রূপটি ধরা পড়ে। সুবন্ত, তিঙন্ত প্রকরণের বৈশিষ্ট্য সহজেই বোধগম্য হয়। তখন অনুস্বর-বিসর্গ-হসন্ত নিয়ে কোথাও গোলমাল বাধে না। উপরন্তু, মুখস্থ করার পর বারবার লিখলে ক্রমশ নির্ভুল হতে থাকবে এবং নম্বরও পুরো উঠবে।

ছকে-বাঁধা প্রশ্নে কতকগুলি জানা প্রশ্ন পড়ে। যেমন দুটি অব্যয় দিয়ে বাক্য গঠন। অব্যয়ের অধ্যায় ভাল করে পড়ে অর্থ জানা থাকলেই দুটি ছোট নির্ভুল বাক্যে প্রয়োগ করতে পারো। তাতে পূর্ণ নম্বর।

তারপর 'Comprehension Test'গল্পাংশটি লিখে দেওয়া থাকে। বারংবার পড়ে অর্থ করলেই প্রতি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব। আর বেশি নম্বর পেতে হলে উত্তরপত্রে বাক্যগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে।

আর একটি পরিচিত প্রশ্ন—সূক্তিরত্নাবলী থেকে দুটি শ্লোক মুখস্থ। সূক্তিরত্নাবলী থেকে প্রথম দশটি শ্লোক বারবার পড়ে সন্ধি না ভেঙে পুস্তকানুযায়ী যথাযথ লেখার অভ্যাস করলে পুরো নম্বর তোলার সুবিধা। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে সন্ধি ভেঙে লিখলে পুরো নম্বর পাওয়া যায় না, তবে বাংলা অক্ষরে লিখলেও চলবে।

বহুজনবিদিত একটি প্রশ্ন হল পাঠ্যপুস্তকগত অনুবাদ। এক্ষেত্রে যেটি করণীয় তা হল পাঠ্যাংশগুলির সন্ধি-সমাস ভেঙে ব্যুৎপত্তিগত অর্থগুলি ভাল করে বুঝে নিতে হবে; তবে অনুবাদ করতে অসুবিধা হবে না। এক্ষেত্রে পুরো নম্বর পাওয়া যায় যদি অনুবাদে কোনো শব্দার্থ বাদ না পড়ে এবং অনুবাদটিতে নির্ভুল বানান থাকে এবং সর্বোপরি সম্পূর্ণ লেখাটি স্বচ্ছন্দ হয়।

পাঠ্যপুস্তকগত অপর প্রশ্নটি হল—কে-কবে-কেন-কোথায়-কী—এইসব প্রশ্নের উত্তর। উত্তরগুলির মান, প্রশ্নের পাশেই লেখা থাকে। অতএব উত্তর কতখানি লিখতে হবে তা সুনির্দিষ্ট। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে বেশি নম্বর পেতে হলে গল্পটির নাম, বক্তার বা শ্রোতার নাম ও পরিচয় ইত্যাদি নির্ভুল বানানে লিখতে হবে। 'কেন' প্রশ্নটির প্রসঙ্গটি যথাযথ হবে, পুরো গল্প লিখলে ভাল নম্বর উঠবে না। এক্ষেত্রে গল্পগুলি খুঁটিয়ে ভাল করে পড়া দরকার। তাতে যথাযথ উত্তর দেওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা—প্রতি প্রশ্নের জন্য পৃথক অনুচ্ছেদ চাই।

অতঃপর ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যায় প্রথম প্রয়োজন কোথা হতে অংশটি উদ্ধৃত তার সঠিক পরিচয়, লেখক ও শিরোনামের নির্ভুল বানান। 'সূক্তিরত্নাবলী' বানান তো শতকরা সত্তরজনের ভুল। সু+উক্তি=সূক্তি। রত্ন+আবলী=রত্নাবলী। নিম্নরেখ হরফগুলি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। মনে রাখবে, এ-সকল ক্ষেত্রে বানান ভুল হলে এর জন্য প্রদত্ত আংশিক নম্বর পুরো কাটা যায়। অতএব বানান সম্পর্কে এক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করবে। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর—একথা বলা না থাকলেও ব্যাখ্যা করতে প্রসঙ্গ প্রয়োজন। এজন্য অলিখিত হলেও উত্তরপত্রে নম্বর দেওয়া হয়। আর কোথাও যদি তুলনা থাকে তবে ব্যাখ্যা-শেষে ছোট্ট টীকা করে তুলনাগুলি দেখালে বেশি নম্বর পাওয়া যায়।

পাঠ্যপুস্তকের ব্যাকরণ এবং বহিরাগত ব্যাকরণ অংশে সন্ধি, সমাস, একপদীকরণ এবং কারকবিভক্তি থাকে। এ-সম্পর্কে বক্তব্য হল এই যে, অনুস্বর বিসর্গ হসন্ত সম্পর্কে সাবধান হতে হবে। ব্যাকরণের এই অংশে এগুলি এবং ইকার-ঈকার, সমাসের নামের বানান খুবই সতর্কতার সঙ্গে লিখতে হবে। বানান ঠিক হলে এক্ষেত্রে পুরো নম্বর পাওয়া যায়।

গণিতে নম্বর কাটা যায় কেন

অসীম মুখোপাধ্যায়

বহু পরীক্ষার্থী গণিতে আশানুরূপ নম্বর পায় না। এর কারণ তাদের কাছে রহস্যাবৃত থেকে যায়, বিশেষ করে যে-ক্ষেত্রে উত্তরদানের ভুলত্রুটি সম্বন্ধে তাদের অবহিত করার কোন ব্যবস্থা থাকে না। গণিতে উত্তরদানকালে অজান্তে বা অজ্ঞতাবশত যে সাধারণ ভুলত্রুটিগুলি করলে প্রাপ্য নম্বর কমে যাবার সম্ভাবনা থাকে, সেই সাধারণ ভুলত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা করাই এই রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

গণিত একটি নিশ্চয়তা-বিষয়ক শাস্ত্র, এবং একথা অনস্বীকার্য যে, সামান্য ভুলত্রুটিও সমগ্র উত্তরদানকে একেবারে নিরর্থক করে দেয়। তবু ভুলত্রুটির গুরুত্ব অনুযায়ী পরীক্ষকরা সম্পূর্ণ উত্তরকে অস্বীকার না-করে কিছু মূল্যায়নের চেষ্টা করে থাকেন। এই প্রচেষ্টাই পরীক্ষার্থীর কাছে আশার বাণী।

দেখা যায়, ছাত্ররা কোনো অঙ্কের নির্ণীত ফলের একক লিখতে বহু ক্ষেত্রে ভুল করে বা আদৌ দেয় না। যেমন কোনো কোণের মান লেখার সময় ডিগ্রী-চিহ্ন অত্যাবশ্যক, বা কোনো ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল লেখার সময় বর্গ-একক উল্লেখ অত্যাবশ্যক। কিন্তু ছাত্ররা ডিগ্রী-চিহ্ন (°) দেয় না বা ক্ষেত্রফলের একক লেখে না কিংবা ভুল একক (যথা শুধু সেমি বা ফুট ইত্যাদি) লেখে। ঠিক অনুরূপভাবে উত্তর টাকায় হলে তার একক টাকা লেখা আবশ্যিক। এই সব ভুলত্রুটির জন্য ছাত্রদের প্রাপ্য নম্বর বেশ কমে যায়।

আর এক ধরনের ভুল ছাত্ররা করে থাকে যা খুবই মারাত্মক—কিছু পদকে বন্ধনীবদ্ধ বা বন্ধনীমুক্ত করার সময় পদের চিহ্ন সম্পর্কে অসতর্কতা। বন্ধনীর পূর্বে যোগচিহ্ন থাকলে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু বিয়োগচিহ্ন থাকলে বন্ধনীর অন্তবর্তী পদসমূহের চিহ্ন পরিবর্তিত হয়ে যায়, এই জ্ঞান ছাত্রদের থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষার খাতায় বহুল পরিমাণে ভুল লক্ষিত হয়। এ-বছরের (মাধ্যমিক '৭৯) একটি প্রশ্নের মাধ্যমে ছাত্ররা কেমনতরো ভুল করে তা দেখানো যায়। প্রশ্নটি হল—উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো : $x^2+x-(a+1)(a+2)$ । প্রশ্নটির উত্তর যেমন হওয়া উচিত তা নীচে কষে দেওয়া হল :

প্রদত্ত রাশি $= x^2+\{(a+2)-(a+1)\}x-(a+1)(a+2)$
$= x(x+a+2)-(a+1)(x+a+2)$
$= (x+a+2)(x-a-1)$

ছাত্ররা যে-ভুলটি করে তা শেষ ধাপে, তারা লেখে $(x+a+2)(x-a+1)$। এছাড়া অসাবধানী পরীক্ষার্থীরা আরও অনেক ধরনের ভুল করে থাকে, যেমন— দ্বিতীয় ধাপে x^2-এর পর '+' চিহ্ন না-দেওয়া, দ্বিতীয় বন্ধনী না-দেওয়া, দ্বিতীয় পদে 'x' না-লেখা ইত্যাদি। বক্তব্য এই যে, দুটি ধাপের মধ্যে সমতা রক্ষা করা অবশ্যকর্তব্য—এই বিশেষ দিকটির প্রতি ছাত্ররা যদি নজর রাখে তবে এ ধরনের ভুলের হাত থেকে অব্যাহতি পাবে। উপরিবর্ণিত ভুলে কোনো পরীক্ষকই নম্বর দিতে চান না। পরীক্ষকরা নম্বর দেন না যদি উত্তরে কোনো মৌলিক ধারণার ত্রুটি নজরে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ আলোচ্য উৎপাদকে বিশ্লেষণের অঙ্কটিতে যদি কোনো ছাত্র $a+1=1$ এবং $a+2=2$ ধরে নেয়, তাহলে

প্রদত্তরাশি $= x^2+x-2=(x+2)(x-1)=(x+a+2)(x-a-1)$
(1 এবং 2-এর মান বসিয়ে) পাওয়া যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে $a+1=1$ এবং $a+2=2$ ধরার অর্থ হল $a=0$ ধরা এবং সেক্ষেত্রে প্রদত্ত রাশিটির সার্বিকতা হানি হওয়ায় কোনো নম্বরই পরীক্ষার্থী পাবে না। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার যে, উৎপাদকে বিশ্লেষণের জন্য যে-কোনো প্রদত্ত রাশি সম্পূর্ণ উৎপাদকে, অর্থাৎ যতগুলি উৎপাদক হওয়া সম্ভব, বিশ্লেষিত না হলে পুরো নম্বর দেওয়া হয় না। যেমন $x^4-1=(x^2+1)(x^2-1)$ লিখলে প্রদত্ত রাশিটি সম্পূর্ণ উৎপাদকে বিশ্লেষিত হল না। এখানে x^2-1 অংশটিকে আরও উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার অবকাশ আছে ; তাই প্রদত্ত-রাশিটি সম্পূর্ণ উৎপাদকে বিশ্লেষিত হলে দাঁড়াবে $(x^2+1)(x+1)(x-1)$ এবং এইটিই নির্ণেয় উত্তর।

সমীকরণ-সমাধানের সময় ছাত্রদের ভুলত্রুটি নিয়ে আলোচনায় আসা যাক। সমীকরণে অজ্ঞাত রাশির মান নির্ণয় করাই মূল উদ্দেশ্য। প্রদত্ত সমীকরণকে সরল করে অজ্ঞাত রাশিটির মান বার করবার পর্যায় আনা হয়। এই সরলীকরণের সময় যদি ছাত্ররা কোনো মৌলিক ভুল করে তাহলে, ফল ঠিক হলেও কোনো নম্বর ছাত্ররা পায় না। উদাহরণস্বরূপ একটি সমাধান উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রশ্নটি হল, সমাধান করো :

$$\frac{1}{x-a-b}=\frac{1}{x}-\frac{1}{a}-\frac{1}{b}$$

উঃ প্রদত্ত সমীকরণ $\dfrac{1}{x-a-b}=\dfrac{ab-bx-ax}{xab}$

বা $(x-a-b)(ab-bx-ax)-xab=0$
বা $(a+b)(x-a)(x-b)=0$
বা $x=a,b$

যে চক্র-ক্রম উৎপাদকসূত্রের মাধ্যমে তৃতীয় ধাপটি পাওয়া গেছে তা হল

$$(a+b+c)(ab+bc+ca)-abc=(a+b)(b+c)(c+a)$$

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বহু ছাত্র তৃতীয় ধাপের উৎপাদকটিকে ভুল করে লেখে $(a-b)(x-a)(x-b)=0$ এবং পরবর্তী ধাপে স্বাভাবিকভাবেই লেখা যায় $x=a, b$। বীজ দুটি ঠিকই পাওয়া গেল, কিন্তু মধ্যবর্তী ধাপে একটি মৌলিক ভুল থাকার জন্যে এই প্রকার উত্তরে কোনো নম্বরই পরীক্ষার্থী আশা করতে পারে না। এই সূত্রে আর-একটি কথা বলে রাখা দরকার। $a+b\neq0$—এই শর্তটি উল্লেখের প্রয়োজন আছে, কারণ $a+b=0$ হলে, $a=-b$ হয় এবং সেক্ষেত্রে প্রদত্ত সমীকরণটি আর সমীকরণ থাকে না, পরন্তু একটি অভেদে পর্যবসিত হয়। প্রদত্ত সমীকরণটি চক্র-ক্রম উৎপাদকসূত্রের সাহায্য ব্যতিরেকেও সমাধান করা যায়। পদ্ধতিটি সহজ ও আয়ত্তে থাকলেও যে ছাত্ররা ত্রুটি-মুক্ত থাকে তা নয়। আলোচ্য সমীকরণটিকে লেখা যায়

$$\frac{1}{x-a-b}-\frac{1}{x}=-\frac{1}{a}-\frac{1}{b}$$

বা $\dfrac{x-x+a+b}{(x-a-b)x}=-\dfrac{a+b}{ab}$
বা $ab=-(x-a-b)x,\ a+b\neq0$
বা $x^2-ax-bx+ab=0$
বা $x(x-a)-b(x-a)=0$

এই ধাপের পর বহু ছাত্র লেখে $x=a, b$। কিন্তু তা উচিত নয় ; সম্পূর্ণ উৎপাদকে $(x-a)(x-b)=0$ বিশ্লেষণ করে নিয়ে লেখা উচিত $x=a, b$। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য $x=a$ বা b লেখা ভুল, অবশ্য $x=a$ এবং b লিখলে কোনো আপত্তি নেই। দেখা যায়, পরীক্ষার্থীরা সমীকরণ সমাধানের সময় দুটি ধাপের মধ্যে 'বা' (কিংবা or)-এর পরিবর্তে সর্বত্র সমতা-চিহ্ন '=' লেখে। এই সমতাচিহ্ন ব্যবহারে ছাত্ররা যে খুবই মুক্তহস্ত তার পরিচয় পাওয়া যায় তাদের লেখার মধ্যে, যেমন কোনো স্থানে কিছু ধরে নেওয়ার ক্ষেত্রে লেখে "$=x^2+2x=a$ ধরিয়া"!

এই সব দেখে মনে হয় বহু ছাত্রের গাণিতিক প্রতীকচিহ্নাদির (যথা =, ∴, ∵ ইত্যাদি) সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান নেই। এই জ্ঞান না থাকার জন্যে ছাত্রদের যুক্তিবদ্ধ চিন্তাশক্তির প্রকৃত বিকাশ ঘটে না। উত্তরে প্রতীকচিহ্নের অপব্যবহারের জন্য ছাত্রদের কিছু দণ্ডভোগ করতে হয়।

সহসমীকরণ সমাধানের সময় দেখা যায় ছাত্ররা x-অজ্ঞাত-রাশির মান ঠিকমতো নির্ণয় করে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট y-অজ্ঞাত রাশিটির মান আদৌ বার করে না বা ভুল করে, এই সব ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী কোনো সহানুভূতিই আশা করতে পারে না পরীক্ষকের কাছে, কারণ সহসমীকরণ সমাধানে সব-কটি অজ্ঞাত রাশির মান নির্ণীত না হলে কোনো সমাধানই হয় না। সমাধানের শেষে x এবং y-এর প্রাপ্ত মান পৃথকভাবে লিখে দেওয়া উচিত। বিশেষ করে দ্বিঘাত সহসমীকরণ সমাধানের ক্ষেত্রে x এবং y-এর মানসমূহ সংশ্লিষ্টভাবে প্রকাশ করতে হয়। উদাহরণ সহযোগে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে ; সমাধান করো ঃ $x+y=8,\ xy=15$ । সমাধানের পর x এবং y-এর সংশ্লিষ্ট মান নিম্নলিখিত উপায়ে লেখা উচিত

$$\left.\begin{array}{l} x=3 \\ y=5 \end{array}\right\} \begin{array}{l} x=5 \\ y=3 \end{array}$$

বলা বাহুল্য, শুধু সমাধানের বেলায় নয়, সব প্রশ্নের উত্তরটি পৃথকভাবে শেষের ধাপে লেখা বাঞ্ছনীয়। সমাধানের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর একটা সুবিধে আছে। অজ্ঞাতরাশির প্রাপ্তমান ঠিক হল কিনা তা প্রদত্ত সমীকরণে বসিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া যায়। অনেক সময় সমাধানকালে অজ্ঞাতরাশির কিছু বাড়তি মান এসে পড়তে পারে, সেক্ষেত্রে সেই বাড়তি মান প্রদত্ত সমীকরণকে সিদ্ধ করে না দেখিয়ে বর্জন করতে হয়। বর্জন না করলে সব পরীক্ষায়ই কিছু নম্বর কেটে নেওয়ার নির্দেশ থাকে।

সুদকষা-প্রশ্ন সমাধানের সময় পরীক্ষার্থীরা ব্যবহৃত পরিভাষাগুলির সম্বন্ধে তাদের ধারণা কত অস্পষ্ট তার পরিচয় দেয়। যেমন সবৃদ্ধিমূল বা সুদ-আসল কথাটার অপব্যবহারের একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কোনো মূলধন 3 বৎসরে সুদেমূলে 560 টাকা এবং 5 বৎসরে 600 টাকা হয়, তাহলে 2 বৎসরে সুদ হয় মাত্র 40 টাকা ; দুঃখের বিষয় বহু ছাত্র উক্ত 40 টাকাকে 2 বৎসরের সবৃদ্ধিমূল বলে আখ্যাত করে থাকে। সুদের হার নির্ণয়ের সময় 100 টাকার এক বছরের সুদ 4 টাকা না লিখে অনেক ছাত্র 100 টাকার এক বছরের সুদ 4% লেখে। পরীক্ষার্থী যদি নিজেই একবার ভেবে দেখে যে, সে কী লিখছে তাহলেই মনে হয় এই সব ভুলভ্রান্তির হাত থেকে রেহাই পায়। বলা বাহুল্য, ঐকিক নিয়ম প্রয়োগের সময় উত্তরদানে যথেষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি নজরে পড়ে। প্রসঙ্গত বলা দরকার, সুদের হার বলতে প্রকৃতপক্ষে 1 টাকায় 1 বৎসরের সুদ কত বোঝায় ; অবশ্য শতকরা হারকেও সুদের হার বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সূত্রের সাহায্যে সুদকষার অঙ্ক সমাধান না করাই শ্রেয়, কারণ এতে পরীক্ষার্থীর অধীত বিদ্যার তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেক পরীক্ষক এই ধরনের উত্তরে সন্তুষ্টও হন না। অবশ্য সূত্রাদি প্রমাণ করে নিয়ে অগ্রসর হলে আপত্তির কিছু নেই। যদি নিরুপায় অবস্থায় সূত্রাদি প্রয়োগ করতেই হয়, সেক্ষেত্রে সূত্রে ব্যবহৃত প্রতীকচিহ্নাদির অর্থ, ব্যাখ্যা এবং সম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের প্রযোজ্যতা উত্তরে অবশ্যই থাকা প্রয়োজন, নইলে পরীক্ষক কিছু নম্বর অনায়াসেই কেটে নিতে পারেন।

‘ভুল’

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

না। শিরোনামটি ‘আনন্দমেলা’র ভুল নয়। বিভিন্ন পরীক্ষার খাতায় পাওয়া অজস্র রত্নের অন্যতম।

ব্যাপারটা তাহলে ভেঙেই বলি। যখনই আনন্দমেলার প্রতিনিধি হয়ে বিভিন্ন স্কুলে প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছি, প্রত্যেকেই এই সমস্যার কথা বলেছেন। এত বড় সমস্যা অথচ ছাত্রছাত্রীরা গ্রাহ্য করে না তেমন। কতকগুলি নির্বোধ ধারণাও আমাদের মধ্যে অনেকে পোষণ করেন। যেমন, বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা তো বাংলা বানান ভুল করবেই। কেন ? সে-বিষয়ে তাদের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে নাকি ? কিংবা, ‘বানান-ভুলের জন্যে তো আর নম্বর কাটা যায় না।’ এ-কথা ঠিক যে, প্রতিটি বানান-ভুলের জন্যে আলাদা করে নম্বর কাটলে অনেকেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাস করত না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, এতে অন্যভাবে নম্বর কমছেই। এই সব ভুলের ফলে পরীক্ষার্থী সম্পর্কে পরীক্ষকের ধারণা আদৌ উঁচু হয় না। মোটামুটি ভাল উত্তরের মধ্যে ‘ব্যাক্তি’,‘অধ্যায়ন’, ‘প্রতিনিধী’, ‘বিদ্রূহ’ ধরনের কিছু ভুল পরীক্ষকের মন তেতো করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এর ফলে যা হবার তাই হয়—তিতিবিরক্ত পরীক্ষক ভাল উত্তরের নম্বর দিতেও কৃপণ হয়ে পড়েন।

বহুদিন আগে স্কুলে, কলেজে পড়িয়েছি। ঐ সব শিক্ষায়তনের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ছাড়াও স্কুল ফাইন্যাল, হায়ার সেকেণ্ডারি, প্রি-ইউনিভার্সিটি, ডিগ্রী পার্ট ওয়ান-টু পরীক্ষার খাতা দেখতে হয়েছে অনেকবার। প্রথম প্রথম ভুল ‘সংগ্রহ’ করার চেষ্টা করিনি। দু-তিন বছর পরে লক্ষ করলাম বিভিন্ন বছরের পরীক্ষার্থীদের খাতায় বানান-ভুলের সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। তখন থেকেই সেগুলো লিখে রাখতে শুরু করি। দু’একবার ক্লাসে বোর্ডে লিখে দেখিয়েছিলাম ছাত্রছাত্রীদের। ওরা তো হেসে কুটিপাটি, বিশ্বাসই করতে চায় না যে, এ-সব কেউ লিখতে পারে। অথচ এর মধ্যে ওদেরই নিজস্ব বস্তু কত ছিল।

আমার ‘রত্নভাণ্ডারটি’ উজাড় করে দেবার আগে দু-একটি কথা জানানো দরকার। এই সব ভুল-বানান কেন হয় তা অবশ্যই জানা দরকার। এদের উৎস প্রধানত তিনটি কি চারটি। প্রথমত অমনোযোগ, দ্বিতীয়ত লেখার অভ্যাসের অভাব এবং তৃতীয়ত উচ্চারণের দোষ। অনেক ছেলেমেয়ে কোনো কোনো শব্দ ভাল করে না-দেখেই পড়ে, কিন্তু বানানটা তারা গোড়া থেকেই ভুল শিখে আসছে। আমার এক বোন, বাংলার এম. এ. ও বি-এড-এ ফার্স্ট ক্লাস, দীর্ঘদিন জানত এবং লিখত ‘সাধরণ’। এক ছাত্রী লিখত ‘পরিষধ’। কোন কোন শব্দের বদলে তা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না। ধরিয়ে দেওয়ার পরও ওই একই ভুল তারা বহুবার করেছে। কিছু ভুল হয়েছে এক শুদ্ধ শব্দের অনুকরণে অন্য শব্দ লিখতে গিয়ে। যেমন ‘দায়ী’ দেখে দেখে ‘দায়ীত্ব’। জ্যোৎস্নার মতো ‘কুৎস্না’ (কুৎসা লিখতে গিয়ে), ‘সাধারণত’র দেখাদেখি ‘প্রধানত’ হয়েছে ‘প্রধারণত’।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শুধু চোখ দিয়ে নয়, মন দিয়ে পাঠ্যাংশ পড়ার এবং নির্ভুলভাবে উচ্চারণ করার আগ্রহ থাকলে আর পড়া জিনিসটা সুযোগ পেলেই লিখে উপযুক্ত কাউকে দিয়ে সংশোধন করিয়ে নিলে এই সব ভুল হবার অবকাশ কম।

অনেকে বলতে পারেন, যে-কোনও প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা বইতে ‘ভ্রম সংশোধন’ অধ্যায়েই তো এ-সব পাওয়া যেত।

নতুন করে এগুলি লেখার দরকার কী ছিল? নিশ্চয়ই আছে। মজার কথা হল যে, যে-সব ভুল আমি তালিকাভুক্ত করে শ্রেণী-বিভক্ত করেছি তাদের অধিকাংশ এতই অভিনব যে, প্রচলিত বই-গুলিতে সেগুলির সাক্ষাৎ মিলবে না। বড় শব্দই হোক আর ছোট শব্দই হোক, তার কতরকম ভুল বানান হতে পারে উত্তরপত্র পরীক্ষা না করলে বর্তমান প্রবন্ধ-লেখক তা কোনওদিন জানতেন না। 'বৃহদায়তন' শব্দটি বড়সড় বলেই কি 'বৃহদায়াতন', 'বৃহৎদায়তন' 'বৃহদায়ন' ইত্যাদি যা খুশি লেখা চলে? এমন ভ্যারাইটি অন্তত শতাধিক ক্ষেত্রে পেয়েছি। সন্ধির নিয়ম জেনে ঠিক উচ্চারণ করলে এসব ভুল হয় না। 'বৃহদায়ন' তো একেবারে দুনিয়া-ছাড়া। এইরকম আরও কত আছে। কেউ কেউ বলতে পারেন, আহা, এগুলি তো কলম-ফসকানো ভুল বা 'স্লিপ অব পেন' হতে পারে। কিন্তু একই খাতায় একই বানান-ভুল বার বার পাওয়া গেলে তাকে কি স্লিপ অব পেন মনে করা যায়? তবে 'গততন্ত্র', 'মর্তমান' (বর্তমান র জায়গায়) 'একনাকতন্ত্র' লবস ও হক (হবস ও লক) ত্রিবেন্দ্রসুন্দর রামেদী (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী) 'আইনপ্রণয়' ভুল বানান হলেও সম্ভবত 'স্লিপ অব পেন'।

বানান-ভুল (বা অন্য ভুল) যে-ধরনেরই হোক না কেন, দুটি মূল শ্রেণীর যে-কোনও একটির মধ্যে পড়বেই। যা লেখা উচিত ছিল সেটি না-লেখা এবং যা লেখা উচিত ছিল না তা লেখা। অর্থাৎ যথাক্রমে ইংরেজিতে যাদের বলা হয় 'এরর অব অমিশন' এবং 'এরর অব কমিশন'। আবার একই শব্দে এই দু'ধরনের ভুলের মিশ্রণ বা সহাবস্থান হয়েছে, এরকম উদাহরণ প্রচুর আছে। যে 'সাধরণ' কথাটির উল্লেখ করেছি ওটিতে ধ রয়েছে নিরাকার। তেমনি বহুপ্রচলিত 'ব্যাক্তি' এবং 'ন্যাস্ত' শব্দ দুটির 'দুরাবস্থা' আকার দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। (দুরাবস্থা আমি পাইনি, সম্ভবত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গল্প বহুলপ্রচারিত হওয়ায় ঐ ভুলটা কেউ আর বিশেষ করে না।) আবার 'স্বৈরচারি' শব্দটিতে দুরকম ভুলই আছে ; প্রথম 'র'য়ে আকার দেওয়া উচিত ছিল, দেওয়া হয়নি, আর শেষের 'র'য়ে ঈকার এর বদলে ই-কার দেওয়া হয়েছে। সেইরকম 'রাষ্ট্রয়ত্ত' 'সুতারং'।

এবার অন্যান্য ভুলগুলি দেখাচ্ছি। আগে স্বরবর্ণের ভুলগুলি দেখা যাক : সাধরণ, অষ্টদশ, মর্যদা, প্রধান্য, প্রাধন্য, সমাজিক, সম্ভবনা, প্রকৃতিক, ব্যখ্যা, আত্মহুতি, আধ্যন্তিক (আধ্যাত্মিক) শব্দগুলিতে যথাস্থানে আ-কার দেওয়া হয়নি। শেষের শব্দটিতে তো আবার 'ত্ম' হয়ে গেছে 'ন্ত'। বিপরীতক্রমে, ব্যাক্তি, ব্যাস্ত, ন্যাস্ত, আনায়ন, অধ্যায়ন, সপ্তাদশ, অত্যান্ত, সামাজবিজ্ঞান, ব্যাতিরেকে, ব্যাতীত, একানায়কতন্ত্র, ব্যাবস্থা, ব্যায়, ব্যাবহার, আলৌকিক, সুতারাং, বৃহদায়াতন, সামাঞ্জস্য শব্দগুলির 'আ'-কার অপ্রয়োজনীয়ভাবে বর্ধিত করা হয়েছে। সেইরকম, হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞান-বর্জিত শব্দগুলি। সিমা, কার্যকরি, স্বাধিনতা, শতাব্দি, কেন্দ্রিয় মিমাংসা, জাতিয়, বিপরিত, দ্বিতিয়, তৃতিয়, দলিয়, জীবনি, অম্বিকার, রাষ্ট্রবিজ্ঞানি, চিন্তাশিল, বিশ্বাসি, নিতি ব্যতিত-তে ঈ-কার-এর বদলে ই-কার ব্যবহার করা হয়েছে। আবার 'ই'-কার-এর জায়গা দখল করেছে ঈ-কার এমন উদাহরণও কম নয় অতী, নির্বাচীত, প্রতিনিধী, যদী, প্রেরীত, সমীতী, ভীত্তি, প্রকৃতী, নীতী, সহযোগীতা, জাতী। মজা হল, 'জাতি'-র বেলায় হচ্ছে 'জাতী, কিন্তু 'জাতীয়' হয়ে যাচ্ছে 'জাতিয়'!

পরীক্ষার্থীরা এইরকম ভুল উ, ঊ-কার নিয়েও করেছে। ভুমিকা, রূপ, স্বরূপ, সূত্র, দূষিত, দুরীভুত — এ-সব বানান 'কল্পনাপ্রসুত' নয় কি?'বিলুপ্ত' দেখে 'নির্লিপ্ত'র মধ্যের ই-কার লুপ্ত করে উ-কার আমদানি করে'নির্লুপ্ত' লিখলে পরীক্ষক ক্ষিপ্ত হবেন না? এবার 'আলচ্য' বিষয় ও-কারের ভুল। আলচোনা, মনভাব, বন্দবস্ত, উৎকচ, রাজদ্রহী, রুশ (রুশো), প্লেট (প্লেটো), গলোযোগ, বিদ্রহ শব্দগুলি পরীক্ষককে বিদ্রোহী করে তুলতেই পারে। কিংবা আলোচোনা, বলপ্রোয়গ, সর্বপোরী (সর্বোপরি) গোষ্টিষ্ঠতা দেখে তিনি কী 'মত পেষণ' করবেন? আর 'রাষ্ট্রনৌতিক' কি ভৌতিক কাণ্ড নয়?

স্বরবর্ণের ভুলই যেখানে এত, সেখানে ব্যঞ্জনবর্ণের ভুল স্বাভাবিক ভাবেই আরও বেশি। যুক্তাক্ষরের ভুলের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। ব্যঞ্জনবর্ণের সাধারণ ভুলগুলির মধ্যে 'শ-ষ-স'-এর গণ্ডগোল প্রচুর। মিমাংশা, পরিসদ, শুবিধা, অবস্য, সুধ, মানুস, প্রশিদ্ধ, বিস্বাশ, বৌসিদিন, বিষেস, বিষেশ, স্বাশন, শাষণ, শাশন—এগুলো পেয়েছি অনেকবার। 'র-ড়-ঢ়'এর ভুল তুলনায় অবশ্য কম, যদিও 'দৃড়তা' পেয়েছি বহুবার। সৃষ্ট, গরিষ্ঠ, যথেষ্ঠ—ট-ঠ-এর গণ্ডগোলও নেহাত ফেলনা নয়। ত-থ এর ভুল (মুখস্ত, স্থর, সমস্থ, হস্থ) কিংবা দ-ধ-এর (পরিষধ, অবাদ অসুবিদা, আত্মপোলবিদ্ধ, এমন – কী ব-ভ-এর (সম্ভন্ধে) ভুল বা জ-য-এর ভুলের (সুজোগ, বিপর্জয়) 'প্রাচুর্জ'ও চোখে পড়েছে।

সংযুক্ত বর্ণের ভুল অর্থাৎ য-ফলা, র-ফলা, ল-ফলা, ব-ফলা, ণ-ফলা, ম-ফলা, রেফ-এর ভুল সবচেয়ে বেশি পেয়েছি। এখানেও সেই একই কথা : যেখানে যেটি দেবার কথা, দেওয়া হয়নি, বা অন্য কিছু দিয়ে তার কাজ সারবার চেষ্টা করা হয়েছে। আবার যেখানে যেটি দেবার নয় অকাতরে সেটি দেওয়া হয়েছে। 'বৈচিত্র'-তে বৈচিত্র্য নেই, এতই বেশি পেয়েছি। 'সংখ্যা'-র বদলে 'সংক্ষা' কী ধরনের 'শিক্ষাদিখ্যা'? সম্পন্য (সম্পন্ন), সিধ্যান্ত (সিদ্ধান্ত), সম্পর্ক্য, সমব্যয় (সমবায়) চ্যুক্তি, সিংহাসনচুত্য, পদচুত্য—এই জাতীয় আরো কিছু নমুনা। 'বৈচিত্র' গ্রুপের যেসব ভুল 'প্রতক্ষ্য/প্রতক্ষ/প্রত্যোক্ষ' করেছি সেগুলি হল বৈশিষ্ট, অন্যান্ন, আক্ষা, উদ্দম/উদ্দাম (উদ্যম) সিংহাসনচুত। এগুলো বাস্তবিকই 'জঘন্ন'। আবার স্বার্থ্য, রাষ্ট্র্য, পদ্ধ্যতি, অর্থ্যাৎ, অবস্থ্যা, মূর্খ্য পরোক্ষ্য, সর্বোচ্য—এ-সবে য-ফলা দেবার 'ব্যবস্থ্যা' কোন্ ব্যাকরণ বা অভিধান দিয়েছে তা বোঝা যায় না।

অনেক ক্ষেত্রে লেখা দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে পরীক্ষার্থী বা পরীক্ষার্থিনী যুক্তাক্ষর একেবারেই চেনে না। উচ্চারণ জানলেও লিখতে পারে না। যেমন—'সঙ্গা' (সংজ্ঞা), 'অভিঙ্গ' (অভিজ্ঞ),'ক্রুটি'(ত্রুটি) 'ভিক্তি/ভিক্তী' 'উৎপত্তির' সম্ভাব্য উৎস ঐ অপরিচয়।

উচ্চারণের দোষে যে-সব ভুল হয় তার মধ্যে 'বর্ণবিপর্যয়' শ্রেণীর ভুলের সংখ্যা কম নয়—'ল্যাক্সি (ল্যাসিক), নির্মলিখিত, ক্ষমতালিস্পু, শতাব্দী, অপকট, ঝড়গা (ঝগড়া), ফ্রান্সের—এ-সবের উৎসের জন্য খুব 'ভগীর'-এ যেতে হবে না। যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে ততদিন 'বাঁধা' দূর হবার সম্ভাবনা নেই! কিন্তু মুনীষি, মুন্ত্রী, কোট (কোর্ট), প্রাই, ইতিহাসাশ্রই, ছন্দবেকারত্ব (ছন্মবেকারত্ব), বাচিতে, খুজিতে, উচু, দাড়াতো, সানিধ্য, অঙ্গাঅঙ্গি, জম্বু (Jammu) এ-সব ভুল সম্পর্কেও কি সেই কথাই বলতে হবে? এরাও কি উত্তরের সঙ্গে 'ওতপ্রেত'-ভাবে জড়িত থাকবে? 'তাহালে' উপায় কী? এরকম 'সর্বাত্তক' ভুল তো পরীক্ষকদের 'হিংসাত্বক' করে তুলবেই!

মাধ্যমিকে ফার্স্ট রানা

শিরোনামাটা লিখেই ভাবলাম ভুল হল। রানা খুশি নয়, আবার খুশিও, সেটা আবার কেমন কথা! মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে খুশি না হবার কী কারণ থাকতে পারে?

রানা ওরফে তমোঘ্ন চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃত, অঙ্ক ও কর্মশিক্ষার পেপার তিনটিতে আশানুরূপ নম্বর পায়নি। তার চেয়ে বড় আক্ষেপ—বাংলায় 'লেটার' পায়নি। "খুব ভাল পরীক্ষা দিয়েছিলাম, লেটার আশা করেছিলাম।" এই জন্যেই রানা খুশি নয়। আর খুশি শুধু ফার্স্ট হয়েছে বলেই নয়, ওর অকালমৃতা মায়ের আশা পূর্ণ করতে পেরেছে বলে। মা অধ্যাপিকা রত্না চট্টোপাধ্যায় গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস কলেজের কেমিস্ট্রি বিভাগের প্রধান ছিলেন। মায়ের আশা ছিল রানা দশজনের মধ্যে একজন হোক। মায়ের মৃত্যুর পর সেই আশা জাগিয়ে রেখেছিলেন ওর বাবা কবি তুষার চট্টোপাধ্যায়। ডঃ চট্টোপাধ্যায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং আন্তর্জাতিক লোকগাথা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। সাড়ে-ছয় বছরের ছোট ভাই তপান্তও ওকে সাধ্যমত উৎসাহ যুগিয়েছে।

এখন দেখা যাক নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের অন্যতম রত্ন তমোঘ্ন কোন বিষয়ে কত মার্কস পেয়েছে। (তুলনার সুবিধার জন্য বন্ধনীর মধ্যে প্রথমে ১৯৭৭-র ও পরে ১৯৭৯-র ফার্স্ট বয় দেবাশিস বসু ও অভিজিৎ চৌধুরীর মার্কসগুলি দিলাম।) বাংলায় ১৪৯ (১৫২, ১৫৬), ইংরেজিতে ৭৩ (৬৭, ৭০), সংস্কৃতে ৮০ (৮৭, ৭৮), অঙ্কে ৯১ (৯৩,৯৯) ফিজিক্যাল সায়েন্সে ৯৪ (৯০, ৯৬), লাইফ সায়েন্সে ৮৯ (৭৮, ৮৯), অতিরিক্ত অঙ্কে ৯১ (৮১,৯৫) ইতিহাসে ৮২ (৭৮, ৮৪), ভূগোলে ৮৯ (৮৬, ৮১), আর কর্মশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়টিতে ৮০ (৭৯, ৮০)। মোট ৮৮৫ (৮৫৭, ৮৯৪)। মজার ব্যাপার হল, টেস্টে রানা পেয়েছিল মাত্র ৭৯৩। এত তফাত কী করে হয় জিজ্ঞেস করতে বলল, "স্কুল থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল, অন্তত একশো নম্বর বাড়াতে হবে।" তা ছাড়া ওদের স্কুলে খাতা-পরীক্ষার মানও নাকি বেশ উঁচু।

কোন কোন বই পড়ে রানা এত ভাল নম্বর তুলতে পেরেছিল, সেটা জানার জন্যে সকলের মতো আমারও কৌতূহল হয়েছিল। বলা বাহুল্য, স্কুলের পাঠ্য-বই ছাড়া বাইরের বই ও যথেষ্টই পড়েছে। তবে দুটো কথা মনে রাখতে হবে। ও দারুণভাবে টেস্ট পেপার্স থেকে প্রশ্নোত্তর অভ্যাস করেছে- টেস্ট পেপার্স-এর এমন ব্যবহার খুব কম ছাত্রই করে। দ্বিতীয়ত প্রায় প্রতিটি বিষয়েই ওর স্কুলের শিক্ষকদের দেওয়া নোটস খুবই কাজে লেগেছে। ''এমন সুন্দর নোটস, যে নিজে পরিশ্রম করে বাইরের বই পড়ার দরকার আর হত না।''

বাংলা ব্যাকরণে পি আচার্যর রচনা-বিচিন্তা, বামনদেব চক্রবর্তী, রচনার জন্যে পি আচার্য ও বিভূতি চৌধুরীর দ্বাদশ শ্রেণীর বই দুটি এবং ইংরেজি গ্রামার ইত্যাদির জন্যে নেসফিল্ড, রেন-মার্টিন। অঙ্কে কে সি নাগ, কে পি বসু। আর ক্লাসের শিক্ষক ওয়াকার-মিলার, হল-স্টিভেন্স, হল-উড প্রভৃতি বই থেকে ওদের কিছু করিয়ে দিতেন। অতিরিক্ত অঙ্কের জন্যে কে সি নাগের ঐচ্ছিক গণিত, দাশ-মুখার্জির ডিগ্রী কোর্সের বই এবং কে সি নাগের ইলেক্টিভ ম্যাথামেটিকস ব্যবহার করেছে রানা।

লাইফ সায়েন্সে স্কুলের বই (রবীন্দ্রনারায়ণ পাল) ছাড়া ডাঃ অমূল্যভূষণ চক্রবর্তী, কার্তিকচন্দ্র মন্ডল, কুন্ডু-দাশ-কুন্ডু। গুপ্ত-ভৌমিকের লেখা পুরাতন হায়ার সেকেন্ডারি সিলেবাসের বইটাও 'খুব সুন্দর'। আর রবার্টস-এর 'বায়োলজিঃএ ফাংশনাল অ্যাপ্রোচ'। এই সবই ও পড়েছে ক্লাসের নোটসের সঙ্গে মিলিয়ে।
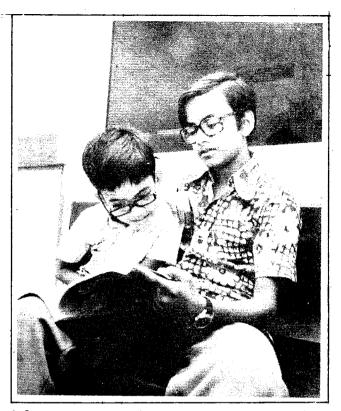
ফিজিক্যাল সায়েন্সে ফিজিক্সের জন্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ-এর বই (স্কুল), চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত আর সিন্‌হা রায়চৌধুরী এবং কেমিস্ট্রিতে বিজয়কালী গোস্বামী, শ্রীপতি দে, পি কে দত্ত, এ ছাড়া ,ল্যার্ডলির শুধু নবম শ্রেণীর জন্যে একটা চমৎকার বই, যেটা ও মাত্র একবারই ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছে। এই বিষয়েও, বিশেষত কেমিস্ট্রিতে, ক্লাস নোটস খুব কাজ দিয়েছে।

ইতিহাসে ক্লাসে পড়ানো হত নিমাইসাধন বসুর বই। রানা আরও পড়েছে ডঃ কিরণ চৌধুরীর ডিগ্রী ক্লাসের বই, ডঃ অতুল রায়, এবং ডঃ অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরেজিতে লেখা নাইন ও টেনের বই। আর ডি এন কুন্দ্রার দু-খন্ডের বইটি। ভূগোলে স্কুলের বই ডঃ শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বাসব ভট্টাচার্য ছাড়া এম সি ঘোষ-তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহা-সেন, লাহিড়ী--সেনগুপ্ত, গুহ - শ্যাম আর 'ভারত-বসুধা'। বিভিন্ন দেশের লোকের "খাদ্য, ভাষা, পোশাক" অংশের জন্যে 'ইন্ডিয়া দা ল্যান্ড অ্যান্ড ইটস পিপল' ব্যবহার করেছে। আর পাঁচসালা পরিকল্পনার জন্যে ক্লাস নোটস—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিন, বাণিজ্য ও অন্যান্য পত্রপত্রিকা থেকে তৈরি।

রানা স্কুল চলাকালীন দৈনিক পাঁচ-ছ ঘন্টা পড়েছে। টেস্টের পরের তিন মাস রুটিন করে গড়ে দৈনিক বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত পড়েছে। এর মধ্যে অর্ধেকটা সময় দিতে হয়েছে লেখায়। ওর পড়ার রুটিনের বৈশিষ্ট্য হল প্রয়োজন অনুযায়ী ও সাতদিন অন্তর রুটিন পালটে নিত, যাতে প্রত্যেক বিষয়ই গুরুত্ব পায়। আর প্রতিদিনই প্রতিটি বিষয়ই থাকত রুটিনে। পড়াশোনার ব্যাপারে বাবার সাহায্য ও অনেকটাই পেয়েছে। আর্টস-এর বিষয়গুলিতে ও যে-সব উত্তর লিখত, উনিই সেগুলি সংশোধন করে দিতেন, আর নানা রকম প্রয়োজনীয় আলোচনা করতেন। টেস্টের পরে অল্প কয়েকজন ছাত্রকে বেছে নিয়ে যে বিশেষ টিউটোরিয়াল ক্লাস হয়েছিল স্কুলে, সেটিও-ওর খুব কাজে লেগেছে। এই বিশেষ ক্লাসের লক্ষ্য ছিল উত্তরের মা যথাসম্ভব উঁচু করা। আর পাক্ষিক আনন্দমেলার পড়াশো

বিভাগ এবং বিশেষ করে পূজা সংখ্যার হেড এগজামিনারের পরামর্শ ও ১৯৭৯ সালের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের উপদেশ ওকে খুবই সাহায্য করেছে। স্কুলে পাক্ষিক আনন্দমেলা নেওয়া হয়, বাড়িতে তো আসেই।

লোডশেডিংয়ে ওর তেমন কোনও অসুবিধা হয়নি। বাড়িতে থাকলে অবশ্য হত, কিন্তু স্কুলে জেনারেটর থাকায় প্যাসেজ আর স্টাডি অন্ধকার থাকত না। আর রানা তো রাত জেগে পড়াশোনা করার একেবারেই বিপক্ষে।

নানা প্রশ্ন করে রানার পড়াশোনার পদ্ধতি সম্পর্কে যা জানলাম তা হল—টেক্সট বইয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া, উচ্চশ্রেণীর ক্লাস নোটসের উপযুক্ত ব্যবহার, শিক্ষক মহাশয়দের ও বাবার নির্দেশ অনুসারে বাইরের বই পড়া এবং উপযুক্ত নোটস লেখা, সব-কিছু মিলিয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে সামগ্রিকভাবে লেখা। এই লেখা 'প্রশ্ন' ধরে নয়, বিষয়গতভাবে বা টপিকস্ অনুযায়ী। টেস্টপেপার্স থেকে বারবার লেখা এবং শিক্ষকদের ও বাবার কাছ থেকে সংশোধন করিয়ে নেওয়া, নিয়মিত পড়া এবং ঘড়ি ধরে উত্তর লেখা। সাধারণভাবে পড়ার পদ্ধতি এইরকম হলেও বিশেষ-বিশেষ বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন অনুসারে ও পড়াশোনা করেছে। বাংলায় টেস্ট পেপার্স থেকে প্রশ্ন বেছে উত্তর লিখে দেখিয়ে নিয়েছে। রচনার জন্যে বিভিন্ন বই পড়েছে। ভাবসম্প্রসারণ, সারাংশ লিখন ও অনুবাদের উপর জোর দিয়েছে। ইংরেজিতে পিতৃবন্ধু অধ্যাপক প্রলয় দেব ও অধ্যাপক হিরন্ময় দত্তর সাহায্য পেয়েছে যথেষ্টই। অঙ্কে ও টেস্ট পেপার্স থেকে উত্তর করে অভ্যাস করেছে এবং প্রচুর অবজেটিভ অঙ্ক কষেছে। লাইফ সায়েন্সে নাইন ও টেন দু ক্লাসেই নোট তৈরি করেছে, টেস্টের পরের তিনটি মাস নোটস এবং টিউটোরিয়ালের সাহায্যে টেস্ট পেপার্সের সেইসব প্রশ্নোত্তর করেছে, যেগুলি সচরাচর পরীক্ষায় আসে না। "লাইফ সায়েন্সে সমস্ত ছবি অভ্যাস করেছিলাম, একটাও আসেনি!"

অবজেক্টিভ প্রশ্নোত্তর ও অনেক করেছে। সেইরকম ফিজিক্যাল সায়েন্সেও ক্লাস নোটস তৈরি করে অপ্রচলিত প্রশ্নের উত্তর করেছে। এই বিষয়টিতে, বিশেষত কেমিস্ট্রিতে, অনেক বেশি লিখতে ও পড়তে হয়েছে। ইতিহাসেও কম নয়। প্রত্যেক অধ্যায় থেকে যত রকম প্রশ্ন হয় তা বিষয় অনুসারে সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি করেছে। শেষের দিকে "শুধু খাতাটাই পড়েছি।" ভূগোলে গোড়ায় নোট করেছে এবং ম্যাপ পয়েন্টিং করেছে। টেস্টের এক মাসের পর সমস্ত খাতা, বিশেষত ভূগোল ওর তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সংস্কৃতে ব্যাকরণ ও অনুবাদ প্রচুর অভ্যাস করেছে। আর ওয়ার্ক এডুকেশনে? "প্রোজেক্ট খাতা খুব যত্ন নিয়ে তৈরি করেছি।" বিতর্ক, বক্তৃতা, তাৎক্ষণিক বিতর্ক ও বক্তৃতা, আবৃত্তি এসব ব্যাপারে রানার সহজাত দক্ষতা যেমন একদিকে ওকে কর্মশিক্ষার অন্তর্গত স্কুল পারফরম্যান্সে ভাল নম্বর দিয়েছে, তেমনি অপরদিকে এনে দিয়েছে বিভিন্ন বিখ্যাত প্রতিযোগিতার পুরস্কার।

রানা প্রথমে ভর্তি হয়েছিল মায়ের কলেজের স্কুল বিভাগে। ওখানে কে জি ওয়ান আর টু শেষ করে সেভেন পর্যন্ত পড়েছে সেন্ট লরেন্সে। সেখান থেকে নরেন্দ্রপুর।

এই নরেন্দ্রপুরে আসাটাই ওর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আশ্রমিক পরিবেশে একটা সুতীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে থেকে ও উপকৃত হয়েছে।

রানা এখন নরেন্দ্রপুরেই ইলেভেনে ফিজিকস, কেমিস্ট্রি, ম্যাথামেটিক্স ও স্ট্যাটিসটিকস (চতুর্থ বিষয়) নিয়ে পড়ছে। ও সলিড স্টেট ফিজিক্স নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে চায়।

ভজা ও জাদুকর

অজেয় রায়

তখন ভজা পড়ে ক্লাস সেভেনে।

সেদিন বৃহস্পতিবার। স্কুল ছুটি হবার কথা বিকেল সাড়ে-চারটেয়। কিন্তু বেলা তিনটেয় সিক্সথ-পিরিয়ড শেষের ঘন্টা ঢং করে জানান দিতেই ভারত-মাতা বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা হৈ হৈ করে ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

কারণ ছুটি। ঠিক ছুটি নয়—ম্যাজিক। একজন ম্যাজিশিয়ান আজ ম্যাজিক দেখাবে স্কুলে—সাড়ে তিনটে থেকে।

পিলপিল করে ছেলের দল ছুটল স্কুল-বাড়ির একতলার চত্বর লক্ষ করে। চৌকো আকারের প্রকাণ্ড চত্বর। তার দু-দিকে স্কুলের দোতলা বাড়ি, বাকি দু-দিকে দেড়-মানুষ উঁচু পাঁচিল। চত্বরের উত্তর দিকে পাঁচিল ঘেঁষে তৈরি হয়েছে ম্যাজিক দেখানোর মঞ্চ। সাত-আটখানা তক্তপোশ গায়ে-গায়ে লাগানো, তাদের ওপর শতরঞ্চি বিছানো। মঞ্চের ওপর সামনের দিকে একটা লম্বা টেবিল। টেবিল আর-একখানাও রয়েছে মঞ্চে, কিঞ্চিৎ ছোট সাইজের। সেখানা রয়েছে পিছনে। মঞ্চের ঠিক পিছনে দেয়ালে ঝুলছে ঘন নীল কাপড়ের ব্যাকগ্রাউন্ড। মঞ্চ ঘিরে গোল করে দড়ির বেড়া—যাতে একটু তফাতে থাকে দর্শক।

খেলা দেখতে টিকিট আছে। কুড়ি পয়সা মাথা-পিছু। আগের দিন ক্লাসে-ক্লাসে টিকিট বিক্রি হয়েছে। বেশির ভাগ ছেলেই টিকিট কিনেছে। যারা কেনেনি, কিনে নিয়ে ঢুকছে।

স্কুল-বারান্দা থেকে চত্বরে ঢোকার পথ দড়ি খাটিয়ে আটকে ফেলা হয়েছে। দুটো গেট দিয়ে ঢুকছে ছেলেরা। কয়েকজন জাঁদরেল মাস্টারমশাই কিছু মাতব্বর ছাত্র ভলেন্টিয়ার নিয়ে সামলাচ্ছেন গেট, ঠিকঠাক বসাচ্ছেন ছেলেদের, ডিসিপ্লিন বজায় রাখতে হিমসিম খাচ্ছেন।

হেডমাস্টারমশাই ঢুকলেন। পিছনে অন্য মাস্টারমশাইরা। মঞ্চ ঘিরে দড়ির বেড়ার একধারে বসলেন তাঁরা—হেডমাস্টারমশাই চেয়ারে, অন্য শিক্ষকরা বেঞ্চিতে। ছেলেরা বসেছে মাটিতে শতরঞ্চির ওপর।

"এসেছে এসেছে!" কলরব উঠল।

শতরঞ্চিতে বসা ছেলেদের মাঝখান দিয়ে সরু পথ। সেই পথে এগিয়ে এল—প্রথমে স্কুলের দারোয়ান রামলক্ষ্মণ সিং, কাঁধে এক পেল্লাই ট্রাংক। তার পিছনে এলেন স্বয়ং জাদুকর।

রোগা, ঢ্যাঙা, তামাটে রং। মুখখানা চিমড়ে লম্বাটে। ঠোঁটে একটু বাঁকা হাসি, তার ওপর ঝুলে পড়েছে বেজায় লম্বা নাকটা। মাথায় কাঁচা-পাকা ব্যাকব্রাশ করা চুল। দাড়ি-কামানো মুখে সরু গোঁফ।

জাদুকরের পরনে কালো পেন্টালুন ও হাঁটু অবধি ঝুলের

গোলাপি সিল্কের জোব্বা। জোব্বাটা পুরনো, রঙ চটে গেছে। পায়ে মোজা-বুট। হাতে একটি কালো কুচকুচে সরু গোল বেঁটে লাঠি, যাকে বলে জাদুদন্ড। জোব্বার বুকের কাছে আটকানো একটি ছোট্ট লাল গোলাপফুল।

জাদুকরের পিছনে-পিছনে এল একটি বছর বারো-তেরোর রোগা কালো ছেলে। তার গায়ে কড়া ইস্ত্রি-দেওয়া সাদা শার্ট ও ফুল-প্যান্ট। ও নাকি জাদুকরের অ্যাসিসট্যান্ট।

জাদুকর সোজা হেঁটে গিয়ে মঞ্চে উঠলেন। দারোয়ান ট্রাংক-খানা রাখল ছোট টেবিলটার ওপর। আর ছোকরা অ্যাসিসট্যান্টটি একটা বড় হলদে কাপড় টাঙিয়ে দিল পিছনের নীল পর্দায়। তাতে বড় বড় লাল হরফে লেখা, প্রায় পাঁচশো কণ্ঠ সমস্বরে পড়ল, "জাদুকর কর"।

জাদুকর কোমরে হাত রেখে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালেন সমবেত দর্শকদের। তারপর তিনি জাদুদণ্ড তুললেন—গোলমাল থামাবার নির্দেশ। শত কণ্ঠে ধ্বনি উঠল—"স্‌স্‌"—পরস্পরকে থামাবার চেষ্টা। ক্রমে গোলমাল থিতিয়ে এল।

জাদুকর কথা বললেন। তীক্ষ্ণ গলা, কারোর কান এড়াল না।

"স্নেহের ছাত্রবৃন্দ এবং শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাইরা, আপনারা জানেন, ম্যাজিশিয়ান মানে জাদুকররা অনেক রকম টাইটেল ব্যবহার করেন। কেউ হন প্রফেসর, কেউ জাদু-সম্রাট, কেউ মিস্টিক। উপাধি আমিও পেয়েছি—প্রচুর। কিন্তু কোন্‌ টাইটেলটি ব্যবহার করব তা এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি। কারণ যাঁরা আমায় টাইটেল দিয়েছেন—ভালবেসে দিয়েছেন, সম্মান করে দিয়েছেন। কিন্তু তার একটাকে ব্যবহার করলে অন্যদের যে অসম্মান করা হয়। আর সবগুলো একসঙ্গে নিলে—না না, সে বিরাট ব্যাপার হয়ে যাবে। তাই আমি এখনও বিশেষণবর্জিত। জাদুর খেলা দেখাই তাই জাদুকর, আর কর আমার পদবি। আপনাদের দেওয়া সমস্ত 'অনার' আমার এই এখানে (জাদুদণ্ড দিয়ে নিজের বুকে টোকা মারলেন) সযত্নে সঞ্চিত হয়ে থাকবে।"

জাদুকর আর এক দফা মাথা ঝোঁকালেন, হাতের জাদুদন্ডে টুক করে পাক দিয়ে হাঁক ছাড়লেন, "গিলি গিলি গিলি—স্টার্ট।"

জাদুদণ্ডটি সামনের টেবিলে রেখে দিয়ে তিনি জোব্বার পকেট থেকে একখানা রুমাল টেনে বার করলেন। মস্ত রংচঙে রুমাল। ঝপাং করে বাতাসে আছড়ালেন রুমালখানা। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন মন্ত্রবলে তাঁর হাতের মুঠোয় আবির্ভূত হল একটি পায়রা। পায়রাটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিলেন জাদুকর। ঝটপট করে সে উড়তে লাগল। জাদুকর শিস দিতেই নেমে এসে বসল তাঁর কাঁধে

"বাচ্চু!" জাদুকর পায়রাটাকে বাড়িয়ে দিলেন। ছোকরা সহকারীটি তাঁর হাত থেকে পায়রা নিয়ে রাখল ট্রাংকে।

শুরু হয়ে গেল খেলা।

প্রত্যেক খেলার শেষে চটাপট হাততালির ঝড় বয়। মাঝে মাঝে জাদুকর ডাক দেন, "বাচ্চু।" সহকারী বাচ্চু অমনি খেলার জিনিস এগিয়ে দেয়, কখনও গুছিয়ে তুলে রাখে। প্রত্যেক খেলার আগে জাদুদণ্ডে চরকি দিয়ে জাদুকর হাঁক পাড়েন, "গিলি গিলি গিলি।"

দর্শক মুগ্ধ হয়ে দেখছে। একটু যা গোল পাকাল কিছু ছাত্র। জাদুকর বাচ্চুকে ডাকবার উপক্রম করতেই তারা আগে থাকতেই হুঙ্কার ছাড়তে লাগল, "বাচ্চু-উ।"

বাচ্চু খুব চটপটে, ঘাবড়াল না। তবু মাঝে-মধ্যে ছেলেদের গর্জনে তার তাল কেটে যেতে লাগল। জাদুকরের কথা সে ঠিক শুনতে পাচ্ছে না।

ছোটন ভজাকে খোঁচা মারল, "এই চুপ, হেডস্যার।"

বাড়াবাড়ি দেখে হেডমাস্টারমশাই উঠে দাঁড়িয়েছেন। ক্লাস সেভেনের ছেলেদের দিকে কটমট করে চেয়ে তিনি হাত তুললেন। ব্যস, সব ঠান্ডা। আর কেউ বাচ্চুকে বিরক্ত করল না।

হুহু করে ঘণ্টাখানেক কোথা দিয়ে যে পার হয়ে গেল কেউ টেরই পেল না।

জাদুকর মঞ্চের সামনে খানিক এগিয়ে এলেন। গলা যথাসম্ভব ভারী করে ধীরে ধীরে বললেন, "এইবার আমার শেষ খেলা। খেলাটা একটু কঠিন, কারণ এবার আমি একজন জীবন্ত মানুষের মুণ্ডু কাটব। মানে একদম কেটে ফেলব, তারপর সেই কাটা মুণ্ডু ফের যথাস্থানে জুড়ে দেব। এবং আবার সে বেঁচে উঠবে।''

জাদুকর ট্রাংকের ভিতর থেকে একটা ছুরি তুলে নিলেন। মস্ত ছুরি। কসাইরা যা দিয়ে মাংস কাটে সেই গোছের। চকচক করছে। দেখেই গায়ে কাঁটা দেয়। বাঁ হাতের তালুতে ছুরির ধারালো দিকটা বারকয়েক উল্টে-পাল্টে ঘষে নিলেন ধার বাড়াতে। অবশ্য তার কোনও দরকার ছিল বলে মনে হয় না। এরপর জাদুকর মিষ্টি হেসে জানালেন, "এবার আমার একটি মানুষ চাই। জ্যান্ত মানুষ।"

তিনি আশাভরা চোখে চাইলেন মঞ্চের কাছে বসা ছেলেদের দিকে। চাউনিটা বুলিয়ে নিলেন ছাত্র থেকে মাস্টারমশাই অবধি সবার ওপরে। অমনি সামনের সারির ছাত্ররা ঠেলাঠেলি করে হাতখানেক পিছিয়ে গেল।

জাদুকর কাতরভাবে ছেলেদের কাছে আবেদন করলেন, "কই, এসো কেউ, কোনও কষ্ট হবে না। কোনও ভয় নেই, এগারো বচ্ছর আমি এই খেলাটা দেখাচ্ছি। কখনও কোনও, না, মাত্র দু-বার বাদে আর কখনও গোলমাল হয়নি।''

"কী, দু-বার?" বহুকণ্ঠ প্রশ্ন করল।

"মানে জোড়া লেগেছিল ঠিকই, শুধু একটু বেঁকা সেট করে ফেলেছিলাম। ওই একটু বেঁকে রইল ঘাড় দুটো। তখন নতুন শিখেছি খেলাটা, ভাল রপ্ত হয়নি কিনা, তাই। এখন আর অবশ্য কোনও রিস্ক নেই। খোকা তুমি আসবে?''

জাদুকরের লক্ষ্য বাচ্চা ছেলেটা মুহূর্তে ডিগবাজি খেয়ে পিছনের ভিড়ে মিলিয়ে গেল।

"বাচ্চুকে কাটুন।" সমস্বরে প্রস্তাব এল ছেলেদের।

বাচ্চু চুপ করে আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। কথাটা শোনা মাত্র একদৌড়ে দেয়ালের কাছে গিয়ে কাঠ হয়ে রইল।

"বাচ্চু বড্ড ভয় পায়।" জানালেন জাদুকর কর।

"কেন?" সবাই জানতে চাইল।

''বাচ্চুকে আমি অনেকবার কেটেছি,'' বললেন জাদুকর, ''কিন্তু একবার ওর ঘাড়টা দু-বার কাটতে হয়েছিল। প্রথমবার ঠিকমতো সেট হল না, তাই। দ্বিতীয়বার অবশ্য পারফেক্ট হয়েছিল—কই, খুঁত আছে কিছু? তবে এক খেলায় দু-বারের বেশি কাটা চলে না—ওই থেকে বাচ্চুর ভয় ধরে গেছে, যদি দু-বারেও না ঠিক সেট্ হয়। আর বেশি ভয় পেলে হার্ট দুর্বল হয়ে যায়—একটু প্রাণহানির রিস্ক থাকে। বাচ্চু থাক্। তোমরা কেউ এসো ভাই। মাস্টারমশাইরা পাঠান কাউকে।" কথা বলতে-বলতে জাদুকর সমানে শান দিয়ে চলেছেন তাঁর ছুরিতে। একটা সরু কঞ্চি তুলে নিয়ে ধার পরখ করতে এক কোপে কচাং করে দু-খান করে দিলেন।

''কে আসবে, হাত তোলো। তোলো, তোলো।'' জাদুকর উৎসাহ দিলেন। কিন্তু কোনও হাত উঠল না।

একটু ভাবলেন জাদুকর কর। তারপর বললেন, ''বেশ, যে সাহস করে এগিয়ে আসবে একটা পুরস্কার পাবে—নগদ পঞ্চাশ পয়সা আর দুটো কমলালেবু। কেমন?"

এবারেও কোনও হাতের দেখা নেই।

"আচ্ছা এক টাকা দেব।" রেট বাড়িয়ে দিলে জাদুকর।

তবু কারও গরজ হল না।

"ইস, এত বড় ইস্কুলে একজনেরও কি সাহস নেই? এই কি নেতাজী সুভাষ আর ক্ষুদিরামের দেশের ছেলে। সব দেখছি ওই বাচ্চুর মতো ভিতু।" —জাদুকরের কণ্ঠে ধিক্কার। ''তাহলে আর কী করা যায়,'' বললেন তিনি, "অগত্যা বাচ্চুকেই কাটতে হবে। বাচ্চু—" কঠোর স্বরে ডাক দিলেন জাদুকর।

এই সময় একটি হাত উঁচু হল। শুধু তাই নয়, হাতের মালিকও উঠে দাঁড়াল। চারদিক থেকে ছাত্রদের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠল, "ভজা, ভজা।" মাস্টারমশাইরাও কয়েকজন কিঞ্চিৎ নড়েচড়ে বসলেন।

সাহসী বালকটিকে ভাল করে নজর করলেন জাদুকর।

ফর্সা, নধরকান্তি, গাল দুটি ফুলো-ফুলো। মুখখানি গোল। চোখ দুটি বর্তুলাকার ও ভাবলেশহীন। গায়ে হাফ-শার্ট ও হাফ-প্যান্ট। একটু যেন ক্যাবলা টাইপ—ভাবলেন জাদুকর। ঘাবড়ে গিয়ে মাটি করবে না তো খেলাটা?

যাহোক তিনি হাসিমুখে ডাকলেন, "এই তো একজন উঠেছে। এ ব্রেভ বয়। চলে এসো এখানে।"

ছোটন আর শিবু দু-পাশ থেকে টানছে ভজাকে, "এই, বসে পড়্।"

"এক টাকা দেবে বলছে।'' চাপাস্বরে বলল ভজা।

''টাকার লোভে মরবি?"

''ভিতু বলছে যে।''

"যদি মুণ্ডু বেঁকে যায়?"

''ধুত।'' নিজের বই-খাতা ছোটনের হাতে গুঁজে দিয়ে ভজা মঞ্চের দিকে পা বাড়াল।

ভজার পিঠে হাত বুলিয়ে জাদুকর জিজ্ঞেস করলেন, ''তোমার নাম কী খোকা?''

"ভজা।" উত্তরটা সমবেত কণ্ঠে এল দর্শকদের কাছ থেকে।

"ভজা! বাঃ, খাসা নাম। তোমায় সব চেনে দেখছি। পপুলার বয়। কোন ক্লাসে পড়?"

"সেভেন।" এবারও ভজাকে জবাব দিতে হল না, অন্যরাই দিয়ে দিল।

ভজার ঘাড়ে হাত বোলাতে বোলাতে গম্ভীরভাবে বললেন জাদুকর, ''এঃ, তোমার ঘাড় যে বেজায় শক্ত হে। খুব রদ্দা খাও বুঝি মাস্টারমশাইদের? পড়াশুনো কর না বুঝি?"

ছেলেরা হোহো করে হেসে উঠল। শিক্ষকরাও অনেকে মুখ টিপে হাসলেন। জাদুকর ধরেছে ঠিকই।

ভজা আড়চোখে পিটপিট একবার জাদুকরের দিকে চাইল। তার গাল দুটো আরও ফুলে উঠল।

"যাকগে, কুছ পরোয়া নেই, এর চেয়েও ঢের কড়া গর্দান আমি কোতল করেছি।'' জাদুকর জানালেন। ''খোকা, এই টেবিলটায় শুয়ে পড়ো তো চিত হয়ে। জামাটা খুলে ফেলো, নইলে রক্ত লেগে যাবে।"

ভজা বিনা বাক্যব্যয়ে গায়ের জামা খুলে সামনের টেবিলে টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

বাচ্চু কাছে এগিয়ে এসেছে। সে এখন বিপদ-মুক্ত। একটা সাদা চাদর দিয়ে সে ভজার গলা অবধি ঢেকে দিল।

জাদুকর কর বললেন, ''আগে একে হিপনোটাইজ্ মানে সম্মোহন করতে হবে, নইলে কাটার সময় ব্যথা লাগবে।"

ছুরি রেখে দিয়ে তিনি ভজার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। বললেন, ''খোকা, আমার চোখের দিকে তাকাও।'' তীব্র দৃষ্টিতে ভজার চোখে চোখে চেয়ে তিনি বিড়বিড় করতে লাগলেন, আর দু-হাতের দশ আঙুল ছড়িয়ে বারবার বাতাসে

ঘোরাতে লাগলেন ভজার মুখের ওপর দিয়ে।

ভজা নিথর। তবে চেয়ে আছে সোজা।

একটু পরে জাদুকর ভজার খোলা চোখের পাতা বুজিয়ে দিলেন। বললেন, "ব্যস, হিপনোটাইজড হয়ে গেছে।" তিনি ছুরিখানা তুলে নিলেন আবার। বললেন, "আপনাদের চোখের সামনে আমি কাটব না। বীভৎস দৃশ্য। অনেকে সহ্য করতে পারে না, অজ্ঞান হয়ে যায়। তাই পুলিস থেকে অর্ডার দিয়েছে ঢাকা দিয়ে কাটতে। তবে সত্যি কাটা হল কি না আপনারা বুঝতেই পারবেন দেখে। একটি অনুরোধ—দয়া করে কেউ গোলমাল করবেন না। আমার কনসেনট্রেশন নষ্ট হলে ছেলেটির ক্ষতি হতে পারে। যা তা ভাবে কেটে-কুটে যেতে পারে।"

জাদুকর চোখ বন্ধ করে স্তব্ধ হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। জোরে জোরে দম নিলেন বার দুই। তারপর বাঁ হাত ঢুকিয়ে দিলেন চাদরের তলায়। চেপে ধরলেন ভজার মাথা। এরপর ছুরি-সুদ্ধু ডান হাতখানাও ঢুকিয়ে দিলেন চাদরের নীচে। খুব সাবধানে ছুরির পোঁচ দেওয়া শুরু হল। দর্শকরা রুদ্ধশ্বাস।

বোঝা যাচ্ছে কাপড়ের তলায় ছুরিটা এগোচ্ছে পিছোচ্ছে। একটু পরেই দর্শকরা দেখতে পেল রক্ত পড়ছে। টেবিলের গা বেয়ে ঝরছে টকটকে লাল রক্তধারা। ভজাকে ঢাকা দেওয়া চাদরটাও লাল হয়ে উঠছে গলার কাছটায়। শিউরে উঠল সবাই। ভীষণ কান্না পাচ্ছে ছোটন আর শিবুর। গোঁয়ার, লোভী—এখন যদি জোড়া না লাগে মাথা, কী হবে? উঃ!

হঠাৎ জাদুকরের মুখের ভাব কেমন থমথমে হয়ে উঠল। তিনি চাদরে-ঢাকা ভজার মুখের খুব কাছে ঝুঁকে পড়লেন। তাঁর ঠোঁট নড়ছে, ভুরু কুঁচকে গেছে, মাঝে-মাঝে থামছে ছুরি।

ছুরি একেবারে থেমে গেল। জাদুকর তাঁর বাঁ হাতখানা বের করে আনলেন চাদরের তলা থেকে। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন। মুখে তাঁর রীতিমত অস্বস্তির ছাপ।

"কী হল?" ইংরেজির শিক্ষক হরিবাবু নার্ভাস হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। সবারই বোধ হচ্ছে, কিছু একটা গণ্ডগোল বেধেছে যেন!

জাদুকর ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে ঘাড় নেড়ে অভয় দিলেন শঙ্কিত দর্শকদের। তিনি ফের বাঁ হাত চাদরের তলায় ঢুকিয়ে ভজার মাথা চেপে ধরলেন। আবার চলতে লাগল ছুরি। সবাই দেখল ভজার মাথাটা কেমন নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। মাথাটা ধরে এপাশ-ওপাশ নাড়াচ্ছেন জাদুকর। ছুরির টানে মাথা যেন ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে ধড় থেকে।

"দেখুন।" গলা চড়িয়ে বললেন জাদুকর, "এর মাথা এখন আমি পুরোপুরি কেটে ফেলেছি। এই যে—"

জাদুকর ভজার মাথাটা প্রায় হাতখানেক দূরে টেনে সরিয়ে আনলেন, কিন্তু তার বাকি দেহ এতটুকু নড়ল না। চাদরের নীচে উঁচু হয়ে থাকা ভজার দু-পায়ের বুড়ো আঙুল দুটো ঠিক তেমনি রইল একই জায়গায়। ভজার গলার কাছে কাপড়ের তলায় উঁচু হয়ে আছে জাদুকরের মুঠোয় ধরা লম্বা ছুরির পিঠটা। তারপর চাদরের ঢাল। অর্থাৎ মুণ্ডহীন ঘাড়ে শেষ হয়েছে ধড়।

খন্ডিত মস্তক অবশ্য চাদরের নীচেই রইল। জাদুকর কাটা মুণ্ডু বের করে দেখালেন না। কেউ তা দেখতেও চাইছিল না। তবে কাপড়ের তলায় তাঁর হাতে ধরা ভজার মাথার গড়নটি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। কাপড়ের ভাঁজে ফুটে উঠেছিল তার নাক, কপাল, থুতনি।

"জুড়ে দিন এবার।"

"আর দরকার নেই।"

নানা জনের উৎকণ্ঠিত আবেদন ভেসে এল দর্শকদের মধ্য থেকে।

"প্লীজ বী কেয়ারফুল।" হরিবাবুর অনুরোধ শোনা গেল।

জাদুকর মাথা ঝাঁকিয়ে ভরসা দিলেন সবাইকে। তারপর খুব সাবধানে ভজার কাটা মুণ্ডু লাগিয়ে দিলেন আগের জায়গায়। এরপর তাঁর দু-হাতই বের করে আনলেন বাইরে। রক্তমাখা ছুরিটা রেখে দিলেন টেবিলে। আস্তে-আস্তে ভজার মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিলেন চাদর।

একটু পরেই ভজা চোখ মেলল। উঠে বসল টেবিলে। সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দেখল মুন্ডুটা চমৎকার জুড়েছে। একটুও টেড়াবাঁকা হয়নি। ছেলেরা গলা ফাটিয়ে জয়ধ্বনি দিল আনন্দে। জাদুকর কোমরে হাত রেখে মাথা নুইয়ে অভিবাদন গ্রহণ করলেন। তাঁকে বেশ কাহিল দেখাচ্ছিল। তবু হাসিটুকু ধরে রেখেছেন। সত্যি ধকল আছে খেলাটায়।

ম্যাজিক-ফেরতা ভিড় থেকে একটু ফাঁকায় এসে ছোটন জিজ্ঞেস করল, "ভজা, তোর লেগেছিল নাকি রে?"

ভজা বলল, "ধুত।"

"টের পাসনি বুঝি?" বলল শিবু।

ভজা মিচকে হাসল।

"টাকা দিয়েছে?" ছোটন জানতে চাইল।

"হুঁ, এই যে।" ভজা প্যান্টের পকেট থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বের করে দেখাল।

"অ্যাঁ পাঁচ কেন? এক দেবে বলল যে?"

"আদায় করলাম।" বলল ভজা।

"কী করে?" দুই বন্ধু একসঙ্গে জানতে চায়।

"বললাম পাঁচ টাকা না দিলে উঠে বসব, চেঁচাব, সব বলে দেব।"

"কী বলে দিবি?"

"বলে দেব, সব ফল্‌স, মিছিমিছি।"

"কী ফল্‌স?" ছোটন ও শিবু থৈ পায় না।

"ওই গলা কাটা।"

"তবে যে দেখলাম তোর মুণ্ডুটা কেটে আলাদা করে ফেলল?"

"ফল্‌স মুণ্ডু। রবারের। কখন চাদরের নীচে ঢুকিয়ে নিয়ে হাতের কায়দায় তোদের বোকা বানিয়েছে। আমি তখন মাথাটা কাত করেছিলুম।"

"দেখলাম যে রক্ত পড়ল।"

"রক্ত নয়, আলতা।"

"আর ছুরি চালানো? কী ধার!"

"ভোঁতা দিকটা চালিয়েছে।"

"আর হিপনোটাইজ করা?"

"বাজে। ফল্‌স। আমায় তখনই তো শিখিয়ে দিল চুপি-চুপি, কেমন করে ভান করতে হবে।"

"তারপর?"

"তারপর চাদর ঢাকা দিয়ে ছুরি চালানো শুরু করতেই ফিসফিসিয়ে বললুম—এক টাকায় হবে না, পাঁচ চাই। দিতে কি চায়। রাম কিপ্‌পুস। আর কী ধমক। আমিও নাছোড়। তখন বলে, পরে দেব। বললুম—উঁহু, এখুনি চাই। তাই দিল। চাদরের ভিতরে ঢুকিয়ে দিল নোটটা আমার হাতে। শেষে আবার লেবুদুটো ফাঁকি দেবার তাল। জোর করে তুলে নিইচি ট্রাঙ্ক থেকে। হুঃ, ভজা ঘোষকে বলে কিনা, পড়া পারে না, মাস্টারের রদ্দা খায়। ঠেলা বুঝিয়ে দিইচি বাছাধনকে। যাক, এসব কথা তোরা আর বলিসনি কাউকে, আমায় খুব রিকোয়েস্ট করেছে না-বলতে।"

ছবি অনুপ রায়

মঞ্চের আড়ালে
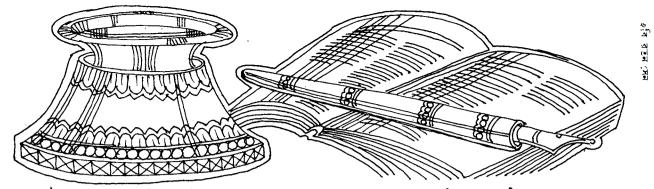
অখিলেশ্বর ভট্টাচার্য

চাষির প্রাঙ্গণে মাচায় কুমড়ো ফলেছে। দেখে চোখ জুড়োয়। ফলে-ফুলে মাচার যে শোভা তার অন্তরালে অদৃশ্যভাবে রয়েছে শিকড়। মাটি ভেদ করে শিকড় সংগ্রহ করছে প্রাণরস যা সকল শোভার উৎস। বাংলা ভাষার মঞ্চে অনেক শব্দের বাহার আমরা দেখি যার মূলে যে-শব্দ আছে, তা আমাদের নজরে আসে না ; কারণ বাংলা ভাষায় তা উপেক্ষিত। প্রিন্স দ্বারকানাথ ছিলেন অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক। স্যার আশুতোষের ছিল অগাধ পান্ডিত্য। অগাধ শব্দের অর্থ অতি গভীর, অপরিসীম, অথই। যার কাঁধে ভর করে অগাধ শব্দটি এসেছে বাংলার রঙ্গমঞ্চে, সেটি গাধ। গাধ শব্দের অর্থ অগভীর, যার তল স্পর্শ করা যায়। এককভাবে এ-শব্দের ব্যবহার বাংলা ভাষায় নেই। শুধু ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর মতো সমাসের ব্যাসবাক্য বলতে গিয়ে আমরা 'গাধ'-কে টানি। নাই গাধ যার, অগাধ ; নঞর্থক বহুব্রীহি। মহাকবি কালিদাস তাঁর রঘুবংশ মহাকাব্যের চতুর্থ সর্গে শব্দটি একটি শ্লোকে ব্যবহার করেছেন—

> সরিত কুর্বতী গাধাঃ পথশ্চাশ্যানকর্দমান্।
> যাত্রায়ৈ নোদয়ামাস তং শক্তেঃ প্রথমং শরৎ।।

অর্থ, নদীগুলোকে পার হওয়ার যোগ্য এবং পথগুলোর কাদা শুষ্ক করে দিয়ে শরৎকাল তাঁকে (রঘুকে) শক্তিলাভের আগেই যুদ্ধযাত্রায় উৎসাহিত করেছিল।

উদরাময়, নিরাময় প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে ফেউ-এর মতো 'আময়' শব্দ লেগে থাকে। আময় শব্দের অর্থ রোগ। একটু খুঁটিয়ে দেখলেই জানা যায় 'আময়' সাজঘর থেকে নিরাময় ও উদরাময়কে ভাষার রঙ্গমঞ্চে টেনে এনেছে। আময় শব্দের একক ব্যবহার চোখে পড়ে না। 'অর্হ' শব্দের অর্থ যোগ্য। পূজার্হ, ক্ষমার্হ, ঘৃণার্হ প্রভৃতি শব্দ আমরা হামেশা ব্যবহার করি। এমন-কী পূজনীয় অর্থে অর্হনীয় শব্দেরও সাক্ষাৎ মেলে। যে 'অর্হ' শব্দ পূজা, ক্ষমা, ঘৃণা ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভাষামঞ্চে পূজার্হ, ক্ষমার্হ, ঘৃণার্হ প্রভৃতি শব্দের রূপায়ণ করছে, তার একক ব্যবহার দেখা যায় না। অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ না করে কাউকে দোষী বলা উচিত নয়। অকাট্য শব্দের অর্থ যুক্তিদ্বারা অখন্ডনীয়। আর কাট্য শব্দের মানে কর্তনীয় খন্ডনীয় প্রভৃতি। কেবল কাট্য শব্দের প্রয়োগ বাক্যে মেলে না। নেপথ্যে থেকে অকাট্যকে সাজিয়েই কাট্যের সার্থকতা। কুইনিন ম্যালেরিয়া জ্বরের অমোঘ ওষুধ। অমোঘ শব্দের অর্থ অব্যর্থ বা সার্থক। আর মোঘ শব্দের মানে ব্যর্থ। মহাকবি কালিদাস লিখেছেন, 'যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।' কিন্তু এটা সংস্কৃত ভাষা। বাংলা বাক্যে 'মোঘ' শব্দের পৃথক ব্যবহার নেই। মোঘের কাঁধে ভর করে অমোঘ ভাষার রঙ্গমঞ্চে ঢুকেছে।

বীরপুরুষ কবিতায় আছে—এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে/ ভাবছ খোকা গেলই বুঝি মরে।/আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে/ বলছি এসে, 'লড়াই গেছে থেমে।' রক্তাক্ত এবং ঘর্মাক্ত খোকার রিপোর্টে খুশি হয়ে মা তো খোকাকে চুমো খেয়ে কোলে তুলে নেবেই। রক্তাক্ত, ঘর্মাক্ত, ঘৃতাক্ত, তৈলাক্ত প্রভৃতি শব্দের নেপথ্যে আছে অক্ত। এ-শব্দটির অর্থ লিপ্ত বা মাখানো। এককভাবে অক্ত শব্দ বাংলা ভাষায় উপেক্ষিত। কেউ কেউ 'অক্ত' বলে; কিন্তু তা 'র'-এর উচ্চারণ-বিভ্রাট। যেমন, 'অক্ত নয়, অক্ত নয়, এ যে অঙ।' অর্থাৎ রক্ত নয়, রক্ত নয়, এ যে রং। বাল্যশিক্ষায় অনেকেই পড়েছি, পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল। পক্ষী থেকে এসেছে পাখি। পঙ্খীও তাই। কিন্তু 'পঙ্খী' শব্দের একক ব্যবহার নেই। সে শুধু অভিধানের পাতাতেই বসে থাকে। তবে রূপকথার রাজ্যে 'ময়ূরপঙ্খী' এখনও চলে।

গোধন, গোমূর্খ, গোবৈদ্য, গোগ্রাস, গোধূলি, গোপ প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে আমরা খুব পরিচিত। এ-সব শব্দের শুরুতে আছে চতুষ্পদ জন্তু 'গো' অর্থাৎ গোরু। গোরু সর্বত্র আছে। এমন-কী কলকাতার রাজপথেও। কিন্তু বাংলা বাক্যে 'গো' শব্দের একক প্রয়োগ দেখা যায় না। সাজঘর থেকে অন্য শব্দের সঙ্গে সমাসের পোশাক পরে 'গো' শব্দ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে। 'পন্ডিত' শব্দের সঙ্গে আমরা খুবই পরিচিত। পন্ডিত শব্দের অর্থ বিদ্বান, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ ইত্যাদি। আবার ব্রাহ্মণবংশীয় হিন্দুর উপাধি হিসাবেও পন্ডিত প্রচলিত। সে-বংশের ছেলে গন্ডমূর্খ হলেও নামের শেষে পন্ডিত লেখার হক তার আছে। পুষ্পের সঙ্গে 'ইত' প্রত্যয় যোগ করে যেমন পুষ্পিত হয়, তেমনি পন্ডা থেকে হয়েছে পন্ডিত। পন্ডা+ইত=পন্ডিত। পন্ডিতের আড়ালে যে 'পন্ডা' তার ব্যবহার বাংলা ভাষায় নেই। এমন-কী, ছোটখাটো বাংলা অভিধানেও পন্ডার সাক্ষাৎ মেলে না। পন্ডা মানে বিদ্যা বা শাস্ত্রজ্ঞান। তীর্থে বেরুলেই পান্ডার দেখা মেলে। তীর্থ ও তীর্থকৃত্যাভিজ্ঞ তীর্থগুরুর আর-এক নাম পান্ডা। দলের পান্ডা, সভার পান্ডা প্রভৃতি বাংলা বাক্যে প্রচুর প্রয়োগ হয়। পন্ডা থেকেই পান্ডা হয়েছে।

গোয়েন্দা-কাহিনীর দুর্ধর্ষ দস্যু অকস্মাৎ অট্টহাসিতে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। সে-হাসি শুনে ফেলুদার মতো পাকা গোয়েন্দাও মুহূর্তের জন্য ঘাবড়ে যেতে পারে। কাব্যের পেলব জগতে, বিশেষত রবীন্দ্রকাব্যে, অট্টহাসির কথা অনেকেই সহসা ভাবতে পারেন না। স্মরণ করা যাক কবি-কণ্ঠের রেকর্ডখানা—

> …"মরণ দোলায় ধরি রশিগাছি
> বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি
> ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্টহাসিয়া মারিবে ঠেলা ;
> আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে ঝুলন-খেলা
> নিশীথ বেলা।"

অট্টহাসির 'অট্ট' শব্দের অর্থ উচ্চ। অট্টরোল, অট্টহাসি, অট্টরব, অট্টনাদ প্রভৃতিতে অট্ট গাঁটছড়া বেঁধে আছে যথাক্রমে রোল, হাসি, রব ও নাদ শব্দের সঙ্গে। যে অট্টের কাঁধে ভর করে রোল, হাসি প্রভৃতি শব্দ ভাষার মঞ্চে ঢুকেছে, তার কিন্তু একক ব্যবহার নেই। একক 'অট্ট'র সন্ধান ঈশ্বর খোঁজার শামিল।

মুখের মতন মিষ্টি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মুখের মতন মিষ্টি কি আর কিচ্ছু আছে ?
আমার কাছে, তোমার কাছে, তাদের কাছে !
কিচ্ছুটি নেই কিচ্ছুটি নেই কিচ্ছুটি নেই
কথায় কোনো মিচ্ছুটি নেই
মুখের মতন মিষ্টি অমন বিচ্ছুটিও !

সন্ধে হলেই ঠ্যাং ছড়িয়ে কাঁদতে বসে।
ভূতপেরেতের নিবাস কাছের এককোরোশেই—
এবং অন্ধকারের ভিতর ব্যাঙবাবাজি
ঘ্যাঁঙোর-ঘোঁঙর আওয়াজ করে গাইতে থাকে,
টপ্পা ঠুংরি খেয়ালখুশির কুম্ভীপাকে।

কোন্ সাহসী একলা বসি' দাবার ধারে,
ইচ্ছে মতন সাহস পাইলে পাইতে পারে—
অমন সময় !

কুত্তা-কাহিনী

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কুত্তার চিৎকারে রাত্তিরে কাল
ঘুমোননি মুনসেফ বনোয়ারিলাল।
কেঁউ-কেঁউ ঘেউ-ঘেউ ঘোঁ-ঘোঁ আর
ভোঁ-ভোঁ ডাক শুনে নেড়িকুত্তার
বিনিদ্র বনোয়ারি সারারাত ধরে
শয্যায় কেঁদেছেন ভেউ-ভেউ করে।
সক্কালে পেয়াদাকে বললেন, "যাও,
রাস্তার থেকে সব কুত্তা হটাও।"

পেয়াদা জেয়াদা রেগে গোঁফে দিয়ে চাড়া
তক্ষুনি করে সব কুত্তাকে তাড়া।
এ-ধারে ও-ধারে লাঠি দুমদাম মারে,
দাঁতে দাঁত ঘষে আর হুঙ্কার ছাড়ে।
হাকিমের চেয়ে রাগী পেয়াদার লাফে
সকলের বক্ষের পঞ্জর কাঁপে।
ভয়ে নেড়িকুত্তারা করে কুঁই-কুঁই,
আকাশে ভির্মি খায় পায়রা-চড়ুই।

কুত্তাসমাজে আজ ত্রস্ত সবাই ;
বুঝে গেছে না-পালালে নিস্তার নাই
কম্পিত বুকে রাত সাড়ে বারোটায়
চম্পট দিল তারা অন্য পাড়ায়।
কুত্তাবিহীন পাড়া শান্ত নিঝুম,
বনোয়ারি দেন তাই জব্বর ঘুম।
সেই ফাঁকে হাকিমের ঘরে সিঁদ দেয়
তারা, যারা ওস্তাদ বড়বিদ্যায়।

ঘুম ভেঙে বনোয়ারি সক্কালবেলা
বুঝলেন কুত্তাকে তাড়াবার ঠেলা।
বললেন, "শোনো সারসত্য সবাই,
ঘুম চাই, তবে কিনা কুত্তাও চাই।
চিৎকারে যার কাঁচা ঘুম ভেঙে যায়,
মনে রেখো, সে-ই ডাকু-চোট্টা ভাগায়।"
তারপরে পেয়াদাকে বললেন, "যাও,
দশ-বিশ-পঁচাশঠো কুত্তা লে আও!"

ছবি দেবাশিস দেব

বিনামূল্যে
এল পি রেকর্ড
৪৯* টাকা থেকে ১৪৭* টাকা মূল্যের
আজই আপনার পছন্দের
এইচ এম ভি রেকর্ড প্লেয়ার
অথবা স্টিরিও সিস্টেম কিনুন
এবং বিনামূল্যে রেকর্ড সংগ্রহ শুরু করুন
বিনামূল্যে
১৪৭ টাকার ৩টি
এল পি, স্টিরিও
৩১৩১-এর সঙ্গে
বিনামূল্যে
৯৮ টাকার ২টি
এল পি, স্টিরিও
পপুলার II এর সঙ্গে
বিনামূল্যে
১৪৭ টাকার ৩টি
এল পি, স্টিরিও
বিনামূল্যে
৯৮ টাকার ২টি এল পি
সুপার ট্র্যাক II এর সঙ্গে
POPSTAR
বিনামূল্যে
৪৯ টাকার ১টি এল পি
ক্যালিপ্সোর সঙ্গে
STEREO
বিনামূল্যে
১৪৭ টাকার
এল পি, স্টিরিও
১০১০IC
HMV fiesta popular
বিনামূল্যে
৯৮ টাকার ২টি এল পি
পপস্টার-এর সঙ্গে
বিনামূল্যে
৯৮ টাকার ২টি
এল পি, ফিয়েস্টা
পপুলার-এর সঙ্গে
আপনার রেকর্ড
সংগ্রহ শুরু করার
এ এক দারুণ উপায়।
তাছাড়া আপনার
নতুন রেকর্ড প্লেয়ার
বা স্টিরিওটি কেনার সঙ্গে
সঙ্গেই বাজিয়ে উপভোগ
করার চমৎকার সুযোগও
আপনি পাচ্ছেন।
দেরী করবেন না! আজই আপনার
এইচ এম ভি ডিলারের সঙ্গে দেখা করুন।
৩০ নভেম্বর, ১৯৮০ পর্যন্ত এই বিনামূল্যের উপহার পাবেন।
* দাম সমস্ত উৎপাদন শুল্ক ও কর সমেত।
হিজ মাস্টার্স ভয়েস
সেরা সামগ্রী—সেরা আওয়াজ।